

দশম বর্ষ ।]

আশ্বিন, ১৩১৭

[ষষ্ঠ সংখ্যা ।

বঙ্গদর্শন

(নবপর্যায়)

মাসিক পত্র ।



কলিকাতা,

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

স্বদেশী লাইব্রেরি হটেল প্রকাশিত

আছে।

বর্তমান সংখ্যার মূল্য

২০ হাট

প্রতিম বার্ষিক মূল্য ৩০০

বঙ্গদর্শন

(নব পর্যায়)

মাসিক পত্র ।



কলিকাতা,

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

মহুসদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহারের দেশীয় সালসা



পারদ ও রক্তদ্রুষ্টির মহৌষধ।

সুন্দরী সর্বদা সর্বদা শরীরের দ্রুষ্টি শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি, ঘা, ক্ষেত্র
বর্তিরক্ত, মাংস
মবাত ও পারদ জন্ত রক্তদ্রুষ্টি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।
এই মহা তৈল
কর দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষ ও শরীরের কান্তি বর্ধিত হইয়া থাকে।
হার প্রত্যেক
মাত্রাই শরীরে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার করে।

মূল্য এক শিলি ১৫০ দেড় টাকা। ভিঃ পিতে লইলে মোট ২/০ আনা।

জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।



বীহাদের অল্প পরিপ্রসঙ্গেই মাথা ধরে, মন স্থির থাকে
না, কাজের সময় মাথা গরম হইয়া ভুলচুক হয়, তাহাদের
পক্ষে জবাকুসুম তৈল বিশেষ উপকারী। জবাকুসুম
তৈল কেশের অকালপকতা ও উঠিয়া যাওয়া নিবারণ
করে। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতুলনীয়। মহারাজা-
ধিরাজ হইতে সামান্ত কুটীরবাসী পর্যন্ত সকলেই
জবাকুসুম তৈলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেশের
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্ত মহিলাগণ অতি আনন্দের
সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন।

এক শিলির মূল্য ১/০ এক টাকা। ডাকমাওল ১/০ পাঁচ আনা।

বকবলহ রোগীগণ নিজ নিজ রোগের বিবরণ লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়।

তিন শিলির মূল্য ৩৫০ পনের লিকা। ডাক মাওলাদি ৫০/০ আনা।

ঐদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও ঐউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

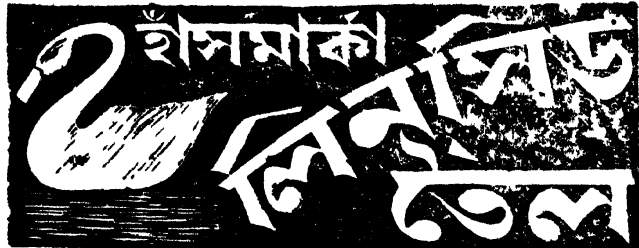
সীলটে চূণ

সীলটে চূণ

পাঁচদিন এক খণ্ড কঠিন প্রস্তরের আয় পরিণত হয়।
গ্রাহকসমূহের সুবিধায় জন্ম চূণ বস্তাবন্দী কবিতা রেণে কিম্বা টিমারে
সুক করিয়া পাঠান হয়।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানি,

৪ নং ফেরার্লি প্লেস, কলিকাতা।



আপনি কি জানেন ?

হান্স মার্ক লিনসিড তৈল লকলে এত পছন্দ করে কেন ?

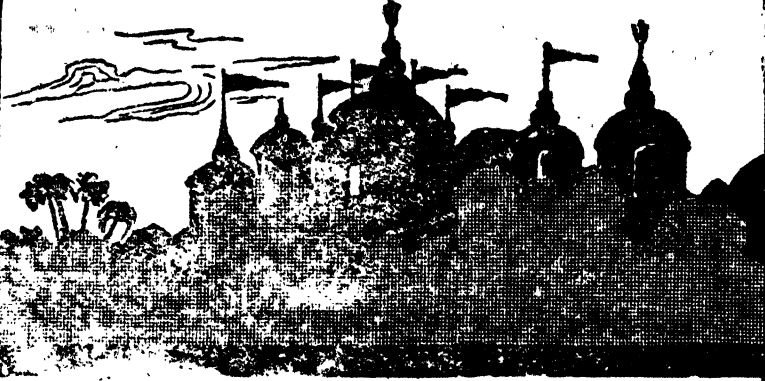
রংয়ের কার্যকে উজ্জ্বল ও কাঠকে স্থায়ী করিতে

কোন তৈলই ইহার সমতুল্য নহে।

এণ্ড ইউল এণ্ড কোম্পানি,

৮ নং ফ্লাইং রোড, কলিকাতা।

অগুরু দেবভোগ্য স্বর্গাস্থি



ছোট শিশি ১/০

বড় শিশি ১/০

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা।



যমানি-ট্যাবলেট

Ptychotis - Tablets

আমাদের 'যমানি-জলের' সমস্ত গুণ ইহাতে
বহুমান আছে। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি রোগে
সত্ত্ব ফলপ্রসূ। পেটকাঁপা বুকজ্বালা একমাত্র সেবনে নিবারিত হয়।

মূল্য ২৫ ট্যাবলেট ১/০ পাঁচ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা।

হিন্দুস্থান সমবার বিমামণ্ডলা ল্যামচেড্ ।

প্রধান কার্যালয়—৩০ নং ডালহাউসি স্টোর (দক্ষিণ), কলিকাতা ।

মজুরী মূলধন—এক কোটি টাকা একশত টাকার একলক্ষ অংশে বিভক্ত ।

প্রত্যেক অংশের জন্য বার্ষিক মাত্র ৫ টাকা তলব অঙ্গুসারে দেয় ।

অংশের ১০ তম বৎসরক্রমে শোধ করিলে আর ১৫ বৎসর অন্তে বা পূর্বে মৃত্যু হইলে মৃত্যুর প্রমাণ মাত্র অংশের পরিমাণ টাকা বিমামণ্ডলে পাওয়া যায় একশত পৃথক পণ দিতে হয় না । অংশও সম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । এতদ্ব্যতীত স্থলত পণে এবং বহুবিধ সুবিধাজনক সর্বোৎকৃষ্ট সকলপ্রকার বিমার কার্য্য করা হয় । জীলোকের সমান হারে সমান সর্বোৎকৃষ্ট বিমা করিতে পারেন । বিমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া মাত্র বা বিমাকারীর মৃত্যু হইলে মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া মাত্রই টাকা বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হয় । বিমাকারীর ওয়ারিশ নিঃসহায় জীলোকের নাবালক হইলে মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ ও আটন ঘটিলে তৎক্ষণাত মণ্ডলী স্বয়ং করিয়া থাকেন কখনও পণ চালাইতে অসমর্থ হইলেও মণ্ডলীর খরচ বাড়ে প্রদত্ত টাকা সুদ সমেত ফেরত পাওয়া যায় । সকল রকম বিমামণ্ডল লাভের অংশ দেওয়া হইয়া থাকে ।

ভূসম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়া দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে শতকরা ২৫ টাকার অধিক লাভ পাওয়া গিয়াছে । প্রথম বর্ষে শতকরা ৭ টাকা ডিভিডেণ্ড বন্টন করা হইয়াছিল—দ্বিতীয় বর্ষে শতকরা ৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে । প্রথম দুই বৎসরেই ৫০ লক্ষ টাকার অধিক বিমার কার্য্য পাওয়া গিয়াছে । বর্তমান বর্ষে মাসিক ৬৭ লক্ষ টাকার কাজ পাওয়া যাইতেছে ।

সর্বত্র সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ এজেন্ট আবশ্যক । এজেন্টগণকে উচ্চতম হারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে । তাঁহারা সংগৃহীত কার্য্যের উপর, কার্য্যভাগ করিলেও এমন কিছু ব্যতিক্রমে কমিশন পাইয়া থাকেন । স্থানে স্থানে এজেন্ট মনোনয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রধান এজেন্ট আছেন । এজেন্সি প্রাধিকার তাহাদের কাহারও মন্তব্য সহ আবেদন করিবেন । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী ইত্যাদি পাঠান হয় ।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ,

জমিদার, কালকাতা ।

সহস্রাধিক—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী,

জমিদার, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ ।

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য পুস্তক।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দিনচর্যাঃ

দলীল।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সাক্ষাল প্রণীত।
প্রত্যেক জিন্দগীবনকে সুন্দর, মহৎ ও
সার্থক করিবার জন্য ও আদর্শের সঙ্গে
পরিচালিত করিবার জন্য অত্যাশঙ্ক্যকর
গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালী ভাষায় আর নাই।
বিচারপতি সারদা বাবু, কবির রবীন্দ্র বাবু
প্রভৃতি দেশমাত্র ব্যক্তিগণ কর্তৃক ও বহু
পত্রিকায় এক বারের প্রশংসিত। মূল্য
চারি আনা মাত্র।

আশ্রম চতুষ্কর।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সাক্ষাল প্রণীত।
জীবনের লক্ষ্য কি ও কোন আদর্শ
তাৎকে গঠিত করা উচিত, এ গ্রন্থ তাহা
ব্যখ্যাস্তব আলোচিত হইয়াছে।

মূল্য ১০ আট আনা।

নিরুপাধে চিকিৎসক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
ইহা সুবিখ্যাত ফরাসী কবি মোলিয়ার
রচিত একখান উৎকৃষ্ট প্রহসন অবলম্বনে
লিখিত। কোভুক-ডক্টর ও মানবচরিত্র
প্রদর্শন নৈপুণ্যে এত প্রহসন চির প্রশিদ্ধ।
মূল্য ৬০ হলো।

দাম্পত্য-চিত্র।

শ্রীযুক্ত কিতিনাথ দাস প্রণীত। যদি
কাব্যের উপহাস করিতে চান, যদি অমৃত-
ময়ী বঙ্গভাষায় আপনাকে জ্বাড়ে চান
তবে নাট্য কাব্য দাম্পত্য-চিত্র পাঠ করুন।
বিবাহিত যুগ্মযুগ্মীর জন্য প্রিয়জনকে
উপহার দিবার জন্য এত অপূর্ণ নাট্যকাব্য
দাম্পত্য-চিত্র। মূল্য ৮০ (বীণাই) ১০

বৌ-কথা-কল্প।

শ্রীযুক্ত কিতিনাথ দাস প্রণীত। আমা-
দের বৌ-স্বামীর হৃৎকণ্ঠে হৃৎকণ্ঠে (দেখিয়া) যদি
সংবাদ হইতে চান, দাম্পত্যজগতের বিবিধ
উপজ্ঞানিক চিত্রের সমালোচনা দেখিয়া
যদি মুগ্ধ হইতে চান তবে এই সরল গদ্য
কাব্য পাঠ করুন। মূল্য ৮/১০

রাজগোপাল রায় সংকলিত। রেজেষ্টারী
আগশ সংকলিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দরখাস্ত
এবং ভিন্ন ভিন্ন দলীলের আদর্শ ও তাহাদের
আইন মত সাধারণের বোধগম্য সংল
বাখ্য ও প্রত্যেক দলীল সম্বন্ধীয় আইন
মত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়; আইন ও আদা-
লত সংক্রান্ত কার্যে নিতাপ্রয়োজনীয়
রেজেষ্টারী আইন, চুক্তি আইন, তত্ত্বাবধ
করণ আইন, উইল সম্বন্ধীয় আইন ইত্যাদির
খণ্ড ও তৎসম্বন্ধীয় ন্যায় ইত্যাদি যন্ত্র-
বিশিষ্ট হইয়াছে। বিবরণী ব্যক্তি যাত্রেরই
আবশ্যকীয় গ্রন্থ। ৪২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বাণাই
মূল্য ২১।

চাকমা জাতি।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-অট-আর-
এস প্রণীত, প্রাক্তনকবি রায় শরচ্চন্দ্র দাস
বাহ হুং সি, আর, ই কর্তৃক ভূমিকা লিখিত
এই গ্রন্থখানি চাকমা নামক পাহাড়্য জাতি
বিশেষের অপূর্ণ রহস্য পূর্ণ জাতীয় চিত্র বা
ইতিবৃত্ত। বঙ্গের বিচারপতিগণ, সাহিত্য-
রসিকগণ, কবিগণ ও পাহাড়্য পণ্ডিতগণ এক
বারে ইহার অধ্যয়ন করিয়াছেন। ১৮খান
হাক্টোন ছবি ও একখান মানচিত্র যোগে
সুশোভিত। মূল্য ৩ টাকা।

বঙ্গ-গৌরব।

নব্যভারতের নবযুগ প্রবর্তক রাজা রাম-
মোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি
হে সকল মহাপুরুষ বঙ্গ নবজীবনের
সফার করিয়াছেন, তাহাদের উৎকৃষ্ট বৃত্ত
প্রাণকৃতি ও জীবনের সুশিখর নকশা।
উপহার কি পুরস্কার দিবার পক্ষে একজন
সরলা সুন্দর উপযুক্ত পুস্তক বঙ্গভাষায় আর
নাই। মূল্য ৪৮ হলো ৩।

মতিচূর।

মিসেস আর, এম্, হোমেন প্রণীত এবং
পুস্তক। ইহাতে পিপাসা, ত্রিভাতির অবনতি,
নিরন্তর বাঙ্গালী, সুগৃহীণী প্রভৃতি সাতটি
অবস্থা আছে। সুন্দর বাবাই, মূল্য ৮০।

পুরাতন বঙ্গদর্শন ।

১৩০২ সাণ হইতে ১৩১৬ সাণ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষের নূ্য ডাকমাস্তন সমেত হই
টাকা ।

হিন্দু ধর্ম-নীতি ।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত । শ্রাদ্ধ-
যতি, মহাভারত, রামায়ণ, বসুপুরাণ,
শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, প্রভৃতি প্রধান
প্রধান ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র চইতে
সঙ্কলিত । নীতি শিক্ষার এমন পুস্তক আর
নাট বসিলেও চলে । মূল্য ১২ ফলে ৯০
(বাঁধাই) ৫০ আনা ।

সরল বর্ণ জ্ঞান ।

ডাক্তার ব্রজনাথ সাগ প্রণীত । কিতাব
গার্টেন প্রাণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গালা
অক্ষর পরিচয় ও সচিত্র পুস্তক । সুন্দর
সুন্দর ছবি । মূল্য ৬০ ।

লিপি-সংগ্রহ ।

সবজ্ঞ বিদ্যোদবিহারী মিত্র কর্তৃক
প্রকাশিত । প্রায় শতবর্ষ পূর্বের লিখিত
সমস্ত বাঙ্গালার উপদেশ পূর্ণ চিঠী পত্র ।
মূল্য ৯০ ।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী ।

চক্ৰকিশোর রায় প্রণীত । গ্রন্থের
প্রণেতা প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে একজন ।
ইহাতে আত্মপুঙ্খিক দুর্গালীলা সরল ও
প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । সৃষ্টি-
প্রকরণ হইতে দক্ষযজ্ঞ, ৩২ং বে গিরিজাতের
যয়ে শিবের বিবাহ প্রভৃতি সহস্র আখ্যান
পদ্য চন্দ্রে বর্ণিত হইয়াছে । হই খণ্ডে সম্পূর্ণ ।
মূল্য ১২ ।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণী রাজ্য ।

শ্রীবাস চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত নূতন রকমের
বই । যদি অসীম জ্ঞান সুন্দরশী সৃষ্টিকর্তার
অপূর্ণ সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া বিম্বিত ও
ভস্মিত হইতে চান ; যদি নদী, হ্রদ, অরণ্য
ও প্রান্তরবাণী এবং আকাশচারী প্রাণিগণের
বিবরণ পাঠে পুঙ্খিত হইতে চান তবে ইহা
পাঠ করুন । মূল্য ১২ ।

কাব্যগ্রন্থ ।

কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও
চমোতিচন্দ্র সেন, এম্, এ সম্পাদিত ।
অব্যয় খণ্ডে সম্পূর্ণ । মূল্য ২২ নর টাকা ।
গল্পগুচ্ছ ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । আট
পেপারে মুদ্রিত, হই খণ্ডে সুন্দর বাঁধাই ।
মূল্য ৫২ ।

মুক শিক্ষা ।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমামন মজুমদার
প্রণীত । মুক বধিরের শিক্ষা এ দেশ
নূতন জিনিষ । ভ্রমবধির হইলেই মুক হয় ।
এই পুস্তকের সাহায্যে মুক-বধিরকে কণা
ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারা যায় । সচিত্র
উত্তর বাঁধাই মূল্য ৫০ ।

পঞ্চ প্রদীপ ।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি, এ
প্রণীত যুতন গল্পের বই । অধিক ক্রটি
টলটল গল্পের অনুকরণে আমাদের দেশের
মত করিয়া পরগুলি লিখিত । বাগ-
বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য । পুস্তকের
উপযোগ্য । সুন্দর বাঁধাই । মূল্য ৭০ ।

পুণ্যের জয় ।

শ্রীযুক্ত সুধাক্ষ বাগচি প্রণীত ও শ্রীযুক্ত
পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত, অভিনব রচনাময়
ড্রিটেকটিভ উপন্যাস । মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১২
নববিধান সমাজের বই ।

ব্রহ্ম সঙ্গীত প্রথম ২২ দ্বিতীয় ৬০
আচাণ্য কেশবচন্দ্র (বিদ্যুৎ জীবন চরিত)
১২ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম ১১০ গীতা সম্বন্ধ
ভাষ্য ৫২ বেদান্ত সম্বন্ধ (১২ খণ্ড) ৬২ বিবিধ
ধর্ম সঙ্গীত (প্রসন্নকুমার সেন কৃত ২২) ও
নানকের জীবন চরিত ১১০ শাক্যমুনি চরিত
১০ উপাখ্যায়ের বক্তৃতা ১২ হিন্দুদের ব্রাহ্ম-
বাদ, পূর্ব বিভাগ ৪২ উত্তর বিভাগ ২২
কোরাণশরীফের ব্রাহ্মবাদ ৪২ মোহনদের
বিদ্যুৎ জীবনী ০, হাকেরের ব্রাহ্মবাদ
প্রথমভাগ ১২ তপসমালা (৬ খণ্ড) ৩২
জীবন-বেদ ১২ মহাপুরুষ চরিত ৫০ ।

শারদীয় পূজার আয়োজন

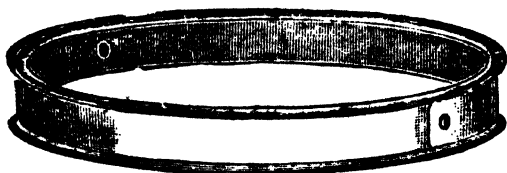
বৎসরান্তে আগার সেই চির মধুর আনন্দ সন্নিবন। চিরপ্রবাসী বৎসরান্তে গৃহান্তিমুখে ছুটিয়াছেন। গুলফীগণ আনন্দে আত্মগারা—নূতন নূতন বসন ভূষণ হটবে। আপনি স্বাভাবিক পাইনে স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিয়া পরসে বাঁচাতে চান—যদি মনের মতন নূতন নূতন ডিকাইনের অলঙ্কার ব্যবহার করিতে চান—সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের কারমে একবার পদধূলি দিউন। মফস্বলবাসী সস্ত্র পত্র লিখুন আর সময় নাই। নূতন ধরণ—নূতন গঠন—নূতন ফাশন—সব নূতন। রং পালিস কারুকাৰ্য্য দেখিলে আত্মহারা হইবেন। অর্ডার জিনিষ ৩ দিনে প্রস্তুত করিয়া দিই।

রূপার উপর গিনির পাত মোড়া স্বর্ণের শাঁখা বিন্দুমাত্র পান নাই।

অর্ডার দিলে নানাবিধ “মটো” শাঁখার উপর লিখিয়া থাকি।

প্লেন শাঁখার মূল্য ১৪, নাম লেখাইযুক্ত হইলে ১৯ হইতে ২৪।

অভিনব আবিষ্কার।



শাঁখা বন্ধ-ললনার সোহাগের সামগ্রী বাজারে সেকরারা শাঁখা প্রস্তুত করে বটে কিন্তু ইহার কোণল সম্পূর্ণ নূতন। কেন যে ইহা ঘরে ঘরে সমাদৃত ভাং

১ গোড়া ব্যবহার না করিলে বৃদ্ধিতে পারিবেন না।



বিন্দুমাত্র পান নাই। জাপানী মাকড়ী বিনা পানের গহন।

মূল্য ১৪ হইতে ২২

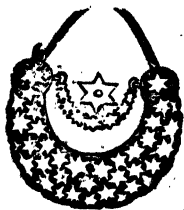
এই মাকড়ী আমরা প্রথমে ভারতে আবিষ্কার করিলাম। ইং আমাদের নিজস্ব। পার্শী ও ইহুদী ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। চক্চকে পালিস—নয়ন ঝলসিয়া যাইবে।

পূজার সর্ব প্রভ উপহার।

জানিতাবে আমাদের গহনার মূল্যাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পত্র লিখিয়া আমাদের সচিব জুরেলারী ক্যাটলগ লউন।

হাতির দাঁতের শাঁখার উপর গিনি সোণের পাত মোড়া শাঁখা এক জোড়া ১৪ টাকা

ইহুদি ও পার্সি মাকড়ি



হাই পালিস দেখিলে আত্মগারা হইবেন গিনি স্বর্ণের পার্সি মাকড়ি
১ জোড়া ১৫ টাকা হইতে ২২ টাকা। ইহুদি মাকড়ি (গিনির)
১ জোড়া ১২ হইতে ২৫ টাকা।

মণিলাল এণ্ড কোং

জুরেলার এবং গোল্ড স্মিথ—৪০নং পরগণাটা, কলিকাতা।

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা



সঞ্জীবনী বলেন যে অনেকেই আমাদেরকে ভাল পেনালের চসমা কোথায় বিক্রয় হয় জিজ্ঞাসা করেন ; আমরা রায় মিত্র কোং-কেই বিশেষরূপে জানি তাঁদের কথাও যা কাজও তাই । সুতরাং ভাল চসমা খরিদ করিতে হইলে উক্ত দিম্বাস যোগ্য কোং-কে নির্দেশ করিয়া থাকি ।”

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স এবং দিবালোকে ক্ষুদ্র ২ অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান এবং কোনরূপ চসমা ব্যবহার করেন কি না, লিখিলে ভিঃ পিতে চসমা পাঠান হয় । দরকার হইলে ১০ টাকা ডিপজিট রাখিয়া চক্ষু পরীক্ষার যন্ত্রও পাঠান হয় । সচিত্র মূল্য তালিকা চাহিলেই ডাকে প্রেরিত হয় ।

রায় মিত্র এণ্ড কোং

৮ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা, — ব্র্যাক দোকান — পাটুয়াটুলী, ঢাকা ।

[পোষ]

[৫ম সংখ্যা ।

বঙ্গদর্শন ।

(নব পর্য্যায়)

দশম বর্ষ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।	বিষয়	পৃষ্ঠা ।
যরেন্দ্র-ভ্রমণ	২২৫	বেদান্ত	৪৬৪
উৎকল-গদ্য	৪৩৬	বিহুলা-সঙ্গয় সংবাদ	৪৭২
উবার ভাষা	৪৫৪	ভাষা	৪৭২ গ
কৃষ্ণ-চরিত	৪৫৪	ভাষা	৪৭২ ছ

গ্রন্থসমালোচনা

৪৭২ জ

এস সজ্জমদার কর্তৃক প্রকাশিত ।

১৯১৭

হিন্দুস্থান সমবায় বিমামণ্ডলীতে বিমা ও

এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার, বিশেষ প্রতিনিধি,

হিন্দুস্থান কার্যালয়—ময়মনসিংহ

এস. পি. সেন এণ্ড কোম্পানীর

৩ পুস্তকসার

লউঠা ও টাকের মহোষধ।

এই ছুটি রোগের প্রকৃত ঔষধ এতদিন এক-
বারেই ছিল না। বিজ্ঞাপনে যিনি বাতাই বলুন,
বাবহায়ে সে উপকার করছেন পাঠ্যছেন; কিন্তু—
“সুরমা টোল” সত্য সত্যই টাকেব ও চুল উঠিয়া
যাওয়ার অব্যর্থ ঔষধ। তড়িৎ চুল কটা হইলে,
কড়া হইলে, অঙ্গমরে পাকিলে, এবং মাথাগরম
হইলে, স্ফীতির অভাব হইলে, সুরমা বাবহায়ে
যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। যে সকল জিনিষ বায়ু
উপশমন করে, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে এবং চুলের দোষ
মই করিতে পারে, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই সুরমা
তৈলের প্রধান উপাদান। সুরমার স্বপূর্ণ অতি
মনোরম। একবার একশিশি বাবহার করিলেই,
এ কথার সত্যতা বুঝতে পারিবেন। একশিশির
মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র। মাত্রলি। ১/০ সাত
আনা। একত্র তিন শিশির মূল্য ২/০ চট টাকা
মাত্রলি। ৮/০ তের আনা। ৮/০ আনার ডাক-
টিকিট পাঠাইলে, একশিশি সুরমার মূল্য এবং
একখানি সুরমা-পাকড়া বিনামূল্যে পাঠাতে পারিবেন।

প্রত্যেক পুস্তকসার বড় এক শিশি ১/০ এক টাকা। মাত্রলি ৮০ বার আনা, ছোট ৪০ আনা, মাত্রলি
১/০ পাঁচ আনা।

স্বদে-গোরব এসেন্স।

চামেলো।—চামেলোর সৌভদ বড় মিষ্ট—বড়
মধুর।
সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চন্দ্রের মত
পরম পবিত্র ও স্মৃতনীর পদার্থ।
মল্লিকা।—বেলা-বুধিকানির মত মল্লিকা চন্দ্র-
দিমই একাদশ অধিকার করে।



চম্পক।—চাঁপার তীওতা
কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত
হইয়াছে, তাণা দেখবার
জিনিষ।

বেলা।—অবসর গ্রীষ্মবেলায়
‘বেলায়’ গন্ধ যেন স্বর্গস্থ
আনিয়া দেয়।

কামিনী।—বামিনীর কোমল
কামিনীর সৌরভে মধুরতা
হইয়া উঠে।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, টোল, গুল, মোলক, অবগেহ, আসব, আরট, মকংধর, মৃগনাতি
এবং সকল প্রকার জারিত বাতুয়া আমরা অতি বিস্তারপে প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট
মূল্যভরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁড়ী ঔষধ অজ্ঞাত ছিল।

রোগিগণ য য় রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসংকারে উপযুক্ত বাবহাও
পাঠাইয়া থাকি। বাবহাও উত্তরের জন্য অর্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী,
১৯২ নং গোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন ।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ ।

১

পটুয়া-সহর ।

বরেন্দ্রভূমির পল্লীপথ কখন ধূলায়, কখন কানায় সম্পূর্ণ সমাক্রম থাকে । দরিদ্র পল্লীবাসিগণকে তাহার উপর দিয়াই প্রতি দিবসের সুখদুঃখ লইয়া যথাসম্ভব অধ্যবসায়ের সঙ্গে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে হয় । সে পথ নাগারকণ্ঠের পক্ষে নিয়ত স্তম্ভরজনক । কিন্তু তাহারই উভয় পার্শ্বে অত্যন্ত গৌরবের নানা কৌটুভিহ ভগ্নাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । দেশের কথা জানিতে হইলে, সে পথে পদার্পণ করিতে হইবে । তাহা সকল সময়ে সকলের পক্ষে সুখের বনিয়া কথিত হইতে পারে না । যানপাশন সকল অলভ্য নয়, সকল স্থানে তাহাদের গতিবিধির পক্ষে সুবাবস্থা করাও সকল সময়ে সম্ভব হয় না, স্তত্রাং পদার্পণ-ব্যাপারটি কখন কখন নিষ্ঠুর গদ্যের মত প্রতিভাত হইতে পারে । জলাশয়ের অভাব নাশ,—স্রুপেয় মণিলের অভাব; দর্শনীয় বস্তুর অভাব নাই,—আশ্রয়স্থানের অভাব । একরূপ অনেক অভাব অনেক স্থলেই পরিদর্শন-ব্যাপারের অনিবার্য্য ক্রেশ চিরসঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে ।

এবার শীতের শেষে,—বসন্তোদয় সময়ে, বরেন্দ্রের এইরূপ চরবিগম্য পল্লীপথে একটি সুদীর্ঘ ভ্রমণ-ব্যাপারের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল । “মৃগয়া” না হইলেও, কাহারও কাহারও বিচারে তাহা “ব্যসন” বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল । কারণ, এই অভিযানটি কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্বালুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই সংকল্পিত হইয়াছিল । * তজ্জগৎ বিন্দুকর মুখে নানা তর্ক কুটয়া উঠিয়াছিল,—“মাথা নাই, মাথা ব্যথা; ইতিহাস নাই, ঐতিহাসিক তত্ত্বালুসন্ধান!” কিন্তু অভিযানটি কিছুতেই “মাঠে মারা” গেল না; কুবার শরংকুয়ার রায় বাহাদুরের পরিচালন-কৌশলে সকল দ্বিধা, সকল অতিসাবধানতা, সকল বাধা, সকল বিতর্ক অতিক্রম করিয়া, যাত্রাপথে দণ্ডায়মান হইল ।

নিরঙ্কর পল্লীবাগীর নিকট তাহা প্রথমে একটি মৃগয়া-ব্যাপার বসিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকিলে । কারণ, হস্তী ছিল, বন্দুক ছিল, লোকলব্ধর ছিল, পট্টাবাস ছিল, চিত্র-সংগ্রহের অগ্র বিচিত্র বস্ত্রপত্র ছিল । লোটো

কমল ছিল, বিছানা-বালিশ ছিল, বোতল-গেলাশ ছিল, খস্তা কুড়ালি ও কোদালিগুলি গোধানের উপর হইতে তাহাদের চিরপরিচিত অশোভন অঙ্গশোভা বাহির করিয়া, পল্লীবাসিগণকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল ।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় ; সাহেব নয়, কেবল বাঙ্গালী ; ছোট, বড়, মাঝারী ; —কায়, বপু, কলেবর ! কেহ বাঘের সন্ধান লইতে লাগিয়াইত নয় ; অথচ বাঘের দেশে অগ্রসর হইতেছে । একরূপ উদ্বেগ লইয়া, একরূপ অভিযান ইহার পূর্বে এ দেশে আর কখনও একরূপ বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হয় নাই । স্মরণ্য ষাঁহার অকারণ বিভীষিকায় বা স্বভাবশুলভ নিদ্রাপরতন্ত্রায় ইহার সঙ্গে যোগদান করিতে পারিলেন না, তাহার। “শিবাস্তে পহানঃ” বলিয়া বিদায় দান করিলেন । ষাঁহার অগার হইলেন, তাহার। কথাকোতুকে পল্লীপথ মুগরিত করিয়া তুলিলেন ।

পথপার্শ্ব হইতে গোপালকগণের সকল শাসন অতিক্রম করিয়া, সুরভিনন্দিনীগণ উর্কপুচ্ছে পলায়নপর হইল ; মহিষেরা কিছু সাহসী,—দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিতে করিতে, চাহিয়া দেখিতে লাগিল ;—চারিদিকে ধূলা উড়িয়া, বসন্তের সকল শোভা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ! নগর হইতে পাঁচ ক্রোশের মধ্যেই প্রথম ‘জয়-স্বক্কাবারে’র স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল । রণারোহণে অর্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতেই, কেহ কেহ জলযোগের জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । ব্যবস্থাপ্তে ধূলার মধ্যেও তাহার অসুবিধা ঘটিতে পারিল না ।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া আসিতে

লাগিল, কিন্তু অন্ধকার ঘনীভূত হইতে পারিল না । মেঘযুক্ত সুনীল গগনতলে গুরুপঙ্কের সুবিমল শীতল কিরণ চারিদিক এক অপূর্ণ শোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল । বাহা কিছু কুৎসিত ছিল, তাহা আর দেখা যায় না ; বাহা দেখা যায়, তাহার উপর রক্তকিরণের বিচিত্র মোহাবরণ ইজ্জতালের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে । দূরে দীপ জলিয়া উঠিল,—একটি, দুইটি, অনেকটি,—ক্রমে তাহা নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল । তাহাই অবশেষে ‘জয়স্বক্কাবারে’র আলোকমালা বলিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল ।

পথের ধারে মাঠ,—মাঠের ধারে একটি ক্ষুদ্র খাড়ি, খাড়ির ধারে কয়েকটি অতীত শাক্তী মহামহীকর,—তাহারই অনতিদূরে এক সদ্য-স্মার্কিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণভূমির এক পার্শ্বে একখানি সুসজ্জিত কুটির ; অপর পার্শ্বে ছোটবড় পট্টাশাস ;—তাহার সম্মুখে কদলী তোরণ, পুষ্পগুচ্ছ, আলোকমালা, পূর্ণকুস্তের উপর নববিকশিত আশ্রমঞ্জরীর মাস্তুলিক বিচিত্র বিভাস । পথশ্রান্ত সাহিত্যিকবর্গ সে প্রাঙ্গণে আসন গ্রহণ করিবা মাত্র, চা, ডাব, সরবৎ আসিয়া তাহাদিগকে যথোপচारे অভ্যর্থনা করিয়া লইল ।

তখন “দিবসঃ পরিণাম-রবণীয়াঃ” ; —কিছু কিঞ্চৎ শীত থাকিলেও, তাহা “উপভোগক্ষমাঃ” কেবল শীত কেন, সকল ব্যবস্থাই “উপভোগক্ষমা” বলিয়া মানিয়া লইতে হইল । বরেন্দ্রভূমির পুরাতন জ্ঞাতিভ্যগৌরবের মর্যাদা-রক্ষার প্রশংসনীয় প্রবল

উদ্যমে জনৈক মুসলমান জমিদার তাহার পাত্রমির সমভিষাগারে সময়োচিত বিনয় আপ্যায়নে সাহিত্যিকবর্গের যেক্রপ সাদর অভ্যর্থনা সুসম্পন্ন করিলেন, তাহাতে কাহারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবসর রহিল না। গড়-গড়ার উপর হইতে তাম্রকূটের কুণ্ডলাগিত ধুমপুঞ্জ আকাশমণ্ডলে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে ‘জয়স্বক্কাবারে’র সকল স্থানে আরাম-আনন্দের সুসমাচার প্রচারিত করিয়া দিল।

বরেন্দ্রের নতোন্নত পুরাতন পল্লীভূমি বহুদিন জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি কণ্ঠস্থ কৃষক আসিয়া হলকর্ষণের সূত্রপাত করিতেছে। তাহারা জয়স্বক্কাবার হইতে সশস্ত্রমে দূরে দাঁড়াইয়া, তাহাদের কৌতূহল-পূর্ণ নয়ন সকল আলোকপুলকে “ঝলকিত” করিয়া তুলিতেছিল। কোন কোন সাহিত্যিক তাহাদিগকে পট্টাবাসের মধ্যে টানিয়া আনিয়া যন্ত্র সাহায্যে তাহাদের মাথা মাপিতে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র, তাহাদের সকল কৌতূহল এক অনির্বাচনীয় বিভীষিকায় পরিণত হইয়া পড়িল। কাব্যামোদিগণ প্রভাতে পল্লীচিহ্ন সংগৃহীত করিবার আশায়, যন্ত্রগৃহ সূবন্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐতিহাসিক সম্প্রদায় পল্লীবাসিগণকে সন্নেহে প্রত্যভিষাদন করিয়া, বিচিত্র মানচিত্রের উপর রেখাপাত করিতে করিতে নানা স্থানের পরিচয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে দৃশ্য অজুতব করিবার,— অজুতব করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব উপভোগ করিবার ;—তাহা ভাষায় প্রকাশিত

করিবার নহে। সম্ভাব, সদালাপ, সাধু-সংকল্প, উদ্যম, অধ্যবসায়, অপরাজিত উৎসাহ, যেন মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া দেদীপ্যমান।

যেখানে এই “জয়স্বক্কাবার” একরূপ সুব্যবস্থায় সুসংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম পলাশবাড়ী, থানা গোদাগাড়ী, জেলা রাজসাহী। পলাশবাড়ীর অনতিদূরে এক দিকে পালপুর,—তাহার উত্তরে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে হুগলপরিধার পুরাতন চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহার নিকটে ধরমপুর ; তাহার ডাকনাম পালপুর, ধরমপুর, উপকণ্ঠ এখনও “মালক” নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। পলাশবাড়ীর একপার্শ্বে যে খাড়িটি বর্তমান, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, সুগভীর। তাহার উপর একটি সেতু ; তাহা উত্তীর্ণ হইলেই একটি পুরাতন পল্লী। তাহা এখন “দেওপাড়া” নামে সুপরিচিত। দেওপাড়ার নাম সকল সভ্য-দেশের সাহিত্যেই স্থানলাভ করিয়াছে ; সুতরাং তাহা এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত। এই খ্যাতির মূল একখানি পুরাতন প্রস্তরলিপি।

এই পল্লীটি এখনও একরূপ জনশূন্য বলিলে অত্যাক্তি হয় না ; অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে ইহার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মেটকাফ সাহেব এখানে যুগয়া উপলক্ষে উপনীত হইয়া, একটি বিস্তৃত সরোবর তীরে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে একখানি প্রস্তরে একটি প্রাচীন লিপি খোদিত থাকি দেখিতে পাইয়া, তাহা এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে প্রস্তর-লিপি এখন

কলিকাতার “বাহুবরে” সময়ে সুরক্ষিত হইতেছে।

যে সরোবরতীরে এই পুরাতন প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্তমান আছে ;—এখনও তাহার জল তক্ক করিতেছে। এক পার্শ্বে পদ্মবন সমুদ্ভূত হইয়া, তাহার স্বাভাবিক শোভা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সরোবরে অবতরণের জন্ত সোপানাবলী ছিল ; তাহা অদৃশ্য হইলেও, তাহার স্থান-নির্দেশের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই। সাহিত্যিক-বর্গ প্রত্নতাত্ত্বিক শিবির ত্যাগ করিয়া, পদব্রজে এই সরোবরতীরে উপনীত হইবা মাত্র, ইহার শোভা-সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

“কথা মধুর সরসী শোভা।

নিরমল পরিপূরিত জল,

এহি কত কত ভাঁতি কমল,

অতুলিত অলি বলিত মঞ্জু গুঞ্জত চিতলোভা॥”

সরোবরটি সুবিস্তৃত বলিয়াই কথিত হইতে পারে। ভীড়ভূমিতে পুরাতন প্রাসাদাবলীর ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। উত্তরতীরে একটি সুবিস্তৃত ভূমিপার্শ্বের সকল স্থানে ইষ্টকচিহ্ন ; একটি স্থান “দরগা” বলিয়া সুপরিচিত। তাহার “দরগা” কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কতদিন হইতে ভগ্নরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। মুসলমান-শাসন প্রবর্তিত হইবার প্রবল প্রকোপের সময়ে যে সকল “দরগা” গৌরবে আকাশে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিল, তাহার অনেক “দরগা”ই এখন এই পথে ভূমি চূষন করিয়া, ক্রমে চিহ্নহীন হইয়া

পড়িতেছে! ইহাও সেইরূপ একটি জয়-পরাজয়ের কীৰ্ত্তিচিহ্ন ;—কালের কঠোর শাসনের অসংদ্বিদ্ধ নিদর্শন। “দরগা” ছিল ; তাহার স্মৃতি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু তাহার পূর্বে কি ছিল, সে স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল একটি মতীত সাক্ষী স্মৃতিচিহ্ন “দরগা”র ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বদেশে নীরবে কালগণনা করিতেছিল। তাহা একখানি মস্তক কক্ষ প্রস্তর ;—সুবিহ্বল শিরকোণে সুরচিত মকরযুগ্মের ভগ্নাবশেষ !

এখানে একদিন এক দেবমন্দির ছিল, তাহার উপর “দরগা” উদ্ভিয়াছিল ; এখন আবার “দরগা”র ধ্বংসাবশেষের উপর এক নিম্নরক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। লোকে তাহার ফোর উপর হস্তার্পণ করে না ; ভূপতিত হইলেও, অহরণ করিবার জন্ত সাহস প্রকাশ করে না। এতবার এক হতভাগ্য যুবক একটি ফল পাড়িতে গিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছে ; তাহার কথা এখনও পল্লীসমাজকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে ; পল্লীসংসর্গ যুবকের ছরাকাজ্জল প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল ;—যুবক ইংরাজ ;—সে কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যেমন তাহার বন্ধুকের সাহায্যে ফল পাড়িবার উপক্রম করিল, অমনি তাহার গুলি তাহারই মস্তক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল! যুবকের নাম বারক্রে। হতভাগ্য বারক্রে জীবনের কত আশা লইয়া এদেশে আসিয়া, এইরূপে অকালে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল! বারক্রে লেখকের সহিত সুরচিত

ছিল;—এই গ্রামে এই সরোবর-তীরে তাহার আপন বন্ধুকেই তাহার অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল;—এ সকলই সত্য কথা। কিন্তু এইরূপে এই চৈতরক্ষের ফলা-হরণ করিতে গিয়াই যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আসিয়া প্রথম অবগত হইলাম। কি জানি কেন,—একটি ফল লইয়া বারংকুর সমাধির উপর রাখিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু বৃক্ষে তখন ফল ছিল না! তাহার উদ্দেশে অস্ত্রাঙ্গারে একবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

সরোবরটির নাম “পদ্ম-সহর”। পল্লীর মধ্যে আরও দুইটি পুরাতন সরোবর আছে,—একটির নাম “শীতল সহর”, আর একটির নাম “ওপুদহর”, সরোবরের একরূপ নাম অথচ কোন স্থানে পচলিত আছে কি না, জানি না। একরূপ নামকরণের কারণ কি, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। “পদ্ম-সহরের” পূর্বতীরে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড; তাহার উপর দিয়া আধুনিক রাজপথটি উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সেই পথের পূর্বধারে—পথ হইতে অনতিদূরে—মেট্রাকফ সাহেব প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, পুণ্ড্রবংশের উৎকীর্ণ। তাহা এখন “বিজয়সেন-প্রাপ্তি” বলিয়া সুদী-সমাজে সুপরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মজয়দেবের সুপরিচিত চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি কীর্ত্তিমানগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিজয়ী বিজয়সেন এখানে একটি অভূতচর মন্দির নির্মিত করাইয়া,

তদাধো হরিহর-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কথা রাজকবি উমাপতি ধরের রচনা-কৌশলে সুলিখিত, এবং “বাহুবল-শিল্পি-গোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি” কর্তৃক প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিজয়সেন দেব সুবিখ্যাত বল্লালসেনের পিতা;—সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা;—তাঁহার কথা এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই দেব-মন্দিরের কথা প্রস্তরফলকে যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, তাহা একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, অতিশয়োক্তির আধার বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সেকালে এবং কালে,—কোন কালেই মানুষ অতিশয়োক্তির হাত হইতে সম্পূর্ণ পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারে নাই; কখনও পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না।

সেকালের আলঙ্কারিকগণের বিচারে অতিশয়োক্তি দোষ-পরিচ্ছেদে স্থান লাভ করিত না, কাব্যের অলঙ্কার বলিয়াই বিবেচিত হইত। এখন এই বিজ্ঞান-যুগের রুচিবিবর্ত্তনে তাহা দোষের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন মাপকাঠি হাতে লইয়া রচনা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার দিন পড়িয়াছে;—একচুল ইতরবিশেষ হইলেই সর্পনাশ! কিন্তু অতিশয়োক্তি যে অতিশয়োক্তি, তাহা ত বালকেও বুঝিতে পারিত। তবে সেকালে তাহা অলঙ্কার বলিয়া মর্যাদা লাভ করিয়াছিল কেন? তাহা একটি সাহিত্য-সমস্যা। সাহিত্যিকগণ তাহার মীমাংসার জন্ত সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না;—সরোবরতীরে কোথায় সেই পুরাতন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভে বিলীন

হইয়া রহিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন ।

আমরা একালের রচনাধিষ্ঠিত লইয়া অতিশয়োক্তির উপর একেবারে খড়গহস্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু,—কেহ কেহ বলিবেন, ইহাতে আবার “কিছু” কি ? কিছু ইহাতেই কিছু “কিছু”র অভাব নাই। সরোবরতীরে বসিয়া, তাহার সুবিস্তৃত সলিলরাশির দিকে চাহিয়া, তাহার তীরে কিরূপ আয়তনের দেবমন্দির গঠিত হইলে, সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইতে পারিত, তাহার কথা চিন্তা করিলেই, “কিছু”র সন্ধান লাভ করা যায়। রচনা-সামঞ্জস্যের মধ্যে যে বিচিত্র সুধমা আপনা হইতে আত্মবিকাশ করে, তাহার কোন আকার নাই ;—মাপ-কাঠি লইয়া তাহার আয়তন মাপিয়া লইবার সম্ভাবনা কোথায় ? কবি সে চেষ্টায় সময় নষ্ট করেন নাই। মন্দির-তলে উপবেশন করিয়া, তাহার রচনাগাম্ভার্য্য যে পরিমাণে অনুভূতির আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই অনুভূতি তাঁহাকে সকল প্রকার ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করাইয়া, একেবারে মেঘলোকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাই তিনি মন্দিরবর্ণনা করিতে গিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—

দিক্ শাখা-মূলকাণ্ডে গগন

তলমহাস্তোভিমধ্যা-স্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্প্রত্যগদ্রিহিতিমিল-
দ্রদয়াস্তস্ত মধ্যাহ্ন শৈলম্ ।

আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন
ভবনৈশ্চকশ্চেষং গিরীণাং

সপ্রহ্মায়েশ্বরস্ত বাধিত

বসুমতীবাসবঃ সৌধমূঠৈঃ ॥

ইহা কদাপি রচনা-দোষ বলিয়া কথিত হইতে পারে না ;—ইহা কাব্যলক্ষ্যের মাত্র। মন্দির মধ্যে যে দেবমূর্তি অর্চনা লাভ করিত, তাহা হরিহর-মূর্তি,—“প্রহ্মায়েশ্বর” নামে পরিচিত ছিল। প্রহ্মায় (হরি) ঈশ্বর (হর) এই অর্থে প্রহ্মায়েশ্বর। তাহারই ক্ষীণমূর্তি এখনও সরোবরকে “পদ্ম-সহর” বলিয়া পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যিকগণ বুঝিলেন,—শীতল-সহর এবং তপ-সহর নামক অপর দুইট সরোবরের নামের মধ্যেও এইরূপ ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে ;—সে দুইট সরোবরতীরেও এক সময়ে শীতলেশ্বরের এবং তপেশ্বরের দেব-মন্দির বর্তমান ছিল।

এ অঞ্চলে যে আরও অনেক সরোবর এবং দেবমন্দির বর্তমান ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্যোগিত ধর কাব্যক্ষেত্রে তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। বিজয়সেন দেব নিয়ত শত্ৰুনিপাত করিতেন। নিহত অরাতিবৃন্দ সংগ্রামমৃত্যু লাভ করিয়া, স্বর্গলোকে অশ্রয় প্রাপ্ত হইত। বিজয়সেন দেব নিয়ত যাগযজ্ঞ করিতেন। আহুত দেববৃন্দ আহুতির লোভে মর্ত্যলোকেই অবস্থিত করিতে বাধ্য হইতেন। তজ্জন্ত এখানে অনেক ‘সুরসদন’ এবং অনেক ‘বিতত তল্ল’ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে স্বর্গমর্ত্যের মধ্যে ‘ব্যত্যাগ’ সংস্থাপিত হইয়াছিল ;—স্বর্গ মর্ত্য হইয়া উঠিয়াছিল, মর্ত্যই স্বর্গলোক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। এখন ‘দেওপাড়া’ অগদ্বিখ্যাত ; সেখানে তাহা এইরূপে

বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। কবি
লিখিয়া গিয়াছেন,—

মেরোরাহতবৈরিসঙ্কুগ

তটাদাহয় যজ্ঞামরান্

ব্যত্যাং পুরবাসিনাম্

কৃত বঃ স্বর্গস্ত মর্ত্যস্ত চ ।

উক্ত্যৈঃ সুরসম্মতিশ্চ

বিততৈস্তলৈশ্চ শেষীকৃতং

চক্রে যেন পরম্পরস্ত চ

সমং দ্যাবাপৃথিব্যোবপুঃ ॥২৫॥

ইহাও কাব্যালঙ্কারের নিদর্শন। কিন্তু
ইহা আবার ঐতিহাসিক তথ্যেরও আধার।
বিজয়সেন যুদ্ধজয় করিতেন, তিনি বাগযজ্ঞ
করিতেন, বিদ্রুত সরোবর খনন করাইতেন,
দেবালয় নির্মিত করাইতেন,—ইহার সকল
কথাই ইতিহাসের কথা। আর একটি
কথা আরও বিশিষ্ট কারণে ইতিহাসের
কথা। সেকালে সরোবরের নাম ছিল
'তল্ল',—কথাটি সংস্কৃতমূলক না হইয়াও,
প্রবল প্রচলন গৌরবে কাব্য মধ্যে স্থান
লাভ করিয়াছে। একালের 'ভালাও' যে
মুসলমানী ভাষা হইতে জন্মলাভ করে নাই,
মুসলমানাগমনের পূর্বকালবর্ষী প্রস্তরলিপির
এই 'তল্ল'-শব্দ তাহারই অভ্রান্ত ঐতিহাসিক
প্রমাণ। এই শব্দ এখন সাহিত্য হইতে
বহিস্কৃত হইয়াছে। সাহিত্যিকগণ এক
থাকো ইহাকে আবার সাহিত্যে স্থান দান
করিবার জন্ত অতি প্রায় প্রকাশ করিলেন।

প্রত্যয়েশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাব-
শেষ কোথায় ভূগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে,
তাহার সন্ধান লাভ করিতে বিশেষ আয়াস
স্বীকার করিতে হইল না। কৃষকেরা

দেখাইয়া দিল,—একটি স্থানে তাহাদের হল-
কর্ষণের বিশেষ অস্ত্রবিধা ঘটিয়া থাকে।
সেখানে ভূগর্ভে এক প্রস্তর নির্মিত "রাজার
মার ঢেঁকি" পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার অনতি-
দূরে আরও একটি ঐরূপ ঢেঁকি; তাহা হয়
ত "রাজার বাণের ঢেঁকি" হইবে। তাহাদের
মূল পাতালে চলিয়া গিয়াছে,—কতবার
কত লোকে ভূমি খনন করিয়া তুলিয়া
দেখিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে নাই;
একবার এক কালেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত
বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন!"
একজন খুব গাভীখোর সঙ্গে দৃঢ়বরেই ব্যক্ত
করিল,—“রাজা বা রাজপুত্র না আসিলে,
ঢেঁকি উঠিবে না।” সাহিত্যিকগণ নির্দিষ্ট
স্থানে সমবেত হইয়া, খননকার্যের ব্যবস্থা
করিবার জন্ত বাস্তব হইয়া পড়িলেন।
কিন্তু ব্যস্ত হইলে কি হইবে;—অর্থলাভ,
অমুনয়-বিনয়, ব্যর্থ হইয়া গেল;—কেহ
খননকার্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না।
একজন একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল! তখন
সাহিত্যিকগণ কোদালী ধরিলেন। বরেন্দ্র-
ভূমির কঠিন মৃত্তিকা প্রচণ্ড মার্ত্তও তাপে
“পাথর” হইয়া উঠিয়াছিল;—সুকুমার
সাহিত্যের সুকুমার সাধকগণ সমালোচনা-
পটুত্বের পরিচয় প্রদানে সিদ্ধহস্ত হইলেও,
খনন-পটুত্বের পরিচয় দান করিতে পারিলেন
না। অবশেষে হঠাৎ পুষ্ট বলিষ্ঠ সাঁওতালগণ
সেই দুর্লভকার্যে নিযুক্ত হইল। বুঝিতে
পারা গেল;—ঐর্ষ্য ভিন্ন উপায় নাই।
প্রতীক্ষা ভিন্ন কোতূহল চরিতার্থ ক'
সরল পথ নাই। খনন-কার্য চলিতে লগ্নের
—সাহিত্যিকগণ চারিদিকে হতলে বৃক্ষ-

লোকের নান।

সকল স্থানের

করিয়া পরসংযোগে প্রশস্তি পাঠ করিয়া, সেই পুরাতন দেবভূমিকে আবার সংস্কৃত শ্লোক পাঠে মুগ্ধরিত করিয়া তুলিলেন। আবার,—কিছু কতদিন পরে,—সেখানে দেবভাষায় সুগলিত রচনা-মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তখন কণকালের জন্ত “সেকাল” যেন কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল, রচনা-কৌশলের অমোঘ মাহাত্ম্যো প্রদ্যাক্ষেপের মন্দির, মন্দির মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, তাহার বসন-ভূষণ, তাহার অর্চনা-স্মারনা, সকলই যেন এক সঙ্গে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সরোবর নূতন শোভায় বিকশিত হইল, তাহার তীরভূমি যেন নুপুরশিঙ্কনে মুগ্ধরিত হইয়া গেল। যখন প্রশস্তি-পাঠক সকলকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া শুনাইতে লাগিলেন,—এই সেই সরোবর, যেখানে পুরাঙ্গনাগণের স্তম্ভচন্দন-সৌরভে উচ্ছ্বসিত মধুকরনিকর নিত্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া, জলের উপর নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত;—এই সেই সরোবর, যাহার পাতালস্পর্শী তলদেশ নাগরাণীর মুকুটমণির স্নিগ্ধজ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া দিত;—এই সেই সরোবর, যাহার শীতল সলিলে আকর্ষণময় পুরাঙ্গনাগণের অঙ্গজ্যোতি আবৃত হইয়াও, সমধিক বিকশিত হইয়া উঠিত; তখন সহসা মনে পড়িয়া গেল, আজ বোলপূর্ণিমা! এই দিনে, এমন স্থানে, সেকালে না জানি কত আনন্দ, কত কৌতুক, কত কোলাহল সরোবরতীরকে লালে লাল করিয়া তুলিত। বলিতে না বলিতেই ব্যবহ্যাকুশল ভূতগণ আবার-ভাঙ উপস্থিত

করিল। তখন আর গুরুলব্ধ বিচারের অবসর রহিল না। অনেক দিনের পর, প্রদ্যাক্ষেপের সরোবরতীর আবার আবার লালে লাল হইয়া গেল। তখনকার সাহিত্যিকগণের শোভা—তাহাদের কলহ-কৌতুক, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরোবরে অবতরণ করিবার একান্ত আগ্রহ,—কেবল অল্পভূতির বিষয় হইয়া, স্মৃতির স্মৃতিকে মৃণ্ময় করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্ত উমাপতি ধরের সেই সুরচিত শ্লোক এখনও থাকিয়া থাকিয়া বাক্ত হইয়া উঠিতেছে।

বিলেখয়বিলাসিনী-মুকুটকোটরাস্তুর-
ক্ষুরংকিরণমঞ্জরাস্কুরিতবারিপুং পুং।

চখান পুরবৈরিণঃ সজ্জলময়পোরঙ্গনা-

স্তনৈগমদমৌরভোচলিতচকরাং সরঃ ॥

বিশ্রামে আশ্রয়প্রকাশ করিলে,—চিরাত্যন্ত পূজার মন্ত্র বিশ্বত হইতে হয়, হাতের পুষ্পাঞ্জলি স্থলিত হইয়া পড়ে, পাদপদ্মে অর্পণ করিবার প্রয়োজন অল্পভূত হয় না, অল্প ভূতই অর্চনার সকল অঙ্গ অধিকার করিয়া লয়। তখন আর স্থানকালের ব্যবধান অন্তরায় হইতে পারে না। সরোবরতীরে সাহিত্যিকগণ কি দেখিয়াছিলেন, জানি না; সন্দেহই আশ্রয়বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন ভগবান্ মরাচিমালী মধ্যগগনে চরণ সঞ্চার করিয়া, ত্রিবিক্রম নামের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন; তথাপি সাহিত্যিকগণের উৎসবানন্দ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই।

দানাহারের পর, অন্তর্যাকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, সাহিত্যিকগণ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দল পদব্রজে পুনরায় ঘনন-কার্য্যের পর্যাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন।

আর একদল দুইটি হস্তী লইয়া, নিকটস্থ গ্রাম-মণ্ডলী পর্য্যটন করিয়া, ভৌগোলিক তত্ত্বের আবিষ্কার-সাধনের জন্য অগ্রসর হইলেন। মধ্য এশিয়ার বা মধ্য আফ্রিকায় এবং (সাহস ও সুযোগ পাইলে,) তুবারাচ্ছন্ন তিব্বতের উপত্যকায় ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করাই শোভা পায়। দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, আবার ভৌগোলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান কি? আমরা কি সত্য সত্যই এমন কথা বলিয়া, উপহাস করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছি? আমরা বরং মেকমণ্ডলের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার উপর প্রত্যেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণপথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি;—দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, কোথায় কাহার প্রকৃত অবস্থান, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান প্রদান করিতে পারি না! আমাদের সাহিত্যে “দেওপাড়া”র নাম একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়;—কিন্তু “দেওপাড়া” কোথায়, তাহার আসে-পাশে কি ছিল, এখনই বা কি আছে, তাহার কথা আমাদের সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। তর্ক ছাড়িয়া, সরল ভাবে ইহার আলোচনা করিতে গেলে, নিকার ধ্বনিত হইয়া উঠে। আমরা সন্ধান লই নাই বলিয়াই আমাদের দেশ আমাদের কাছে একরূপ অপরিচিত!

আমাদের ইতিহাস নাই, তাহা অল্প কথা। উপাদান সংগৃহীত হইলে, ইতিহাস রচিত হইতে কতক? কিন্তু উপাদান সংকলিত করা কোনরূপেই অনায়াস সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার সংখ্যা অল্প হইলে,—অনায়াসগত

হইলে,—সাধারণ শিক্ষার অধিগম্য হইলে,—সংকলনকার্য্য সহজ হইতে পারিত। সৌভাগ্যক্রমে উপাদানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ;—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা যথাযোগ্য জ্ঞানে অধিগত করিবার উপযুক্ত বিশিষ্ট শিক্ষা এখনও অপরিজ্ঞাত। এখনও তথ্য-সন্ধানের ভার নিরক্ষর পল্লীবাসীর উপরেই তুল্য হইয়া রহিয়াছে। বাহ্য কিছু জানা গিয়াছে, তাহারাই তাহার প্রথম সন্ধান-দাতা;—অনেক স্থলে তাহারাই প্রকৃত আবিষ্কর্তা। তাহার নিরক্ষর বলিয়াই অশেষ ঐতিহাসিক কৌতূহলের আধার “অশোকের লাট” দেশের লোকের নিকট “ভীমের গদা”,—বরেন্দ্রভূমির “গরুড়-স্তম্ভ” এখনও “ভীমের পাণ্ডি,”—দেওপাড়ার “রাজার মার টেকিও” তাহার অধিক পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই। যেখানে এত যত্নে, এত অর্থব্যয়ে, একরূপ সরোবর এবং দেব-মন্দির অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার নিকটবর্তী স্থান কখনও মরুভূমির মত নিরন্তর ধূ ধূ করিত না,—সেখানেও জন-নিবাস ছিল, সেখানেও তাহার প্রকৃতি-বিজ্ঞাপক নানা চিহ্ন বর্তমান থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহার প্রকৃতি কিরূপ, কৃষক তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। তাহার সন্ধান লইবার জন্যই এই আয়াস-স্বীকারের প্রয়োজন অমূল্য হইয়াছিল।

সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল না, পালপুরের পরিখা, ধরমপুরের মহামহীকৃতলে বৃক্ষ-মূলাচ্ছন্ন পুরাতন দেবমূর্ত্তি, মালধের নানা ত্রিমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এই সকল স্থানের

পুরাতন অবস্থানের এবং বিলুপ্তগৌরবের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। আরও কিয়দূর অগ্রসর হইলে, বগপুর নামক পল্লী দেখিতে পাওয়া গেল। একটি সুদীর্ঘ সরোবর, তাহার তীরে একটি পুরাতন বৃক্ষ, বৃক্ষমূলে এক স্তম্ভহং দেবমূর্তির ভগ্নাবশেষ;—গ্রামের মধ্যে একখানি প্রস্তরফলকে ঘোগাসনোপবিষ্ট নয়টি নারীমূর্তি, দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া কোতুহল বদ্ধিত করিয়া তুলিল। গ্রামের লোকে সন্ধান দিল,—মাঠের মধ্যে একটি সরোবর আছে, তাহার নাম—“মঠ-পুকুর।” সেখানে গিয়া বিশ্বাসের অবধি রহিল না। গ্রামের লোকে ইষ্টকাহরণের লোভে সরোবরতীরে মৃতিকা খনন করিয়া, এক অভিপুরাতন মঠের ভিত্তি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের খননশ্রমই সার হইয়াছে। মঠ এত পুরাতন যে তাহার ইষ্টকরাশি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিকটে একখানি স্তম্ভহং কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারফলক পড়িয়া রহিয়াছে।

তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বরেন্দ্রের নতোরত বিস্তৃত প্রান্তরের উপর সন্ধ্যার অঞ্চলছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবার আয়োজন করিতেছে। হস্তী পরিশ্রান্ত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া আর্জনাৎ জ্ঞাপন করিতেছে। পিপাসার জন অনেকক্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে, মাহত পথ ভুলিয়া যে সীমান্ত প্রান্তরের মধ্যে হস্তীকে চালিত করিয়া আনিয়াছে, তাহার কোন্ খানে আরম্ভ এবং কোন্ খানে শেষ, তাহা আর প্রতিভাত হইতেছে না। অবশেষে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকারী

জনৈক কৃষকের নির্দেশে কোনরূপে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল।

শিবিরে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। “রাজার বাপের ঢেঁকি” উঠিয়াছে, তাহাকে একেবারে মাঠের সমতলক্ষেত্রের উপর তুলিয়া রাখা হইয়াছে। “রাজার মার ঢেঁকি” সম্পূর্ণরূপে শেষ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—পঞ্চাশ জন সাঁওতাল দড়িডা লইয়াও তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিতে পারে নাই! ছুইটি ঢেঁকির দৈর্ঘ্য প্রায় এক-রূপ;—ঢেঁকি নহে,—প্রত্যাশের মন্দিরের দ্বারফলক,—চৌকাঠের উপরের এং নীচের প্রস্তরফলক,—কাকার্য্য খচিত,—আট হাত,—বার ফিট,—ইত্যাদি সংবাদ (হস্তীর উপর হইতে অবতরণ করিতে না করিতেই) অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কোতুহল প্রবল হইলেও, সে রজনীতে আর চক্ষুর্গণের বিবাদভঞ্জন অবসর রহিল না।

বরেন্দ্রের নন্দনাবাসী গ্রামনিবাসী দিবাকর ভট্টের সুযোগ্য পুত্র কুম্ভক ভট্ট “মহাসংহিতার” টীকা রচনা করিয়া, অমর হইয়া রহিয়াছেন। তাহার নাম, তাহার পাণ্ডিত্য, সভ্যসমাজে সুপরিচিত। বরেন্দ্রের এক নিভৃত পল্লীতে,—ভাণপুর নামক গ্রামে,—কুম্ভক ভট্টের এক বংশধর এখনও বাস করিয়া থাকেন। আমরা প্রত্যুষে ভাণপুরের নিকটবর্তী কোন কোন গ্রামে তপ্যামৃগসন্ধানে বহির্গত হইব, মধ্যাহ্নে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিব না, এই সকল বিবেচনা করিয়া, কুম্ভকবংশধর স্বতঃপ্রস্তুত হইয়া, তাহার গৃহে মধ্যাহ্নে আতিথ্য-স্বীকারের

জন্ম অরুরোধ জানাইতে শিবিরে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। ইণ্ডা এত অল্প কথার, এত সরল ভাবে, অতিব্যক্ত হইল যে, ইহাকে “অমুকুল গগনহন্ত” অপেক্ষাও অধিক অমুকুল বলিয়া মানিয়া লইতে হইল। ভট্ট সহস্র যুগে বিদ্যার গ্রহণ করিলে, সাহিত্যিকগণ সে রজনীতে বড় অনিকক্ষণ বিশ্রামের অবসর লাভ করিলেন না। নগর হইতে পত্র আসিয়াছিল; ফলমূল-মিষ্টান্ন আসিয়াছিল; ডাব এবং বরফ আসিয়াছিল; আলোকচিত্রের মাগমস্কা আসিয়াছিল; সে সকল বুঝিয়া লইতে, তাহার সদ্যবহার করিতে, ধন্যবাদ সহ পত্রাত্তর প্রদান করিতে, এবং অনুসন্ধানসমিতির সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার নগরে পেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে, রজনী অধিক হইয়া পড়িল। তথাপি ভাল করিয়া প্রভাত হইবার পূর্বেই, বনগাহন কোলাহলে শিবির প্রতিবোধিত হইয়া উঠিল। কেহ দেগাইবার জন্ত, কেহ দেখিবার জন্ত, প্রবল আগ্রহের অনিবার্য্য তাড়নায়, শয্যাভাগ করিতে কাতরোক্তি করিলেন না। সূর্যোদয়কালে সকলেই সেই পুরাতন মন্দিরের দ্বারফলকের নিকটে উপনীত হইয়া, তাহার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরদ্বার প্রায় আট হাত প্রশস্ত ছিল; স্মরণ্য তাহার উচ্চতা প্রায় ষোল হাত। না জানি কত লোকের দেবদর্শনের সৌকর্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে একরূপ আয়তন নির্দিষ্ট হইয়াছিল! দ্বারের উচ্চতার সঙ্গে বেদিকার ও দেবমূর্তির উচ্চতার, এবং বেদিকার উচ্চতার সঙ্গে দেবমূর্তির উচ্চতার একটি শাস্ত্রনির্দিষ্ট পরিমাণ-সামঞ্জস্য সেকালের মন্দির-রচনায় সুরক্ষিত হইত। তজ্জন্ত মূর্তি পাইলে, তাহা

ধরিয়া মন্দিরের আয়তন কিরূপ ছিল; তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়;—মন্দিরদ্বার পাইলেও, তাহা ধরিয়া শ্রীমূর্তির আয়তন কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দ্বার যত উচ্চ, তাহার অষ্টমাংশ বিয়োগ করিলে যাহা থাকে; তাহাই বেদিকা এবং শ্রীমূর্তির উচ্চতার সমষ্টি;—এই সমষ্টির এক-চতুর্থাংশ বেদিকার, ও তিন-চতুর্থাংশ শ্রীমূর্তির উচ্চতা বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। এই নিয়মের অনুসরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়,—প্রত্নশিল্পের বিগ্রহমূর্তি নিতান্ত ক্ষুদ্রমূর্তি বলিয়া পরিচিত ছিল না।

এত বড় মূর্তি কোথায় গেল? মন্দিরধ্বংসের সময়ে, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, তাহার ধ্বংসাবশেষ কোথায় গেল? তাহাতে কাহারও কোন প্রয়োজন সিন্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহা হয় ত সরোবরের জলে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হইয়াছিল। তজ্জন্ত কোন উৎসাহী সাহিত্যরথী কদলীরূক্ষে ভেলার চনা করিয়া, সরোবরের জলে শ্রীমূর্তির অনুসন্ধানের আয়োজন করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের বিশীর্ণ কদলীতরু সাহিত্যিকের ক্ষুধার সহ্য করিতে পারে নাই,—অগত্যা শ্রীমূর্তির অনুসন্ধানব্যাপার অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে। স্মরণ্য সকলে মিলিয়া দ্বারফলক খোঁজ করিয়া, তাহার আলোকচিত্র লইয়া, ভট্টরংশধরের আতিথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, একটি দিনব্যাপী দীর্ঘভ্রমণের জন্ত বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইলেন। তখন প্রভাতবায়ু সংস্পর্শে আত্মবনের মধ্যে কোকিলের কলকণ্ঠে বসন্তের বিজয়বার্তা সর্গোরবে বিঘোষিত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

উৎকল-প্রসঙ্গে ।

(২)

রাজা মরকত কেশরী যে স্থানে মহানদী
বিধা বিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটিকে
প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিখা-বস্তু মনে করিয়া
সেই স্থানেই কটক রাজধানী স্থাপন করেন ।
বর্ষাকালে এই নদী ভীষণ আকার ধারণ
করে, নানা স্থানে ভীতি-উৎপাদক প্রকাণ্ড
প্রকাণ্ড আবর্ত উৎপাদিত হয়, নানা নদী
আসিয়া মহানদীর কলেবর-বৃদ্ধির সগোত্রা
করে; সুতরাং বহিঃশত্রু আসিয়া এই
দুরাক্রম্য স্থানে সহসা উপস্থিত হইতে
পারিবে না—রাজা এই সমস্ত বিষয় চিন্তা
করিয়াই স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন ।
রাজধানী-নির্মাণের পর যখন দেখিলেন,
মহানদীর জলপ্লাবনে অচিরেই নগরটি বিনষ্ট
হইতে পারে, তখন তিনি মহানদীর দ্বিতীয়
শাখা কাঠঘড়ীর তীরভূমিতে বজ্রকল
প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বিপুল বজ্রকল বন্ধনীর
(Revetment) সৃষ্টি করিলেন । বলয়াকারে
মহানদী এই স্থানটিকে বেষ্টন করিয়াছে
বলিয়া এই স্থানটি বলয়বাটী কটক এই
নামে অভিহিত হইয়াছে; চক্রাকারে
নগরটি পরিদৃশ্যমান হইত বলিয়া স্থানটি
চক্রবাটী কটক নামে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।
ভূকবলিত পর্বতের সমতলভূমিতে নগরটি
অবস্থিত বলিয়া সামুবাটী কটক নামে কথিত
হইয়াছে, অথবা এই নগরে সেনানিবাস
স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া সেনাবাটী কটক
এই নামে নগরের নামকরণ হইয়াছে
বলিতে পারি না । “নগরের নামে পরে

জনপদেরও নামের সৃষ্টি হয় । কটক-
দুর্গের নাম বারবাটী, এই দুর্গের মধ্যে
বারটি চত্বর ছিল, * এই জায়গা দুর্গের
নাম বারবাটী হইয়াছে । আইন-ই-
আকবর পাঠে জানা যায়, এই দুর্গে ধূপের
বর্ণের গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত নবতল
গৃহ ছিল । কেহ কেহ এই দুর্গের নির্মাতা
উড়িষ্যার শেষ রাজা যুগ্মদেব, কেহ কেহ
পুরুষোত্তম-মন্দিরের নির্মাতা অনঙ্গ ভীমদেব
বলিয়া নির্দেশ করেন । যিনিই হউন,
তাঁহার যে উল্লুখ গিপুগ রাজকোষ বহু
বর্ষের জন্য শুল্ক করিয়া এত দুর্গ-প্রাসাদের
নির্মাণের জন্য বহুবর্ষব্যাপী ধনাধারার মহা বৃত্তি
হইয়া ছিল, সন্দেহ নাই । যে দুর্গ-প্রাসাদের
নির্মাণের জন্য দেশের প্রধান প্রধান স্থপতির,
প্রধান প্রধান শিল্পীর, প্রধান প্রধান ভাস্করের
চিস্তানিপুণ বুদ্ধি ও কর্মনিপুণ হস্ত বহু
বর্ষ ব্যাপিয়া নিয়োজিত ছিল, যে বিপুল
রাজ-প্রাসাদকে সুসজ্জিত করিবার জন্য,
বিভূষিত করিবার জন্য নানা দিগ্দ্দেশ
হইতে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বহুমূল্য সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক

* ঐতিহাসিকদিগের এইরূপ একটি ভ্রম হইয়াছিল ;
এই ভ্রমে পতিত হইয়া আইন-ই-আকবরিকার দুর্গস্থ
নয়টি চত্বর দেখিয়া বিন্মিত হইয়াছিলেন: কোন কোন
ঐতিহাসিক আবার “বার” শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত
“বরাহ” শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । উৎকলে “বাটী”
একটি ভূমির পরিমাণ, বার বাটী পরিমিত ভূমিতে
দুর্গটি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই জন্য দুর্গটির নাম বারবাটী
হইয়াছে । ৩ বিঘার এক মান, ২০ মানে এক বাটী ।

অগণিত দ্রব্যসম্ভার আনীত হইয়াছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীর অপ্রসন্নতার এক দিন তাহা হিন্দু রাজার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল। মুসলমান রাজার উৎকট ভোগভুক্ষা-নিবারণের জন্য তাহার শোণিতমিষ্ট হস্তে ভগবান্ অর্পণ করিলেন। সুবর্ণস্তম্ভ-নিবন্ধ পার্শ্বলক্ষ্মমান বহুমূল্য যুক্তাজাণে উদ্‌গৃহীত, মহার্যা রত্নসমূহে উদ্‌ভাসিত, সুবর্ণস্তম্ভে বিচ্ছুরিত, বহুমূল্য কোশেয় বস্ত্রে নির্মিত, চন্দ্রাতপের নিম্নে সুবর্ণস্তম্ভে গ্রহিত ফল, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, পশু, পক্ষীর চিত্রে-সমাকুল কোমল গভলোমনির্মিত বহুমূল্য আস্তরণে সমচ্ছাদিত গৃহাভ্যন্তরের মধ্যস্থলে রক্ত বর্ণের মকমল-নির্মিত সুরত্ন উপাধানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট দিল্লীখরের প্রতিনিধি গর্বিত আগা মহম্মদ জমানকে দেখিয়া, আর সেইরূপ ভাস্বর রত্নসমূহে সমুদ্ভাসিত গুপ্তসজ্জা দেখিয়া উইলিয়ম ক্রটন বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়া-ছিগেন। * বলা বাহুল্য যে, ইহার একটিও মুসলমান রাজা বা রাজপ্রতিনিধির আদৃত ও আনীত নহে, সমস্ত গৃহোপকরণই হিন্দু রাজার বহু শতাব্দীর পোষিত সৌন্দর্য্য-স্পৃহা, স্বত্ব চেষ্টা ও অজস্র ধনধারা-বর্ষণের কৰ্ম্মলব্ধ মহার্যা মহাফল।

উৎকল-কলিঙ্গরাজের কীদৃশ শক্তি ও প্রভাপ ছিল, ইহা দ্বারাই তাহার অসুমান করা যাইতে পারে যে, রাজনীতি বিষয়ক মহাশক্তি দিল্লীখর আকবরের রাজদূত হাসান খাঁ উৎকল-কলিঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা

মুকুন্দদেবের রাজসভায় সর্বনা উপস্থিত থাকিতেন। মুকুন্দদেব বণন কে টসমা নামক সীমান্ত ভূগে—অসতর্ক ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে গোড়েখর সোলেমান কোরাণীর জামাতা ও সেনাপতি, একটাকিয়া ভাদ্রদ্বী কুলে সমুৎপন্ন রাজা নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র কালাচাঁদ বা রাজচন্দ্র নামে অভিহিত, মুসলমানধর্ম গ্রহণের পর কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—গোড়েখরের অনুমতি লইয়া দ্বাদশ সহস্র অশারোহী সৈন্তের সহিত তীব্রবেগে ময়ূভঙ্গে উপস্থিত হইলেন; সে স্থানের রাজ-প্রতিনিধিকে পরাভূত করিয়া বাজপুরের সরিধানে মুকুন্দদেবের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দুর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত উৎকলরাজ মুকুন্দদেব নিহত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, উৎকলের দক্ষিণাংশে একটি বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়, সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা মুকুন্দদেব দক্ষিণ উৎকলে গমন করেন। বিদ্রোহীর হস্তে মুকুন্দদেবের মৃত্যু হয়, সেই সুযোগে কালাপাহাড় উৎকলে প্রবেশ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন কুন্তকর্ণের মত রাজা মুকুন্দদেব ছ'মাস জাগিয়া থাকিতেন, আর ছ'মাস নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতেন। রাজা বধন নিদ্রিত থাকিতেন, সে সময়ে মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সেনাবৃন্দ সকলেই একরূপ বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিবার সুযোগ পাইত। কুন্তকর্ণ বধন নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময়ে ভগবান্ রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর আজ বধর্ম্মত্যাগী নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের

* Mr Wilson's 'The Early Annals of the English of Bengal'.

উপরে খড়্গহস্ত বলোন্নত কালাপাহাড় সেইরূপ নিদ্রাভিত্ত রাজা মুকুন্দদেবের চূর্ণে প্রবেশ করিলেন, কুন্তকর্ণের মত অকাল-জাগ্রত রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিলেন; যে উৎকল-কলিঙ্গ মহানীর বৌদ্ধরাজ্য অশোক লক্ষ মন্তক ছিন্ন করিয়াও দীর্ঘকাল বৌদ্ধসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, আজও উদয়চালের প্রস্তরগাত্রে অশোকের উৎকীর্ণ শাসন-শিলালিপি রহিয়াছে; কিন্তু অশোকের অন্তর্দ্বারের সঙ্গে সঙ্গে একরূপ উৎকল-কলিঙ্গ হইতে বৌদ্ধসাম্রাজ্যও অন্তর্হিত হইয়াছে, বঙ্গবিজয়ী বক্রিয়ার শিলিঙ্গ সেনাপতি মহম্মদ-ই-সিরাজ দ্বারা ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যা-রাজের শোঁধা, বীর্ষ্য, প্রবল প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের মত সহজে উৎকলে দস্তফুট করিবার সম্ভাবনা নাই অবধারণ করিয়া আর দ্বিতীয় বার যে উৎকল-কলিঙ্গ আক্রমণের জন্ত সাহসী হয়েন নাই, মহারাজ অনঙ্গভীমের মন্ত্রী শৌর্য্যবীৰ্য্যের অবতার ব্রাহ্মবংশাবতঃ বিষ্ণুর ভূজবীৰ্য্যে ভীত ও বিব্রত হইয়া যবন-সেনা যে উৎকলের সীমা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, যে বীর-প্রসবিত্রী উৎকল-কলিঙ্গভূমির সাহসী বীর-কুমারেরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া বঙ্গেশ্বর তুগ্রিণ-ই তুগান খাঁকে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, বঙ্গেশ্বর তুগান খাঁ যে উৎকল আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন তিন্ন আর পতাস্তর নাই অবধারণ করেন, যে উৎকল-কলিঙ্গের অধিপতি কোণার্ক-মন্দিরের নির্মাতা মহারাজ নরসিংহ

দেবের জামাতা ও সেনাপতি সামন্ত রায় কর্তৃক চালিত আড়াইশত মাত্র সৈন্তের আক্রমণে পরাভূত ও ভীত হইয়া সেনানীর সহিত পাঁচ সহস্র মুসলমান সৈন্ত ‘কটাসেন’ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির মত যে উৎকল-সেনার অপ্রতিহত ভীতবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গোড়ের রাজধানী লক্ষণাবতী পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতেছিল; আজ সেই বীরপ্রসূ গিরিবপ্রা সাগরপরিখা বিপুলকলেকরা নদীগহব্রে অগম্যা উৎকলকলিঙ্গভূমি কুলপাংশল ব্রাহ্মকুমার পাপিষ্ঠ কালাপাহাড়ের পাপ হস্তে বিপর্য্যস্ত, বিব্রত ও লাজিত হইল! মহাত্মা মধ্বর্ষি কশ্যপের পুত্র হিরণ্যক, হিরণ্যকশিপু; ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিসন্তম পুলস্ত্যের পৌত্র রাবণ, কুন্তকর্ণ; রাজর্ষি উগ্রসেনের পুত্র কংসাসুর; আশুরভাবাপন্ন ভ্রাতার হস্তে দেবভাবাপন্ন ভ্রাতার নিগ্রহ চিরকাল আছে, অহরের হস্তে দেবতার নিগ্রহ চিরকাল আছে। কালাপাহাড়ের পাপমণিন কঠোর হস্ত কেবল রাজার ভ্রায় নিদ্রিত-অচেতন দেবপ্রতিমাগুলির লাজনা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত সচেতন জাগ্রত দেবপ্রতিমারূপিনী পূজনীয়া হিন্দুপুরস্কোদিগেরও লাজনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। অলস্ত অগ্নিযুগে অনেক দেব-প্রতিমা কালাপাহাড়ের কঠোর হস্ত দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যবনের পাপহস্তস্পর্শের ভয়ে অনেক জীবন্ত সচেতন প্রতিমা আপনা হইতেই আকাশস্পর্শী-সর্বভক্ষ্যের কুক্কিগত হইয়াছিল; সচেতন অচেতন অনেক দেব-প্রতিমা আগার আত্মপদ্মানাভিজ্ঞ অনেক

ভক্তের পবিত্র দুঃখকম্পিত হস্ত দ্বারা অতল অলরাশির অগাধ বক্ষে নিমজ্জিত হইয়াছিল ; উৎকল-কলিঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছিল ! এ প্রভাবে দুর্ভুক্ত কালা-পাহাড়ের স্কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পরি-দেবনাময়, পরিতাপময়, শোচনীয় পরিণাম বলিবার অবকাশ নাই। পাঠকবর্গের জানি-বার আকাঙ্ক্ষা হইলে “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস” পাঠ করিতে পারেন।

কটকদুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইয়া মুসলমান-রাজপ্রতিনিধির বিলাস-নিকেতন হইয়া উঠিল, মুসলমানেরা হিন্দুর মত কটকদুর্গের ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় ! সভ্য ইংরাজ রাজার হস্তে পড়িয়া কটকদুর্গের আর তাদৃশ ব্যবহারের সৌভাগ্য রহিল না। পাবলিক ওয়ার্কসের নির্দয় হস্ত সেই দুর্গের অস্থিভগ্নশুলি একে একে নির্দয়ভাবে উন্মুক্ত করিয়া রাজপথে ও অগ্ন্যগ্নি কার্যে নিয়োজিত করিতে লাগিল। বিজ্ঞ ম্যাগি সাহেবও এ জন্ত ইঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া-ছেন।* লর্ড কর্জনের লোকে যতই কেন দোষ কৌতূহল করুক না, তিনি যে ভারতের প্রাচীন কার্ত্তি রক্ষা করিবার জন্ত বদ্ধ-পরিকর ছিণেন, তিনি যে ভারতের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ প্রাচীন সৌধ,

প্রাচীন সেতু, প্রাচীন গুহা রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার যত্নের একশেষ ছিল, তিনি যে এজন্ত গোড়ের দুর্গম অরণ্যানীতে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ কথা কৃতজ্ঞদ্বয়ে ভারতবাসীর একান্ত স্বাকার্য্য ; কটকদুর্গের ধ্বংসের পূর্বে যদি লর্ড কর্জন এদেখে আসিতেন ; তবে আমরা দুর্গের একরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিতাম না।

কটকে অনেক দেবমন্দির ও তাহাতে অনেক দেবমূর্তি ছিল, ইত্যন্ততঃ তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। আমি যে বাড়ীতে বাস করিতেছি, তাহার অদূরে একটি শিবের নূতন ক্ষুর মঠের কুরপাতে একটি বরাহদেবের স্তম্ভের মূর্তি রহিয়াছে। এইরূপ নানা স্থানে নানা দেবমূর্তি অবশ্যে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারি হিন্দু-নরনারীর মনে দেবতাব জাগ্রত করিবার জন্ত, হিন্দু নরনারীর স্তুতি পূজোপহার গ্রহণ করিবার জন্ত অবস্থিত নহেন, প্রত্নতত্ত্বাবধিগের প্রত্নতত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষণ করিবার জন্ত, তাহাদিগকে প্রাচীন ভারতের শিল্পশালা বুকাইবার জন্ত যেন মলিনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। মহা-নদীর বেনাহূমিতে গড়গড়ের মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে, প্রকম্পিত হইয়া পৃথিবী অগ্ন্যাগ্নি প্রাচীন মন্দিরের মত তাহার অর্দ্ধাংশ উদরস্থ করিয়াছে, পরবর্তী সময়ে সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে অণ্তরণ করিবার উদ্দেশে সোপান নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অগ্রভাগে প্রস্তরনির্মিত সুন্দর বৃষভ-মূর্তি ; মন্দিরের সেই অংশ ভূমিকম্পে প্রোথিত হয় নাই, হয় ত উহা পরবর্তী সময়ে

* “The Public Works Department, in early vandal days, stripped the old buildings for the sake of their stone, which they used for the False Point light-house and other buildings as well as for metalling the roads, and thus converted the fort into an unsightly series of mounds, and the ground within the moat into a wilderness of stone pit.”

নির্মিত। তরী-সহায়ে চৈতন্তদেব মহানদী
উত্তরণ করিয়া এই ঘাটে অবতরণ করিয়া-
ছিলেন। তক্তিতে উদ্ধৃতিত হইয়া ভাবো-
ন্নত মহাপ্রভু অবতারণ করিয়াই গড়াগড়ি
দিতে দিতে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত
হইয়াছিলেন; তদবধি সেই কারণে মহা-
দেবের নাম গড়গড়েশ্বর হইয়াছে। রাতেন্দ্রা-
কগেজের নিকটে লঙা দেউল; এই গ্রামাদে
শিবলিঙ্গ আছেন, আর একটি উদাসীন-
রক্ষিত প্রস্তরে স্বভাবজাত অনন্তদেবের
ক্রোড়ে শালগ্রাম চক্র আছেন। পূর্বে
মন্দিরটির চূড়া নির্মিত হয় নাই, * সেই
জন্ত লোকে লঙা দেউল বলিত, এক্ষণে
চূড়া নির্মিত হওয়াতেও আর সে নামের
পরিবর্তন হয় নাই। অগ্নির একটি মন্দিরে
কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভারত-
বর্ষের অধিকাংশ স্থানেই কালীবাড়ী আছে,
বাঙ্গালীর আরাধ্যা কালী সর্বত্র বাঙ্গালীর
প্রতিষ্ঠিত। এখানেও সেইরূপ ৫০।৬০ বৎসর
পূর্বে কোন ভক্ত বাঙ্গালী কালী প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন, অদ্যাপি বাঙ্গালীর চাঁদার ধূম-
ধামের সহিত দেবার পূজা চলিতেছে।
কটকে সোপান-মন্দির প্রভৃতি আরও
কয়েকটি দেবমন্দির আছে, সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ-
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সে সকল মন্দিরেও
নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে, ধূমধামের সহিত
সাময়িক উৎসব আছে। গোপাল-মন্দিরের

বাড়ীর অভ্যন্তরে ও কালীমন্দিরের বাড়ীর
অভ্যন্তরে ময়রার দোকান আছে, সেই
ময়রার দোকানের সন্দেশই ত্রিগোপালের
ও দেবীর ভোগে নিয়োজিত হয়;
আশ্চর্য্য ও বিশ্বাসের বিষয়, সেই
দোকানে কাঁচা সন্দেশের সহিত একত্র
জিলাপী প্রভৃতি পক্করও রটিয়াছে।
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এদেশে ময়রার
প্রস্তুত পক্কর দেবভোগে দিবার রীতি
আছে। দেওয়ানি কাচারি-গৃহের নিকটে
হরিবল্লভ বাবুর কয়েকটি ভাড়ার বাড়ী
আছে; সেই বাড়ীগুলি যে স্থানে নির্মিত
হইয়াছে, পূর্বে সেই স্থানে দেবীগিরি-মঠ
ছিল, সেই স্মৃতি মঠের ৩৬৫ টি পৃথক্
পৃথক্ গৃহ ছিল, মঠস্থানী একবৎসর কাগ
প্রত্যহ এক একটি গৃহে বাস করিতেন।
এই মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেন।
এক্ষণে সেই মঠের কিঞ্চিৎমাত্র চিহ্নও নাই;
কোন স্মৃতি দীর্ঘিকা ও দীর্ঘিকার ঠিক
মধ্যস্থলে একটি বিশ্রামগৃহ। কটক নগর
হইতে কিঞ্চিদূরে মহানদীর পর পারে
মহানদীবেষ্টিত একটি অশ্রুত পর্বত আছে।
পর্বতের নাম ধবলগিরি, এই পর্বতে
ধবলেশ্বর মহাদেব আছেন, ও তাঁহার মন্দির
আছে। স্থানটি অত্যন্ত মনোহর; দেব-
ভক্তি ও প্রাকৃতিক শোভা যুগপৎ মানুষের
মনকে অধিকার করে। বৈদ্যনাথ, তারক-
েশ্বরের মত এখানেও রোগপ্রিষ্ট ব্যক্তি
মহাদেবের পবিত্র সম্মুখ হত্যা দিয়া থাকে।

উৎকল-কলিঙ্গেশ্বরের অধীনে অনেক-
গুলি সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের
প্রত্যেকের এক একটি দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল,

* সংস্কৃত “মুণ্ডিত” শব্দ হইতে বাঙ্গালীর “নেড়া”
শব্দের উৎপত্তি এবং উড়িয়া ও হিন্দিতে “লঙা” শব্দের
উৎপত্তি। রঙ্গপুর-ভাষার শাখামন্তকশূণ্ড বৃক্ষমূলকে
“মুড়া” বলে। কেহ কেহ বৈয়াক্ষণী ভাষাকে “রঙা”
শব্দ হইতে নেড়া শব্দের উৎপত্তি বলেন।

বৃক্ষোপকরণ অল্পশত্রু ছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সৈন্তসামন্ত লইয়া কলিঙ্গেশ্বরের সাহায্য করিতেন, কলিঙ্গেশ্বরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতেন; তাঁহাদিগের এতদ্বিধি অস্ত্র কর ছিল না। ব্রিটিশরাজ ও তাঁগদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেন নাই, অদ্যাপি তাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া খ্যাত, আজও তাঁহাদিগের অধীনে দেওয়ানি, ফৌজদারি গিচারালয় আছে। এক্ষণে তাঁহারা গড়জাত রাজা বলিয়া রাজপুরুষদিগের নিকটে ও দেশীয়দিগের নিকটে পরিচিত। এই গড়জাতের মধ্যে ময়ূরভঞ্জও অন্তর্নিবিষ্ট। কনিকার রাজা গড়জাতের রাজা নহেন, ইনি বাঙ্গালার জমিদারের মত এক জন জমীদার মাত্র। ইংরাজের প্রথম অধিকারের সময়ে কনিকার রাজাই উড়িষ্যাঙ্গিকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী করিয়াছিলেন; তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দুর্ধ্ব উড়িষ্যাঙ্গিকে শাসন ও দমন করিতে বিজ্ঞ রাজপুরুষদিগকে ভীষ ও কাস্ত উভয় নীতির অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

গড়জাতের দুর্গসমূহ ভিন্ন কলিঙ্গেশ্বরের নিজের অধীনে পাঁচটি দুর্গ ছিল। তন্মধ্যে যাজপুরের অনতিদূরে চাতিয়া পর্বতের উপরে অমরাবতী দুর্গ ও বিরূপা নদীর উত্তর তীরে চৌহ্মার নামক গ্রামে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরাবতী দুর্গ প্রস্তরনির্মিত, দুর্গ-প্রবেশের নিমিত্ত সুখারোহ সোপান আছে, সব শুভ-গুলি নাই, কতকগুলি ভগ্ন শুভ দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজেদের উচ্চতা ও বিস্তার দর্শক-

দিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। দুর্গের সমতল স্থানে একটি ভগ্নমন্দিরে পুরুষ-পরিমিত ইন্দ্র ও ইন্দ্রানীর মূর্তি রহিয়াছে, দেখিলে শুদ্ধিত ও বিন্মিত হইতে হয়; উৎকলের প্রত্যেক দেবমূর্তিতেই ভাস্করের রুচি ও হস্তনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। দুর্গটি দুই মাইল স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের কর্মচারী মহাস্বাদিগের কৃপায় মেঘচুখী বিস্তীর্ণ বৃহৎ দুর্গপ্রাচীর দেখিয়া আর চক্ষুকে কৃতার্থ করিবার সম্ভাবনা নাই, প্রাচীরাবয়ব-প্রস্তরে ট্রাক রোডের বৃহৎ কলেবরের ক্ষত-স্থানে চিকিৎসা-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। * দ্বিতীয় দুর্গটি এক এক দিকে দুই মাইল করিয়া বিস্তৃত ছিল, এক্ষণে কিছুই নাই, ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। ভূগর্ভ হইতে উত্থাপিত তাম্রশাসন দেখিয়া প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা সেখানি বর্ষ শতাব্দীর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। যাজপুরের অনতিদূরে ১১ ফুটার বিশিষ্ট ২৪০ ফিট লম্বা নানা কারুকার্যে খচিত নানা উৎকীর্ণ মূর্তিতে অলঙ্কৃত প্রসিদ্ধ তেজসীমল সেতু। এ সেতুটিও “আঠারনালা সেতুর” মত প্রসিদ্ধ। যাজপুর হইতে দুই মাইল দূরে ব্রাহ্মণী নদী দ্বারা বেষ্টিত দেউলি পর্বত; সেই পর্বতের উপরে গোকর্নেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, নিকটে বটবৃক্ষের মূলে নদী হইতে উত্তোলিত মহত্বপরিমিত শায়িত বিষ্ণু-

* “.....the great wall which surrounded it was demolished by the Public Works Department for the sake of the stone, which was used for the construction of the Orissa Trunk Road”—Gazetteer of Cuttack, p. 200.

মূর্তি । * ভগবানের ভুবনমোহন মূর্তির স্পষ্ট ছায়া এই স্তুপস্থ মনুষ্যানির্মিত মূর্তিতে প্রতি-
ফলিত ও প্রতিভাত হইতেছে ; হয় ত এক
দিন এই মূর্তির মেঘচূড়ী মন্দিরের সৌন্দর্য্য
দেখিয়া, অর্চনার আড়ম্বর ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের
সগর্ব্ব পরিচালন দেখিয়া দর্শকমাত্রাই
চকিত, বিস্মিত, পুলকিত ও ভক্তিতে
উচ্ছ্বসিত হইত ; আজ সেই দেবপ্রতিমা
বৃক্ষমূলে ধূলীধূসরিত অবস্থায় পড়িয়া রহি-
রাছে, তাহার মন্দির যে কোথায় অবস্থিত
ছিল, নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই ; আজ
তাহার চিহ্ন পর্য্যাপ্ত নাই । দেবভক্ত উৎ-
কল-কলঙ্গের রাজারা যে কত স্থানে কত
দেবমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, কত স্থানেই
যে ঔহাদিগের উত্থাপিত কত শত দেব-
মন্দিরের উচ্চপতাকা সমুদ্র-বায়ুহিল্লোলে
গর্ব্ব ও আনন্দে প্রকম্পিত হইত, আকাশ-
মার্গে ক্রৌড়া করিত, তাহার সংখ্যা
করিবার সম্ভাবনা নাই । এক বাজপুরেই
সহস্রাধিক শিবমন্দির ছিল । আজ তাহার
কি আছে ? সমস্তই বিনষ্ট, থাকিবার মধ্যে
আখণ্ডলেশ্বর, অগ্নীশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, বিরজা,
বজ্রবরাহ বা আদিবরাহ ও বৈতরণী নদীর
তীরে অষ্টমাতৃকার সামান্য মন্দির দেখিতে
পাওয়া যায় । স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্থানে বস
করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকেরা সাক্ষ্য
প্রদান করিতেছেন ; সেই বাজপুরের বর্ত্তমান
অবস্থা দেখিলে, বিশ্ববিশ্রুত কোণার্ক-মন্দিরের

ধ্বংস-পরিণাম দেখিলে ক্ষোভে, দঃখে ও
অধীরতার অভিভূত হইতে হয়, আবার সেই
বিনাশের উপরে ভারত-সমুদ্রির, বিশ্ববিজয়ী
রাজাদিগের কীর্ত্তি-স্মরণীর ক্ষীণ পদচিহ্ন
দেখিয়া বিষ্ময়ে আপন্ন হইতে হয় । চন্দ্র-
ভাগা নদীর পবিত্র তীরে অর্কক্ষেত্রে বহুমূল্য
কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত সৌরজগতের রাজা
সূর্য্যাদেবের রাজপ্রাসাদ । কপিল সংহিতার
প্রাচীন মাহাত্ম্য পাঠ করিলে এই তীর্থের
প্রাচীনত্ব সন্দেহ থাকে না । এই স্থানেই
উদয়মান সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাত হয় । এই
তীর্থমাহাত্ম্য দেখিয়া, এই স্থানের সহিত
প্রাভাতিক সূর্য্যের সুবর্ণকিরণ-স্পর্শের
আদি সম্বন্ধ অবধারণ করিয়া উৎকলরাজ
নরসিংহদেব এই স্থানেই সন্নিবাসিত মণ্ডপ
নির্মাণ করিয়াছিলেন ; স্থানের ভগ্নপ্রবণতার
দিকে লক্ষ্য করিয়াও সে দিকে ভ্রমশ্রম
করেন নাই । কে বলিতে পারে, উৎকল-
রাজ-নির্মিত এই স্মরণ্য সূর্য্যমন্দিরের পূর্বে
এ স্থানে সূর্য্যাদেবের অস্ত্র মন্দির ছিল না ;
কে বলিতে পারে যে উৎকলরাজই এই
স্থানের আদি নির্দেশক । ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া
নানা স্থানে তীর্থভূমি আছে, যুগযুগান্তর
ধরিয়া সেই সকল তীর্থ হিন্দুর নিকটে পূজিত,
হিন্দুনরনারী যোগবিশেষে সেই সেই তীর্থ
যাত্রা করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিয়া
আসিতেছে । প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইর
জন্মের বহুকাল পূর্বে মগধে গয়াতীর্থ ছিল,
বিষ্ণুর পবিত্র পদচিহ্ন ছিল ; রণবীর রণজিৎ
সিংহের জন্মিবার বহুপূর্বে পবিত্রতীর্থ কাশী-
ক্ষেত্র ছিল । অহল্যাবাই গয়াক্ষেত্রে গদা-
ধরের মন্দির নির্মাণ, রণজিৎ সিংহ কাশী-

* "At the foot of a vanyau tree is a life-sized monolithic image of the four-handed Vishnu, which was recovered some years ago from the river-bed"—Gazetteer of Cuttack, p. 203.

বিশ্বনাথের মঠ সুবর্ণ পথে আবৃত, করিয়া-
ছেন। এই বৃহৎ দেবপ্রাসাদের পুরোভাগে
শত হস্ত উচ্চ অরুণ-স্তম্ভ ছিল; সেটি এক্ষণে
শ্রীক্ষেত্রে নীত হইয়া পুরুষোত্তমের
শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে। এক্ষণে
সূর্য্যদেবের মন্দিরটি নাই, আছে কেবল
নাটমন্দির। সেই নাটমন্দিরের উচ্চতা,
তাহার ভাস্কর্য্য, তাহার স্থাপত্য ও উপরিভাগে
উত্তোলিত সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া ইংরাজ
দর্শকমাত্রই বিস্মিত হইয়াছেন। নাট-
মন্দিরেরও চূড়া ও কুস্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।
নাটমন্দিরটি ১২৮ ফিট উচ্চ। নয়টি
সোপানের উপরে উত্তীর্ণ হইলে গৃহের সুবৃহৎ
অভ্যন্তর ভাগ বিস্তৃত চকুর উপরে পতিত
হয়। গৃহের ছাদ কড়ি-বর্গার উপরে
স্থাপিত নয়, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে খিলান।
মেলি সাহেব অনুমান করেন, প্রকৃত সূর্য্য-
মন্দির ১৯০ ফিট উচ্চ ছিল; কিন্তু আইন-ই-
আকবরির গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া-
ছেন, সূর্য্যমন্দির ২২৫ ফিট উচ্চ। চতুর্দিকের
প্রাচীর ১৫০ হস্ত পরিমিত উচ্চ, পার্শ্বের
বিস্তৃতি উনিশ হাত। প্রাচীরের তিনটি
তোরণ আছে, পূর্ব তোরণ দ্বারে দুইটি সুদৃশ্য
প্রস্তর ক্ষোদিত হস্তী, পশ্চিমে উচ্চ অখন্ডের
উপরে বীরবেশে সজ্জিত অশ্বারোহী-দ্বয়,
উত্তরদ্বারে সিংহমণ্ডিত হস্তীদ্বয়। পূর্ব
দ্বারের উপরে উনিশ ফিট উচ্চ নবগ্রহের
মূর্ত্তি আছে। গৃহের ছাদেও নবগ্রহের
মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ১৫০ ফিট উচ্চে
অবস্থিত, চূড়ার নিকটে সম্মুখভাগে
নিঃসারিত, হস্তীর উপরে সন্নিবেশিত প্রকাণ্ড
সিংহমূর্ত্তি উত্তোলিত ও স্থাপিত হইয়াছে। *

* "This colossal figure was cut out of

হস্তী ও সিংহের প্রতিকৃতিটি ২০ ফিট উচ্চ।
কি করিয়া এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি অক্ষতরূপে
অত্যাচল স্থানে উত্থাপিত হইয়াছে? কি
করিয়াই বা পচিশ ফিট ঘন দুই হাজার
টন (৫৪ হাজার ৫০০ মণ) ওজনের বৃহৎ
বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সেই উচ্চ মন্দিরের শিরো-
ভাগে উত্তোলিত হইয়া সংযোজিত হইয়াছে?
ফাণ্ডসেন সাহেব বিস্মিত, মেলি সাহেব
বিস্মিত, আরকিউলজিকাল বিভাগের ডিরে-
ক্টার জেনারেল মার্সেল সাহেব বিস্মিত;
বিস্ময়ের আরও কারণ, চতুর্দিকে ২৫ মাই-
লের ভিতরে কোনও রূপ প্রস্তরের খনি
নাই, যে স্টেটিট (Steatite) প্রস্তরের ব্যবহার
হইয়াছে, তাহার খনি ৮০ মাইলের ভিতরে
নাই। * এই প্রস্তরগুলি দূর হইতে আনীত
হইয়াছে, তবে কি সে সময়ে ভীষণ সমুদ্রের
বক্ষে হিন্দুদিগের সুবৃহৎ পোতের ইত্যন্ততঃ
বিচরণ ছিল? সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উচ্চে
উঠাইবার ক্ষমতা হিন্দুরা কপিকলের ব্যবহার
জানিতেন? জেনারেল মার্সেল সাহেব
বলেন, ফাণ্ডসেন সাহেব ইহার অর্দ্ধাংশ
দেখিয়াই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন।
তখনও সূর্য্যের রথ ও অশ্ব ভূগর্ভ হইতে
উত্তোলিত হয় নাই। বাহার অপূর্ব কারু-

two solid blocks of stone, and both these stones had to be raised to a height of 150 feet above ground, where they were fastened into the wall."—Report, Arch. Surv., Ind., pp. 48-49.

* "There are no stone quarries within a radius of 25 miles, and no steatite slabs like those found in the temple are available within 80 miles."—Report, Arch. Surv. Ind., pp. 48-49.

কার্য্য দেখিলে, রথ-অথের গঠন-প্রণালী দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সকল উৎকর্ষ মূর্ত্তির সর্ব্বত্র অবয়বের উপযুক্ত পরিমাণ (Proportion) ঠিক আছে, সৌন্দর্য্য ও ভাবব্যঞ্জকতা আছে, ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব চাতুর্য্য আছে। বহু পূর্বে একদিন চীন-পরিব্রাজক হুয়েন সায়েন উৎকল-কলিঙ্গের ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা দেখিয়া শত মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, আর এক দিন মুসলমান-গ্রন্থকার আবুল ফজল কোণার্ক-মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন; আর আজ সভ্যতাভিমानी, সভ্যতার ধরশ্রোতে ভাসমান, জ্ঞানবিজ্ঞানে দৃষ্ট, অহঙ্কৃত ইংরাজের মুখেও কোণার্ক-মন্দিরের প্রশংসা! বিদেশীর মুখে ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা শুনিতে কাহার মনে পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি জাগরুক না হয়? কাহার মনে পূর্ব্বপুরুষদিগের উপরে কুলপ্লাবী ভক্তি-উচ্ছ্বাসের প্রবর্ত্তনা না হয়? এই অল্প দিনে এই সভ্যজাতির শোচনীয় পরিণাম ও অধঃ-পতন দেখিয়া কালের অপ্রতিহত প্রভাবে স্তম্ভিত হইতে হয়; শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতার উপরে অণুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কোণার্কের সহিত তুলনা করিলে ভগবৎ-প্রসাদে বাজপুর এখনও সমৃদ্ধিশালী আছে বলিতে হয়, আবার বাজপুরের সহিত তুলনায় এখনও ভুবনেশ্বর জগতের সমক্ষে আত্ম-জ্ঞাপন করিতে সমর্থ, বলিতে হয়। এক দিন দিল্লীশ্বরের সেনানায়ক মুনিষ খাঁ দুর্জ্জব পাঠানরাজ দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া, বিজয়োজ্জ্বলে গর্জিত হইয়া ভুবনেশ্বরে

প্রবেশ করেন ও ভুবনেশ্বরের মেঘচূষী মন্দিরসমূহ, দেবপ্রতিমানিবহের পূজাভয়র, দেবতার সম্মুখে ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত সন্ততি উপহার, ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য ও নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন, “এ পবিত্র স্থান মাহুঘের বিজয়ের উপযোগী নয়, ইহা দ্বৈতধর্ম্মভূমি, তীর্থযাত্রীর গন্তব্য মহাতীর্থ, মনুষ্য-হৃদয়ের দুঃখাকাজক্ষা ও কল্লনার অনেক উপরে অবস্থিত।” * মন্দিরের গাত্রে উৎকর্ষ লতা, পত্র, পুষ্পদাম, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতার মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কান্তগৈন গাহেব বলিয়াছিলেন, “এই মন্দিরগুলির নিষ্ঠাধানে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার তিনগুণ অর্থ সম্ভবতঃ এই সমস্ত ক্ষোদিত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে” † ভুবনেশ্বরের প্রত্যেক দেব-মন্দিরই বিবিধ কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত, লিঙ্গ-রাজ ভুবনেশ্বরের আকাশ-স্পর্শী মন্দিরের ত কথাই নাই। সেই সুবহৎ মন্দিরের পাদ-দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের নিম্ন পর্য্যন্ত কতরূপ যে হস্ত হস্ত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই ভাস্কর্য্যের তিতরে প্রাচীন ভারতের কত যে প্রহ-তত্ত্ব গূঢ়ভাবে অবস্থিত

* “This country is no fit subject for conquest or for schemes of human ambition. It belongs entirely to the gods and is one great region of pilgrimage throughout.” —Puri by L. S. S. O' Malley, p. 32.

† “It is perhaps not an exaggeration to say that if it would take, say lakh of rupees, to erect such a building as this, it would take three lakhs to carve it as this one is carved.” —History of India and Eastern Architecture, Book v, Ch. vi, pp. 421-3.

রহিয়াছে, বাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই তাহা বাহির করিতে পারেন। ইতিহাস-জগতে অগৃহীতনামা বহুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যদি দীর্ঘকাল ভুবনেশ্বরে অবস্থিতি করেন; তাহা হইলে আমরা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হই। কলিকাতা হাইকোর্টের উজ্জলরত্ন ভট্ট জ্ঞানী শ্রীযুক্ত সায়দাচরণ মিত্র মহাশয় চৈতন্যদেবকে অগ্রবর্তী করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎকল ভ্রমণ করিয়াছেন, বিশ্বকোষের প্রণেতা প্রত্ন-তাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে আসিয়া অনেকগুলি তাম্রশাসন ও শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন; হুস্মদর্শী মৈত্রেয় মহাশয়ও উৎকলে আসিয়া দর্শনীয় স্থান, মন্দির ও গুহাগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই পুরুষত্রয়ের বহু চেষ্টায় আমরা অচিরে উৎকলের সম্পূর্ণ প্রাচীন ইতিহাস দেখিতে পাইব, এইরূপ আশা করিবার আমার অধিকার আছে। পৃথিবীর আদিকাব্য রামায়ণ ও জগতের অদ্বিতীয় পুস্তক মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া, সংস্কৃতের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ লিখিত। পৃথিবীর সমস্ত ভাষার রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ হইরাছে, অদ্যাপি হইতেছে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রচলিত ভাষাতেই রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ আছে, কাব্য আছে, নাটক আছে, গান আছে। কবি হউক, অকবি হউক, সকলেই রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করে, উৎকল-কলিদে আসিয়া উৎকল-কলিদেব অতীত

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তত্বনির্দ্ধারণে শক্তি থাকুক বা না থাকুক, সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিবার জন্ত সকলেরই আগ্রহ হয়। সেই প্রলোভনের হস্ত হইতে আমিও দূরে অবস্থান করিতে পারিলাম না, তাই আমার এই লিপি-কণ্ঠন। আমি পাঠকবর্গের নিকটে কোনও রূপ প্রত্ন-তত্ত্বের উপহার দিতে পারিব, এরূপ ছুরাকাজ্জা আমার নাই, হুগচকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আজ উপস্থাপিত করিতেছি। লিঙ্গরাজের মন্দিরের উত্তরাংশের ভিত্তিতে ও ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের গাত্রে অখারোহী সৈনিকের চিত্র আছে, অশ্বের পৃষ্ঠে আধুনিক প্রণালীর চর্ম্ময় ব্রিন আছে, আরোহীর পায়ে আধুনিক প্রণালীর বুট জুতা আছে এবং জুতার নিম্নে রেকাব আছে। অখারোহীর পরিচ্ছদ আধুনিক প্রণালীর পরিচ্ছদ। উদয়গিরির রাণী-গুপ্তার উপরের দক্ষিণাংশেও উৎকীর্ণ সৈনিক পুরুষের চিত্র আছে, তাহার পাশ্বে লঙ্ঘিত কোষবদ্ধ আধুনিক প্রণালীর দীর্ঘ ঋজু তরবারি আছে। * অভিজ্ঞান শকুন্তলে রাজা হুমন্তের শরীর-রক্ষিক ধর্ম্মবর্ণহস্তা যুবতী বীরাদনা আছে, লিঙ্গরাজের মন্দিরেও বৌদ্ধোচিত বেশে সজ্জিত অখারোহী স্ত্রীসৈনিকের চিত্র দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত প্রাচীন ভারতের সামাজিক চিত্র অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ভুবনেশ্বরের বৈভাল দেউলের চূড়ার গঠনবৈলক্ষণ্যে

* ".....a kilted warrior, 4 feet 4 inches high, booted and turbaned, with a straight sword in a scabbard hanging from his left side."—Gazetteer of Puri., p. 252.

দর্শকের বিশেষতঃ প্রকৃ-তাত্ত্বিকের চক্ষু স্বভাবতঃ সেই চূড়ার উপরে আকৃষ্ট হয়। বঙ্গালাদেশে মিষ্ট কুম্ভাণ্ড “বিলাতি কুম্ভা” নামে পরিচিত। যে দেশে যে বস্তু পূর্বে ছিল না, পরে অত্র দেশ হইতে আনীত হইয়াছে, সেই দেশবাসী সেই নবানীত বস্তুটিকে “বিলাতি” বলিয়া ব্যবহার করে। এই “বিলাতি” বিশেষণ পদ দেখিয়া বঙ্গালী-মাত্রেই এই জাতীয় কুম্ভাণ্ডকে বঙ্গালাদেশের প্রাচীন সম্পত্তি মনে করে না। উৎকল-বাসী মিষ্ট কুম্ভাণ্ডকে “বৈতাল” বলে। রঙ্গ-পুরবাসী রাজবংশীদিগের মধ্যেও “বৈতাল” শব্দের প্রচলন আছে। তাহার বৈরিণী জীলোককে বৈতালী বলিয়া গালি দেয়, অনেক সময়ে “জাহাজী বায়া”ও বলে। আমরা এই “জাহাজী” শব্দ দেখিয়া “বৈতালী” শব্দের ভিতরেও “জাহাজ”বাচক কোন শব্দের সম্বন্ধ আছে মনে করিতে পারি। সংস্কৃত “বহিত্র” শব্দ হইতে ক্রমে “বহিতর” “বহিতল” “বহিতল” “বৈতল” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উড়িয়া ভাষার প্রচলিত “বৈত” শব্দের অর্থ জাহাজ। সম্ভবতঃ যখন উৎকল, কলিঙ্গ জাহাজ অর্থে “বৈতল” শব্দের ব্যবহার ছিল, সেই সময়ে তাদৃশ চূড়াবিশিষ্ট মঠের “বৈতাল” নামের সৃষ্টি হইয়াছে ও বিদেশ হইতে জাহাজে আনীত বলিয়া এই নবাগত কুম্ভাণ্ডের “বৈতাল” এই নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থিত উৎকলের সহিত স্মৃদুর হিমালয়ের পাদবর্তী রঙ্গপুরের ভাষা-সাম্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।*

উদয়গিরিহু হস্তিগুপ্তার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, কলিঙ্গরাজ মহামেষবাহন ব্রাহ্মণ ও অর্হৎ উভয়ের উপরে তুল্যভাবে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন, উভয়ের উপরে তাঁহার বদাশ্রুতা ও দাক্ষিণ্য ছিল, তিনি অনেক গুহা ক্ষোদিত ও অনেক স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, অনাধাশ্রমগুলির পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যাসে তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যে ভীত হইয়া মগধরাজ তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।* কলিঙ্গ যে প্রাচীন সময়ে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, কলিঙ্গ যে সেকালে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক নিদর্শন আছে। চরক-সংহিতার কল্পস্থানে অভিনব চিকিৎসার উদ্ভাবনের জন্য কলিঙ্গের উল্লেখ আছে, বৃহৎ সংহিতায়, কলিঙ্গের খনি হইতে উৎখাপিত, কঙ্কিত ও বিশোধিত হীরকের কথা আছে। মালয় উপদ্বীপে ভারতবর্ষীয়েরা ক্রিং নামে পরিচিত, ক্রিং যে কলিঙ্গেরই স্থলিত শব্দ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বৌদ্ধনরপতি অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়া উৎকল, কলিঙ্গ বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার

সম্পাদ্য, রঙ্গপুরি ভাষার বোয়ালিন শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ জাহ্নবী। উড়িয়া ও রঙ্গপুরি উভয় ভাষাতেই শেকালিকা পুষ্পের নাম শিকাহার, নাটমন্দিরের নাম জগমোহন। রথযাত্রার রথে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ দেব যে বাড়ীতে অবতরণ করিয়া অবস্থিতি করেন, উড়িয়া ভাষায় সেই বাড়ীর নাম গুল্লিকা বাড়ী, রঙ্গপুরি ভাষায় গুল্লাবাড়ী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

* Report Arch. Surv., Eastern Circle,

1905-06.

* উড়িয়া ভাষায় বোয়ালিন শব্দের অর্থ অখ্যা-

করিয়াছিলেন, পর্বত-গাত্রে গুহা নির্মাণ, শিলালিপির উৎকীর্ণ ও স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের তিরোধানের পর বৌদ্ধনৃপতি বীরসম্মল উৎকল-কলিককে আর আয়ত্ত রাখিতে পারিলেন না, উৎকল-কলিক তাহাদিগের শিখিলমুষ্টি হইতে স্থলিত হইয়া আবার হিন্দুনৃপতির বার্ষ্যপ্রসারিত হস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৌদ্ধাধিকারের সময়ে উৎকল-কলিকের অনেক অধিবাসী বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ রাজা মহামেষবাহন প্রজারঞ্জনের জন্ত রাজার উপরে প্রজার ভক্তি আকর্ষণের জন্ত নিজে হিন্দু হইলেও বৌদ্ধসন্ন্যাসীর উপরে, বৌদ্ধমঠের উপরে সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সে সময়ে হিন্দু-দেবমন্দিরের মত হিন্দু-দেবমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধস্তূপ, স্তম্ভ, মঠ ও পর্বতোৎকীর্ণ গুহাগুলি ভূগতভাবে অর্চিত ও রক্ষিত হইত। মহামেষবাহনের লোকান্তরে প্রস্থানের পর বৌদ্ধমঠ ও সজ্জারাম তাদৃশ রাজসাহায্য পাইতে সমর্থ হইল না, প্রজাদিগেরও বৌদ্ধধর্মের উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা কমিয়া গেল, ক্রমে তাহারা হিন্দুধর্মে শ্রদ্ধালু হইয়া আবার সেই সনাতন হিন্দু-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হিন্দু-ধর্মে বার মাসে তের পার্বণ আছে, বারত্রয় আছে, বিপদে পড়িলে বিপদ উদ্ধারের জন্ত দেবতার সহায়তা লইবার ব্যবস্থা আছে, বিপদের বহু ভগবান্ আছেন, আবার প্রতিমা-পূজা আছে। নিপুণ শিল্পী শিক্ত হস্তে উৎকীর্ণ পাষণ-

মূর্তি, দক্ষ কুস্তকারের কুশল হস্তে নির্মিত ভাব-প্রভাবে উদ্ভাসিত প্রসন্নবদনা দেব-প্রতিমা বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পূজামণ্ডপে উচ্চবেদীর উপরে স্থাপিত হইলে স্মৃগন্ধী সূদৃশ পুষ্পভারে, নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে, স্মৃগন্ধিমোদগারি ধূপে ও নির্মলদীপে অর্চিত, বন্দিত ও ভক্তি-গদগদ ভাগ্য সংস্কৃত হইলে দর্শকের মন স্বভাবতঃ গলিয়া যায়, সেই দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; পক্ষান্তরে, বৌদ্ধধর্মের কঠোর দার্শনিকভায় মনের অবস্থান্তর হইবার সম্ভবনা নাই। মনের উপরে বাহার আধিপত্য করিবার শিক্ষা আছে, প্রতিমা-পূজায়, দেবভক্তি ও ঈশ্বর-ভক্তিতে তাহার মনের আকর্ষণ না হইতে পারে, বাহারা সেইরূপ কঠোর অভ্যাসের বশবর্তী হয় নাই, তাহাদিগের যে স্বভাবতঃ সেই দিকে আকর্ষণ হইবে, তাহা আর যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না। যখন বঙ্গ, কলক, উৎকলের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মের পরিহার করিয়া দলে দলে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, তখন বৌদ্ধাচার্যেরা হিন্দুধর্মে আকর্ষণের মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন; ত্র্যেতোপবাস, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না থাকিলে দেবার্চনা ও দেবপ্রতিমা-স্থাপনের পদ্ধতি না থাকিলে, আর বৌদ্ধধর্ম টিকে না অবধারণ করিলেন। সেই অবধারণের ফলেই মহাবান বৌদ্ধসম্রাটের সৃষ্টি হইল। আচার্যেরা হিন্দুতন্ত্র দেখিয়া সেই আকারের কতকগুলি বৌদ্ধতন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে বোধিসত্ত্বদিগের

মন-কল্পিত ধ্যান, প্রণাম ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতুণ্য বীজসংযুক্ত কতকগুলি মন্ত্র সন্নিবেশিত হইল। ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তির সহিত তারা, লোকনাথ, হরগ্রীব প্রভৃতি বোধিসত্ত্বদিগের প্রতিমা নানা স্থানে স্থাপিত ও পূজিত হইতে লাগিল।

উপনিষদ, তন্ত্র ও পুরাণে দেবদান ও ধর্মদানের উল্লেখ আছে। মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে কেহ দেবদানে স্বর্গলোকে গমন করে, কেহ বা ধর্মদানে পিতৃলোকে প্রস্থান করে। বৌদ্ধেরা এই শাস্ত্রোক্ত ধ্যান স্বীকার করিতেন না বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাদিগকে হীনযান নামে আখ্যাত করিতেন। শাক্য-প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞানের বলে বৌদ্ধেরা নির্দোষে অধিকারী, তাঁহাদিগের কোন পথে যাইতে হইবে না, এই জন্ত তাঁহারাও এই উপাধি গৌরবের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায়ে যখন দেবদেবীর পূজা, মন্ত্র-জপ, প্রতিমা-স্থাপনের ব্যবস্থা হইল, সেই সকল কর্ম্মের প্রবর্তক বুদ্ধি-প্রসূত তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রচার হইল, তখন বৌদ্ধনৃপতির শাসিত মগধের অধিবাসী বৌদ্ধেরা এই প্রতিমা-পূজক বৌদ্ধদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন ও হিন্দু অপেক্ষাও ইহারা অধঃপতিত মনে করিয়া মহাবান এই নামে ইহাদিগকে অভিহিত করিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে যে সকল শব্দে পথ বা যাত্রা বুঝায়, সেই সকল শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ দিলে তাহার অর্থ মৃত্যু হয়। এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা মৃত্যুমুখে পতিত এই নিন্দিত অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশে হীনযানের বৌদ্ধেরা

মহাবান শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার মহাবানের বৌদ্ধেরা আপনাদিগের অবলম্বিত পথ উৎকৃষ্ট মনে করিয়া মহাবান উপাধি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, হীনযানের বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত পথ অতি নিকৃষ্ট এই অর্থ করিয়া তাঁহাদিগকে হীনযান বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। বেদের অনেক সূক্তে অশ্ব (প্রাণের) দাতা বলিয়া অশ্বর শব্দের প্রয়োগ আছে। সুন্দররূপে যাহারা দান করেন, তাঁহারা অশ্ব ; যাহারা সুন্দর-দানের পরিপন্থী, তাঁহারা অশ্বর, এ অর্থেরও সমাবেশ অনেক সূক্তে আছে। দেবতার নিকটে নিন্দিত অর্থে অশ্বর হইলেও জেন্দাতেস্তার পূজিত অর্থে তাহার ব্যবহার হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়-বিশেষের নিকটে সম্প্রদায়-বিশেষের নাম ঘৃণ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তির পার্শ্বে কৃতাজলিপুটে হিন্দুর অনেক দেবমূর্তিরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে শাক্যসিংহের উপদেশে দেবদেবী দূরের কথা, ঈশ্বরের পর্য্যন্ত নাম-গন্ধ নাই, যে বুদ্ধ শাক্যসিংহ নিরীশ্বর-বাদের প্রবর্তক বলিয়া তাৎকালিক দার্শনিকদিগের নিকটে, হিন্দু জনসাধারণের নিকটে পরিচিত, তাহার প্রবর্তিত ধর্মে প্রতিমা-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা, প্রতিমা-পূজার পদ্ধতি, তন্ত্র-মন্ত্র থাকিবে, অসম্ভব। ইংরাজের চক্ষে এবং ইংরাজ-গুরুর নিকটে বা ইংরাজ পুস্তকের নিকটে শিকা-দীক্ষা লাভ করিয়া, সেই ভাব-মদিরার উদ্যাপনার যাহারা অধিকৃত, তাঁহাদের রাগবিচ্যুতিত চক্ষুর সম্মুখে উপলব্ধি হইতে পারে যে, হিন্দুরা বৌদ্ধের নিকট

হইতে প্রতিমা-পূজা, তত্ত্ব যন্ত্র নির্মাণ-মুক্তি গ্রহণ করিয়াছে, আরও কত কি গ্রহণ করিয়াছে। বাহারা বুদ্ধপ্রচারিত দার্শনিক মত আলোচনা করিয়াছেন, বাহারা তত্ত্বানু-লন্ধান দ্বারা বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখনই ঐরূপ বিদেশী মতে মত দিতে পারিবেন না। যদি বৌদ্ধধর্মের প্রতিমা-পূজার চমকে হিন্দুর মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, নির্মাণের জন্ত লালায়িত হইয়া হিন্দু যদি সেই দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, তবে বাহাতে সত্য আছে, ভক্তি আছে, জ্ঞান আছে, নির্মাণ আছে, আবার অকণ্ঠ্য মুক্তি দ্বারা স্থাপিত জ্ঞানান্তরবাদ আছে, হিন্দুর পক্ষে একেবারে সেই সত্য ধর্মের অশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া বৌদ্ধধর্মের সমস্ত মাগমসলা লইয়া বৌদ্ধপ্রণালীতে মন্দির রচনা করিয়া তাহার হিন্দুমন্দির এই নামকরণ করিয়া লাভ কি? বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মে বাহারা বিশ্বাস আছে, বুদ্ধদেবের উপরেও তাহার ভক্তি আছে, ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়ম। বুদ্ধদেবকে ভক্তি না করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্মে অগ্ররক্ত হইয়া যেমালুম তাহা নিজের করিয়া লইলাম, ইহা কোন্ নিয়মের অধীন, কোন তর্ক দ্বারা ইহার অবধারণ, বুঝিতে পারি না। আমি হিন্দু, আমি কোন ধার্মিক মুসলমানকে, কোন ধার্মিক খ্রীষ্টিয়ানকে ভক্তি করিতে পারি; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম-পুস্তকের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে পারি না। তাহা করিলে

ত আর হিন্দু থাকিব না, হয় মুসলমান হইব, নয় খ্রীষ্টিয়ান হইব। পক্ষান্তরে, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ানও কোন ধার্মিক হিন্দুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের আদিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন না। এটী ভুলই আমরা বৌদ্ধধর্মকে না মানিয়াও বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, নাস্তিক চূড়ামণি চার্লসকে বৃহস্পতির অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। এই পাশ্চাত্য ভাবের ধরনোতে আত্মবিত্ত দেশে ও কালে অবস্থান করিয়াও যখন উদ্ধানের শোভা-বর্দ্ধক মোরগ্ ফুলে অন্যাপি হিন্দু দেবতার পূজা করেন না, ও দেবভোগে পলাতুর প্রযোগ করেন না, তখন সেই আদিয়েগে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম আত্মসাৎ করিলেন, বুঝি না। আর বুঝি না, যে হিন্দু-বিশ্বাসে আগে শোকে ক্রিষ্ট হইয়াও নিজে পাক করিয়া লয়েন, একবেলা দুটি অন্ন ভোজন করিয়া দীর্ঘ দিবা রজনী কাটাইয়া দেন, পুরোহিতের পথে পূর্বদিনেও যিনি সেই ভাবে আহার করিয়াছেন, সেই সদাচারনিরতা হিন্দুবিশ্বাসে আজ পুরীক্ষেত্রে অর্থাৎ বুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াই সমস্ত সদাচার ভুলিয়া গেলেন, পুরুষোত্তম বুদ্ধদেবের দারুণময় ত্রিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াই জাতিভেদ ভুলিয়া গেলেন, অগ্নান যুগে অসন্দ্বিগ্ন চিত্তে সকল বর্ণের স্পৃষ্ট, উজ্জিষ্ট প্রদত্ত বুদ্ধদেবের প্রসাদ দিনের ভিতরে বহবার ভরুণ করিতে লাগিলেন। অল্প কোন বৌদ্ধতীর্থে এইরূপ আচার আছে^৩ কি না জানি না, শুনি নাই, কল্পনার চক্ষেও

দেখি নাই। যাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ আচারে নাই, প্রবাদে নাই, হিন্দু কিন্তু বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত করিয়া বৌদ্ধের নিকট হইতে সেই আচার গ্রহণ করিয়া জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশে নিজেদের ভিতরে তাহার প্রবর্তনা করিল। কত যুগযুগান্তর অতীত হইল, ত্রীপুরাষোত্তমের তথাবিধ প্রসাদ ভক্ষণ বরিয়াও হিন্দুর হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হইল না, জাতিভেদ অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সকল কল্পনাশ্রুত তর্কের মূলে কি আছে আমরা তাহা অবধারণ করিতে পারি না; পারেন কেবল তাঁহারা, যাহারা বেদ অপেক্ষা বিদেশী গুরুর কথাতে শ্রদ্ধা পূরুষোত্তম বুদ্ধমূর্তি; সে সম্বন্ধে আর একটি অখণ্ডনীয় তর্ক আছে, একথা কহারো কহারো মুখে শুনিতে পাই। ভারতীয় স্থূলবুদ্ধি গোতম বুঝিতে পারিবেন না। তর্কটি এই, পুরুষোত্তমের মন্দিরে আমরা তিনটি মূর্তি দেখিতে পাই, একটি জগন্নাথের, একটি বলভদ্রের, একটি হস্তদ্বার। বহুগুলি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, ভগ্নাথো কোন কোনটিতে তিনটি মূর্তি আছে, একটি বুদ্ধের, একটি ধর্ম্মের ও একটি সজ্জের। যখন কোন বুদ্ধপ্রতিমার সঙ্গে আমরা আরও দুইটি মূর্তি দেখিতে পাই, তখন বলিতে হইবে, বুদ্ধের প্রতিকৃতিতে ত্রিমূর্তির সমাবেশ আছে; যাহাতে ত্রিমূর্তির সমাবেশ আছে, বলিতে হইবে, তাহা বুদ্ধের প্রতিকৃতি; যখন জগন্নাথমূর্তিতে আরও দুইটি মূর্তির সমাবেশ আছে, তখন সে ত্রিমূর্তি; যখন সে ত্রিমূর্তি, তখন সে বুদ্ধের প্রতিকৃতি। * এই

তর্কের উপরে আর বলিবার কি আছে? বলিবার কিছুই নাই, জিজ্ঞাসা করিবার কিছু আছে। খ্রীষ্টীয়ানের ত্রিহবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত? না, খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট হইতে এই ত্রিহবাদ বৌদ্ধধর্ম্মে সংক্রামিত? খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে ত্রিহবাদ সংগৃহীত হইল, আবার হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে সেই ত্রিহবাদ গোপনে অপহৃত হইল; এই যুক্তিতেই বিনিগমনা আছে, অমূল্য তর্ক আছে, এই মূল সত্যের অনুসরণ না করিয়া শাখার আশ্রয় গ্রহণ করা সূক্ষ্মত হয় নাই। তাহা হইলে আর বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল লইয়াও গোলযোগে পড়িতে হয় না। খ্রীষ্ট জন্মবার অন্ততঃ দুইশত বৎসর পরে বুদ্ধের আবির্ভাবের কাল অবধারণ করা যাইতে পারে। আর, হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুৰাণ সমস্তই তৎপরে অর্থাৎ ষাটশ শতাব্দীর ভিতরে রচিত হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। তন্ত্র ত ইংরাজাধিকারের পরে লিখিত, সে সম্বন্ধে অত্রান্ত যুক্তি আছে, ক্রাইবের নাম দেখিয়াই তন্ত্রে ক্রী বীজ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা আবশ্যক, হিন্দু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বৌদ্ধের নিকট হইতে না খ্রীষ্টীয়ানের নিকট হইতে গৃহীত। অনেকের গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, অনেকের গৃহে গণেশজননার মূর্তি ও মহাদেব আছেন; এ সমস্তই বুদ্ধ, সজ্জ ও ধর্ম্মমূর্তি। রাধাকৃষ্ণ মূর্তির সহিত শালগ্রাম চক্র আছেন; বলা বাহুল্য যে, সে মূর্তি ত্রয় ও বুদ্ধ, সজ্জ ও ধর্ম্মের মূর্তি। * বুদ্ধ ও ধর্ম্মের পুরুষ মূর্তি, সজ্জের স্ত্রী-মূর্তি। পূর্ব্বে কথিত হিন্দুদেবমূর্তিগুলির ভিতরেও এক

* * জেনারেল কনিংহাম কৃত The Ancient Geography of India দ্রষ্টব্য।

একটি স্ত্রী-মূর্তি, অপর দুই দুইটি পুরুষ-মূর্তি আছে ; সুতরাং জগন্নাথদেবের মূর্তি যে বুদ্ধমূর্তি, এই অনুমান কোনরূপ হেতু-ভ্রাসের (Fallacy) সম্ভাবনা নাই । এই ত্রিমূর্তির নিকটে প্রস্তরনির্মিত সুদর্শনচক্র আছে । আর কি ? ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি থাকিতে পারে ? বুদ্ধেরও যে চক্র আছে, এই চক্রই যে বুদ্ধহৃদাধক অর্থার্থ প্রমাণ । ষড়্‌বর্ষব্যয়ঙ্গ সুরোজকুমারী তাহার পিত্রালয়ের সন্নিধানে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বুদ্ধা গোরীর নিকটে বাইয়া তাহার মুখে রূপকথা শুনিত । দরিদ্রা গৌরা তাহাকে রূপকথা শুনাইত, আর হাতে চরকার হুতা প্রস্তুত করিত । সুরোজকুমারী গোরীর চরকা ভিন্ন আর কখনও চরকা দেখে নাই । কোন এক সময়ে সুরোজকুমারী মাতার সঙ্গে মাতামহের গৃহে যাইয়া কোন এক দাসীর একটি চরকা দেখিতে পায় ও সেই চরকা দেখিয়াই জিহ্ব ধরে, গৌরী ঠানদিদিকে ডাকিয়া দেও, আমি তাহার মুখে রূপকথা শুনিব । সকলে বলিল, গৌরী কে ? গৌরী নামে এখানে কেহ নাই, কাহাকে ডাকিব ? সুরোজকুমারী চরকা দেখাইয়া বলিল, কেন থাকিবে না ? যখন ওটা আছে, তখন গৌরী ঠানদিদিও আছে, ওটা যে গৌরী ঠানদিদির । এই বিদেশী অনুমান শুনিয়া সুরোজকুমারীর অনুমানের কথা মনে হয়, হায়, সুদর্শনচক্র ! তোমাকে লইয়াও বিব্রতে পড়িতে হইল ! চীন, জাপান, তিব্বত, বর্ম্মা, ভারত যে স্থানেরই বুদ্ধমূর্তি দেখিবে, সমস্ত মূর্তিরই একরূপ গঠন, চক্ষুঃমুখ, নাসিকা এক

ভাবেই গঠিত, সর্বত্র এক সাম্য বিদ্যমান । আবার সমস্ত মূর্তিই যোগাৎনে উপবিষ্ট, চক্ষু ভ্রমধ্যে সন্নিবেশিত, পাণিতল অঙ্কে স্থাপিত । জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, জগন্নাথদেবের মূর্তিতে ইহার কি আছে ? বুদ্ধ মূর্তির সহিত জগন্নাথদেবের মূর্তির কত-টুকু সৌসাদৃশ্য আছে ? অর্ধনির্মীলিত বুদ্ধ-নেত্রের সহিত জগন্নাথদেবের ভীষণ বিশাল নেত্রদ্বয়ের কি সাদৃশ্য আছে ? আর অন্ধ-ব্রূত পাণিতলের সহিত পাণি-তলবিহীন এবং ঋজুভাবে সম্মুখে শূণ্য প্রসারিত বাহুযুগলের কিরূপ সাম্য আছে ? কলিঙ্গ-উৎকলের ভাস্কর্য্য এক সময়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, উৎকল-কলিঙ্গের শিল্পী কঠোর প্রস্তুতফলক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণিতলের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রেখাপাতগুলি পর্য্যন্ত বাটালীর মুখে বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; আর কোমল কাষ্ঠফলকে জগন্নাথদেবের কমনীয় মূর্তি বাহির করিতে পারিল না, অস্বাভাবিক ভাবে বাহুদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পাণিতলের সন্নিবেশ করিতে পারিল না ; ইহার অর্থ কি ? জগন্নাথদেবকে বুদ্ধমূর্তি স্বীকার করিলে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে না, হিন্দুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে সহজেই মীমাংসা হইবে । শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে জগন্নাথ প্রণবমূর্তি ;—অর্থেও প্রণব, আকারেও প্রণব । দেবনাগর-বর্ণমালায় ওকের পৃথক্ আকার নাই, যে প্রণালীতে ব্যঞ্জনবর্ণে ওকারের সংযোগ করা হয়, অকারে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ওকারের চিত্র লিখিত হয়, ইহারা দেবনাগর-বর্ণমালার গঠন হইতে সমস্ত ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি

হইয়াছে বলেন, তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদানের জন্য অমুরোধ করি। বাঙ্গালা অক্ষর আধুনিক নয়, বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রও আধুনিক নয়। তন্ত্র প্রাচীন প্রমাণ করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যকতা হইবে। বুদ্ধদেব যখন বাঙ্গালা অক্ষর শিখিয়াছিলেন প্রমাণ পাওয়া যাউনো, তখন বাঙ্গালা বর্ণমালা যে প্রাচীন, সে সম্বন্ধে আর পমাণাত্বের প্রয়োজন করে না। প্রণবের শীর্ষস্থ বিন্দুটি জগন্নাথদেবের মস্তক, চন্দ্রটি পঙ্ক বাহুগুণ, ওকারের উর্দ্ধাংশ নাভি পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থল, নিম্নাংশ নাভি হইতে নিম্নাবধি। অবশ্য, বাঙ্গালা প্রণবই এই ভগবান্মূর্তির আদর্শ। তন্ত্রের অনেক বাঙ্গালা অক্ষরকে আদর্শ করিয়া লিখিবার ব্যবস্থা আছে। “তন্ত্র বাচকঃ প্রণবঃ” পাতঞ্জল-দর্শনের সূত্র, সেই ঈশ্বরের বাচক-শব্দ প্রণব, উপনিষদে তাহাই আছে, ভগবদ্গীতাতেও তাহাই আছে। অকার, উকার, মকার এই তিনবর্ণের ঘনসন্নিবেশে এই বর্ণের সংস্থান। তিন বেদ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন বৃত্তি; ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, এই তিন ভূমি; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতা প্রণবের অর্থ। ধরিতে গেলে ভগবানের বিশ্বরূপই প্রণব। আবার নাদবিন্দু শক্তি, অকার বিষ্ণু, উকার ব্রহ্মা ও শিব। অর্থ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের কারণ। বিন্দু তুরীয়ব্রহ্মা; নাদ শক্তি; অকার, উকার ঈশ্বর। এক প্রণবেই বেদান্ততত্ত্ব নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, এক প্রণবেই তাহা বিদ্যমান, ভগবানের

বিশ্বরূপ এক প্রণবেই নিহিত। একদিন ক্ষত্রিয়ান্তকারী প্রণব-সমুদ্রের তীরভূমি কুরুক্ষেত্রে তত্র অর্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন, আর আজ এই কল্লোলময় মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া চক্ষু তরিয়া ভগবানের এই ভীষণ জলময় মূর্তি এই বিশ্বরূপ বিলোকন করিয়া সাধক ভূমি, ভক্ত ভূমি, মানব জন্ম সার্থক কর। অর্জুনে প্রদর্শিত বিশ্বরূপে সহস্র চক্ষু, সহস্র বক্তৃতা, সহস্র বাহু, সহস্র উদর ছিল; আর এ বিশ্বমূর্তিতে বিশাল ভয়ানক লোচনদ্বয়ে সহস্র চক্ষুর সত্তা আছে, আকাশরূপ বিশাল ললাটে উদ্ভাসিত বিশাল নেত্রদ্বয়ে সহস্র সহস্র উজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য্যের সত্তা আছে, কালানল-স্বরূপ জ্বালাময় ভয়ানক বিশাল বদন-মণ্ডলে সহস্র মুখের সত্তা আছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য অগ্র-প্রেরিত বাহুগুণে বাহুসংগ্রহের ভাণ-সমাবেশ আছে। কে বলিবে কোন্ কৰ্ম্ম করিবার জন্য এই বাহুব্যয়ের অগ্রভাগ প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত? কৰ্ম্ম অনন্ত, কৰ্ম্মের শেষ নাই, বিশ্বরূপের বাহুগুণেরও শেষ নাই, অগ্রভাগ নাই; ভূমি জ্ঞানী, ভূমি সাধক, তোমাকে বুঝাইবার জন্য বাহুর কিয়দংশ প্রদর্শিত হইয়াছে, বুঝাইবার জন্য আবার অগ্রভাগ পাণিতল প্রদর্শিত হয় নাই। এক মূর্তিতে যেমন ত্রিমূর্তির সমাহার, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ তিন মূর্তি প্রদর্শিত হইয়া এই তিন মূর্তির সমষ্টিতে একমূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দক্ষিণে ধুম্রবান, বামে সংকর্ষণ বলরাম, সূতরা মহাশক্তির আশ্রয়ে ব্রহ্মরূপে

সৃষ্টি, রুদ্ররূপে প্রায় সৃষ্টি হইতেছে, বামে দেবদান, বামে অবস্থিত হইয়া জগন্নাথ এক সৃষ্টিরই আগ্রহে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, স্থিতি-তত্ত্ব, প্রায়-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া আয়ত্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছেন; ঠাহাকেই বলে পুরুষোত্তম দর্শন। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিমলা দেবী আছেন, সরস্বতী আছেন, লক্ষ্মী আছেন, চামুণ্ডা আছেন। লোকনাথ মহাদেব, মার্কণ্ডেয় মগাদেব, ইন্দ্রহ্যম্বেশ্বর মহাদেব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যাজপুর বিরজাক্ষেত্র, পুরী শ্রীক্ষেত্র বা বিমলাক্ষেত্র। তদ্রাও অত্রক্ষেত্র নহেন, স্বয়ং দুর্গা ভুবনেশ্বরী, ইহা একটি বৌদ্ধী সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি। এ সন্ন্যাসী কখনও পুরীতে, কখনও কানীতে, কখনও উত্তরাপথে থাকিতেন। যাজপুরে বিরজার কর্ভূহ, শ্রীক্ষেত্রে বিমলার আধিপত্য, বিম্বপত্র ভুলনী শব্দের সংযোগে দ্বাদশাক্ষরি বামুদেব-মন্ত্রে শ্রীভুবনেশ্বরের অর্চনা দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে রক্ষিত তাল-পত্রে লিখিত উৎকলের ইতিহাস-মাদলপত্রিকা পাঠ করিয়া বিদেশী ভাবে শিক্ষিত মহাত্মানিগের মনঃ-কল্পিত শৈবযুগ, শাক্তযুগ, বৈষ্ণবযুগের সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিতে না পারিয়াও একান্ত দুঃখিত হইতেছি। উৎকল-কলিঙ্গের রাজা যে স্বাতি-কেশরী ভুবনেশ্বরের বিশ্ববিশ্রুত মন্দির নির্মাণের আরম্ভ করেন; তিনিই সমুদ্রকূলের বালুকাস্তূপ উৎসারিত করিয়া স্বপ্নাদিষ্ট এই ভগবৎ-মূর্ত্তির লাভ করেন ও পুরুষোত্তমের প্রাচীন মন্দির নির্মাণ করেন। নবীন সন্ন্যাসী বৈষ্ণবধর্মের নবীন প্রবর্তক চৈতন্য

দেবের একান্ত ভক্ত হইয়াও রাজা প্রতাপ-রুদ্র ধবলেশ্বর প্রভৃতির মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। স্বয়ং চৈতন্যদেবও সর্বত্র মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অর্চনা বন্দনা ও স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন। আজ যেমন শাক্তের গৃহে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, শাগগ্রামচক্র অর্চিত হইতেছেন, আজ যেমন বৈষ্ণবের গৃহে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা আছে, আড়ম্বরের সহিত শারদীয়া দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইতেছে, যুগযুগান্তর পূর্বেও তাহাই ছিল। এই জন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন, অর্জুন শিবের তপস্যা করিয়াছেন, ব্রজ-কুমারীরা কাত্যায়নীত্রের অমুষ্ঠান করিয়াছেন। স্মরণ্য ঐ সমস্ত যুগবিভাগ যে একান্ত মনঃকল্পিত, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

বৌদ্ধার্থোদয়ী অমুষ্ঠান-প্রবল মহাবান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াও ভারতবর্ষে অধিক দিন বৌদ্ধধর্মের রক্ষা করিতে পারেন নাই; বৈদিক ধর্মের প্রথমমার্ভওপ্রভায় তামস ধর্ম স্থির থাকিতে না পারিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দিগ্দিগন্তরে প্রস্থান করিয়াছে; উৎকল-কলিঙ্গে আজ একটিও বৌদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। উদয়গিরি, খণ্ডগিরির গাত্রে ক্ষোদিত গুফাগুলি না থাকিলে, পর্কতগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের শাসনলিপি না থাকিলে এক সময়ে যে উৎকল-কলিঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় থাকে না। উৎকল-কলিঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের অনেক উপকরণ,—অনেক নিদর্শন ইত্যদ

পাড়িয়া রহিয়'ছে, এক জীবনে বহুবর্ষব্যাপী
পরিশ্রম করিলেও সমস্ত সংগ্রহ করিবার
আশা করা যাইতে পারে না ।

উৎকল-প্রসঙ্গ পিথিতে যাইয়া বাধা হইয়া
আমার অনেক অবাস্তব কথা বলিতে

হইয়াছে । দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া আমি পাঠক
পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মাইয়াছি বলিয়া
শঙ্কিত হইয়াছি । উপসংহারে তাঁহাদের
নিকটে একমাত্র ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন আর
আমার বলিবার কিছু নাই ।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন ।

উষার তারা ।

বিরলে গগণ কোলে কে তুমি যাপিছ নিশি
স্নান আঁখি বিরহিণী প্রায়,
কি বাধা ধরিয়া বুকে বল কি আশার আশে
অনিমেঘ চাহিছ ধরায় ?
সাথী কি এসেছ ফেলি তাই পথ চেয়ে চেয়ে
নাহি স্মৃতি, বিনিদ্র অধীর ?
বিরহের মত্তব্যথা শিশুর সম্পাতে কি গো
ঝরিতেছে,—তব আঁখি নীর ?

অথবা কি ধ্যানমগ্না আছ তুমি নভতলে
— উমা যথা হিমগিরি পরে,
সংজাহীন হর লাগি ছিলেন কঠোর ত্রুতে
একাসনে মিলনের তরে ।
যুগযুগান্তর হতে সাধনা সমাধি মাঝে
বল দেবি কতকাল হায় !
ওগো প্রেম-সন্ন্যাসিনী কোন পুণ্যক্ষণ লাগি ।
রবে তুমি চাহি দেবতায় ।

শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ রায় ।

‘কৃষ্ণ-চরিত’

সাহিত্যচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম নবা-
সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের চেষ্টা
করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থে
তিনি কৃষ্ণের মানব-চরিত্রেরই আলোচনা
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণকে যে স্বয়ং
ভগবান্ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যে তাঁহার সেই
বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, উক্ত গ্রন্থেই তিনি
এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন । ভক্তি দ্বারা
বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্তি দ্বারা, মানুষ উন্নত হয় ;
কিন্তু ভগবচ্চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা
থাকিলে সেই উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে । “কৃষ্ণ
আমাদের দেশে সর্বব্যাপক,” অতঃপর কৃষ্ণ

চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আমাদের জাতীয়
উন্নতির পক্ষে তিনি একান্ত প্রয়োজনীয়
বলিয়া বুঝিয়াছিলেন । সেই চরিত্র সম্বন্ধে
লোকের অমূলক বিশ্বাস দূর করিবার ইচ্ছায়
তিনি যথাসাধ্য পুণ্য-ইতিহাসাদির আলো-
চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিমল শুভ চরিত্র
তাঁহার গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।
কিন্তু বিষয়টি যেরূপ সূবিস্তৃত ও বহু আলো-
চনাসাপেক্ষ এবং আচার্য্য-দেবের জীবন
যেরূপ কল্পবহুল ছিল, তাহাতে এরূপ শুদ্ধ-
তর বিষয়ে অনন্ত-সহায় ব্যক্তিবিশেষের
সিদ্ধান্তের উপর সর্বাংশে নির্ভর না করিয়া
এদিকে সমবেত চেষ্টা প্রয়োগই সাহিত্য-
সৌবর্ণের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বোধ হয় ।

এবস্থি কার্যে আমার মত অযোগ্য লোকের হস্তক্ষেপ দেখিয়া অনেকই মনে করিবেন (এবং সেরূপ মনে করা অসঙ্গতও হইবে না) যে “Fools rush in where Angels fear to tread” কিন্তু এইরূপ ধৃষ্টতার সমর্থন-কল্পে আমার বিনীত উত্তর এই যে, একটি সমবেত চেষ্টার স্বরূপাত করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ।

পূজাপাদ বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ-চরিত্র বৃদ্ধিবার জন্য প্রধানতঃ মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণের কলঙ্কমোচন-প্রয়াসে মহাভারতের অনেকগুলি অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন । নৈতিক ধর্ম্যধিকরণে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগ যাহা আছে, তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ-সমূহের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, সে অভিযোগ ভিত্তিহীন ; ঘটনাগুলি সত্য নহে—কাজেই তিনি কৃষ্ণকে নির্দোষ বলিয়াছেন ! বর্তমান প্রবন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, ঐ ঘটনাগুলি সত্য হইলেও উহার কৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক নহে ।

“অশ্বখামা হত ইতি গজঃ” ও বৃন্দাবনের গোপী—এই দুইটিকে কৃষ্ণের প্রধান অণবাদ ধরিয়া প্রথমটি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—“বৃত্তান্তটি নিতান্তই যে উপহাস্য তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম ।” কিন্তু যাহাকে তিনি ‘প্রমাণ’ নাম দিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—অনুমান মাত্র । বৃত্তান্তটি যে প্রক্ষিপ্ত নহে একথা অবশ্য আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না ; তবে আমার বক্তব্য এই যে উহা সত্য

হইলেও উহাতে কলঙ্কের কারণ প্রকৃত পক্ষে কিছুই নাই । ইহা দেখাইতে হইলে কৃষ্ণ কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব বঙ্কিম বাবু বেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা একবার দেখা উচিত ।

তিনি কৃষ্ণ-প্রোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

সত্য, শৌচ, দান, অহিংসাদি ক্রতিবিহিত বিধিসমূহের সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আবার অবস্থা-বিশেষে অর্থাৎ অনুপযুক্ত প্রয়োগে সকলগুলিই অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায় ; পক্ষান্তরে, অসত্য হিংসাদি যে সকল কার্য সাধারণতঃ অধর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহারও স্থলবিশেষে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় । উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—(১) দম্ভ্যর নিকট সত্য কথা কহিয়া প্রাণতরে পলায়িত ব্যক্তির সন্ধান বলিয়া দেওরাতে সতানিষ্ঠ কৌশিক নরকে গিয়াছিলেন । (২) পাপাত্মাদিগকে ধনাদি দান করা অধর্ম্ম । (৩) লোক-হিংসাকারীর হনন করিয়া বাঁলক-ব্যাধ স্বর্গ লাভ করিয়াছিল ; ইত্যাদি । ক্রতি সাধারণতঃ ধর্ম্মের প্রমাণ হইলেও উহাতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই । তজ্জন্ত অসুখান দ্বারাও অনেক স্থলে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয় । কিন্তু সম্মুখে একটি আদর্শ না থাকিলে কি ধরিয়া অনুমান অগ্রসর হইবে ? তাই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য একটি সর্বত্র প্রযোজ্য, বিশ্বজনীন মূলসূত্র চাই । শ্রীকৃষ্ণের মতে সেই মূলসূত্রটি এই—“যদ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম । পাশ্চাত্য হিতবাদী Sidgwick-এর সহিত এই মতের ঐক্য আছে । Kant, Hegel প্রমুখ নৈতিক ও দার্শনিকদিগেরও এইরূপ

এক একটি মূলমন্ত্র আছে। উহাকে ভিত্তি বা আদর্শ ধরিয়া সমস্ত কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত হয়।

অহিংসা সত্যাদি শ্রুতি-বিহিত স্থূল নীতি-গুলি যখন উক্ত লোকহিতরূপ চরম লক্ষ্যের প্রতিকূল হয়, তখন তাহারা অধর্ম্য। আবার অসত্য হিংসাদি সাধারণতঃ নিষিদ্ধ কার্যগুলি উহার অনুকূল হইলে ধর্ম্য বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই বার্ত্তিত তত্ত্ব। স্তুরাং দেখা যাইতেছে এই মতে অহিংসা ও লোক-রক্ষাই পরম চরম ও অনন্তসাপেক্ষ ধর্ম্য। অত্যাচার বিধিসমূহের নৈতিক মূল্য আপেক্ষিক, অর্থাৎ উক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্যানুকূল্যসাপেক্ষ। সত্য—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্য, কেননা ইহা লোক স্থিতির অনুকূল ও উপায়ীভূত। সত্য ও অহিংসার বিরোধ স্থলে অহিংসাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। আবার লোক-স্থিতির সহিত অহিংসার বিরোধ স্থলে লোকস্থিতিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অর্থাৎ লোকরক্ষার্থ হুটের প্রতি হিংসাচরণ ধর্ম্য। কৌশিক ও বালকের বৃত্তান্তে এই দুই কথার উল্লেখ হইয়াছে।

লোকরক্ষার্থ স্থূল নীতির বর্জন অপরিহার্য্য হইলে তাহার ঐচ্ছিত্য সম্বন্ধে বন্ধন বাবু কৃষ্ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—যথা “স্থলবিশেষে সত্য মিথ্যাস্বরূপ এবং মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।” গীতা ও মহাভারত হইতে ইহার অনুরূপ আরও ২৪টি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

“কর্তব্য কি এবং অকর্তব্য বা কি, এই তত্ত্ব পণ্ডিতজনের পক্ষেও অতি দুষ্কর। স্থলবিশেষে অর্থাৎ প্রয়োগ-ভেদে কর্তব্য কখনও অকর্তব্য এবং অকর্তব্যও কর্তব্য

বলিয়া গণ্য হয়। বুদ্ধিমান, যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্ত্বের এই গহন গতি বুঝিতে পারেন।” (গীতা, ৪র্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণোক্তি) “কোন স্থলে অধর্ম্য ধর্ম্মের জ্ঞান এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের জ্ঞান লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোনটি বার্থ্য্য ধর্ম্ম আর কোনটি বার্থ্য্য অধর্ম্ম, তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।” (শান্তিপর্ক, ৩৩শ অধ্যায়)। “ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক নিরূপণ করিতে পারেন না।” (মত্তাপর্ক ভীষ্মোক্তি) এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া একটি কুল, এবং একটি কুলকে নির্মূল করিয়া রাজারক্ষা করা ধর্ম্ম।” “কেবলঃ শাস্ত্রমাত্রিণ্য ন কর্তব্যো বিনির্গমঃ।” ইত্যাদি।

“যাহা ৫২ তাহা ৫৩” বলিয়া একটি গল্প আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোন সতীর উপর অত্যাচার করণোদ্যত অনেক ছুট লোকের বিনাশ করায় এক দল তাহার সমস্ত নয়-হত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। বস্ততঃ সক্ষীর্ণ, লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা সাধারণতঃ পাপ বা পুণ্য বলিয়া বোধ হয় তাহা দেখিয়া, দেশ কাল পাত্র ও আনুসঙ্গিক অবস্থাদির বিচারক্ষম, হৃদয়-দর্শী ধর্ম্মরাজ অনেক সময়েই হয় ত বলিয়া থাকেন—

“ধাক তব ক্ষুদ্র মাপ, ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ,
সংসারের পারে।”

বন্ধন বাবুর বাধ্যতাত ও অনুমোদিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের বার্ত্তিত তত্ত্বানুসারে লোক-রক্ষার্থ সত্য ও অহিংসা এই স্থূলনীতিদ্বয়ের ব্যতিক্রম দ্বারা দ্রোণভীষ্মাদির বধ ব্যাপারে

উঁহা'র কোন আপত্তি থাকা উচিত ছিল না। তাঁহার ব্যাখ্যাসূত্রে ক্রোধের ধর্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য হিতবানেরই অমূল্য বলিয়া বোধ হয়। এই ব্যাখ্যাকে সত্য ধরিয়া লইলে ক্রোধ ও ঘৃণিষ্ঠাদির কলঙ্কমোচন আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনারামসাধ্য হইত। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটি অতি ক্ষুদ্র বিবেচ্য বিষয় আছে। বর্জিত তত্ত্বসূত্রে লভ্য অহিংসাদি স্থানীতির ব্যতিক্রমে কি একেবারেই পাপ নাই? ঐরূপ ব্যতিক্রম সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম, না মোটের উপর ধর্ম্ম? বন্ধিম বাবু এই প্রশ্নটো তোলেন নাট। ক্রোধেরও এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন উক্তি পাওয়া যায় না। তবে মহাত্মারও অজ্ঞান গ্রন্থে ক্রোধের ভয় ও মহাবলবী ব্যক্তিদিগের এরূপ অনেক উক্তি আছে যাহা হইতে বুঝা যায় যে সত্য অহিংসাদির ব্যতিক্রম মাত্রই অসংখ্য পরিমাণে পাপ আছে। নিকাম ভাবে কর্ম্ম করিতে না পারিলে হিংসা মাত্রই পাপজনক। এটো ভাবের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—“সকল কার্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। ছুরিলের রক্ষার্থ, প্রবলের বিনাশ সাধন পক্ষেও এই কথা।” (শান্তিপর্ব ৫শ অধ্যায়)। “রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে।” (শান্তিপর্ব ১৭শ অধ্যায়)। “যুদ্ধান্তে তীর্থযাত্রাং বৎ প্রকৃত্তে বাগ্নরয়ণঃ। তেন জানীমহে হিংসা ধর্ম্মগাহপি ছুরিত-প্রদাঃ॥” (আদিপর্ব লীলকণ্ঠভূতা গাণেশী টীকা)। শ্রেনবজ্জ দ্বারা শত্রুকরূপ শ্রেনোলাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে জীবহিংসাজনিত নরকভোগরূপ

শ্রেনোলাভও হইয়া থাকে। সাংখ্যকারিক ব্যাখ্যার বাচস্পতি মিশ্র দ্বিত পঞ্চশিখাগণ্যের “স্বল্পসংসারঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যাবমর্ষঃ” এই উক্তিও উক্ত মতের সমর্থন করিতেছে। হিংসা মাত্রই পাপ; এমন কি অজ্ঞান-রূত হিংসাতেও পাপ আছে। চুল্লী, জাঁতা, উদুখলাদি দ্বারা অনিচ্ছাকৃত জীবহিংসাহেতু পঞ্চশূন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভার্থ গৃহস্থকে পঞ্চ বজ্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কৈনদীগের মধ্যেও অজ্ঞানরূত জীবহিংসা নিবারণার্থ আহার-বিহার সম্বন্ধে অনেক সতর্কতা বর্ণন করিবার বিধি আছে। ক্রোধোক্ত ধর্ম্মেরও প্রথম কথা “অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ” ইহা বন্ধিম বাবু বলিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার হিংসাই পাপজনক, হিন্দু-শাস্ত্রের অভিপ্রায় এইরূপই বোধ হয়। আবার উঁহার বিপরীত ভাবের কথাও আছে, যথা :—“অভিত্যগী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার বিনাশে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় না।” “লোকরক্ষার্থ হিংসাকারীর বিনাশ হলে অধর্ম্মই ধর্ম্মস্বরূপ হয়।” এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া একটি কুল এবং একটি কুলকে বিনাশ করিয়া রাজ্যরক্ষা করা ধর্ম্ম” ইত্যাদি। এই সকল উক্তি এই ভাবে বর্ণিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে হিংসা মোটের উপর ধর্ম্ম। কেননা উহাতে পাপ অপেক্ষা পুণ্যই বেশী হয়। বস্তুতঃ অবিশিষ্ট শ্রেনোলাভ মাছুষের ভাগ্যে সাধারণতঃ ঘটে না। মনের ভাল লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। বৃহত্তর শ্রেনোলাভার্থ ক্ষুদ্র আশ্রয় স্বীকার করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোটের উপর লাভবান হইবেন।

সুতরাং যে যে স্থলে বর্জিত তত্কাহুসারে স্থগনীতির বাতিক্রম ধর্ম্য বলিয়া উক্ত হই-
রাছে, তত্ত্ব স্থলে ধর্ম্য অর্থে মোটের উপর
ধর্ম্য এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে।

অজ্ঞানকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হিংসার ইচ্ছার
স্বাধীনতা নাই, তথাপি তাহাতে পাপ হয়
কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে।
তবে ইহা বুঝা যায় যে প্রাণগণের রক্ষাতেই
যদি ধর্ম্য হয় তবে যে পরিমাণে জীবহিংসা
হইবে সেই পরিমাণে অধর্ম্যও হইবে, সুতরাং
অধিকাংশ লোকের রক্ষার্থ স্বল্পসংখ্যক ছুষ্টের
সংহার স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে পাপ হইবেই।
কিন্তু ঐরূপ হিংসা মোটের উপর ধর্ম্য,
কেননা উহাতে অধিক লোকের হিত ও
অল্প লোকের অহিত হয়। এবং যে পরিমাণে
অহিত হয় সেই পরিমাণে পাপও হয়।

লোকরক্ষারূপ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মের প্রতি-
কূল হইলে আহংসা সত্যাদি যেরূপ অধর্ম্মে
পরিণত হয়, ক্ষমা, প্রেম, দয়া, দান, ভক্তি
প্রভৃতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ইহার
অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।
প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য আশঙ্কায় তাহা দিলাম না।

আর একটি কথাই উল্লেখ করা উচিত।
লোকরক্ষারূপ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্থল-
নীতির বাতিক্রম যে স্থলে নিতান্তই অপরি-
হার্য্য, এবং যে স্থলে উক্ত উদ্দেশ্য সাধন হওয়া
সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর মাত্রও নাই, কেবল
তদ্রূপ অনিশ্চিত প্রয়োজনের স্থলেই স্থল-
নীতির বর্জন ধর্ম্য (অর্থাৎ মোটের উপর
ধর্ম্য)। ক্রমোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে
সত্যের অনিত্যত্ব সম্পর্কে বন্ধিম বাবু বলিয়া-
ছেন যে—‘এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যোর

মতভেদ।’ কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এ
বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বড় মতভেদ দৃষ্ট
হয় না। প্রথমেই বলা উচিত প্রতীচ্য বা
পাশ্চাত্য মত বলিয়া কোন একটা মত
নাই। আমাদের দেশের মত পাশ্চাত্য
নৈতিকদিগের মধ্যেও নানা মূনির নানা
মত। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে
নিতান্তবাদিগণের অগ্রণী যে Dr. Marti-
neau, তিনিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে
স্থলবিশেষে, মিথ্যা প্ররোগই ধর্ম্য। উদাহরণ
স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, রোগীর কাছে
তাহার প্রকৃত অবস্থা জানাইলে যে স্থলে
রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা, সে স্থলে পরিণাম
ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মিথ্যাবাক্য
প্ররোগ করাই শ্রেয়স্কর। ক্রমোক্ত কৌশিক
বৃহত্তর সহিত এই কথাই সাদৃশ্য আছে।
হিতবাদী Sidgwickএরও এই মত।
প্রাচীন গ্রীক মনীষী Aristotleএর মতেও
নৈতিক বিধিসমূহ নিত্য ও অপরিবর্তনীয়
নহে, কিন্তু অবস্থান্তরে ব্যবস্থান্তরে
প্রয়োজনীয়।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে, বিশেষতঃ দ্রোণাদির
বধব্যাপারে, উল্লিখিত ধর্ম্মতত্ত্বের প্ররোগ
বিষয়ে এখন আলোচনা করিব।

সকলেই জানেন কৃষ্ণ কর্তৃক সন্ধি-
স্থাপনের চেষ্টা দুর্ঘ্যোধনের দোষে বিফল
হওয়াতেই অষ্টাদশ অশ্বোহিনী সেনা সমবাহে
কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে লোক-ভয়ঙ্কর সমরানল
প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। পরস্থাপহারক অশুরা-
বতার দুর্ঘ্যোধন ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবদের বধ্য।
ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মাগণ তাহার রক্ষক,
সুতরাং ধর্ম্মস্থাপনের পথে অন্তরায় বলিয়া

তাহারাও বধ্য। এ পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। কিন্তু বিধম সমস্তার কথা এই যে জ্ঞায় যুদ্ধে অর্থাৎ দ্বুত-শত্রাবস্থায় ভীষ্ম দ্রোণ অপরাজের। যুদ্ধের প্রাকালে যুধিষ্ঠিরের প্রাতি তাহার উক্তিই ইহার প্রমাণ। কোরব পাণ্ডব কোন পক্ষকেই ইহার ছাড়িতে পারেন না। একদিকে অর্থ দ্বারা বদ্ধ; অন্যদিকে ধার্মিকের প্রতি ধার্মিকের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহানুভূতি। ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদিগেরই যে জয়ী হওয়া উচিত, ইহার তাহা বুঝেন এবং মনে মনে তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষাও করেন। সুতরাং উভয় পক্ষের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য ইহার কোরব পক্ষে থাকিয়াই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবেরা বাহাতে জয়ী হয় (যুধিষ্ঠির প্রার্থনাক্রমে) তদ্রূপ মন্ত্রণা, এমন কি নিজেদের বধের উপায় পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন। অর্ধেক “তাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাতোথান পূর্ব্বক সংবত হইয়া ‘পাণ্ডবদিগের জয় হউক’ বলিয়া আশীর্বাদ করিতেন।” তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ভীষ্ম-দ্রোণ কর্তৃক এই অশীর্কচন-রূপ আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রয়োগ পাণ্ডবদিগের পক্ষে অন্ন লাভের বিষয় ছিল না। অতএব দেবী বাইতেছে কৃষ্ণ যেমন উভয় পক্ষের প্রার্থনাক্রমে ক্ষাত্রধর্ম্মানুরোধ উভয় পক্ষকেই সাহায্য দান করিয়াছিলেন,—একপক্ষে তাহার দৈহিক বলের প্রতিনিধি স্বরূপ তাহার সমযোদ্ধা নারায়ণী পেনা, অন্য পক্ষে তাহার মানসিক বল বা মন্ত্রণাশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম ও ভীষ্মভক্ত দ্রোণও তদ্রূপ একপক্ষ বাহুবল, অন্যপক্ষে

মন্ত্রণা ও আশীর্বাদরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি-দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। ভীষ্মদ্রোণের জ্ঞায় রূপ-শল্যও পাণ্ডবদিগকে মন্ত্রণা ও আশীঃশক্তি দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রূপে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৃষ্ণ-ভীষ্ম-প্রমুখ পাঁচ জন প্রধান অধিনায়কের বাহুবল এক দিকে এবং বুদ্ধিবল ও অধ্যাত্ম-বল অন্য দিকে প্রযুক্ত হইয়াছিল; এবং পরিণামে মানসিক বলই জয়-লাভ করিয়াছিল। ভীষ্ম দ্রোণ জ্ঞায় যুদ্ধে অপরাজের। তাহাদিগের দ্বারা যখন রাশি রাশি পাণ্ডব-সৈন্তের ধ্বংস হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের নির্দেশিত অন্ত্যায়োপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের বধ্য-সাধন পাণ্ডবপক্ষে অপরিহার্য্য হইল। কিন্তু যিনি ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাকে নিরস্ত-গাম্য হইতে হইবে। একরূপ স্থলে ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও লোকরক্ষার্থ ব্যক্তি-বিশেষের নিরস্ত-গমন কি শ্রেয়স্কর? এ বড় কঠিন সমস্তার কথা।

পরার্থে স্বার্থত্যাগ মহত্বের পরিচায়ক। স্বার্থত্যাগের আবার ইতর-বিশেষ আছে। যিনি আত্ম-সুখ কিংবা পরিমাণে ধর্ম্ম করিয়া স্বকীয় অর্থ দ্বারা আত্মীয়-স্বজনদের হিত সাধন করিতে পারেন, সেই স্বজন-প্রতিপালক ব্যক্তি অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। আবার তাহার বদান্ধতা যখন স্বজন, স্বজাতি ও স্বদেশের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক বিশ্ব-প্ৰীতিতে পরিণত হইয়া উহার বিশ্ববিস্তৃত স্নেহজ্ঞানার আশ্রয়ে ত্রুতাপ-দন্ধ জীবনাত্মকে টানিয়া লয়, তখন তাহার মহত্ব আরও অধিক। এ স্থলে কার্য্যক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি দ্বারা আত্ম-ত্যাগের মাত্রাধিক্য স্থচিত হইতেছে।

পণ্যস্বত্বের আবার দত্ত-পদার্থ দাতার নিকট যে পরিমাণে প্রিয় ও মূল্যবান, অর্থাৎ উহার তাগহেতু তাঁহার যে পরিমাণে কষ্ট হইবার কথা, তাঁহার আত্মত্যাগের গভীরতাও সেই পরিমাণে অধিক। পরার্থে আত্ম-প্রাণ-বিসর্জন সাধারণতঃ দুষ্কর। সেই জন্য দমীচ, দামিয়েন, বেণ্ডনাম্ প্রভৃতির আত্মত্যাগ বিশ্ব-বিস্মৃত। আবার আত্মপ্রাণ-দান অপেক্ষা পুত্রালিদান অধিকতর দুষ্কর বলিয়া ধাত্রী পান্না, ভেটুরিয়া, ক্রটাস্, ত্রেডাম, কর্ণ প্রভৃতির আত্মত্যাগের গভীরতা অধিকতর। অর্থদান অপেক্ষা প্রাণদান সাধারণতঃ দুষ্কর হইলেও, যে রূপে ব্যক্তি দান্যের নিকট গুণ্ডানের সন্ধান বলিয়া দেওয়ার পরিবর্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, পরার্থে তাহার আত্ম-সম্বন্ধিত অর্থরাশি দান বড় শ্রেষ্ঠ দান বলিতে হইবে। বুদ্ধভক্ত অনাথা রমণীর একমাত্র পরিধেয়খানির দান অতিশ্রেষ্ঠ দান, কেননা লজ্জাত্যাগ জীলোকের পক্ষে নিরতিশয় দুষ্কর। মহাভারতোক্ত বৃদ্ধ-পীড়িত ঋতীক ঋষির ভিক্ষালব্ধ শত্ৰুপুত্র দান, বাইবেলে বর্ণিত বিধবারমণীর কপর্দকদান, মুম্বু-*Sydney Smith*-এর পাণীয়দান, প্রভৃতি পরিমাণে অল্প হইলেও অবস্থানুসারে অতিশ্রেষ্ঠ দান। পুথু, হরিশ্চন্দ্র, উশানর, সুধিষ্ঠির, জোব্, রিড্‌লি, ল্যাটিনার প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের পক্ষে পরার্থে ধর্ম্মবিসর্জনেই সর্বপেক্ষা দুষ্কর আত্মত্যাগ। পলিনী, সরোজিনী প্রমুখ রাজপুত-ললনা যতীষ ও সম্মানরক্ষার্থে জহর-ব্রতাবলম্বন পূর্বক জীবন আত্মত্যাগ দিয়াছিলেন। আবার প্রবাদ আছে কোন সাধবী নারী পতির প্রাণরক্ষার্থে তাঁহার

অজ্ঞাতসাথে জীলোকের শেষরত্ন বিসর্জনে দিতে বাধ্য হইয়া শেষে লুক্রেসিয়ার মত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। পরলোকের ধর্ম্মা-দিকরণে তাঁহার কার্যের বিচার-কালে ধর্ম্মরাজের স্বপ্ন নিক্তির কাঁটা কোন দিকে হেলিয়াছিল বলিতে পারি না। “শাস্ত্র এখানে মুক, মনুষ্যের জ্ঞান এখানে অসমর্থ।” সত্যৈক্য-ক্ষার্থে প্রাণবিসর্জন যত দুষ্কর, পতি প্রাণ-রক্ষার্থে সত্যবিসর্জন তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক দুষ্কর। পরার্থে সাধ্বীনারীর আত্মত্যাগের ইহাই বোধ হয় শেষ সীমা। আর লোকহিতার্থে দম্যপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণকালের জন্যও ধর্ম্ম-বিসর্জন সাধ্বী রমণীর সত্যবিসর্জনের ত্যাক্ষ্য সর্বাপেক্ষা দুষ্কর, সর্বাপেক্ষা কষ্টকর। *Abraham* ও *Brutus*-এর, ধাত্রী পান্নাও কর্ণের পুত্র-বলিদান অপেক্ষাও ইহা কঠোরতর কর্তব্য। ধর্ম্ম-বিসর্জনেই স্বর্গ-বর্জন ও নিরয়-গমন; স্বর্গ-বিসর্জনেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ-বিসর্জন ও ক্লেশ-স্বীকারকরণ। সকল ব্যক্তির পক্ষে ইহাই আত্মত্যাগের চরম সীমা।

নিরপেক্ষ বিচারকম পাঠক! সুধিষ্ঠিরের ‘হত ইতি গজ’ বিষয়ক আচরণ এখন একবার চিন্তা করুন। পূর্বে সত্য প্রভাবে সুধিষ্ঠিরের রথ চতুরঙ্গুল পরিমাণে উজ্জ্বল ছিল; দ্রোণবধ কালে অসত্যচরণশতঃ তাঁহার রথ-চক্র ভূতল-স্পর্শ করিল। এই উক্তিটির মধ্যেই কক্ষোক্ত অটল ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে। লোকরক্ষা-রূপ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনার্থে ব্যক্তিবিশেষকে যদি ধর্ম্মচ্যুত ও নিরয়গামী হইতে হয়, তবে ব্যক্তিগত ক্ষতি সীকার করিয়াও সেই

লোকরক্ষার সহায়তা করিতে হইবে। এই স্বেচ্ছা বোধ আত্মত্যাগের পরিচয়। সাধ্বী ভাষ্যকে সন্তোষিত হইতে কষ্ট কর্তৃক নিগৃহীতা দেখিয়াও তিনি ধর্মচ্যুত করেন নাই; আত্মত্যাগ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ লাহিত, দ্রুতসর্পস্ব ও নির্দাসিত হইয়াও যিনি লাগাপেক্ষা প্রিয়তর ধর্মধনকে ভাগ করিতে পারেন নাই, অনুভব করিয়া গুরুত্বতা ও ব্রহ্মহত্যারূপ অনার্যোচিত অজ্ঞতা কার্যে তাঁহার প্রবৃত্তি কেন হইল? ইহার একমাত্র উত্তর—নিজে দুর্বল পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্ত। ধর্মসংস্থাপন দ্বারা লোকরক্ষার অভিপ্রায়েই তিনি আকস্মিকতায় মহামূল্য তপঃপ্রভাব ধর্ম করিয়া তাঁহার সন্তোষিত রথখানি পৃথিবীর ধূলিতে সংলগ্ন করিয়াছিলেন। যাহারা পরের জন্ত ভাবেন, তাঁহাদের গমনের সময়ে এইরূপ একটু নীচে নামিতে হয়; পনের জন্ত পৃথিবীর ধূলিতে দেহ মলিন করতে হয়। পর-হিতার্থ ধন-বিসর্জনকে যদি মহত্ব বল, আত্মত্যাগে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বনবাস স্বীকার করাকে যদি আত্মত্যাগ বল, পরার্থে পুত্র-বলিদান বা আত্ম-বলিদান দেখিয়া যদি বিশ্বাস স্থাপিত হও, তবে ধন-প্রাণ-পুত্রাদি অপেক্ষাও সত্য যাহার নিকট প্রিয় ও মূল্যবান, লোকহিতার্থ তাঁহার সত্য-বিসর্জন ও নেকালিঙ্গন দেখিয়া কেন যে অধোবদন হইবে তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেষ্টা এবং যুদ্ধের অমূল্য বর্ত্তিত এই নীতিকে Machiavellian policy বলিয়া ভ্রম হওয়া অজ্ঞ হইলেও,

বিচিত্র নহে। এমন কি স্বয়ং অর্জুনও যুদ্ধের দ্রোণবধ-বিষয়ক আচরণকে রামচন্দ্রের বালিবধের তায় চির-অকীর্তীর বলিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে যে ইহা অকীর্তকর তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তাঁহার এই অকীর্তি-কালিমা জগতের হিতার্থ নীলকণ্ঠের বিষধারণের তায় মহত্বেরই পরিচায়ক। মহাপ্রাণ ব্যক্তি বাচীত অরুণকে লোকরক্ষার নরক-বহুগারূপ তীর হলাহল পান ও কলঙ্ক কালিমা ধারণ করিতে পারেন? দ্রোণবধ না হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফল পৃথিবীর পক্ষে কিরূপ অকল্যাণকর হইত, তাহা চিন্তা করিলে পাঠকবর্গ আমার মতাবলম্বী হইবেন আশা করা যায়। দ্রোণাচার্য্য অস্থানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগরূপ অধর্ম যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং তৎপূর্বে অভিমত্যা-বধ কালেও তিনি সপ্তরথীর অজ্ঞতম হইয়া অত্যাচার যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান যুদ্ধ যদি তিনি নাও করিতেন তথাপি ধর্ম সংস্থাপন পক্ষে তাঁহার বধ অপরিহার্য্য ছিল। এবং বৈধ উপায়ে তাহা করা অসম্ভব বলিয়াই অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল।

দ্রোণবধের তায় ভীষ্ম-কর্ণ-দ্রুপদাদির বধ-কালেও অধিক পরিমাণে অবৈধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণের উপদেশ-ক্রমেই সেরূপ হইয়াছিল। কথা উঠিতে পারে,—কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে কোন তায়-সঙ্গত উপায়ে কি ইহাদের বধ সাধন করিতে পারিতেন না? কোন প্রকৃষ্টতর উপায় কি ছিল না?—না, মনুষ্য-সাধ্য উপায়ান্তর ছিল না। তবে অতি-মানুষ উপায়ে কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র

দ্রোণাদিকে উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও উহা অবৈধ উপায়ই হইত। যে উপায় বিপক্ষের আয়ত্ত নহে, তদবলম্বনে বিপক্ষের পরাভব অবৈধ উপায় মধ্যেই গিয়া। গন্ধর্ব-অসুরাদির মায়াযুদ্ধ এইজন্ত অধর্ম যুদ্ধ। প্রাকৃতই হউক বা অতি প্রাকৃতই হউক অবৈধ উপায় প্রয়োগ ভিন্ন ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিপাত অসম্ভব ছিল। যে অবৈধ উপায়াবলম্বন দেখিয়া আপনি আপত্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অবলম্বিত না হইলে যুদ্ধের যে ফল হইত তাহাতে আপনি আরও অধিক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। “কোন কার্যাই সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে।” পূর্বে উক্ত মহাভারতের সেই উক্তিটি স্মরণ করুন। মনের ভাল লটগাই মানুষকে ভুট্ট হইতে হয়। ষোল আনা শ্রেয়োলাভ তাহার ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। ভুট্ট ব্যক্তির নোবে, বাধা হইয়া নির্লোভ ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে অনিচ্ছাসেই ধর্ম চ্যুত হইতে হয়। ইহাতে তাঁহার দোষ হয় না (অর্থাৎ পাপ অপেক্ষা পুণ্যই অধিক হয়)। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তিতে ইহা পাওয়া যায়। কৌশল ও অধর্ম ঐরূপ স্থলে পর-পীড়নের অন্ত-স্বরূপ নহে, কিন্তু আত্মরক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ অপরিহার্য। বলিয়াই বাধ্য হইয়া একান্ত অপ্রীতিকর কর্তব্যরূপে উহা স্বীকার করিতে হয়। জল দিয়া কাণের জল বাহির করার মত, বিষনাশের জন্ত বিষাস্তর প্রয়োগ করার মত, দেহরক্ষার্থ ব্রণ-ভুট্ট অঙ্গ অন্তপ্রয়োগ করার মত, ঐরূপ ধর্ম-সঙ্কট স্থলে ধর্মকে ক্রিয়াক্ষণের জন্ত আঘাত করিয়াই তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। অধর্মই সে

স্থলে ধর্ম, অধর্মই সে স্থলে ধর্ম। অধর্মই সেস্থলে ধর্ম অর্থাৎ মোটের উপর ধর্ম। ধর্মার্থে আচরিত ঐ পাপ পাপই থাকিবে। এক নিষ্কাম ধর্ম ব্যতীত তাহা একেবারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই (বলা বাহুল্য যুধিষ্ঠির নিষ্কাম ছিলেন না)। সে পাপের ভোগ ভুগিতেই হইবে। একজনকে সেই বিষ পান করিতেই হইবে। তাই মহাদেবের প্রয়োজন। মহাপ্রাণ ব্যক্তি ঐ পাপের বোকা মাথা লইয়া জগতের উদ্ধার সাধন করুন, পরার্থে আত্ম-শ্রেক্ষারূপ স্বার্থ বিসর্জন দিয়া নরক-যন্ত্রণা স্বীকার করুন, একা একা স্বর্গে না যাইয়া আর সকলকে সঙ্গে লইতে চেষ্টা করুন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, ইহাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অন্ততম শিক্ষা। তপোবনে চরিত্র, বর-প্রভাবে অবধ্য বা অপরাধের আত্মর শক্তি যখন বল নর্পক হইয়া স্বায় ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা ধর্মের মানি ও অধর্মের প্রবর্তন করিয়া জগতের উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ করিতে থাকে, তখন কৌশলাবলম্বন পূর্বক উহার ধ্বংস-সাধন কর্তব্য কি না এই জটিল ধর্ম-সমস্যার সমাধান পুরাকালে দেবাত্মর-সংগ্রামে একবার হইয়াছিল। কালর প্রারম্ভ লোকশিক্ষার্থ কুরুক্ষেত্র-প্রাপ্তরে পুনরায় সেই চরিত্র সমস্যারই সমাধান হইল। ধর্মস্থাপন ও লোকরক্ষার্থ ক্ষণিক অধ্যাত্মশ্রম নিষ্ঠাতাই অপরিহার্য হইলে, তদবলম্বন পুণ্যক ধর্মের উদ্ধার সাধন করিয়া তৎপর পাপের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত কর। যুদ্ধান্তে নির্দগ্ন-হৃদয় যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্যাসদেবের উপদেশক্রমে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মনোনিবেশ দানের অনুষ্ঠান এবং

তৎপর প্রজারঞ্জন ও রাজ্যের শ্রীরুদ্ভি-সাধনাদি
সমসুষ্ঠান দ্বারাও তাঁহার পাপের খণ্ডন হয়
নাই ; অবশেষে নরক-ভোগ দ্বারা প্রারম্ভিত
সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। অর্জুনকে
মণিপুরে স্বীয় পুত্র বক্রবাহন কর্তৃক পরাজিত
ও নিহত হইয়া শিখণ্ডী সাহায্যে ভীষ্মবধ
জনিত মহাপাপের প্রারম্ভিত করিতে হইয়া-
ছিল। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সতীর অভি-
সম্পাত-গ্রহণজ্বলে নারায়ণের মর্যাদাই রক্ষা
করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির যে প্রধানতঃ পর-বিইত্বগণা
প্রেরিত হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং কৃষ্ণের
ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইয়া-
ছিলেন, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ
হইবে না। অধিকন্তু তাঁহার মত ধর্মপরায়ণ
মহাত্মাদিগের স্বার্থ ও পরার্থ পৃথক্ নহে।
স্বার্থকে তাঁহার পরার্থ-সাধনের উপায় মাত্র
মনে করেন। তাঁহাদের অর্থ-সংগ্রহ মেঘের
বারি-সংগহের ন্যায় একমাত্র জগতের
হিতার্থই হইয়া থাকে।

অতএব ভীষ্ম-দ্রোণাদির বধ-বিষয়ক
প্রচলিত মতগুলি যদি ঐতিহাসিক সত্যও
হয়, তথাপি উহারা বস্তুতঃ কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদির
চরিত্রে কলঙ্ক নহে, আমার এইরূপ ধারণা।
আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে
চেষ্টা করিলাম, ইহার বিচার-ভার এখন
সহস্র বিধমণ্ডলীর উপর। কৃষ্ণের ধর্মমতকে
ঠিক আধুনিক হিতবাদ বলিয়া বোধ হয় না।
তাঁহার ধর্মভবে আপাতবিরোধী হিতবাদ ও
নিত্যস্ববাদের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া বোধ
হয়। প্রবক্তার এ বিষয়ের আলোচনা
করিবার ইচ্ছা থাকিল।

হৃদ্ধগণের বিনাশ দ্বারা ধরার পাপভার
হরণ এবং সাধু-পরিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম-সংস্থাপনের
জন্যই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ; আবার কুরুক্ষেত্র-
যুদ্ধের ফলেই নারায়ণের মর্যাদা-রক্ষার্থ প্রভাসের
তীরে কৃষ্ণের আত্মবংশ-নাশ, বাধ হস্তে
আত্ম-জীবন-বিসর্জন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পির-
তন্ত্রের নিরস-গমন। অতএব বলা যাইতে
পারে যে, অমর-গ্রাস হইতে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ
ধর্ম-সংস্থাপন দ্বারা বিশ্বমানবের পরিভ্রাণার্থ,
শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-বলিদান ও তন্ত্র-বলিদান করিয়া
নারায়ণের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু কর্তৃক আরম্ভ
কার্যের অগ্রসর-সাধনই আমার অভিপ্রেত।
“বঙ্গের নরনারায়ণের যিনি শাপভ্রষ্ট দেবতা”
রূপে মহৎকার্য-সাধনার্থ আসিয়াছিলেন,
বাল্যকালে আমোদের গোতে বাঁহার গ্রন্থ-
মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুণ্যচরিত্রের পাবনী
শক্তি অনুভব করিতে করিতে ভক্তি-বিশ্ব-
পূর্ণ হৃদয়ে গ্রন্থ শেষ করিয়া উঠিতাম, যে
বিশাল-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ স্বাধীন চিন্তাপ্রভাব
কুহকময়ী পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহশাশ ছিল
করিয়া বিভ্রান্ত দেশবাসীর উদ্ধারার্থ তাহাদের
সুপ্ত আত্মানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন ;
ইয়ুরোপীয়েরা বাহা জানে না এমন সত্যও
জগতে আছে,—ইয়ুরোপীয়েরা এ পর্য্যন্ত বাহা
জানিতে পারে নাই এমন তত্ত্বও ঋষিদিগের
জানা ছিল—এই মহতী শিক্ষা সর্বপ্রথম
বাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়া নূতন জীবন লাভ
করিয়াছিলাম ;—আজ আমি তাঁহারই অঙ্গ
অঙ্গনিক্রমে করিতে উদ্যত হইয়াছি, কেহ যেন
এরূপ মনে না করেন। কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতি
প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃই মহাত্ম্যতের কতকগুলি

অংশকে প্রাকৃষ্ট ও অমৌলিক বলিয়া আচার্য্যাদেবের মনে সন্দেহ হয়। পরে তিনি চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা তাঁহার সন্দেহের সমর্থন-কল্পে কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাহ্য বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই, যাহা কৃষ্ণ-চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া তাঁহার ধারণা, তাহার প্রতিকূল যুক্তিও স্বভাবতঃ তাঁহার মনে উপস্থিত হইয়াছে। সেই যুক্তিগুলি পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য মনে করি। আমার অবলম্বিত শ্রাণী কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার বিভিন্নতা কিছুমাত্র নাই। তাঁহার ভ্রায় এ ক্ষুদ্র লেখকেরও উদ্দেশ্য কৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক-মোচন ও মহাত্মা প্রচার। তবে একটু ভিন্ন পথে আমি সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছি মাত্র।

বন্ধিম বাবু অতি প্রকৃতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তবে অশ্রু কারণে তিনি মহাভারতের অনৈসর্গিক ঘটনাপূর্ণ অংশগুলিকে প্রাকৃষ্ট

মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির পর এবং কিয়ৎকাল পূর্বে জ্ঞান-পিপাসু খিওদাক্ষি সম্প্রদায়ের অজস্র অনু-সন্ধান এবং লণ্ডনের “Society For Psycical Researches” প্রভৃতি সমিতি ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফলে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জগতের অনেক অজ্ঞাত ও লুপ্তপ্রায় তথ্য মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর হইয়াছে। আচার্য্যাদেব তৎ সমুদয়ের সাহায্য পান নাই, বিশেষতঃ তত্ত্ববিদ্যার প্রতি তিনি কিছু বীতশ্রদ্ধও ছিলেন। নচেৎ তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সম্ভবতঃ আরও পরিপূর্ণিত আকার ধারণ করত। এখন তাঁহার আত্মা পূর্ণজ্ঞানের পরিণামী দেহ মনের নিগড়ঃস্রোতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। পূর্বে তাঁহার নিকট বাহ্য জটিল, অসম্পূর্ণ ও অবোধ-গম্য ছিল, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি—

“জন্মান্তর নব প্রাতে, সে হয় ত আপনাতে
পেরেছে উত্তর।”

শ্রীপ্রাণনাথ সরকার।

বেদান্ত।

পূর্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বেদান্ত-বাক্য দ্বারা বস্তুার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সুতরাং বেদান্তবাক্য প্রমাণ, এবং তজ্জনিত জ্ঞানের কল যুক্তি। এই দুইটি বিষয়ে একটু বলা কর্তব্য। পূর্বে প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, দ্বারা প্রমাণ অর্থাৎ বস্তুার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রমাণ। যদি

বেদান্তবাক্য দ্বারা বস্তুার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানের সেই বস্তুার্থতা আমরা অনুভব করিতে পারি, তবেই বেদান্তবাক্যকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় প্রথমতঃ বেদান্তবাক্য প্রমাণ কি না? এই বিষয়ের মীমাংসার পূর্বে প্রামাণ্য অর্থাৎ জ্ঞানের প্রমত্তাবধারণ সম্বন্ধে আমাদের

দার্শনিক মতভেদ প্রদর্শন করা বাইতেছে—
প্রমাণত্ব প্রমাণত্বে মতঃ সাংখ্যাঃ সমাপ্রীতাঃ
নৈয়ায়িকা স্তে পরতঃ সৌপ্তাশ্চরমং স্বতঃ ।
প্রথমং পরতঃ প্রাহঃ প্রামাণ্যং, বেদাবাদিনঃ
প্রমাণং স্বতঃ প্রাহঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাং ॥

(সর্বদর্শনসংগ্রহ)

সাংখ্যমতাবলম্বিগণের মতে প্রামাণ্য ও
অপ্রামাণ্য অর্থাৎ জ্ঞানের প্রমাণ ও অপ্রমাণ
উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ, নৈয়ায়িকগণের মতে
উভয়ই প্রমাণান্তরসিদ্ধ। বৌদ্ধ প্রভৃতির
মতে অপ্রামাণ্য (অযথার্থ) স্বতঃসিদ্ধ এবং
প্রামাণ্য (যথার্থ) প্রমাণান্তরসিদ্ধ, বেদ-
বাদিগণের (বৈদান্তিক ও মীমাংসকের)
মতে প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং অপ্রামাণ্য
প্রমাণান্তরসিদ্ধ। যাহারা জ্ঞানের যথার্থতা
অর্থাৎ প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ বলেন, তাহারা
প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞান-কারণের স্বতঃসিদ্ধতা-
বাদী এবং যাহারা তাহা স্বীকার করেন না,
তাহারা প্রামাণ্যের প্রমাণান্তরগ্রাহ্যতা-বাদী।

সাংখ্যমতে, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের
স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং
তাহাদের মতে, সকল জ্ঞানেই, এক সময়ে
প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয় গৃহীত হইতে
পারে, এবং তাহা হইলে কোন জ্ঞানই
প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের প্রমাণান্তর-
সিদ্ধতাবাদী নৈয়ায়িক। তাহাদের মতে
প্রমাণ বা অপ্রামাণ্যের জ্ঞান হওয়া এক
প্রকার অসম্ভাব্য বলিয়াই মনে হয়। কারণ
যে প্রমাণ দ্বারা প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে হইবে,
সে প্রমাণের প্রামাণ্য অথবা প্রমাণসিদ্ধ,
আবার তাহার প্রামাণ্যও অথবা প্রমাণসিদ্ধ,

সুতরাং অনবস্থা-দোষ-প্রযুক্ত কোন জ্ঞানেই
প্রামাণ্য অবধারিত হইতে পারে না।

বৌদ্ধমতে অপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, প্রামাণ্য
প্রমাণান্তরসিদ্ধ। তাহাদের মতেও প্রামাণ্য
অজ্ঞেয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে
প্রমাণ দ্বারা প্রামাণ্য জানিতে হইবে,
সেই প্রমাণের স্বতঃসিদ্ধ অপ্রামাণ্য নিরাস
করিবার জন্য প্রমাণান্তরের অবেষণ করা
আবশ্যক এবং সেই প্রমাণান্তরের স্বাত বিক
অপ্রামাণ্য নিরসনার্থও প্রমাণান্তর ইত্যাদি
রূপে ত্রায়মতোক্ত অনবস্থা-দোষ হইয়া
পড়ে। সেই দোষ হইতে অব্যাহতি
পাওয়ার কোন রূপ সম্ভাবনা নাই।

বৈদান্তিক ও মীমাংসক উভয়েই স্বতঃ-
প্রামাণ্যবাদী। তাহাদের অভিপ্রায় এই
যে, যখনই কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান
হয়, তখনই সেই জ্ঞানকে আমরা যথার্থ
বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। জ্ঞান হওয়া
মাত্রই, তাহাকে অপ্রমাণ মনে হয় না।
জ্ঞানের কারণে কোনরূপ দোষ-সংশয়
আছে, এইরূপ জানিতে পারিলেই, সেই
জ্ঞানের অপ্রামাণ্য অস্বীকৃত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় উক্ত সিদ্ধান্ত অস্বীকারে
বেদান্তবাক্য জ্ঞান জ্ঞানের যথার্থ স্বতঃসিদ্ধ,
সুতরাং বেদান্তবাক্যের প্রামাণ্যও স্বতঃসিদ্ধ।
কারণ, বেদান্তবাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান
উৎপন্ন হওয়া মাত্রই, সেই জ্ঞানের যথার্থতা
নিশ্চয় হইয়া বাইবে। যদি বেদান্তবাক্য
জ্ঞান জ্ঞানের যথার্থতা প্রথমেই অবধারিত
হয়, তবে তৎসম্বন্ধে অযথার্থতা-জ্ঞানের
সম্ভাবনা থাকে না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের
কারণ বেদান্তবাক্য, তাহাতে কোন রূপ

দোষ-সংসর্গ প্রমাণিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানে
অপ্রমাণ্য-বোধের সম্ভাবনা করা যায়
কিন্তু তাহাতে কোন রূপ দোষ-সংসর্গ
প্রমাণসিদ্ধ নহে। কেহ কেহ বলিয়া
দােন যে, বেদ সকল প্রতারক বাক্য,
তাহারা কোন রূপ বার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়
না। কিন্তু এই কথাই অস্বীকার, তাহারা
কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। বৈদান্তিক-
গণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের বার্থতা
স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞান হওয়া মাত্রই তাহাকে
আমরা বার্থ বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এমন
কি, ভ্রম-জ্ঞানকেও প্রথমে আমরা বার্থ
বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। যদি কোন
বক্তির দিক্‌ভ্রম হয়, তবে সে বক্তি ভ্রম
হওয়া মাত্র সেই জ্ঞানকে বার্থ বলিয়াই
মনে করেন। অনন্তর যুক্তি প্রতীতি দ্বারা
উক্ত জ্ঞানের অবার্থতা সাধিত হইয়া থাকে।
সেই রূপ, যিনি বৈদিক জ্ঞানের অবার্থতা
সিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তিনিই তাহার অস্বীকার
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য। অবার্থতা
সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শিত না হওয়া পর্যন্ত
কোনও রূপে তাহাকে মিথ্যা মনা যাইতে
পারে না। বেদপ্রমাণাবাদিগণ বলিতে
পারেন যে, যদি বেদপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয়
ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বার্থ হয়, তাহা হইলে
তৎসম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস না হওয়ার কারণ
কি? ইহার উত্তরে যুক্তব্য এই যে, স্বতঃ-
সিদ্ধ বার্থ জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস না হওয়ার
কারণ,—অতি প্রাচীন অজ্ঞানজ সংস্কার।
যেমন চন্দের স্বাভাবিক আলোক নাই,
সৌরালোকেই ইহা আলোকিত হইতেছে,
ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত, কিন্তু

এই কথা কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিই, বোধ
হয়, স্বীকার করেন না। সেই রূপ যাহারা
জড়জগৎ সত্য, এইরূপ মনে করেন, তাহারা
জড়জগৎ সম্বন্ধে সত্যতা-সংস্কারের অসারতা
প্রতিপাদন না হওয়া পর্যন্ত, কোন ক্রমেই
অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের স্বাভাবিক সত্যতা,
স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাহা-
কার শব্দ জড়জগতের মিথ্যাত্ব সংস্থাপনের
জন্তু নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।
তৎপ্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা জড়জগতের মিথ্যাত্ব
স্থাপিত হইলে, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের সত্যতার
প্রতি অসম্বন্ধ বিশ্বাস অংশই উৎপন্ন হইবে।
বাহার রজুতে চান্দ্রব সর্পভ্রম হইয়াছে, সে
ব্যক্তি “ইহা রজু, সর্প নহে” এত বাক্যের
উপর কখনও যুক্তি ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন
করিতে পারে না। সেই রূপ আমাদের
জড়-গৎ সম্বন্ধে চান্দ্রব দ্বৈতভ্রম থাকায়,
অদ্বৈত বোধে বিশ্বাস স্থাপিত হয়
না। জড়জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে যুক্তি
জামিতে পারিলেই, তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসের
সম্ভাবনা করা যায়। এত বিষয়ে মধুসূদন
সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভেই
লিখিয়াছেন যে “অদ্বৈতসিদ্ধেই বৈতমিথ্যাত্ব
সিদ্ধপূর্বকত্বং প্রথমতঃ অদ্বৈতমিথ্যাত্বং
নিরূপ্যতে”, বৈত (জড়জগৎ)-এর মিথ্যাত্ব
সিদ্ধ হইলেই অদ্বৈত (ব্রহ্ম) এর সিদ্ধি হইয়া
থাকে, অতএব প্রথমে বৈতবর্ণের (জড়-
জগতের) মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যাইতেছে।
জড়জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে গোড়পাদাচাণ্য
বলিয়াছেন যে “আদ্যন্তে চ ব্রহ্মাতি বর্তমানে-
হপি তত্থা। নিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতথা
ইব লক্ষিতাঃ।” বাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ

কালে থাকে না, তাহা বর্তমান কালেও অসং, মিথ্যা। কিন্তু তাহা যুগত্মিক। প্রভৃতির মত মিথ্যা হইলেও মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট অজ্ঞানবশতঃ সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা জড়জগতের মিথ্যাত্ব সাধিত হইলে, বেদান্তবাক্য জ্ঞান জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ যথার্থতার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, এইরূপে উক্ত বিশ্বাস ও একাগ্রতা প্রত্যবে অদ্বৈত ব্রহ্মানুভবের প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষই যুক্তির কারণ। এই সকল বিচার দ্বারা অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধ এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতেছে যে, জ্ঞানের প্রমাহ এবং জ্ঞানকারণের প্রমাণত্ব অবধারণের জন্ত, প্রমাণান্তর প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই; কারণ, প্রমাহ এবং প্রমাণত্ব স্বতঃসিদ্ধ, যেমন জ্ঞান স্বপ্রকাশ, সে জন্ত তাহার অস্তিত্ব-সাধনের জন্ত জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না, সেটরূপ জ্ঞানের স্মার প্রমাহ অবধারণের জন্তও অজ্ঞ জ্ঞানের সাগায়া অপেক্ষা করে না। জ্ঞান স্বয়ংচ নিজকে এবং নিজের প্রমাহকে অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এবং জ্ঞান-কারণের অস্তিত্ব যে প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, সেই প্রমাণই সেই জ্ঞান-কারণের প্রমাণত্ব অবধারণ করিয়া থাকে। যদি জ্ঞানের প্রমাহ স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে তাহার কারণের প্রমাণত্ব অংশই স্বতঃসিদ্ধ হইবে। কারণ, যে জ্ঞান দ্বারা তাহার কারণ অনুমিত হয়, সেই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, সুতরাং তাহার কারণও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত

বলিয়াই গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত। বেদের প্রমাণা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও এস্থলে প্রচুর বিষয়ের অনুরোধে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। এইরূপ বোধ্য-বাক্য জ্ঞান জ্ঞানের ফল মুক্তি, এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

মুক্তি শব্দের অর্থ, বন্ধন-নিবৃত্তি। বন্ধন দুঃখের কারণ, ইহা সর্ববাদি-সিদ্ধ। এই অবস্থায় বন্ধনের কারণ কি? তাহা জানিতে পারিলে, তাহার নিবৃত্তির কারণ বুঝা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। অতএব অগ্রে বন্ধনের কারণ সম্বন্ধে একটু বিগদভাবে বলা কর্তব্য। আমরা সংসারে দ্বিবিধ বন্ধন অনুভব করিয়া থাকি। শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক বন্ধনের কারণ শৃঙ্খল প্রভৃতি। তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। মানসিক বন্ধনের কারণ অজ্ঞান। তাহা আমরা সাধারণ জ্ঞানে বুঝিতে পারি না, এবং তাহাকে বন্ধন বলিয়াই মনে করি না, বরং বিশেষ ক্রীতির চক্ষেই দেখিয়া থাকি। অজ্ঞান প্রযুক্ত আমরা সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হইতেছি। এবং ঐ সকল বিষয়ে আমাদের সুখের উপকরণ মনে করিতেছি, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুখের কারণ নহে, বরং দুঃখেরই কারণ, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের সংসর্গে আমরা তাগাদের অধীন হইয়া পড়িতেছি। যেমন রজ্জু দ্বারা বদ্ধ পশু প্রভৃতি প্রাণিগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে না, সেরূপ আমরাও অজ্ঞানরূপ রজ্জু দ্বারা সংসার-বন্ধে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে

পারিতেছি না। যে রূপ রজ্জুবদ্ধ প্রাণিগণ বন্ধন কর্তার অধীন, সে রূপ অজ্ঞানবদ্ধ মনুষ্যগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বেদ, স্মৃতি, সদাচার বা যথেষ্টাচারের অধীন। অজ্ঞান অন্ধকারের মত তাহা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া কলিত মিথ্যা। তাবের উৎপাদন করিয়া থাকে। এই পরিদৃষ্টমান সংসারে আমাদের অতিশয় আসক্তি আছে। ইহা পরিত্যাগ করিতে আমাদের কখনও প্রেরণা হয় না। ইহার মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান আমাদের নিকট সংসারের প্রকৃত দোষ আচ্ছাদিত করিয়া মিথ্যা তাবের উদ্ভাবন করিয়া দেয়। আমরা যে সকল বস্তু অহাস্ত ক্রীতিপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, সে সমস্ত প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রিয় হইতে পারে না। বিক্ষুব্ধভাবে কথিত আছে—

“কলত্র মিত্রে পুত্রার্থ গৃহক্ষেত্র ধনাদিষ্টকঃ ।
ক্রিয়তে ন তথা ভুরি স্তুখং পুংসাং যথাহস্তুখং”
স্ত্রী, মিত্রে, পুত্র, ধন, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি যে পরিমাণ অসুখ সম্পাদন করে, সেই পরিমাণ স্তুখ উৎপাদন করে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে পূর্বেকৃত স্তুখোপকরণ দ্বারা নখন আমরা স্তুখ উপভোগ করি, তখনও তাহাদের ভাবী অনিষ্ট-চিন্তা আমাদের কাছে দুঃখ প্রদান করিতে থাকে। কিন্তু আমরা অজ্ঞানের মোহিনী শক্তির বশবর্তী হইয়া, একবারও এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে বা আপাত-মনোহর এই সকল স্তুখোপকরণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। বরং ঐ সকল বিষয়ের নিকটে থাকিতে বা তাহাদিগকে নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি,

এবং যাহাতে তাহাদের পুষ্টি হয়, তজ্জন্ত বস্ত্র করিয়া থাকি; উক্ত বিষয়-সমূহ দুঃখপ্রদ, কিন্তু আমরা তাহাদের আসক্তি ছাড়িতে পারি না, সুতরাং আমরা তাহাদের অধীন। এবং সে অধীনতা প্রযুক্তই আমরা দুঃখ অশ্রব করি। এই অধীনতা দৃঢ়তর বন্ধন, ইহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভই মুক্তি বা মোক্ষ। মুক্তি-লাভের জন্ত বৈদান্তিকের উপদেশ অতিশয় সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের প্রথম উপদেশ আত্মা নিত্য, নির্বিকার, জ্ঞান ও স্তুখ-স্বরূপ; দ্বিতীয় উপদেশ জগৎ মিথ্যা এবং সেই আত্মা অদ্বিতীয়। যদি আমরা প্রথম উপদেশ অনুসারে, আত্মা নিত্য, নির্বিকার জ্ঞান ও স্তুখ-স্বরূপ এইরূপ ধারণা পুনঃপুনঃ আগোচনা ও বৃদ্ধিপ্রভাবে দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলে জন্ম ও মৃত্যুভয়-জনিত কষ্ট আমাদের আক্রমণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় উপদেশানুসারে, জগৎের মিথ্যাত্ব ও আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব অসংকল্পভাবে অবধারণ হইলে, “দুঃখের কোনরূপ কারণ নাই”—এই ধারণাই হইবে। যদি আমরা এই ধারণা সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে এ জগৎের কোন বস্তুই, আমাদের দুঃখদায়ক হইতে পারিবে না। কারণ, যে সকল বস্তু আপাততঃ দুঃখের নিদান, সে সমস্তই মিথ্যা, সুতরাং মিথ্যা পদার্থ দ্বারা কোনরূপ দুঃখ হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন,

“কো মোহঃ কঃ শোক একমহানুগম্ভতঃ ।

বদ্রত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মং তৎ কেন কং পশ্যেৎ ॥
যিনি সকল বস্তুকে এক বলিয়া দেখিতে

পান, তাহার শোকই বা কি মোহই বা কি ? অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তির কোনরূপ শোক বা মোহ হয় না। যখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি সমুদয়ই আত্মস্বরূপে অমুত্বব করিতে থাকেন, তখন তিনি কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিগেন। অর্থাৎ তখন তিনি কাহাকেও নিজ হঠাতে ভিন্ন বলিয়া দেখিতে পান না। তাহার নিকট সেই অবস্থায় সকলই আত্মস্বরূপ, সুতরাং আত্মা স্বয়ং নিজ দুঃখের কারণ হইতে পারে না। আত্মার সহিত অস্ত্র পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানই দুঃখের কারণ, সে সময়ে সর্বত্র আত্মদর্শনপ্রভাবে অস্ত্র সকলই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ঐ সময়ে কোনরূপ দুঃখকারণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। যতক্ষণ রজ্জুতে সর্পভ্রম বর্তমান থাকে, ততক্ষণই ভয়প্রযুক্ত তাহার নিকটে বাইতে সাহস হয় না, কিন্তু সেই ভ্রম বিদূরিত হইলে আর ভয় থাকে না। সেই রূপ বেদান্তবিচার-প্রভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাব জানিতে পারিলে, যখন সংসার-রূপ সর্পভ্রম বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন আর কোনরূপ ভয় বা দুঃখ থাকে না এবং থাকিতেও পারে না।

মুক্তি সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে বহুবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(১) নাস্তিক মত—এই মতে অপরাধীনতা বা স্বাধীনতাই মুক্তি। কোন কোন নাস্তিক মতকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন। এই তাহাদের উক্তি “অপরাধীনতা মুক্তিঃ” “মরণমেবাণবর্গঃ—বাহ স্পত্য সূত্র অপরাধীনতা বা মরণই মুক্তি।

(২) বৌদ্ধমত—তাঁহাদের মধ্যে মাধ্যমিক

মতে, আত্মনাশ মুক্তি এবং বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধমতে, বিষয়-সংস্কার-শূন্য জ্ঞানই মুক্তি নামে অভিহিত।

“মহোদয়ো নাম স বাসনাসমুচ্ছেদো জ্ঞানো পরম ইত্যোকে”। “নিখিল বাসনোচ্ছেদে বিগতবিষয়াকারোপপ্লব-বিশুদ্ধ-জ্ঞানোদয়ো মহোদয় ইত্যপরে” প্রশস্ত পাদভাষ্য। “রাগাদি-জ্ঞান সন্তান বাসনোচ্ছেদ সম্ভবাচতুর্গামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীৰ্ত্তিতা (বিবেকবিলাস)

সংস্কার বিনাশ হইলে জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এই নিবৃত্তিই কোন কোন বৌদ্ধমতে মুক্তি। কাহারও মতে সংস্কার বিনষ্ট হইলে বিষয়-সংস্কার বা বিষয়াকার-রহিত বিমল জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, তাহাদের মতে সেই বিমল জ্ঞানই মুক্তি। বৌদ্ধমতে মুক্তির অপর নাম মহোদয়।

(৩) জৈন মত—তাহার মতে জ্ঞানজ সংস্কার ও কণ্ঠের নিবৃত্তি হইলে আত্মার উর্দ্ধদেশে অবস্থিতির নাম মুক্তি। কোন কোন জৈন মোক্ষাবস্থায় আত্মার সুখ স্বীকার করেন।

(৪) রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ মত—ইহারা উভয়ই বৈষ্ণব, ইহাদের মতে বিষ্ণুর সহিত এক লোকে অবস্থানই মুক্তি, মুক্ত ব্যক্তি তৎসময়ে অগৎ সৃষ্টি বাতীত সকল বিষয়েই বিষ্ণুর মত ক্রমতা লাভ করিয়া থাকেন।

আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সৰ্ব্বজ্ঞানাদয়ো গুণাঃ এবং গুণাঃ সমানঃ স্যুমুক্তানামৌষরস্ত চ। সৰ্ব্ব-কৰ্ত্তৃষমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে ॥ (পাঞ্চরাত্র রহস্য) মুক্ত পুরুষের সৰ্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণ

সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বর ও মুক্ত পুরুষের সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ সমান হইলেও একমাত্র সর্ব কর্তৃত্ব ঈশ্বরেই থাকে। মুক্ত পুরুষে তাহা থাকে না। ঐ সময়ে মুক্ত ব্যক্তির অবিনাশী সুখ হয় এবং মুক্ত ব্যক্তি সে সময়েও বিষ্ময় সেবা করিতে থাকেন।

(৫) মাহেশ্বর মত—ইহাদের মতে মহেশ্বরের নিকটে অদ্বিতিত্বই মুক্তি। এই মতে মুক্তাবস্থায় কোনরূপ দুঃখ থাকে না। এবং মুক্তাত্মা ঈশ্বরের কোনরূপ সেবা করেন না।

“মুক্তাত্মানোহপি হি শিবাঃ কঠৈষ্ঠে তৎপ্রসাদতো মুক্তাঃ। সোহনাদি মুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমস্ততমুঃ”। (ভবপ্রকাশ)

সকল মুক্তাত্মাই শিব, কিন্তু তাহারা সেই শিবের (ঈশ্বরের) অগ্রগৃহে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি (শিব) অনাদি মুক্ত এবং পঞ্চমস্তময় শরীরধারী, অর্থাৎ তাহার প্রাকৃতিক শরীর নাই।

মাহেশ্বরদিগের মধ্যে চারি মত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে (১) নকুলীশ পাণ্ডপত, (২) শৈব, (৩) প্রত্যভিজ্ঞা এবং (৪) রসেশ্বর মত। ১ম ও ২য় মাহেশ্বর মতে মুক্তাত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এবং মুক্ত পুরুষ প্রাকৃত শরীরধারী নহেন। তৃতীয় মাহেশ্বর—ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবাদী—তাহার মতে মুক্ত পুরুষ ও ঈশ্বরের তাদাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের “সোহং” আমিহ সেই ঈশ্বর, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জীব ও ঈশ্বরের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আগমাধিকারে উক্ত হইয়াছে—

“তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোক পদ্ধতিঃ প্রকাশক্যাত্তদেবং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতিঃ।”

ঈশ্বর এক এবং স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, আমরা যে সকল লৌকিক জ্ঞান অশুভব করিয়া থাকি, সে সকল ঈশ্বররূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। বিষয়াংশ পরিত্যাগ করিলে সকল জ্ঞানই স্বপ্রকাশ রূপে পরিস্ফুট হয়, অতএব সর্বজীব সাধারণ, সেই প্রমাতা এক; ইহাই স্থিরীকৃত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। প্রত্যভিজ্ঞ-দর্শনের মতে মুক্তাত্মা—সকল ঈশ্বর-ভাবাপন্ন হন এবং তাহারাজাগতিক সকল পদার্থকে নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তত্ত্বার্থসংগ্রহে কথিত আছে যে—

“মেয়ং সাধারণঃ মুক্তঃ স্বাত্মাভেদেন মততে মহেশ্বরো যথা বদ্ধঃ পুনরত্যস্তভেদবৎ।”

যে রূপ মহেশ্বর জগতের সমুদয় প্রেময়কে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন, সেইরূপ মুক্তাত্মাও জগতের সকল প্রেময়কে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু বদ্ধ পুরুষগণ সে রূপ মনে করেন না, তাহার সকলকে ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এই প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ বিদেহ (দেহহরিত) মুক্তি স্বীকার করেন।

চতুর্থ মাহেশ্বর মত, তাহা রসেশ্বরদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা মুক্তি সময়ে আত্মার শরীর স্বীকার করেন। তাহার কারণ যেন, মুক্তি সময়ে জীবের ঈশ্বর-ভাব হয়, কিন্তু শরীর না থাকিলে সে ভাব অশুভব করা যাইতে পারে না। সে জন্য মুক্তিসময়েও শরীর স্বীকার করা কর্তব্য। ইহারা বিদেহ (দেহশূন্য) মুক্তি স্বীকার করেন না। মাত্র জীবমুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। জীবমুক্তি সময়ে জীবের ঈশ্বর-ভাব অশুভবের অন্ত, যে

শরীর থাকে, তাহা অবিনশ্বর ‘আয়ুর্বেদোক্ত’ সংশোধিত পারদাদি দ্বারা শরীরের অক্ষয়ই সম্পাদিত হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের শরীর থাকা সম্বন্ধে রসার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে—

“বড়দর্শনেহপি মুক্তিস্ত দর্শিতা পিওপাতনে
করামলকবৎ সাপি পত্যাক্ষেনোপলভ্যতে ।
তস্মাৎ তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ ॥”

বৈশেষিকাদি বড়দর্শনে শরীরপাতের পরে মুক্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ মুক্তি, হস্ত-হিত আমলক ফলের মত প্রত্যাক্ষভাবে অনুভূত হইতে পারে না। অতএব প্রত্যাক্ষভাবে সেই মুক্তির অনুভব করার জন্ত, পারদরূপ রসায়ন দ্বারা শরীরের রক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক মত—ইঁহাদের মতে দুঃখের আত্যাত্মিক নিবৃত্তির নাম মুক্তি। দুঃখের যেরূপ নিবৃত্তি হইলে আর কখনও কোনরূপ দুঃখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ দুঃখ নিবৃত্তিকে আত্যাত্মিক দুঃখনিবৃত্তি বলা যায়। এই উভয় মতেই বিদেহ মুক্তি সময়ে আত্মার জড়তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইঁহারা জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি উভয়ই স্বীকার করেন। কিন্তু জীবমুক্তি অবস্থায় যে শরীর থাকে, তাহার বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৭) সাংখ্য মত—ইঁহাদের মতে দুঃখের আত্যাত্মিক নিবৃত্তিই মুক্তি। ইঁহারা জীবমুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু বিদেহ-মুক্তি সময়ে আত্মার জড়তা স্বীকার করেন না। তখনও আত্মার জ্ঞানরূপতাই স্বীকার করেন।

(৮) পাঁচতন্ত্র মত—এই মতে নির্দিকার ভাবে, জ্ঞানরূপে আত্মার অবস্থানই মুক্তি। “মুক্তির্হিত্যজ্ঞাণা ভাবঃ স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ” প্রকৃতিসংযোগ জন্ত বিকার ভাব পরিহার পূর্বক জ্ঞানস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

(৯) মীমাংসক মত—এই মতে অবিনশ্বর সুখভোগই মুক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইঁহাদের মতে বাগ প্রভৃতিই মুক্তির কারণ, আত্মজ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ যেমন মুক্তি সময়ে আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করেন, ইঁহারা সেরূপ বলেন না। তাঁহাদের মতে মুক্তি সময়েও জগতের অস্তিত্ব থাকে, এবং মুক্তি সময়ে আত্মা, যে সুখ উপভোগ করেন, সে সুখ আত্মা হইতে ভিন্ন, বেদান্তাদ্বৈতবাদী-মুসারে সেই সুখ আত্মস্বরূপ।

(১০) অদ্বৈতবাদী বেদান্ত ও পাণিনি মত—ইঁহারা বলেন ব্রহ্মানন্দ লাভ এবং দুঃখ-নিবৃত্তি, উভয়ই মুক্তি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে “ব্রহ্মবিদুঃ ক্লেশং ত্যজতি,” “তরতি শোক-মাগ্নবিৎ” ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মস্বরূপ হন। আত্মজ্ঞানী শোক অর্থাৎ দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদিগণ আত্মার সং চৈৎ ও আনন্দ-রূপতা স্বীকার করেন। অজ্ঞানের আবরণ প্রযুক্ত সকল সময়ে আনন্দরূপতার অনুভব হয় না। আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, সেই আত্মস্বরূপ সুখ বা ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধ হইতে থাকে। এবং মুক্তি সময়ে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। একমাত্র আত্মাই অদ্বিতীয় ভাবে অবস্থিত থাকেন।

শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ ।

বিহুলা-সঞ্জয়-সংবাদ ।

(মহাভারত হইতে গৃহীত)

বিহুলা ও সঞ্জয় ।

সঞ্জয়—

কেন মা কালিমাময় হেরি ও বদন ?
কুরু কি গো পরাক্রম ? পরাক্রান্ত অস্ত্র
ছত্রভঙ্গ করি বল, দিগেছে আমার
মা গো রণস্থল হ'তে খেদাইয়ে বলে ।
রাধিতে পরাণ মোর, তাজি আশাহীন
নিফল বিরোধ, আসিতে হল মা আজি
পলাইয়ে ; এবে শ্রান্ত দেহ, কুরু হিরা
জুড়াইল প্রীচরণ করিয়ে দর্শন ।
বড় ভাগ্যে মা তোমার, এসেছ বাঁচিয়া ।
জয় পরাক্রম নিত্য সময় প্রাক্ণে ;
কুরু কেন তার লাগি ? জননা আমার,
পেয়েছ আমারে ফিরে এই ভাগ্য গণি !

বিহুলা—

হীন প্রাণে নীচ সম শিখেছি সু বাণী
কুলান্দার ! ভাগ্যে মোর এসেছি সু ফিরে ?
ঢেকে ফেল্ ঢেকে ফেল্ কলঙ্কমাণ্ডিত
কুংসিং বদন তোমার মোর আঁখি হ'তে,
নহে মোর মর্যতেদী নরনের আলা
অতিভীক্স অসহন নারিবি সহিতে ।
রে বর্ষায় ! কেন বহু স্থগিত জীবন ?
অগ্নি ক্ষত্র কুলে তুই, আশী বয় সম
নাহি দংশি অর্য্যতির, কুকুরের প্রাণ
পলা'য়ে আনন্দে এত হয়েছ অধীর ?
হাসে বার শত্রুকুল জয় গর্ব্বোচ্ছাসে
সে কোন্ লজ্জার বদন দেখাতে চার
জগত মাঝারে ? ভুলি নিজ মর্য্যাদার

সে কোন্ লজ্জার গৃহকোণে পশে আসি
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ? তোর কাজে ভাবি মনে
আমি কি ধরেছি তোরে আমার জঠরে ?
বিশিবিড়ম্বনে আসি অন্ধার জন্মিল
সুবর্ণ খণির গর্ভে ? দিল মাধবিকা
কিন্তুকে জনম ? ব্যর্থ আসিল কিরে
কোন্ কিলার নীড়ে ? হায় ! কত ছিল আশা
উজ্জল হবে রে মুখ তব বীৰ্য্যবলে,
বীর-প্রসবিনী ঋগতি আগিবে জগতে,
দ্বিগুণ উজ্জল হবে পিতার গরিমা ।
বড় আশে কুলান্দার !—বীরাদনা আমি,
অঙ্গের শোণিত দানে পানিহু যে তোরে—
হেরিতে কি তোর শুধু অশকীর্তিরশি ?
অর্জিতে জগতমাঝে অতি অসহন
কাপুরুষ-ধাত্রী নাম ? কেন, হায় ! হবে
অকলঙ্ক শিশু মুখে, রে কুলময়, তোর
অর্পিতাম প্রীতিভরে স্তম্ভ পরঃবাহী,
সে ক্ষীর হ'ল না মোর গরলের ধারা ?
তা হ'লে তো আজি এই কলঙ্ক কালিমা
দেখিতে হত না তোমার অনিন্দ্য বদনে ;
অনাব্রাত কুলকলি যেত শুকাইয়া
সৌরভবিহীন প্রাণ লভিবার আশে ।
কোন্ পাপে, হে বিধাতঃ, অভাগীর ভালে
লিখেছিলে এত আলা ? বার মুখ চেয়ে
এত দিন তুচ্ছ প্রাণ রাখিহু এ ভবে
সর্ব্বস্ব হারিয়ে মোর—সেই আজি মোরে
জীবনের সাধ হ'তে করিল বঞ্চিত ।

সঞ্জয়—

মা আমার, আমি তব অকণের নিধি,
একমাত্র রত্ন কোলে, একটি প্রদীপ
তব এ আশ্রয় ঘরে, সেই ভাবি মনে
পরাজয়ে রণরঙ্গে না সঁপি জীবন
এসেছি তোমার কাছে, তোমার অঙ্কেতে
লয়েছি আশ্রয় তাই,—কেন দাও গালি ?
কেন তবে চ্যুত করি স্বেচ্ছাক্রোড় হতে
নীরস হৃদয়ে মোরে দিবে কেলি দূরে ?
কোন্ অবলম্ব ল'য়ে রহিতে জগতে
মরণে বরিলে আমি ? হৃদয় তোমার
কোমল মৃণাল সম, মৃত্যু মোর তারে
মৃত মাতঙ্গের বলে পীড়িত, জননী !
কেমনে বাঁচতে তুমি নির্ভুর পেষণে ?
বিহুলা—

আরে মৃত্যু-ভীত ! আপনার হীনপ্রাণ
তবেহে মায়ার পথে করি সঞ্চারিত
মোর দৃষ্ট হৃদে তুমি, লক্ষ্যদ্রষ্ট মোরে
পারবে করিতে ? মেহের দোহাই দিবে
নিজের ক্ষুদ্র চাহ ঢাকিয়া ফেলতে ?
বৃথা সে সাধনা ভব । বৃথা ভাব মনে
স্নেহবশে হ'বে মোর হৃদি বিপ্রকৃত ।
তুই কি বুঝিবি মোর স্নেহের মহিমা—
রে অবোধ, হীনমতি ? ভ্রান্ত হিয়া ল'য়ে
নারিবি বুঝিতে মোর হৃদয়ের প্রথা ।
কুপোদকবাসী ক্ষুদ্র ভেক পারেনা ক'
বুঝিবারে সাগরের বিরাট বিস্তার ।
পারিবি না বুঝিবারে কত স্নেহপ্রীতি
ঘরে মোর হিয়া । কর্তব্যবিবেকহীন
বে অভাগা, তবে সে কি নিজ হৃদিমাঝে
স্নেহের পবিত্ররূপ পায় ধরিবারে ?
মৃত্যুতর দেখাও আদ্যারে ? আজি যদি

সমরপ্রাঙ্গণে বিজয়লক্ষীর কুণা
না পারি লভিতে, ক্ষত্রিয় কুমার তুই,
যক্ষ পাতি ধরিতিস্ সমর-মরণে,—
মৃত্যু হ'ত পরাজিত, লভিতিস তবে
প্রাণ দিবে বিখ্যাত্তে অনর্থক প্রাণে ।
প্রতি অন্ত্রলেখা, হৃদয় সমুদ্র মোর
করিয়া মহন, তুলিত ঘে স্নেহসুখা,
সে সুখা পিন্নায়ে চির অমৃতত্ব ভোগে
করিতাম দান, অনন্ত জীবন তোমার
জীবনবিহীন দেহে হ'ত প্রতিষ্ঠিত ।
এবে তোমার মৃণ্ময় প্রাণ কোন্ লাঞ্জে
দিতে চাস্ মোর পায়ে ? চরণদলিত
পত্র-পুষ্পে চাস্ তুই পুঞ্জিতে দেবতা ?
তুচ্ছ জীবনের তরে ! পত্ন মর্যাদার
অতল সলিল মাঝে দিল ডুবাইয়া,
চির-মৃত্যু আত্মানিলি মরণের তরে ?
জীবনের যে মুহূর্ত অনায়াসে তোমার
অনন্ত মুহূর্ত হ'ত, আজি শুধু তাহা .
অনন্ত অকৌতুক হ'ল সর্বনাশী ।
গেল মান, তুচ্ছ প্রাণ শব সম দেহে
রাখিবি কি আশে ?
সঞ্জয় ।

এত স্নেহ যদি মা হৃদয়ে

এই অভাগার প্রতি, তবে কেন চাহ
ঐক্য মৃত্যুমুখে মোরে প্রেরিতে আগ্রহে ?
বধি মোরে দিবি কারে সে স্নেহের রাশি ?
শুভ্র নথ যদি লয়ে বাঁচিবি কেমনে ?
অভূপ্ত রবে মা তোমার স্বেচ্ছাপ্রাণ মোরে
পিন্নাবার ভীত আশা, যদি বাই চলে
অকালে হারার যোম নবীন জীবন ।

বিহুলা—

কারে তোমার নীচ মুখে ডাক বারে বারে

না বলিয়ে ? আমি তোর নইরে জননী ।
 তোর কদাচারে হুট্ট স্নেহ মোর স্বদে
 হরেছে গরল রাশি, সে বিবের দাহ
 মুভুভীত কাপুরুষ নারিবি সহিতে ।
 অমৃত দেবের ভোগা, দানবের ভালে
 কালকূট । স্নেহ যোর নহে, তোর মত
 কর্তব্যবিমূখ হীন ঘৃণিতের তরে ।
 স্নেহের পেটিকা মাঝে ভেবেছিদ্ বুকি
 পূরে রেখে শিখে ধরি কিরিব অধমে ?
 ফেলে দিব খুলে দূরে মহিমামণ্ডিত
 কিরীট মস্তক হ'তে, বহিতে আদরে
 কুংসিং আরসে শিরে ? সিংহিনী হইয়ে
 বতনে ধরিব বৃকে কেকর শাবক ?
 বজ্রদণ্ড তরঙ্গুলে অজস্র ধারায়
 ঢালিব নিষ্ফল রসে ? ক্ষত্রিয় ললনা
 ছেন হীন স্নেহ লয়ে জনমে না তবে ।
 আজি হ'তে তোর ফুরাল সংসার মাঝে
 জননীর স্নেহ—রহিল বা, মরীচিকা,—
 হস্তর মরুর মাঝে প্রবাসীর প্রাণে
 বিফল তৃষ্ণার শাস্তি আশা-প্রদায়িনী ।
 সঞ্জয়—

হতভাগ্য আমি, হারাব মুহূর্ত্তে কি গো
 সকলি এ তবে ? এর চেয়ে ছিল না কি
 মৃত্যু শ্রেয় : ! মৃত্যুশ্রেয় : ? নব মুকুলিত
 বাসনা কুসুমকলি নিষ্পেষিত করি
 এ নব জীবনে, জীর্ণ মরণ কঙ্কালে
 ছুটে গিয়ে বাঁধিব কি অভেদ্য বন্ধনে ?
 এই তো উঠেছে সবে গগনের ভালে
 সূর্য্যাকর গগে বাঁধি তারকার মালা ;
 প্রদোষে, কি দোষে হার ! এত সূর্যময়ী
 রজনী সূর্য্যে বাবে, দেখা দিবে শুধু ?
 না না বা কোমল হিয়ে কঠিন ক'র না

স্নেহে দিবে অলাঞ্জলি ; বৃত্তচ্যুত করে
 স্নেহের প্রস্থনে তব দ'ল না চরণে ।
 করাল মুরতি ত্যজি মা হ'রে আবার
 মেমে এসে লহ পূজা গ্রী তমাখা মুখে
 অভয়ে ! অতর দ্বিগে রাখ রাত পানে ।
 বিদূলা—

এখনও এখনও, ভ্রান্ত, মৃদু-বিভীষিকা
 ঘুচিল না তব ? এখনও ফিরিতে চাহ
 সংসারের ঘনঘোর বিপিনের মাঝে
 কোন আশে পুত্র যোর ? অমৃত নির্ঝর
 অবহেলি মৃগতৃষ্ণা চাহ ধরিবারে ?
 চাহ যদি যোর স্নেহ, সিংহিনীর শিশু !
 সিংহের বিক্রমে, জরাজর তুচ্ছ করি
 কর আক্রমণ বীরদন্তে শত্রুকূলে ।
 ভীমা ভূজঙ্গিণী হেরি মন্ত্রমুগ্ধ যথা
 গন্ধীকুল পড়ে লুটি, লুটিবে তেমতি
 অরি তোর হেরি তব ভীষণা শক্তি ।
 হার জিন যাও রণে বীরেন্দ্র-বিক্রমে ;
 জন্মিলে এ ক্ষুদ্র দেহ অবশ্য ভাঙ্গিবে,
 তবে কেন এ দেহের অলীক মমতা ?
 আর, যদি হয় প্রাণে হয় বাসনার
 দাস হ'রে অমরত্ব ভুলে মৃত্যুভয়ে
 থাকিস লুকারে গৃহ কোণে, পলে পলে
 শতবার হীনমুহূর্ত্তা মরিবি জীবনে ।
 তুমি যদি নাহি যাও কর্তব্য সাধনে
 রণরঙ্গিণীর বেশে নিজে বাব আমি ।
 ঝলসি চপলা সম আকস্মিক ভেজে
 শত্রু শির : নিতে বাবে কাণ মেঘ মাঝে ;
 নিতে বাবে এ জগতে আশার শব্দীপ
 তোর ভালে । আরে ভ্রান্ত ! বুধা বিধা ভাজি
 চল চল বীরসাজে, আকুল আহ্বানে
 ডাকিছে কর্তব্য তোরে, চল ঘরা করি ।

চল যাই দৌছে বখা দামিনীর সাথে
নির্মম অশনি ছোটো মহা মহীকহে
চূর্ণ দীর্ণ দগ্ধ করি প্রলয় হুকারে ।
মরি যদি কিবা ক্ষতি ? ফিরে যদি আসি
গর্জনাতে বরষিব সহস্র ধারার
স্বাগম বারি রাশি তোর ক্লান্ত হৃদে ।

সঙ্গ—

থাক থাক এ দেউলে দেবতা আমার
বরাতয়-প্রদায়িনি ! প্রচণ্ড শক্তি
করিয়াছ সঞ্চারিত হৃদয়ে জননি !
দাও শিরে পদধূলি, চলিছ এখনি
পশিতে সময়ে ; চূর্ণি অরতির শির,
ফিরে এসে বোণা হস্তে বন্দিব চরণ !

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু ।

তার।

১

চাষার ঘরে এমন সুন্দর মেয়ে কেহ
কখনো দেখে নাই । প্রভাতে সোণার মত
সূর্য্যের আলো যেমন করিয়া কীণ অবকাশ-
পথে নিবিড় বনের ঘনাককার বন্ধের উপর
ক্ষণেকের জন্ত আসিয়া পড়ে, এই স্বর্ণের
জ্যোতিকণা তেমনি করিয়া বুঝি দরিদ্র
হারাধনের অন্ধকার কুটিরে পথ ভুলিয়া
আসিয়াছিল !

হারাধন আদর করিয়া কল্লার নাম
রাখিয়াছিল—তার। তার। নৈশাকাশে
তারারই মত হারাধনের আঁধার ঘরে দিন
রাত্রি ঝক্ ঝক্ করিত ।

হারাধন ও তাহার পত্নী ভবসুন্দরী
গুরুতর কষ্টের মধ্যে যখনই অবকাশ পাইত,
একবার ছুটিয়া আসিয়া তারার কুসুমপেলব
মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া যাইত । তার।
কাদিতে জানিত না । সে যেখানে থাকিত
তাহার আয়তলোচনের নিষ্করশ্মি সেই
খানকেই অমৃতময় করিয়া রাখিত । যে

দেখিত সেই বলিত “মেয়ে বেন সাক্ষাৎ
মা-লক্ষ্মী ।”

কিন্তু হায় “হাদে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীছাড়া ।”
তারার পিতামাতা অমুরক্ত হৃদয়ের পরিপূর্ণ
স্নেহরস দানে তারাকে পরিপুষ্ট করিতে
করিতে এক দিন অন্ধকার নিশীথে
নিঃশেষিত-রস তরুর মত সংসারারণ্য হইতে
উৎপাটিত হইলেন । নিদারুণ বিস্মৃতিকা
ওধুদয়া করিয়া তারাকেই ফেলিয়া গেল ।

তার। তখন নবমবর্ষীয়া বাগিকা । ক্ষুদ্র
মুকুল কুটিবার পূর্বেই হরিত শাখার স্নেহাস্ত-
রাল হারাইল । তারার পিতার কিছু জমি-
জমা ছিল । তারার পিতামাতার মৃত্যু
সংবাদ পাইয়া তারার এক মাসী শোকে
অধীর হইয়া স্বামী-পুত্র সমভিব্যাহারে
গ্রামান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তারার এই বিপদের সময়ে কি তাহার মাসী
স্থির থাকিতে পারেন ? যত দিন ভগ্নী
জীবিত ছিলেন, তত দিন কোন ঝোঁক-ধবর
লওয়ার আশঙ্কক হয় নাই । কিন্তু বাড়ুহীনা

কন্ডার এই দুঃসময়ে কি আর নিশ্চিত থাকি যায়! কিন্তু আমরা সত্য কথা বলিব, এখন আর মাসী ছাড়া তারার আপনার কে আছে? তারার মাসী অপেক্ষা মেসোর সহানুভূতিই কিছু অধিক! নিজের লোক-জন থাকিতে সেই দুখের মেয়ে তারা—দেখা শুনার অভাবে—কষ্ট পাইবে? না, তা কিছুতেই হইতে পারে না। তারার মেসো পুরুষানুক্রমের পুরাতন বাস্তব ভিটা এবং পিতৃপুরুষের কৃত, অধুনা জীর্ণ ভগ্ন খরওলি এবং কাংসা ও যুস্তিকার তৈজস পত্রের মায়া পরিচাগ করিয়া সপরিবারে তারার পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন। মেসো ও মাসী প্রথম প্রথম কয়েক দিনে তারার প্রতি স্নেহ ব্যবহারে, গ্রামবাসীদের সহিত আলাপ-আপ্যায়নে, এবং আশ্রয়িতায় সকলেরই মন অধিকার করিল। তারার একটা গতি হইল ভাবিয়া সকলেই যেন নিশ্চিত হইল। এ দিকে সাধারণের মনের সঙ্গে সঙ্গে তারার মেসো তারার পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তিও অধিকার করিয়া বসিল, ক্রমে মেসো ও মাসীর নিজমূর্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তারা ‘নিজ বাসভূমে পরবাসী’ হইল! ইহাদের সংস্পর্শে বেচারী যেন দিনে দিনে স্পর্শকাতর লজ্জাবতীর মত নিতান্ত লঙ্ঘিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে বসন্তের মুকুল যেন করকাধাতে ভূমিতলে পড়িয়া দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। তারার পেনীবহুল মেসো মহাশয়ের হাঁকডাক এবং তাহার নবাগত ভ্রাতাভগিনীগণের লক্ষ্যবস্ত্র তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তারার দেবতার মত মূর্তি দেখিয়া দেখিয়া, কুংসিং পুষ্ককতার জননী তারার

মাসী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সে অসন্তোষের তীক্ষ্ণকণ্টক তারার কোমল বক্ষকে সর্বদাই বিদ্ধ করিতে লাগিল।

২

তারা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই এই হীন পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিল না। ছেলেরা পাক ও কাদা লইয়া মাতামাতি করিয়া বেড়ায় এবং মেয়েরা কুংসিং ভাষায় পরস্পরকে পালাগালি দেয় ও মারামারি করে, তারা কেমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করে? সে দূর হইতে বড় বড় চক্ষু মেলিয়া এই অসংযত উপদ্রব দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত।

তারার মাসী সর্বদা তাহাকে শাসাইতেন “দেখো, দেখো, এত তেজ থাকবে না।”

তারা এ অনুযোগের হেতু কিছু খুঁজিয়া পাইত না, অনির্দিষ্ট ভয়ে সে শুধু শুকাইয়া যাইত।

সুশীল। তারাকে গ্রামের সকলেই স্নেহ করিতেন, তাহার ম্লান মুখ এবং অশ্রুসিক্ত চক্ষু দেখিয়া অনেকেই তাহাকে আপনার গৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার মাসী মাতা ও মেসো মহাশয়ের ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তারা কিছুই বলিতে পারিত না। শুধু ছল ছল চক্ষে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। কোন দিন বা এক ফোঁটা অশ্রু সেই শান্ত চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া নীরবে গড়াইয়া পড়িত। দেখিয়া সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, কেহ বা রুটে হইয়া বলিতেন “তারার ‘বাপের বিষয় খেয়েই মাহুব, তবু হতভাগা মেয়ে-টাকে একটু বয় করে না।” এ সকল

অপ্রিয় উক্তি কিরূপে তারার মাসীর কর্ণগোচর হইত, সে এক জটিল প্রহেলিকা ।

কিন্তু যে দিন এই সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইত, সে দিন আর তারার লাজনার সীমা থাকিত না—সে দিন গ্রামস্থ সমুদয় জীবিত নরনারীর সঙ্গে তারার স্বর্গগত পিতামাতা পর্য্যন্ত মহাসমারোহে অভিনন্দিত হইতেন । তারার মেশো মহাশয়কে ভগবান তাহার মাংসপেশীর ঠিক বিপরীত অঙ্গুপাতে মস্তিক দান করিয়াছিলেন, প্রিয়তমা পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে এক এক দিন গর্জন করিয়া বলিত “বটে ! এত তেজ ? এক দিনে মেরে ‘গোব্‌ড়েন’ করে দেব না !” এবং সে এত দিন “কথায় যা বলিত তা দেখাইত—কাজে”, কিন্তু তারার মাসী জানিত সে “চাবার মরদের লাঠি খাইলে স্কুুমারী তারার প্রাণহানি ঘটা বিচিত্র নহে । কাজেই কর্ণবীর স্বামীকে বহু কষ্টে সে হস্তচালনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিত ।

৩

কিন্তু কিছু একটা করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল । বৎসর অতীত হইতে না হইতে তারার মাসী একদিন সত্যে শুনিল যে গ্রামের লোকে তারার পিতার বিষয় তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্ত বড়যন্ত্র করিতেছে । তারার মেশো গোবিন্দের একটি অঙ্গুগত ভাগিনেয় ছিল । ভাগিনেয়টি নামে গণেশ এবং রূপে ও গুণে “নরাণাং মাতুলক্রমঃ ।” তাহার ‘জমি-জারত’ ‘বাস-বাগিচা’ কিছু কিছু থাকা সত্ত্বেও, কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি অজন্মা ইত্যাদি কারণে গণেশ ত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহশৃঙ্খল হইয়া

শূণ্য গৃহ পূর্ণ করিতে পারে নাই । তাহার হিঠৈতবী মাতুল ও মাতুলানী তাহারই সঙ্গে তারার শুভ বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন । বংশলোপভয়ে ভীত গণেশ সুন্দরী পাত্রীর লোভে তারার বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল ও মাতুল গোবিন্দ দয়াপরবশে মাত্র কিছু উপস্থিত বৎসরে বৎসরে দিবার বন্দোবস্ত করিল । প্রতিবেশিগণ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া উদ্ভিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তারার মাসী ‘মন্ত্র-শুপ্তি’ ও কুটবুদ্ধির প্রভাবে তাহাদের সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড করিয়া দিলেন ।

আষাঢ়ের শুভ বাসরে তারার সঙ্গে গণেশের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল । আরক্ত চক্ষু স্বামীর যমদূতের মত মূর্ত্তি দেখিয়া তারা সত্যে চক্ষু মুদিল ।

৪

ষাটশ বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে তারা স্বামীগৃহে নীত হইল । সহসা গৃহস্থালীর ভার পাইয়া অশিক্ষিতা তারা বিষম বিপদে পড়িল । তারার পিতামাতা স্নেহময়ী কন্তাকে কোন কাজ করিতে দিতেন না, তারার মাসীও আক্রোশবশতঃ তাহাকে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেন নাই, কাজেই পরীক্ষার দিনে তারা পদে পদে বিপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল । অঙ্গনে গোময়ের প্রলেপ দিতে তারার চাপার মত অঙ্গুলি ফাটিয়া রক্ত পড়ে, আগুন ধরাইতে তাহার বিশাল চক্ষুতে জলের স্রোত বহিয়া যায়, ঘাট হইতে জল আনিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না, তারা কি করিবে ভাবিয়া পায় না ।

সুন্দরী কিশোরী ভাব্যার ছুরবস্থা দেখিয়া গণেশ প্রথম প্রথম তাহাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিত। কিন্তু অধিক দিন সে নিজের সংকল্প রক্ষা করিতে পারিল না—‘মিসিরঞ্জিতদশনা কৃষকগৃহিণীকূলে’র তীব্র পরিহাস-বাণী তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

যে দিন প্রতিবেশিনীগণের বাক্যবাণ শুল্লবুদ্ধি গণেশকে অধিক পরিমাণে বিদ্ধ করিত, সে দিন সে ধৈর্য্য হারাইয়া ছকার করিয়া তারার উদ্দেশে বলিত, সেবা করিবার জন্ত সে তাহাকে গৃহে আনে নাই। কিন্তু তাহাতে ফল বিপরীত হইত, যে দিন তারা স্বামীর নিকট তাড়না সহ করিত সে দিন তাহার ক্রটির পরিমাণ অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইত। উত্তেজিত গণেশ ক্রোধাক্ত হইয়া মনে করিত, তারাকে প্রহারের দ্বারা রীতিমত শিক্ষা দেয়, কিন্তু তাহার সঙ্কল্প ভৃষ্টি এবং কুসুমপেলব শরীর দেখিয়া তাহার মায়া হইত—প্রহার করা ঘটিয়া উঠিত না।

আজ গণেশ নিজগৃহে আহারের একটু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়াছিল, আজ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গণেশ বিশেষ করিয়া তারাকে শাসাইয়া গিয়াছিল, আজ কোন ক্রটি হইলে তারার আর ‘রক্ষা থাকিবে না।’ তারা ভয়ে ভয়ে রক্তনাদি করিতে-ছিল। গণেশ বাহিরের ঘরে বজ্রবাকবদের লইয়া আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিল। রক্তনাদি প্রায় সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছিল, মাংসপাত্র নামাইলেই মোটাঘুটি রক্তনাকার্য্য সমাপ্ত হয়। তারা অত্যন্ত সাবধান হইয়া মাংস

পাত্র নামাইতে গেল। ভাল করিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে সে পাত্রেয় গলদেশ চাপিয়া ধরিল। ধরিয়া নামাইতে যাইবে, এমন সময়ে একটা বৃহৎ কুকুর লক্ষ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। করিবামাত্র চকিত তারার অঙ্গনিবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রক্তনাপাত্র সশব্দে মাটিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তারা ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

শব্দ শুনিয়া ‘খাঁটি’-সেবিত গণেশ ছুটিয়া ভিতরে আসিল। আসিয়া দেখিল তাহার সম্মুখে আহত মাংসখণ্ড চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে এবং তারা পাণ্ডুর মুখে পাষণ-প্রতিমার মত তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। পান-বিহ্বল গণেশ আজ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। এক হস্তে তারার গ্রীবা ধারণ করিয়া “খিড়কির” ঘরের নিকটে লইয়া গিয়া পদাঘাতে তাহাকে বাটির বাহিরে দূরে নিক্ষেপ করিল। বলা বাহুল্য সে রাত্রে বজ্রবর্গের আহারাদির তেমন সুবিধা হইল না। গণেশ আদরে আপ্যায়নে, গল্পে ও গানে, পানে আহারের ক্রটি মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজেই তারার সংবাদ লইবার সে রাত্রে আর তাহার অবকাশ হইল না।

গণেশ তারাকে খিড়কির বাহিরে দিয়া আসিবার পর তারা অনেকক্ষণ “আড়ষ্ট” হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কি মনে করিয়া কতকটা রমণী-সুগভ আশঙ্কা, কতকটা বা সাধারণ ভয়ের তাড়নায় সে বাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে খিড়কি বন্ধ করিয়া দিল। তারা সহজে

ভীক—স্বভাবে বৃহ—লজ্জাবতী লতার মত
সে পরম্পর্শে মুদিয়া আসে। আজিকার
গণেশের এই অমানুষিক ব্যবহারে—পাশব
আচারে—সে ভয়ে ঘুণায় শরমে মরমে
মরিয়া গিয়াছিল, তাহার বকের তিতর
হইতে যেন একটা “কাঁপুনি” উঠিতে লাগিল,
সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, দাওয়ায়
বসিল, বসিয়া বসিয়া ওইয়া পড়িল। তার
পর প্রবল জ্বর, জ্বরের দাহে দেহ জ্বলিতে
লাগিল, পিপাসায় যেন ছাতি ফাটয়া
যাইতেছিল। সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না
পারিয়া তারা অনেক কষ্টে উঠিয়া কলসীর
জল আকর্ষণ পান করিল, কিন্তু তৃষ্ণা কমিল
না; আবার—আবার—কতবার সে জল
খাটল, তবু সেই যেন মরুভূমে বারি বিন্দু!
পীড়া কঠিন হইতে কঠিনতর দাড়াইল।

বেলা প্রায় দশটার সময় গণেশের

নিদ্রান্তর হইল, তখন নেশা ছুটিয়াছে, সহসা
তার তারার কথা মনে পড়িল, ছুটিয়া
খিড়কির পথে বাইতে দাওয়ায় ভূমিশয্যায়
শায়িতা, আলুখানুবেশা তারাকে ছুট ফট
করিতে দেখিল,—তখন সে স্নানজ্যোতিঃ
প্রভাতের তারা নিভ নিভ হইয়াছে,
আকাশের চাঁদ ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি
যাইতেছে, পূজার প্রস্তুতি কুসুম বালকের
নখাবাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কর্দমে
লুটাইতেছে!

অনুতপ্ত গণেশ, তখন তারাকে বুক
করিয়া, গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ন করাইল,
গ্রাম্য চিকিৎসার ক্রট করাইল না, কিন্তু সে
গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত!
হায়!—

“নির্মাণে দীপে কিয়ু তৈলদানম্!”

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ভ্রান্তি।

১

যুদ্ধ শিশু সারা বেলা

পথে পথে করে খেলা,

ধূলা মাটি ছাই পাঁশ কত মাখে গায়

স্নেহময়ী মা'র পানে ফিরিয়া না চায়।

২

সন্ধ্যা যবে আসে ধীরে

অন্ধকারে ধরা ঘিরে

ভীত শিশু খেলা ফেলি গৃহযুগ্মে ধায়

আকুল কাতর কণ্ঠে ডাকে মা কোথায়।

৩

ও মা আমি শিশু তোমার

মায়া-ঘোরে ছিহু ঘোর

সন্ধ্যা দেখি কাঁপে হিয়া ডাকি ‘মা’ ‘মা’ বলে

ঝেঁড়ে দে মা ধূলামাটি তুলে নে মা কোলে।

৪

মাগো! আমি পথভ্রান্ত

বড় ভীত, বড় শ্রান্ত

জননীর বুক ছাড়া কোথা পাব ঠাই?

তুলে নে মা, কোল দে মা, আরামে ঘুমাই।

শ্রীপ্রমোদ গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

শ্রীশ্রী ৭ দুর্গা পূজার বলি ও জীব-বলি—
শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। দুর্গাপূজার
জীব বলির আবশ্যিকতা আছে কি না
তাহারই আলোচনা। কারুণ্যের অবতার
বুদ্ধদেব যে দিন যজ্ঞার্থ বলিদানের বিরুদ্ধে
দণ্ডায়মান হইয়া জগত-সমক্ষে মৈত্রীর আদর্শ
স্থাপন করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে ভারত-
বর্ষে এ বিষয়ে অনেক বাদামুবাদ চলিয়া
আসিতেছে। প্রেমাবতার চৈতন্যদেবও অনেক
পরিমাণে এই নিঃসহায় জীবের রক্তশ্রোত
রুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি ধর্মের
দোহাই দিয়া,—“জীব জননীর পূজাচ্ছলে”
—বলিদান চলিয়া আসিতেছে। আজকাল-
কার এই যুক্তির দিনে গ্রন্থকার শাস্ত্রাদি
হইতে জীব-বলির বিরুদ্ধে যে সকল মতবাদ
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন—
তাহা বিশেষ বিবেচ্য ও আলোচ্য। সমগ্র
গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া করুণ-হৃদয়
গ্রন্থকারের ব্যাকুলতা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ
করিয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হউক
—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দিনচর্য্যা।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল
প্রণীত—মূল্য চারি আনা।

আশ্রম-চতুষ্টয়।—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল
প্রণীত—মূল্য আট আনা।

পাশ্চাত্য-আদর্শের প্রভাবের এই যুগে,
ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশে এই গ্রন্থ দুই-
খানি যেন মাতৃভূমির পবিত্র আবহানের মত
আমাদের সমস্ত হৃদয়কে উদ্বোধিত করি-
য়াছে। মানুষের সমস্ত জীবন-যাপনের
এবং প্রাত্যাহিক কর্তব্যের যে প্রণালী
ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শ তাহাই ভাল, না
মানুষে মানুষে কঠোর প্রতিযোগিতা জীবন-
সংগ্রামের এই নিষ্ঠুরতা, পাশ্চাত্য-আদর্শ
“dying in harness”ই ভাল—তাহা

আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে।
পাশ্চাত্য-আদর্শের প্রবল জোরে আমাদের
দেশের আদর্শ আজ নিমজ্জিত—আমরা
পুরাতন হারাইয়াছি এবং নুতনও আমাদের
‘ধাতের’ সঙ্গে ধাপ ধায় নাই—তাই
শিক্ষা কেবল বহিরাবরণের মত বাহিরেই
আছে—তাহা আমাদের চরিত্র-গঠনের
কোন কাজেই আসিতেছে না—তাই
সঞ্চল কণ্ঠে, সকল উত্তোগে আমাদের এত
বার্ঘতা—এত দৈন্ত। আমরা তাহা শিক্ষা
করিতেছি—কিন্তু আমরা মানুষ হইতেছি
না। এই গভীর সমস্তার দিনে গ্রন্থকার
আমাদের সম্মুখে ভারতবর্ষীয় আদর্শ স্থাপন
করিয়াছেন। যে আদর্শে তিন্দুজাতি কন্য
ও জ্ঞানের সর্বোত্তম ফল লাভ করিয়াছিলেন,
গ্রন্থকার আজ সেই দিকে ফিরিবার জন্ত
আহ্বান করিয়াছেন। আমরা কি করিব?
পরম দুঃখ-দৈন্তের মধ্য দিয়া সর্বকালনিয়ন্তা
আমাদিগের সে সমস্তার মীমাংসা করিবে।

এহ গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে অনেক কথা
বলিবার ছিল - কিন্তু সমালোচনার বৃথা
বাগজাল বিস্তার করিয়া এই গুরু
বিষয়কে লবু করিবার প্রযুক্তি নাই। তাই
সমস্ত দেশবাসিকে এই গ্রন্থ দুইখানি পাঠ
করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি মাত্র।
গ্রন্থকার বলিয়াছেন—“দিন দিন লইয়া মাস,
মাস মাস লইয়া বৎসর, বৎসর বৎসর লইয়া
এই জীবন”—এই হিসাবে “দিনচর্য্যা” ও
“আশ্রম-চতুষ্টয়” অভিন্ন। যিনি প্রতি
দিন সাধুভাবে, স্মরণ ভাবে যাপন
করিবেন—তাঁহার কি ব্রহ্মচর্য্যা, কি গার্হস্থ্য,
কি বাণপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস—সকল আশ্রমই
সুন্দর, শোভন এবং তগবন্ধু হইবে।
কিন্তু এই বিলাসিতার দিনে ভারতের
কঠোর আদর্শ কি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে?

মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন কোহিনুর !



ভেমনি সমস্ত সুবাসিত কেশ তৈলের মধ্যে আমাদের মহাসুগন্ধি “কেশরঞ্জন” সর্বোপরি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ইহা কেশরঞ্জনের আত্মগর্ভ প্রসূত উক্তি নহে। কেশরঞ্জনের গৌরবকারী আমাদের দেশের বড় বড় দেশাধিপতি রাজা, মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির অসংখ্য অবাচিত প্রশংসাপত্র আমাদের বিনামূল্যে বিতরিত কেশরঞ্জন ডায়েরীতে দেখিলেই আপনার ভ্রম ঘুটিবে। কেশরঞ্জনের অনেক গুণ— তাই ইহা সর্বদেশ সর্বজন সমাদৃত। কেশরঞ্জে, বৃদ্ধিকরণে, পোষণে, লাবণ্য সাধনে, ইহা অধিতীয়। সর্ববিধ মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবারণে এবং পিত্তাদি অকোপ জন্ত হস্ত পদাদির আলায় প্রতিকারে ইহা অদ্বুত

শক্তি সম্পন্ন। কেশবৃদ্ধি করিতে, কেশ কৃষ্ণিত কোমল ও সুকৃষ্ণ করিতে ইহার ত্রায় অলৌকিক উপাদান আর দ্বিতীয় নাই। যদি কেশকে বোবনের প্রারম্ভ হইতে নিজের আরম্ভে রাখিতে চান, যদি অকাল বার্কিকোর নিদারুণ মনস্তাপে, আত্মগ্লানিতে মর্শ্মপীড়িত হইতে না চান, তাহা হইলে বোবনের প্রথম বিকাশেই “কেশরঞ্জন” ব্যবহার আরম্ভ করুন। খালি সুগন্ধের জন্ত নহে, খালি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারিতা গুণের জন্ত নহে—মর্শ্মবিধ শিরারোগের “কেশরঞ্জন” অধিতীয় ও মহোপকারী।

একশিশির মূল্য ... ১ এক টাকা। মাগুলাদি ১/০ আনা।
তিনশিশির মূল্য ... ২।০ আড়াই টাকা। মাগুলাদি ২/০ আনা।

সচিব ডাক্তারি-শিক্ষা।

পঞ্চম সংস্করণ।

পন্নীগ্রামে অনেককেই অশিক্ষিত ডাক্তারের হাতে প্রাণ সঁপিতে হয়। এই শোচনীয় দৃষ্টে মর্শ্মহত হইয়াই ডাক্তারি-শিক্ষা প্রণয়নে প্ররম্ব হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যেন এই পুস্তকের সাহায্যে যে কেহ নিজে নিজে ডাক্তারি শিখিতে পারেন। ঈশ্বরের জ্ঞান আমার সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। ডাক্তারি-শিক্ষার পাঁচটি সংস্করণে দশ হাজারটি অশিক্ষিত ডাক্তারের কবল হইতে পন্নীগ্রামী রক্ষা পাইয়াছেন। একটু বাজালা জানা থাকিলেই এই আড়াই হাজার পৃষ্ঠার বইখানি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সেই জন্তই ইহার এত আদর। মূল্য ৫ মূল্য ৪ টায় টাকা মাত্র। ডাকমাতুল ৫০ বাস আনা। হুইথগে জুনার বাধান ৫ পীচ টাকা।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যালিগোমোগ্রাফ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮১৩ ও ১৯ নং নোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা

মুখের সৌরভ ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য মিষ্ক অব রোজ

অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিছুদিন ধরিয়া ইহা নিয়মিতরূপে মুখে ব্যবহার করিলে মুখদুর্গন্ধ ওভ্র, সুকোমল ও মসৃণ হয়; ক্ষতাদিনিত ও ব্রণাদিঘটিত বিকৃত চিহ্ন অন্তহিত হইয়া মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। মহিলাগণের ইহা পরম আদরের সামগ্রী।

মূল্য প্রতি বোতল বার আনা।

গোলাপ দন্তমঞ্জর

বিবিধ দন্ত রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; দাঁত থাকিতে সকলেরই দাঁতের মর্যাদা বোঝা উচিত। দন্তশ্রেণী ওভ্র, স্ফূট, নিরোগ রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে ইহা নিয়মিতরূপে দন্তে ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহার সুকোমল গোলাপগন্ধে মুখের দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ অন্তহিত হইয়া মুখের সৌরভ বৃদ্ধি করে। ইহা বিলাসী বড় আদরের সামগ্রী।

মূল্য প্রতি শিশি ছয় আনা।

তাম্বুলীন

পানে ব্যবহারোপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী। পান সুরস রুচিদায়ক ও মুখপ্রিয় করিতে হইলে তাম্বুলীনের জার মনোরম সামগ্রী আর নাই। বাহারা মিঠা পান ব্যবহার করেন, তাহারা অক্সমসলার পরিবর্তে তাহাতে তাম্বুলীন ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যে পারবেন, ইহার তাম্বুলরজন শক্তি কত অধিক; একবার ব্যবহার করিলে তাম্বুলীনহীন পান ব্যবহার করিতে কখন ইচ্ছা হইবে না। তাম্বুলীন ব্যবহারে মুখে নব-প্রসুতিত স্বরভিত কুসুমের সৌরভ বাহির হয়—ইহা তাম্বুলীনেরই বিশেষত্ব।

মূল্য প্রতি শিশি আট আনা।

প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্য ব্যবহার্য্য।

এইচ বসু,

ম্যাজিস্ট্রেট, পানচিতিসার,

১৯, কলিকাতা, ১৯১৩।

ବହୁଦର୍ଶନ

(ନବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ)

ସାମ୍ବିକ ପତ୍ର



ପ୍ରଥମ

କଲିକାତା,

୧୫ ନଂ ବର୍ମାବେଲ୍‌ସ୍‌ ଟ୍ରଷ୍ଟ,

ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের দেশীয় সাপসা



পারদ ও রক্তদ্রুতির মহৌষধ।

স্বপ্না কবীর সেনে শরীরের দ্রুতি শোষণিত বিশেষিত হয়। চুলকানি, ঘা, ফোড়া, বাতরক্ত, আমবাঁহ ও পারদ জন্ত রক্তদ্রুতি প্রভৃতি কষ্টসাধ্য রোগ শাস্তি প্রদায়ক হয়। এই মহা তৈজস্কর দেশীয় সাপসা সেবনে পুরুষ ও শরীরের কাস্তি বৃদ্ধি হয়। থাকে হার প্রত্যেক মাত্রাই শরীরে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার করে।

মূল্য এক শিশি ১৪০ দেড় টাকা। ভিঃ পিতে লইগে মোট ২/০ আনা।

জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।



বাঁচাদের অল্প পরিচর্যেই মাপা ^{কি ২৩} তির থাকে না, কাজের সময় মাপা গমে হইয়া তুলচুক হয়, তাহা হইলে পক্ষে জবাকুসুম তৈল বিশেষ উপকারী। জবাকুসুম তৈল কেশের অকালোৎকর্ষ ও উষ্ণি বাঁচরা নিবারণ করে। জবাকুসুম তৈলে গন্ধ অতুলনীয়। মহাপ্রজ্ঞা-হিরাজ হইতে সামাজ্য কুটীরশাসী পথান্ত সকলেই জবাকুসুম তৈলের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেশের পৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য মহিলাগণ অতি আনন্দের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন।

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাকমাওলা ১/০ পাঁচ আনা।

বকস্কাই রোগীগণ নিজ নিজ রোগের বিবরণ লিখিলে বিনামূল্যে বাবস্থা প্রেরণ করা হইবে।
তিন শিশির মূল্য ৩৫০ পনের টাকা। ডাক মাওলা দ্র/০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২১ নং কলুটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

কৃষ্ণের চন্দ্র কান্তি !

রূপ এবং মৌলিক্য ও যৌবনের মনোমত্তা সঙ্গী হারি রাখিতে চাহেন ? এই গঙ্গাধর লেপন চর্চায়োগমাত্রই অর্থাৎ ছাদ, চুলকানি, ঘামাচি, ছুশী, মেচেতা, কলাকার চিহ্ন, ব্রণ ইত্যাদি নীচ অংগেয়া করিয়া চর্চের কোমলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। রমণীগণের আদরের সামগ্রী। সূতা ১০ আনা, ডাঃ মাঃ ১০ আনা।

আফিম পরিত্যাগের ঔষধ।

যত অধিকদিনের আফিম সেবনকারী হউন না কেন, বিনা কষ্টে আফিমরূপ কালকূট-বিষ পরিবাগ করিয়া শারীরিক প্রাণিশূন্য হইয়া বেশ ক্ষুধা, সচ্ছন্দতা এবং সতেজতা ও কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে পারেন, অথচ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্র দ্বারা জ্ঞাতবা।

কে, সি, বিশারদ,

৬৭ নম্বরের চিংপুর রোড, কলিকাতা।

মাঘ]

[১০ম সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

দশম বর্ষ।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
সাধিত্য-প্রচার	৪৭৩	বৈশ্ব	৫১১
বরেজ-ভ্রমণ	৪৮৫	বেদান্ত	৫২১
বিলাতের কথা	৪৮২	প্রকৃতি নির্মাণ কি	৫২৪
ভবিষ্যতের ভাবনা	৪২৭	মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির	
বিষয়ক	৪২৭	অভিভাষণের সারাংশ	৫২২

মানবের জ্ঞানকথা

৫৩৪

এস্‌মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

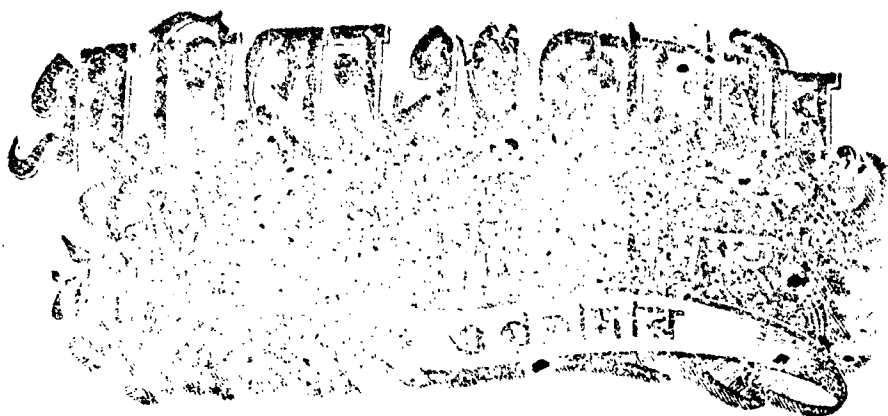
১৯১৭

হিন্দুস্থান সমবায় বিনামূলীতে বিমা ও

এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন

শ্রীউমেশচন্দ্র চাকলাদার, বিশেষ প্রতিনিধি,

হিন্দুস্থান কার্যালয়—মুম্বাই



চুল উঠা ও টাকের মনোম্বন্ধ ।

এই দুইটা রোগের প্রকৃত ঔষধ এতদিন এক-
লাবেই ছিল না। বিজ্ঞাপনে যিনি বাতাই বলুন,
বাবুহাতে সে উপকার করছেন পাহাছেন ; কিন্তু—
“সুরমা টেল” সত্য সত্যই টাকের ও চুল উঠি-
বার অস্বাভাবিক ঔষধ। হস্তির চুল কটা হইলে,
কড়া হইলে, কসমেরে পাকিলে, এবং মাথাগরম
হইলে, স্ফিত্রার অভাব হইলে, সুরমা বাবুহা-
তে যথেষ্ট সফল পাওয়া যায়। যে সকল কিনিম বায়ু
উৎপন্ন করে, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ বাধে এবং চুলের নোষ
নষ্ট করিতে পারে, সেট সমস্ত দিগ্ভিষ্ট এই সুরমা
তৈলের প্রধান উপাদান। সুরমার সঙ্গক অতি
মনোরম। একবার একশিশি ব্যবহার করিলেই,
এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। একশিশির
মূল্য ১০ বার আনা মাত্র। মাস্তানা ১০ সাত
আনা। একত্র তিন শিশির মূল্য ২০ টাকার
মাস্তানা ১০ ছের আনা। ১০ আনার ডাক-
টিকিট পাঠাইলে, একশিশি সুরমার নমুনা এবং
একখানি সুরমা-পঞ্জিকা বিনামূল্যে পাঠিতে পারিবেন।

প্রত্যেক পুস্তকের বড় এক শিশি ১ এক টাকা। মাস্তানা ১০ বার আনা, ছোট ১০ আনা, মাস্তানা
১০ পাঁচ আনা।

স্বদেশ-গৌরব এসেন্স ।

চামেলী।—চামেলীর সৌভ বড় স্নিগ্ধ—বহু
মধুর।
সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চন্দ্রের মতই
পরম পবিত্র ও স্পৃহণীয় পদার্থ।
মল্লিকা।—বেলা-মূল্যবান মল্লিকা চির-
দিনই একসমন অপিকার করে।



চম্পক।—চাঁপার... তীব্রতা
কখন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত
হইয়াছে, তাহা দেখা যায়
কিনিম।

বেলা।—অবসর গ্রীষ্মবেলায়
‘বেলা’র গন্ধ যেন স্বর্গস্থ
আনিয়া দেয়।

কাঁমরী।—যামিনীর জোৎস্না
কাঁমরীর সৌরভে মধুরতা
হইয়া উঠে।

যাবতীর কবিরাজি ঔষধ, টেল, ঘৃত, মোদক, অনণেহ, আসন, অরিষ্ট, মকরজ্বক, মুগনাভি
এবং সকল প্রকার জারিত দাতুদ্রব্য আমরা অতি বিস্তারিতরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট
জলভরণে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অজ্ঞাত দ্রব্য।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসংকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও
পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিস্টস,
১৯২ নং জোয়ার চিংড়ার রোড, কলিকাতা।

পুরাণের বঙ্গদর্শন।

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বর্ষের মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত দুই টাকা।

হিন্দু ধর্ম নীতি।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। মবাদি-স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে সংকলিত। নীতি শিক্ষার এমন পুস্তক আর নাই বলিলেও চলে। মূল্য ১/- স্থলে ১০ (বাঁধাই) ৮০ আনা।

সরল বর্ণ জ্ঞান।

ডাক্তার ব্রজনাথ সাগা প্রণীত। কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয়ঃ সচিত্র পুস্তক। সুন্দর সুন্দর ছবি। মূল্য ৮/-।

লিপি-সংগ্রহ।

সবজ্ঞ বিদ্যোদবিহারী মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। প্রায় শতবর্ষ পূর্বের লিখিত স্মৃতির বাঙ্গালায় উপদেশ পূর্ণ চিঠি পত্র। মূল্য ১৮/-।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিণী।

চক্ৰকলিশোর রায় প্রণীত। গ্রন্থের প্রণেতা প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে একজন। ইহাতে আত্মপুঙ্খিক দুর্গালীলা সরল ও প্রাজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে রক্ষণ, তৎপরে গিরিরাজের ঘরে লিখের বিবাহ প্রভৃতি সহস্র আখ্যান পদ্য ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১/-।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণী রাজ্য।

শ্রীবাস চট্টোপাধ্যায় সংকলিত নূতন রকমের বই। যদি অসীম জ্ঞান স্বন্দর্শী সৃষ্টিকর্তার অপূর্ণ সৃষ্টি কৌশল দেখিরা বিস্মিত ও ভস্মিত হইতে চান; যদি নদী, হ্রদ, অরণ্য ও প্রান্তরবাসী এবং আকাশচরী প্রাণিগণের বিবরণ পাঠে পুলকিত হইতে চান তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১/-।

কাব্যগ্রন্থ।

কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও ৮মোহিতচন্দ্র সেন, এম্, এঃ সম্পাদিত। ত্রয়োদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৯/- নয় টাকা।

গল্পগুচ্ছ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আট পেপারে মুদ্রিত, দুই খণ্ডে সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৫/-।

মুক শিক্ষা।

শ্রীযুক্ত মোতিনৌমামান মজুমদার প্রণীত। মুক বধিরের শিক্ষা এ দেশে নূতন জিনিষ। জন্মবধির হইগেই মুক হয়। এই পুস্তকের সাহায্যে মুক-বধিরকে কথা ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারা যায়। সচিত্র উত্তম বাঁধাই মূল্য ৮/-।

পঞ্চ প্রদীপ।

শ্রীযুক্ত স্বর্ষোদচন্দ্র মজুমদার, বি, এ প্রণীত যুতন গল্পের বই। ঋষিকল্প কাউন্ট টলষ্টয়ের গল্পের অনুকরণে আমাদের দেশের মত করিয়া পল্পগুলি লিখিত। বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য। পুস্তকটির উপযোগ্য। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১৮/-।

পুণ্যের জয়।

শ্রীযুক্ত সুধাক্ষ বাগচি প্রণীত ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত, অভিনব রহস্যময় ডিটেক্টিভ উপজ্ঞাস। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১/-

নববিধান সমাজের বই।

ব্রহ্ম সমাজ প্রথম ২/- দ্বিতীয় ১৮/- আচাৰ্য কেশবচন্দ্র (বিশ্বত জীবন চরিত) ১/- শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম ১১/- গীতা সমগ্র ভাষা ৫/- বেদান্ত সমগ্র (১২ খণ্ড) ৬/- বিবিধ ধর্ম সমাজ (প্রসন্নকুমার সেন কৃত ২/- গুরু নানকের জীবন চরিত ১১/- শাকামুনি চরিত ১১/- উপাখ্যায়ের বক্তৃতা ১/- হৃদিশের বঙ্গানুবাদ, পূর্ব বিভাগ ৪/- উত্তর বিভাগ ২/- কোরাণশরিফের বঙ্গানুবাদ ৪/- মোহাম্মদের বিশ্বত জীবনী ৩/- হাকিমের বঙ্গানুবাদ প্রথমভাগ ১/- তাপসমালা (৬ খণ্ড) ৩/- জীবন-বেদ ১/- মহাপুরুষ চরিত ৮/-।

বিনা পাইনে স্বর্ণের গহনা

যে প্রস্তুত হয় একথা লোকে অগ্রে বিশ্বাস করিতেন না। বাজারের সেকরারা প্রথমতঃ ন্যায্য মজুরি লয়—তদপুরি জঘন্য পাইনে গহনার সর্বনাশ করে এই জন্য মফঃস্বলের ভদ্রলোকে কলিকাতায় গহনা গড়াইতে পশ্চাৎপদ হ'ন। আমরা সেই অসুবিধা দূর করিয়াছি। প্রত্যেক রসিদ পত্রে গহনার গ্যারান্টি লিখিয়া দিয়া থাকি যে, সামান্য তারতম্য দৃষ্ট হইলে আমরা সম্পূর্ণ দায়ী থাকিব। আপনার যদি শুভবিবাহের গহনা গড়াইবার সময় উপস্থিত হয় একবার দয়া করিয়া আমাদের পরীক্ষা করুন। অর্ডারি জিনিষ তিন দিনে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

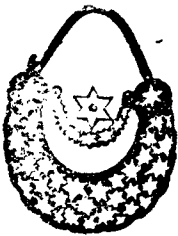


জাপানী মাকড়ী।

ইহা কি, পার্শ্বের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। সম্পূর্ণ নূতন অলঙ্কার। ইহা ইলেকট্রিক মেশিনে পালিশ করা হয় এবং পান আদৌ নাই।

মূল্য প্রতি জোড়া ১৪, হইতে ২২ টাকা।

পারসী মাকড়ী।



যুবতীর কর্ণমূলে ইহা বড়ই শোভা প্রদান করে। রাজকালে ইহার চাকচিক্য বৃদ্ধি হইরক অপেক্ষা অধিক দেখায়। ইহাতে আদৌ ব্যবহারে সয়না ধরে না।

মূল্য প্রতি জোড়া ১৫, হইতে ২৫ টাকা।

আমাদের ফার্মের বিস্তৃত জুয়েলারী ক্যাটালগের জন্য
সস্ত্রর পত্রে লিখুন।

৪০ নং গরাণহাটা, কলিকাতা,

মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স এণ্ড গোল্ডস্মিথ।

হিন্দুস্থান সমবার বিমামণ্ডলী লিমিটেড্ ।

প্রধান কার্যালয়—৩০ নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার (দক্ষিণ), কলিকাতা ।

মধুরী মূলধন—এক কোটি টাকা একশত টাকার একলক্ষ অংশে বিভক্ত ।

প্রত্যেক অংশের জন্ম বার্ষিক মাত্র ৫ টাকা তলব অনুসারে দেয় ।

অংশের ১০ তলব যথাক্রমে শোধ করিলে আর ১৫ বৎসর অন্তে বা পূর্বে মৃত্যু হইলে মৃত্যুর প্রমাণ মাত্র অংশের পরিমাণ টাকা বিমারূপে পাওয়া যায় এজ্ঞত পৃথক পণ দিতে হয় না । অংশও সম্পূর্ণ পাকিয়া যায় । এতদ্ব্যতীত সুলভ পণে এবং বহুবিধ সুবিধাজনক সঠে সকলপ্রকার বিমার কার্য্য করা হয় । জ্বীলোকেও সমান হারে সমান সঠে বিমা করিতে পারেন । বিমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া নাত্র বা বিমাকারীর মৃত্যু হইলে মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া মাত্রই টাকা বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হয় । বিমাকারীর ওয়ারিশ নিঃসহায় জ্বীলোকের নাবালক হইলে মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ ও আইন ঘটিত তর্কের মণ্ডগী স্বয়ং করিয়া থাকেন কখনও পণ চালাইতে অসমর্থ হইলেও মণ্ডগীর খরচ বাদে প্রদত্ত টাকা সুদ সমেত ফেরত পাওয়া যায় । সকল রকম বিনাভেই লাভের অংশ দেওয়া হইয়া থাকে ।

ভূসম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়া দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভ হইতে অল্প সময়ের মধ্যে শতকরা ২৫ টাকা অধিক লাভ পাওয়া গিয়াছে । প্রথম বর্ষে শতকরা ৭ টাকা ডিভিডেণ্ড বন্টন করা হইয়াছিল—দ্বিতীয় বর্ষে শতকরা ৯ টাকা দাঁড়াইয়াছে । প্রথম দুই বৎসরেই ৫০ লক্ষ টাকার অধিক বিমার কার্য্য পাওয়া গিয়াছে । বর্তমান বর্ষে মাসিক ৬৭ লক্ষ টাকার কাজ পাওয়া যাইতেছে ।

সর্বত্র সম্ভ্রান্ত ও দক্ষ এজেন্ট আনুগত্য । এজেন্টগণকে উচ্চতর হারে কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে । তাঁহারা সংগৃহীত কার্য্যের উপর, কার্য্যত্যাগ করিলেও এমন কি পুরুষাত্মকরূপে কমিশন পাঠিয়া থাকেন । স্থানে স্থানে এজেন্ট মনোনয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রধান এজেন্ট আছেন । এজেন্সি প্রার্থিগণ তাঁহাদের কাহারও মন্তব্য সহ আবেদন করিবেন । পত্র লিখিলে নিয়মাবলী ইত্যাদি পাঠান হয় ।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ,
জামদার, কলিকাতা ।

ধনাধিক—

শ্রীযুক্ত ব্রজেনাকশোর রায় চৌধুরী,
জামদার, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ ।

মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য পুস্তক।

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দিনচর্যা

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সাক্তাল প্রণীত।
প্রত্যেক হিন্দুজীবনকে সুন্দর, মহৎ ও
সাধক কবিবার জন্ত ও আদর্শের পথে
পরিচালিত কবিবার জন্ত অত্যাশঙ্ক্যকায়
গ্রন্থ। এক্ষণ গ্রন্থ বাজালা ভাষায় আর নাই।
বিচারপতি সারদা বাবু, কবিগর রবীন্দ্র বাবু
প্রভৃতি দেশমাত্রে ব্যক্তিগণ কর্তৃক ও বহু
পত্রিকায় এক বাক্যে প্রশংসিত। মূল্য
চারি আনা নাই।

আশ্রম চতুষ্টয়।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সাক্তাল প্রণীত।
জীবনের লক্ষ্য কি ও কোন্ আদর্শে
তাহাকে গঠিত করা উচিত, এ গ্রন্থে তাহা
যথাসম্ভব আনোচিত হইয়াছে।

মূল্য ১০ আট আনা।

নিরুপায়ে চিকিৎসক

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
ইহা সুবিধায় ফরাসী কবি মোলিয়ার
রচিত এবং ন উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ অনন্যভাবে
লিখিত। দৌড়ক-উল্কীপন ও মানবচিত্র
প্রদর্শন উপযোগী এই গ্রন্থসমূহ চির প্রসিদ্ধ।
মূল্য ৩০ স্বলে।

দাম্পত্য-চিত্র।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত। যদি
কাল্য কস উপভোগ করিতে চান, যদি অমৃত-
ময়ী বসন্তাষার আপনাকে ডুবাইতে চান
তবে নাট্য কাব্য দাম্পত্য-চিত্র পাঠ করুন।
বিবাহিত যুগ-যুবতীর জন্ত প্রিয়জনকে
উপহার দিবার জন্ত এই অপূর্ণ নাট্যকাব্য
দাম্পত্য-চিত্র। মূল্য ৬০ (বাঁদাট) ১০।

বৌ-কথা-কণ্ড।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত। আমা-
দের বৌ-সমাজের ভ্রংশ দ্রুত দেখিয়া যদি
সাংসদ হইতে চান, দাম্পত্যজগতের বিবিধ
উপত্যক চিত্রের সমালোচনা দেখিয়া
যদি চান তবে এই সরল গদ্য
কাব্য পাঠ করুন। মূল্য ১০/১০।

দলীল।

রাজগোপাল বাম সম্বলিত। রেজেষ্টারী
আপনি সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দখল
এবং ভিন্ন ভিন্ন দলীলের আদর্শ ও তাহাদের
আইন মত সাধারণের বোধগম্য সরল
বাধা। এ প্রত্যেক দলীল সম্বন্ধীয় আইন
মত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়; আইন ও আদা-
লত সংক্রান্ত কার্যে নিত্যপ্রয়োজনীয়
রেজেষ্টারী আইন, চুক্তি আইন, হস্তাক্ষর
করণ আইন, উইল সম্বন্ধীয় আইন ইত্যাদির
ধারা ও তৎসম্বন্ধীয় নজির ইত্যাদি সম্মি-
বেশিত হইয়াছে। বিবরণী ব্যক্তি মাত্রেরই
আবশ্যকীয় গ্রন্থ। ৪২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বাধাই
মূল্য ১১/০।

চাকমা জাতি।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম.এ.ই.আর-
এস প্রণীত, পদার্থবিদ্যার শ্রদ্ধা দাস
বাহাদুর সি, আর. ই কর্তৃক ভূমিকা লিখিত
এই গ্রন্থখান চাকমা নামক পাশ্চাত্য জাতি
বিশেষের অপূর্ণ ব্রহ্মা পূর্ণ জাতীয় চিত্র বা
ইতিহাস। বঙ্গের বিচারপতিগণ, সাহিত্য-
রসিকগণ, কবিগণ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক
বাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮খানা
হাফ্টোন ছবি ও একখানি বঙ্গিন মেনে
সুশোভিত। মূল্য ৩ টাকা।

বঙ্গ-গৌরব।

নব্যভারতের নব্যজ্ঞ প্রবর্তক রাজা রাম-
মোহন রায় ষ্টেজে আরোহণ করিয়া অদ্যাবধি
হে সকল মহাপুরুষ বঙ্গে নবজীবনের
সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাদের উৎকৃষ্ট বৃত্ত
প্রতিকৃতি ও জীবনের সুলিখিত নক্সা।
উপহার কি পুরস্কার দিবার পক্ষে এক্ষণ
সর্বোৎকৃষ্ট উপযুক্ত পুস্তক বঙ্গভাষায় আর
নাই। মূল্য ৪ স্বলে ৩।

মতিচূর।

মিসেস আর, এস, হোসেন প্রণীত প্রবন্ধ
পুস্তক। ইহাতে পিপাসা, জীবাতির অবনতি,
নিরাশ বাজালী, অগৃহীণী প্রভৃতি সাতটি
প্রবন্ধ আছে। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ৬০।

সীলটে চূণা

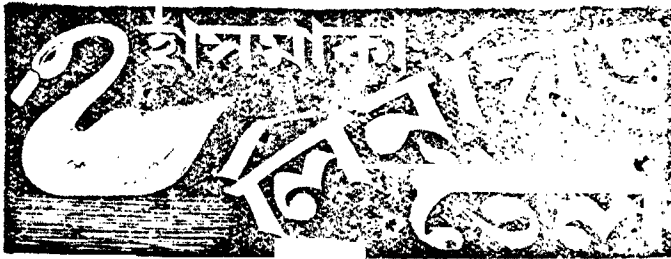
সীলটে চূণে

গাঁথনি এক খণ্ড কঠিন প্রস্তরের মায় পরিণত হয়।

প্রাক্কগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তাবন্দী করিয়া বেগে কিম্বা স্থিতিয়া
বুকা করিয়া পাঠান হয়।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানি,

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।



আপনি কি জানেন ?

হাস মার্ক লিনসিড্ তৈল সকলে এত পছন্দ করে কেন ?

রংয়ের কার্যকে উজ্জ্বল ও কাষ্ঠকে স্থায়ী করিতে

কোন তৈলই ইহার সমতুল্য নহে।

এণ্ড্‌ ইউল এণ্ড কোম্পানি,

৮ নং ব্লাইব রো, কলিকাতা।



যমানি-ট্যাবলেট

Ptychotis-Tablets

আমাদের 'যমানি-জলের' সমস্ত গুণ ইহাতে
বর্তমান আছে। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি রোগে
সুচ ফলপ্রসূ। পেটফাঁপা বুকজ্বালা একমাত্র সেবনে নিবারিত হয়।
মূল্য ২৫ ট্যাবলেট ১/০ পাঁচ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

অগুরু দেবভোগ্য সুগন্ধি



ছোট শিশি ১/০

বড় শিশি ১/০

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন ।

সাহিত্য-প্রচার ।

“জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সংসারে যঃ পরেভ্যো ন বদ্ধতি ।

জ্ঞানরূপী হরিত্তম্ভৈ প্রসন্ন ইব নেকতে ॥”

জ্ঞান অন্তরের বস্ত্র । ভাষা-গৃহীত প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান,—ভাষার সাহায্যেই জ্ঞান জ্ঞাতার নিকটে পরিষ্কৃত ও স্পষ্টীভূত এবং অন্তরের নিকটে প্রতীত হয় । কিন্তু ভাষা স্থানে এবং কালে সীমা-বদ্ধ । এই স্থান এবং কালের কঠোর নিগড় হইতে বিমুক্ত করিয়া ভাষাকে পৃথিবী-পরিচ্ছিন্ন স্থানে এবং অপরিচ্ছিন্ন কালে পরিব্যাপ্ত করিবার যে উপায়, তাহাই সাহিত্য । এই কথাই বালক-বোধ্য সহজ ভাষায় বলা হইয়াছে—

“কথার মুখের শব্দ বাতাসে মিলায়,

লিখিয়া রাখিলে তাহা শতকে না যায় ।”

সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই প্রচারের চেষ্টা দেখা যাইতেছে । ঐতি যখন ঐতি-নিবদ্ধ ছিল, তখনও জন চাইতে জনান্তরে উহা প্রচারিত হইয়াছে, বেদ-প্রচারের জন্তই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল । ঐতি-বৃগের পর লিপি-বৃগ ; তখন হাতে লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করিবার প্রথা ছিল ; তখন এক এক খানি গ্রন্থ সহস্র মুদ্রার বিক্রীত হইত, এক এক খানি গ্রন্থ নকল করিয়া সহস্র সহস্র লেখক পরিবার প্রতিপালন করিত । লিপি-বৃগের পর বর্ত্তমান মুদ্রা-বৃগ ; এই বৃগে মুদ্রা-

যন্ত্রের প্রভাবে গ্রন্থ-বাহুল্য ঘটয়াছে, প্রচারের অত্যধিক সুবিধাবশতঃ প্রয়োজন অপেক্ষা যোগান বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রয়োজনে অপ্ৰয়োজনে কত জনের কত গ্রন্থাগার বিবিধ গ্রন্থে পরিশোভিত হইতেছে । এখন আর প্রচারের জন্ত ভাবনা নাই, ভাবনা কেবল প্রচার-যোগ্য গ্রন্থের জন্ত । তখন আর বাছাই বাচাই করিবার দরকার হইত না, গ্রন্থমাতেই তখন গ্রন্থ-যোগ্য ছিল ; এখন প্রচারের সুবিধার জন্ত মালের এতই আমদানি হইতেছে যে, অনেক সময়ে খাঁটি মাল বাছিয়া লওয়া কঠিন হয় । কিন্তু ইহা সাহিত্য-প্রচারের ব্যবসার মাত্র । প্রচারের প্রয়োজনই বিচার্য, ব্যবসার বিচার্য নহে ; প্রয়োজন উপলব্ধি হইবার অনেক পরে ব্যবসারের সৃষ্টি হয় । আবার ব্যবসার মাটি হইয়া গেলেও প্রয়োজন থাকিতে পারে ।

সর্ব্বদো সাহিত্য-প্রচারের আকাঙ্ক্ষা কেন হইল, এই প্রশ্নের শীর্ষস্থ শ্লোকটি পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় । এ সংসারে জ্ঞান লাভ করিয়া যে ব্যক্তি পরকে তাহা দান না করে, জ্ঞান-স্বরূপ তগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না । ইহাই সাহিত্য-প্রচারের

প্রথম প্রবর্তক, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক। যে সকল তত্ত্বপিপাসু মহর্ষি জ্ঞানানন্দে বিভোর হইরা সাধন-সমুদ্রে ভাসিতেন, অশান্তির আশঙ্কায় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্ঝিল্লাস সত্ববিবর্জক তপোবনে জীবন যাপন করিতেন, লোকের নিন্দা-প্রশংসায় ক্রক্ষেপ-শূন্য হইয়া নিরাবিল নির্ভীক চিত্তে একমাত্র সত্যের সেবা এবং সত্যের প্রচারই পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন, তাঁহারা কেবল জগতের মঙ্গল-সাধন-সংকল্পেই পরিচালিত হইতেন, নিজের কঠোর তপস্যালব্ধ জ্ঞানানুভূত জন-সাধারণের কঠোর নীরস হৃদয়-ক্ষেত্রে সঞ্জন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থব্রত করিতেন। জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্ এই বিষয়টা এই ভাবে যে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, এজন্ত আমি ধন্ত, আর জন-সমাজে ইহার প্রচারই পরম পুণ্য, এই ভাবেই তাঁহারা ভাবিতেন, এই কথাই তাঁহারা বুঝিতেন।

পরম কাকনিক ঋষিদিগের এই পবিত্র জগদ্ব্যঙ্গলভাব হতভাগ্য আমাদের প্রকৃতি হইতে ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেই, আমাদের আদর্শ হইতেও অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশা করি, আমরা এখনও এত দূরে সরিয়া পড়ি নাই, জগদহা এখনও আমাদের কাছে এতটা অধঃপাতিত করেন নাই যে, এখনও আমরা কল্লনা-চক্রে তাহা না বেধিতে পারি, ধ্যান-যোগে সেই ভাব হৃদয়ে না আনিতে পারি। বজ্র-ধূম-পুত, বিহঙ্গ-কুজানন্দিত, শান্তি-রস-সমাপ্ত সেই তপোবনে যখন তাঁহারা লেখনী হস্তে লইয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিতেন,

তখন নিন্দা-প্রশংসার চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না, অমুরাগ-বিরাগের কথা তাঁহাদের মনে উদ্ভিত হইত না, কতি-লাভের গণনা তাঁহাদের হিসাবেও আসিত না। যজ্ঞাঘ্নিতে পবিত্র হব্য অর্পণ করিবার সময়ে যে পুণ্য-পবিত্রতা এবং সদ্ভাব-সম্পত্তি লইয়া তাঁহারা ক্রগ্ধও ধারণ করিতেন, লেখনী-ধারণের সময়েও ঠিক সেই পুণ্য-পবিত্রতা এবং সদ্ভাব-সম্পত্তি তাঁহাদের হৃদয়কে স্পন্দিত করিত। তাঁহারা এক এক জন জীবন-ব্যাপী কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এক একখানি গ্রন্থ লিখিতেন, তাই তাঁহাদের এক একখানি গ্রন্থ এক একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ আশিও বর্তমান থাকিয়া মানবের জ্ঞান-পিপাসা পরিভূণ করিতেছে, সত্যতার এই উৎকট উৎকর্ষের দিনেও মনীষীদিগের বিশ্বয় উৎপাদন করিতেছে। তাঁহাদের লেখার আরম্ভ, স্থিতি এবং পরিণাম, সমস্তই পবিত্রতাময়; তাঁহাদের চিন্তা-প্রবাহ পবিত্রভাবে উদ্ভূত হইয়া পবিত্রভাবেই প্রবাহিত হইত, এবং পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে সেই পবিত্রভাবেই ঢালিয়া দিত। সাহিত্যের সেই স্রবর্ণ-মুগে গ্রন্থ বাছিয়া লইবার প্রয়োজন হইত না; যে বাহা পাঠ করিত, সে তাহাতেই যুগপৎ শিক্ষা এবং আনন্দ পাইত। তাঁহারা কেবল তৃপ্তিই দিতেন না; তাঁহারা পাঠককে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিতেন, এবং চিন্তা করিবার অবসরও দিতেন। তাহার প্রমাণ, আশিও যিনি ঋষিদিগের গ্রন্থ নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, তিনি স্বভাবতঃ চিন্তাশীল হন; ধৈর্য্য, গাভীর্ঘ্য এবং অগাঢ় বিচার-শক্তি

তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার হয়। তিনি গ্রন্থ-পাঠে ঔদারিকতা পরিহার করেন, বোল-অবল-নির্কিচারে আকর্ষণ উদয় পূর্ণ করিয়া অজীর্ণ-রোগও জন্মান না।

অধুনা বাঙ্গালার সাহিত্য-রথীদিগের মধ্যে অনেকেই মহারথী, কেহ কেহ বা ‘সাহিত্য-সম্রাট’ বলিয়া পরিগণিত। এ সমস্তই তাঁহাদের সাহিত্য-সেবার যোগ্য পুরস্কার এবং নিতান্ত গৌরব, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি সাহিত্য-ঋণী হইয়া বাঙ্গালী জাতিকে ধস্ত করিতে পারেন না? তাঁহাদের স্বাভাবিক শক্তি এবং প্রতিভা লইয়া এই পথে চলিলে—আর্থভাবে অমু-প্রাণিত হইয়া তাঁহারা সাহিত্যের জন্ত লেখনী ধারণ করিলে বাঙ্গালী জাতি পবিত্র হইতে পারে, তাঁহারাও কৃতার্থ হইতে পারেন।

সরস্বতী আমাদের দেবতা, স্তূতরাং তাঁহার অর্চনার হিংসা-ষেয-স্বার্থ-বিরহিত অনাবিল পবিত্রতার নিতান্ত প্রয়োজন। সরস্বতীর প্রকৃত অর্চনা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে নহে, কিন্তু নির্মল হৃদয়-জাত বিত্তের চিন্তার স্বতাব-সিদ্ধ অবাধ বিজ্ঞান। দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে গেলে ভক্তের হস্ত যেমন যুগপৎ তর এবং আনন্দতরে কাঁপিতে থাকে, যিনি সাহিত্যের জন্ত লেখনী ধারণ করিলে সেইরূপে এবং সেইভাবে হস্ত-কম্প অমুভব করেন, সাহিত্য-সাম্রাজ্যে তিনিই ঋণ-পদবীতে আরোহণ করিবার যোগ্য। জানি না এমন কেহ আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন কি না, কিন্তু থাকিলেও তিনি আনি-হৃত্যগার চক্রে

অন্তরালে রহিয়াছেন।

সাহিত্য-প্রচারের প্রথম কল্পে যেমন জ্ঞান-বিস্তার উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় কল্পে সেইরূপ যশোবিস্তার উদ্দেশ্য হইল—অনেকে “কবি-যশঃপ্রার্থী” হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। জগতের মঙ্গল-সাধনের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজের যশোবাসনা বস্তুটা নিয়ে, জ্ঞান-গান্ধীর্ঘ্যে এবং গুণ-গরিমায় ঋষিদিগের গ্রন্থ হইতে এই সকল যশঃ-প্রার্থীর গ্রন্থও তত্তটা নিয়ে। যশ ঋষিদিগের কার্যের একটা গৌণফল মাত্র, কিন্তু এই গৌণফলই ইহাদিগের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। ঋষিদিগের ছিল মঙ্গল-সাধন উদ্দেশ্য, জ্ঞান-বিস্তার তাহার উপায়; কবিদিগের হইল যশোলাভ উদ্দেশ্য, পাঠকের চিত্ত-রঞ্জন তাহার উপায়। এই হইতেই সেব্য-সেবকের আসন-বিনিময় হইয়া গেল; ঋষিদিগের সময়ে লেখক সেব্য এবং পাঠক সেবক ছিলেন, এখন হইলেন পাঠক সেব্য এবং লেখক সেবক, স্তূতরাং লেখকের আসন অনেক নিম্নে পড়িয়া গেল। ঋষিদিগের মধ্যে বাঁহারা কবি ছিলেন, তাঁহারা যশঃ-প্রার্থী হইয়া আদর্শকে অবনত করেন নাই, তাঁহারা দুর্বল রোগীর জন্ত তিক্ত ঔষধকে মধুর রসে সিক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। রামায়ণ এবং মহাভারত একাধারে ইতিহাস, ধর্ম-গ্রন্থ এবং কাব্য; কিন্তু ইহারা কাব্য হইলেও যশঃপ্রার্থীর কাব্য নহে।

কেহ কেহ বলেন, প্রকৃত কবি প্রকৃতির কৃত্রিমতা-বর্জিত সরল সন্তান; তিনি নিন্দা-প্রশংসা-নিরপেক্ষ হইয়া কাব্য এবং সজীভূতলে তব-কথাই বলিয়া থাকেন, কে

তুলিল বা না তুলিল, সে দিকে ত্রুক্ষিপ করেন না । ইহা কবির উচ্চ আদর্শ বটে ; কোন কোন কবি যে কোন কোন অতিবিরল মাধেয় সুহৃৎ এই উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে পারেন, তাহাও স্বীকার করি ; কিন্তু এ আদর্শ দৃশ্যমান বাস্তব হইতে অনেক দূরে, অনেক উর্দ্ধে । শুনিয়াছি, ঋষিকল্প পারস্য-কবি সাদি ভাগিনেরের বাড়ীতে বাইতেন, আর একটা গাঁহতলায় সারাদিন বসিয়া চিন্তা করিতেন এবং কবিতা লিখিতেন । তিনি মাটির খাপরায় চক দিয়া কবিতা লিখিয়া খাপরাগুলি ফেলিয়া দিতেন, আর তাহা ফিরিয়া দেখিতেন না । তাঁহার ভাগিনের খাপরা এবং চক যোগাইতেন, আর লেখাগুলি নকল করিয়া রাখিতেন, তাই সাদির রসময়ী কবিতার আজ পারস্যভাবী পাঠক এত পরিতুষ্ট, এত মুগ্ধ । এই কবিতার আবির্ভাব যেমন আশ্চর্য্য, স্বাদও সেইরূপ অলৌকিক ! শুনিয়াছি, একই মজলিসে উপবিষ্ট সংসারী তাঁহার কবিতা শুনিয়া হাসিয়া আটখান ; ভণ্ডাজানী তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল । এক সময়ে এক ব্যক্তি একখানি গ্রন্থ সমুখে লইয়া উপবিষ্ট ছিল ; তাঁহার গওঘর অক্ষ-জলে প্রাণিত, আবার সে মধ্যে মধ্যে হো হো করিয়া হাসিতেছে ; দেখিয়া আর এক জন বলিলেন, “হয় এ ব্যক্তি পাগল হইরাছে, না হয় সাদির কবিতা পড়িতেছে ।” এ সব অতিরঞ্জিত গল্প হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত স্বভাব-কবি পদার্থটা যে কি, তাহা বেশ বুঝা বাইতেছে ।

অধিক দূরের কথা কেন, কিম্বদন্তীর

আশ্রয় লইবার প্রয়োজন কি ? আমরা চক্ষুর সমুখে কি দেখিলাম । বশোহর ঝিকারগাছায় বিরাট জন-সমাগম ; কলিকাতা হইতে আমাদের আদরের জুরেজ-নাথ প্রভৃতি জননায়কগণ আলিয়াছেন, জন-সাধারণকে দুইটা কথা বলিবেন, দেশে প্রজাশক্তির উদ্বোধন করিবেন । কিন্তু তাহাদের কথা বুঝে কে, আর শুনে কে ? মহা গণ্ডগোল উপস্থিত, কাণের কাছে চিংকার করিয়া কথা বলিলেও প্রতিগোচর হয় না । গণ্ডগোলে সমস্ত উদ্যোগ শূন্য হইবার উপক্রম, এমন সময়ে এক মহাপুরুষ সেই বিশাল জন-সভ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া সঙ্গীতের তান ছাড়িলেন, আর অমনি সেই কলরবাকুলিত পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহাকে ঘেরিয়া নিম্নতর পুত্তলিকার তায় দাঁড়াইয়া গেল ! এই মহাপুরুষ কে ? না-হিন্দু, না-মুসলমান, বিখ্যাত লালন ককিরের শিষ্য, একজন দরবেশ, নাম পাগলা কানাই । পাগলা কানাই নিরঙ্কর ছিলেন । তিনি পরের গান শিখিতেন না, নিজের গানও ফিরিয়া গাইতে পারিতেন না ; কিন্তু যতক্ষণ ইচ্ছা পেতে হাত বুলাইতেন, আর মুখে চমৎকার ভাবব্যঞ্জক নূতন নূতন গান গাইয়া বাইতেন । পাগলা কানাই অতীত যুগের হৃর্ত্তে অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি বর্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান-কিরণোদ্ভাসিত দিবালোকেই সশরীরে উপস্থিত ছিলেন । অল্প দেশে জন্মিলে এতদিনে তাঁহার অন্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ভদ্রেশ্বর শিল্প-কলার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিত ; কিন্তু আমরা তাঁহার কি আদর করিয়াছি, তাঁহার প্রতি

কি সম্মান প্রদর্শন করিতেছি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অভীভূতের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেছেন, বর্তমানের তৈলচিত্রাদি দ্বারা সারস্বত-মন্দির সাজাইতেছেন; কিন্তু এই দৈব-শক্তি-সম্পন্ন পাগলা কানাইর একটা গান, একটা কটো, একটুকু জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছেন কি না প্রকাশ নাই। সুদূর ভবিষ্যতে এই মহাপুরুষের নাম উপকথারও বর্তমান থাকার সম্ভাবনা দেখি না।

সাহিত্য-প্রচারের তৃতীয় কল্প ব্যক্তিগত মত-বিস্তার। ধর্ম-প্রচার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক চর্চা, ঐতিহাসিক বিরোধ প্রভৃতি এই কল্পের অন্তর্নিবিষ্ট। স্বগতা, বিরোধ, তর্ক-বিতর্ক, গালাগালি, সাক্ষ্য, প্রমাণ, নজির ইত্যাদি ইহার প্রশালী; সংযোগ-বিরোগ, শত্রুতা-বন্ধুতা, সুখ-দুঃখ, আশ্রয়-আশ্রয়ানি প্রভৃতি মিশ্র বিচিত্র অবস্থা ইহার ফল। এই সাহিত্যের আলোচনার নানা বিষয় জানা যায়, নানা দিকে চক্ষু পড়ে, বিচার-বিতর্কের অভ্যাস এবং প্রবৃত্তি ক্ষেপে, বুদ্ধি-বৃত্তি প্রাথর্য লাভ করে, এবং ভাবার কোটিল্য ও কোশল-জাল পাঠকের হৃদয়ে সংক্রামিত হয়। শিক্ষার মানুষের সরলতা মষ্ট করে বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে, এই শ্রেণীর সাহিত্য তাহার জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী। ফল ভাল হউক আর মন্দ হউক, সমাজের বর্তমান অবস্থার এক্ষণ সাহিত্যের প্রচার অনিবার্য, ইহা দূর করা সম্ভব হইলেও সমাজ তাহাতে রাজি হইতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না।

সাহিত্য-প্রচারের শেষ কল্প—অতি মিকুটে উদ্বেগ—অর্থায়ম। ইহাতে সাহিত্য একটা ব্যবসারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য ব্যবসায় সভ্যসমাজের একটা অপরিহার্য অঙ্গ, উন্নতির নিদান। ব্যবসায় যত দিন ‘সামু’র কার্য ছিল, যত দিন ইহা ‘সামু’-দিনের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, যত দিন ইহাতে অস্ত্রার প্রতিযোগিতা প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই, তত দিন ব্যবসায় অবিমিশ্র সামুভার কার্যই ছিল, তত দিন ইহা দ্বারা সমাজের অবিমিশ্র মঙ্গলই সাধিত হইতেছিল। কিন্তু যে দিন হইতে ইহাতে অস্ত্রার প্রতিযোগিতা প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহাকে পাপে ল্পর্শ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই মিথ্যা বহুধনী সাজিয়া ব্যবসায়কে কলুষিত করিতেছে। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ এই অস্ত্রার প্রতিযোগিতার বিষময় ফল ‘অমৃতব’ করিয়াই ব্যবসায়কে জাতিগত করিয়া-ছিলেন। এই ব্যবহার আচড়াল ব্রাহ্মণ সকলেরই একটা নির্দিষ্ট জীবনোপায় ছিল, এক শ্রেণীর অস্ত্র শ্রেণীর জীবিকাকর্মে পরি-পন্থী হইবার কোন প্রয়োজন বা প্রলোভন ছিল না। এখন আমাদের বর্তমান অবস্থা সেই ব্যবস্থা পদ-দলিত করিতেছে, সেই সুন্দর শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাই সমাজের নানা দিকে নানা বিপ্লবী দেখা যাইতেছে। এখন যে বলবান, সুতরাং প্রতিযোগিতার সমর্থ, সে একটায় উপরে পাঁচটা ব্যবসারে হাত দিতেছে; আর যে অসমর্থ, সে নিজের কৌলিক ব্যবসারে পর্যন্ত নিরবকাশ হইয়া পরিত্যক্ত-পথে অনাচার করিতেছে। হার

হার, দেখিতে দেখিতে কি হইল! একদিন হিন্দুর এই ব্যবহার প্রতি জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, আমরাও কিরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিব; কিন্তু তখন আর সংশোধনের পথ থাকিবে না, তখন দেখিব, আমরা কুপ্ত্রে হইয়া পৈত্রিক সৌভাগ্য ও শাস্তি হইতে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হইরাছি।

বাহা হউক, পুস্তক-বিক্রেতাদিগের হাতে ব্যবসায়ের ভারটা চাপাইয়া গ্রন্থকার-গণ যদি ব্যবসায় হইতে দূরে থাকিতে পারেন, তাহা হইলেও কতক রক্ষা। গ্রন্থ লইয়া হাজার লোক ব্যবসায় করুক, তাহাতে কতি-বৃদ্ধি কি? বাঁহার হাতে সাহিত্যের প্রাণ, সেই গ্রন্থকার যদি আর্থিক লাভ-লোকসান-গণনার দৃকপাত না করিয়া, সাময়িক নিন্দা-প্রশংসার চিন্তাকে মনে স্থান না দিয়া, কেবল জ্ঞান-সত্য-জ্ঞান-ধর্ম-মঙ্গল-পরিজ্ঞতার আদর্শকে ঐক্যতার জ্ঞান মন-চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর ব্যবসারে কি আসে যায়? বৃক্ষ অবৃত্ত ফল প্রসব করে; তাহার কতটা দেব-পুঞ্জার লাগে, কতটা আদাড়ে পড়িয়া পঁচে, কতটা দহা-তব্বরে লইয়া যায়, কতটা লইয়া শিরাল-কুহুরে কামড়া-কামড়ি করে; কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের মাহাত্ম্যের কি লাভব হয়, আর তাহাতে ফলের আদরই বা কোথায় কমিয়া যায়? গ্রন্থকার ঠিক থাকিলে সাহিত্যের রূপনা বটে না, কর্ণধার ঠিক থাকিলে নৌকা ডুবে না।

কিন্তু যে কেহ গ্রন্থ লিখিবেন, তিনিই যে এই আদর্শে চলিবেন, এমন আশা

করিতে পারি না। যদি ইহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে আজ এত আবর্জনা জমিত না। আজ কাল অধিকাংশ পাঠকের কৃতি কোন্ দিকে, সাধারণতঃ ইহার। কি পড়িতে এবং কি শুনিতে ভালবাসে, কোন্ বিষয়ে কি প্রণালীতে একখান বই লিখিলে হু'পরস। আর হটেবে, ইত্যাকার চিন্তা যে গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে বহু গ্রন্থকারের হৃদয়কে আক্লিষ্ট করে, অর্থাৎ বহু গ্রন্থকার যে গ্রন্থ লিখিবার সময়ে কেবল ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন, আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারেই তাহার বখেটে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, মানবের সরল সহজ বুদ্ধি অনেক পরিমাণে তাহাকে রক্ষা করে। প্রবন্ধনা, প্রভারণা, কদাচর্চ এবং কুরুচির সাময়িক প্রাবল্য বতই হউক না কেন, সমাজ তাহাতে চিরদিন ভুলিয়া থাকে না, প্রতিভার প্রেরণা-চর্চায় একবার উদ্ভ্রান্ত হইলেও কিছুকাল পরে আবার চক্ষের ধাঁধা সরিয়া যায়, সমাজ গন্তব্য পথ দেখিতে পায়। কিন্তু এই কদাচর্চ এবং কুরুচি ক্ষুদ্র কণ্ঠধ্বনী হইলেও যে অস্বস্ত! ক্ষুদ্র মংশ-মশকের জ্ঞান ইহার। সমাজের কর-মর্দনে অনবরত বিনষ্ট হইতেছে, যে একবার দেখা দিতেছে, সে আর প্রায় দ্বিতীয়বার দেখা দিবার আশু: পাইতেছে না, তথাপি ইহাদের বিরাম নাই, স্রোতের জ্ঞান অবিরাম ইহাদের উত্তর চলিতেছে। সত্য বটে, যেখানে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে, যেখানে সমালোচনের প্রথম অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, সেখানে ইহার। পাখা পুড়িয়া সরিষার তরে

বার না ; কিন্তু আমাদের সমাজে অন্ধকারের ভাগই যে অধিক, জ্ঞানালোকের পরিসর যে নিতান্ত অল্প, সমালোচনার অগ্নি যে নাই বলিলেই হয় ! অন্ধকারে দংশ-মশকের উৎপাদ-নিবারণের অল্প মানব-বুদ্ধি মশারির উদ্ভাবন করিয়াছে, সমাজকে কুসাহিত্য হইতে বাচাইবার জন্য আমাদের সুধীগণ কি কোন একটা সুস্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন না ?

সমাজ এইরূপ একটা কিছু চায় । জল আসিলে তাহার সঙ্গে মাছও আইসে, এই যেমন বিশ্বাস, শরীরে বার্কক্য আসিলে তাহার সঙ্গে সেইরূপ জ্ঞানও আইসে, এই বিশ্বাসে অনেক সময়ে যুবকেরা ভাল ভাল পুস্তকের একটা তালিকা চাহিয়া থাকে । বলা বাহুল্য, এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা কুলায় না । যুবকেরা যেখানে নিতান্ত না-ছোড় হয়, সেখানে রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া আর কোন গ্রন্থের নাম করা নিরাপদ মনে করি না । যদি আমার সেরূপ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে বাছা বাছা পুস্তকের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের হাতে দিতে পারিতাম । অনেক স্থলে বঙ্গ-সাহিত্যের কোন কোন মহারণীর নাম ও ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিতে তাহাদিগকে উপদেশ দিরাছি, এবং একাধিক তালিকায় যে সকল গ্রন্থের নাম থাকিবে, তাহাই সংগ্রহ করিতে বলিরাছি । যুবকেরা ঐরূপ পত্র লিখিয়াছে কি না, অথবা তাহাদের প্রার্থনা সকল হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই ।

যুবকেরা যে বৃদ্ধের নিকট সদগ্রন্থের

তালিকা চায়, ইহা একটা ততলক্ষণ । ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের, মঙ্গলকর সাহিত্য-পাঠের পিপাসা জন্মিয়াছে ; অথচ তাহারা নিজের বিচার-শক্তিকে বিশ্বাস করে না, বর্তমান ব্যবসায়িক সমালোচনেও নির্ভর করিতে পারে না । কিন্তু এই স্পৃহণীর অবস্থায় জ্ঞান-বৃদ্ধ সমাজ-নাশকগণ তাহাদের সহায়তার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ? অনেক স্থানে, অনেক সমৃদ্ধ পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত, আমাদের উৎসাহী যুবক-দিগের বহু পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে । এই সকল পুস্তকালয় বা পাঠাগার যদি সুব্যবস্থিত হয়, যদি সংগৃহীত পুস্তকগুলি প্রকৃত জ্ঞান-দানে সমর্থ হয়, এবং পল্লীবাসী সকলে বধ্যাযোগ্য ভাবে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাহাতে উপকৃত হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহা হইলে বিনা আড়ম্বরে এবং বিনা বাক্যব্যয়েও যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু উৎসাহ ও অসুষ্ঠানের অসুস্থরূপ সুব্যবস্থা যে সর্বত্র আছে, এমন বোধ হয় না । পল্লীগ্রামে পাঠাগারের সংবাদ পাইলে আনন্দ অসুতব করি, সুযোগ পাইলে ছই একটা দেখিতেও বাই ; কিন্তু বাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সচরাচর সুব্যবস্থার ক্রটিই লক্ষিত হইয়া থাকে । টাকা-দাতৃগণ বীকৃত টাকা দেন না ; বাহারা ভাল পাশা খেলিবার সময় পান, তাহারাও পুস্তক পড়িবার সময় পান না ; কেহ বা পুস্তক পড়িতে লইয়া বাইরা পড়েনও না, কেবলও দেন না ; কেহ পুস্তক কেবল না দিয়াই বলেন দিয়া-

ছেন ; কেহ বা বলেন চুরি হইয়াছে । কেহ পুস্তকখানার হইতেই অধ্যাক্ষকে না জানাইয়া পুস্তকখানি আরও করিয়া কেলেণ, কেহ কেহ বা গোপনে গোপনে পুস্তকের খাতা কাটেন, ছবি সংগ্রহ করেন । পাঠাগারের অতুষ্ঠাভাগিকে ইত্যাকার অসংখ্য অসুবিধা, অসংখ্য হুর্কীব্যবহার সহ করিতে হয় । এত সহ করিয়াও যে সকল অতুষ্ঠাতার উৎসাহ থাকে, তাঁহারা অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র । ঐযথ বধন বরিয়ে, সদগ্রহ পাঠের ফল বধন ফলিবে, পাঠাগারের প্রতি সাধারণের অতুরাগ বধন জন্মিবে, তখন এ সকল অসুবিধা, পাঠকের এগ্নপ হুর্গীতি ও হুর্কীব্যবহার অবশ্যই থাকিবে না । কিন্তু সে স্তম্ভদিন কে আনিবে ? সদগ্রহের পরিবর্তে আবর্জনা দিয়া গ্রন্থাগার পূর্ণ করিলে কি পড়িয়া, কি শিখিয়া, তাহার প্রভাবে লোকের হুর্গীতি দূর হইবে ? অসদগ্রহ পড়া অপেক্ষা না পড়া নতুও ভাল । পূর্বে না পড়িয়াও লোক নীতিমান হইত, এখন পড়িয়াও হুর্গীতিপরাগ হয়, ইহার কারণ কেবল অসদগ্রহ-পাঠ, এবং অসদগ্রহ-পাঠক-দিগের জীবন-গত দৃষ্টান্ত । পুতকে বাহা পড়া যায়, সমাজের মধ্যে অবস্থাপন্ন বা পদস্থ লোকের দৃষ্টান্তেও যদি তাহাই দেখা যায়, তবে অসার্কিত-বুদ্ধি সাধারণ লোকে তাহার অমূল্য করিবে না কেন ? কোন্ প্রেণীর পাঠক অধিক, সুতরাং কি প্রকার জ্ঞান, কি প্রকার নীতি সমাজে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অবধারণ করিতে অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না, প্রত্যেক পাঠাগারের গ্রন্থ-বিলির খাতাখানি একবার

দেখিলেই তাহা বেশ জানা যাইবে । বেহ-রক্ষার জন্য আহাের প্রয়োজন, কেবল ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল না ; কিন্তু শাস্ত্র আহাের করিলে বেহ রক্ষা হয়, তাহাও জানা চাই ; নতুবা অশাস্ত্র খাইয়া প্রাণান্ত হওয়া বিচিত্র নহে ।

এ সমস্তার একটা সুমীমাংসা হওয়া উচিত, এ অনিষ্ট-নিবারণের একটা সতপার উদ্ভাবন করা দেশের মঙ্গলাকাজী সুবি-গণের কর্তব্য । গবর্ণমেন্ট সংপ্রতি এক প্রেণীর গ্রন্থেব বিক্রমে দণ্ড উত্তোলন করিয়া-ছেন, রাজ-পুস্তকগণ যে গ্রন্থকে রাজ-বিষয়ের উদ্ভেদক মনে করিতেছেন, তাঁহারা তাহারই প্রচার বন্ধ করিয়া দিতেছেন । এ ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের শক্তির সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত, সুতরাং টকা প্রজা-সাধারণের সমালোচনার অধীন । সাহিত্যের হুর্দশা দেখিবার একবার মনে হয়, যদি দেশে সাহিত্য-প্রচারিত চর্গীতির প্রাক্কুলে পরিচালিত কবিবার এতরূপ একটা অমোঘ শক্তি আমাদের মঙ্গলাকাজী জ্ঞান-বৃদ্ধ-দিগের হস্তে স্তম্ভ থাকিত, তাহা হইলে বাস্তব এই প্রেণীর অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারিত । কিন্তু বাহা মনে হয়, তাহাই যে কর্তব্য, এমন নহে । লেখামাত্রেরই গ্রন্থরূপে প্রচারিত হইবার অধিকার থাকিবে ; কিন্তু জ্ঞান-পুণ্য-বিস্তার দ্বারা জনতের মঙ্গলসাধনে যাহার বড় শক্তি থাকিবে, সে তত আদর পাইয়া দীর্ঘজীবী হইবে ; আর বাহার সে শক্তি নাই, সে নিরবচ্ছিন্ন অনাদরে এবং অনাহারে মরিয়া যাইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তা-সম্পাদনের কোন সুবিবেচিত

স্থিতিস্থিত ব্যবস্থা সুধীগণ ইচ্ছা এবং যত্ন করিলে অবশ্যই উদ্ভাবন করিতে পারেন ।

মুক্তা-যন্ত্রের প্রসাদে কত ভাবে, কত প্রকারে এবং কত নামে কত পুস্তক বাহির হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই । বিজ্ঞাপনের কৌশল এখন একটা বিস্তার পরিণত হইয়া পড়িয়াছে । অনেকে কেবল বিজ্ঞাপন লেখায় সিদ্ধহস্ত, যেন মূর্ত্তিমান ব্যাস ; আবার এই বিদ্যার যথেষ্ট আদরও আছে, কত বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী কেবল এই বিস্তার খাতিরেই ইহাদিগকে রীতিমত বেতন দিয়া পুষিতেছে । সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অরুণের জ্বালা, নবাব-বাদসাহের পুরোগামী নকাবের জ্বালা, পরিক্রমণোৎসবের পুরোবর্ত্তা জঘটাকের জ্বালা, অথবা সে কালের যাত্রার দণ্ডে সং বাহির হইবার পূর্বে খবর-দায়ের জ্বালা এই সকল বিজ্ঞাপন যখন নূতন নূতন পুস্তকের সংবাদ লইয়া বাহির হয়, তখন সেই বিজ্ঞাপনের ভাষার চমকে পুস্তক দেখিবার জন্ত বৃদ্ধের হৃদয় পয়াস্ত নাচিয়া উঠে, তরুণ-বয়স্ক পাঠকের ত কথাই নাই । এই বিজ্ঞাপনের জোরে কত কদর্যা বিষয়, কত অশ্লীল বিজ্ঞাপন, মাত্র নামে এবং আকারে পুস্তক সাজিয়া দেবী সরস্বতীর পবিত্র পূজা-মণ্ডপে নিঃশঙ্কভাবে নৃত্য করিতেছে, তাহাদিগকে নিষেধ করিবার, সারস্বত-কুঞ্জ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার কেহ নাই !

সমাজে অত্যাচার করিবার অধিকার কাহারও নাই ; কিন্তু কেহ কোন অত্যাচার করিলে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার অধিকার সকলেরই আছে । কিন্তু অধিকার থাকিলেই শক্তি থাকিবে, এমন নহে । কুগ্রন্থের

অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন সমাজের মধ্যে পনের আনা পাঠকেরই সে শক্তি নাই । যাহারা গ্রন্থের দুই চারি ছত্র পড়িলেই তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন, এমন পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প ; যাহারা ছাপার অক্ষর দেখিলেই তাহাকে ব্রহ্মার বেদের জ্বালা অশ্রান্ত মনে করে, যাহারা গ্রন্থের আত্মোপাস্ত পড়িয়াও উপকার হইল, কি অপকার হইল বুঝিতে না পারে, পাঠক-সমাজে তাহাদিগের সংখ্যাই অধিক । এই সকল বিচার-বিমূঢ় পাঠককে কুগ্রন্থের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা শক্তিমান পাঠকদিগের কর্তব্য ।

অত্যাচার বলিতেছি কেন ? অবধান করুন । যৎহাতে আমাকে আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বাধ্য করে, তাহাকেই অত্যাচার বলিতে পারি । কুগ্রন্থ কি করে, এখন তাহাই দেখুন । কুগ্রন্থ পাঠকের অর্থ হরণ করে, ততোধিক মূল্যবান সময় হরণ করে, ততোধিক মূল্যবান আয়োজনতির সুযোগ হরণ করে । এখন ভাবিয়া দেখুন, কুগ্রন্থ সমাজের কি সর্ব্বনাশ করে । যেমন অনিত্য শরীরের সহায়তায় জ্ঞান-ধর্ম্মাদি নিত্যবস্ত লাভ করা যায়, সেইরূপ অকিঞ্চিৎ-কর অর্থের সহায়তায় সংসারে নানারূপ ইষ্ট লাভ করা যায় । এমন উপকারী, অথচ কঠোর প্রমোদার্জিত অর্থকে আমারই দ্বারা নিরর্থক ব্যয় করান কি অত্যাচার নহে ? তাহার পরে সময়-হরণ । মানবের সমস্ত সুখ, সৌভাগ্য এবং উন্নতির মূল, সমস্ত সাধন-ভজন এবং সিদ্ধি-লাভের হেতু, এই সময় । সময়ই জীবন—সময় বুধা গেলে জীবনই বুধা গেল । যে আমাকে দিয়াই আমার জীবনটা বুধা

ব্যর' করাইল, তাহার মত অত্যাচারী কে ? সর্বশেষে আত্মহত্যার সুযোগ হরণ। মানবের মনুষ্যত্ব—মানবের দেবত্ব আত্মহত্যার সাধনে। যে আমার আত্মহত্যার সুযোগ হরণ করিয়া আমাকে আত্মহত্যার অবসর দিল, যে আমাকে উপল-খণ্ড সংগ্রহে ব্যাপৃত রাখিয়া আমার হীরকখণ্ড সংগ্রহ করিবার সুযোগটা নষ্ট করিল, তাহাকে অত্যাচারী না বলিয়া আর কাহাকে বলিব ? এখন যে দিন আসিয়াছে একটি পরমা উপার্জনে লোকের কত কষ্ট। আর কষ্টোপার্জিত অর্থের এই ব্যবহার ? সমাজে এখন আমোদ-প্রমোদ নাই, গান-বাজনা নাই, জ্ঞান-ধর্মের চর্চা নাই ; আছে কেবল জীবন-সংগ্রামের হড়াহড়ি পাড়াপাড়ি। পশু-সমাজ যেমন কেবল মাত্র আহার-অবেষণে ক্ষিপ্তপ্রায় থাকিয়া সারাটা জীবন অতিবাহিত করে, বর্তমান মনুষ্য-সমাজও সেইরূপ অবিরাম কেবল আহারের জন্ত, কেবল ধনের জন্ত, কেবল ধনোন্মানের জন্ত ব্যাকুল থাকিয়া মানব-জন্ম সার্থক করিতেছে। সাহিত্যের আলোচনার বাহ্যদের স্বাভাবিক আনন্দ নাই, অথবা সাহিত্যকে বাহ্যের জীবনের প্রধান অবলম্বন করেন নাই, এই অবিরাম ছুটীছুটি মধ্যে সাহিত্য-পাঠের জন্ত ছুই এক ঘণ্টা সময় বাহির করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা বাহ্যের করেন তাহারাই জানেন। এত বস্তুর, এত কষ্টের এমন যে মূল্যবান সময় তাহার সার্থকতা কি এইরূপ গ্রহণার্থে ? পরমা দিয়া বটে কিনিলাম, সময় ব্যয় করিয়া পড়িলাম, কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তিদায়ক আশ্বাস উপলব্ধি কিছুই

পাইলাম না। ইহা কি যের প্রবন্ধনা, প্রভাষণা, অত্যাচার নহে ?

পুস্তক পড়িয়া ক্লান্ত হইলাম, বিজ্ঞাপনের উপরে রাগ হইল, আবার সেই বিজ্ঞাপন খানি পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু পড়িতে বসিয়া দেখি কি চমৎকার চাতুরি, কি অপূর্ণ কৌশল, পাঠক ধরিবার কি বিচিত্র বাক্য-জাল ! একটি মিথ্যা কথা নাই, অথচ কাঁকা কথার এমন বিচিত্র গাঁথুনি যে, তাহা পড়িলেই পুস্তকখানি পাইবার জন্ত মনের মধ্যে একটা ভাড়া উপস্থিত হয়।

কলিকাতায় বড় রাস্তার ধারে বিজ্ঞাপন দিয়া ধূর্তলোকে সং দেখাইয়া অর্থ উপার্জন করে। একবার দুইটা ধূর্ত লোক নিঃস্ব হইয়া পরমা উপার্জনের একটা পরামর্শ করিল, কলিকাতার এক রাস্তার ধারে একখানি ঘর ভাড়া লইল, ঘরের সম্মুখে পরমা টাঙ্গাইল, পরমার উপরে বড় বড় চিত্রবিচিত্র অঙ্করে বিজ্ঞাপন দিল, এবং একজন পরমার বাহিরে দাঁড়াইয়া অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া “অপূর্ণ নৃত্য ! এক পরমা !” বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এত বড় জালে কি মাছ না পড়িয়া যার ? রাস্তার জন-স্রোতের মধ্য হইতে অনেকে সেই চিৎকারে আকৃষ্ট হইল, দলে দলে লোক একজন একজন করিয়া একটি পরমা অগ্রিম দিয়া সেই পরমার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখিল কি, না একটা নগ্ন-প্রায় মনুষ্য সর্দাঙ্গ চূর্ণকালি মাখিয়া লাকাইতেছে ! তখন দণ্ডবিধি জারি হইয়াছিল কি না জানি না। বাহ্যের সং দেখিল, তাহার প্রভাবিত হইয়া

কল্পচিত্রে ফিরিল, কিন্তু একজনও মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিল না। বলিবে কি? বিজ্ঞাপনের “অপূর্ণ নৃত্য” “এক পরসা” ইহার একটি বর্ণও যে মিথ্যা নয় তাহা ত প্রত্যক্ষই হইল। দুঃখের বিষয় সাহিত্য-সাম্রাজ্যেও এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রবেশাধিকার পাইতেছে, বিত্তহীন সাহিত্যের উপরেও নিরীহ তত্ত্ব পাঠকের বিরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইতেছে।

তীব্র, কঠোর, নিরপেক্ষ সমালোচনা বর্তমান থাকিলে সাহিত্যের এরূপ দুর্দশা ঘটত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেরূপ সমালোচনা যে একরূপ অসম্ভব, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্য-সভার তুচ্ছভাবই তাহার প্রমাণ।

তবে কি একটা উপায় হইবে না? আপনারা বর্তমান থাকিতে সমাজের একটা অমঙ্গল, জাতীর উন্নতির এত বড় একটা অন্তরায় ঘুচিবে না? আপনারা ইহার একটা ব্যবস্থা করুন, আবর্জনা-রাশির মধ্য হইতে মণি-মুক্তা বাছিরা দেখাইয়া, বিজন বিপথ নিবিড় সাহিত্যারণ্যে ভীত ও সন্দেহ পাঠককে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করিয়া সামাজিক মঙ্গল বিধান করুন।

আপনাদের মধ্যে অনেকই এ কার্যে সমর্থ, জানি; কিন্তু সমর্থ হইলেও চক্ষুলাজ্ঞার ষাতিরে অমেকেই যে এ কার্যে সন্মত হইবেন না, তাহাও বৃষ্টি। জজ হইতে গেলেই কঠোর হইতে হয়, অনেক সময়েই জনের প্রতিফুল হইলেও অপরাধীকে আশ্রয় দেয় আদেশ শুনাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি জজের পদ কেহ গ্রহণ করে না?

অথবা বিনা বিচারকে সমাজ কি নিরাপদে চলিতে পারে?

এ বিষয়ে আপনাদিগের নিকটে কোন প্রস্তাব করি, এমন সাহস আমার নাই। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে একটা উপায় ফলপ্রসূ হইতে পারে বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনাদের অবগতির জন্ত তাহা নিম্নে নিবেদন করিলাম।

আপনাদের মধ্যে যাহারা সমালোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন, এবং সে জন্ত কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হউক। এই সমিতির উদ্দেশ্য থাকিবে, বাঙ্গালা পুস্তকগুলি রীতিমত পাঠ করিয়া তাহা হইতে সদ-গ্রন্থগুলি নির্বাচিত করা, এবং মধ্যে মধ্যে ঐ সকল নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা সমিতির নামে ছাপাইয়া সর্বত্র প্রচার করা। ইহাকেই আমি সাহিত্য-প্রচার মনে করি; মুদ্রাবস্ত্র যে ছাপার পুস্তক দিয়া দেশকে প্রাণিত করিতেছে, তাহাকে সাহিত্য-প্রচার বলা বিড়ম্বনা।

ইহাতে বিবিধ উপকার হইবে। প্রথম, যাহারা নিজের জন্ত, পারিবারিক ব্যবহারের জন্ত, অথবা সাধারণ পাঠাগারের জন্ত ভাল গ্রন্থের নাম খুজিয়া বেড়ান, তাঁহারা সমিতির তালিকা হইতে প্রচুর উপকার পাইবেন; তাঁহাদের পরিশ্রম, অর্থ এবং সময় অনেক বাঁচিয়া যাইবে, বাহা ব্যয় হইবে তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। দ্বিতীয়, সমিতি আপনায় কর্তব্য যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলে দেশে তৎপ্রকাশিত তালিকার একটা প্রয়োজন ক্রমে অনুভূত হইবে, ক্রমে সর্বত্র ইহার

আদর বাড়িবে, অবশেষে এমন এক সময় আসিতে পারে, যখন লোকে সাহিত্যের জন্ত বিজ্ঞাপনের দিকে না চাহিয়া সমিতির তালিকার জন্ত উৎসুক চিতে প্রতীক্ষা করিয়া রহিবে। যদি এমন দিন আইসে তাহা হইলে ব্যবসায়ী লেখকেরাও আর বিজ্ঞাপনের উপরে নির্ভর করিবেন না। তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাড়িয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিবেন; আর যাহারা নাছোড় হইয়া সাহিত্যকেই ধরিয়া থাকিবেন, তাহারাও বিজ্ঞাপনের যত্নও পরিশ্রমটা লিখিত গ্রন্থেই প্রয়োগ করিবেন।

তিনিয়াছি, কোন কোন প্রসিদ্ধ পরীক্ষার পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর নাম জানিতে পারেন না, প্রেমের উত্তরে একটি সংখ্যা মাত্র থাকে, কল-প্রকাশের সময়ে প্রত্যেক সংখ্যা-সূচিত নাম বাহির হয়। এ স্থলেও সে নিয়ম গ্রহণ করিলে মন্দ হইবে না।

সমিতির সম্পাদক গ্রন্থের প্রথম পাতাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কেবল মাত্র মূল গ্রন্থখানিই সমালোচকের হাতে দিবেন। ইহাতেও সমালোচক যদি গ্রন্থকারকে চিনিয়া ফেলেন, তবে তিনি উহা সমালোচন না করিয়া ফেরত দিবেন। সম্পাদক যাহাকে যে গ্রন্থ সমালোচনার জন্ত দিবেন, তিনি তাহারই সমালোচন করিবেন, অন্য গ্রন্থের নহে। যদি কোন সমালোচক সম্পাদকের নিকট কোন গ্রন্থ চাহেন, তিনি উহা লইয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু তাহার নিকট হইতে উহার সমালোচন গ্রন্থ হইবে না।

এরূপ অনুষ্ঠানে অবশ্য কিছু ব্যয় আছে; কিন্তু সে জন্ত চিন্তার কারণ দেখি না। দরিদ্র সাহিত্য-সেবকেরা যদি দেশের মঙ্গলের জন্ত এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন, তবে আমাদের ধনবান সাহিত্য-পোষকেরা কি উদাসীন রহিবেন?

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ।

২

চতুর্ভুজা।

দেওপাড়া হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবা মাত্র, বরেন্দ্রের নগ্নমূর্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি-সঞ্চালনের সম্ভাবনা, ততদূর কেবল এক দৃশ্য;—নতোন্নত প্রাস্তরভূমি, কচিং “ভালীবননীলা,” কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বৃক্ষলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে তৃণদল ধরিজীর শ্রাবল অঞ্চল বলিয়া কবিকল্পনার সমুজ্জ্বল হইয়া

রহিয়াছে, এখানে তাহা শ্রাবল নহে, পীতাম্ব। কেবল হেমন্ত কালেই বরেন্দ্র-প্রাস্তর ভিন্নমূর্তি ধারণ করে; তখন প্রাস্তরভূমি শতসম্মানে পুলকিত হইয়া উঠে; তাহার উপর দিয়া বায়ুহিজ্রাল এক অনির্বচনীয় শোভা তরঙ্গায়িত করিয়া রাখে। হেমন্তের শেষে তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই;—তখন কেবল সৌন্দর্য্যের স্থানে অটল

গার্ভীয়া ;—যেন কোন মহাযোগী আশান-ভূমিতে যোগাসন বিহৃত করিয়া দীর্ঘস্থানে সমাধিমগ্ন,—ভয়ে সমীরণ পর্য্যন্ত সতর্ক পদ-বিক্ষেপে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে !

প্রাক্তরের অপর প্রান্তে একটি পুরাতন নগর বর্তমান ছিল ;—এখন তাহার নাম চন্দ্রশ-নগর । অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে । কিন্তু শতবর্ষ পূর্বেও গ্রামের অবস্থা একরূপ ছিল না । গ্রামখানির অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান । তাহাদের মধ্যে একজন শতবর্ষ পূর্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল । তাহা এখন ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছে । যে প্রস্তরলিপিতে নির্মাণকাল লিখিত ছিল, তাহা গ্রামান্তরে নীত হইয়াছে । এখানে কতকাল হইতে মুসলমান অধিবাসীর প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে । তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে । তাহা অতি পুরাতন মসজিদ এবং দরগার ধ্বংসাবশেষ ।

একটি দরগার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তরনির্মিত মন্দিরের দ্বারের ভগ্নাংশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল । তাহাতে কাক-কাঞ্চীর আভাস প্রাপ্ত হওয়া গেল । তাহা হয় ত দরগার সোপানরূপে ব্যবহৃত হইত ;—সেই ভাবেই তাহা ভূগর্ভে অর্দ্ধ প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে । গ্রামের মধ্যে একরূপ পুরাতন প্রাসাদশিলার অভাব নাই । গ্রামবাসিগণে একস্থানে ইষ্টকাহরণের আশায় ভূমি খনন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; ভূমিতল হইতে বৃহদায়তনের প্রস্তরস্তম্ভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে । গ্রামবাসিগণের সঙ্গে পদব্রজে গ্রামখানি পরিভ্রমণ করিয়া, এই সকল পুরা-

কীর্তির নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতে, সাহিত্যিকগণ গলদ্বর্ষ হইয়া উঠিলেন । অবশেষে গ্রামের শেষ প্রান্তে আসিয়া, সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—বহু “বিতত তল”—একটির পর একটি,—কত কিংবদন্তী অতল সলিলে চিরনিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে । কাহারও সোপানাবলী কাচপ্রলেপযুক্ত বিচিত্র ইষ্টকাবলীতে সুসজ্জিত ছিল ;—কাহারও তীরভূমিকে মন্দির-শোভা সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল ;—এখন কেবল দেবমূর্তির প্রস্তর-বেদিকা প্রান্তরভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে ! একটি “তল” সর্কাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; তাহা এ অঞ্চলের সুবিখ্যাত “তপসহর” ;—যেমন বৃহৎ, সেইরূপ সুন্দর ;—যেন সরোবর নহে, একটি ক্ষুদ্র হ্রদ, তাহার স্বচ্ছ সলিলে সেকালের সৌভাগ্যগর্ভক এখনও প্রতিবিম্বিত করিয়া রাখিয়াছে !

“তপসহর ছাড়িয়া আবার প্রান্তরভূমি ; তাহারই অপর প্রান্তে মাড়ইল গ্রামের সীমা । এখানকার মন্দিরস্তূপ এবং তাহার জনশ্রুতি বরেন্দ্রভূমিকে এখনও শত বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে । এখানে একটি প্রস্তর-মন্দিরে এক রক্তত্বাতুরা দেবীমূর্তি নরবলি গ্রহণ করিতেন । মন্দির এখন ভূগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে ;—যখন কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইত, তখন তাহার রুদ্ধদ্বার উদঘাটিত করিতে গিয়া, কতলোকে জীবন বিসর্জন করিয়াছে ! এখন কেহ আর তাহার স্থান অঙ্গুলি নির্দেশেও দেখাইয়া দিতে সক্ষম হইয়া না । সাহিত্যিকগণ যেন এখানে পদার্পণ না করেন,—আসিবার সময় অনেক অন্তঃপুর হইতে একরূপ অব্যক্ত

কাতরোক্তি নয়নকোণে সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ! কতক্ষণের পরে সকলে শ্মশানভূমিতে সমবেত হইলেন ।

সত্য সত্যই তাহা অতীত গৌরবের শ্মশানভূমির দ্বার প্রতিভাত হইল । নিকটে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র বর্তমান নাই । গ্রামের দক্ষিণে, লোকালয় হইতে বহুদূরে প্রান্তর-সীমান্ন কবে কি উদ্দেশ্যে কাহার যত্নে এই দেবারতন নির্মিত হইয়াছিল, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না । চারিদিকে চারিটি “তল্ল”,—তাহাতে এখনও রক্তপন্ন বিকশিত হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু পূজার জন্ত কেহ আর তাহাতে হস্তার্পণ করিতে সাহস প্রকাশ করে না । মধ্যস্থলে মন্দিরস্তূপ;—তাহার উপর এক মহামহীকর,—কত কাল দেবমন্দিরটি ভূগর্ভে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহারই সাক্ষ্য দান করিতেছে । চতুর্দিকের সমতলভূমি এক সময়ে প্রাঙ্গণ রূপে ব্যবহৃত হইত । তাহা হইতে মন্দির-স্তূপের শীর্ষদেশ চল্লিশ ফিট উচ্চ,—সকল স্থানই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডে আচ্ছন্ন । কেহ সেখানে পদার্পণ করে না,—ইষ্টক-আহরণের জন্তও সাহস প্রকাশ করে না । তাহার উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি বহিয়া যায়, নীত গ্রীষ্ম চলিয়া যায়,—এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, আরও কত শতাব্দী চলিয়া গেলেও স্থানটি চিহ্নহীন হইবে না ।

এক সময়ে বরেন্দ্রক্ষেত্র তাত্ত্বিক-সাধনার সিদ্ধিক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল, কোন্ অতীত যুগে কিরূপ প্রয়োজনে তাত্ত্বিকাচার জনসমাজের মধ্যে প্রভাববিস্তারে কৃতকার্য হইয়াছিল, এখন তাহার তথ্য-নির্ণয়ের জন্ত

সুধীসমাজে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে । চারিশত বৎসর পূর্বের বরেন্দ্রদেশে তাত্ত্বিকাচারের অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রসঙ্গক্রমে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার কিছু কিছু বিবরণ লিখিত হইয়াছিল । তখন মুসলমান-শাসনের প্রবল প্রভাপ ! কিন্তু দেশের মধ্যে তখনও দেশের লোকের স্বেচ্ছাচারের প্রবল প্রভাপ মন্দীভূত হয় নাই । তাহার তখনও দেবীর ভূটি সম্পাদনের আশায় নয়নুও উৎসর্গ করিয়া দিত ।

“এ দেশের লোক দম্মাকর্ষে বিচক্ষণ ।
না জানয়ে ধর্ম কিবা কর্ম বা কেমন ॥
করয়ে কুক্তিয়া যত কে কহিতে পারে ।
ছাগ-মেঘ-মহিম-শোণিত ঘরঘারে ॥
কেহ কেহ মনুষ্যের কাটামুণ্ড লৈয়া ।
ধড়কাবরে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া ॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায় ।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায় ॥
সবে দ্রো-লম্পট জাতি-বিচার রহিত ।
মন্তমাংস বিনা না ভূজয়ে কদাচিত ॥”
(নরহরি চক্রবর্তি-বিরচিত নরোত্তম-

বিলাসে সপ্তমোবিলাসঃ)

মাড়টেলের মন্দিরস্তূপের সঙ্গে হয় ত এই সকল কাহিনী জড়িত হইয়া, ইহাকে বিভীষিকার আধার করিয়া রাখিয়াছে । সে দেবীভূক্তি এখনও বর্তমান আছে । তাহা বীভৎস নহে, স্তূপের;—যেমন বৃহৎ, সেইরূপ স্তূপের;—বরেন্দ্র ভাস্কর্য্য-কৌশলের অনির্বচনীয় নিদর্শন । মন্দিরস্তূপের উপর হইতে অদূরে একটি উচ্চভূমি দৃষ্টিপথে পতিত হইল । একটি সুগভীর তল্ল, তাহার পার্শ্বদেশে একটি উচ্চভূমি, তাহার

উপর নানা লতাশৃঙ্গ জয় গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পার্শ্বে একটি বৃক্ষ,—সেই বৃক্ষমূলে দেবী চতুর্ভূজা আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যিকগণ সেখানে আসিয়া শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া, বিষয়ে অভিভূত হইলেন;—তন্ন হইতে সত্ত প্রফুটিত কমলদল আহরণ করিয়া সসম্মানে, দেবীমূর্তিকে বিতুষিত করিয়া দিলেন। এক সময়ে যে দেবীমূর্তি দেউলের মধ্যে, ধূপদীপের মধ্যে, আলো ও ছায়ার মধ্যে, বসন-ভূষণের চাক্-চিক্যের মধ্যে, অর্চনা-আরাধনার অনির্বচনীয় বোহময়ের মধ্যে, দূর হইতে দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া, ভক্তিসিদ্ধ উদ্বেলিত করিত, এখন তাহাকে মুক্ত সমীরণের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে নিকট হইতে নিকটে দেখিয়া, তাহার রচনা-কৌশলের সকল সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এই শ্রীমূর্তি সে বনভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

এই দেবীমূর্তির অনতিদূরে—উচ্চভূমির অপর প্রান্তে—ছইখানি দ্বার-কলকের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গেল। একখানি বিচিত্র কারুকার্যে খচিত,—কৃষ্ণ-প্রস্তরের স্তরে স্তরে নানা নারীমূর্তির অনিন্দ্যসুন্দর লাস্ত্রবিকাশে উদ্ভাসিত। তখন সমগ্র মন্দির-দ্বারটির অহুসন্ধান আরম্ভ হইল। সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অহুসন্ধান করিয়াও, আর কোন ভগ্নাবশেষের সন্ধান লাভ করা গেল না। পরে জানিতে পারা গেল,—মন্দির-দ্বারের উপরের অংশটি এবং দেবীপদতললগ্ন বোধিকাপ্রস্তরটি এক ব্রাহ্মণ কুড়াইয়া লইয়া

পূজা করিতেন। তাঁহার বাস্তভূমির উপর এখন এক মুসলমান বাস করিতেছে। প্রস্তর খণ্ডগুলি সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হষ্টকা-চ্ছাদিত পুরাতন রাজপথের চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল,—মাড়ইল চিরদিন এরূপ গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিচিত ছিল না। ইহা যে এক সময়ে একটি নগর রূপে পরিচিত ছিল, তাহাব নানা নিদর্শন প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে কারুকার্য-খচিত ইষ্টকশোভা পুরাতন প্রাসাদাবলীর রচনা-রীতির পরিচয় দান করিতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্যিকগণ তখন সেই মন্দিরদ্বারের সন্ধান লাভের আগ্রহে কোন স্থানে অধিক কাল হরণ না করিয়া, মুসলমান কৃষকের কুটিরদ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বারকলক দেখিবামাত্র সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দ্বারকলকের মধ্যস্থলে একটি শিবলিঙ্গ; উভয় পার্শ্বে কত লতাপাতার সাজসজ্জা, তাহার মধ্যে হংসমূর্তি; তাহার উপরে যে স্তরবিভাগে চিত্রবিভাগ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে আকাশপথ,—সেই আকাশপথে বিস্তার বিস্তারী পুজার অর্ঘ্য লইয়া ভেরী বাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে!

কৃষক তাহার কুটিরদ্বারে সাহিত্যিকগণের এরূপ অতিষ্ঠিতপূর্ব সমবেশ দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, আতিথ্যের জন্ত একখানি গোবানের উপর আসন নির্দেশ করিয়া তাত্র-কূট হস্তে অভ্যর্থনা করিল। এত সরল, এত স্বাভাবিক, এত আন্তরিক, এত মর্ম্মস্পর্শী,—সে অভ্যর্থনা প্রত্যাখ্যাত হইবার সম্ভাবনা

ছিল না। সাহিত্যিকগণ সগৌরবে গোঁধানের আবরণহীন বংশবিতানের উপর উপবেশন করিয়া, কথা-কোতুকে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। কৃষক এদেশের অধিবাসী ছিল না;—কিরূপে কাহার অত্যাচারে, কত দিন হইল, স্ত্রীপুত্র লইয়া এদেশে আসিয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার কাহিনী আদ্যস্ত বিবৃত করিয়া সমবেদনার উদ্রেক করিয়া দিল। বাঙ্গালার কঙ্কালাবশিষ্ট কৃষকদেহের মধ্যেও হৃদয় আছে। বেলা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, ভট্টনিবাস এখনও অনেক দূরে,—সুতরাং কৃষক তাহার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অরুরোধ জানাইতে কুণ্ঠিত হইল না। ভট্টগৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার অন্যত্র আতিথ্য গ্রহণের স্বাধীনতা ছিল না, তাহা বুঝিলামাত্র কৃষক পথ দেখাইয়া দিল;—সকলে আবার গজারোহণ করিয়া, সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গ্রামের বাহিরে আসিলে, অতিদূরে ছায়া-চিত্রের ন্যায় ভট্টভবন দেখিতে পাওয়া গেল। তখন মধ্যাহ্ন গগনের প্রচণ্ড মার্ত্তওকিরণ বরেন্দ্রপ্রান্তরের উপর অনল বর্ষণ করিতে-ছিল। দৈর্ঘ্যের শেষ উপস্থিত না হইলে, দীর্ঘপথের শেষ দেখিতে পাওয়া যায়,—যথাকালে সাহিত্যিকগণ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। শীতল জলে স্নান করিয়া স্নানের পর বরেন্দ্রভূমির পুরাপ্রচলিত শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া, সাহিত্যিকগণ মধ্যাহ্নের আহ্বারের জন্য প্রস্তুত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। ভট্টবংশধর যথাস্থান অতিথি-সংকার করিবার আশায়, একটি মেষ বলি দিয়া, পূজা সাজ করিয়াছিলেন; সুতরাং

প্রসাদলাভে বিলম্ব ছিল। সেই অবসরে পুরাতন পুথির অমূল্যসন্ধান আরম্ভ হইল। জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ ভগ্নসার, কুলার্ণব, তাহার সঙ্গে বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ, মারণ উচাটন বশীকরণের মন্ত্রসংগ্রহ, অরণ করাইয়া দিল;—“অশেষবিধ পাণিনিরেকসূত্রে স্থানং যুবানং মঘবানমাহ”।

আর না আর না করিয়াও, মধ্যাহ্ন-ভোজন বড় গুরুভোজন হইল,—মেঘমাংস সম্পূর্ণ আতপতগুলের পলার, তাহার সঙ্গে বিবিধ বাজ্ঞন, দধি ক্ষীর মিষ্টান এবং পায়স-পিষ্টকের আক্রমণে সাহিত্যরথিগণ রণে ভগ্ন দিবার উপক্রম করিয়া তুলিলেন। আহ্বারের পর বিশ্রাম করিতে করিতে স্থির হইল,—একটি হস্তী লইয়া একদল নিকটস্থ অস্ত্রাশ্র গ্রামে ভৌগোলিক তত্ত্বাসন্ধানের বহির্গত হইবেন; অস্ত্রাশ্র সকলে ভট্টবংশধরকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় মাড়ইল পরিদর্শনে নিযুক্ত হইবেন।

পুনরায় মাড়ইলে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে বহুসংখ্যক শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। একটি শ্রীমূর্ত্তি বৃক্ষকোটরে এরূপ ভাবে বৃক্ষ-স্বকে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে বৃক্ষমূলের কিয়দংশ ছেদন না করিলে, তাহাকে বাহির করিবার উপায় নাই। কেহ ছেদন করিতে সম্মত হইল না, উপযুক্ত অস্ত্র দান করিতে কাতরতা প্রকাশিত করিল। তখন এই গুরুভার একজন সাহিত্যিকের উপর সমর্পণ করিয়া অস্ত্রাশ্র সকলে চতুর্ভুজার নিকটে উপনীত হইলেন। বেলা আর অধিক নাই; অনেক অমূল্যসন্ধানের পর গোঁধান সংগৃহীত হইয়াছে, এখন চতুর্ভুজাকে

ও মন্দিরবারের প্রস্তরফলকগুলিকে তাহাতে বোঝাই করিতে পারিলেই, প্রত্যাখ্যান আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য কিছুতেই সহজ হইল না;—সাহিত্যিকগণকে কোদালি ধরিতে হইল, কাঁধ লাগাইতে হইল, গোবানে বোঝাই করিবার সকল শারীরিক ক্লেশই অগ্নানবদনে বহন করিতে হইল। বৃক্ষমূল ছেদন করিয়া ত্রীমূর্ত্তিগুলি সঙ্গে লইয়া, অপর সাহিত্যিক সন্ধ্যার সময়ে গো-বানের নিকট উপনীত হইলেন; কিন্তু বাঁহারা ভৌগোলিক তথ্যসম্বন্ধে বাহির হইরাছিলেন তাঁহাদের আর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গেল না। অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, পিপাসা প্রবল হইয়া পড়িল; সূর্য্যোঃ শিবিরাভিমুখে প্রত্যাখ্যান করাই স্থির হইল। উত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। কিন্তু তখনও ভৌগোলিক তথ্যসম্বন্ধকারিগণ প্রত্যাবর্তন করেন নাই। হুই এক বিদ্যুৎ বৃষ্টি পতিত হইতেছে,

চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, নিকটে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—দুর্ভুক্ত মধ্যাহ্নে গোহত্যা করিয়াছে,—তাহার ভয়ে রজনীতে শিবির রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। এমন সময়ে সেই হস্তীটি ফিরিয়া আসিল। বহুগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া জানিতে পারা গেল,—তাঁহারা পথ হারাইয়া বনের মধ্যে পদব্রজে আসিতে আসিতে ব্যাঘ্রের কবলে নিপতিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেরই হস্তপদে ক্ষতচিহ্ন,—তাহার সহিত ব্যাঘ্রের সম্বন্ধ থাকিলেও ব্যাঘ্রনখের সম্বন্ধ ছিল না। তাড়াতাড়ি গল্পপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার সময়ে কণ্টক-বনে হস্তপদ ক্ষতবিক্ত হইরাছিল। বরফ-জলে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া, সকলে মিলিয়া নৈশভোজন-ব্যাপারে নিবিষ্ট হইলেন। আবার মাংসসংপৃক্ত পলার,—কিন্তু কেহ আর তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না। চতুর্ভুজার আশীর্বাদে রজনী নির্ঝরে অতিবাহিত হইয়া গেল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

বিলাতের কথা ।

বসন্তের বাহার ।

আমাদের বসন্ত কবিকল্পনার যেকোন কুটিরাছে, বর্তমানে প্রকৃতি-অঙ্গে তেমন ভাবে প্রায়ই কুটিতে দেখা যায় না। শীত কুরাইতে না কুরাইতে, তড়িৎ গতিতে নিদ্রাঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য্যোঃ বসন্তের প্রকৃত বাহার আদর্য্য প্রত্যক্ষ করিবার

অবসর পাই নাই। এক দিন, বোধ হয়, এমন ছিল না। এক দিন হিম্ন বসন্ত কল্পনা করে নাই, প্রত্যক্ষ করিত। তখন হয় ত সে ভারতের অন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া ছিল। অথবা তখন হয় ত, যেনে কাল-প্রভাবে এমন করিয়া গুরুনির্ণায় ঘটে

নাই। তখন হয় ত, ভারতেও তুবানপাত হইত, নিদারুণ শীতে প্রকৃতির অঙ্গ কঠোর, শুষ্ক, জীবনের চিহ্নহীন হইয়া পড়িত। সে সময়ে শীতাবসানে বসন্তের বাহারও ফুটিয়া উঠিত। এখানে, আমাদের দেশের মত ঋতুবেচিয়া নাই। এ দেশে চার ঋতুতে বর্ষ শেষ হয়; আমাদের ছয় ঋতুতে বর্ষ গণনা হইত, এখনো হইয়া থাকে। কলে, এখন আমাদের ঋতু ছয়টা না তিনটা, তাহা বিচার্য্য বটে। এখানে শীত যেমন হ্রস্ব, বসন্ত তেমনি স্তূন্য, অল্প, অলৌকিক। এখানে শীতে বহিঃপ্রকৃতি যেন মরিয়া যায়, মাঠে ঘাস থাকে না, গাছে পাতা থাকে না, কোথাও প্রকৃতি-অঙ্গ জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। তার পর, যখন বসন্তের হাওয়া যুঁহু যুঁহু বহিতে আরম্ভ করে, তখন সহসা এই মৃত প্রকৃতি যেন নবজীবন পাইয়া শিহরিয়া উঠে। এ ক্ষণ বসন্ত এখানে সত্য সত্যই যেন মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র সুখে লইয়া উপস্থিত হয়। এই হ'মাস পূর্বে—এই লণ্ডন সহরের গাছপালাগুলো শুকনো কাঠ হইয়া যেন ঝাঁড়াইয়াছিল। এরা যে আবার হরিত-কোমল পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, তখন একসন্ধ্যাও যেন অসম্ভব বোধ হইত। আর আজ সহসা এই মৃত প্রকৃতি জীবন-রসে ভরিয়া উঠিয়াছে। মরা ডালে পল্লব, মরা গাছে ফুল, শুষ্ক বনে হরিত-আচ্ছাদন হাইয়া গিয়াছে। এমন জীবনের সম্ভার, এমন লভ্যপাত্যর বাহার, এমন বরণ-কীরণ-পঙ্কেত হুড়াহুড়ি আমাদের বসন্তে দেখা যায় নাই। আর, যেমন প্রকৃতি তেমনি মানুষও

যেন বসন্ত-সমাগমে এক নূতন আভা ফুটিয়া উঠে। ঋতুতে ঋতুতে এ দেশে প্রকৃতি যেমন বেশপরিবর্তন করে, সাহেব-মেমেরাও তেমনি করিয়া থাকেন। বিশেষ মেম-সাহেবেরা, শীতের গাঢ় কৃষ্ণ পরিহার করিয়া, বসন্তে বিচিত্র বর্ণের পরিধেয়ে আপনাদিগের বরবণু সজ্জিত করিয়া থাকেন। বিলাতী বরবর্ণিনীগণ এ সময়ে যেন নিজেরাও বসন্তের বরণ-কীরণ-গন্ধ সম্ভার লইয়া বসন্তের মলয়-হিম্মলের স্তার মুগ্ধ মানবের ক্ষুদ্র চিত্তকে দোলাইয়া, নাচাইয়া, লুটিয়া, ফেলিয়া চারিদিকে বিলাসের তরঙ্গ তুলিয়া যেন উপবনে, পথে ঘাটে, নাচে ও নাটো, জলে স্থলে, সর্বত্র বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

বসন্তের বাহার ও শোকের আঁধার

রাজশোকে এবারে এ বসন্ত নীলার কতকটা ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এ দেশে শোকের রং কালো। শোকার্জের চিহ্ন কৃষ্ণ পোষাক। প্রথম অবস্থার গাঢ় কৃষ্ণতা শোকের নিদর্শন। তখন হ্যাট-কেট-বুট, টুপি-ডফনা-গাউন, জীপুকাব সকলেরই পরিচ্ছন্ন নিরবচ্ছিন্ন কালো হওয়া চাই। বসন্ত দিন বার, ততই এই কৃষ্ণবস্ত্রের গাঢ়তাও হ্রাস হইতে থাকে। পুরা-শোকে—ইংরেজিতে ইহাকে full mourning কহে,—সকলই নিরবচ্ছিন্ন কালো হওয়া আবশ্যক। তার পর আর্দ্র শোকে বা হাফমোর্ণিংএ (half mourning) কালোর সঙ্গে সাদা মিশিতে পারে। ক্রমে শোকচিহ্ন সৰূ কালো ফিতার পর্যন্ত পরিণত হয়। সাদার কালোর রাত্রীর-নীতিতে বসন্তই বেশি কালো হউক না কেন,

পরিচ্ছদ-নীতিতে বড়ই মিলিয়া মিলিয়া
 যায়। কালোর উপরে সাধারণ বা সাধারণ
 উপরে কালোর বাহার বড় ছুটিয়া উঠে।
 ক্রমে এখানেও শোকেসর ভীষণতা বড়
 কমিতেছে, ততই কৃষ্ণবস্ত্রের সঙ্গে নানা
 উজ্জলতার বর্ণের সমাবেশ হইতেছে।
 এ বর্ণবিচিত্রতা বস্ত্রের বাহার নষ্ট না
 করিয়া বরং বাড়াইয়াই দিয়াছে। সচরাচর
 বাসন্তী বিহারের মধ্যে একটা অসংবত ভাব
 দেখিতে পাওয়া যায়। শীতে মাহুৰ ও
 উত্তর সকলেই এ দেশে কতকটা সংকুচিত
 হইয়া, কতকটা মুশড়িয়া যায়। বসন্তে এ
 সংকোচভাব নষ্ট করিয়া ফেলে। সকলেই
 যেন আপনাকে ছড়াইবার জন্ত, বাড়াইবার
 জন্ত, জগতের জীবন-প্রোতে ভাসাইবার
 জন্ত, বিশ্বের সঙ্গে ডুবাইবার জন্ত, বরষিত্তর
 ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এ বাসনা-তরঙ্গে
 সংবোধের অবসর অল্প। বসন্ত সর্বদাই
 একটু অসংবত। গোবাক-পরিচ্ছদে,
 আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে সকল
 বিষয়েই বসন্ত একটা অসংবত ভাব আনিয়া
 দেয়। কিন্তু রাজ-শোকে এ বৎসর বিলাতে
 বাসন্তী লীলার কতকটা সংবোধ আনিয়া
 দিয়াছে। কৃষ্ণ বর্ণের সমাবেশে বাসন্তী
 পরিচ্ছদের বর্ণবিচিত্রতা সংবত হইয়াছে।
 রাজ-দরবারের অশোচে নৃত্যগীতের কোলা-
 হল অনেকটা কমিয়াছে, এ জন্ত অভিজাত-
 সমাজেও কতকটা সংবোধ আসিয়া পড়িয়াছে।
 আর শ্রেষ্ঠ জনেরা বাহা করেন, জনসাধারণে
 সর্বদাই তার অনুকরণ করিয়া চলে; এ জন্ত
 জনমণ্ডলী মধ্যেও যেন কতকটা সংবোধ
 আসিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, এ

বৎসর বোড়মোড়ের মেলায় যে সংবতভাব
 দেখা গিয়াছে, এমন কখনো পূর্বে দেখা
 যায় নাই।

আমোদ-প্রমোদ ।

কিন্তু সমাজের আমোদ-প্রমোদের
 কোনই হ্রাস লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ
 এ দেশের লোক আমোদ-প্রমোদ নহিলে
 থাকিতে পারে না। প্রাতে নরটা হইতে
 সন্ধ্যা ছরটা পর্য্যন্ত এরা প্রাণান্ত পরিশ্রম
 করিয়া ধনোপার্জন করে, তার পর একবার
 নিশ্চিন্ত হইয়া, মনটাকে হাত পা ছড়াইয়া
 খানিকটা বিশ্রাম করিবার অবসর না দিলে
 চলে না। শরীরের পক্ষে যেমন অন্ন-পান,
 মনের পক্ষে এদের সেইরূপ নাচ-ভাঙ্গা।
 এই লণ্ডন সহরে, পাড়ায় পাড়ায় নাট্যশালা
 ও রঙ্গালয়। আর এই সকল প্রতিদিন
 লোকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। অনেক
 রঙ্গালয়ে ও প্রায় প্রত্যেক নাচঘরে বা
 মিউজিক হলে (Music hall) দিনে দু'বার
 করিয়া অভিনয়, নাচ-গান হয়। অপরূপ
 দুই ঘটিকার একবার, রাজ ৮০ টার আর
 একবার। আর দু'বারই ঘরগুলো লোকে
 লোকারণ্য হইয়া যায়। মনে হয় যেন এই
 লণ্ডন সহরের স্ত্রী-পুরুষ কেহ অন্ততঃ সপ্তাহে
 একবার করিয়া নাচ-ঘরে বা রঙ্গালয়ে না
 গিয়া থাকিতে পারে না। এ সকল
 আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন যে
 জনতা হয়, এ দেশে বড় গীর্জা আছে তার
 সকলে মিলিয়াও এত লোকের সমাগম হয়
 না। এই লণ্ডন সহরে শতকরা আশীজন
 কখনো কোন গীর্জায় যায় না, শতকরা
 সত্তরজন বোধ হয় সপ্তাহে একবার করিয়া

কোন না কোন নাচ ঘরে বা রঙ্গালয়ে না গিয়া থাকিতে পারে না ।

বিলাতী নাট্যকলা ।

আর এই সকল আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে জনমণ্ডলীর তিতরকার চরিত্রের যে প্রমাণ পাওয়া যায় আর কোথাও তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই । নাট্যকলা এক সময়ে ইংরেজ-সমাজে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই । নাট্যকলার এরূপ উৎকর্ষতা বাতীত এ দেশে শেক্সপীরের সম্ভব কখনো সম্ভব হইত না । কিন্তু শেক্সপীরের নাটক এখন শেক্সপীরের উৎসব উপলক্ষে কেবল একবার, একটি মাত্র রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া থাকে । পরলোকগত স্যার হেনরি আইভিং শেক্সপীরের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার হ্যামলেট অপূর্ণ সৃষ্টি ছিল । আইভিংয়ের পরে বিরভস্টি কতকটা শেক্সপীরের অভিনয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, সত্য ; কিন্তু লোকে আর শেক্সপীরের নাটকের অভিনয় পছন্দ করে না । শেক্সপীরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যে গুলি তাহাতে আর এখন জনসাধারণের তৃপ্তি হয় না । হ্যামলেট বা টেম্পেষ্ট বা ম্যাকবেথ বা জুলিয়াস সীজার এ সকলের রস আন্বাদন করিতে হইলে যে অভিনিবেশের প্রয়োজন, এখন ইংরেজ আর সেরূপ ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে কোনো বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারে না । বিলাসিতা যে পরিমাণে বাড়িয়া যায় সে পরিমাণে গভীরতর রস আন্বাদনে লোকের শক্তি-সামর্থ্যও বোধ হয় হ্রাস হইতে

থাকে । একেবারে বর্ধরতাতে যেমন নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব, একান্ত ভোগ-বিলাসেও সেইরূপ । হুই-ই মাহুযকে একান্ত-ভাবে ইজিয়াধীন করে । বিশেষতঃ কলার অনুশীলনে মাহুযের অতীন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে সজাগ করিয়া তুলিতে হয়, নতুবা কোন প্রকারের রসান্বাদনেই মানবের অধিকার ও সামর্থ্য জন্মে না । বর্তমানে ভোগবিলাসিতার ভাঙনার সভ্যসমাজে অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অনুশীলনের আভ্যন্তরিক ব্যাঘাত জন্মিয়াছে । এ জন্ত ক্রমে এত অভূতপূর্ব বর্ধরতা আসিয়া এই গর্জিত মনোমগ্ন সভ্যতাকে অলক্ষিতে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । বিলাতী নাট্যালয় সকলে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায় । সর্বত্রই কেবল অদ্বুত রসের ছড়াছড়ি । বিলাতী রঙ্গমঞ্চে এখন বিরোগান্ত নাটকের অভিনয় আর দেখা যায় না । ইংরেজ, শোককে সন্মোগ করিবার যে উচ্চ অধিকার, তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে । এখন মেলোড্রামাই (melo-drama) এখানে ছড়াছড়ি, আর বা কিছু অভিনীত হউক না কেন তাতেই রংএর ছড়াছড়ি ও হাত-পা নাড়ার ছড়াছড়ি চাই । না হইলে দর্শক-মণ্ডলীর মন উঠে না । পান্টোমাইম লোকে ভালবাসে, নাচঘর সকলে কেবলই মাতামাতি ছড়াছড়ির পালা পড়িয়াছে । ইহার শেষ কোথায় হইবে কে জানে ? ইংরেজ এখন একটা নতুন কিছু দেখিবার জন্ত ব্যগ্র ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

ভবিষ্যতের ভাবনা।

বঙ্গবিভাগের পর আমরা একর বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছি, বাহাতে বিভাগ রহিত হইয়া আবার ছিন্ন অংশের যুক্ত হয়। কেননা এই বিভাগের সুযোগে যদি একদিন বাঙ্গালী জাতিও ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, তবে এই উদীয়মান জাতির সর্বনাশ হইবে। জাতীয় জীবনের যে সমস্ত শক্তিকেই আছে, জনসংখ্যা তাহার মধ্যে একটি সর্বপ্রধান। আরও একটি বিপদ আছে। তাই যখন তাইকে পরিত্যাগ করে, অতি সামান্য ঘরাও কথার যদিও এই দুর্বলতা ঘটে, কিন্তু বিবাহ এমন গুরুতর আকার ধারণ করে যে পরস্পরের সুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। পাকা প্রতিবাসীর সঙ্গে যে সাধারণ সৌহার্দ্য তাহাও উভয়ের মধ্যে থাকে না। এই জন্ত ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, সমুদ্রের উত্তর তীরবর্তীগণের মধ্যে যে দূরত্ব তাহা অপেক্ষা নদীতীরবর্তীগণের দূরত্ব বেশী (Brooks make wider difference than Oceans). সেই জন্তই দেখা যায় বাঙ্গালীর সঙ্গে উড়িয়া, আসামী বা বেহারীর যেমন রেখারেখি, দূরবর্তী অজ্ঞাত ভারতবাসীর সঙ্গে তেমন নহে। সেই জন্তই বঙ্গবিভাগে আমাদের এত আশঙ্কা। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমরা আগ্রহ এবং সন্দর্ভ আছি, বুঝাইরা না পড়িলে আর কোন ভাবনা নাই। কিন্তু একটি বিষয় সর্বাপেক্ষে বিবেচ্য, তাহা এই—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একতার মূলতত্ত্ব কি? সামাজিক রীতিনীতি, বিধি-ব্যবস্থা,

আচার-ব্যবহার, বাহাদিগকে সাধারণতঃ জাতীয় একতার মূল উপাদান বলিয়া সকল জাতির মধ্যে ধরা যায়, তাহাই কি বাঙ্গালীর সম্বন্ধেও খাটিবে? কিরূপপরিমাণে খাটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ খাটিবে না। বাঙ্গালী ছুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মে বিভক্ত। একদেশবাসী বলিয়া আচার-ব্যবহার কিরূপপরিমাণে এক হইলেও ধর্মের বিভিন্নতা এ বিষয়ে ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উৎপন্ন করিয়াছে। সুতরাং ইহার উপর আমরা বিশেষ জোর দিতে পারি না। দূরত্ব এবং নিকটবর্তিতাও এখানে মাণবগুরুপে ব্যবহার করা চলিবে না। সিলেটবাসী, কলিকাতাবাসী বা মানভূমবাসী বাঙ্গালী; কিন্তু বালেশ্বরবাসী ও মেদিনীপুরবাসী এক জাতি নহে। অন্ততঃ একজাতি বলিয়া গণনা করা হয় না। এখনই কথা উঠিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের কোনও বিষয়েই মিল নাই—আচার-ব্যবহারে মিল নাই, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান নাই। সুতরাং একজাতি থাকিবার আন্দোলনটার যে কোনও মূলগত ভিত্তি আছে তাহা নহে। ইহা কেবল ভারতবাসীর মঙ্গলমীল প্রকৃতির একটা উজ্জ্বল মাঝ, তাহাদের পরিবর্তন বিরোধিতার একটা বহিঃপ্রকাশ। উড়িয়াকে যদি বাঙ্গালী হইতে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন করা যায় হইবে। কেননা, বাঙ্গালীর

সহিত মোটের উপর উড়িয়ার যে পার্থক্য, পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গের পার্থক্য বোধ হয় তাহা অপেক্ষা কম নহে। সুতরাং ভাবার কথা ছাড়িয়া দিলে, উভয়কে দুই দেশে পরিণত করা অতি কষ্টকর ব্যাপার নহে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন শাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আন্দোলন না বামাইতে পারি, কিন্তু উভয়কে একত্র করা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। এখন যদিও শাসনপ্রণালী একই আছে, কিন্তু চিরদিন এক থাকিবে না। অস্থিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দিন দিন যেমন ভিন্ন হইবে, জাতীয় ঐক্যটিও সেই পরিমাণে ভিন্ন হইবে, ইচ্ছা না করিলেও হইবে। এই তো জী-শিক্ষা বিষয়ে পূর্ববঙ্গের গবর্ণমেন্টের কিঞ্চিৎ বেশী আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অল্প দিকে আবার পশ্চিমবঙ্গে শাসনের কঠোরতা কিঞ্চিৎ কম। তার পর যদি ইউনিটাসিটি ও হাইকোর্ট নতুন করা হয় তাহা হইলে বাহিরের দিক্ হইতে একতা-বন্ধন একরূপ ছিন্ন হইয়া যাইবে। চিন্তাস্রোত পর্যন্ত বদলাইয়া যাইবে। বাহির হইতেও যে সময়ে সময়ে মনোমালিন্যের কারণ ঘটবে না তাহা নহে। রাজনৈতিক দিক্ হইতে দিন দিন বিভিন্নতা বাড়িবেই, আমাদের জাতিভেদ ও রক্ষণশীলতা কোনও প্রকার সামাজিক ঘন নিবিষ্টতার অন্তরায় চিরদিনই রহিয়াছে। তাহা যে আজ আমরা হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক রোগের ভেদভ্রমরূপ ব্যবহার করিতে পারিব, তাহা নহে। বরং দিন দিন মেলামেশার ব্যাঘাতই উৎপন্ন হইবে, দুই বঙ্গ একত্র থাকিবার

সময় কাজকর্মোপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে বাতায়িত ছিল, সুতরাং আদান-প্রদানের একটা সুবিধা ছিল। দিন দিন সেটাও যে কমিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গবাসী পাইলে কেন আর পশ্চিমবঙ্গবাসীকে নতুনবঙ্গে চাকুরী দেওয়া হইবে? সুতরাং ইচ্ছার হউক অনিচ্ছার হউক দিন দিন উভয়ের মধ্যে প্রাত্যহ্য বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ স্থলে বাঙ্গালীকে একজাতি রাখিবার উপায় কি? এমনও বাহা সমগ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী করিয়া রাখিয়াছে, সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যবন্ধনের রন্ধু-বন্ধন হইয়া রহিয়াছে, সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে আরও শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে। কে শ্রীহট্ট, শান্তিপুর, পুুলিয়ারাকে একস্থজে গাঁথিয়া বাঙ্গালী-হারে পরিণত করিয়াছে? তিনি আর কেহ নহেন, আমাদের বরণীয়া মাতৃভাষা। যে ভাষা অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ আগুন লাভ করিয়াছেন, এ বিপদে তাঁহার পরণা-পন্ন হওয়া ছাড়া বাঙ্গালীর আর অন্য গতি নাই। অসম্ভব হইলে আমরা নিজেরাই আমাদের বন্ধ বিদীর্ণ করিব। কেন, এখন তাহাই নির্দেশ করিতেছি।

ভাষার দুই দিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। কণোপকণনের ভাষা ও লিখনের ভাষা সর্বত্র বিভিন্ন। ইহা কেবল বাঙ্গালীর বিশেষত্ব নহে। একই দেশে একই জাতির মধ্যে কণোপকণনের ভাষা নানা হইতে পারে, কিন্তু লিখিবার ভাষা এক। এই লিখিবার ভাষা একাধিক হইলে জাতীয় একতা বেশী দিন টিকিতে পারে না। বহু

প্রাকৃতের মধ্যে এক সংস্কৃতই কেবল সকলকে এক করিয়া রাখিয়াছে। লওনের কথিত ভাষা, পার্শ্বের কথিত ভাষা নহে, কিন্তু ইংরাজীর সংস্কৃত এক। শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন একমাত্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু বিভিন্ন অংশের জীবনী-শক্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে যেমন অংশ সকলের একতা বিনষ্ট হইয়া যায় তেমনি বিভিন্ন প্রাকৃত সকল এক বন্ধন-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া ভাবার একত্ব বিধান করিতেছে। যে প্রাকৃত ভাষাতেই আমরা কথা কহি না কেন, লিখিবার সময় সকলেরই আশ্রয় এক সংস্কৃত। গ্রীকদের প্রাকৃত ভাষা রচিত্তে সম্পূর্ণ অবোধা হইলেও গ্রীক ও রচিত্তে লিখিবার ভাষা একই। এই সংস্কৃত ভাষাই একতার ভিত্তি। লিখিয়া বধন মনের ভাব প্রকাশ করিলাম, তখন সকলের নিকট সুবোধ্য। সংস্কৃতের একতা রক্ষাই জাতীয় একতা-রক্ষার একমাত্র উপায়। এই একতা হারাইলে জাতীয় একতা রক্ষা অসম্ভব। আজ যে আসানী ও উড়িয়া বাল্যলী হইতে স্তম্ভ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ এই যে তাঁহাদের লিখিবার ভাষা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নতুবা উড়িয়া ভাষার মধ্যে এমন কিছু নাই, বাহাতে উহা বাল্যলার একটা প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। গ্রীকদের কথোপকথনের ভাষা লিপিবদ্ধ করিলে তাহার সঙ্গে বাল্যলার সংস্কৃতের যে বিভিন্নতা দেখা যাইবে, উড়িয়া ভাষার বিভিন্নতা তাহা অপেক্ষা কিছুতেই অধিক দাঁড়াইবে না। অথচ গ্রীকবাল্যলী বাল্যলী,

কিন্তু উড়িয়া বাল্যলী নহেন। অর্থাৎ একটি প্রাকৃতকে সংস্কৃত করিয়া জাতীয় এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক শাসনাধীনে থাকিয়াও সে বিচ্ছিন্নতা দূর করিবার উপায় মিলিতেছে না। ভাষার বন্ধন ছিন্ন হইলে আর কিছুতেই জাতীয় একতা রক্ষা করা যায় না। এই ভাষাগত বিপত্তিতেই বাল্যলী উড়িয়া ও আসানীকে হারাইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। বাল্যলীভাষার সংস্কৃতের বিত্তত্বটা সর্বপ্রথমে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু সে দিকে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ শিথিলতা দৃষ্ট হইতেছে। সেই জন্য আমরা ভীত হইরাছি। পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন সংস্কৃতের আবির্ভাব হইয়াছে। অন্ততঃ কেহ কেহ পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাদেশিক ভাষার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ চলিলে বঙ্গবিভাগে আর বেশী বিলম্ব হইবে না। কলিকাতাবাসী যদি তাঁহার কথোপকথনের ভাষার লেখন, তবে ঢাকাবাসী না লিখিবেন কেন? এই রূপে বাল্যলার দুইটি সংস্কৃতের সূচনা হইবে। দুইটি সংস্কৃত হওয়াও বা, আর জাতীয় একতা বিনষ্ট হওয়াও তা,—একই কথা। কলিকাতার ভাষাকে সংস্কৃত করিলে যেমন তাহার চতুর্পার্শ্বে কতকগুলি প্রাকৃত মিলিবে, পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতের চারিদিকেও প্রাকৃতের অভাব হইবে না। সুতরাং বাল্যলী ধীরে ধীরে দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তার পর লিপিপাঠ্য ঘটিলে তো বোল কলা পূর্ণ। আমাদের দৃষ্টিতে এখনই বিশেষ সাবধান হইতে

হইবে। যে পথে সামান্য একটু আশঙ্কার কারণে সে পথে আমরা বাইতেই পারি না। কেননা, তাহার একতাই আমাদের এক মাত্র সম্ভাব্য। এখন চারিদিকে বাকাল্য তাহার নানা প্রকার পরিবর্তনের বরূপ প্রস্তাব সকল উপস্থিত হইতেছে তাহাতে ভয় হয়, এক বন্ধ তাহা গ্রহণ করিলেও অপর বন্ধ যদি তাহা গ্রহণ না করে তবে বিপদ ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। দুই বন্ধের শাসন-বিভাগ যখন ভিন্ন, তখন উভয়ের পক্ষে সব বিষয়ে একযোগে চলা সম্ভব হইবে না। পূর্ববন্ধের কর্তারা যদি বলেন, রোমান অক্ষর প্রচলিত হউক, তাহা হইলে বালকেরা দুই বন্ধের অক্ষর পরিচয়ের পরিশ্রম হইতে রক্ষা পাইবে এবং আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ নেতৃ-বর্গের অনেকে সে প্রস্তাবে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সায় দিবেন। ইতিপূর্বে একবার ঢাকার স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলনের দেশীয় অসু-মোদনকারী মিলিতে দেবী হয় নাই। আবার সেই প্রস্তাবটিকে পুনর্জীবিত করিলে কি উত্তর দিবার আছে? কলিকাতার যদি কলিকাতার ভাষার পুস্তক লেখা অন্তায় না হয়, ঢাকার কেবল অন্তায় হইবে? এখন তো লোমায় সোহাগা। ঢাকা এখন স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজধানী। ঢাকার ভাষার বই লিখিয়া দেবনাগর অক্ষরে ছাপাইতে আরম্ভ করিলে কে ঠেকাইয়া রাখিবে। দেবনাগর অক্ষর প্রচলনের জন্যও তো সভা-সমিতি

হাসিত হইয়াছে। এক বন্ধ তাহা গ্রহণ করিয়া অন্ত তাহা গ্রহণ না করিলেই তো কার্যসিদ্ধি। এইরূপ যখন চারিদিকে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন কোনও প্রাদেশিক ভাষাকে সংস্কৃতের আসনে তুলিয়া বেওয়ারী নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। একদিকে শাসন-বিভাগ ইতিপূর্বেই সংঘটিত হইয়াছে, একতাহজের এক তার হিঁড়িয়াছে। আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, শিক্ষাসভ্যতার, সর্বোপরি কথোপকথনের ভাষার এক হ্রস্বতক্রমণীয় বিভিন্নতা তো চলিয়াই আসিয়াছে, শাসন বিভক্ত হওয়ার আরও বাড়িবে। এরূপ হলে জাতীয় একতার বৈকল্য বরূপ লিখিত ভাষার মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করা বাকালীর জাতীয় জীবনের বিনাশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া নয় কি? আমরা বলিতে বাধ্য, বাহারা প্রাদেশিক ভাষাকে বাকালীর সংস্কৃতের পদবীতে উন্নতি করিয়া দিতেছেন, তাহারা নিজেদের অন্ত্যাতসারে খাল কাটিয়া কুমীর ডাকিয়া আনিতেছেন। কোনও বিশেষ প্রাকৃত ভাষা যতই শ্রুতিময় হউক না কেন, কথোপকথনের উপযোগিতা তাহার মধ্যে যতই বেশি থাকুক না, ভাষার একতা বিনাশ না করিয়া সে সংস্কৃতের আদর গ্রহণ করিতে পারে না। বাকালীর পক্ষে ভাষার একতার বিনাশ আর জাতীয় একতার বিনাশ একই কথা। সুবীণ কণাটা একবার প্রণিধান করেন, এই প্রার্থনা।

ঐশীয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বিষয়বস্তু ।

বিষয়কে কবি বেক্সপ অমৃত করণ করিয়াছেন, এরূপ বৃষ্টি আর কুজাপি নহে। জীবনের অতি সাধারণ সাধারণ ঘটনা লইয়া, কবি যে ইন্দ্রজাল সৃজন করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, চকের জলে ডালিতে হয়, কিন্তু সে স্নানাপুরী পরিত্যাগ করিয়া বাইতে ইচ্ছা হয় না। তাহার পূর্ন-রচিত কাব্যত্রয়ের কবিত্ব প্রধানতঃ কল্পনার উদ্ভাবনশক্তিসমূলক, সে শক্তি বৈদেশিক ও জাতীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছিল। বিষয়কে উদ্ভাবনশক্তির অভাব লক্ষিত না হইলেও, মূলে ইহার কবিত্ব তির প্রকৃতির, এবং এই কাব্যেই কবির আধ্যাত্মিক-কাব্য-প্রণয়ন-প্রতিভা প্রথম দীর্ঘ শক্তিতে প্রতিভাত দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকামি অকিকিংকর নির্মাণসাধনীর সমাবেশে হৃদয় পুরস্যা হৃদয় নির্মাণ করে। সুনিপুণ শিল্পী বাঙ্গালী জীবনের অতি-প্রাণাত্মিক ঘটনাবলী সজ্জিত করিয়া, নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে, যে অপূর্ণ দৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়াছেন, জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাহা চিরদিন অমূল্য রত্নরূপে দীপ্ত প্রদান করিবে। যে কল্পনা, প্রান্তরপার্শ্বে, প্রকৃতি-বিপ্লবমধ্যে, শৈলেশব্দ-মন্দিরে, কুমার অগংসিংহ ও গড়কন্দারপের অধীশ্বরপুত্রী তিলোত্তমার প্রথম সন্দর্শন ঘটাইয়াছিল; বাহা হইতে বিদ্যার সাহস ও চক্ৰবর্তী, এবং বিলাস-ভবনে, ইজিরসেবা-মধ্যে, দেবীপ্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিতা আর্য্যনার অপ্রাপ্য প্রণয়োৎসর্গ প্রকৃত; যে মহতী

উদীপ্ত কল্পনা হইতে সমুদ্ভূত-সৈকতে, বাসুকাত্ম-পে, বা বিজন কাননে, দয়া ও পর-দুঃখকাতরতার স্বভাবপ্রতিমা এবং কৃত্রিম-ব্যবহারানিরম্বিত রমণীপ্রকৃতির আদর্শ কপালকুণ্ডলা, ও তজ্জীবনপিপাস, অবিচলিত-সংকল্প, অকৃত-তত্ত্বধর্ম্মোপাসক, ভয়াবহচরিত্র কাপালিকের উদ্ভব; সে কল্পনার জীড়াকেন্দ্র এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কল্পনার নিকটতর সৃষ্টি মনোরমারূপ চিত্রও এ কাব্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এখানে বাহা কল্পনার সৃষ্টি, তাহাতেও যেন পরিচিত বস্তুর সমাবেশ। তাহার অভিনব দেখিয়া চমৎকৃত হইবার কিছু নাই, অগত তাহার মাধুর্য্য অতুলনীর। স্তম্ভরং বাহা দেখিলেই সুপরিচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না, বাহা চিন্তার আরম্ভ করিতে প্রয়াস পাইতে হয়, এরূপ জিনিসের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। কবি যেন আপনার কিছুই এখানে সন্নিবেশিত করেন নাই, সকলই যেন আমাদের নিজের জিনিস, বাহার সহিত প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে, অতি বনিষ্ঠভাবে; প্রীতির ভাবে, ঘেঁষামিষি করিতেছি, সকলই তাহাই, কবি কেবল যে সকলকে আপনার মত সাজাইয়া রিয়াছেন। কিন্তু সেই সংযোজনায় মজা, ঘটনার পর ঘটনা, কাব্যখাজগণের কাব্যের পদ কার্য্য, সংস্কৃত করিতে, পাত্রবিশেষের সহিত পাত্রবিশেষকে সব্ববিশিষ্ট করতঃ প্রত্যেকের প্রকৃতির পরিচূরণ ও পরিণতি সম্পাদনে, এবং সর্বোপরি, সম্পূর্ণ চিত্রের স্রবৎ কলকল্প, মানবশিকার ভক্ত, স্বর্গ-

নরকের প্রকৃতি-ভেদ চিত্রাঙ্গিত করিতে, কবি বৈষ্ণব স্বভাবজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যাহুত্ব, চিত্তানিরতি ও কোশলকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিম্নীর সৌন্দর্য্য-কল্পনার এখানে উচ্চতম প্রকাশ।

কবির বঙ্গদর্শিত সাময়িক পত্র বঙ্গদর্শনে বিষয়ক প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং উক্ত পত্রিকার প্রকাশিত কবির কাব্যসমূহ-মধ্যে বিষয়কই প্রথম। বঙ্গদর্শনকে একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা করিতে কবি বৈষ্ণব প্রয়াসবান ছিলেন, বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত স্বরচিত কাব্যখানিকেও সেইরূপ উচ্চশ্রেণীর করিতে বঙ্গ পাইয়াছিলেন। কবি সে বস্ত্রে সম্পূর্ণ সকলতা লাভও করিয়াছেন। বিষয়ক যে তাঁহার বিশেষ বস্ত্রের ফল, তাহা প্রতিপদে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভাবা, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত, একই ভাবে প্রবহমান, অতি সুসজ্জিত, সমগতিবিশিষ্ট, এবং কাব্যের বিষয় বিবেচনার, সরল ও স্থূলপাঠ্য, অর্থ সহজে বোধগম্য—এবং স্থূলবিশেষে ভাবা বিশেষ অর্থবাহক; ইহার গল্পগঠনে জটিলতা নাই, অথচ সেই সরল ঘটনাবিভাগসমূহে কবি বৈষ্ণব চিত্তাশীলতা ও কোশলকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ বলিতে হইবে; স্বভাব বা বৃত্ত-বর্ণনের বাহ্যিক আর কুত্ৰাপি এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে বর্ণনা এরূপ বখাবৎ, একতরূপ পূর্ণতার বশে, পড়িতে যোষ হয় বৃত্ত বেন চক্রে সমুদ্রে বিস্তারিত রহিয়াছে, কবি বেন, পাঠকে সমুদ্রে দণ্ডারমান রাখিয়া, অঙ্গুণিনির্দেশপূর্বক, তাহার

কুত্ৰাপি কুত্ৰাপে পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিতেছেন—আর বৃত্ত দেখানে কল্পনাগ্রন্থ সেখানে তাহা অতীব কবিত্বময়; এ কাব্যে চরিত্রাঙ্কনেও সেইরূপ পূর্ণতা, কবি প্রকৃত্ত কল্পনার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; লোকশিকার জড়ই এ কাব্য প্রথম রচিত, সে শিকা ইহাতে হরসম্পর্শী।

আমরা কবির কাব্যান্তর-সমালোচনার বলিয়াছি, বঙ্গবাত ভাবার, হই একটি কথা, অনেক সময়ে একটিবার নাম দ্বারা, অঙ্কিত চরিত্রের আভাস-প্রদানে তাঁহার বৈষ্ণব কল্পতা, অতি বিস্তৃত বর্ণনারও সেরূপ অভিব্যক্তি সন্নিবেশিত হয় না। তাঁহার কাব্যপাণ্ডপের নাম-নির্বাচনেও আমরা তাঁহাকে বিশেষ সৌভাগ্যের অবিকারী দেখিয়াছি। বিষয়কেও, একাধিক স্থলে, কবির সেই সৌভাগ্যশালিতা, চরিত্রাঙ্ক-সম্পাদন-কল্পতার সেই বিশেষত্ব, দেখিতে পাওয়া যায়। এ কাব্যে, অতি কুত্ৰাপেশের সমাবেশেও, চিত্তা ও কোশল প্রতীকমান। স্বর্ঘ্যমুখী, কমলমণি, কুন্দনকিনী, সকলেই নিজ নিজ রমণীয়ত্ব, নিজ নিজ বাহু ও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য-হেতু, কুলের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সে তুলনার প্রভেদ আছে, সেই পৃথক্বে চরিত্রের প্রকৃতি ও প্রকৃতিভেদ সূচিত হইতেছে। জড়-প্রকৃতিতে বহুপ্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া কবির চক্রেই সহজে অহুত্ব হয়। কুলেও বহুপ্রকৃতির ছায়া আছে; তাহার তাহা প্রকাশ করা সহজ নহে, কিন্তু কল্পনার চক্রে দেখিলে সে সাধুশ্যের অহুত্ব অসিবার্য্য। স্বর্ঘ্যমুখী, কমল, ও কুন্দে

বে প্রভেদ, ভরামক পুনঃপ্রবেশে তাহা প্রতি-
বিম্বিত হেথিতে পাওয়া যায়। গৌরব ও
পাতীর্ঘ্য স্বর্ধ্যমুখীর প্রকৃতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ ;
তিনি প্রৌঢ়বে উপনীতা, গৃহিনীভাবে
পরিণতা, তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যও সে বয়সের,
সে প্রকৃতি-পাতীর্ঘ্যের তাব প্রতিকলিত ;
তাহার স্বামীপ্রেমেও সেই গৌরব, সেই
পাতীর্ঘ্য, সেই হিরণ্য প্রায়শ তাব, অথচ
তাহার পূর্ণপ্রকৃতি প্রকাশমান ; তাহাতে
কমলমণির চাকল্যেরও যেমন অভাব, তাহার
চরিত্রপ্রভা তেমনই কুন্দনন্দিনীর ভাব
ভিম্বিতজ্যোতি বা স্বরপ্রকাশ নহে। একুণ
প্রকৃতির প্রতিবিম্ব ফুলের মধ্যে স্বর্ধ্যমুখীতে
তিনি আর কোথায় পাইব ? স্বর্ধ্যমুখী
বৃহৎ, উজ্জল, শুক্লের ভাবে পরিপূর্ণ।
আবার স্বর্ধ্যমুখী স্বর্ধ্যদেবকে সর্বদা সমুখে
রাখিয়া দিক্‌পরিবর্তন করে, স্বর্ধ্যদেব
অন্তর্মিত হইলে শুকাইয়া যায়। পতি-
মাজলীবিভা নগেন্দ্রবনিতাও পতির পদাঙ্ক
অঙ্গসরণ করিয়া চলিতেন, পতির প্রকৃত
প্রীতিপূর্ণ মুখপানে তাকাইয়া জীবনের
সার্থকতা বোধ করিতেন ; যেই সে মুখ-স্বর্ধ্য
তাহার পক্ষে অন্তর্মিত হইল, অমনি কালিয়া
আসিয়া সে সৌন্দর্য্য ঢাকিল, সে গৌরবের
ফুল শুকাইয়া গেল। কমলও তাহুকর-
প্রদীপ্ত ; সে পবিত্র, শুভ্র, বিমল কাঙ্ক্ষি,
দিনমণির স্নান-সংযোগ ব্যতিরেকে, সারাদিন
ভরপ কোমল অথচ তাব্র জ্যোতিঃ প্রতি-
ভাত করিত না। প্রেমময়ী কমলমণি
প্রকৃতি কমলবৎ সর্বদা হুটাই থাকি-
তেন, কিন্তু সে নিত্য প্রকৃততা স্বামীর
আদরে পরিপোষিত না হইলে, তাহার

অভিষেক লভাবনা হীনতাপ্রাপ্ত হইত।
কমলমণিতে নিত্য প্রেমমতা, তাহার প্রকৃতি
চাকল্যময় ; সে চাকল্য প্রেমময়ীর প্রেম-
পারাবারের তরঙ্গভঙ্গ। স্বর্ধ্যমুখীতে যে
পূর্ণতার হিরণ্য উদ্ভব করিয়াছে, কমল-
মণিতে সেই পূর্ণতা-হেতুই সে প্রকৃতি টল-
মলারমান, যেন প্রাচুর্য-জল-সম্ভার-সমন্বিতা
মোতবিনীবৎ ফুলপ্রাবনামুখী। স্বর্ধ্য-
মুখীর প্রেমের ঐকান্তিকতা, আপনায়
স্বামীতে তাহার কেন্দ্রীভূত তাব, তাহার
আত্মগত সংবততা, আর স্বর্ধ্যমুখী ফুলের
বর্ণগাঢ়তা, তাহার নিবিড়তা, সে উজ্জল
পীতের উপর ক্রকাতার প্রক্ষেপ, আমরা
একই প্রকৃতিবাহক বলিয়া বুঝি। অস্ত
দিকে, পদ্ম শুভ্র, পবিত্র, নরনন্দিতকর,
সুগন্ধে মনোমুগ্ধকর, তাব্র অথচ বিরলবর্ণ,
—সে গাঢ়তাপূর্ণ, সে অসংবেত ভাসাভাসা
ভাবে, সে পবিত্রতার আদর্শ, আমরা
কমলের প্রেমের বিকিণ্ড অথচ বিতক
প্রকৃতি, তাহার অভে বিতৃষ্ণি, তাহার
সার্বজনীন তাব, প্রকাশপ্রাপ্ত হেথিতে
পাই। স্বর্ধ্যমুখীর স্বরকোমার্য্য যেন
একে সমর্পিত, চির-প্রেমময়ী কমলের
প্রীতির তাব, স্বামীর চতুর্দিকে বিবর্তমান
থাকিয়াও, যেন অন্যো ব্যাপ্তি লাভ করিত।
এই ঐকান্তিক বা আত্মগত এবং বিকিণ্ড
বা সার্বজনীন তাব স্বর্ধ্যমুখী ও পদ্মগুণে
সাদৃশ্যগত। সেইরূপ, কুন্দনন্দিনীও কি
কুন্দ-প্রকৃতিক নহে ?—শুভ্র, পবিত্র
জ্যোতিমান, স্নিত শুভ্র, সুস্বকৃতি, অপ্রহর
—যেন বিকসে হুটাই বিকসেই অসিক
হয়, যানবচক কথোতিং আকর্ষণ করে।

নগেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে কলিকাতা বাইতেছেন, পথে বিবস কড় উঠিল। তাঁহার আদেশক্রমে নাবিকেরা নৌকা কিনারায় বাঁধিল। নগেন্দ্র সৰুটে পড়িলেন, ঝড়ের ভয়ে নৌকা হইতে নামিলে নাবিকেরা তাঁহাকে কাপুরুষ মনে করিবে— না নামিলে স্বর্ধ্যসুখী কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কেননা, তাঁর্য্যা স্বর্ধ্যসুখী নৌকাযাত্রাকালে মাথার দিবা দিয়া ঝড়ের সময়ে তাঁহাকে নৌকার থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর্য্যায় মনস্ত্বষ্টির অস্ত, তাঁহার রমণীমূলত অনিষ্টাশকার নিরা-করণার্থ, কৃত অলীকারের বিকলচিত্তরণেই বা ক্ষতি কি, এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন মনে করিয়া, আখ্যায়িকাকার উত্তর করিতে-ছেন, “আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন।” নাটক-কার হয় ত এত টুকুও বলিতেন না, তিনি হয় ত খগত বাক্যে নগেন্দ্রকে দিয়া এইরূপ বলাইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন, “নৌকা হইতে নামিলে নাবিকেরা আমাকে কাপুরুষ মনে করিবে, কিন্তু আমাকে নামিতেই হইবে, কারণ তাঁর্য্যা স্বর্ধ্যসুখী মাথার দিবা দিয়া ঝড়ের সময় আমাকে নৌকার থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন।” পাঠক ইহা হইতেই বুঝিতেছেন, নগেন্দ্রনাথ তাঁর্য্যায় তক্তি ও ভালবাসার কতদূর আত্মবান ছিলেন, যে গৌরবান্বিত পতিপ্রেমকে তিনি কত-দূর সম্মান করিতেন, অসাক্ষাতেও, কেবল-মাত্র কথার থাকিতেও, সে তাবের বিনিময় সম্পাদনে তাঁহার মন-কিরূপ আত্মহাবিত

ছিল। অল্প কথার কবি এই নান্দ্যতা-ঐগ্যের প্রকৃতির বেক্রপ আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহা অল্পকপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইত না। ইহা কবির কোশলময় উপায়, তাঁহার নিজস্ব। এ ক্ষমতা সেকপীর প্রকৃতি উচ্চশ্রেণীর নাটককারদিগের ক্ষমতার সঙ্গু।

“তিমিত প্রদীপে,” “হারা,” ও “পূর্ব-বৃত্তান্ত” নামক পরিচ্ছেদজন্মে কবি যে অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণ করিয়াছেন, তাহার শেষ চিত্রে নগেন্দ্র-স্বর্ধ্যসুখী পরস্পরের ত্বকে মস্তক তন্ত করিয়া বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোমন করিতেছেন, রোমনে কত সুখ অল্পভব করিতেছেন। সে রোমনস্ব-বিম্বলতার অবসানে, স্বর্ধ্যসুখী পূর্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, নগেন্দ্রনাথের কোতুল নিবারণ করিলেন, এবং এই বলিয়া শেষ করিলেন, “এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু হি! তুমি আমার ভালবাস না। তুমি আমার গারে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গারের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।” স্বাধীর প্রীতি-প্রসন্নতার পূর্ণবিবাসে স্বর্ধ্যসুখী কেমন পূর্ববৎ সংস্থাপিত। কি অসাধারণ রমণী-মূলত সরলতা। বিচ্ছেদের পর পুনর্নিমনে স্বর্ধ্যসুখী যেন আপনার স্বামীকে অধিকতর আপনার মনে করিতেছেন, হৃৎপের সৃষ্টি যেন নিচ্চিহ্নিতরূপে সুস্থির গিয়াছে। এ অভিব্যক্তির ভাষা কবির আপনার সম্পত্তি। ইহার তুলনা কেবল প্রথম শ্রেণীর কবি-গণের লেখাতেই পরিদৃষ্টমান।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নবরের কল্পনাও অতীত মনোহর এবং কবিত্ব ও কৌশলপূর্ণ। এই স্বপ্নবর ও কুন্দচরিত্রই এ কাব্যে বিভূষিত্ত্বাবনশক্তিসমুৎ, এবং ইহাদের সৌন্দর্য্য কবির অন্তান্ত কল্পনা হইতে নিষ্কটতর বলিয়া বোধ হয় না। এ স্বপ্নবৃত্ত-বর্ণনায় তাবাও অতি লাগিত্যময় এবং স্বপ্নবরের অভিব্যক্তি বিশেষ চিত্তাশীলতার পরিচায়ক। কুন্দ একাকী যোগেশ্বার পিতার সেবামুগ্ধা করিতেছিল, ক্রান্তি ও অনিচ্ছা ভক্ত পিতৃশ্রবণার্থে তজ্জাতিভূতা হইয়া আছে, কুন্দের স্বর্ণগতা জমনী তাহার মন্তক-সান্নিধ্যে স্বপ্নাবিভূতা হইলেন। মাতৃমূর্ত্তি জ্যোতির্পরী, কীরীটকুণ্ডলারিকুণ্ডলভূতা, তরু-সুবৃহৎ-দীপ্তিময় চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী, উক্ত গগন হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া সহস্র নীতলরশ্মি পাত করিতে করিতে, কুন্দনন্দিনীর মন্তকোপরি আসিল, জননীর কাকণ্যগ্রন্থন মুখমণ্ডল, মেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে ক্ষুরিত হইতেছে। তিনি সম্মুখাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উঠাইয়া কোড়ে লইলেন এবং মুখচূষন করিয়া তাঁহার সহিত নক্ষত্রলোকে বাইবার ভক্ত আস্থান করিলেন। কুন্দ বাইতে সাহস করিল না— দেখিয়া তাঁহার কাকণ্য-গ্রন্থন অথচ গভীর মুখমণ্ডলে অনায়াসজনিতবৎ ক্ষুণ্ণ বিকাশ হইল। কুন্দ এক সময়ে মনোদীপ্তার ধূল্যবলুপ্তিতা হইয়া সেই নক্ষত্রলোকে বাইবার ভক্ত কাতর হইবে, তখন তিনি পুনরায় দেখা দিবে, এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। বাইবার সময় অঙ্গুলিসংক্বেদ্যারা কুন্দকে গগনপ্রান্তে এক পুরুষমূর্ত্তি এবং

এক ভ্রামারী পদ্মপলাশময়না সুবর্ত্তীর মূর্ত্তি দেখাইয়া, তাহাদিগকে, ইহ ভগতে তাহার অন্তরের কারণ-স্বরণ, পরিহার করিতে উপদেশ করিয়া গেলেন। সে পুরুষমূর্ত্তি দেবনির্ম্মিত মূর্ত্তি, তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল নকরুণ কটাক; তাঁহার ময়ালবৎ দীর্ঘ জীবৎ বহিম শ্রীবা এবং অন্তান্ত মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, তাঁহা হইতে আশঙ্কা নষ্টবে। নারীমূর্ত্তিও দেখিতে কুন্দের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিল না, কিন্তু জমনী তাহাকে নারীবেশে রাক্ষসীনির্দেশে তাহাকে বিবধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিতে বলিলেন। কুন্দনন্দিনী মাতার সহিত নক্ষত্রলোকপ্রষ্ট হইয়া ভূতলে আসিয়া ভ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার তরোকে প্রত্যাগমনের পর পিতৃ-সেবারূপ কর্তব্য পালনের ভক্ত তাঁহাকে এ পৃথিবীতে থাকিতে হইয়াছিল। সে কর্তব্যের অবসানে এখন তাঁহার শ্রলোকে প্রত্যাগমন করিয়া এ সংসারের হঃখরেশ হইতে মুক্তিলাভের অবসর ও সময় উপস্থিত। মাতা, যদি তাঁহাকে এই সুবোধসময়ে নক্ষত্রলোকে লইয়া বাইতে পারেন, এই আশাশ্রয়ীণ মনে হাস্যময়ী। তাঁহার প্রস্থান পরে পিতৃ-সেবাহুরোধে কুন্দনন্দিনীর এ পৃথিবীতে অবস্থান ও তৎক্ষণে এ সংসারের হঃখভোগ স্বরণ করিয়া সন্তান প্রতি তাঁহার কাকণ্যের সঞ্চার। এ পৃথিবী হইতে লইয়া বাইবার ভেটের নকলতা লাভ না করিলেও ভেটের ইহ জীবনের তত্তান্ত সবকে বাহা বলিবার ভাষা ভক্তকে বলিতে আসিবার ভাষা

পক্ষে এই অবলম্বন সম্বর। আর সেই অপূর্ণসৌন্দর্য্যবর হৃদ কুন্দনন্দিনীর মনকে নক্ষত্রলোকের নিকে আকৃষ্ট করিবার সম্পূর্ণ উপকরণসম্বিত। সুতরাং কুন্দনন্দিনীর এই ভাবে স্বপ্নাবিভূতা হওয়া তৎকালীন অবস্থার কি উপযোগী! এই স্বপ্ন আবার কেবল কুন্দনন্দিনীর অপার্থিব প্রেক্ষিতর আভাস প্রদান করে নাই, ইহাতে নগেন্দ্র-চরিত্রও অল্প রেখাপাতে চিত্রকলিত হইরাছে, এবং কবি হীরা-চরিত্রেরও মূল রেখা ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। অল্প দিকে, কুন্দকে নগেন্দ্রনাথের দেবোপম শরীর-কান্তির প্রতি আকৃষ্ট এবং কারুণ্যপূর্ণ সুখভাবের সহিত সুপরিচিত করিয়া, তাঁহাকে অপরিচিত পুরুষসঙ্গে বিদেশগমনজন্ত প্রস্তুত করা হইরাছে। বেবন আধ্যাতিকার আরম্ভেই এক কথার কবি নগেন্দ্র-স্বর্বাদুখীর দাম্পত্যপ্রণয়ের প্রেক্ষিত সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই স্বপ্ন ভাবার এখানে নগেন্দ্রপ্রেক্ষিতেরও পূর্ণাভাস প্রদান করা হইরাছে। একজনে একস্থলে এত উদ্বেগের সাধন কৌশলবুদ্ধি ব্যতিরেকে সম্ভবে না। কুন্দনন্দিনীর দ্বিতীয় স্বপ্নও সেইরূপ অর্থব্যঞ্জক। এবার যাত্রা “বিভক্ত-ভক্ত-চন্দ্রবৎসল্যবর্জিতা নহেন, এক অতি নিবিড় বর্ণপোষ্ম লীলনীরদমণ্ডে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুর্দিকে অন্ধকারময় ককবাস্পের তরঙ্গোৎকণ্ঠ হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মল্লযাবুর্জি অল্প অল্প হালিতেছে। তন্মধ্যে কণে কণে সৌদামিনী প্রভান্বিত হইতেছে। কুন্দ মস্তকে বেবিল বে, ঐ হাস্য-নিমিত্ত বদনবর্তন, কীর্তন-সুখাহরণ। আরও

বেবিল যাত্রার ককণাময়ী কান্তি একদেব দ্বীপ্ততাবাশর।” হীরা প্রদত্ত বিবর্ণানে কুন্দ এই স্বপ্নদর্শনের অব্যবহিত পরেই বেবিলদেহ, বেবিলদেহ কালিদায় হৃদয়ের সংঘটন করিলেন, এই স্বপ্নদৃশ্যে তাহা কি কুন্দর সৃষ্টি হইরাছে! স্বপ্নও প্রকৃতি কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য! এ উদ্ভাবনে কি কুন্দর কবিত্ব! এই খানে কবি হীরাচরিত্রেরও দ্বিতীয় রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিবৃকের পররচনার প্রথম কথা এই—কবি কুন্দনন্দিনীকে প্রথম অস্ত্রে পরিণীতা করিয়া, বৈবৰ্ণ্যে নগেন্দ্রের প্রণয়পাজী করিলেন কেন? নগেন্দ্রের কুন্দস্বয়ং প্রকৃত জীবনের ঘটনা হইতে গৃহীত হইরা থাকিলে, এ প্রেমের অঙ্গসন্ধান নিশ্চয়োজন। ঘটনার স্বাভাবিকত্বের অভাব কিছুই নাই, কবি প্রকৃত জীবনে যেরূপ দেখিয়াছেন, বা ঘটনার বিবরণ যেরূপ জানিয়াছেন, কাব্যেও সেইরূপই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অল্পখা এ প্রেমের মূলে অনেক কথা নিহিত আছে। ঘটনা সত্য হইলেও, সেই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই, অবিকল বাহা ঘটনাছিল, কবি তাঁহার কাব্যে তাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রাখিয়া থাকিতে পারেন। বালিকা কুন্দকে পথে ফুড়াইয়া পাইয়া নগেন্দ্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইরাছিলেন। কুন্দনন্দিনী বালিকা হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে নগেন্দ্রনাথের অতুলনীর রূপের প্রভাব অনস্বত্ব ছিল না। তথাপি উভয়ের পরিণয়ের কল্পনা কাহারও হৃদয়ে স্থানান্বিত করে নাই। কুন্দনন্দিনী বালিকা, তাহার প্রকৃতি আশ্রয়প্রদান-

বিদ্যুৎ, আকীর্ষন ঘটনাস্রোত ভাষাকে
বেঙ্গলে বহন করিয়াছে, তাহারই অঙ্গুগমন
করিয়া, সংস্কোচে, আত্মবিলোপের সহিত,
জীবনপাত করিয়াছে ; তাহার পক্ষে
ইহা স্বভাবোপযোগীই হইয়াছে । কিন্তু
নগেন্দ্রনাথ সৰ্ব্বদে এ প্রেমের ব্যাখ্যা
অভিন্নরূপ । যদি সেই বালিকার অপার্থিব
বর্ণনাবিলাস, যদি তাহার শান্ত স্বন্দর
স্বকুমার দেহলাবণ্য, তাঁহার হৃদয়ে এক
অধিকার লাভই করিয়াছিল, তবে সে
আকারগত চন্দ্রকর, সে বেহসবন্ধ পূর্ণ-
সৌন্দর্যের সহিত মিলিত হইতে বিরত
থাকিলেন কেন ? বৈষম্যে বাহার পরিণয়
করিতে বিধবাবিবাহ-বিধির আশ্রয় গ্রহণ
করিতে হইরাছিল, কুমারীজীবনে তাহাকে
পুহিতী করিয়া সে সমাজ-বিরোধ পরিহার
করিতে পারিতেন । ইহার উত্তর এক
কথার নহে । নগেন্দ্রের কুম্ভাঙ্গুরাণের
অঙ্গুর বহিঃ এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে
মূলস্থাপন করিয়াছিল, স্বর্গমুখীর হৃদয়-
প্রাণনকারী গতিশ্রম সে অঙ্গুরকে বৃদ্ধি
পাইতে দেয় নাই । নগেন্দ্রনাথকেও কবি
এগরী, ভাষ্যাবৎসল করিয়া অঙ্কিত করিয়া-
ছেন । তিনি এত সহজে স্বর্গমুখীর প্রেম-
হুরাগকে ঐত্যাখ্যাত করিয়া কুন্দনন্দিনীর
পানিগ্রহণাভিলাষী হইলে, লোকে তাঁহাকে
সে সৰ্ব্বদে পবিত্রতার হিলাবে ঘোষারোপ
করিবার কারণ কিছু না দেখিলেও, তাঁহার
সাম্প্রদায়িকের বিশেষ প্রশংসা করিত না ।
আর সুবর্তীর রূপে চিত্তের বেক্স বিজ্ঞ
জ্ঞান, বালিকার রূপ মনোমুগ্ধকর হইলেও
সে রূপ জ্ঞানির উৎপাদন করে না । কুন্দ-

নন্দিনী স্বন্দরী হইলেও এখনও সুবর্তী নহে ।
কৌশলী কবি, একদিকে নগেন্দ্রের বিধবা
স্বন্দরীর প্রতি অঙ্গুরাণের ঘোষাবহ ঐক্যতির
সাম্য ক্রিয়বার জন্ত, যেমন সে অঙ্গুরাণের
বীজ পূর্বেই অবস্থাত্রে তাঁহার হৃদয়ে উণ্ড
করিয়া রাখিলেন, অস্ত্র দিকে, সেইরূপ,
নগেন্দ্রের চরিত্র-গৌরব রক্ষার জন্ত, অঙ্গুরো-
দ্বন্দ্ব রহিত ক্রিয়বার অতিপ্রায়ে, নগেন্দ্রের
সামিধ্য হইতে কুন্দকে স্থানান্তরিত করি-
লেন । এগর-বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে নিষ্কিণ্ট
হইলে তাহা সময়ে কলেকর ধারণ করিবেই ।
বাধা নগেন্দ্র প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ
হইলেন, তাহা স্বাভাবিক এবং সহস্র অঙ্গু-
লম্বনীর হওয়ার, আত্মদমনশক্তির অভাব-
জনিত তাঁহার দোষ লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে ।
আবার তাঁহার ভাষ্যাবৎসলতারূপ চরিত্রের
একদুগুণেও সুবিধা হইয়াছে । ইহাতেই
উৎপাদিত প্রেমের সম্পূর্ণ নিরাকরণ হইল
না । ইহার ফলে কবির চিত্তাশীলতার
অবিকতর অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায় ।
কুমারীর প্রতি প্রেমোত্তরান কাব্যের সামগ্রী
হইলেও, তাহাতে অপবিত্রতার কথা কিছু
না থাকিলেও, বাল্যলার হিন্দুসমাজে এক্ষণ
অঙ্গুরাণ সামাজিক ভাবে অঙ্গুরোদ্বন্দ্বীর নহে ।
হিন্দু-সমাজগঠন-প্রণালী, সে সমাজের
ব্যবহারনীতি, এরূপ অঙ্গুরাণের অঙ্গুরোদ্ব
নহে । সাম্প্রদায়িক-এগরী, বিবাহিত স্ত্রী-
পুত্রবধূর পরস্পরের প্রতি অঙ্গুরাণই,
ভক্তিবাৎসল্য ও সেবাসাহচর্যই, বাল্যলী
হিন্দুসমাজের লক্ষ্য বা উৎকর্ষাবর্ণ । নগেন্দ্র-
স্বর্গমুখীতে কবি সেই আদর্শই চিত্রিত
করিয়াছেন । সে আদর্শের বিরোধী বর্ত্ত

কবিকে সুতরাং এ ভাবেও পরিহার করিতে হইরাছে।

নগেন্দ্রনাথের কুন্দাহরণ স্বভাব-প্রসূত হইলেও সমাজ-বর্ণের অহুরোধে নগেন্দ্র-নাথের তাহা প্রতিহত করিবার প্রয়োজন ছিল। নগেন্দ্রনাথ তাহাতে কৃতকাৰ্য্য হইলেন নাই, ইহাই তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা। মনুষ্য-প্রকৃতি এ দুর্বলতা হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা। ধর্মবীর প্রতাপও তাঁহার শৈবলিনী-প্রণয়-স্রোত প্রতিবন্ধ করিতে পারেন নাই, অবশেষে সমাজ-বর্ণব্রতকার ভক্ত আত্মবিনিধান করিয়া, সে অবস্থা হইতে নিজত্যাগ করিয়াছিলেন। তবে প্রতাপ ও নগেন্দ্র সমাজস্থাপন ছিলেন না। শৈবলিনী চন্দ্র-ধ্বজের পরিণীতা ভার্যা, তাঁহার প্রতি প্রতাপের প্রেমানুরাগ ঘালে গভীত হইয়া থাকিলেও, সে অহুরোধের মকলতার প্রতিবন্ধক সমাজধর্ম, প্রতাপের পক্ষে অধর্মের পথে ধর্মানর্পণ না করিলে অসম্ভবীয় হইরাছিল। নগেন্দ্রের নবকে সেরূপ নহে। বিধবা কুন্দলিনীকে পরিণয়ের পথে সেরূপ অসম্ভব বাধা কিছু ছিল না। সমাজ সাধারণতঃ বনিও তাহার অহুরোধে ভয়ঙ্কর প্রবৃত্ত নহে, বিধবাবিবাহবিধি স্বাভাবিকভাবেই সমাজস্থাপিত হইরাছিল। সে বিধির কাছের নাইসেই সমাজধর্মের প্রতিরোধ বিরুদ্ধত-হইল। নগেন্দ্রনাথ সমাজধর্মের অসম্মাননা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু, সমাজধর্মের বাধার কথা তাঁহার নবকে না ঘটিলেও, তিনি তাঁহার এই চিত্তবৃত্তির সঙ্গী

হওয়ার, তাঁহাকে ব্যবহারনীতির প্রতিগমন করিতে হইরাছিল। এখানেও, সমাজের প্রতি তাঁহার সম্মান অক্ষুর রাখিবার ভক্ত, কবি তাঁহাকে প্রকৃতি এ বিবাহ করিতে দেন নাই। নগেন্দ্র-চরিত্রের পৌরব্রতকার ভক্ত, সুতরাং কবি সর্বভোক্তাবেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টার তিনি সম্পূর্ণ কৃতকাৰ্য্যও হইরাছেন। কিন্তু আমরা একপাশে বুলিলে ভুল হইবে যে, কবি নগেন্দ্রকে, তাঁহার কুন্দাহরণ নবকে, নির্দোষ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইরাছেন। তাঁহার সামাজিক উপভাসের অতি উচ্চ নীতির ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। সমাজধর্মকে তিনি মনুষ্যজীবনে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য-প্রকৃতি স্বাভাবিক চিত্রিত করা তাঁহার কার্য্য হইলেও, তিনি সে ধর্মের সহিত সর্বত্র তাঁহার চিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইরাছেন। তাই তিনি সমাজধর্মের অহুরোধে প্রতাপের জীবন বিসর্জন প্রেরণকর বনে করিয়াছেন, তাই তিনি শৈবলিনীর পাগখালনভক্ত ওরূপ কঠোর প্রাকৃতিকের বিধান করিয়াছেন, এবং গোবিন্দলালকে সে ধর্মের প্রতিকূলা-চরিত্রের কলধরূপ গৃহভাগী সম্মানী করিয়া ছাড়িয়াছেন। নগেন্দ্র-কুন্দলিনীর প্রণয়কে তিনি স্বাভাবিক ও সমোহর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে একপাশে কিছু প্রয়োগ করেন নাই, বাহাতে তৎপ্রতি সাহসের স্থান বা বিচাণের ভাব কিছু হইতে পারে; বরং নগেন্দ্রের প্রতি প্রকৃতি অক্ষুর রাখিয়া, কুন্দের রূপে সহানুভূতির উদ্রেক করিয়া সে চিত্রকে তিনি একপাশে করিয়াছেন, নগেন্দ্র-স্বাভাবিক

পুনর্মিলনে তাঁহাদের সুখাতিশয়্য প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের বিচ্ছেদজনিত দুঃখের একশেষই মিলাকরণ করিয়াছেন যে, তাঁহার বিষবৃক্ষের শিকার ফল সে চিত্রে যেন ব্যর্থতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তিনি পাঠককে, এইরূপ সন্দ্বিগ্ধচিত্তে, সেই উচ্চ নীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রণয়ে দোষারোপ করিবার কিছু না থাকিলেও, নগেন্দ্রের পক্ষে সে অমুরাগকে সফলতার বা তোপে পরিণত করিবার চেষ্টা এবং কুন্দের পক্ষে সে চেষ্টার প্রতিরোধের অভাব দোষাবহ হইয়াছে। স্বভাবে প্রতিহত করিতে না পারিলে, তিনি তাঁহাদিগকে জলে ডুবিয়া মরিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি নগেন্দ্রকে বেরূপ গৌরবের চরিত্র করিয়া দৃষ্টি করিয়াছেন, কুন্দকে বেরূপ পবিত্র অপার্থিব প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের নিকট সেইরূপ অসাধারণ নৈতিক শক্তির আশা করিতে পারিতেন। নগেন্দ্রনাথ সেরূপ শক্তি প্রদর্শনে অক্ষতকাৰ্য্য হওনাতই, তাঁহার সবকে বিষবৃক্ষের ফল কলিয়াছে বলা বাইতে পারে। কুন্দেরও এ দুর্বলতা দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কুন্দ নক্ষত্রালোক হইতে শাপজট হইয়া বা অস্ত্র কারণে পৃথিবীতে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মানবীচরিত্রও তাঁহাতে দেখাইবার আবশ্যক ছিল। নগেন্দ্রকে কবি মহাপুরুষত্বলা করিয়াও তাঁহাতে মানুষের দুর্বলতা রাখিয়াছেন। ইহাদের দৃষ্টান্তে মানুষকে পূর্ণতা দিলা দিবার, কবির উচ্চাৰ্শ্ব কি তাহা

জ্ঞানরত্ন কঁরাইবার, কবির অভিশ্রম। প্রতাপকেও বর্ণবীর গড়িয়া, প্রতাপ বেরাশ্রয় তাহা দেখাইতে তিনি তুলেন নাই, কারণ মানব-শিকার জন্ত এরূপ করা আবশ্যক। মানুষকে দেবতা দেখাইবার তত প্রয়োজন নাই, বস্ত্র প্রয়োজন, মানুষে কোনটুকুর অভাবের জন্ত মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহা দেখাইবার। শিকার যে মানব-চরিত্রের সে অভাব পূরণ হইতে পারে, সে দুর্বলতার সংশোধন সম্ভবপর, তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই কবির উদ্দেশ্য; এবং তাহা কেবল কবির কল্পনা বা আখ্যায়িকাগত বিষয় না রহিয়া, প্রকৃত জীবনে তৎসাধনের অমুষ্ঠান হইতে পারে, তাহাও তাঁহার অভিশ্রম। নগেন্দ্রকে নির্দোষ মহাপুরুষ এবং কুন্দকে পূর্ণ নগ্নের হবি করিয়া থাকিলে, সে অভিশ্রম সিদ্ধ হইত না। অস্ত্র প্রকারেও, বগুহে প্রতিপালিতা বিধবার প্রতি অমুরাগে, সামাজিক ভাবে যে দোষস্পর্শ হইতে পারে, কবি তাঁহার কাব্যনাটকের চরিত্রগৌরব রক্ষার জন্ত, বক্তব্য সম্ভব, সে দোষের লঘুতাসাধনান্তি প্রায়ে, কৌশলাবলম্বন করিয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পূর্ব-স্বামী তারাগচরণকে কবি নগেন্দ্র বা স্বর্গ্যসুখীর সহিত সম্পর্ক-বিশিষ্ট করেন নাই। বগুহে প্রতিপালিত কন্যা অজিত আশ্রীর বা কুটুম্ব-কলসর ধর্মরক্ষা গৃহপতির কর্তব্যের মধ্যে, তাহা কিছু গৃহস্থানীর কর্ম। নগেন্দ্রকে সে ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, সম্পর্কবিরুদ্ধ ভাবজনকিত্তে দোষ। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক সোপান না করিলে, এ অস্ত্র কবি কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার সহিত

নিঃসঙ্গকীর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাও কোশলের কথা। কবি চিন্তা করিয়াই ভাষাচরণকে বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। নতুবা ভাষাচরণের সহিত একটি স্তম্ভরী ভ্রমেরের কভার বিবাহ দিব্যর বধন স্বর্ধামুখীর আগ্রহাতিশয় ছিল, তখন কবি তাঁহাকে স্বর্ধামুখীর নিকটতর করিয়া প্রদর্শিত করেন নাই কেন? কুড়াইয়া পাওয়া যেরের সঙ্গে বাহার বিবাহ দেওয়া হইল, স্বর্ধামুখী বা নগেন্দ্র দত্তের জ্ঞান সন্তান ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে সম্পর্কবিহীন করাই সুসঙ্গত হইয়াছে, এই কি এ কথার উত্তর? কেন? নগেন্দ্র দত্ত ত কুলের পিতৃগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাসিগণের নিকট তাঁহার কুলের পরিচয় লইয়া আসিয়াছিলেন। কেন? নগেন্দ্রনাথ ত কুলকে আপনায় গৃহীণী করিতে এরূপ কোন বাধার কথা ভাবেন নাই। ভাষাচরণ তাঁহাদের বসঙ্গকীর্ত্তি হইলে তাঁহার বিবাহ কুলের অপেক্ষা করিত না, অনেক পূর্বেই সম্পন্ন হইয়া বাইত। ভাষাচরণ গ্রাম্য কুলের শিক্ষকতা করিতেও বাইত না, তাঁহার দেবেন্দ্র দত্তের সংঘবে আসিবার কারণোক্তব্যও হইত না। উৎপাদিত প্রেরের ইত্যাকার অনেক উত্তর হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, সমালোচ্য কাব্যগ্রন্থনে কবির সাধারণ চিন্তাশীলতার সহিত তাহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অথবা তিনি ভাষাচরণকে ওকথন অবহাগর করিয়া অনেক উদ্বেগই সাধন করিয়াছেন।

যে প্রকৃতির পরিকল্পণে বেরূপ সামগ্রীর আবিষ্কৃত, কবি তাঁহারই আয়োজন করিয়া

রাখিয়াছেন। স্বর্ধামুখীর প্রীতিবৃত্তি আশ্রয়ত, ধ্যানগত, তাহা বাহ্যবিকাশের সুবিধা তন্ময় করে নাই; তাই কবি তাঁহাকে পুত্রবতী করেন নাই। পুত্রবতী করিলে, তাঁহার পরীপ্রকৃতির পরিকল্পণে বাধা হইত। তাঁহাকে সন্তানবিহীনা করিবার সেও অল্পতম প্রকৃষ্ট কারণ। পতিপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্যের প্রকৃতিভেদ থাকিলেও, উভয়ই হৃদয়কোমার্যমূলক, সে কোমলতা বিতর্ক হইলে, পাত্রবিশেষ সহকে হাস্যপ্রাপ্ত না হইত, এক পাত্র হইতে প্রতিহত হইলে, পাত্রান্তরে নির্ভর করে। তাহাতে ঐকান্তিকতার যে গাঢ়তা, যে অনন্তাবলম্ব ভাব, তাহা থাকে না। পতিকর্ষক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, সন্তান বিদ্যমান, স্বর্ধামুখীর হৃদয়কোমলতা সেই সন্তানরূপ অবলম্বনকে আশ্রয় করিলে, তিনি সাধনা প্রাপ্ত হইতেন, পতিনিগ্রহস্থঃখ তাঁহাকে অতটা ব্যাকুলিত করিতে পারিত না। পুত্র থাকিলে, বামীর ভালবাসার বঞ্চিত হইয়া স্বর্ধামুখীর গৃহভ্যাগ সম্ভাবিত হইত না। অথচ স্বর্ধামুখীকে গৃহভ্যাগ করাইয়া কবি তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিকত রক্ষা এবং অস্তিত্ত প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন। কবি স্বর্ধামুখীকে আদর্শ পরী করিয়া স্তম্ভন করিবেন, তাই সে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকের সংঘটন করেন নাই। অল্প বিবেক, কমলমণির হৃদয়প্রবাহ বাহিরে জীড়ার সামগ্রীর অল্পসন্ধান করিত, সে উদ্বেগ তরঙ্গ প্রতিবাদের বস্ত্র না পাইলে শয়তা লাভ করিত না। সে হৃদয়ভারল্যা বামীর প্রতি প্রবণতায় হইলেও, অল্প তাহে অল্প পাত্রের বিবৃতি

পাইতে চাহিত। তাই বাহির কর্তৃক হইতে প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করা অসম্বোধ হইলে, পুত্র সে প্রীতি-ক্রীড়ন-ব্যগ্রতার শব্দটা বিধান করিত, তাই বাহির হইতে কুন্দ আসিয়াও সে দৃষ্টির অংশ-ভাগিনী হইরাছিল, কমলের বড় ভালবাসার প্রতীকস্বরূপ হইয়া পুত্র-কণ্ঠক হইয়াও সে কোমলতার সে বক্তিতা হয় নাই। পুত্র এ প্রকৃতির বিকাশের সহায়তা করিয়াছে, কমলের কোলে পুত্র স্থাপন না করিলে, এ চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিত। সর্বাঙ্গীন কৃষ্ণের জন্ত এক স্থলে যেমন সন্তানের অভাবই অসম্ভব হইয়াছে, অন্য স্থলে সন্তান সমাবেশ করিয়া, কবি সেইরূপ স্বভাবজ্ঞান ও কোমল-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ণতা এ কাব্যের একটি অত্যন্ত লক্ষণ। কি স্বভাব-বর্ণন, কি চরিত্র-প্রকটন, কি চরিত্রবিশেষের সমাবেশ-সাধন, কিছুতেই অসম্পূর্ণ সর্বাঙ্গীন পরিষ্করণের অভাব দৃষ্ট হয় না। গোচারগণীল-কৃষক-বালকসমবিত গলাতীরবর্তী প্রান্তরভূমি হইতে, নদীবৎ-মলিন-বস্ত্রপরিধানা রৌপ্য-লতারভূমিতা কৃষকপত্নীশোভিত দ্বারের দাঁট হইতে, ধর্মীর সুবৃহৎ অংশত সুনির্মিত ও সুসজ্জিত, বিবিধ-লোক-সমাগর-চিহ্নিত ঘটালিকা এবং তৎপার্বহিত উদ্ভান বাসীভট ও বৃক্ষশ্রেণী পর্যন্ত, তাঁহার কাব্যের বিবরণ-সংশ্লিষ্ট কোন দৃষ্ট কবি অবশিত রাখেন নাই, এবং যে কোন দৃষ্টে বাহা কিছু থাকে বা থাকিতে পারে, তৎস্বয়ং বর্ণনায় সন্নিবেশিত করিতে, কবি কোথায়ও বিমূর্ত

হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এ কাব্যে প্রেমাত্মকতার তিনটি দৃষ্ট কবি চিত্রাংকিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রকৃতি-পার্বক্য পরস্পরের বিশেষত্ব স্পষ্টীকৃত করিতেছে, এবং প্রেমাত্মকতার সকলতা, কলরাহিত্য, ও বিমিশ্রতা, পরস্পরের পার্থক্যপূর্ণ হইয়া, এ চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে। আবার কেবল কুন্দের দৃষ্টের পূর্ণতা সাধন করিয়াই কবি বিরত করেন নাই। সংসার-চিত্রের পূর্ণতা সম্পাদনা-তিপ্রায়ে, তিনি, এ মনোহর দৃষ্টের বিপরীত সমাবেশে, বর্গ ও নরকের প্রভেদ অঙ্কিত করিয়া, যে মহতী শিক্ষা এ কাব্যের উদ্দেশ্য তাহার বিধান করিয়া, পূর্ণ সকলতা লাভ করিয়াছেন। সুখবোধতা এ গ্রন্থের আর একটি অসম্পূর্ণ রেখা। পাত্তালির কথার পর কথা, কাব্যের পর কাব্য, একত্র করিয়া দেখিলেই, প্রত্যেকের প্রকৃতি অতি মহাজনই স্বপ্নিত হইবে, সুখিয়ার জন্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন করিবে না। দৃষ্টগুলি অতি সুপরিচিত প্রবোধ গ্রহণে রচিত, তাহাদের সৌন্দর্য্য সহজে পরিদৃষ্টমান। নগ্নপ্র-স্বয়ংবোধী স্বাভাবিকবর্ণনে অতি মনোমুগ্ধকর নবীনত্ব থাকিলেও, সে দৃষ্টের গঠনসামগ্রী সকল হিন্দুপাঠকের অজ্ঞাত নহে, সহজেই তাহার সৌন্দর্য্য স্বকলম হয়। “দীপ-সিদ্ধি” ও “দীপ” নামক পরিচ্ছেদবহন দৃষ্ট অতুলনীয়, এরূপ অসম্পূর্ণ চিত্র লক্ষ্যে রাখিয়া পড়ে। বিরল বলিতে হইবে। এ দৃষ্টে কবি যদি ভবদৃষ্টির “উত্তরচরিত্র” হইতে আভাসমাত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন, কবি-বীর-প্রতিভাধরে অসম্পূর্ণ বে-উকত

স্বাধীন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, পুরাতন করিকে তাঁহার নিকট পরাতন মানিতে হইবে। এরূপ অপূর্ণ কবিত্ব ও কৌশলময়তা পৃথিবীর কবিগণমধ্যে সাধারণ নহে, এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাই উপযুক্ত। পাঠক প্রাণধান করিবেন উত্তরচরিতের “ছায়া” আর বিবৃকের “ছায়া” একই কথা নহে, এবং উত্তর স্থলেই “ছায়া” শব্দটি একার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। উত্তরচরিতের ছায়া কল্পনামাত্র অপ্রাকৃত কেবল কবির উদ্দেশ্যসাধন-বিষয়ে উৎকৃষ্ট কৌশল; বিবৃকের ছায়ার অপ্রাকৃত কিছু নাই, বরং খুব সম্ভবপর ঘটনা, পাঠক সহজেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। কালিদাসকেও, ছয়স্তরের শকুন্তলা-বিশ্বাস্তি সম্ভবপর করিবার জন্য এবং ছয়স্তরচরিতের গৌরবরক্ষার্থ, দুর্জাসার শাপ ও অস্তিত্ত্বান-অভুরীরের কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সেখানেও পাঠককে কবি ঐবিবাক্যের অব্যর্থতার বিশ্বাসবান হইতে অহরোধ করিতেছেন, কিন্তু বদেব কবি তাঁহার কৌশল প্রয়োগে পাঠকের বিশ্বাসের উপর এরূপ অপ্রাকৃতিক দাবি-দাওয়া কিছু রাখেন নাই। ইহাই বিবৃকের কবির বিশেষত্ব।

মহুয়া-দ্বয়ের অীতি, প্রেম, বিভিন্ন ধারার প্রেক্ষত হইয়া, মানবসমাজে অন্তর্নিহিত করে। জনমীর সন্তানবাংসলা, বিভবদয়ের অক্ষুট আকারব্যক্ত প্রতিমাত; পদীর প্রতিপ্রের ও পতিতক্তি, স্বাধীর জাতিস্বরাগ; সৌভ্রাত, সৌহৃদ্য, স্বজন-ঐতি; উদার প্রেমপূর্ণ দ্বয়ের সাক্ষরানীন

প্রের, পরোপকারীর পরসেবার আত্মোৎসর্গ; তাহাতে তুতলে মানবের স্বর্গের সৃজন, বিবৃকে কবি তাহা চিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন নাই। তাই এ কাব্যের নিত্যনূতনত্ব, পড়িলে কখনও পুরাতন হয় না। বালালী, সকল জুলিয়া, সকল হারাইয়া, এই মোহের বশে জীবনাতি-পাত করিতেছে; তাহার তুততার রসসিক্তন করিয়া, তাহার দারিদ্র্যে রসাদিকার প্রদানে, কবি তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার্জন করিয়াছেন। স্বর্গাসুখীর পতিপ্রাণতা জগতে অভুলনীয়া,—যে হিন্দুর পদীরে আদর্শ, সেই হিন্দুর মধ্যেও বিরল। সে সাধনী পতিমাত্রজীবিতা গৌরবারিতা রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সন্তম হৃদয়-ধিকার করে; নগেন্দ্রনাথও, তাঁহার সাময়িক চিত্তবৈকল্যসত্ত্বেও, গৌরবারিত-চরিত্র, ত্যাগবাৎসল্য পতির জলন্ত হৃষ্টান্ত, তাঁহারও প্রতি সন্মান ভিন্ন অন্য তাবের উদয় হয় না; আর শ্রীশ-কমল সুবকস্বতী, প্রথম যৌবনের মস্তামধ্যে এখনও বিতোদ-চিত্র; কবি তাহার মধ্যে স্নেহের পুতলি সতীশচন্দ্রকে সংস্থাপন করিয়া, সে উজ্জ্বলিত প্রবমান ঐতিহ্যের রমণীরতা সংবর্জন করিয়াছেন, তাহাতে সে প্রেমপ্রকৃতির পরিচ্ছুরণের সহায়তা হইয়াছে;—অনন্ত-প্রেমময়ী কমলমণির নিত্যসুখি দেখিলে হৃদয় আনন্দসলিলে পরিপ্লুত হয়, চিত্ত-প্রসাদ সে চরিত্রের প্রত্যাবের অবশ্যজাবী বল। আর কুন্দনলিনীও ঐতিপ্রদ চিত্র, তবে তাহার অদৃষ্ট-লিপি, কবি যে স্বর্গের ছবির সহিত তাহাকে মিলিত করিয়াছিলেন,

ভাষার উপর কণিক বিবাদের দ্বারা
পাতিত করিয়া, একদিকে যেমন স্বর্ণরূপের
নিত্যস্বয়ং কল্পে বটে দেখাইয়াছে, অত
দিকে, নিয়তির বলে, এ সংসারে স্বর্ণের
বস্তুও কল্পে বিলম্ব প্রাপ্ত হয় প্রমাণ করি-
য়াছে। কল্পের প্রতি দৃষ্টি করিলে, দয়া
ঐতি হুঃখ যুগপৎ জ্বলন্ত উদ্বেলিত হয়।
ভ্রাতার বেহ এবং তগিনীর ভ্রাতৃপ্রেম,
কবি বিশিষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া না
থাকিলেও, আত্মাশে বা স্বল্পমাত্র রেখাপাতে,
নগেন্দ্র-কমলে একরূপ স্থাপিত প্রতীয়মান;
শ্রীশ-নগেন্দ্র এবং নগেন্দ্র ও হরদেব যোবালের
বহুতা সৌন্দর্যের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।
কবির অনেক কাব্যেই হিন্দুজীবনাবশের
অলীকৃত সম্যাসীর চিত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে;
হিন্দুর মহতী কল্পনার সৃষ্টি এবং প্রকৃত
জীবনের কল্পবোণী সম্যাসিগণ, সার্কজনীন
প্রেমের অধীন হইরা, চিরজীবন পরহিত-
ব্রতে নিয়োজিত থাকেন। ব্রহ্মচারী শিব-
প্রসাদ শর্মা বিবৃক্তের সংসারত্যাগী লোক-
হিতব্রতধারী সম্যাসী, মরণোন্মুখী স্বর্ধ-
মুখীকে পুনর্জীবিতা করিয়া তিনি পাঠকের
বিশেষ তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়াছেন। কমলকে
কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।
অনন্তজ্ঞো পতিধ্যানে মগ্না স্বর্ধমুখীও ভাল-
বাসিতেন। কমলই সে গাভীধামরী রমনী-
রত্নের নিভৃত আলাপের ও মনোহুঃখ
প্রকাশের একমাত্র স্থল ছিলেন; কিন্তু
স্বর্ধমুখীর প্রতি কমলের ভালবাসা একটু
তির প্রকৃতির, তাহা কতকটা কমলের
অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেমের ফল; ভ্রাতৃভাষা এবং
ভ্রাতার বিশেষ অনুগ্রহপাত্রী বলিয়া কমল

তাহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু প্রধানতঃ
সে ভালবাসা কমলের সার্কজনীন প্রেমের
প্রকৃতিসম্বৃত। আমরা বলিয়াছি কমলের
এ প্রেমের স্রোত কল্পনাবিনীতেও প্রবাহিত
হইয়াছিল—বালিকা কল্প যখন তাঁহার ভ্রাতা
কর্তৃক তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, তখন
এক ভাবে, আর যুবতী কল্প যখন নগেন্দ্রের
প্রণয়পাত্রী এবং নিজেও নগেন্দ্রাঙ্গরাগিনী,
তখন অত্র ভাবে,—ভাষার প্রণয়নৈরাশ্যে
সহায়ত্বভিত্তিতে। নগেন্দ্র দত্তের গৃহে
অগণিত আত্মীয়া-কুটুম্বিনী প্রতিপাল্য করিয়া
কবি হিন্দুর স্বজনপ্রীতি এবং স্বজনোপকার-
প্রবৃত্তিরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

একদিকে কবি যেমন স্বর্ণের প্রকৃতি
চিত্রাঙ্গিত করিয়া মানবমনের উৎকর্ষ-
সাধনের উপায় বিধান করিয়াছেন—সে
চিত্রের উজ্জ্বল্যসম্পাদনাভিপ্রায়ে, ভাষার
প্রত্যাব মানব-জগতের গভীরাক্রিত করিবার
উদ্দেশ্যে; অত দিকে তেমনই বিপরীত
প্রকৃতির চিত্র সংস্থাপন করিয়া তৎপ্রতি
যুগের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার, তাঁহার
কৌশলমরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। হৈমবতী,
বেবেজ দত্ত, হীরা দাসী এ বিসমুখ
চিত্রের স্থলয়ণ সূর্তি। অবশ্য কবি
বেবেজ দত্তকে রূপগুণসম্পন্ন করিয়া,
তাঁহার জীবনে চরিত্রচ্যুতির কারণোক্তব
ঘটাইরা, অজ্ঞানতার পাত্র হইলেও তাঁহাকে
কতকটা কবির এবং মহাহুঃখের স্বেচ্ছা
করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ কেহ পাঠক
হরয়ে এরূপ চিত্রের ফল ভদ্র মজিয়া
মনে করিবেন না; কেমনা অনেক সুন্দর
জীবনের অবস্থা বেবেজ দত্তের সন্মুখ হইলে;

ভাষার পৰ্য্যায়সূত্র ভাষার সমর্থন করিতে পারেন; জীবনে হৃৎথের কারণকে চরিত্র-ব্রহ্মতার দলিলস্বরূপ দোষদর্শীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া, স্বপথের স্বাভাবিক সংস্থাপনে চেষ্টিত হওরা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবিত। তবে অল্প দিকে নির্মল স্বর্ণসুখের হবিনয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত থাকিতে, দেবেন্দ্র দত্তের দৃষ্টান্ত, অনিষ্টের পথে তত কার্য্যাকরী হইবে না, একরূপ আশা করা বাইতে পারে। বিশেষতঃ কবি, এ হুলেও ভাষার স্বাভাবিক কোশলময়তার অনুসরণ করিয়া, দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র এবং হিতকারী সহস্র শীতল-কান্তি বিতুষ্টচরিত্র সুরেন্দ্রকে তৎপার্শ্বে সংস্থাপিত করিয়া,—গেই ইজ্রিসেবার দৃষ্টের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি কেমন আপন চরিত্রপরিজ্ঞতা রক্ষা করিয়াছেন, পাণীকে ভালবাসিয়াও কেমন নিজকে পাণ-বৃত্ত রক্ষিয়াছেন,—তাহা প্রদর্শন দ্বারা, সে দৃষ্টান্তের বিবরণ কালের একরূপ নিরাকরণ করিয়াছেন। দেবেন্দ্র স্বভাবতঃ রূপভগ্ন-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বিজ্ঞারও অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহার আত্মদমনের ক্ষমতার অভাবে সে সকলই বুঝা হইল; ইহাও শিকার কথা, এবং সামান্য শিকার কথা নহে। এই শিকার ভ্রষ্টই দেবেন্দ্র দত্তকে চরিত্রচ্যুত করিয়াও, কবি সে চরিত্রে গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, এ শিকারও কবির সেই উচ্চ নীতির কথা। চিত্তবনের শিকার অভাবে মানুষের চিত্তবিকার ঘটে, তাহা হইতেই মানুষের অধঃপতন ও হৃৎ-তোগ। ভাষার এ বিকার সাময়িক, হৃৎতোগও সাময়িক, যেমন মগেন্দ্র দত্তের;

ভাষার অধঃপতনে মানুষের পূর্ণ বিলয়, যেমন দেবেন্দ্র দত্তের। গোবিন্দলাল ইহা জীবনেই হৃৎতোগ দ্বারা সংশোধিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ইহা জীবনের স্রুথের অধিকার আর পুনঃ প্রাপ্ত করেন নাই, সর্বহৃৎথের পদারবিন্দে মনোনিবেশ করিয়া স্বদয়ের শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রের অধঃপতন বহুদূরগত, তাঁহার উদ্ধার, পর-কালের হৃৎতোগ ব্যতিরেকে, অসম্ভাবিত। দেবেন্দ্রের ইহা জীবনের পরিণাম যোগতোগ, স্রুথের অনুসন্ধানে নিরন্তর চিত্তের অশান্তি, এবং মানুষ-সমাজে চিরদিনের জন্য আত্ম-বিলোপ। ইহা কি এতদ্যেক সুবক্তার পক্ষেই শিক্ষাশূন্য নহে? দেবেন্দ্র দত্তে কবি স্বাভাবিক চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন, শিকার মানসে দৃষ্টি করিলে, সে চিত্রে শিকার নিকলতা কিছু আছে বা তাহা নৈতিক অধোগতিক প্রোৎসাহিত করিতে পারে, একরূপ মনে করা সম্ভব হইবে না। আর একটি বড় কথা। মানুষ কদাচিত্ ইচ্ছা করিয়া নরকের পথে হাটে। মানুষ-প্রকৃতির দুর্বলতাই প্রায় সর্বত্র মানুষের অধঃপতনের কারণ, এবং অনেক হুলেই সে দুর্বলতা কন্মার চক্ষে দেখিবার যোগ্য হইতে পারে। এ কথার ব্যতীত থাকিলে তাহা কাব্যে চিত্রিত করিয়া মানুষ-সমাজের কোন উপকার করা হয় কি না সন্দেহ। একরূপ হুলে, কঠোর নৈতিকের চক্ষে দৃষ্টি করিয়া, দুর্বলকে নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি পাত্ত করিয়া প্রদর্শিত করাই সমাজের মঙ্গলকর, না, পাণের প্রতি দৃষ্টির উত্তরক করিয়া দিয়া, পাণীকে ভালবাসাইতে পারিলেই, মানুষ-

সমাজকে অবিকৃতর রূপের স্থান করিতে পারা যায়? আমাদের বিশ্বাস, মানুষ বড়ই মানুষকে বুঝিবে, মানুষমধ্যে বড়ই ঐতিহ্য ভাব বিস্তৃতি লাভ করিবে, মানুষসমাজে বড়ই উন্নত ও সুখশান্তির স্থান হইবে। বহিঃক্ষেত্রে তাই তাঁহার কাব্যসমূহে ঐতিহ্য সংসার সৃজনে প্রকাশ পাইরাছেন, অনির্দিষ্ট স্থানীয় পাত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন নাই; কেননা, সেক্ষণ চিত্র দ্বারা সংসারের প্রকৃত উপকার সাধিত হয় না। ইরাগো-চিত্রে চিত্রকরের নৈপুণ্য থাকিলেও, সেক্ষণ চিত্র সমাজের বিশেষ কাজে আসে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষে দেবচরিত্র সম্পূর্ণ অঙ্গকরণ-যোগ্য না হইলেও, তাহা আদর্শের কাজ করে; কিন্তু নিরন্তর হৃদয়নতার চিত্র, কলে বাহা তৎসামগ্রীতে গঠিত না হইলে কেহ অঙ্গকরণ করে না এবং করিতেও পারে না, কল্পিত বা কদাচিৎ হৃষ্ট সেই প্রকৃতির প্রতি মানুষ-মনের কঠোর স্থানীয় ভাব জন্মাইয়া দিয়া কতক পরিমাণে মানুষের প্রতি মানুষের বিরোধের ভাব উদ্ভূত করে। বন্দ্য মানুষও সাধারণতঃ বেঙ্গল হইয়া থাকে, বহিঃক্ষেত্রে

তাহাই চিত্রিত করিরাছেন। তাঁহার দেবেশ্বর মন্তব্য, সুভাষা, বন্দ্য হইলেও নিরন্তর হৃদয়নতার চিত্র নহে। দেবেশ্বরের অধঃ-পতনের স্বাভাবিক কারণ সংযোজন্যর অন্ত দেবেশ্বর বরং দারী ছিলেন না, তাঁহার পিতা কর্তৃক ইহার সংঘটন হইরাছিল। যদিও তাঁহার পিতা সহদেবদেই, পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবস্থাবিচিত্রিত অন্ধতাবশতঃ এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইরাছিলেন, তথাপি সে দিকেও সমাজের শিক্ষার প্রয়োজন আছে, কবি বোধ হয় তাহাও অনুভব করিরা-ছিলেন। আবার হৈমবতীদিগের প্রভাবে সমাজে কি কুলের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাও কি পাঠিকাগণের পক্ষে প্রশংসনীয় নহে? হীরাচরিত্রের কতক ভাগ স্বাভাবিক কারণ-সম্বৃত এবং আমার চক্ষে দেখিবার যোগ্য হইলেও, তাহার দীর্ঘ ও পরের অধিত্তিক্তাহুলক চরিত্রে অতি স্থানীয় জিনিস এবং তাহা নরকেরই চিত্র। হৈমবতীই এ সুখবিরোধী চিত্রের প্রধান উদ্যোক্তা, এবং কবি অতি অল্প রেখাপাতে তাহা স্পষ্ট করিরাছেন। অস্তান্ত কথা বারান্তরে।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী।

স্ত্রীশ্রী ।

নিত্যানন্দপুরের বজ্রেশ্বর চাঁটুখোর দাফি-পৌক-বর্জিত শ্রীমুখ-পঙ্কজ কোন দিন প্রভাতে কাহারও দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে আর তাহার রক্ষা নাই; সে দিন তাহার উপবাস স্থানান্তরিত, ইহা গ্রামের আশাল বৃদ্ধ বসিতার প্রব-বিশ্বাস।

বজ্রেশ্বরের পিতা ৮গোপীমোহন চট্টো-পাধ্যায় ওরফে ওপীঠাকুর মহারাজীনের সন্তান ছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্মের পূর্ণে সাংইজিপিট, বৌদ্ধনে জ্ঞানারটি ও বার্কিহো-হরটি নামে বিবাহ করিয়া নিরেনক-ইটি কতাদার-এক উদ্যোক্তার হৃদয়ভার ভার

হরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে মহা পুণ্যবান আত্মসমরপীর লোক ছিলেন সন্দেহ কি ? এমন পুণ্যবান লোকের সন্তান হইয়া বক্তাবর প্রভাতে বাহাকে বুধ দেখাইত, তাহার অগৃহে সে দিন অন্ন জুটিত না, ইহা বিধাতার ভ্রম তিন্ন আর কি বলিব ?

ওপীঠাকুর গঙ্গালাভের পূর্বে কি করিয়া সংসারবান্ধা নির্মাহ করিতেন, বলা কঠিন। কারণ তাঁহার জীবনের ইতিহাস এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে বিবাহই যে তাঁহার উপজীবিকা বা পেয়া ছিল, তাহার বখেটে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে তিনি বড় ভাগ্যবান ছিলেন, তিনি ছুইবার পূর্ববঙ্গে কোন আত্মীয়ের বিবাহে বরবান্ধী হইয়া গিয়াছিলেন, সেই ছুইবারই তিনি ছুইটি কুলীন-কস্তার পানিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, একটি কুলীনকুমারী তাঁহার অশেকা সাতাশ বৎসরের বড়, আর একটি ছত্রিশ বৎসরের ছোট, কিন্তু বরস সবচে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাঁহার কোলীনা-মর্যাদা বজায় থাকিলে অল্প ধন বিকলাল বালিকা বৃদ্ধা কিছুতেই তাঁহার আপত্তি ছিল না। তিনি বলিতেন, তত্ত্ব লোকের কস্তাদার মোচন করা বড় ভাগ্যের কথা।

ওপীঠাকুরের বরস বধন ছাপার বৎসর সেই সময় নিত্যানন্দপুরের ভোক্তদার বজীবর সুখোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র কস্তা কালী-ভার্যাকে তাঁহার হস্তে সম্ভ্রমণ করেন। বজীবর বড় ধর্মনিষ্ঠ ও আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুলীনপুত্রদের তিনি সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিতেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন, গোপী-

মোহন রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বিষয়ে কালীভার্যার বোধ্যবর,—তবে কি না বরস একটু বেশী, তা কুলীনের ঘরে এমন হইয়া থাকে।

সবৎসরকাল বগুরবাড়ী গুলিতে বুরিয়া ওপীঠাকুরের অশন-বসনের সংস্থান হইত, তিনি এক আধটু গুলি তক্ষণ করিতেন—একস্ত সর্বদা হাম পরিবর্তনে তাঁহার মোতাভের বড় ব্যাঘাত ঘটত, কিন্তু রতনে রতন চেনে, তিনি যেখানেই বাইতেন, আজ্ঞা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। একবার কোন দূরতর পল্লীর বগুর-বাড়ী গমনোপলক্ষে তাঁহাকে নিত্যানন্দ-পুরের ভিতর দিয়া বাইতে হয়, সেখানকার এক আজ্ঞার বজীবরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়,—সেখানেই বজীবর গোপীমোহনের সহিত কস্তার সবন্ধ স্থির করিয়া কেলিয়াছিলেন।

বজীবরের সাংসারিক অবস্থা সঙ্কুল ছিল। কালীভার্যার ভিন্ন তাঁহার অল্প সন্তান সন্ততি ছিল না; গোপীমোহন তাবিয়া দেখিল, বৃদ্ধাবস্থার উদ্বারের চেষ্টার বেশে বেশে বগুরবাড়ী বুরিয়া বেড়ানো বড় কষ্টকর, বিশেষতঃ তাহার বস্তুরেরা আর সকলেই দরিদ্র, সকলে তাহার কোলীনা-মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, এ অবস্থার বজীবরের কস্তাটির পানিগ্রহণ করিয়া এই নূতন বগুরের কক্ষে কার্যমীভাবে ত্বর করিলে অন্নবস্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে সে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে; সুতরাং বিবাহে তাহার আপত্তি হইল না। বজীবরের কস্তার পানিগ্রহণ করিয়া সে সেখানেই

রহিয়া পেল। এবং গ্রামে ‘জামাই-ঠাকুর’ নামে সর্বজন পরিচিত হইয়া উঠিল।

২

গুপীঠাকুর ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে বজ্রবলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একপুত্র রাখিয়া এবং নিরনকসুইটি রমণীর হাতের নোরা ও সিঁধির সিন্দুর ঘুচাইয়া সজ্জানে গজালাত করিলে, গ্রামের লোকেরা বলিল, এতদিনে বাঙ্গালার দেশে একটি নীতি মহা-কুলীনের অভাব ঘটিল, কুলীন-সমাজের একটি উজ্জল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

গোপীমোহনের পুত্র বজ্রেশ্বর বিবাহ বিষয়ে পিতার আদেশের অমুচরণ করে নাই। সে এক পরীতেই সন্তুষ্ট ছিল; মাতারহের জ্যোত-জমাতেই তাহার সংসার চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সে উচ্চাভিলাষী ছিল, তেজস্বিত, মহাজনী প্রভৃতি নানা উপায়ে সে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে তাহার অর্থনিপাশা প্রশমিত হইল না, শেষে সে বহু চেষ্টার একটা ট্যাম্প-তেওয়ারী জুটাইয়া লইয়া নিত্যন্যপূরের মুনসেফী আদালতের কাছে একটা বট-গাছের তলায় দোকান খুলিয়া বলিল এবং ডেনী, কোর্টফি, ‘ইষ্টাঘর’ কাগজ প্রভৃতি বিক্রয় করিতে লাগিল।

বজ্রেশ্বরের উপার্জনের আরও একটা পন্থা ছিল। মকদ্দমার অনেক লোক মুনসেফী আদালতে মামলা করিতে আসিত; কাহারও হঠাৎ ছই পাঁচ টাকার আবশ্যক হইলে বজ্রেশ্বরের নিকটে আসিলেই সে টাকা পাইত, কিন্তু তাহাকে অস্বীকার করিতে হইত, পরদিন এক টাকা মুনসেফত সে গণ-পরিখোদ করিবে। মাথল্য লষ্ট হয়,

‘দেখিরা অনেক মক্কেল উকীলকে জামিন রাখিরা বজ্রেশ্বরের নিকট এই ভাবে টাকা কর্কস লইত। বজ্রেশ্বর পরমা হাতে রাখিত না, কোন উপায়ে আটটি পরমা হাতে হইলেই সে ছয়ানি গাঁপিত, ক্রমে ছয়ানি হইতে শিকি, শিকি হইতে আধূলি—তাহার পর টাকা। কোনরূপে একটি টাকা জমিলে বজ্রেশ্বর কখন তাহা ভাঙ্গাইত না।

বজ্রেশ্বরের স্ত্রী একটি পুত্র ও একটি কস্তা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে সে নিম্বাস কেলিয়া বাঁচিল, বজ্রেশ্বর সর্বদাই আক্কেপ করিয়া বলিত তাহার স্ত্রীর ভায় অমিতব্যরী ভূ-ভারতে আর দেখা যায় না। বজ্রেশ্বরের স্ত্রী পূজা-পার্বণে ছই চারিটি পরমা ধরচ করিতেন ইহাই তাহার অভিযোগের কারণ। একটা প্রধান অপব্যয়ের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বজ্রেশ্বর কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে অর্থ সঞ্চয় করিল, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া এক দিন পাকাচুলে কলপ লাগাইয়া, লাল চেলি পরিয়া ও টোপড় মাধার দিয়া কালান্তর হইতে একটি পঞ্চদশী ঘুঘতীকে বিবাহ করিয়া আনি। সে সময় তাহার কস্তা হীরামণির বয়স কুড়ি বৎসর, চারি বৎসরের একটি পুত্র কোলে লইয়া সেইবার হীরামণি বিধবা হইয়াছিল। খন্তরকূলে তাহার কেহ ছিল না বলিয়া হীরামণি পিতৃগৃহেই বাস করিতে আসিল।

বজ্রেশ্বরের পুত্র বিবেশ্বর হীরামণির ছই বৎসরের বড়, সে কলিকাতায় দিয়াই করিয়া সেখানে খন্তরালয়ে বাস করিত। একটা আকিসে কেরানীগিরি করিয়া তাহার সংসারবাড়্য নির্বাহ হইত। বিবেশ্বর

উপার্জননের সমস্ত টাকা পিতাকে পাঠাইত না বলিয়া যজ্ঞেশ্বর পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। চাকরী আরম্ভ করিয়া বিবেশ্বর দুই একবার পুত্রার ছুটিতে সজীক বাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু পিতার কার্পণ্য ও বিমাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সে নিত্যানন্দপুরের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল। বিধবা ভগিনীটিকে সে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিত।

যজ্ঞেশ্বর বহুগুণের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিত, “একালের ছেলেগুলো জীব অত্যন্ত বাধ্য, যা বাপকে গ্রাহ্য করে না, অপব্যারী, সাহেবী মেজাজ, ঘোরতর বেতরিবৎ”—ইত্যাদি।

৩

কলিতে যে বরসে বাণপ্রস্থাবলম্বনের ব্যবস্থা আছে—তাহা অপেক্ষাও অধিক বরসে যজ্ঞেশ্বর সেই পঞ্চদশবরীয়া কুলীন ছহিতাকে বিবাহ করিয়াছিল। গৃহে অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকিলে কেহ এমন পায়ে কস্তা সন্তানদান করে না, সুতরাং বিবাহের পর পিতৃভালয়ের সহিত নব বধূর সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল।

বৃদ্ধ বরসে বিবাহ করিয়া ষ্ট্যাম্পভেগের যজ্ঞেশ্বরের যৌবনকাল আবার নূতন করিয়া কিরিয়া আসিল। সে পাকা পোক কামাইয়া ফেলিল; কলপ-ব্যবহারের সুযোগ থাকিলে না কামাইলেও চলিত বটে, কিন্তু কলপ কিনিতে পরসা খরচ হয় এবং কাহারও নিকট হইতে নিত্য তাহা চাহিয়াও পোক কালো কল চলে না। তাহার সাধার একটি টিকি ছিল—হাঁটিয়া তাহার আকার ঘোট করিয়া লইল এবং বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তির একালে বেঘন বিলাতী বস্ত্র বর্জন

করিয়াছেন, সে সেই ভাবে খান বর্জন করিয়া কালাপেড়ে ধুতি পরিতে আরম্ভ করিল। এ সময় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, ‘চাঁচুঘো মশার, আপনার বরস কত হইয়াছে?’ তাহা হইলে যজ্ঞেশ্বর খুব গভীর হইয়া বলিত, “বরস আর কম কি, চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে!”

মারের মৃত্যুর পর হইতে হীরামণি সংসারের কর্তৃক করিয়া আসিতেছিল। বিবাহের পর দুই মাস বাইতে না বাইতে সামান্ত সামান্ত বিষয় লইয়া, যজ্ঞেশ্বরের ‘বিত্তীর পক্ষে’র সহিত তাহার মনান্তর আরম্ভ হইল, এবং ক্রমে মনান্তর হইতে কলহের সৃষ্টি হইল। যজ্ঞেশ্বরের সংসারে অশন-বসনের ব্যবস্থা যে অতি শোচনীয় ছিল তাহা না বলিলেও চলে; এক পরসার চিংড়ি বা পুঁটী মাছ ও দুই পরসার তরকারী দৈনন্দিন বাজার নির্দিষ্ট ছিল। নূতন গৃহিণী হওয়ার পর কি তাবিয়া আনি না বাজারের বরাদ্দ কিছু বাড়িয়াছিল, কোন দিন বেড় পরসা কোন দিন বা দুই পরসা পর্য্যন্ত ‘হুনো হুনি আর কি’ বেশী খরচ হইত! শেষ বরসের বিবাহের পর যজ্ঞেশ্বরের হাত খুলিয়া গিয়াছিল, লোকে বলাবলি করিত, লক্ষণ ভাল নয়।

হীরামণি অন্ন রন্ধন করিত; বিবেশ্বর তাহার ছেলের অন্ত দৈনিক আধসের ছুধের রোজ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আধসের দুখে চারিবৎসরের ছেলের পেট ভরে না, কাজেই সে বার দুই মাছভাত খাইত, পিতার পাতে সুতরাং চিংড়ি পুঁটী বড় বেশী স্থান পাইত না। যজ্ঞেশ্বর কোনদিন সে

অন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিত না। কিন্তু নূতন বৌ কুসুম হীরামণির পক্ষপাত দেখিয়া দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন রাত্রে আহায়াদিয় পর বজ্রেশ্বর তাহুল চৰ্চণ করিতে করিতে গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছে এমন সময় শব্দাশ্রুতস্থিত সববধূর অক্ষুট ক্রন্দনোজ্জ্বল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

বজ্রেশ্বর গুড়গুড়ির নল কেলিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিল, “কুসুম, কানিতেছ কেন?” কুসুম বলিল, “আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি এখানে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিব না।”

বজ্রেশ্বর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল “কেন, তোমার কষ্টটা কি?”

কুসুম বলিল, “কষ্ট নয় কি, কষ্ট দিতে থাকি রাখচো কি? তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখে কিছু দেখতে পাও না। যে মাছ আন, তোমার ঘরে ছেলের পাতেই সব ঢেলে দেয়, আর যারা আছে তারা কি দিবে তাত খায় সে বিবেচনা নেই। বুড়ো বাপকে পুষ্কান্ত কাঁকি দেয়! তা বলতে গেলেই আবার বা নর তাই বলে গাল, কেনরে বাপু আমি ত নিজের অস্ত্র বলিনি ‘বে এলো চবে সে থাকবে বসে’ বাড়ীর কর্তার উপর বেখানে দণ্ড নেই এমন সংসারে কি মাহুব থাকে?”

বজ্রেশ্বর বলিল, “আচ্ছা আমি কাল তোমার এ হুংখ দূর করবো। তুমি কেন না।” জী যে সংসারে পদার্পণ করিয়াই তাহার হুংখে মহাহুত্ব প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে, ইহাতে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

পরদিন বজ্রেশ্বর হীরামণিকে বলিল, “হীরামণি আমার সংসারের অবস্থা ত এই, কত কষ্টে যে তোকে প্রতিপালন করছি, তা মা কালীই জানেন; তা তোর আকল কি রকম বল দেখি! তোর নূতন মা ছেলে মাহুব, সে লজ্জার ভোকে কোন কথা বলতে পারে না, তার খাওয়া দাওয়ার সুবিধা অনুবিধা ত তোকে দেখতে হয়। মাহ রাঁধিস্ তাকে হুঁ এক খান দিস্। তোর এত বয়স হলো, আজ ও মাকে ভক্তি করতে শিখুলি নে?”

হীরামণি কিঞ্চিং মুখরা, সে গালে হাত দিয়া জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল, “ও মা কি লজ্জার কথা! আমি নূতন মাকে মাহ তরকারী খেতে দিইনে, শুধু তাত দিই, এ কথা তোমাকে কে বলে? তুমি বাজার থেকে এক পরসার মাহ আন, রেঁধে বেড়ে তা তোমাদেরই দিই; আমি বিধবা মাহুব, আমি কি মাহ খাই যে তুমি আমাকে এমন কথা বলচো? আমার রাম মাহ খেতে একটু ভাল বাসে, তা তোমাদের কম পড়বে তবে আমি তাকে এক খানার বেশী হুঁ খানা মাহ দিইনে। আচ্ছা, কাল থেকে আর তাকে মাহ খেতে দেব না।”

বজ্রেশ্বর বলিল, “এই উল্টো বুঝি। আমি কি তোর ছেলেকে মাহ খাওয়াতে বায়ণ করছি? আমি বলছি, রামা ছেলে মাহুব, বেশী মাহ খাওয়ালে ওর পেটের ব্যারাম হতে পারে। খাওয়ার দোষেই ছেলে পিলের ব্যামো হয়।”

হীরামণি হাত নাড়িয়া বলিল, “আমার

হুধের ছেলে, হুধ পার না তাই হু'বেলা হু'মুঠো
ভাত খায়, এই জন্যে এত ধোঁটা। আমার
অদেটে বেস্তর হুধ না থাকলে আমারই
বা হাতের নোয়া বুচেবে কেন, আর তুমি
রা, বুড়ো বয়সে আবার একটা বিয়ে করে
বসবে কেন?"

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার পর, যজ্ঞ-
শ্রবকে কেহ বুড়া বলিলে, সে কথা তাহার
সহ হইত না। সে আশুপ হইয়া বলিল,
"কি, তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?
আমি বুড়ো! কেয় যদি তুই আমার বয়স
তুলে কথা বলবি ত তোর ভাল হবে না
বলুচি। বাপ বলে আমি অনেক সহ্য করচি,
পড়েছিঁস্তাল মাহুঘের হাতে—" যজ্ঞশ্রব
রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঠ্যাং ও ডেমির
বাণ্ডিল লইয়া কাছারি চলিল।

কুসুম বলিল "পান নিয়ে যাও, তোমার
জন্তে যে মসলা দিয়ে পান তৈয়ারী করে
য়েখেছি। আমার মাথা খাও পান খেয়ে
যাও।"

যজ্ঞশ্রব তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেল।

৪

সেই দিন হইতে হীরামণি ছেলের পাতে
মাছ দেওয়া বন্ধ করিল।

কিন্তু আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল,
যজ্ঞশ্রবের আকিৎসার খাত, রাত্রে একটু
হুধ না খাইলে সে বাঁচিত না। সেই জন্ত
সে নিজের জন্ত আধসের হুধের বরাদ্দ
করিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে
বঞ্চিত করিয়া অতি রূপণেও বরং হুধ
পাইতে পারে না, এই জন্ত আর আধসের
হুধের রোজ ছিল। এই এক সের হুধ জাল
দিয়া হীরামণি তাহা পিতার ও বিমাতার

জন্ত তুলিয়া রাখিত। তাহার ছেলের হুধ
সে পৃথক ভাবে জাল দিত।

যজ্ঞশ্রবের নিকট ঘোষাণীর অনেক
টাকা পড়িয়াছিল। ক্রমাগত তাগাদার টাকা
না পাইয়া সে হুধে জলের মাত্রা বাড়াইয়া
দিল। যজ্ঞশ্রব দেখিল, হুধ সাদা বটে,
কিন্তু তাহার কোন স্বাদ নাই! একদিন
রাত্রে সে আহ্বারে বসিয়া বলিল, "কুসুম,
ঘোষাণী আজ কাল কি রকম হুধ দিচ্ছে?
শুধু দিয়েও বে এ হুধ মিষ্টি হয় না।"

কুসুম বলিল, "ঘোষাণীর দোষ কি?
তোমার মেয়ে নিজের ছেলেকে দিয়ে সব
হুধ খাইয়ে জল ঢেলে রাখবে, তা হুধ মিষ্টি
হবে কোথা হু'তে?"

পরদিন যজ্ঞশ্রব আবার হীরামণিকে
তিরস্কার করিল। অনাথা নিকপার বিধবা
পিতার তিরস্কার শুনিয়া ছেলেকে কোলে
লইয়া অনেক কণ নীরবে কাঁদিল। তাহার
পর চক্ষু মুছিয়া ভাত রাঁধিতে গেল।

কয়েকদিন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা
ঘটিল না। একদিন যজ্ঞশ্রব বাজার হইতে
আধ পরসার নতি (পটলের পাতা) আনিয়া
হীরামণিকে বলিল, "আজ নতির বড়া কর,
অনেক দিন নতির বড়া খাওয়া হয়নি।"

হীরামণি বলিল, "এ আর দক্ত কাজ
কি? হটাক খানেক তেল এনে দাও।"

আধ পরসার নতির বড়ার একহটাক
তেল! যজ্ঞশ্রব রাগে জলিয়া উঠিল, বলিল
"সংসার খরচের জন্ত আধপোয়া তেলের
বরাদ্দ আছে, তিনটি মাহুঘের রান্নার কি সব
তেল খরচ হয়, সংসার করিস—আধ হটাক
তেলও বাঁচাতে পারিসনে? বা পাখি সব

খরচ করে বস্বে, নিজের সংসার হলে কি করতিস্ ?”

হীরামণি বলিল “আমাকে এক মুঠো খেতে দিবে আজকাল তুমি সদাই বোঁটা দেও, আমার যেমন আর মরবার ব্যর্থতা নেই, তাই তোমার হুরোরে দাসীগিরি করতে হজ্জে ! তেল কি আমি চুসুক দিবে খাই ? আখ পোরা তেলই বা কতটুকু ? রান্না, মাখা, প্রদীপ-জালা—সব সেই তেলে, তার উপর আবার বাঁচাতে হবে ! এমন গিমিমো আমাকে দিবে হবে না, যে পারে সে ককক !”

“আমার যেমন কাজ ছিল না, চন্ডোর বড়া !” বলিয়া যজ্ঞেশ্বর সরোবে নতির আঁটিটা আঁতাকুড়ে নিক্ষেপ করিল। সে দিন সে রাগ করিয়া কিছু খাইল না, শুকমুখে দপ্তরটি লইয়া কাছারী চলিল।

কুহুম স্বামীর অস্ত্র কিছু জলখাবার আনাইয়া রাখিল। স্বয়ং দুধ না খাইয়া সমস্ত দুধ ভাল করিয়া আল দিয়া রাখিল। সন্ধ্যার সময় যজ্ঞেশ্বর ভোগারী করিয়া বাড়ী ফিরিলে কুহুম পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহাকে জল খাইতে দিল। কুখাতুর বুদ্ধ ‘দ্বিতীয় পক্ষে’র পতিভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পরিতৃপ্ত ভাবে বলিল “আজ ত দুখটা বেশ লাগলো।”

কুহুম বলিল, “বেশ লাগবে না কেন ? আজ যে আমি নিজে আল দিইছি, আজ তোমার মেয়ে হুধে জল মিশাতে পারেনি। তুমি ওবেলা তাকে তেলের কথা কি বলেছিলে, সে সমস্ত দিন রাগে গর গর করচে, বলেছে সে আর সংসারের কাজ

করতে পারবে না; তাইকে পত্র লিখে তোমাকে জব্ব করবে। না গো না, এমন মেয়ে বাপের জন্যে বেধিনি। বাপের একটা কথা গায়ে সর না ? এত তেজ ! আমি তো চোখের মাখা খাইনি, সে কি করে না করে আমি সব দেখতে পাই। চাল বল, তেল বল, ছন বল—সব জিনিষ সে তুলোর মাঝে দিবে মুকিরে মুকিরে বিক্রী করে। হাতে কি কম পরস জমিরেছে, গরনা বন্ধক রেখে মহাজনী করচে।”

যজ্ঞেশ্বর বলিল “বটে ! এ কথা এতদিন বলতে হয় ! তাই ত বলি, মাসে দেড় মণ চাল কিনি, তাতেও কুলোর না, হুঁসের ছনে মাল দায় না। হারামজাদী দেখিচি আমাকে কেয়ার করবে, এমন উপায় ?”

কুহুম বলিল, “উপায় আর কি ? ভাড়ারের ভায় ওর হাতে থাকলে কিছুতেই কুলোবে না !”

যজ্ঞেশ্বর বলিল, “তবে তুমি ভাড়ারের ভায় লও। ও হুঁবেলা হুঁটো রেঁধে দিতে পারে দেখ—না পারে তুমি ছেলেনাহুহ হুঁবেলা হাঁড়ি ঠেলতে পারবে কি ?”

কুহুম বলিল, “আমার সংসার আমি না পারলে আর কে পারবে ? হুঁবেলা হুঁটো রাঁধে, সে অস্ত্র ওর কথা শুনতে হয়, তুমি ত সে সব কথা শুনতে পাও না। আমার কাপ খালাপালা হয়ে গেল। আমি বলি কি, ওকে এক বেলায় মত চাল ভাল দিবে বলা বাব্ ও আলাদা ব্যর্থতার রান্না করে বাব্, আমা-দের কোন জিনিষ ওর হাত দেবার দরকার নেই।”

যজ্ঞেশ্বর বলিল, “তুমি খুব ভাল কথা

বলেছ, পাকা সিঁড়ির মত কথা বলেছ, কাল থেকে দাও ওকে পৃথক করে। কি করি গলার পড়েছে, তাকাত্তে ত পারবো না।”

কুসুম বলিল “আহা তা কেন করতে গেলে! হাজার হোক নিজের ঘরে ত বটে, ও বাই কেন করুক না, ওকে হুঁমুঠো খেতে দিতেই হবে। এত ধর্মজ্ঞান, বুড়া একেবারে গলিয়া গেল।

বজ্রেশ্বরের যে কথা সেই কাজ। পর দিন হইতে কুসুম সংসারের সর্বময়ী কর্তা হইল। সে হীরামণিকে একবেলার উপযুক্ত চাউল, ডাল, লবণ, তেল দিয়া বলিল “তোমাকে আর আমাদের সংসারের কাজও করতে হবে না, দশ কথা শুনিরেও কাজ নাই, এই নাও তোমার সিঁদে, আলাদা করে রেখে ধাও।”

হীরামণি পিতার ব্যবহারে স্তম্ভিত হইল। সে বলিল, “আমার চাল-ডালে দরকার নেই, আমার হুঁতোলা সোনাদানা আছে, তাই বিক্রি পরে আমার বেদশদিন চলে চলুক, তার পর আদেটে বা থাকে হবে, চাল-ডাল দিবে আমার কোন দিন কি বৌটা বেবে, এমন ভাতের পারে দণ্ডবৎ।”

হীরামণি শৈশবকালে অল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, সে কোথা হইতে কাগজ ও দোরাড-কলম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহার পর দাদাকে পত্র লিখিতে বলিল। পত্রে সে পিতার ও বিমাতার ব্যবহারের সকল কথা আত্মপূর্বিক লিখিল, পিতার সংসারে আর তাহার স্থান নাই, স্বামীর কুলেও আর তাহার কেহ নাই, এখন দাদা যদি তাহাকে হুঁটি খাইতে না দেন, তাহা হইলে তাহাকে

অনাহারে মরিতে হইবে। আত্মহত্যা করিয়া সে সকল জালা জুড়াইতে পারিত, কিন্তু রামার মুখ চাহিয়া সে মরিতে পারিতেছে না—ইত্যাদি। পত্রখানি লিখিয়া ঘোষাণীকে দিয়া সে তাহা ডাকঘরে পাঠাইল।

বিশেষর যথাকালে সকল কথা জানিতে পারিয়া মনে বড় আঘাত পাইল। কিন্তু সে খণ্ডরবাড়ীতে বাস করে, সেখানে ভগিনীকে লইয়া যাইবার সুবিধা নাই, অগত্যা সে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যয় স্বয়ং গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, এবং প্রতিমাসে তাহার খোরাকীর টাকা পাঠাইতে লাগিল, সেই টাকার হীরামণি পৃথক ভাবে রাখিয়া খাইতে লাগিল। বিশেষর পিতাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা না লেখায় বজ্রেশ্বর পুত্রের প্রতি খড়াহস্ত হইয়া উঠিল।

হীরামণি ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। এই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। রামা পাঁচ বৎসরের হইল।

রামা ছেলেমানুষ হইলেও দাদা মহাশয়ের উপেক্ষা বেশ বুঝিতে পারিত। সে দেখিত আজ্ঞা মশার তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেটিকে আদর বর করে, তাহাকে পোষাক পরাইয়া কোলে করিয়া বেড়ায়, আর রামাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না, কখন তাহাকে একখানি কাপড় দেয় না, একটু আদর করিয়া কাছে ডাকে না। সে ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া এক এক দিন তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিত, “মা, আজ্ঞা মশার আমাকে আর ভালবাসে না কেন?” হীরামণি অপ্রাপ্ত মেজে সন্তানের মুখ চুসন

করিত, মায়ের আদরে বালকের মনোবেদনা দূর হইত ।

পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে হীরামণি রামাকে পাঠশালার ভর্তি করিয়া দিল ।

রামা একদিন মধ্যাহ্নে পাঠশালা হইতে আসিয়া শয্যা পূরন করিল । মা বলিল, “পাঠশালা থেকে এসে শুনি বে !”

রামা বলিল, “মা, আমার অর এসেছে, আমি বসতে পারচিনে, বড় শীত লাগছে, একখান কাঁধা দে ।”

হীরামণি পুত্রের ললাটে হাত দিয়া দেখিল, কপাল পুড়িয়া বাইতেছে, তাহার জ্বরের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে । অরের বস্ত্রগার সে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিতেছে না ।

সমস্ত রাত্রি সেই ভাবে কাটিয়া গেল । হীরামণি পুত্রের পাশে বসিয়া বিনিত্র বিভাবরী অভিবাহিত করিল ।

প্রভাতে বালক চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কাতর ভাবে বলিল, “মা, দাদা মশারকে একবার ডাক, আমি আর বাঁচবো না ।”

হীরামণি বলিল, “বাঠ, বাঠ, বেঠের বাছা ও কথা বলে না ।” পুত্রের এক্সপ অর দেখিয়া হীরামণির উষ্মগের সীমা রহিল না । এ বিপদে সে কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে ? সে চারি দিক অন্ধকার দেখিল, তাহার পর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “বাবা, আমার বড় অর, এক বার হাত খানি দেখে এস ।”

বজ্রেশ্বর অনিচ্ছায় সহিত কস্তার গৃহে প্রবেশ করিল, ঘোহিত্রের হাত দেখিয়া বলিল, “জের সকল কাজেই ডাকাডাকি,

অর একটু অর হয়েছে, দিন দুই উপোস দিলেই সেরে যাবে, এ ভেতে ডাকার কবরের ডাকতে হবে না ।”

অর ছাড়িল না । কিন্তু সে ভক্ত বজ্রেশ্বরকে কিছু মাত্র চিন্তিত দেখা গেল না । সে যথা নিয়মে আহার, আমোদ ষ্ঠান্ধ বিক্রয় করিতে লাগিল । হীরামণি আহার নিত্ৰা বন্ধ করিয়া পুত্রের শুশ্রূষা করিতে লাগিল । কুন্ম কোন দিন তাহার দ্বারের নিকটও আসিত না । সে হীরামণিকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, “দাদার খেতে পরতে দিচ্ছে, সে এসে এখন তাগনের চিকিস্যে করাক না কেন ! বাপের অমান্য করে বোনকে টাকা পাঠানো হয়, যেমন ভাই, তেমনি বোন !”

গ্রামের কবিরাজ ভোলানাথ কবিত্ববণ নিদান-সিদ্ধ তিব্বতর বজ্রেশ্বরের প্রতিবেশী, বজ্রেশ্বরের সহিত তাহার পিতার বন্ধুত্ব ছিল । বজ্রেশ্বর কস্তার কাতরতা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সমর ভোলানাথকে ডাকিয়া আনিল, সে জানিত ভোলানাথ তাহার নিকট টাকা লইতে পারিবে না । সূচিকিংসক বলিয়া গ্রামে ভোলানাথের প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও, সংবাদ-পত্রের বহু বিজ্ঞাপনে ভোলানাথের নাম ছাপা হইত ।

ভোলানাথের এলোপ্যাথিক চিকিৎসাও নাকি কিছু কিছু জানা ছিল । কবিত্ববণ, নিদানসিদ্ধ ও তিব্বতর, এই তিনটি উপাধি সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা কেহই জানিত না । ভোলানাথ ণ্মমেটার দিয়া অর পরীক্ষা করিল, এবং রোগীর মাথার Ice bag বসাইবার ব্যবস্থা

দিয়া প্রস্থান করিল। ভোলানাথ জানিত পল্লীগ্রামে Ice ও Ice bag উভয়ই অপ্রাপ্য, কিন্তু সে যে অসাধারণ কবিরাজ ভাষা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অসাধারণ জিনিসের করমাইস করা আবশ্যিক।

তিন দিনেই অর বিকারে দাঁড়াইয়াছিল, ভোলানাথ কবিরাজ তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে সে বলিল “প্রেমার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, সাধারণ ঔষধে কোন ফল হইবে না, তিব্বত দেশ হইতে আমার বন্ধু তাসিলামা শীঘ্রই কিছু কস্তুরী পাঠাইবেন, তাহার একমাত্রা সেবনে রোগ সারিয়া যাইবে।”

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, “ততদিন ছেলেটা বাঁচিবে ত?”

নিদানসিদ্ধ বলিল, “সে উহার অদৃষ্ট, আমরা চিকিৎসা করিতে পারি বটে, কিন্তু পরমাত্ম দিতে পারি না।” তাসিলামার প্রেরিত কস্তুরী আসিল না, রোগীকে ডবল নিউমোনিয়ার ধরিল।

হীরামণি অল্প উপায় না দেখিয়া তাহার দাদাকে টেলিগ্রাম করিল। রেলের টেনন গ্রাম হইতে অধিক দূরে নহে।

পরদিন প্রভাতে বিবেশ্বর ব্যাগহস্তে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল। ভাগিনেয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রানাকে দেখিয়া আর চিনিতে পারা যায় না, এই কম দিনের রোগেই তাহার বেহ চক্ষুসার, চক্ষু নিশ্চত, গণ্ডহল শুক। রানার দাদাকে দেখিয়াই ‘দাদা’ বলিয়া কঁদিয়া উঠিল।

হীরামণি অকলে চক্ষু মুছিয়া বলিল,

দাদা, বাহাকে বাঁচাও, আমার যে আর কেউ নেই দাদা।

বিবেশ্বরের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

পুত্রের আকস্মিক আবির্ভাবে যজ্ঞেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিল, “হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ আসবার কি দরকার ছিল! অর হয়েছে ছ’পাঁচ দিন ভূগে সেরে উঠবে, অর কি কারও হয় না? তোমাদের সকল ভাতেই বাড়াবাড়ি, পরসী খুব সস্তা কিনা।”

বিবেশ্বর বলিল, “না এসে করি কি? আমার যে রকম কঠিন রোগ, তার মত চিকিৎসা হচ্ছে কৈ?”

যজ্ঞেশ্বর বলিল, “চিকিৎসা হচ্ছে না, কলকাতা থেকে, ডাক্তার আনতে হবে না কি? ভোলানাথের মত কবিরাজ এ তলাটে নাই, খবরের কাগজে পর্যন্ত তার নাম ছুটেছে, সে ভ’বেলা এসে দেখে বাচ্ছে, তাতেও ভাল চিকিৎসা হচ্ছে না? আমরা দেব ব্যারাম স্যারাম হ’লে যে কবিরাজও ডাকতে হয় না, অমনি সেরে যায়।”

বিবেশ্বর কিছু উত্তর দিল না, অবিলম্বে তিন ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গারামপুর হইতে একজন এসিষ্ট্যান্ট সার্জন লইয়া আসিল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া বলিলেন, “প্রথম হইতে একেবারেই চিকিৎসা হয় নাই, ‘কোলাঙ্গ টেটে’ আসিয়া আসি কি করিব?”

ডাক্তার আসিরাছে শুনিয়া কবিরাজ নিদানসিদ্ধ বলিল, “এখন পুত্ৰকাতরণ ব্যবস্থা, ডাক্তার মফিয়া ইন্ডোরে করিবে।

বুঝি? তাহাতে কি ফল হইবে?”

নিদানসিদ্ধির কথাই বলিল, ডাক্তার কিছুই করিতে পারিলেন না। অত্যাগিনী হীরামণি তাহার মরন-পুতলি পাঁচ বৎসরের পুত্রটিকে হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিধেবধি আর অগ্রপশ্চাত্ত না তাবিতা পুত্রহারা ভরীকে সঙ্গে করিয়া

লইয়া গেল। আমরা জানি বিদায়ের সময় বৃদ্ধ বজ্রেশ্বর কিন্তু চক্ষের জল সঞ্চার করিতে পারে নাই, তাহার মনটা যেন উদাস হইয়া গেল, কিন্তু সে বেশী দূরের জন্ত নহে, কুসুমের প্রাক্কল মুখ দেখিয়া, তাহার ক্রোড়স্থ কনিষ্ঠ পুত্রের কচি মুখে মিষ্টি কথা শুনিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

বেদান্ত ।

যুক্তি সম্বন্ধে, নাস্তিক ও আন্তিকদিগের যে সকল মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সকল মতেই মোক্ষাবস্থার হ্রঃ-নিবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য এবং বৈষ্ণব ভিন্ন সকল দার্শনিকই ঐ অবস্থার অধীনতার অভাব স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, তাহাদের মতে মোক্ষাবস্থার কোন রূপ সম্বন্ধজ্ঞান থাকে না, সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে অধীনতা থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবচাৰ্য্য রামানুজ ও পূর্ণ-প্রজ্ঞ মোক্ষাবস্থার ঈশ্বরের সহিত সেব্য-সেবক সম্বন্ধ স্বীকার করেন, সুতরাং তাহাদের মতে সে সময়েও অধীনতা অপরিহার্য্য। সৰ্বদর্শনসংগ্রহের শৈবমত প্রারম্ভে মাধবচাৰ্য্য লিখিয়াছেন “তদেতদ্বৈষ্ণবমতঃ পরমতত্ত্বত্বাংগবহনেন্দিষ্টাঙ্গত্বাৎ” বৈষ্ণব-দিগের দাসত্ববাদ সংস্থাপক মত, পরাধীনতা-জনিত হ্রঃবোধক; সে জন্ত ইহা অভিলষিত হইতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবচাৰ্য্যগণ ঐ সময়ে পরাধীনতা হ্রঃ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন যে, যখন মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর-

সেবার নিযুক্ত থাকেন, তখন তাহার কোন রূপ হ্রঃ বোধ হয় না, প্রত্যুত বিমল সুখ হইয়া থাকে। বাস্তবিক বিশেষ যুক্তি সহকারে বিচার করিলে, সে সময়ে অল্প পরিমাণ হ্রঃ থাকারই সম্ভাবনা বলিয়া মনে হয়। তবে সেই হ্রঃ, সে সময়ের স্থখের তুলনার অত্যন্ত অল্প, সুতরাং তাহা “স প্রত্যাবমৰ্শঃ” অর্থাৎ সহিষ্ণুতার সহিত অনুভবনীয় হইতে পারে। যদিও বৈষ্ণব ভিন্ন সকল দার্শনিকের মতেই অধীনতা হ্রঃখের কারণ তথাপি বৈষ্ণবদিগের উক্ত মত, শঙ্করসম্মত অদ্বৈত যুক্তির সোপান বলিয়া আদৃত হওয়ার যোগ্য। কারণ, চিত্তশুদ্ধি অদ্বৈততত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের কারণ, এবং চিত্তশুদ্ধির হেতু ঈশ্বরোপাসনা। সুতরাং বৈষ্ণবসম্মত মোক্ষাবস্থার ঈশ্বরোপাসনা-প্রভাবে চিত্তের নির্মলতা বা শুদ্ধি সাধিত হইলে, অদ্বৈত ব্রহ্মরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার অবশ্যসাধী। অতএব বৈষ্ণবসম্মত ঈশ্বরোপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মতাব প্রাপ্তি রূপ যুক্তির কারণ না

হইলেও, মুক্তির হেতু পূর্বোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
কারের কারণ বলিয়া মুক্তির বিশেষ উপ-
যোগী। ভগবদ্দীতার স্বয়ং ভগবান্
বলিয়াছেন

“লোকেশ্বিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা

পুরাশ্রোতা মনানথ ।

জানযোগেন সাংখ্যানাং

কর্মযোগেন যোগিনাং । ৩।৩।

হে নিম্পাপ! আমি পূর্বেরই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী
মুদ্রব্যগণের ভক্ত দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা
বলিয়াছি। একটি জাননিষ্ঠা এবং অপর
কর্মনিষ্ঠা। বাহ্যার সাংখ্য অর্থাৎ আত্ম-
বিষয়ে বিবেকসম্পন্ন ও শুদ্ধচিত্ত তাহার
জাননিষ্ঠার অধিকারী, এবং বাহ্যার আত্ম-
বিবেক রহিত ও অশুদ্ধচিত্ত তাহার কর্ম-
নিষ্ঠার অধিকারী। এই বাক্য দ্বারা ইহাই
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বাহ্যাদিগের চিত্তের
কলুষতা বিদূরিত হয় নাই, তাহার চিত্তের
বিশুদ্ধতা সম্পাদনের ভক্ত ঈশ্বরোপাসনা
প্রভৃতি কর্ম্মাহুষ্ঠান করিবে। এবং বাহ্যার
শুদ্ধচিত্ত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মাহুষ্ঠান
নিম্নয়োজন। এই সম্বন্ধে ভগবদ্দীতার
কথিত হইয়াছে যে

“নৈব ভক্ত কৃতেনার্থো নাকৃতেনৈক কচ্চন ।

ন চাত্ত সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ৩।১৮

যে জানী ব্যক্তি বৈবরিক স্রবের কনিকতাদি
দর্শনে আত্মস্থখে নিরতিশয় প্রীতিযুক্ত এবং
তাহাতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট তাহার
পক্ষে কর্ম্ম করা ও না করা উভয়ই সমান,
অর্থাৎ নিষ্কল। কারণ এই জগতের কোনও
পদার্থেই, ঐরূপ ব্যক্তির কোনরূপ প্রয়োজন
সম্বন্ধ নাই। ইহার ভাবার্থ এই যতক্ষণ

পর্যন্ত প্রয়োজনান্তিলাষ থাকে, ততক্ষণই
কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়। জানী ব্যক্তির
কোনও রূপ প্রয়োজনান্তিলাষ নাই। তিনি
ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে বিমল ও অধিনাশী ব্রহ্ম-
নন্দ লাভ করার তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন।
ব্রহ্মানন্দ সকল আনন্দের শীর্ষস্থানীয়।
যে ব্যক্তি এইরূপ উৎকৃষ্টতর আনন্দ লাভ
করিতে পারেন, সে ব্যক্তি কোনরূপ কর্ম্ম
করিতে অভিলাষ করেন না। উপাসনা
প্রভৃতি কর্ম্ম ঈশ্বরের সন্তোষার্থ করা হইরা
থাকে। কারণ, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইরা উপাসকের
সুখ বিধান করেন। যখন জানী ব্যক্তি
আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত এবং এই আত্মানন্দ
অবিনশ্বর ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অমুত্তম
করিতে পারেন, তখন তাহার অন্য বিধ
সুখাভিলাষ থাকে না, সুতরাং সে সময়ে
তিনি নিম্নপ্রয়োজন ঈশ্বরোপাসনা হইতে বিরত
থাকিবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। বিবেচনঃ
জানী ব্যক্তির নিকট জগতের সকলই আত্ম-
স্বরূপ, কিছুই জানী ব্যক্তি হইতে ভিন্ন নহে,
ঈশ্বর ও জানী ব্যক্তি উভয়ই এক, সুতরাং
উপাস্ত ও উপাসক এ উভয়ের ভেদজ্ঞান না
থাকিলে উপাসনা হইতে পারে না। এই
অবস্থার বৈকল্যসম্বন্ধে দেগব্যাবেকভাবে—
চিত্তের অশুদ্ধাবস্থার কার্য; ইহাই অদ্বতৈ-
বাদিগণের সিদ্ধান্ত।

অদ্বৈত মতে মুক্তি দ্বিবিধ। জীবমুক্তি
ও বিদেহ-মুক্তি। জীবমুক্তিসময়ে শরীর
থাকে, বিদেহমুক্তিসময়ে শরীর থাকে না।
জীবমুক্ত ব্যক্তি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব-
বশতঃ অজ্ঞানের মোহিনী শক্তি দ্বারা
অতিভূত হন না। তিনি অজ্ঞান ও তৎ

কার্য্য সকলকেই মিথ্যা বলিয়া বুদ্ধিতে
পারেন, এবং শারীরিক চূঃখ প্রভৃতি দ্বারাও
তিনি কোনরূপ উদ্বেগ অনুভব করেন না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সপ্তবিধ অবস্থা শাস্ত্রে কথিত
হইয়াছে। তন্মধ্যে পরবর্ত্তী তিনটি
জীবমুক্তের অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
বধা—

“চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্র্যঃ সাধনং পুরা।
জীবমুক্তেরবস্থাস্ত পরা তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রথম দ্বিনটি সাধনাবস্থা, চতুর্থটি জ্ঞানাবস্থা
এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম জীবমুক্তাবস্থা
বলিয়া কথিত আছে। উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা
সহজে লিখিত আছে যে

“জ্ঞানভূমিঃ তত্তেজাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যা তৃতীয়া তত্স্থমানসা।
সত্তাপত্তিস্ততুর্থী স্তাৎ ততোহসংস্কিনামিকা।
পদার্থাতাবনীযজী সপ্তমী মুখ্যা গা নৃত্য।

প্রথম যুমুক্তাবস্থা, দ্বিতীয় বিচারাবস্থা,
তৃতীয় বিচারজ্ঞ একাগ্রতাজনিত যুমুক্ত
এবং বোগ্যতাবস্থা, চতুর্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎ
কার্য্যাবস্থা, পঞ্চম নির্জিকর সমাধি অবস্থা,
ষষ্ঠ নির্জিকর সমাধির চিরস্থায়িতাবস্থা
এবং সপ্তম সৰ্ব্বদা পরিপূর্ণানন্দ অবস্থা।
প্রথম অবস্থার জাগ্রৎ অবস্থা নামে
অভিহিত। কারণ, আমাদের জাগ্রৎ
সময়ের জ্ঞান সে সময়েও জাগ্রৎ প্রপঞ্চ
রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। চতুর্থ জ্ঞান-
বস্থা, ইহা স্বপ্নাবস্থাতুল্য; কারণ, সে সময়ে
জাগ্রৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নমুদ্র বস্তুর যত অনুভূত
হইতে থাকে। চতুর্থাবস্থাপ্রাপ্ত জ্ঞানীকে
ব্রহ্মবিৎ বলা যায়। পঞ্চম নির্জিকর সমাধি
অবস্থা, ইহা সুষুপ্তি নামে অভিহিত, কারণ,

এই অবস্থার কোনরূপ জাগ্রৎ প্রপঞ্চ অনুভূত
হয় না। স্বভাবতঃই জ্ঞানী ব্যক্তির এই
অবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন
জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিদ্বয় বলা যায়। ষষ্ঠ অবস্থা
গাঢ় সুষুপ্তি নামে অভিহিত, এই অবস্থার
নির্জিকর সমাধি অধিক সময় স্থায়ী, এবং
অন্তের চেষ্টা ব্যতীত এই অবস্থার ভঙ্গ হয়
না। এই অবস্থার জ্ঞানীকে ব্রহ্মবিদ্বয়িয়ান
বলা হইয়া থাকে। সপ্তম তুরীয়াবস্থা, এই
অবস্থার সৰ্ব্বদা পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ অনুভূত
হয়, কখনও এই অবস্থার ভঙ্গ হয় না। এই
অবস্থাপন্ন জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্বয়িষ্ঠ নামে অভিহিত
হইয়া থাকে। এই অবস্থার জ্ঞানী ব্যক্তির
নিদ্রাসপ্রদ্রাস প্রভৃতির জন্তও কোনরূপ
যত্ন থাকে না। এই অবস্থা হইতে বধন
শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বিদেহ-মুক্তি
হইয়া থাকে। এ স্থলে আর একটি কথা
বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।
সকলেই বলিয়া থাকেন যে, দর্শনশাস্ত্র
নীরস। সে জন্য তাহার প্রতি অনেকেরই
আংশিক উপেক্ষা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।
প্রকৃতপক্ষে দর্শনশাস্ত্র ‘নীরস’ নহে, তাহাতে
‘রস’ আছে। সে রসের নাম ‘অভূত রস’
ও ‘শান্ত রস’। সকল দর্শনেই উভয় বিধ রস
নাই। বধাসম্ভব কোন দর্শনে ‘অভূত’ ও
কোন দর্শনে বা ‘শান্ত’ রস বর্ত্তমান আছে।
যে সকল দর্শনের বিচারপ্রণালী দ্বারা বুদ্ধি-
বৃত্তি হ্রাস হয়, সে সকল দর্শনে অভূত রস,
বধা বৌদ্ধ ও জ্ঞানাদি দর্শন। যে সকল
দর্শনের বিচার দ্বারা সংসারের প্রতি বধা-
সম্ভব আসক্তি নিবৃত্তি এবং আত্মজ্ঞানের
প্রতি আগ্রহ হওয়া যায় সে সকল দর্শন

শাস্ত্র রস। বখা সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে অদ্বুত রসের লক্ষণ বখা—“অদ্বুতো বিশ্বর স্থায়ি ভাবঃ” বিশ্বর হইতে যে রস প্রকাশিত হয়, তাহার নাম অদ্বুত রস। সাধারণবুদ্ধির অগম্য বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তৃতি, বিশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জ্ঞানাদি দর্শনের বিচারপ্রণালী দেখিলে, উক্ত দর্শন-প্রণেতৃগণের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ প্রসারিতা অদ্বুত হয়, সুতরাং ঐ সকল দর্শনে অদ্বুত রসই বুদ্ধিসিদ্ধ। সাহিত্যদর্পণকারের মতে শাস্ত্র রসের লক্ষণ বখা “শাস্ত্রঃ শম স্থায়ি ভাবঃ” “অনিত্যবাদিনাংশেষ বস্ত-নিসারিতাভূ বা, পরমাত্মব্রহ্মণং বা তস্যাগমন-মিযাতে” শম হইতে যে রস প্রকাশিত হয়, তাহার নাম শাস্ত্র রস, বিষয়ানুকূল শৃঙ্গারহার আত্মানন্দে বিশ্রামজনিত সুখে শম বলা যায়। অনিত্যতা প্রভৃতি দোষপ্রযুক্ত সকল পদার্থে অকিঞ্চিৎকরত্ব-জ্ঞান অথবা সচ্চিদানন্দরূপ আত্মা এই রসের অবলম্বন। কাব্যপ্রকাশকারের মতে শাস্ত্র রসের লক্ষণ অন্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে, বখা “নির্কেদ স্থায়িতাবোহন্তি শাস্ত্রোহপি শমোরসঃ” তৎসংজ্ঞান

আপদ বা ভীষা প্রভৃতি প্রযুক্ত ‘অহংকারে’র প্রতি অবজ্ঞা-বুদ্ধি হয়, সেই অবজ্ঞাবুদ্ধির নাম নির্কেদ, এই নির্কেদ হইতে অভিব্যক্ত রসের নাম শাস্ত্ররস। সাংখ্য ও বেদান্তের বিচার এবং যুক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে শম বা নির্কেদের উদয় হইতে পারে। সুতরাং উক্ত দর্শনসমূহে শাস্ত্র রস থাকা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এই সপ্তবিধ রস সাধারণের উপভোগ্য। কাব্য-নাট্যাদিতে বিশেষভাবে এই সপ্তবিধ রসেরই বর্ণনা আছে, সে জন্য কাব্য-নাট্যাদির প্রতি সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অদ্বুত এবং শাস্ত্র রস সাধারণ বুদ্ধির উপভোগ্য নহে, বিচারের আত্মপ্রসার ও মানসিক একগুতা প্রভাবে উক্ত রসদ্বয়ের উপভোগ সম্পাদিত হইতে পারে। সাধারণ বুদ্ধি ও বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ এই রসদ্বয়ের তাদৃশ অধিকারী নয়, সে জন্য দর্শনশাস্ত্রের উপর, সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় না, এই অবস্থার দর্শনশাস্ত্রের নীরসত্বপ্রবাদ যুক্তি ও অসুত্ব-বিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্যই মনে হয়।

শ্রীগুরুচরণ-তর্কদর্শনতীর্থ ।

প্রকৃত নির্বাণ কি ?

(পূর্বস্মৃতি)

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। একটা বৃহৎ তত্ত্ব বৌদ্ধধর্মে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই তত্ত্বটির প্রসার বহুল বিস্তৃত। সেই তত্ত্বটি

কি?—না, কর্ম। কর্মই বৌদ্ধধর্ম-নীতির মূল ভিত্তি। কর্ম কি? না, নৈতিক ফলাফল; কর্মের এই নিয়ম যে, ভালই হোক মন্দই হোক,—আমাদের প্রত্যেক কার্যের

যথোই দণ্ড পুরস্কার গুণরূপে নিহিত আছে ; মানুষ অন্যগ্রহণ করিয়া কিল্প অবস্থা লাভ করিবে, তাহার কার্য্য স্বতই তাহা নির্ধারণ করিয়া দেয়। ইহাতে প্রত্যেক মানুষের স্বকীয় কার্য্য নির্বাচনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষই আপনার মোক্ষ আপনিই সাধন করিতে পারে, এবং প্রত্যেক মানুষকেই তাহা সাধন করিতে হইবে।

ভাল কাজ করিলে আমাদের সঙ্গতি হইবে, আমাদের উন্নত অবস্থা হইবে, এমন কি আমরা মোক্ষলাভও করিতে পারিব। পক্ষান্তরে, মন্দ কাজ করিলে, আমরা দুঃখময় লোকে আবদ্ধ হইয়া থাকিব। এই তত্ত্বটির পরিণাম অতীব ফলগত। এই তত্ত্বটি মানুষকে বহু পরিমাণে নৈতিক কার্য্যোদ্যম ও নৈতিক বলবীৰ্য্য প্রদান করে। বৌদ্ধেরা জানেন—মন্দ কার্য্যের পরিণাম হইতে স্নঃ ভগবান্ও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, অথবা কোন মধ্যবর্তী সিদ্ধ পুরুষ তাহাদের হইয়া ভগবানের নিকট দরবার করিলেও কোন ফল হইবে না। আবার ভাল কাজ করিলে, কি মানব কি দৈব কোন শক্তিই সেই কাজের পুণ্যফল ও পুরস্কার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না; বৌদ্ধেরা আপনা ছাড়া আর কাহারো উপর নির্ভর করে না; কার্য্য-কারণের ফলাফল বেশ বুঝিয়াই তাহারা স্বকীয় কর্তব্য নির্ধারণ করে।

মঠে দান করা, তিফা দেওয়া, পূজা কার্য্যের অমুষ্ঠান করা,—এই সব বাহ্য অমুষ্ঠানে তেমন পুণ্য নাই; কারণ, বাহ্য

এইরূপ অমুষ্ঠান করে, তাহাদের কলিক সম্বোধ হয় মাত্র; কর্মের নিরম এই সকল অমুষ্ঠানেই বদ্ধ নহে। কর্মের নিরম আরও বিশেষরূপে এই কথা বলে যে, শুধু জীবের কল্যাণ-সাধন ও দুঃখহ্রাস করিবার যামগেই কার্য্যসকল অমুষ্ঠান করিবে। ফলতঃ, কোন কাজে পুণ্য হওয়া না হওয়া সঙ্কল্পের বিমুক্ততার উপরেই নির্ভর করে।

পুণ্য কিংবা বিমুক্ত সংকল্পের অমুষ্ঠান তিন প্রকার। প্রথম—ইহলোকে পুরস্কারের আশায় যে পুণ্য কার্য্য অমুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মুক্তি হয় না। দ্বিতীয়—পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে পুণ্য কার্য্যের অমুষ্ঠান হয়। ইহা উচ্চতর পুণ্য কর্ম। এই কার্য্য-কলে কার্য্য-কর্ত্তার উৎকৃষ্ট গতি হয় ও পরলোকে সে পুরস্কার লাভ করে। তৃতীয়—হিতৈষণা ও মৈত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া যে কাজ নিঃস্বার্থ-ভাবে করা হয়। শুধু এইরূপ কাজের দ্বারাই নির্বাণ লাভ করা যাইতে পারে। শুধু আপনার প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিলে এই নির্বাণে উপনীত হওয়া যায় না। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের চূড়ান্ত উপদেশ। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য—এ জিনিসটা আসলে কি? ইহা স্বার্থপরতার একটা ছুতামাত্র এবং এই স্বার্থপরতা হইতেই আমাদের যত অন্তত, যত ভ্রম, যত মন্দ কার্য্য উৎপন্ন হয়। অন্তএব স্বার্থপরতাকে নিশ্চূর্ণ করিতে হইবে; এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, স্বার্থপরতাকে যে নিশ্চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের পরম গৌরব বলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম এ কথা বলিতে ভয় পায় নাই

যে, অহংকে পর্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া যে আত্ম-বিসর্জন—তাহাও একটা সঙ্গুণ, এবং অহংকে লোপ করিতে পারিলে তবেই পরম পুরস্কার লাভ করা যাইতে পারে। এরূপ আত্মবিসর্জন মানুষের পক্ষে একটা অলৌকিক বীরত্বের কাজ সন্দেহ নাই; কেননা, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মানুষ প্রায় স্বার্থের উদ্দেশ্যেই সকল কাজ করে; এবং কর্তব্যের অমুষ্ঠান-জনিত যে সুখ কিংবা বিবেকের কথা ভানিয়া চলিলে মনের যে শান্তি হয় তাহাও স্বার্থেরই প্রকারান্তর মাত্র। অতএব, বুদ্ধের মতে যদি কোন মনুষ্য শুধু আপনার হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এবং অস্ত্রের অহিত হইবে কি না তাহার প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া, কোন স্বার্থপর কাজ করে, এবং তাহাতে বাস্তবিকও যদি কাহারও কোন অনিষ্ট না হয়, তবু তাহার সেই কাজকে খারাপ কাজ বলিতে হইবে। সঙ্গুণের বাহা ভাণমাত্র তাহাকে বাস্তবিক সঙ্গুণ বলিয়া লোকে বাহাতে ভ্রম না করে, এই মন্ত্বে বুদ্ধদেবের অনেক উপদেশ আছে। চক্ষু কর্ণকে মল্য হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই চরম সিদ্ধি লাভ করা যায় না; কেননা, তাহা হইলে বধির ও অন্ধেরাও চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিত। বস্ত্র, শুভ সংকল্পের দ্বারা ই পুণ্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বাক্য যদি কার্যে পরিণত না হয়, তবে সে বাক্যের কোন মূল্য নাই।

অতএব কস্মিন্দ্র জ্ঞানের ধারণায় উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পাপপুণ্য অমূল্যেরই মানুষ দণ্ডিত কিংবা পুরস্কৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের পাপক্ষালন করিবার জন্ত যদি প্রারম্ভিত আবশ্যক হয়, তাহা

হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, সেই প্রারম্ভিত অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে; কেননা, সসীম সময়ের মধ্যে যে অপরাধ কৃত হয়, তাহার ফলে অনন্ত শাস্তি কখনই হইতে পারে না। তাহা জ্ঞান-বিরুদ্ধ। সেই-রূপ পুরস্কার লাভ ভাল কার্যেরই ফল; ধুটানেরা বাহাকে ঈশ্বর-প্রসাদ (grace) বলে, এ স্থলে সেই ঈশ্বর-প্রসাদের কোন কার্যকারিতা দেখা যায় না। কারণ, রোমানদিগের প্রতি সম্ভাবিত পত্রে, সেন্ট-পল্ বলিয়াছেন, “ঈশ্বর বাহাকে স্বর্গ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই তিনি স্বর্গ দান করেন”; তাহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কে স্বর্গে যাবে, কে নরকে যাবে তাহা তিনি পূর্বে হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যে সকল লোক ঈশ্বরের নির্ধারিত, তাহাদের প্রতি কে দোষারোপ করিবে? ঈশ্বর স্বয়ংই তাহাদের কার্যকে সমর্থন করেন। কারণ, ঈশ্বর মূল্যকে বলিয়াছিলেন, “আমার বাহাকে ইচ্ছা আমি তাহাকে হুঃখ দিব, আমার বাহাকে ইচ্ছা আমি তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিব। অস্ত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেহ হুঃখ পায়, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেহ দুঃখ লাভ করে (৭১)।” ইহা সহজেই বুঝা যায়, বোধেরা এমন কোন পদ্ধতি কখনই গ্রহণ করিবে না, বাহাতে স্বার্থিত্বের কোন প্রতিভু নাই—বাহা সর্ব-শক্তিমানের কেবল কৃপার উপরেই নির্ভর করে। Schlaginweitও এই কথা সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভূতানের লামার সহিত তাহার যে কথোপকথন হয়

তাহার বিবরণ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। Huo ও Gabet এই দুই ধর্মপ্রচারক পাত্রির সহিত লামার একবার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে, লামা খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে খৃষ্টধর্মে যোক্ষলাভের কোন পন্থা নাই। তিনি বলিলেন—“কারণ, খৃষ্টভক্তেরা, স্বকর্মের পুরস্কার স্বরূপ, ঈশ্বরের সেবকদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবে। অতএব, উহারা পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আবার যদি তাহারা স্বকীয় কর্তব্যে শৈথিল্য করে, তাহারা ঈশ্বর-লোক হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, তাহাদের অপরাধের শাস্ত্যরূপ, কোন দুঃখময় লোকে জন্ম গ্রহণ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?” শেষে তিনি এই কথা বলিলেন—তোমাদের মত অপেক্ষা বৌদ্ধমত ঢের ভাল। বৌদ্ধ মতানুসারে “মামুষ স্বকীয় গুণভিত্তির ফল হইতে বঞ্চিত হয় না, এবং যদি একবার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহার পুনর্জন্ম হয় না।” কর্মের আর একটা পরিণাম এই, কর্ম মামুষের পৈতৃক অপরাধকে বা গোড়ার অপরাধকে (original sin) রহিত করে। মামুষকে পৈতৃক অপরাধের জন্ত দারী করা একটা অস্তায় কার্য। ফলত, এক জনের দোষে আর এক জনের কষ্ট পাওয়া স্তারসঙ্গত নহে; ইহাই সনাতন ধর্মনিয়ম।

আর যদি আত্মহত্যার কথা বল—বৌদ্ধ-ধর্মে আত্মহত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ। “ভগবানের উপদেশ এই—আত্মহত্যা কখনই করিবে না।” বুদ্ধের মতে আত্মহত্যা একটা নৈতিক হুর্নলতা, ইহা যোক্ষের পরিপন্থী।

আত্মহত্যা করিলে, তাহার প্রারম্ভিকস্বরূপ, নিকট বোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সংসারী বৌদ্ধদিগকে যে সকল কর্ম অনুসরণ ও যে সকল কর্ম পরিবর্জন করিতে হয়—সেই সকল বিধিনিষেধের মুখ্য উপদেশগুলি আমি প্রায় সমস্তই বিবৃত করিয়াছি। বাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় বৌদ্ধ-ধর্মের মহত্ত্বও বথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি দেখাইয়াছি যে, এই ধর্ম,—অহিংসা, মৈত্রী ও ইন্দ্রিয়দমনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধধর্ম, যে চরম লক্ষ্যের কথা বলেন, তাহার সহিত যদিও আমাদের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার মিল হয় না, কিন্তু সেই চরম লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্ত যে সকল সঙ্গুণের সাধনা আবশ্যক, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিবার না। বৌদ্ধধর্মে এমন কিছুই নাই, যাহা বিত্তময় হুক্তির বিরোধী; কেননা, বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ নহে, দর্শন-শাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ নহে। মামুষ যে পুণ্য অর্জন করে,—সে তাহা নিজ বলেই অর্জন করে। যে দীন, যে অজ্ঞ,—তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বিশোধিত করিয়া সমুন্নত করে; কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি পণ্ডিত, তাহাদের সকলকেই বৌদ্ধধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, জগৎ অসার শূন্যময়, এবং কেবল সঙ্গুণের সাধনার দ্বারাই নির্বাণে উপনীত হওয়া যায়, এবং এই শিক্ষাই তাহাদিগকে বিনীত করিয়া তুলে।

তা ছাড়া, সেই জগৎগুরু কি আমাদের পথ-প্রদর্শক নহেন—বিনি আমাদের মধ্যে আনন্দ আনিয়াছেন, বিনি জগতের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, জগতের উদ্ধারের জন্ত, মামুষের সমুন্নতি ও যোক্ষের জন্ত,

জগতে আবিস্কৃত হইয়াছেন ; যিনি ধর্মের পরম মিত্র, সেই বুদ্ধদেব অবিরাম এই উপদেশ দিতেছেন যে,—“বাসনা হইতে মুক্তলাভ করাই মানুষের পরম কর্তব্য ; উহাই চিত্ত-শুদ্ধির একমাত্র পন্থা । তোমাদিগের নিকট আমি এই পথের ঘোষণা করিতেছি, কেননা আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জন্মমাত্রই নশ্বর ও দুঃখময় ; এবং এই জন্ম, পূর্ব জন্মেরই অবশ্যভাবী পরিণাম মাত্র ! যে শীলসম্পন্ন সাধু ব্যক্তি আমার কথা বুঝিয়াছেন, তাঁহার নির্বাণের পথ পরিস্কৃত হইয়াছে—সেই নির্বাণ বাহার উপর আর সন্দেহ নাই ।”

কেননা আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বেদনা ।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যার বারে বারে ;
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে ।
যে লতাটি আছে শুকায়ছে মূল,
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল ;
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে ।
পূজাগৌরব পূণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার নীন বেশ ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশী সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমার এনেছে ডাকিয়া ভাঙা মন্দির দ্বারে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

প্রকাশ ।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর ।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ।
কত কর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের নীলার আগে হৃদয় পূর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুরমধুর ।
তোমার আমার মিলন হলে সকলি যার খুলে
বিশ্বনাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন ঢুলে ।
তোমার আলোর নাই ত ছায়া আমার মাঝে পার সে কারা
হয় সে আমার অক্ষজলে সুরের বিধুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুরমধুর ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মালদহ সাহিত্য-সন্মিলনে সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ ।

সন্মিলন প্রকৃতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না ; তাহাতে সাহিত্যের পরিচালনা, জ্ঞান-প্রচারের আয়োজন এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকলের মিলিত চেষ্টার সমবায় সাধিত হয় মাত্র ।

ভাষা, জাতি বা ধর্মের অধীন নহে । তাহা প্রকৃতির জিনিস, প্রকৃতির পথেই চালিত হয় । এই ‘সুজলা সুকলা শস্য-শামল্য’ বঙ্গদেশ বাহাদেবের একমাত্র জননী, তাহার জলবায়ুতে বাহাদেবের অস্থিমজ্জা গঠিত, ‘আপনার ভূমি’ বলিতে হইলে বাহাদেবকে বঙ্গদেশের প্রতিই তাকাইতে হয়, তাঁহারাই বাঙ্গালী, তাঁহারা যে জাতিরই বা ধর্মেরই হউন না কেন । বঙ্গভাষার জন্ম তাঁহারাই দিয়াছেন, এবং সেই বঙ্গভাষা দ্বারা তাঁহারাই পুষ্ট হইতেছেন । একমাত্র এই বঙ্গভাষার ভিতর দিয়াই, তাঁহাদের সর্বোচ্চ চিন্তা ভাব কল্পনা, তাঁহাদের বাঙ্গালিভব, পরিষ্কৃত হইতেছে । তাই ভারতের সুদূরতম প্রান্ত-বাসী বাঙ্গালীও আজ বাঙ্গালী । ভারতের অন্তান্ত সাহিত্য-হীন জাতিভাষার, বিভিন্ন জাতি এবং ভাষার প্রভাবের মধ্যে থাকিয়াও সে আজ আপনার বাঙ্গালিভবটুকু হারায় নাই । বঙ্গ-সাহিত্যই তাহার একমাত্র কারণ । উপরন্তু উদার বঙ্গ-সাহিত্য কত বিভিন্ন দেশবাসীকে একেবারে কোলের ছেলে করিয়া লইয়াছেন । আমাদের ‘পাঁকে’ এবং ‘মিস্র’ সাহিত্য-সেবিগণকে, ‘এ পাঁকে’ বা ‘মিছির হো’ বলিয়া, আজ

সম্বোধন করিলে তাহা শুধু তাঁহাদের অপমান স্বরূপই হইবে, কারণ তাঁহারা আজ পুরো বাঙ্গালী । গণেশ-তনয় সখারামের বাঙ্গলা পড়িয়া তাঁহাকে দেউস-নগরাগত বলিয়া কে বিশ্বাস করিবে ? ‘তেওয়ারীজী’ কতকাল হইল ‘টিকি’টিকে লুপ্ত হকার করিয়া, বঙ্গ-গৃহে ত্রিবেদীরাগে অন্ত্যাতবাস করিতেছেন তাহা ইতিহাসের একটা লুপ্ত তথ্য ।

সুতরাং, যখন বঙ্গভাষা এত উদার এত প্রভাবশালী, তখন, পুরুষাভূক্তমে বাহাদার বাঙ্গলার অধিবাসী—আমি মুসলমান জাতিগণের কথা বলিতেছি—তাঁহাদের পক্ষে, তাহার প্রভাব হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের অনিষ্টেরই কারণ, এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইলে, তাহা অধিক কাল সম্ভবপরও হইবে না । জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ভাষার কথা, এবং সাহিত্যের ভাষার নিয়ম লইয়া আমি তাহা বুঝাইব ।

প্রথম—জনসাধারণের ভাষা । ভাষার উৎপত্তি ও গতি প্রকৃতি-অনুযায়ী ; তাহা প্রকৃতির পথে, সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে চলে । আমাদের নিত্যকার আলাপ-ব্যবহারই আমাদের ভাষার উপাদান, আশপাশের লোকের কথাবার্তা হইতেই আমরা তাহা শিখি । তাই বিভিন্ন দেশের ভাষাও বিভিন্ন—একদানের ভাষা জোর করিয়া অন্যদানে চালান যায় না ; কারণ

ভাষার বিশেষত্ব ব্যাকরণে—শব্দসমষ্টিতে নহে। সুতরাং বিদেশী শব্দাবলী যদি দেশী ব্যাকরণানুযায়িত ভাবে ভাষার সহিত চালাই যায়, তাহা হইলে ভাষাও ঠিক থাকে এবং তাহার পুষ্টিও হয়। এবং সেই নিয়মে বঙ্গ-ভাষার মধ্যে ফারসী ও আরবী শব্দ প্রচলন করিলেও ভাষার কোন হানি হয় না। কিন্তু, তাই বলিয়া বঙ্গভাষাকে ভ্যাগ করিলে, যে কোন ধর্মের বাঙ্গালীই হউন না কেন, নিত্য তাঁহাকে স্বভাবের প্রতিকূলে যুক্তিতে হইবে; কারণ, সমস্ত বাঙ্গালীর প্রকৃতি-অনুযায়িত ভাষা বাঙ্গলা—এটা তাঁহাদের আপন সম্পত্তি।

সাহিত্যের ভাষা স্বতন্ত্রেও সেই নিয়মই খাটে। বঙ্গভাষার দৃষ্টান্ত লইয়াই দেখুন। যে পণ্ডিতগণ বাঙ্গলাকে বিভক্তিহীন সংস্কৃত করিতে চান, বা যে শব্দ-শিল্পীগণ একেবারে গ্রাম্য ভাষায় সাহিত্যচর্চা করিতে চান, তাঁহাদের উভয়েরই চেষ্টা বিফল হইতেছে, হইবেও। কারণ, একদিকে—দুর্ভাগ্য শব্দ-বহুল ভাষা, যাহাতে পদে পদে অভিধানের প্রয়োজন--সে রূপ ভাষা দু'একজন পণ্ডিতেরই উপযোগী, সাধারণে তাহার কখন আদর করিবে না; অপরদিকে—গ্রাম্যভাষা শ্রেণী-বিশেষে আবদ্ধ, এবং স্থানভেদে বিভিন্ন আকারের; সুতরাং তাহা সর্ববিভাগের ভাষা হইতে পারে না; বিশেষতঃ, আমাদের উচ্চতম চিন্তা ভাব কল্পনা বাহা সরল ভাষার পরিষ্কৃত হয়, তাহা লঘু গ্রাম্য ভাষার কখনও পরিব্যক্ত হইতে পারে না। তাই মধ্যবর্তী কোন পথ খুঁজিয়া লইতে হইতে হইবে প্রকৃতিই সে পথ দেখাইয়া দেন। কারণ, ভাষা

কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তাহার উপর জোর খাটে না। সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে তাহার গতির পরিবর্তন করিতে হয়। সে ক্ষমতা মহাপুরুষগণের আছে। তাঁহারা প্রকৃতির অনুচর, বা তাহারাই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। তাঁহারা আপনাদের প্রতিভার বলে আপনাদের রচনার মধ্যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন যাহার কুহকে লোকে আপনাদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের শিষ্য হইয়া, তাঁহাদের শব্দ-বিস্তার প্রথা, তাঁহাদের প্রদর্শিত শব্দাবলী অবলম্বন করে। এইরূপে ভাষার পরিবর্তন সাধিত হয়। এ ক্ষমতা শুধু প্রতিভাবান লেখকেরই আছে, ইহা অস্ত্রের সাধারণত্ব নহে। ইতিহাস তাহারই প্রমাণ দিতেছে।

আশী বৎসরপূর্বে যখন নব গ্রীস স্বাধীন হয়, তখন স্বদেশপ্রেমিকেরা দুই সহস্র বৎসর পূর্বেকার সেই প্রাচীন গ্রীক ভাষা, যাহার সাহিত্য, যাহার রাজনৈতিক প্রাণালী তদানীন্তন এবং পরবর্ত্তী যুগে জগতে অতুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই ভাষার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। শিক্ষক, লেখক এবং সম্পাদকবর্গ প্রাচীন গ্রীসভাষার পথা-মুণ্ডিত হইলেন। কিন্তু ৫৬ বৎসর পরে দেখা গেল—~~কিন্তু~~ বিপরীত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক শেখা দূরে থাক, লোকে বাধ্য হইয়া লেখাপড়ার চর্চায় পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। তখন গ্রীস আবার নব পথে ফিরিয়া আসিল।

ইংলণ্ডেও, নব্রাণগণ প্রথম ইংলণ্ড জয় করিয়া দেশের বাবতীর কার্যে তাহাদের পৈত্রিক করাসী ভাষার প্রচলন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, ইংলণ্ডের লোক তাহার কিছুই

বুঝিল না। এদিকে আবার, বহুকাল ফ্রান্সের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকায়, কালক্রমে ইংলণ্ডস্থ নর্মাণদের ভাষা হাস্য্যাস্পদ রূপে বিকৃত হইয়া উঠিল, সে ভাষার আর তখন ভাল পুস্তকাদি লেখা চলিল না। তিনশত বৎসর পরে তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে তাঁহারা নর্মাণ হইলেও ইংরাজ; সুতরাং ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করা তাঁহাদের শ্রেয়। সেইদিন হইতেই অপূর্ণ ইংরাজী-সাহিত্যের সূচনা হইল। কবি চমার তাহার আদিগুরু। তাঁহারই ভাষা দ্বয়ং পরিবর্তিত হইয়া আজিও চলিতেছে।

পারস্য এবং তুরস্কও এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। ৬৪৪ খৃঃ নাহাবন্দ যুদ্ধে পারস্য জয় করিয়া আরবেরা সেখানে মহম্মদীয় ধর্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিলেন। গ্রন্থ ও দলিলদস্তাবেজাদি আরবীভাষার লেখা আরম্ভ হইল এবং পারস্য হরকে আরবী গ্রন্থসমূহ পুনর্লিখিত হইল। জনসাধারণ তাহা বুঝিল না, তাহাদের জ্ঞানবিস্তার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অবশেষে ফর্দৌসী জয়গ্রহণ করিলেন। তিনি গ্রাম্য ভাষার কাব্য লিখিয়া সকলের মনোহরণ করিলেন। সেই হইতেই ফারসী পারস্যের ভাষা হইল। তুরস্কের কবিগণও একদিন এইরূপে তুর্ক-দেশে পারস্য ভাষা চালাইতে গিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে তুর্কী ভাষাকেই মুখপাত্র করিতে বাধ্য হন।

ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। মুসলমানের উত্তরভারত-জয়ের একশত বৎসর বাইতে না বাইতে, উল্লঙ্ঘ্য কারণে, আরবী ছাড়িয়া ফারসীতে বই লেখা আরম্ভ হইল,

এবং আরবী গ্রন্থগুলিকে ফারসীতে অনুবাদিত করা আবশ্যক হইল, কারণ তখন আরবী ভাষা লোকে ভুলিয়াছে। চারিশত বৎসর পরে আবার ফারসী ভাষাও মুসলমানের নিকট ‘পর’ হইয়া আসিল, তখন ভারতীয় উর্দু প্রচলন হইল। আরবী ‘আখ’ বা ফারসী ‘বেবাদর’ ছাড়িয়া তাঁহারা হিন্দী ‘ভাই’ ও ‘দাদা’ ধরিলেন। ‘পুঁটি বিবি’ ‘মতি বেগম’ প্রভৃতি দেশী কথাও তাঁহাদের পরিবারে প্রবেশ করিল। শাহজাহান যে উর্দুতে অতি সুন্দর গান রচনা করিতেন ও গাহিতেন পাতিশাহনামাই তাহার প্রমাণ দেয়। এখন যাহা গানের ভাষা তাহাই প্রাণের ভাষা; সুতরাং, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাই যে, শাহজাহানের সময় হইতেই উর্দু বাদশাহদিগের আপনাত্তা ভাষা হইয়াছিল।

অতএব, যদি দিল্লীর বাদশাহগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের আরবী ফারসী তুর্কী ছাড়িয়া উর্দু গ্রহণ করিলে তাঁহাদের খানদান বা ধর্মের কোন হানি না হইয়া থাকে, তবে বঙ্গের মুসলমানগণ উর্দু ছাড়িয়া বাঙ্গলা ধরিলে তাঁহাদের সেরূপ কোন হানি হইবে কেন, আমি বুঝি না। উপরোক্ত সকল কারণে মুসলমানগণের বঙ্গভাষা গ্রহণ করা অনিবার্য। যাহা প্রকৃতির সনাতন নিয়ম, দেশভেদে তাহার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না। এ বিষয়ে মুসলমানদের উদাসীনতায় তাঁহারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

সেই ক্ষতির পরিমাণ আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ প্রীযুক্ত আবদুল

করিয়া দেখাইয়াছেন যে উর্দু মধ্য দিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার চেষ্টায় মুসলমান বালক-গণকে হিন্দু অপেক্ষা দুইটি অর্থাৎ পাঁচটি ভাষা শিখিতে হয়। ফলে, ভাষার বোঝা বাড়ি লইয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। তাহারা অনেকেই ভাল উর্দু শেখে না, অথচ বাঙ্গলার চর্চাতেও লজ্জা পায়। ইংলিস ভাষাকুলার লইয়া পরীক্ষার পাশ হইলেও, কর্মক্ষেত্রে—যেখানে মাতৃভাষার নিত্য প্রয়োজন,—সেখানের পরীক্ষায় ইহাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, পারসিক কতি। মধ্য যুগে ইউরোপে যে বিজ্ঞান বটিকাছিল, আধুনিক যুগে বাঙ্গলায়ও তাহাই হইতেছে। ইউরোপে তখন আদি-বাইবেল ধান গ্রীক ও হিব্রু হইতে ল্যাটিনে অনুবাদিত করিয়া গীর্জার গীর্জার-পাঠ হইত এবং ঐ ভাষাতেই ভজন ও মঙ্গীত চলিত। সাধারণে ভোতাপাখীর মত তাহা আবৃত্তি করিত, কিছু বুঝিত না; কাজেই ধর্ম তাহাদের নিকট একটা বাহিরের বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তারপর বোড়শ শতাব্দীতে লুথার যখন ধর্মসংস্কার করিলেন, তখনই দেশী ভাষায় ধর্মকথা শুনিয়া এবং পড়িয়া, যাকে ধর্মকে বর্ধাৎ প্রাণের বস্তু বলিয়া ধরিতে শিখিল। এখানে, এ বাঙ্গালি দেশেও, কোরাণ হাদিস উর্দুতে অনুবাদিত করিয়া উর্দু ব্যাখ্যায় লাহাকো পড়ান হয়। ইহাতেকল এই হয় যে ধর্মপুস্তকগুলি অপরিচিত ভাষায় থাকিয়া যায়। মোজাফি বদি বাঙ্গলা অনুবাদ গুলিকে যুগের চক্ষে না দেখিতেন, তবে কত

মুসলমান মাতৃভাষায় ধর্মপুস্তক পাঠ করিয়া ধস্ত হইতে পারিতেন। ইহা বেশ মনে রাখা উচিত যে ধর্মের সহিত ভাষার সম্বন্ধ নাই। ধর্ম সীমাবদ্ধ নহে, তাহা কোন বিশেষ ভাষায় লিখিত পুস্তকে আবদ্ধ নহে। ধর্ম সার্বজনিক এবং সনাতন।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদের পক্ষে উর্দু পরিচালন সম্ভবপর হইলেও তাঁহাদের রমণীগণের ভাষাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাঙ্গলা-বর্জন এবং জ্ঞান-বর্জন তাঁহাদের পক্ষে একই কথা। বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার পক্ষে তাঁহাদের যেরূপ সুযোগ আছে, উর্দু শিখিবার পক্ষে সেরূপ নাই। কাজেই বাঙ্গলা ত্যাগ করিলে তাঁহাদের সমাজের এক অঙ্গ বিকল হইয়া থাকিবে।

চতুর্থতঃ, বাঙ্গালী মুসলমানেরা প্রায়ই ভাল উর্দুতে সুশিক্ষিত হন না। ফলে, অনেকস্থলে তাঁহাদিগকে অপরের কাছে লজ্জিত হইতে হয়। বাঙ্গলাভাষার কথা বার্তা কহিবার আগ্রহ যে তাঁহাদের সর্বদাই হয় বিদেশস্থ অনেক মুসলমান তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। তবে সে ভাষাকে মুসলমান সম্প্রদায় ত্যাগ করিতে চান কেন?

পঞ্চমতঃ, উর্দুভাষায় আদর্শ অতি পুরাতন। মধ্যযুগের সেই নিরাশা অবসার তাহার প্রতি কাব্য এবং রচনার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু 'জগতের গতি আজ ভিন্ন প্রকার। যে নব ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবাহিত হইয়া জগতের কর্ণে ধর্মে এক নুতন ডেজ আনিয়া জগতের আকর্ষণ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জরুর বহু-

সাহিত্য-নদীতেই প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্য আজ জগতের এই নব শক্তির সহিত আপন সংযোগ রক্ষা করিতেছে। প্রথম যুগযুগান্তরব্যাপী অড়তা, নিজার অলসতা, উদাসীনতা পরিভ্রাণ করিয়া, পৃথিবীর রণক্ষেত্রে নাঁড়াইতে হইবে। সে যুদ্ধের সময়সঙ্গীতের উৎসাহধ্বনি বঙ্গ-সাহিত্যেই মিলিবে, উর্দুতে নহে। অবশ্য উর্দুক আমি অবহেলা করি না, তাহার মধ্যে অতীতের অনেক রস আছে। কিন্তু, সে ভাষা আধুনিক যুগের উপযোগী নহে।

সম্প্রদায়বিশেষের কথা ছাড়িয়া আমি সাহিত্যলোবিগণের নিকট একটি নিবেদন করি।—

পূর্বেই বলিয়াছি, এইরূপ সভা-সম্মিলন সাহিত্য-সৃজন করিতে পারে না। ইহার পথ দেখায় মাত্র। কারণ, যেমন “A poet is born not made”, তেমনি শুধু প্রতিভাই—চেষ্টা নহে—সর্বোচ্চ শ্রেণীর মৌলিক সাহিত্য সৃজন করিতে পারে না। কিন্তু তবু চেষ্টা দ্বারা অনেক কাজ হয়। বাঙ্গলা-সাহিত্য এখন শিশুর জ্ঞান চঞ্চল, শিশুর জ্ঞান অশান্ত। তাহাকে সংবৃত করিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত আবেগকে যোগ্য পথে পরিচালিত করিয়া তাহার পূর্ণ পরিণতির অভিব্যক্তি তাহাকে চালিত করিতে হইবে। ছোট বড় সব জিনিসই জ্ঞান শিক্ষা দেয়; জগতে কিছুই উপেক্ষণীয় নহে। নবযুগের এই বিভিন্ন ভাবের ও জ্ঞানের দিশে, জ্ঞান ক্ষেত্রের বিভাগ করিয়া প্রত্যেক লেখককে তাঁহার নিজের বিভাগ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, তাঁহার ব্যক্তিগত

কার্যের সমালোচনা দ্বারা, যথার্থ সাহিত্য-সেবীর দল গড়িতে হইবে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার সমবায়ের এক বিশাল ব্যাপার এইরূপে সহজে স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে।

উত্তরবঙ্গে ভাবিবাব এবং খুঁজিবাব জিনিস অনেক আছে। প্রাচীনতম ভারতের ইতিহাস, ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ধর্মের পারম্পরিক ইতিহাসের উপকরণ এখানে যত আছে অল্পত্র কোথাও তত নাই। দুইটি পুরাতন পথে এখানে অতীত আপনার লেখা রাখিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতে বাহা মিলে না এখানে তাহা মিলে সুতরাং সেই সকলের এবং এই প্রদেশের বিশেষ তত্ত্বাদির উদ্ধার সাধনে এই সম্মিলনীর সচেষ্ট হইতে হইবে। স্থানীয় অনার্থ্য জাতিদের পূজা-পদ্ধতি, আচার-বিচার, ভূতপ্রোক্ত-বিশ্বাস, ভাষা-উপভাষার বিশেষত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাহাদের আদিম সভ্যতার কালানুসন্ধান প্রভৃতি বহু তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সে পরি-প্রমে অভিনিবেশ চাই। সাহিত্যের সেবা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া করিতে হয়, তাহাতে জ্ঞান চাই, অধ্যবসায় চাই। তাহা শুধু খেরালের কোঁক নহে, তাহা অসম্পূর্ণ শিক্ষার সম্ভবপর নহে। বাঙ্গলা-সাহিত্যে বাহা নাই, বিদেশী সাহিত্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ বাহা সর্ব শ্রেষ্ঠ সভ্য বা প্রাকৃতিক তত্ত্ব তাহা সাহিত্য-বিশেষের সম্পত্তি নহে; তাহা সমগ্র মানব-জাতির সম্পত্তি—তাহা সার্বজনীন। প্রত্যেককে তাই জ্ঞানের সকল বিভাগেই

অদেশ-বিদেশের রত্নরাজি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সাজাইতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভকেই জীবনের কামনার বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে।

এই সন্মিলন, বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই উচ্চ আদর্শের প্রতি যেন আমাদের লইয়া যায়। আমরা যেন সমস্ত সর্পির্ভা,

প্রাণেশিকতা, জাতিগত বিদ্বেষ, অজ্ঞানজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া, হৃৎ-অরা-দৈন্তর্যহিত সেই সর্বোচ্চ সাহিত্যজগতে প্রবেশাদিকার লাভ করিতে পারি,— যেখানে শুধু বিশ্বব্যাপী মহান শান্তি, মহা সংঘম, মহা আনন্দ, মহা স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে! *

মানবের জন্মকথা।

পরিবর্দ্ধনের রোধ। পরিবর্দ্ধনের রোধ এবং বৃদ্ধির রোধ, এতদ্ব্যতীত মধ্যে প্রভেদ আছে; পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ হইলেও অল্পপ্রত্যক্ষ প্রাথমিক আকারেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। বিবিধ অঙ্গ-বিকৃতি ইহার দৃষ্টান্ত হল। খণ্ডিত তালু প্রভৃতি কতিপয় বিকৃতি সময় সময় বংশাঙ্গত হয়। আজন্ম জড়-ভাবাপন্ন অবোধদিগের মস্তিষ্কের পরিবর্দ্ধন রুদ্ধ থাকে; ইহা উল্লেখ করিলেই এ স্থলে যথেষ্ট হইতে পারে। ভণ্ট শ্রীত পুস্তিকান্তে এ বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণ মানবের তুলনায়, ঐ সকল অবোধের মাথার খুলী ছোট, এবং মস্তিষ্কের আবর্তগুলিও কম জটিল। কপালের নালী অথবা ক্রম্বুলের উপরিভাগ বর্জিত, এবং হস্ত বাহিরের দিকে পরিপুষ্ট। এই অবোধেরা নিম্নশ্রেণী (অর্থাৎ অসত্য) মানবের জ্ঞান। তাহাদিগের বুদ্ধি এবং প্রায় সকল মনো-বৃত্তিই হ্রাস। তাহারা কথা বলিবার শক্তি লাভ করিতে অক্ষম; তাহারা দীর্ঘকাল কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না, কিন্তু অশ্রু করণ করিতে বিশেষ পটু। তাহারা বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত কর্মঠ, সর্বদাই লাক্ষ্যাক খেলাধুলা করে, এবং নানারূপ মুখভঙ্গি করিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময়ে চারি পায়ে উপর হামাগুড়ি দিয়া দাঁড়িতে উঠে; এবং কোন জিনিষের

কি বুদ্ধির উপরে চড়িতে ভাল বাসে। এই কথায় বালকদিগের কথা মনে পড়ে, উহার প্রায় সকলেই গাছে চড়িতে ভাল-বাসে; ইহাতে মেঘ এবং মেঘশাবকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, উহার মূলে পার্কতা জন্ত, তাই সামান্য একটু উঁচু স্থান পাইলেই তাহার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে ভালবাসে। উক্ত অবোধেরা আরও কতিপয় বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর জন্তর মত ব্যবহার করে। অনেকগুলি অবোধের কথা লিপিবদ্ধ আছে, উহার খাইবার সময় প্রত্যেক গ্রাসের ভ্রাণ লইয়া যায়। একটি অবোধের কথা লেখা আছে যে, সে যখন উকুন মারে তখন হাত ও মুখ দুই-ই ব্যবহার করে। অনেক সময় তাহাদিগের চল-চলন নোংরা; এবং তাহাদের লজ্জাশীলতার জ্ঞানই নাই। ঐ প্রকার অবোধদিগের দেহ অতিশয় লোমশ হইয়া থাকে, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

পুনরাবর্তন। এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব, তাহার মধ্যে অনেকগুলি উপরের লিখিত বিভাগেও লিপ্য হইত। যখন দেহের কোন অংশ প্রাথমিক অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, এবং ঐ অবস্থাতেই বর্জিত হইয়া কোন নিম্নশ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর এরূপ দেহাংশের জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে এক অর্থে পুনরাবৃত্তি বলা হইতে

পারে। কোন এক শ্রেণীর জীবগণ মধ্যে যাহারা নিম্নশ্রেণী (অর্থাৎ অমূর্ত), তাহাদিগকে দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইতে পারে, উহাদিগের আদি পুরুষ কিরূপ ছিল। ভ্রূণাবস্থাতেই যদি কোন জটিল দেহাংশের বিবর্তন * স্বকৃৎ হয়, অথচ উহা ঐ প্রাথমিক আকারেই বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে উহার স্বকৃৎ নিম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হয় যে, ঐ অবিবর্তিত অঙ্গ যখন কোন অতীত কালে কোন নিম্ন প্রাণীর দেহে সাধারণতঃই জাত হইত, তখনই উহা ঐরূপ কৃৎ নিম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য হয় না। আজন্ম জড়বুদ্ধি নির্বোধের মস্তিষ্ক যে পরিমাণে বানরের মস্তিষ্কের জ্ঞান, সেই পরিমাণে উহাকে পুনরাবর্তনের দৃষ্টান্ত স্থল বলা যাইতে পারে। † সে যাহাই হউক, আরও অত্যাশ্চর্য্য কতিপয় স্থলকে অধিকতর সঙ্গত রূপেই পুনরাবর্তনের দৃষ্টান্ত মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। মানব যে শ্রেণীর জীব সেই শ্রেণীর নিম্নতর জন্তর দেহস্থ কতিপয় সাধারণ গঠন কদাচিৎ মানব দেহেও দেখা যায়, কিন্তু মানবীর ভ্রূণে তাহা দৃষ্ট হয় না ; অথবা ভ্রূণ-দেহে দৃষ্ট হইলেও পরে বিসদৃশভাবে বিবর্তিত হয়, কিন্তু ঐ সকল নিম্নতর জন্তর দেহে উক্ত গঠনগুলি সাধারণতঃই ঐ ভাবে জাত হইয়া থাকে। এই সকল কথা

নীচের দৃষ্টান্তগুলি বিবেচনা করিলে আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে।

অনেক শুভ্রপায়ী জীবের জন্মায় শিশু এবং দ্বিরজ। যথা মানুষ পিঙ্গল দিগের। * এইরূপ জন্মকে ডবল বন্ড বলা যায়। ইহা অপূর্ণ শুভ্রপায়ী জীব-দেহে ক্রমে একটি বন্ডে পরিণত হইয়াছে। ইহার ভিতরে একটি ভাঁজ আছে। তন্নিম্ন ডবলের কোন লক্ষণই নাই। এই ভাঁজ উক্ত শ্রেণীর বানরে ও মানবেও দেখা যায়। দ্বিরজ, জন্ম ক্রমে কিরূপে এক রকমে পরিণত হইয়াছে তাহা দন্তর শ্রেণীতে (Rodants) সুন্দর দেখা যায়। সকল শুভ্রপায়ী জন্মায় দুইটি সরল নল হইতে গঠিত হয়, উহাদিগের নীচের অংশ হইতে জন্ম-শূল উৎপন্ন হয়। ডাক্তার ফ্যারে বলেন যে “ঐ শূল দুইটির নীচের ভাগ পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া মানবীর জন্মায় মধ্যভাগ গঠিত হয়; কিন্তু যে সকল জন্তর জন্মায় মধ্যভাগ নাই, তাহাদিগের উহা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় না। জীবজন্তুর জন্মায় বিবর্তন যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তেমনই শূল স্বয়ং ক্রমে হ্রস্ব হইতে হইতে জন্মায় মধ্যভাগে লুপ্ত হইয়া যায়।” অন্যান্য পিও লোফর এবং বানরের উন্নত জীব শ্রেণীতেও জন্মায় কোণ বদ্ধিত হইয়া শূল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নারীদেহেও পরিণত জন্মায় শূল থাক। সময় সময় দেখা যায়, কখন বা জন্মায় বিতক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ডবল হইয়া উঠে। এরূপ দৃষ্টান্ত নিত্যই বিরল নহে। ওয়েন্স বলেন এরূপ স্থলে দন্তরগণের জন্মায় জ্ঞান দ্বিরজ হইতে একরকম পরিণামের পর্যায় সকল পর পর লক্ষিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে বোধ হয় ভ্রূণাবস্থাতেই জন্মায় বিবর্তন বন্ধ হইয়া যায়, কি ঐ প্রাথমিক ভাবেই উহা বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে

* Development—Growth বৃদ্ধি

† ডাক্টর এ. হলে দীর্ঘ পারীকালে উহার বর্তমান নবতা ও সত্যপ্রিয়তা বশতঃ পূর্বের কয়েকটি ভ্রূণ বীক্ষা করিয়াছেন। তাহার মর্ম এই যে কতিপয় সরলারীর বন্ধ দুইটি তনের অধিক থাক। জাদিরা তিনি “পুনরাবর্তন” বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ বন্ধের ভাঙ্গি পোটে, উন্নত এবং পুষ্টিও এরূপ পুষ্টি গিয়াছে। আর হস্ত-পদে অধিক অঙ্গুলি থাক। তিনি পুনরাবর্তন বিবেচনা করিতেন; তাহাও সঙ্গত নহে। এই সবকিছু এরূপ ত একত্রে ভাব করা হইতে পারে।

* কাল্পনিক এই বর্ণনা শুধু।

সম্পূর্ণ কর্তব্য হয়। কারণ ঐরূপ অংশ ডবল জরায়ু হই দিকই গর্ভধারণ কার্যোপযোগী। অত্যন্ত স্থলে মানবীর জরায়ুতেও দুইটি পৃথক মুখ, পৃথক রক্ত, এবং পৃথক গহ্বর থাকে দেখা যায়। কিন্তু বাহাদিগের এইরূপ থাকে তাহাদিগের ভ্রূণাবস্থায় উহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। কাদাক শ্রেণীতে যেরূপ দুইটি পৃথক মুখ ও রক্ত যুক্ত দুইটি জরায়ু থাকে, এবং প্রত্যেকের পৃথক পেশি, স্নায়ু, স্নায়ুগুণ্ড এবং রক্ত কোণ থাকে, তদ্রূপ দুইটি পৃথক জরায়ু গঠন করিবার পূর্বে হইতে অভ্যন্ত (*) না থাকিলে ঐ প্রাথমিক নল দুইটি স্বয়ং জাত থাকিত। ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন। নারী-দেহে ঐরূপ অ-মানবীর ডবল জরায়ু অমন পূর্ণগঠিত ও কার্য্যকর ভাবে যদিচ্ছা বশতঃ উৎপন্ন হয়, এরূপ কেহই বলিবে না। কিন্তু দেহের কোন অংশ নিরপ্রাণীর ছিল, অথচ কালে উহা পরিত্যক্ত হইয়া উচ্চ প্রাণীতে আর দেখা যায় না, এরূপ স্থলে যদি কখনও উচ্চ প্রাণীর দেহেও উহা পূর্ণাবস্থায় দৃষ্ট হয় তবে পুনরাবর্তনের বিধান স্বীকার করিলেই তাহা দুর্বোধ্য হয় না। †

এই সকল দৃষ্টান্ত এবং এইরূপ অন্যান্য অনেক দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া অধ্যাপক ক্যানেন্‌ট্রিণীও এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তিনি আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, উহা গণ্ডাহি। ঐ অস্থি কতিপয় বনরের এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের সচরাচর দুই অংশে বিভক্ত দেখা যায়। দুইমাস বয়সের মানব-ভ্রূণে উহা এই প্রকার। উহার বিবর্তন বহু হওয়ার উহা কখন কখন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও ঐ আকারেই রহিয়া যায়। বিশেষতঃ যে সকল অসত্য জাতির হস্ত বাহিরের দিকে বর্জিত, তাহা-

দিগের মধ্যে ঐ অস্থি ঐরূপ আকারের অনেক সময় দেখা যায়। এ নিষিদ্ধ ক্যানেন্‌ট্রিণী অনুমান করেন যে মানবের দুর্বর্তী পূর্বে পুরুষের ঐ অস্থি সচরাচর ঐ রূপই হইত, পরে উহা যুক্ত হইয়া গিয়াছে। বয়স্ক মানবের কপালের উর্দ্ধভাগের অস্থি এক খণ্ড মাত্র; কিন্তু মানবগণের এবং শিশুগণের ও নিরশ্রেণীহ প্রায় সকল স্তন্যপায়ী জন্তুরই উহা দুই খণ্ড একত্রে সেলাইর মত বুড়িয়া গিয়া একখণ্ডের মত হইয়াছে। মানব পূর্ববয়স প্রাপ্ত হইলে পরেও এই সেলাইটি কখন কখন অস্বাভাবিক স্পষ্টভাবে থাকিয়া যায়। বর্তমান কালীর অপেক্ষা প্রাচীন কালীয় মাথার খুলিতেই অপেক্ষাকৃত অধিকস্থলে এই সেলাই দেখা যায়। ক্যানেন্‌ট্রিণী দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ অস্থি চওড়া-খুলিতেই বেশি পাওয়া যায়, এবং উহা ক্রীকট মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। গণ্ডাহি অস্থি সম্বন্ধেও তিনি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একত্রেও তিনি তদ্রূপ সিদ্ধান্তই করেন। আমি আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত পরে উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, নিরন্তর জীবদেহের কোন কোন অংশে প্রাচীনকালীর মানবের দেহে, বর্তমান কাল অপেক্ষা অনেক সময় অল্প-বিস্তার দেখা যাইত। এক্ষণে তাদৃশ দেখা যায় না। তাহার কারণ বোধ হয় যে প্রাচীনকালীরগণ অর্জমানববৎ পূর্ব-পুরুষের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন, (আমরা এখন অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছি)।

উপরের লিখিত গুলি ছাড়া আরও অনেক ইতরজন্তু-স্থলত দেহাংশে সন্দেহ পাওয়া যায়। তিস তিস প্রত্নকারগণ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ঐ সকলকেও পুনরাবর্তন বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ বিধা হয়; কারণ ঐ সকল দেহাংশ ইতর জন্তুতে পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে স্তন্যপায়ীগণের অতি নিরশ্রেণীতে থাকিত। (কল্পনা)

ঐশ্বর্য্য হয়।

* নিরন্তর জরায়ুভ্রূণের মধ্যে ঐ নলযর ডবল জরায়ুতে পরিণত হইত, তাহাকেই পূর্বের অভ্যন্ত বলা যেন। অতঃ

† অত্যা অনেকই এই বিধান স্বীকার করেন। বিশেষতঃ যেতেজিসানগণ।

মাণর মধ্যে খেঁচ যেমন কোইনুর ।



কেমনি সমস্ত সুবাসিত কেশ তৈলের
 মধ্যে আমাদের মহাপুত্রিক "কেশরজননী"
 সর্বোপরি স্নেহভাৱে লাভ করিয়াছে। ইহা
 কেশরজনের আত্মস্বর্গ প্রাপ্ত উক্তি নহে।
 কেশরজনের গৌরবকারী আমাদের দেশের
 বড় বড় দেশাধিপতি রাজা, মহারাজা,
 জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির অসংখ্য আরাচিত
 প্রশংসাপত্র আমাদের বিনামূল্যে বিতরিত
 কেশরজন ডায়েরীতে দেখিলেই আপনার
 ভ্রম ঘুচিবে। কেশরজনের অনেক গুণ—
 তাই চম্ভা সর্বদেশ সর্বজন সমাদৃত।
 কেশরকণে, বুদ্ধকরণে, পোষণে, লাবণ্য
 সাধনে, ইহা অবিভীত। সর্ববিধ মস্তিষ্কের
 উচ্চতা নিবারণে এবং পিত্তাদি অকোপ গুল
 হস্ত পদাদির আলায় প্রতিকারে ইহা অদ্বুত

উৎকর্ষ সম্পন্ন। কেশরকি করিতে, কেশ কক্ষিত কোমল ও সুকৃষ্ণ করিতে ইহার জার
 অলৌকিক উপাদান আর দ্বিতীয় নাই। যদি কেশকে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে নিজের
 আয়ত্রে রাখিতে চান, যদি অকাল বার্দ্ধক্যের নিদারণ মনস্থাপে, আত্মস্থানিতে মন্থপীড়িত
 কেশে না চান, তাহা হইলে যৌবনের প্রথম বিকাশেই "কেশরজন" ব্যবহার আরম্ভ
 করুন। খালি সুরকের ভুল নহে, খালি মস্তিষ্ক অন্ধকারিতা গুণের জন্ম নহে—সর্ববিধ
 শিরারোগের "কেশরজন" অবিভীত ও মহোপকারী।

একশিশির মূল্য ... ১ এক টাকা। মাতুলাদি ১/০ আনা।
 তিনশিশির মূল্য ... ২০ আড়াই টাকা। মাতুলাদি ২/০ আনা।

সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা।

পঞ্চম সংস্করণ।

সমগ্রদেশে অনেককেই অশিক্ষিত ডাক্তারের হাতে প্রাণ সঁপিতে হয়। এই শোচনীয় দৃশ্য
 হ্রাস করাই ডাক্তারি-শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল, যেন এই পুস্তকের
 সাহায্যেই কেহ নিজে নিজে ডাক্তারি শিখিতে পারেন। উপরেস্থিত আমার দেখা পূর্ণ
 শিক্ষিত ডাক্তারি-শিক্ষার পাঁচটি সাক্ষরকে ধন হাজারটি অশিক্ষিত ডাক্তারের কল হইতে
 অনেকটা কমিয়ে দিতে পারেন। একটু খালাস জানা থাকিলেই এই আড়াই হাজার পুস্তক
 কলমের সাহায্যে কলমের সাহায্যে পারা যায়। সেই জন্যই ইহার এক আদর। মূল্য ১০ টাকার
 উপর ন্যূনতম। ইহা সর্বজনীন বার মূল্য। দুইখণ্ডে মূল্য ১০ টাকা।
 মূল্য ১০ টাকার উপর ন্যূনতম।

শ্রীমদেবীমাথ দেবমহন্ত কবিরাজ

১৯১৩ ও ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত

সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের গুণ

সমুদ্রের মধ্যে প্রধান গুণ—মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করিবার শক্তি। মনের প্রফুল্লতাব্যবস্থায় অক্ষুণ্ণ রাখে ও জীবনীশক্তি বর্ধিত করে। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারে মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করিতে হইলে এমন একটা সুগন্ধি ব্যবহার করিতে হইবে যাহার সৌরভের মাধুর্য্যে তীব্রতা নাই, বাহ্যিক শিল্প ও কোমল অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী। আজ কাল সুগন্ধি দ্রব্যের সংখ্যা এত বর্ধিত হইয়াছে যে ক্রয়কালে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ ঠিক করা কঠিন। সুতরাং নূতন কোন এসেন্স ব্যবহার না করিয়া আপনি

এসেন্স দেলখোস

ব্যবহার করুন, দেলখোসের বহুবৎসর ব্যাপী প্রশংসার কারণ—ইহার সৌরভের মিষ্টতা, কোমলতা ও স্থায়ী গুণ। ভারতের এমন কোন স্থান নাই, যেখানে দেলখোস ব্যবহৃত হয় না, এমন কোন সমাজ নাই, যে সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দেলখোস ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। রাশী রাশী প্রশংসা পত্র ও সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক সমুদ্বই ইহার প্রমাণ।

মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা।

এইচ বসু, ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা জেলা,
দেলখোস হাউস, ৩২ হাটখোকার রোড, পাবনা

বঙ্গদর্শন

(নব পর্যায়)
মাসিক পত্র ।



কলিকাতা,
২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
মহাত্মা বাহাদুর হাউসে প্রকাশিত ।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের
দেশীয় সালসা



পারদ ও রক্তদ্রুতির মতে হৌষধ।

সুবর্ণী কষায় সেবনে শরীরের দ্রুতি ও শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি, ঘা, কোড়, বাতরক্ত, আমবাণ ও পারদ জন্ম রক্তদ্রুতি প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। এই মহা তেজস্বর দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষ ও শরীরের কাণ্ডি বর্ধিত হয়। থাকে হার প্রভেদে ক মাত্রা শরীরে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার করে।

মূল্য এক শিশি ১০০ দেড় টাকা। ভিঃ পণ্ডে লইলে মোট ২/০ আনা।

জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।



যাঁহাদেও অল্প পরিচর্য্যেই মাথা ধরে, মন স্থির থাকে না, কাজের সময় মাথা গরম হইয়া ভুলচুক হয়, তাঁহাদেও পক্ষে জবাকুসুম তৈল বিশেষ উপকারী। জবাকুসুম তৈল কেশের অকালগততা ও উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতুলনীয়। মহারাজ-ধিরাজ কইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেশের শৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য মহিলাগণ অতি আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন।

এক শিশির মূল্য ১/০ এক টাকা। ডাকমাওল ১/০ পাঁচ আনা।

বহুবলহ রোগীগণ নিজ নিজ রোগের বিবরণ লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়।

তিন শিশির মূল্য ৩৫০ পনের টাকা। ডাক মাওলাদি ৫০০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

২২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

এস. পি. সেন এণ্ড কোম্পানী

পরিষ্কৃত অৰ্থ ঔষধ সমূহ

ও পুষ্পসার

চুল উঠা ও টাকের মহোষধ।

এট চুলটা যোগের প্রকৃত ঔষধ এতদিন এক-বারেই ছিল না। বিজ্ঞাপনে যিনি যাচাই বুলুন, ব্যবহারে সে উপকার কয়জন পাছয়েছেন ; কিন্তু—“সুরমা ঔষধ” সৎ সত্যই টাকে ও চুল উঠিয়া যাকরায় অস্বাভাবিক ঔষধ। তন্ত্রের চুল কটা হঠাৎ, কড়া হইলে, অসময়ে পাকিলে, এবং মাথাগরম হইলে, স্ফিট্রার অভাব হইলে, সুরমা ব্যবহারে যথেষ্ট সফল পাওয়া যায়। যে সকল প্রিন্স বায়ু উৎপন্ন করে, মস্তিষ্ক স্নায়ু রাখে এবং চুলের দোষ নষ্ট করিতে পারে, সেট সমস্ত দিনিষট্টি এট সুরমা তৈলের প্রধান উপাদান। সুরমার সঙ্গক অতি মানারম। একবার একশিশি ব্যবহার করিলেই, চুলের সত্যতা বৃদ্ধিতে পারিবেন। একশিশির মূল্য ১০ বার আনা মাত্র। মাথার দাঁড়ি ১০ সাত স্থান। একত্র তিন শিশির মূল্য ২০ টাক। মাথার দাঁড়ি ১০ টের আনা। ১০ আনার ডাক-টিংগি পাঠাইলে, একশিশি সুরমার নমুনা এবং একখানি সুরমা-পঞ্জিকা বিনামূল্যে পাঠাতে পারিবেন।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড এক শিশি ১ এক টাকা। মাথার দাঁড়ি ১০ বার আনা, ছোট ১০ আনা, মাথার দাঁড়ি ১০ পাঁচ আনা।

স্বদেশ-গৌরব এসেন্স।

চামেলো।—চামেলোর গোবত বড় স্নিগ্ধ—বহু গন্ধুর।
সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহণীয় গদার্ব।
মল্লিকা।—বেলা-যুথকানির স্নিগ্ধ মল্লিকা চির-দিনই একাসন অধিকার করে।



চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাগ দেখবার প্রিন্স।

বেলা।—অবসর গ্রীষ্মবেলার 'বেলা'র গন্ধ যেন স্বপ্নবর্গ আনিয়া দেয়।

কাগিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কাগিনীর সৌরভে মধুরতা হইয়া উঠে।

খাদ্য কবিরাজি ঔষধ, ঔষধ, মোদক, অবগেহ, অসব, অরুট, মকরন্দ, মুগনাতি এবং সকল প্রকার জারিত দ্রব্য আমরা অতি নিষ্কলংপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভমতে বিক্রয় করিতেছি। একপ গাটী ঔষধ সত্তর টাক।
যোগগণ য যোগনিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসংকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের তত্ত্ব অন্ধ আনার ডাক-টি কট পাঠাইবেন।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী—ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী

১৯১২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলকাতা।

পুরাতন বঙ্গদর্শন ।

১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৬ সাল পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষের মূল্য ডাকমাওগ সমেত দুই
টাকা ।

হিন্দু ধর্ম্ম-নীতি ।

শ্রীযুক্ত জৈশানচন্দ্র বসু প্রণীত । মন্বাদি-
স্মৃতি, মহাভারত, রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ,
শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, প্রভৃতি প্রধান
গ্রন্থান ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে
সঙ্কলিত । নীতি শিক্ষার এমন পুস্তক আর
নাই বলিলেও চলে । মূল্য ২৮ ফলে ১০
(বাঁধাই) ৮০ আনা ।

সরল বর্ণ জ্ঞান ।

ডাক্তার ব্রজনাথ সাহা প্রণীত । কিণ্ডার
গার্টেন প্রণালী অনুসারে শিশুদিগের বাঙ্গালা
অক্ষর পরিচয়ের সচিত্র পুস্তক । সুন্দর
সুন্দর ছবি । মূল্য ৮০ ।

লিপি-সংগ্রহ ।

সবজ্ঞ জিনোদবিহারী মিত্র কর্তৃক
প্রকাশিত । প্রায় শতবর্ষ পূর্বের লিখিত
সুসমৃদ্ধ বাঙ্গালার উপদেশ পূর্ণ চিঠি পত্র ।
মূল্য ১০০ ।

দুর্গালীলা-তরঙ্গিনী ।

৮তমকিশোর রায় প্রণীত । গ্রন্থের
প্রণেতা প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে একজন ।
চণ্ডাতে আত্মপুর্নিক দুর্গালীলা সরল ও
প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । সৃষ্টি-
প্রকরণ হইতে দক্ষযজ্ঞ, ৩৭-বে গিরিরাজের
ঘরে শিবের বিবাহ প্রভৃতি সন্তোষ আদ্যাদি
পদ্য চন্দ্রে বর্ণিত হইয়াছে । দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ।
মূল্য ১৮ ।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণী রাজ্য ।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত নূতন রকমের
বই । বহু অঙ্গীম জ্ঞান সুস্বাদু নৃষ্টি-বৃত্তার
অপূর্ণ নৃষ্টি কৌশল মেধারা বিস্তৃত ও
ভিত্তিত হইতে চান ; যদি নদী, হ্রদ, অরণ্য
প্রান্তরবাসী এবং আকাশচরী প্রাণিগণের
বিভিন্ন পাঠে পুঙ্খপুঙ্খ হইতে চাল তবে ইহা
করুন । মূল্য ১৮ ।

কাব্যগ্রন্থ ।

কবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও
সম্পাদিত চন্দ্র সেন, এম. এ. সম্পাদিত ।
অনুবাদন খণ্ডে সম্পূর্ণ । মূল্য ২৮ ফলে ১০
গল্পগুচ্ছ ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । আট
পেপারে মুদ্রিত, দুই খণ্ডে সুন্দর বাঁধাই ।
মূল্য ৮৮ ।

মুক শিক্ষা ।

শ্রীযুক্ত মোতিনোমামান মজুমদার
প্রণীত । মুক বন্দরের শিক্ষা এ দেশে
নূতন জিনিষ । ভ্রমবস্ত্র চতুর্দশ মুক চর ।
এই পুস্তকের সাহায্যে মুক-বন্দরকে কণা
ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতে পারা যায় । সচিত্র
উত্তম বাঁধাই মূল্য ৮০ ।

পঞ্চ প্রদীপ ।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি. এ.
প্রণীত নূতন গল্পের বই । স্বদেশীয় কাউন্সিল
টেলিফোন গার্লের অভ্যুদয় (আত্মাভিমান) দেশের
মত করিয়া পত্রগুলি লিখিত । খালক-
বালিকা ও জীলোকদিগের পাঠ্য । পুস্তকখোর
উপযোগ্য । সুন্দর বাঁধাই । মূল্য ৮০ ।

পুণ্যের জয় ।

শ্রীযুক্ত সুধাক্ষর বাগচি প্রণীত ও শ্রীযুক্ত
পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত, অমিন্দ্র রহস্যময়
ডিটেক্টিভ-উপন্যাস । মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১৮
নববিধান সমাজের বই ।

ব্রহ্ম সঙ্গীত প্রথম ২৮ দ্বিতীয় ৮০
আচাণ্য কেশবচন্দ্র (বিষ্ণু জীবন চরিত) ৮০
১৮ শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম ১১০ গীতা সমগ্র
ভাষা ৮৮ বেদান্ত সমগ্র (১২ খণ্ড) ৮৮ বিবরণ
৮৮ সঙ্গীত (প্রায়স্ক্রমের সেন কৃত ২৮ গুরু
নানকের জীবন চরিত ১১০ শাকামুনি চরিত
১০ উপাখ্যায়ের বক্তৃতা ১৮ হিন্দিশের বঙ্গাভি-
বাদ, পূর্ব বিভাগ ৮৮ উত্তর বিভাগ ২৮
কোরাণশরিফের বঙ্গানুবাদ ৮৮ মোহনদের
বিষ্ণুত জী নী ৩, তাকেজের বঙ্গানুবাদ
প্রথমভাগ ১৮ তামসমাগা (৩ খণ্ড) ৩৮
জীবন-বেদ ১৮ মহাপুরুষ চরিত ৮০ ।

কৃষ্ণের চন্দ্রকান্তি!

রূপ এবং শোভা ও যৌবনের নবীনতা সত্য হারী রাখিতে চাহেন? এই সমস্যাটুকু লেপন চন্দ্রোৎসাহই অর্থাৎ দাদ, চুণকাসি, বামাচি, ছুলী, মেচেতা, কলাকার চিহ্ন, ব্রণ ইত্যাদি শীঘ্র আশ্রয় করা যাক। চন্দ্রের কোমলতা, চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে রমণীগণের আগ্রহের সাক্ষী। মূল্য ৮০ আনা, ডঃ মাঃ ১০ আনা।

আফিম পরিত্যাগের ঔষধ।

যত অধিকদিনের আফিম সেবনকারী ততই নতুন নতুন আফিমরূপ কালকূট বিষ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক মানিশ্রুত চেষ্টা বেশ ক্ষুদ্র, সচ্ছন্দতা এক সতেজতা ও কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে পারেন, অথচ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কে, সি. বিশারদ,
৬৭ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

ফল্গুন]

[১১শ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন।

(নব পর্য্যায়)

দশম বর্ষ।

হুগী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র	৫৩৭	৫। সমাজ-বন্ধন	৫৬১
২। বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ	৫৫০	৬। সূর্যাস্ত	৫৬৫
৩। বরেন্দ্র ভ্রমণ	৫৫৫	৭। মানবের ভদ্রকথা	৫৭২
৪। খাদ্য ও রন্ধন সম্বন্ধে কঠকগুলি		৮। মধুরায় (গল্প)	৫৮১
অশ্রুত নিয়ম	৫৫৯	৯। বঙ্গদর্শন	৫৮৭

এস্ মুকুন্দরাম কঠক প্রকাশিত।

১৩:৭

হিন্দুস্থান সমবায় বিমামণ্ডলীতে বিমা ও

এজেন্সির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন

শ্রী উমেশচন্দ্র চাকলাদার, বিশেষ প্রতিনিধি,

হিন্দুস্থান কার্ফোর্ড-মহানগর



যমানি-ট্যাবলেট

Ptychotis-Tablets

আমাদের 'যমানি-জলের' সমস্ত গুণ ইহাতে
বর্তমান আছে। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি রোগে
সুচ্য ফলপ্রসূ। পেটফাঁপা বুকজ্বালা একমাত্র সেবনে নিবারণিত হয়।
মূল্য ২৫ ট্যাবলেট ১/০ পাঁচ আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা।

অগুরু দেবভোগ্য



ছোট শিশি ১/০

বড় শিশি ১০.

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা।

বিনা পাইনে স্বর্ণের গহনা

যে প্রস্তুত হয় একথা লোকে অগ্রে বিশ্বাস করিতেন না। বাজারের সেকরারা প্রথমতঃ ত্রাণ্য মজুরি লয়—তদপুরি জঘন্য পাইনে গহনার সর্বনাশ করে এই কন্য মফঃস্বলের ভদ্রলোকে কলিকাতায় গহনা গড়াইতে পশ্চাৎপদ হ'ন। আমরা সেই অন্তবিধা দূর করিয়াছি। প্রত্যেক রাসিদ পাত্র গহনার গ্যারান্টি লিখিয়া দিয়া থাকি যে, সামান্য তারতম্য দৃষ্ট হইলে আমরা গম্পুস দায়ী থাকিব। আপনার যদি শুভবিবাহের গহনা গড়াইবার সময় উপস্থিত হয় একবার দয়া করিয়া আমাদের পরীক্ষা করুন। তর্ডারি জিনিষ তিন দিনে প্রস্তুত করিয়া থাকি।



জাপানী মাকড়া।

ইহা কি, পাখের চিত্র দেখিতে বৃকি ত পারিবেন। সম্পূর্ণ নূতন অলঙ্কার। ইহা টেংটিক মৌসনে পাণেশ করা হয় এবং পান আদৌ নাহ।

মূল্য প্রতি জোড়া ১৪ টাকায় ২২ টাকায়।

পারসী মাকড়া।

যুবতীর কর্ণমূলে ইহা বড়ই শোভা প্রদান করে। রাত্রিকালে ইহার চাঁদ চিকি বৃকি হীক অপেক্ষা অধিক দেখায়। ইহাতে আদৌ ব্যবহারে ময়লা ধরে না।

মূল্য প্রতি জোড়া ১৫ টাকায় ২৫ টাকায়।

আমাদের ফরঃের বিস্তৃত জুয়েলারী ক্যাটলগের কন্য
সত্ত্বর পত্র লিখুন।

৪০ নং গরাণহাটা, কলিকাতা,
মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার এণ্ড গোল্ডস্মিথ।

সীলট চূণ

সীলট চূণ

গাঁথনি এক খণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।
গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চূণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলের কিম্বা ট্রাম্বারে
বুক করিয়া পাঠান হয়।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানি,

৪ নং ফোরলি প্লেস, কলিকাতা।



আপনি কি জানেন ?

হাস মার্ক লিনসিড তৈল সকলে এত পছন্দ করে কেন ?

রংয়ের কার্যকে উজ্জ্বল ও কাঠকে স্থায়ী করিতে

কোন তৈলই ইহার সমতুল্য নহে।

এণ্ড ইউল এণ্ড কোম্পানি,

৮ নং ব্লাইং রো, কলিকাতা।

বঙ্গদর্শন ।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র ।

পূর্বভাস ।

ঐযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মুকুন্দ-
রাম চক্রবর্তীকে অবিসম্বাদ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি
বলিয়াছেন, এবং কথিত আছে যে রাজা
রামমোহন রায় একবার কাব্য প্রণয়নে ইস্কুল
হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত লিখিতে
পারিবেন না বুঝিয়, সে ইচ্ছা পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন । এতৎসঙ্গেও ইগা হুগ্গের
সহিত বলিতে হইতেছে যে, মুকুন্দরাম আজ-
কাল শিক্ষিতসমাজে উপেক্ষিত, এবং
ভারতচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞাত । ভারতচন্দ্রকে
অবজ্ঞা করিবার যে কারণ সাধারণতঃ
নির্দেশিত হয়, তাহা অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত্য ;
কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে অবহেলা করি-
বার কোনও ভ্রান্ত্য কারণ দেখিতে পাওয়া
যায় না । কারণ থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু
তিনি যে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে
পরিচিত নহেন, এ কথা নিশ্চিত সত্য ।

কেন এমন হয়, যে কবিত্বের গীত এক
কালে সাধারণের এত প্রিয় ছিল, এখন
ভীষণ কেন অনাদৃত, এ বিষয় অনুসন্ধান
করা প্রয়োজন । এখন যে জীবনসমষ্টি
বঙ্গালী বলিয়া অভিহিত, তাহার ঠিক
বঙ্গালী নহে, আমরা এখন আমরা নহি,
আমাদের সঙ্গে বিদেশীয় তাবের এতটা

মাথামাথি হইয়া গিয়াছে যে এখন কোনও
বিষয়েই খাঁটি বাঙ্গালাজিনিষ আমাদের
মনোমত হয় না । আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র
বলিয়াছেন যে, “এখন আর খাঁটি বাঙ্গালা
কাব্য হয় না, হইয়াও কাজ নাই ।” “খাঁটি
বাঙ্গালা কাব্য হয় না” সেটা সত্য, কিন্তু
“হইয়াও কাজ নাই” এ কথা এখন আমার
সকলেন ত যত্নে স্বীকার করিয়া লইতে
প্রস্তুত হইবেন কি না জানি না । মুকুন্দ-
রামের “চণ্ডা”কে আমরা খাঁটি বাঙ্গালার
কাব্য বলিতে পারি । এমন একখানি
কাব্য আজকাল যদি হয়, তাহা যে আদৃত
কেন হইবে না তাহা বুঝিতে পারি না ।
কাব্যসম্বন্ধে আমরা যে একটা ধারণা
গড়িয়া লইয়াছি, সেই ধারণার পোষক না
হইলেই সেই কাব্যকে আমরা নিম্পৃহ চক্ষে
দেখিয়া থাকি । আজকালকার কাব্যনিচয়
সেই ধারণাপ্রসূত বলিয়া আমাদের কাছে,
অর্থাৎ মুঠমেয়ের কাছে আদৃত । আগেকার
কাব্যগুলি সাধারণের জন্য, আজকালকার
কাব্যগুলি বিদেশীভাবাপন্নের জন্য লিখিত ।
কল এই দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ বাঙ্গালী
আজকালকার কাব্য পড়ে না, আর ইংরাজী-
ভাবাপন্ন বাঙ্গালী আগেকার কাব্যগুলি

পড়ে না। কিন্তু কোনও ক্ষমতাপন্ন কবি যদি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত ভাব বুঝিয়া বাঙ্গালীর কাব্য লেখেন, তাহা হইলে সে কাব্য 'হওয়া কাজ নাই,' বা তাহার অনাদর হওয়াই আবশ্যক, এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

একদিন হঠাৎ আমরা শিথিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, “ইংরাজী পুস্তকাগারের একটি সেল্ফে যে পুস্তক থাকিতে পারে, তাহাই এশিয়ার সমস্ত পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তক-রাশির অপেক্ষা মূল্যবান।” এই শিক্ষা আমাদেরকে বহুদিন দৃষ্টিগোচর করিয়া রাখিয়াছিল; বহুদিন আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, বাহা ইউরোপীয় ভাবে ওতঃপ্ৰুত নয়, তাহা ভাল জিনিষ হইতে পারে না, তা সাহিত্যেই হউক বা অন্য কিছুতেই হউক। নূতনব্ধের মদিরাকর্ষণে আমরা অনেক দিন মস্তাবস্থার কাটাইয়াছি, সে নেশা যে এখনও কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না; তবু নেশা কাটাইবার প্রয়াস হইতেছে, এবং তাহার ফলও যেন একটু একটু দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের স্বাভাব্য কোষায় তাহা খুঁজিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালিদের গৌরব অমূল্য করিতে চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের দোষগুণ খুঁজিয়া লইয়া বাঙ্গালী-জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; বাঙ্গালী বুঝিতে পারিতেছে যে, ভারতবর্ষের জল-হাওয়ার যে শরীর গঠিত, ভারতবর্ষের তপোভূমিতে যে মন যুগযুগান্তর ধরিয়া পরিপুষ্ট, তাহা বিদেশীয় আদর্শে গঠিত বা পুষ্ট করিবার অভিলাষ অতন্ত

অসমীচিন। তাই বলিতেছিলাম, এখন যদি কোনও ক্ষমতাপালী কবি কবিচর্চণের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে আনয়ন করেন, তাহা হইলে এমন কাব্য হইয়া কাজ নাই, এমন কথা কি আমরা বলিতে পারি ?

কিন্তু তাহার এখনও বড় বিলম্ব আছে। যে চেষ্টার কথা বলিয়াছি, তাহা জনকতক যত্নদর্শিগণের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে, সাধারণো প্রস্তুত হয় নাই। এখনও অনেক শিক্ষিত-নামধেয় বাঙ্গালী আছেন, যাহারা বাঙ্গালার পূর্ব কবিগণের নাম পর্যন্ত অবগত আছেন কি না সন্দেহ। অনেকের এখনও বদ্ধমূল ধারণা আছে যে বাঙ্গালার মাইকেলের পূর্বে সাহিত্য ছিল না; বাঙ্গালার পূর্ব কবিগণ অপাঠ্য। ইহার একটি কারণ অবিসম্বাদে এই নির্দেশ করা যায় যে তাহার বাঙ্গালাভাষাটা এমন পরিপাটি ভাবে ভুলিয়াছেন যে, পূর্ব বঙ্গকবিগণের কাব্য বুঝিতে হইলে তাহাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িবার সম্ভাবনা; কাজেই তাহার নিজ অলস বিলাসী জীবনটাকে এই দুর্ভাগ্য শ্রম স্বীকার করাইতে নিতান্ত নারাজ। দ্বিতীয় কারণ—সেই ধারণা যে—কাব্য এমন একটা জম্‌কালো জিনিষ হওয়া চাই বাহাতে সাধা-সিধে ঘরোয়া কথা কিছু থাকিবে না, সোজা-সুজি নিতাদৃষ্ট ঘটনা বা নিত্যপ্রযুক্ত ভাষা তাহাতে কিছুই থাকিবে না। তাহা যদি কোনও কাব্যে থাকিল তবেই সে কাব্য অপাঠ্য। আমরা একটা ‘নূতন’ কথা মোহে এখনও বিশেষরূপে আবিষ্ট রহিয়াছি, সেটা “Sublime”। কাব্য sublime হও যা

প্রয়োজন এই বিশ্বাস আমাদের খুব, কিন্তু sublime দ্বিগুণিত। কি তাহা যে ত্রিক বুদ্ধিতে পারি, বা, বুদ্ধিবার চেষ্টা করি, তাহা বোধ হয় না। কাব্যের ভাষাসম্বন্ধেও আমরা এমনই একটা কথাই মোহে আবদ্ধ ; সে কথাটা "Sonorous". আমাদের পূর্ব কবিগণ যে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কাব্য লিখিয়াছেন তাহা নহে, বরং তাঁহারা ভাবিতেন যে যেখানে সেখানে ভাষা খুব বিস্তৃত হওয়ার আশ্রয় করে না, ফগতঃ ভাষাসম্বন্ধে কোনও একটা অপরিহার্য নিয়ম তাঁহারা মানিতেন না। ইহাও বোধ হয় তাঁহারা স্বীকার করিতেন না যে, বাহা নিত্য-সম্প্রতিষ্ঠিত ঘটনা তাহাতে উচ্চতা (sublimity) আসিতে পারে না। কাজেই তাঁহাদের কাব্যে এমন ঘটনা অনেক আছে। কাব্যের উচ্চতা প্রদান কবির ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তাহা কোন্ কবি কত দূর করিতে পারিয়াছেন, তাহা কাব্য সমালোচনা করিয়া বুদ্ধিবার চেষ্টা করাই কর্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এখনও অনেক পরিমাণে নেশার ঘোরে রহিয়াছি, তাই সে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হই না। যাহারা তাহা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে পূর্বকালের বঙ্গকাব্য বহুমূল্য সম্পদে সম্পন্ন। সে সম্পদ অবহেলার বা অবমাননার উপযোগী নহে। সুখের বিষয় যে আমরা এই কথাটা আবার বুদ্ধিতে আরম্ভ করিয়াছি—

অন্ততঃ এটুকু বুঝিতেছি যে বাঙ্গালাভাষার আদি কবিগণকে তাজিল্য না করিয়া তাঁহাদিগকে বুদ্ধিবার চেষ্টা করিলে লাভ বৈ লোকলাভ নাই। তাঁহাদিগের চর্চা করিলে

অন্ততঃ বাঙ্গালীর পূর্বাবস্থাও বেশ জানিতে পারা যাইবে। এরূপ স্থলে পূর্ব বঙ্গকবিগণের কাব্য-সমালোচনার কিঞ্চিৎ প্রমত্তীকার করিলে সময় নিতান্ত অপব্যয় হইবে না ভাবিয়া, আমি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা এ কথা শুনিলে আপাততঃ একটু মনে খটকা লাগিতে পারে বটে। প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে কি সাম্য আছে যে তাঁহাদের তুলনা হইতে পারে ? তুলনায় সমালোচনা অর্থে দুই কবিকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখা, তা তাহাতে সাম্যই দেখা যাউক অথবা বৈষম্যই দেখা যাউক। এই হিসাবেই আমি তুলনায় সমালোচনা কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহার ফলাফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এ কার্য্য যে নিতান্ত নিষ্ফল নহে, তাহাই বলিবার ইচ্ছা আছে। আর কিছু ফল না পাওয়া যাইলেও অন্ততঃ এটুকু বেশ বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালীর কাব্যের আদর্শ-সম্বন্ধে, এবং জীবনের আদর্শসম্বন্ধে কতদূর পরিবর্তন হইয়াছিল। দুই কালের মানুষের মূর্তি দুই কালের দুই কবির কাব্যের হইতে বেশ চিনিতে পারা যাইবে।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র যে সাম্য আছে তাহা অনেকটা বিষয়গত। রবির উজ্জ্বল কিরণ আর চাঁদের মৃদু চক্ৰিকার যে সাম্য আছে, ইহাও সেইরূপ। দুইই এক বস্তু, একটি অপরের প্রতিবিম্ব মাত্র। চাঁদের

আলো মিষ্ট ও সুস্বাদু, কিন্তু তাহাতে জগৎ উদ্ভাসিত হয় না, তাহার কল্প সূর্য্যের যন্ত্র প্রয়োজন হয়। মুকুন্দরামের কাব্য সূর্যালোক, ভারতচন্দ্রের কাব্য চন্দ্ররশ্মি; ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামে বাহা পাইয়াছিলেন, অনেক স্থলে তাহাই নিজ কাব্যে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মুকুন্দরামে বাহা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, ভারতচন্দ্রে তাহাই স্তিমিত ও রুদ্রিম। উভয় কবির তুলনা-স্থল তাঁহাদের সাংসারিক জ্ঞান। কিন্তু এই সাংসারিক জ্ঞান প্রকাশ করিবার কৌশল দুই কবিতে বিভিন্ন। দুই কনিই আমাদের ঘরের কথা অনেক পরিমাণে নিজ-কাব্য-বিষয়ীভূত করিয়াছেন, কিন্তু যেমন সূর্যালোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়া, সমস্ত দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখা যায়, আর চন্দ্রালোকে লোকের মনে একটু সুখের আবেগ আসিলেও তাহা ঘরা জগতের অল্প কোনও কার্য্য হয় না। সে কারণ মুকুন্দরাম নিজ সঙ্গদরতা ও রসাবতারণ-শক্তির সাহায্যে তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান ও মনুষ্য-স্বদয়জতা অপূর্ণ কৌশলে আমাদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাঁহার সৃষ্ট জগতের সমস্তটুকু পরিষ্কাররূপে দেখিতে ও বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান বা মনুষ্য-স্বদয়জতা লইয়া যেন খেলা করিয়াছেন, কোথাও তাহা তাঁহার চন্দ্ররশ্মি স্পর্শে অর্ধ প্রকাশিত হইয়া ঝিকিঝিকি করিতেছে, কোথাও বা শুধু আভাস মাত্র দেখা যাইতেছে; চন্দ্রালোকে মানুষ চেনা বড় কঠিন, শুধু একটা মানুষ আছে এই টুকুই দেখা

যায়। ভারতচন্দ্রও যে মানুষ বুঝিতেন তাহা নিশ্চয়, কিন্তু মোক্কাইবার চেষ্টা করেন নাই। মনুষ্যের স্মৃষ্টি-লইয়া, মনুষ্যের মন লইয়া ভারতচন্দ্র সোহাগই করিয়াছেন, তাহার সমগ্রতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, অর্থশ্রী করিতে পারেন নাই; তাঁদের আলোতে মানুষ সোহাগই করিতে ভালবাসে। এই প্রকার বিভিন্নতা থাকিলেও বলিতে হইবে যে কবিত্বের ভিত্তর কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে।

ঐক্য শুধু তাহে নহে, বিষয়েও। অতএব একথা নিঃসংশয় বলা যায় যে ভারতচন্দ্র অনেক স্থলে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন। এক জন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর এক জন নকল করিয়াছেন। অনুকরণের যে দোষ তাহা ভারতচন্দ্রে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। অনুকৃত বস্তুকে কথা সাঞ্জাইয়া লুকাইবার চেষ্টা ভারতচন্দ্রে সর্বদা জাগরুক। ফল হইয়াছে এই যে, কথ-নগরের কারিগর এমন একটি যন্ত্রের আশ্রয় গড়িয়াছেন যে তাহা দূর হইতে দেখিলে তাহাতে আশ্রয়-ব্রহ্ম অবশ্রম্ভাবী, কিন্তু তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাও, রাসের বদলে বাটীতে যুগ পুরিয়া বাটবে। ভ্রান্তি দূর হইলেও কিন্তু বিশ্বর ঘুচে না, লোকে তখনও বলিতে বাধা হয় কি নিপুণ কারিগরি!

একটা বিষয় লইয়া এই কথাটা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা বাউক। কবিকল্পের ‘চণ্ডী’কাব্যে ও ভারতচন্দ্রের ‘অরদাবলনে’ হরগৌরীর কথা আছে বলাইই জামেন। বিষয়টি দুই কাব্যে প্রায়ই এক রকম-এই হরগৌরীর কথার ব্যাঘ্রদেবে বালানীর

যরের যে কথাটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এখন আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। এই যরের কথাটুকুর বর্ণনা রবি বাবুর মৰ্ম্ম-স্পর্শী ভাষার জামান ভাল। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের যরের কথা। সেই হরগৌরীর কথার আমাদের বাদলা দেশের একটা বড় মৰ্ম্মের কথা আছে। কত্কা আমাদের গৃহের এক মন্ত ভায়। কত্কাচারের মত দায় নাই। * * *

কত্কা কে অবোপা পাত্রে সমর্পণ করা ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক দৃষ্টিন্দ। ইহা লইয়া দৃষ্টিভ্রা, অহুতাপ, অশ্রুপাত, জামাত-পরিবারের সহিত বিবোধ, পিতৃকুল ও পত্নিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মৰ্ম্মবেদনা সৰ্ব্বদাই যেরে যেরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একদা পরিবারে আমরা দূর ও নিকট এমন কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাহির রাগিতে চাই, কেবল কত্কা কেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী স্ত্রী ব্যতীত পুত্র কত্কা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার। আমাদের এই হৃৎসহ সন্দেহা করিয়া করিতে পারিবে না। আমাদের মিলমর্ম্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং দুরিয়া ফিরিয়া সৰ্ব্বদাই সেই কত বেদনার হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাদলার একদা পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ-সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী বধু কত্কা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী যেরে অসম্পূর্ণা বধন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাদলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

এই সকল কারণে হরগৌরীসম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতার ও শ্রোতবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেট সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থানীর বর্ণনা বাগা আছে, তাহাতে রাজভাণ বা দেহভাণ কিছুই নাই; তাহাতে বাদলাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্ত ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত।

হরগৌরীর কথা সম্পূর্ণরূপে দুই কাব্যের কোনও কাব্যেই নাই, তবে বতটুকু আছে তাহাতেই একটা গৃহচিত্র আবরণযুক্ত হইয়া আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই গৃহচিত্রাঙ্কণে দুই কবির মধ্যে একটু বৈলক্ষণ্য আছে। বিষয় প্রায়ই এক, লক্ষ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া, শিব-পার্কীতীর কলহ পর্য্যন্ত দুই কাব্যেই অঙ্কিত ও বর্ণিত হইয়াছে। দুই কাব্যেই দারিদ্র্য নিবন্ধন স্বত্বের কাছে জামাতার অপমান, স্ত্রীর পতিনিন্দা প্রথমে দেহভাণ, পতির স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, আবার পতিপত্নী-সংযোগ ও শেষে দারিদ্র্যদোষে পতিপত্নীর কলহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। হরগৌরীর কথার ব্যাপদেশে লিখিত হইলেও ইহা যে আমাদের যেরে কথা সে বিষয়ে সন্দেহ যায় নাই। এই সকল চিত্র আঁকিবার সময় দুই কবিই হরগৌরীর দেবদেব বিন্দিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মুকুন্দরাম আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া সেই চিত্রের মধ্যে নিবন্ধ হইয়াছিলেন; ভারতচন্দ্র ভুলিতে পারেন নাই যে শ্রীভারতচন্দ্র রায় ণ্ডাকর কবিতা লিখিতেছেন। মুকুন্দরাম নকের মুখে শিব-

নিজা প্রচারিত করিতে কুষ্ঠিত হন নাই, ভারতচন্দ্র নিম্নাঙ্কলে স্ততি লিখিতে গিয়া কথ্য শালাইয়াছেন; তাহাতে ধনী স্বত্ত্বের দরিদ্র জাতিভার প্রতি প্লেব একেবারেই ব্যাক্ত হয় নাই। মেনকার মুখে মুকুন্দরাম স্বামীর সহিত নিজগৃহে অবস্থিতা কস্তার প্রতি যে কথ্যগুলি বসাইয়াছেন এবং শুদ্ধবশে উমার কার্য্য বঙ্গগৃহের একটা দাক্ষণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছে; ভারতচন্দ্র সে চিত্র যোটেই আঁকেন নাই। মুকুন্দরামের চিত্রগুলি আমাদের নয়নের সমক্ষে দারিদ্র্যের একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তোলে, ভারতচন্দ্রের চিত্রগুলি দারিদ্র্যের চিত্র হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ ও অনেক স্থলে অসংলগ্নও ঘটে। ভারতচন্দ্র একবার গৌরী দ্বারা “মেলানী তার” পূরণ করাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই দারিদ্র্যের জন্ত হরগৌরীর কোমল বাঁধাইতেছেন। মুকুন্দরামের দরিদ্র-গৃহ ঘটাৎ সম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠে নাই; তিনি অকাতরে গৌরী দ্বারা শিবকে ত্রিশূল বাঁধা দিবার পরামর্শ দেওয়াইয়াছেন। ইহাতে শোকের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মহাদেব যেন এতটু দ্বারে পড়িয়া কল উপস্থিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৌরী শিবের মুখের সম্মুখে “আমি আত্মঘাতী হব” ভিন্ন আর কিছু বলেন নাই, ভারতচন্দ্রের গৌরী খুব এক-গালা বলাদেবের অনাইয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৌরী পদ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের গৌরী বগড়া করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কবিতার জন্ম তাঁহার গৌরীও দরিদ্র, কিন্তু হরমহোদা নহেন, বরং দ্বিজ।

ভারতচন্দ্রের গৌরী তাঁহার কবিতারই মত লব করিয়া মুখর, যিনি এক মুহূর্ত্ত পূর্ণ শূভ ভাগ্যের খাদ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ও পরক্ষণেই অন্নপূর্ণা হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার লব করিয়া বাক্যভ্রম দিয়া স্বাগীকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সে বাহাট হৌক, এই চিত্রে অনেক স্থলে স্বাভাবিকতার দৃষ্টান্তও আছে, এবং সংসারিক জ্ঞানের পরিচয়ও আছে। বৃদ্ধ-বয়ে কস্তা-সম্প্রদান-প্রথার প্রতি যে তীব্র কটাক্ষপাত আছে, তাহা স্বাভাবিক ও হৃদয়-গ্রাহী। জয়া কুণ্ডিতা গৌরীর পিতৃগৃহগমন-সংকল্প নোধ করিবার জন্ত যে উপদেশ দিয়াছে, তাহা অমূল্য—

“কহে লখী জয়া শুনগো অভয়া

একি কর ঠাকুরালি।

ক্রোধে করি তব বাবে বাণ ঘর

খেয়াতি হবে কাঙালি ॥

মিছে ক্রোধ করি আপনা পাসরি

কি কর ছালাল খেণা।

সুখ যোক্‌ধাম অন্নপূর্ণা নাম

সংসার সাগর ভেলা ॥

অন্নপূর্ণা হরে অন্ন দেহ ক'রে

দাঁড়াবে কাহার কাছে।

দেখিয়া কাঙালি সব দিবে গালি

রহিতে না দিবে পাছে ॥

জননীর আশে বাবে পিতৃবাসে

ভাকে দিবে সদা তাক্কা।

বাণে না জিজাসে মায়ে না সভাবে

বদ দেখে লম্বীছাড়া ॥

বলা বাহুল্য যে এই উপদেশ বড় খাঁটি।

কবি মুকুন্দরাম উপদেশজ্বলে এই তথ্য

প্রকাশ না করিয়া ইহার সজীব চিত্র
আঁকিয়াছেন :—

“তোমা কি হাতে মোর মজিল গিরিয়াল ।
যরে জামাই রাখিয়া পুঁথব কভকাল ।
প্রভাতে খেজাড়ি মাঙ্গি কার্ত্তিক গণাই
চারি কড়ার সস্তাবনা তোর ঘরে নাই ।”
ইত্যাদি ।

যে স্ত্রী পতির দারিদ্র্যে ভীত হইয়া বাপ
মায়ের কাছে থাকিয়া সোহাগে খাইবার ও
পাইবার আশা করে, তাহার ভাগ্যে এইরূপ
বিড়ম্বনাই ঘটিয়া থাকে । তাই মুকুন্দরামের
গৌরী “এই খোঁটা” খাওয়া অপেক্ষা
ভৎসবর্ণ পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক
পতিন্ সহিত ভিক্ষাসম্বল করিয়াও নিজ ঘরে
প্রস্থান করিলেন । এবং ভারতচন্দ্রের
গৌরীও পিতৃগৃহ গমন সংকল্প ত্যাগ করি-
লেন । এই স্থলে এবং অন্তান্ত অনেক স্থলে
ভারতচন্দ্রের লাংসারিক জ্ঞান প্রকাশিত
হইয়াছে ।

তাই বলিতেছিলাম যে এই হরগৌরীর
চিত্রে মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের
অনেকটা সাম্য আছে । কিন্তু সাম্যও যেমন
আছে তেমনি এই সকল চিত্রেই দুই কবির
মধ্যে যে বৈষম্য তাহাও বিশেষ রূপে ব্যক্ত
হইয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছি যে কবি-
কল্পের চিত্র একটি সমগ্র নৈশের গৃহচিত্র,
ভারতচন্দ্রের চিত্র সমগ্র মহে, ষণ্ড চিত্র মাত্র ।
কিন্তু কেবল এইটুকুতেই সে বৈষম্য
প্রকাশিত হয় নাই । আর একটি বিষয়ে
তাহা বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে । সে
বিষয়টি গৌরীর বিবাহের পূর্বের চিত্রগুলি ।
এইগুলি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই বেশ

বুঝা যাইবে যে মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে
মৌলিক পার্থক্য কোথায় । মুকুন্দরাম
আত্মসংযম, ভারতচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খলতা । ইগাই
তাঁহাদের ভিতর স্বার্থ পার্থক্য । মুকুন্দরাম
দ্রুত, ভারতচন্দ্র স্থব্র; এ কথা বলিলে
তাঁহাদের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা ঠিক বুঝা
যাইবে না । এই কথার পুনরুত্থাপন
প্রয়োজন হইবে, এইজন্য এখানে দুই কবির
মধ্যে যে প্রভেদের বিষয় উল্লেখ করিলাম
তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে । এখন দেখা
যাউক এই হরগৌরীর কণার ভিতর এই
পার্থক্য কিরূপে বিকশিত হইয়াছে ।

বিবাহের গৃহে সতী গৌরীরূপে জন্ম-
গ্রহণ করিবার পর হইতে শিৱের সহিত
তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উভয় কবিই
তাঁহাদের কাব্য বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বর্ণনাতেই
উভয়ের শিল্প-কৌশলের পার্থক্য উজ্জলরূপে
প্রকাশিত হইয়াছে । কাব্য উচ্ছৃঙ্খলতার
লালাফের নহে, তাহা একজন যেমন সুন্দর-
ভাবে হৃদয়ে ধারণা করিয়াছেন, অপর
একজন তেমনি তাহা ভুলিয়া গিয়া সুন্দর
আদর্শ ধর্ম করিয়াছেন । দুই জনের সমক্ষেই
একটি মহান্ বিরাট আদর্শ পড়িয়াছিল—
কালিদাসের অমরসুষ্টি কুমারসম্ভব । দুই
জনেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন ; ইহাও দেখা
যায় ভারতচন্দ্রের মনে সে সময় কুমার-
সম্ভবের কথা একটু উদ্ভিত হইয়াছিল,
কতগুলি বর্ণনা তিনি কুমারসম্ভব হইতে
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । মুকুন্দরাম শুধু
কবি ছিলেন না, তিনি সচিবচক ও রস-
গ্রাহীও ছিলেন, তাই তিনি কালিদাসের

কাছে গণ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, গৌরীর শিবপূজা, ত্রাহার পরামর্শ, দেবগণ কর্তৃক মদনকে প্রেরণ, মদন কর্তৃক শিবের প্রতি অঙ্গক্ষেপ, মদন-তত্ত্ব, গৌরীর তপস্তা ও ছলনা ও পরে বিবাহ এই সকল ঘটনাগুলি তিনি কুমারগণ্ড্য হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ কব্য মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মৃগাকবির বিরাট, অখণ্ডিত রস। তিনি কোথাও খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার কাব্য-সৌভাগ্য কত দূর পুষ্ট হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। মহাবোগী বসন্ত গার্হস্থ্য অবলম্বন না করিয়াছেন। ততক্ষণ তাঁহাকে গৃহস্থভাবে চিত্রিত করা সামান্য মানবভাবে চিত্রিত করা আদৌ পোভন নহে, তাহা তিনি বুঝিতেন। সেই বিবেচনার ফলে আরও বাঙ্গালার কালিদাসের অতুলনীয় কাব্যের কথকিং আভাস পাইয়াছি। তাঁহার হাতে পড়িয়া একটি মহান্ আদর্শ দীর্ঘ হইয়া যায় নাই। মুকুন্দরায়ের প্রতিভা সহজ বুদ্ধিগুলিনা তাই তিনি বুঝিতেন যে মহাকবি কালিদাস যে বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কোনও নুতন প্রদানের চেষ্টা করা, বিকশিত শব্দসমূহ রং রঙের চেষ্টার জার বিড়ম্বনাভ্রমক। তাই তিনি কালিদাসের তাব অক্ষর রাখিবারই প্রয়াস করিয়াছেন। যেখানে সেই পথ ঈষৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বল্পপোল কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, সেইখানেই একটু রসভঙ্গ হইয়াছে এবং সমালোচকের তীব্রোক্তির হেতু হইয়াছে। কিন্তু এখানেও তিনি অতটা ঘোষাই নহ; কেন তাহা পরে

বলিতেছি। সে বাহা হউক ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে মুকুন্দরায় গ্রন্থের মাধব্যা বুদ্ধিতে, প্রেম যে কেবল কলুষিত ইঞ্জির বিচারমাত্র নহে, তাহা তিনি বেশ জগদলব করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতচন্দ্র এই সুন্দর অবকাশ, কবিত্বের এই মনোরম লীলাক্ষেত্র ছাড়িয়া দিয়া শুধু নিজের অনিবেকিত্বই প্রকাশ করেন নাই, নিজের অশারদ ও অরসিকত উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে কোনও উচ্চ আদর্শ তাঁহার সম্মুখে স্থান পায় না, কোনও মহৎ ভাব তিনি ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার কলুষিত কল্পনার মহাবোগী মহাদেবেরও ইঞ্জিরনিগ্রহ লক্ষ্য। মদন-তত্ত্বব্যাপারটা তাঁহার মাঝার একেবারে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাই এই আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা লইয়া তিনি ছেলখেলা করিয়াছেন। মুকুন্দরায়ও বাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই, সেই মহোচ্চ ভাব ভারতচন্দ্রের শব্দ সমূহের কবির হস্তে পড়িয়া একেবারে বিকৃত ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যে মদনবাণে এত কাঠর, সে আগার মদনকে তত্ত্ব করিবে কি করিয়া, এ কথাটা তাঁহার বিচারবিহীন মস্তিকে প্রবেশ করিল না। মহাদেবের এই সার্বিক কোষ ধারণা করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না; তিনি শুধু শুধু মদন বেচারাকে তত্ত্ব করাইয়া, শেষ আগার সেই মদন-আগার মহাবোগী মহাদেবকে পাপল সাজাইয়া দেখাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কি ঘণিত প্রবৃত্তি! কি অন্ধ ইঞ্জির-

বিকৃতিপাণ্ডুল হৃদয়! অনেকে ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন জ্ঞাত নিন্দা করেন, অনেকে ভাবেন যে এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিনেচনায় ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা অশ্লীলতা আর কোথাও ততদূর ব্যক্ত হয় নাই যতটা এই শিল্পের তপোভঙ্গের চিত্রে হইয়াছে। যে কবি অপর এক মহাকবির আদর্শ নিম্নম ভাবে, কুৎসিত ভাবে চূর্ণ করিয়া, দেবতার স্থানে পশুর চিত্র আঁকিতে সঙ্কোচের লেশ মাত্র বোধ করেন না, যিনি আদর্শ যোগীকে কামোন্মত্ত পশুর সঙ্গে সাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন না, তিনি পরনারীর কামোন্মত্ততা প্রদর্শক বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া নিজের বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়াছেন, এ কথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়। ভারতচন্দ্রের বিকৃত রুচির বিকাশ সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধানভাবে এইখানে কুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান দোষ, তাঁহার হৃদয়-হীনতা, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, সবই এই এক চিত্রে একত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। কোনও কবির জাতীয় মহান আদর্শ খল করিবার অধিকার নাই, বিশেষঃ হিন্দু কবি হইয়া হিন্দুর পরম দেবতার মহোপকারী আদর্শ বিনষ্ট করিবার অধিকার ভারতচন্দ্রের আদৌ ছিল না। ইহা দ্বারা তিনি নিজ হৃদয়ের যে হীনতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। ফলতঃ এই কলুষ-কলঙ্কিত ইন্দ্রিয়বিকৃতিই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান দোষ। কোনও সুসমালোচক বলিয়াছেন যে ইহা ভারত-

চন্দ্রের দোষ ততটা নহে যতটা তাঁহার সময়ের দোষ। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও তাহা দ্বারা ভারতচন্দ্রের দোষ একেবারে ক্ষান্ত হয় না। তিনি যদি বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই এই দোষযুক্ত হইতেন তাহা হইলে আমি সে কথায় সাংগ দিতে পারিতাম, কিন্তু তিনি চন্দ্রের সমক্ষে একটি বিরাট আদর্শ বর্তমান থাকিতেও তাগাকে অগ্রাহ করিয়া, অনায়াসে দেব-চরিত্র বিকৃত করিয়া যে নিজের প্রমাণ দিয়াছেন, সে আশ্চর্য্যম্বিত, ইন্দ্রিয়পরাহৃত চঞ্চল ও বিনৈকবিশীল নিজের অপরায়ণ কেশ সময়ের ষাড়ে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে রাম বাবুর নিকট নিমটান স্বভেদের দোষস্থলন চেষ্টার তুল্য হস্তাশ্পর হইয়া উঠে। আমি সেরূপ কোনও চেষ্টার পক্ষপাতী নহি।

কবিরাজ প্রায়ই সমগ্র চিত্রে আশ্চর্য্য-সংযম রাখিতে পারিয়াছেন, কেবল এক স্থলে একটু আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন ও এক স্থলে নিজের কথা কাঁহিয়া আদর্শ নষ্ট করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস ধ্যান-মগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করেন নাই, তিনি বাঁলিয়াছেন যে মহাদেব যখন যোগ ভঙ্গ করিয়া পার্শ্বতী-দত্ত মালা গ্রহণ করিতে গেলেন তখন কাম সন্মোহন বাণ প্রয়োগে তাঁহাকে জ্বলন্ত দৈর্ঘ্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই যোগী মহাদেব হৃদয়বলে ইন্দ্রিয়-বিকার নিগ্রহ করিয়া, মদনকে ভস্মীভূত করিলেন। এই স্বাভাবিক এবং উচ্চ ভাব মুকুন্দরাম একটু সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি

ধানমগ্ন মহাদেবের ধান ভাজাইয়াছেন। তিনিও ঠিক বৃত্তিতে পাবেন নাই যে, যে চিত্র পরমাত্মজ্যোতিঃ নিরীক্ষণে পর্য্যবসিত সে চিত্রে কামবিকার সম্ভব নহে। এই স্থলে আদর্শ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে। আর এক স্থলে কবিকল্প স্বকপোল-কল্পিত একটি ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন, শিবের কুৎসং রূপে আবির্ভাব, পরে মোহনবেশ ধারণ এবং নারীগণের পতিনিন্দা। এগুলি দ্বারা কাবের কোনও শোভা বৃদ্ধি হয় নাই বরং ক্ষতিই হইয়াছে। যাহা কবিকল্প শেষকালে করিয়াছেন তাহা কালিদাস পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বাবধিই কালিদাসের মহাদেব বরবেশে সজ্জিত। এবং কালিদাস মহাদেবদর্শন মুগ্ধ জীগণের মুখে উদার বচনাবলীই বসাইয়াছেন—সুন্দর ও সাধারণতঃ সর্ব্ববেচক কবি মুকুন্দরাম তবে কেন এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন? একজন সমালোচক কহিয়াছেন “সুপুরুষ দেখিলেই নারীগণের দ্বারা স্বীয় পতির নিন্দা করিতে হইবে, প্রাচীন কবিদের এ এক সাধারণ রোগ। যে দেশে পতিপূজা দেব-পূজার উন্নীত, সে দেশে এরূপ বিকৃত ক্রটি কোথা হইতে আসিল?” এই প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের সমাজের একটি ভয়ঙ্কর কুপ্রথার উপর দৃষ্টিনিষ্কপ করিলেই ভালরূপে হইবে; সেই কুপ্রথা দেবীর ঘটক প্রচারিত কৌলীভ্রপ্রথা। এই কৌলীভ্রপ্রথার মোহে আবিষ্ট হইয়া আমাদের কুলবালাগণকে যে রাশি রাশি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, অযোগ্য বরের হস্তে ত্যক্ত হইয়া সারা জীবন যে অসহ্য কষ্টে ব্যস্ত করিতে হইয়াছে

তাহারই ফলে আমাদের সভ্যগণের আদর্শে অমুগ্ধগণিত বঙ্গদেশেও এই অসহ-যজ্ঞা-নিপীড়িতা ললনাগণের মুখে পতিনিন্দা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভীষণ কুপ্রথা মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের সময় সম্পূর্ণ রূপে সমাজে উৎখাত করিতেছিল, এবং অসহায় কুলীন-ললনাগণের বৃদ্ধ নিগুণ বরের সহিত বিবাহিত হওয়া নিত্য ঘটনার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহা মহাদেবের সহিত গৌরীর বিবাহ বর্ণন কালে কবির মনে সজ্জেই এই বিসদৃশ চিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল; এবং পরে সুন্দর মহাদেবকে দেখিয়া নারীগণের নিজের অদৃষ্টকে দিকার দিবার পরিত্র অশোভন হইলেও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। মুকুন্দরাম ঘরের কথা কহিতে এত ভালবাসেন যে তাহার সুযোগ পাইলে আর ছাড়িতে পারেন না। তাহার রচিত নারীগণের পতিনিন্দা উক্ত আদর্শানুসৃত নহে তাহা সত্য, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত কুভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাতে অদৃষ্টে দিকার ভিন্ন ইন্দ্রিয়চপলতা প্রকাশ পায় নাই। যেটুকু আছে তাহাতে মনে হয় যেন সেই নারীগণের দুর্দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি লিখিতে বসিয়াছেন। ইহা উত্তম ক্রটির অমুদোষিত না হইলেও, ইহা দ্বারা কবির হৃদয়ের কোনও বিসদৃশ ভাবের প্রকটন হয় নাই। কবি এই নিন্দার ভিতরও নিপুণ অঙ্গুল সঙ্কেতে সেইরূপ কোনও জঘন্ত ভাবের পথ রোপ করিয়া রাখিয়াছেন।

“আপন স্বামী কণকচাঁপা পর শিমুলের ফুল।” ইহা দ্বারা কবি নিজ সংঘম বজার রাখিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেও নারীগণের পতি-

নিলা আছে—তাঁহার পরিচয় এখানে দেওয়া
প্রয়োজন নাই, এইটুকু বলিলেই চলিবে যে
মুকুন্দরামে যাহা বাস্তব দৃশ্য, ভারতচন্দ্রে
তাহাই হাস্যরস অবতারণার চেষ্টা। তা
ছাড়া আরও যাহা আছে তাহা বড়
গৌরবের বিষয় নহে। সে কথা পরে
বলিব।

এই হাস্য রসাবতারণা প্রসঙ্গে এইটুকু
লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে যে মুকুন্দরাম যে
হাস্যরসের অবতারণা করেন তাহা নাটক-
কারের মত চরিত্রসৃষ্টির ব্যপদেশে। ভারত-
চন্দ্রের হাস্যরসের ভিতর একটু নষ্টামি
আছে; তাঁহার পরকে অপদস্থ করিয়া
হাসিবার ইচ্ছা করে, তাঁহার হাস্যরস একটু
Mischievous. এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা
নিজস্ব নারদের সহিত তুলনা হয়। ঝগড়া
বাণীক্ৰিয়া মজা দেখিতে তিনি বেশ কৌতুক
অনুভব করেন, লোকের সহিত কার্যাক্তঃ
পরিহাস (Practical joke) করিবার প্রবৃত্তি
তাঁহার নারদের মতই প্রবল। হরগৌরীর
চিত্রের মধ্যে মুকুন্দরাম তদীয় পরিহাস
রসিকতার পরিচয় দেন না, ভারতচন্দ্র
দিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি চরিত্রের
গৌরব ভারতচন্দ্রের যেন দ্রষ্টব্যই ছিল না,
অতএব দেবচরিত্র লইয়াও তিনি ঠাট্টা-
তামাসা করিতে বিরত হন নাই। এই
দেখুন শিবের বরসজ্জা লইয়া দ্রষ্টা নারদ কেবল
practical joke করিতেছেন—

নারদ বাসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
সাজাইতে গেলা বর।
বসিছিল হর উঠিল সত্তর
নারদ কহে তৎপর ॥

জটা জুটে চূড়া সাপে বাক খুড়া
মুকুটে কি দিবে শোভা।

কি কাজ মুক্তার হাড়ের মাগার
কহার মা হ'বে লোভা ॥

কস্তুরী কেশরে চন্দন কি করে
ঘন করে মাখ ছাই।

কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে
হেন বর কোথা পাই ॥

ফুল মালা যত শোভা দিবে কত
যে শোভা মুণ্ডের মাগে।

কাপড়ে কি শোভা জগমন লোভা
যে শোভা বাঘের ছালে ॥

রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার
যে বুড়া বলদ আছে।

তোমার যে গুণ কব কোটিগুণ
আমি মেনকার কাছে ॥”

এমন না করিলে নারদের হাসিবার একটা
মন্ত্ৰ সুযোগ ভাসিয়া যায় তাই কবি
মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা রূপান্তর করিয়া
একটু হাসিয়া লইয়াছেন—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষু বজলে ভাসে।

নখে নখ বাজায় নারদ মুনি হাসে ॥

আদর্শহীনতার দোষ ছাড়িয়া দিলে, আমি
ঠিক বলিতে পারি না যে মদনভদ্রের
দৃশ্যে মহাদেবের ছ'ব আঁকিবার সময় এই
নষ্টামিপ্রিয় হাস্যপ্রবণতা কবির মনে
একবারে উদিত হয় নাই। যে কৌতুকময়
চিত্রের রেখাপাত সেখানে হইয়াছে তাহাই
হাস্যরসিক কবি দীনবন্ধুর হাতে পড়িয়া
বিরোপাগ্লা বুড়ার” দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু
সে কথা আর না তোলাই ভাল, কারণ আমি
পূর্বেই বলিয়াছি যে এই চিত্রে কবির যে

দিক্ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা আদৌ স্থলকর
নহে। এই স্থলে ভারতচন্দ্রের পরিহাস-
প্রিয়তার যে টুকু পরিচর পাইয়াছি তাহারই
আভাস দিয়া রাখিলাম। ইহা আমরা আরও
বিকশিতভাবে পরে দেখিতে পাইব।

এক্ষণে ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের
হরগৌরীচিহ্নে তাঁহাদের কতটুকু ক্ষমতার
বিকাশ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের অপরাপর
দোষগুণই বা কি রকমে ধরা পড়িতেছে
তাহারই প্রসঙ্গক্রমে আর দুই একটি কথা
বাগিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই। অবাস্তর
হইলেও উভয় কবিব কাব্যেই রতিবিলাপ
সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রতিবিলাপ-
ব্যাপার লইয়া দুই কবির মধ্যে বেশ একটু
তারতম্য লক্ষ্যত হয়। আমরা দেখিতে পাই
যে কবিকল্পন জীবনের ঘটনার স্বাভাবিকতার
যে কবিত্ব তন্নিম্ন অপর কোনও কবিত্বের
প্রতি আত্মবান্ ছিলেন না; তাহার রতি-
বিলাপ স্বার্থ ই বিলাপ, তাহার ভিতর দিয়া
পতিহীন রমণীর আর্ন্ত ক্রন্দন ফুটিয়া
উঠিতেছে।

“মোর পরমাণু লয়া, চিরকাণ থাক জীয়া

আমি মরি তোমার বদলে।”

কি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী করুণাসিক্ত আর্ন্তধ্বনি !
ইহাতে উহ-উহর বাড়াবাড়ি নাট, মরি
মরি নাই কিন্তু এ ক্রন্দন প্রাণের সহিত
ক্রন্দন। স্বভাবজ কবি যতটুকু স্বভাবানুযায়ী
ভূতটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এই
রতি-বিলাপের ভিতর কথা বসাইবার বা
কবিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা মোটেই নাই।
অথচ ইহা দ্বারা একটি গভীর শোকের মূর্তি
সজীব ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

রতিবিলাপে ভারতচন্দ্র অনেক কথা
বলিয়াছেন, অনেকগুলি “উহ” বসাইয়াছেন,
কবিত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ ছাড়েন নাই,
কিন্তু তৎসহেও বৃত্তিতে কষ্ট হয় না যে রতির
বিলাপ কবির মর্ম্মে তেঁা অনেক দূরের কথা,
তাঁহার কানেও প্রবেশ করিয়াছিল কি না
সন্দেহ।

আহা আচা হরি হরি, উহ উহ মরি মরি
হার হার গোসাই গোসাই।

হৃদয়েতে দিতে স্থান করিতে কতক মান
এখন দেখিতে আর নাই ॥

* * * * *

শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি ল'য়ে
না জানি বা ডল কিবা গুণ।

একের কপালে রহে আরেক কপাল নহে
আগুণের কপালে আগুণ ॥

ইত্যাদি কবিত্বের স্বাভাবিকতার পরিবর্তে
বাহ্যচরিত্র দেখাইবার চেষ্টাই বেশী। কোনও
গভীর শোকমগ্না বিধবার প্রাণে “একের
কপালে রাহ” প্রভৃতি হেয়ালি পড়িবার
প্রবৃত্তি-আনা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক
তাহা কবি ভাবিবার সময় পান নাই।

“আরে নিদারুণ শ্রাপ, কোন পথে পতি যান
আগে বারে পথ দেখাইয়া।

রাজীব চরণ রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে বাহিয়া ॥”

ইহাতে ভাব আছে সত্য, ভাবটি মনোরমও
বটে, কিন্তু কথাগুলি ঠিক স্বাভাবিক
বাগিয়া মনে হয় না। গভীর শোক ভাবের
উৎপাদক নহে, তাহা নিদারুণ মর্ম্মভঙ্গ
বস্তুরাই উৎপাদক। এই চারিটি ছন্দে
একটি কোমল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ

নাই ; কিন্তু মর্মেৎ বেদনা তেমন বাক্য চর
নাই । যে ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি পাঠকের
হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি করে না, যাতে প্রতি-
ঘাতের সৃষ্টি করে না, তাহা কাব্যময়
হইলেও রস হিসাবে তাহার সার্থকতা
বড় বেশী নহে । কারণ রসের স্ফূর্ত্যাব-
শোক, সেই শোকের উদ্ভাপ বত অধিক
ফুটিবে, ততই কল্পন রসের গাঢ়তা সম্পাদিত
হইবে । শোকের সময় কবিতা স্ফূর্ত্ত হয় না,
তাঁই এই ছত্রচতুষ্টয়ে যাক সাধিত হইয়াছে
তাহাতে রস প্রগাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, বরং
রসাত্মকদোষ আসিয়া পড়িয়াছে । মনুষ্য-
চরিত্র বিশ্লেষণ কালে আমরা ভারতচন্দ্রের ও
মুকুন্দরামের রসাবতারণ-শক্তির আরও
বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাইব,
অতএব এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া
ক্ষান্ত হইলাম ।

এই সময়েই বলিয়া রাখা উচিত যে
হরগৌরীর কথ্যে ভারতচন্দ্রের প্রধান দোষ
যেমন পরিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনই তাহার
প্রধান গুণের বিকাশও ইহাতেই দেখা
দিয়াছে । যে অদ্ভুত শব্দ যোজন শক্তি
লইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরজীবী
হইয়া আছেন, সেই শক্তি এই হরগৌরীর
কথায় সম্পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়াছে ।
এ সময়ে তাহার শক্তি অসীম, বঙ্গসাহিত্যে
এই এক বিষয়ে তাহার প্রতিধ্বনী এখনও
হইল না । অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রাণ এই
শব্দমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত । স্রাব্যায় বোণার কি
বাক্যেতেছে বৃষ্টি বা না বৃষ্টি তাহার ধ্বনি
কর্ণে মধু বর্ষণ করে ; কোকিল কি গায়
তাহা কেহ বৃষ্টিতে না পারিলেও তাহার

গানে প্রাণ আকৃষ্ট হয় । ভারতচন্দ্রের
কলধ্বনিও এমন মধুর, এমনি চিত্তা-
কর্ষক ।

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে,
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে চল চল উছলে কুলে ॥

বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিল রাজধানী অশোক মূলে
কুসুম পূর্ণ পূর্ণ ভ্রমর গুণ গুণ
মদন দিল গুণ ধনুক হলে,
বতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধু মুদিত মন ভারত ভূলে ।

বহু কাণ পরে বঙ্গসাহিত্যে আবার এই
শব্দ মন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে । বৈষ্ণব-
কবি গোবিন্দদাস যে শব্দযোজনা-শিল্প
আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন
করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের হস্তে সেই শিল্প
বহু গৌরবসম্পন্ন হইয়াছে । আধুনিক
কবিগণের মধ্যে কবির রবীন্দ্রনাথ অনেক
পরিমাণে এই শব্দবৈভবের অধিকারী হইয়া-
ছেন সত্য, কিন্তু তিনিও ভারতচন্দ্রের কাছে
পরাস্ত । কেবল শব্দের সাহায্যে একটি
গম্ভীর বিরাট চিত্র অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা
ভারতচন্দ্রের মত আর কোনও কবিতে দেখি
নাই । “ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুণ
এই যে তাহাতে প্রমজ্জিত একটি শ্বেদ-
বিন্দুও পাঠকের নেত্র গোচর হইবে না,
শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের ছায় তাহা
আরাস ও আঁড়খর শূন্য । • • • •
• • • • • এই শব্দ ও ছন্দেবর্ষ্য
মুগ্ধ হইয়া অনেক সমালোচক ভারতচন্দ্রের

কাব্যগুলকে ‘ভাষার ভাষ্যমূল্য’ আখ্যা
প্রদান করিয়াছিলেন ।” *

বলা বাহুল্য যে এ শব্দচাতুর্গ্য বা এই
অদ্ভুত শিল্পের পরিচয় আমরা মুকুন্দরামে
পাইবার আশা করি না। মুকুন্দরাম নামে
কবি, কার্য্যাতঃ নাটককার। যাহা স্বাভাবিক
—ভাব বা ভাষা দ্বারাই স্বাভাবিক, কবি
অবিকল তাহা নিজ কাব্য মধ্যে বসাইয়া
গিয়াছেন। তাহাতে সাজসজ্জা অর্পণ
করিবার কল্প বাগ্ৰতা প্রকাশ করিবার তাঁহার
অবকাশ ছিল না। লিপিচাতুর্গ্য মুকুন্দরামে
একেবারে নাই—লেখার মুখে যাহা বাহির
হইয়াছে তাহাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।
তাই বলিয়া তিনি যে আগাগোড়াই গ্রাম্য
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, যখন
যাহা ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইয়াছে
তখন তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন—তা সে
সংস্কৃতই হউক বা গ্রাম্যই হউক। আমার
বক্তব্য এই যে মুকুন্দরাম পাঠককে কোথাও
শব্দমোহে সমাজ্জর করিবার প্রয়াস করেন
নাই, প্রয়াস করিলেও পারিতেন কি না

সন্দেহ, কারণ তাঁহার হৃদয় অগ্রদিকে আবদ্ধ
ছিল। কিন্তু ভারতজ্ঞের শক্তির বিকাশ
এই শব্দচাতুর্গ্যকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া-
ছিল। তাঁহার মত কথার চিত্র হরণ
করিতে প্রাচীন কালের অল্প কোনও কবি
সক্ষম হ’ন নাই।” দীনেশ বাবুর এই উক্তি
আংশিকমাত্র সত্য; ফলতঃ তাঁহার মত
কথায় চিত্র হরণ করিতে এ কালেরও কোনও
কবি সক্ষম হ’ন নাই বলিলে সম্পূর্ণ সত্য
হইত।

যাহা হউক এই শব্দপ্রয়োগশক্তি কবির
চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে
সেই কথা বলিবার কালেই এ বিষয়ের বিস্তৃত
আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। হর-
গৌরীর কথা উভয় কাবের মুখবন্ধ স্বরূপ।
সেই মুখবন্ধে দুই কবির যে আভাস পাইয়াছি
তাহাই এখন প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি
মাত্র। কবিদ্বয়ের পূর্ণ প্রকাশ তাঁহাদ্বয়ের
কাব্য মধ্যে প্রবেশ করিলে তবে পাওয়া
যাষ্টবে, বারান্তরে তাহা করিবার হচ্ছা
রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

বঙ্গালা-ব্যাকরণের একাংশ।

উপযুক্ত অভিধান ও ব্যাকরণ অভাবে
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বঙ্গালাভাষার
পর্যালোচনা দুর্লভ—অসম্ভব বলিলেও
অত্যাশঙ্কিত হয় না। অভিধান বা ব্যাকরণ
সম্পাদনা করা ব্যক্তিগত চেষ্টার অসাধ্য।
সমবেত ধারাবাহী চেষ্টা বিনা এ কার্য্য
সম্পন্ন হইবার নহে।

ব্যক্তিগত পরিশ্রমলব্ধ ফল সুধীমণ্ডলীর
সমক্ষে যাচাই না হইলে বার্থ হয়। এই
বুদ্ধিতে বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত। পরীক্ষাস্তে
প্রত্যাখ্যাত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ নিফল হইবে
না। সম্বাদী ভ্রমেরও সার্থকতা আছে। ঐযুক্ত
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন মহাশয় প্রবন্ধ
প্রণয়নে সং পরামর্শ দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন

হইয়াছেন। মতামতের জন্ত তিনি দায়ী নহেন। ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু রণীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত “বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব” (৬০ পৃষ্ঠা) ও “বাঙ্গালা ধ্বন্যাঙ্গক শব্দ” (২৫২ পৃষ্ঠা) এবং শ্রীযুক্ত বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত “ভাষা-তত্ত্ব” (১৬৮ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের ক্ষুদ্র একাংশ মাত্র উপস্থিত আলোচনার বিষয়। শব্দের বিহ ও বিজ্ঞাভাসের বহুমুখী প্রয়োগ উত্তর ভারতীয় ভাষার একটি বিশেষত্ব। অত্যাগ্ৰ ভাষায় ইহার চিত্রমাত্র লক্ষিত হয়। যেমন, ইংরেজীতে wide wide world, lugger-mugger ইত্যাদি। সংস্কৃতে পরস্পর, পরস্পরা, কিলকিলা ইত্যাদি। কিন্তু এই এক সাধনায় বাঙ্গালায় যত প্রকার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় ভাষান্তরে অপ্রাপ্য। অনাদরে বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপন। এজগৎ ইহার নগণ্য একাংশের আলোচনাতেও অজ্ঞাতদারে বলিয়া উঠিতে হয়—

মাতৃভাষারূপী খনি পূর্ণ মণিজালে।

বাঙ্গালা-ব্যাকরণের একাংশ।

দ্বিরুক্তি।

১। উপর্যুপরি ব্যবহৃত একই শব্দের প্রত্যেকের অর্থ স্বাতন্ত্র্য থাকিলে তাহাকে দ্বিরুক্ত বলা যায়। যথা, রাম রাম, হরি হরি, ধিক্ ধিক্, হায় হায়, রে রে, আশুন আশুন ইত্যাদি।

২। মনোরত্তির প্রবলতা বশতঃ শব্দের

একবার প্রয়োগে আক্ষেপ নিরুক্তি না হইলে দ্বিরুক্তি বা বহুুক্তি হয়। যথা, ভয়ে—সাপ সাপ, আঙণ আঙণ, পালাও পালাও। বিন্ময়ে—জ্যাঁ জ্যাঁ, দেখ দেখ, তাই ত তাই ত। ক্রোধে—মার মার, কাট কাট। ঘৃণায়—মহাভারত মহাভারত, রাম রাম, ধিক্ ধিক্। অবজ্ঞায়—ছি ছি, দুয়ো দুয়ো। হুঃপে—হায় হায়, যাই যাই। আনন্দে—বেশ বেশ, বাহবা বাহবা, সাধু সাধু। লজ্জায়—ছ্যা ছ্যা, রাম রাম। সন্মোহনে—রে রে, হে হে, পুত্র পুত্র, মা মা। আশ্বাসে—আশুন আশুন, প্রত্যাখ্যানে—যাও যাও। সন্নতিতে—আচ্ছা আচ্ছা। অসন্নতিতে—না না, ইত্যাদি।

৩। মনোরত্তির আধিমািত্রিক প্রবলতায় বহুুক্তি হয়। যথা, রে রে রে, হা হা হা, না না না ইত্যাদি।

৪। শব্দ ও বাক্যের দ্বিরুক্তি ও বহুুক্তির একই সাধারণ নিয়ম। যথা, শুনিব না শুনিব না; যাব না, যাব না, যাব না ইত্যাদি।

৫। গতিজ্ঞা হ্রচক বাক্য উপর্যুপরি তিন বার উচ্চারণে শপথ হয়। যথা, যাব যাব রাব অর্থাৎ শপথ করিতেছি যে যাইব।

৬। মনোরত্তির প্রবলতাধিক্যে বাক্য-শক্তি বোধ হয় বলিয়া বাক্য অপেক্ষা শব্দের দ্বিরুক্তিতে মনোরত্তির অধিকতর প্রবলতা হুচিত হয়। যথা, (১) তোমাকে দেব না। (২) তোমাকে দেব না তোমাকে দেব না। (৩) দেবনা, দেবনা। (৪) না, না।

[এখানে উত্তরোত্তর মনোরত্তির প্রবলতার বৃদ্ধি হুচিত হইতেছে।]

দ্বিত্ব ।

১। উপর্যুপরি ব্যবহৃত একই শব্দের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অর্থলোপ হইয়া একটি মাত্র অর্থ নিম্পন্ন হইলে তাহাকে শব্দের দ্বিত্ব বলা যায়। যথা, ডালে ডালে ফল ধরিয়াছে ।

[এখানে “ডালে ডালে” একটি দ্বিত্ব শব্দ। ইহার আত্ম ও অন্ত্য ডালে শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ লোপ পাইয়া বহু ডালে বা প্রতি-ডালে এই অর্থ নিম্পন্ন হইয়াছে ।]

২। গুণ, ক্রিয়া, কাল, সংখ্যা, অবস্থা নির্দেশার্থে শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা, গুণ নির্দেশার্থে—লাল লাল ফুল। ক্রিয়া নির্দেশার্থে—যাইতে যাইতে দেখিও। কাল নির্দেশার্থে—যখন যখন যাইবে। সংখ্যা নির্দেশার্থে—এক এক জন। অবস্থা নির্দেশার্থে—পরে পরে রাধ ।

৩। অপ্রিয় বা সন্ধিগ্ধ প্রিয়ভাব সূচনায় ও অনুরূপ অর্থে নিম্পন্ন দ্বিত্ব শব্দে মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হয়। যথা, অপ্রিয় সূচক—লোকটা পাগলপাগল, মাথাটা গরম গরম, গাড়ী ছাড়িল ছাড়িল। [এখানে পাগল, গরম, গাড়ী ছাড়া অপ্রিয় বলিয়া মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে ।]

সন্ধিগ্ধ-প্রিয়—কথা শুনিলে ইহাকে পণ্ডিত পণ্ডিত বা জ্ঞানী জ্ঞানী বোধ হয় দেখিতে জোয়ান জোয়ান ।

[এখানে পণ্ডিত, জ্ঞানী, জোয়ান, প্রিয় হইলেও প্রস্তাবিত ব্যক্তি সে প্রিয় গুণের আধার কি না সে বিষয়ে সন্দেহ বলিয়া দ্বিত্ব স্থলে মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে ।]

অনুরূপ—চোর চোর মূর্তি, রাগ-রাগ ঠি, হাসি-হাসি মুখ, কান্না-কান্না স্র ।

[এখানে চোর, রাগ, হাসি, কান্না অনুরূপ অর্থে দ্বিত্ব বলিয়া মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে ।]

৪ : বর্তমানে যে ক্রিয়া ঘটিলে মনের অনুরূপ তাহার ঘটবার বিলম্বের তারতম্য অনুসারে, সেই ক্রিয়াবাচক শব্দের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালীয় রূপের দ্বিত্ব হয় এবং বিলম্ব অপ্রিয় বলিয়া মূল শব্দের হ্রাস হয়। যথা, গাড়ী ছাড়িয়াছে ছাড়িয়াছে এমন সময় দেখিলাম, গাড়ী ছাড়িল ছাড়িল এমন সময় পাইলাম, গাড়ী ছাড়িবে ছাড়িবে এমন সময় উঠিলাম ।

[এখানে প্রত্যেক পরবর্তী উদাহরণে বিলম্ব-ধিক্য সূচিত এবং বিলম্ব অপ্রিয় বলিয়া প্রত্যেক উদাহরণেই মূল শব্দের অর্থ হ্রাস হইয়াছে ।]

৫। অত্র সর্বত্র দ্বিত্ব শব্দে মূল শব্দের অর্থ বৃদ্ধি হয়। অর্থ বৃদ্ধি পরিমাণে, কালে ও সংখ্যায় এই তিন প্রকারে হয়। যথা, পরিমাণে—মধুর মধুর রাস্তা, মুহু মুহু সমীরণ, শীঘ্র শীঘ্র চল। কালে—কাদিয়া কাদিয়া ঝাও, বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত। সংখ্যায়—কাল কাল দাগ, বড় বড় জিনিষ, মুখে মুখে উত্তর ।

৬। ব্যাপ্তি ও পৌনঃপুত্ব কালে অর্থ-বৃদ্ধি এই দুই প্রকার। যথা, ব্যাপ্তি—কাদিয় কাদিয়া যাও। [এখানে ক্রন্দন ক্রিয়ার দীর্ঘতর কাল ব্যাপ্তি সূচিত ।] পৌনঃপুত্ব—বলিয়া বলিয়া ক্লান্ত। [এখানে বলা ক্রিয়ার পৌনঃপুত্ব সূচিত ।]

৭। প্রত্যেকতা, বহুত্ব, সাকল্য ও পারস্পর্য্য এই চারি প্রকার সংখ্যায় অর্থবৃদ্ধি ।

যথা, এক এক ঘরে চারি চারি জন । [এখানে প্রত্যেক ঘর ও প্রতি চারি জন স্থচিত ।] বহুত্ব—কাল কাল দাগ । [এখানে কাল দাগের বহুত্ব স্থচিত ।] সাকল্য—বড় বড় জিনিস । [এখানে বড় জিনিসের সাকল্য স্থচিত অর্থাৎ সকল জিনিসই বড় ।] পারস্পর্য্য—মুখে মুখে উত্তর । [এখানে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তর-দাতার মুখের পারস্পর্য্য স্থচিত ।]

দ্বিভাভাস ।

১। দ্বিহ হইবার সময় শব্দের রূপ বিকৃত হইলে তাহাকে দ্বিভাভাস বলা যায় । যথা, গাড়ী-টাড়ী, কাল-কোল ইত্যাদি ।

২। দ্বিভাভাসের একাংশ নিরর্থক বা উভয়াংশই ধ্বন্যাত্মক হয় । যথা, পূর্ব উদাহরণে ‘টাড়ী’ ও ‘কোল’ নিরর্থক । ছটফট, চটপট প্রভৃতিতে উভয় অংশই ধ্বন্যাত্মক ।

৩। অর্থের বৈচিত্র্য অল্পসারে দ্বিভাভাসের শেষাংশে আদ্যাংশের আদ্য আকার, ঞ্কার, ঔকার ভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিবর্তন হয় । যথা, লাকলিক, ফিটফাঁট ঝোপ-ঝাপ, বোকা-শোকা, গজর-মজর দান-টান ইত্যাদি ।

৪। দ্বিভাভাসে স্বর ও ব্যঞ্জনের যুগপৎ পরিবর্তন হয় না । প্রস্তাবে বৃত্ত সমুদয় দ্বিভাভাসই ইহার উদাহরণ ।

৫। দ্বিভাভাসের আদ্যাংশে যাহা স্থচিত হয় তাহার সহিত তাহার সঙ্গাতীয় আনুষঙ্গিক পদার্থের সমুদয় স্থচনায় আদ্যাংশের অ ঞ্ ঔ ভিন্ন স্বর শেষাংশে

পরিবর্তিত হয় । যথা, ডাক-ডোক, ছিট-ছাট, কাল-কোল, গোল-গাল, ধূপ-ধাপ ঝাড়া-ঝোড়া, ঝোপ-ঝাপ ইত্যাদি ।

৬। বিক্রপাত্মক দ্বিভাভাসে আদ্য আ-কার স্থানে শেষাংশে ই-কার হয় । যথা, লাট লিট, লাধ লিধ ইত্যাদি ।

৭। দ্বিভাভাসে আদ্য আ-কারের পরবর্তী স্বর উকার হইলে শেষাংশে আকার স্থানে উকার হয় । যথা, নাহুস নুহুস, গাবুর গুবুর, হাপুর হপুর ইত্যাদি ।

৮। ক্রিয়াপদের দ্বিভাভাসে আদ্য, আ-কার, ই-কার ও এ-কার স্থানে শেষাংশে উ-কার হয় । যথা, ডেকে ডুকে, টিপে টুপে, পৌঁচিয়ে পুঁচিয়ে, ইত্যাদি ।

৯। ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন বিশেষ্য ও বিশেষণপদের দ্বিভাভাসে আদ্য আ-কার ও এ-কার স্থানে শেষাংশে ও-কার হয় । যথা, সাফ সোফ, কাল কোল, ঘাঁটা ঘোঁটা, ঘেরা ঘোরা, ছোঁড়া ছোঁড়া, চেরা চোরা ইত্যাদি ।

১০। অত্র আকার ভিন্ন পরিবর্তনশীল আদ্যস্বর স্থানে শেষাংশে আ-কার হয় । যথা, ঠিক ঠাক, ভিড় ভাড়, মিট মাট, ফুট ফাট, ঘুগ ঘাঘ, টুপ টাপ, ফের ফার, বেগ বাগ, টের টার, ধোপ ধাপ, গোছ গাছ, ধোক ধাক ইত্যাদি ।

১১। দ্বিভাভাসে তীব্র কার্য্যের কালে বৃদ্ধি স্থচনায় হসন্ত বা অ-কারান্ত ধ্বন্যাত্মক আদ্য শব্দের শেষে আ-কার হয় । যথা, পটাপট, চটাচট, মটামট, গপাগপ, সপাসপ, কচাকচ ইত্যাদি ।

১২। পারস্পর্য্য অর্থে দ্বিভাভাসে মুক্ত

শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে আ-কার হয় এবং সর্বশেষে ই-কার হয়। যথা, কাণাকানি, হাতাহাতি, ঘুবাঘুবি, জড়াজড়ি ইত্যাদি।

১৩। শেষোক্ত প্রকারের দ্বিভাভাসে মূল শব্দের আদিতে এ-কার থাকিলে তাহার স্থানে শেবাংশে ই-কার হয়, ও-কার থাকিলে তাহার স্থানে উ-কার হয়। লেখালিপি, ঘেরাঘরি, পেজাপিজি, লোফালুফি, হোড়া-ছড়ি, খোলাখুলি ইত্যাদি।

১৪। দ্বিভাভাসের আদ্য বা সার্থক শব্দে যাহা সূচিত হয় তাহার সহিত সজাতীয় বিজাতীয় আনুষঙ্গিক পদার্থের সমুচ্চয় সূচনায় সার্থক বা আত্ম শব্দের ট-কার ভিন্ন আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ নিরর্থক বা শেষ অংশে পরিবর্তিত হয়। ট-কারের পরিবর্তন হয় না। যথা, গাড়ী টাড়ী, নৌকাটৌকা, টাকাটাকা, টবটব ইত্যাদি।

১৫। ট-কার আদ্য ব্যঞ্জন হইলে শব্দের রূপ হয় দ্বিভূ, কিন্তু অর্থ হয়, দ্বিভাভাসের নিয়মানুগত। যথা, টাকাটাকা, টাকটাক, টকটক ইত্যাদি।

১৬। ক্রোধ, তাচ্ছীল্য প্রভৃতি নিগ্রহ রসায়ক দ্বিভাভাসে শেবাংশের আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ হয় ফ-কার। যথা, ফেলে দে তোর কাপড়-কাপড়, রেখে দে তোর টাকা-ফাকা, ভাত ফাত ছড়িয়েছে ইত্যাদি।

১৭। অনুকম্পা প্রভৃতি অনুগ্রহ রসায়ক দ্বিভাভাসে শেবাংশের আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণ হয় ল-কার। যথা, বোকাসোকা,

মোটাসোটা, রোগাসোগা, কষ্টেস্টে ইত্যাদি।

১৮। বিরসায়ক দ্বিভাভাসে শেবাংশের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণ হয় ম-কার। যথা, চিস্তে-মিস্তে, গজরমজর, কচরমচর, কচমচ, কটমট, বজমজ, টলমল, কাচুমাচু, খাবড়া-মাবড়া ইত্যাদি।

১৯। গতিসূচক দ্বিভাভাসে শেবাংশের আদ্যস্বর হয় প-কার কিম্বা ব-কার। যথা, চটপট, ছটপট, লটপট, তড়বড়, টগবগ, ঘড়বড়, কিলবিল ইত্যাদি।

২০। বিশৃঙ্খলতা সূচক দ্বিভাভাসে বর্ণের বিশৃঙ্খল প্রয়োগ হয়। যথা, ইলবিল, উসঘুষ, উকখুক ইত্যাদি।

দ্বিহগন্ধা।

১। অবিরল সন্নিবিষ্ট সার্থক, সম-মাত্রিক, অনুপ্রাণবদ্ধ বা মিষ্টাক্ষর শব্দ-দ্বয়কে দ্বিহগন্ধা বলা যায়। যথা, চালচলন, টাচাছোলা, মাজাঘষা ইত্যাদি।

২। দ্বিহগন্ধী শব্দদ্বয়ের শেষ শব্দ ভাষান্তর হইতেও গৃহীত হয়। যথা, কাজ-কর্ম, লজ্জাসরম, কলকৌশল ইত্যাদি।

৩। দ্বিভেদে ত্রায় দ্বিহগন্ধী শব্দেও প্রত্যেকের অর্থলোপ হইয়া একটি মাত্র অর্থ নিম্পন্ন হয়। সেই নিম্পন্ন অর্থ প্রত্যেক শব্দের অর্থের তুলনায় আধিমাত্রিক। যথা, কাজকর্ম, সাজসজ্জা, বাচবিচার ইত্যাদি।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ।

বরেন্দ্র-ভ্রমণ ।

৩

সোণার গৌরাজ ।

কুমারপুরের অনতিদূরে, পদ্মাবতী-তীরে, বরেন্দ্র তবাসসন্ধানসমিতির দ্বিতীয় “জয়স্বক্কা-বারের” স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহা প্রথম “জয়স্বক্কাবার” হইতে পাঁচ ক্রোশ মাত্র। কিন্তু প্রত্যুষে যাত্রা করিয়াও, এই পাঁচ ক্রোশ অতিক্রম করিতে সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সে দিন আকাশে মেঘ ছিল, প্রান্তর মধ্যে বায়ু গবাহের অভাব ছিল না। তথাপি নানাস্থান পরিদর্শন করিতে গিয়া, সাহিত্যিকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এখন সে সকল স্থানে জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; কোন কোন পুরাতন জননিবাস প্রান্তর-ভূমিতেও পরিণত হইয়াছে। তথাপি তাহার সকল স্থানই ভাল করিয়া পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন ছিল। কারণ, যাহা এক সময়ে একটি সম্পন্ন রাজনগর ছিল, তাহাই কালপ্রভাবে বহুসংখ্যক গণ্ডগ্রামে এবং নির্জন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। পলাশবাড়ীর পার্শ্বে পালপুর-ধরমপুরের পুরাতন পরিখার চিহ্ন এখনও সেকালের সেনানিবাসের অবস্থান সূচিত করিতেছে। দক্ষিণে একটি প্রান্তর এখনও “গড়খাই” নামে মানচিত্রে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামের লোকে এখন আর সে সকল স্থানের জনশ্রুতির সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। কেবল একটি জনশ্রুতি এত কালেও সম্পূর্ণ-

রূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই; তাহা হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যেই সমানভাবে প্রচলিত আছে। তাহা এই;— “এক সময়ে কুমারপুরে কুমার রাজা নামে এক রাজা বাস করিতেন; তাহার পর বিজয়নগর নামক স্থানে বিজয় রাজা নামে আর এক রাজা বাস করিয়াছিলেন। বিজয় রাজার দুই ভ্রাতা, শীতল রাজা এবং উদয় রাজা, নিকটবর্তী শীতলপুরে এবং উদয়পুরে বাস করিতেন। এই সকল স্থানে তাঁহাদের রাজবাড়ীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।” এতক্ষণে সাহিত্যিকগণ বুঝিলেন,—দেওপাড়ায় “শীতল-সহর” নামক যে তল্লাট দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিজয় রাজার ভ্রাতা শীতল রাজার নামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তখন কোতুলক বড় প্রবল হইল;—কুমারপুর আর কত দূরে,—সকলে পুনঃ পুনঃ সেই কথাই দ্বিভাষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একটি বিস্তৃত প্রান্তরের অপর প্রান্তে কুমারপুর দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা তখনও বহু দূরে। নিকটে, সম্মুখে, উভয়পার্শ্বে, কেবল জনশূন্য প্রান্তরভূমি, তাহার মধ্যে তল্লের পর তল্লা। এই সকল তল্লা এখন আর বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করে না। কিন্তু একদিন ইহারাই বঙ্গ-কবির কল্পনাগ্রবাহে কত ভাব-তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়া দিত।

“প্রসুদিত চিত্ত নিরঞ্জন ঘন শ্রাম সরসী-শোভা ।

নির্মল পরিপূর্ণ বারি,

পীযুষভর গরবহারি,

মন্দ পবন পরশত মৃদুবাচি ভুবনগোভা ॥

বিকশিত নব কুঞ্জ নিকর,

গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর,

মঞ্জু নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা ।

সারস লস হংস লাঞ্ছ, কিরতহি তহি চক্রবাক
ক্রৌঞ্চ-কীর-কোকিল-শিখি-কলরব অতিরামা ॥

বলকত সর তীর অতুল,

কুসুমিত তরুবল্লী বকুল,

ষলরিত জল ছলক ছাঁহ ছুটত ছবি ভারি ।

অভিনব কুটি-মণ্ডপগণ,

মণ্ডিত কত বেদী রতন,

সুগঠন মণিঞ্জড়িত ষাট লোচন-রুচিকারী ॥”

কুমারপুরের উত্তরপ্রান্তে প্রান্তরের মধ্যে এইরূপ একটি “বিতত তল্ল” দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা এখনও নির্মল-বারি-পূর্ণ, এখনও মৃদুমন্দপবন সংস্পর্শে বাঁচিযালাই অশোভিত। কিন্তু এখন আর তাহার তীরে “কুঞ্জনিকর” বর্তমান নাই, কেবল অবসন্নভূত লতাগুল। তথাপি মধুলোক মধুপুষ্করের আনন্দ-সঙ্গীত নিরন্তর হয় নাই, তাহার সহিত তাল রক্ষা করিয়া এখনও—“মঞ্জু নটত খঞ্জন জনরঞ্জন অনুপামা ॥” ষাট নাই, ষাটের মণিঞ্জড়িত সুগঠনের চিত্রমাত্রও বর্তমান নাই; তাহার প্রয়োজন পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, এখন আর ইহাতে কে অবগাহন করিতে আসিবে? এখন কেবল কুতীরগণ নিঃশব্দচিত্তে সঞ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছে! এই তল্লের দক্ষিণতীরে একটি দেবমন্দির

ছিল। এখন তাহাও চিত্র না থাকিলেও, সেখানে একটি “খান” আছে;—তাহা বাঙালী দেবীর “খান”,—তাহার উপর এখনও বর্ষে বর্ষে পূজা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার নাল্‌তিগিরি-শিখরে যে বাঙালী-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কুমার-পুরের বাঙালী-মন্দিরও কি সেইরূপ ছিল? গ্রামের নাম কুমারপুর, দেবীর নাম বাঙালী দেবী, রাজার নাম কুমার রাজা,—এ সকল কি পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপাল কুমার পালকে স্মৃতিত করিতেছে না? কুমার রাজার পরে যে বিজয় রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিই কি সেনরাজ-বংশের বিজয়ী বিজয় সেন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না? দেওপাড়ার প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইবার পর এ সকল প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর ভিন্ন দ্বিতীয় উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে না। এই সেই পুরাতন রাজনগর,—কুমার পালের শেষ আশ্রয়স্থান—সেনরাজ বংশের প্রথম রাজধানী। ইহার কথা ব্যক্ত করিবার জন্তই বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন স্বকৃত “দান-সাগর” গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন;—

“তদনু বিজয়সেনঃ প্রাহরাসীঘরেজ্ঞে ।”

কোন গ্রামের পর কোন গ্রাম পরিদর্শন করিতে হইবে, তাহা ঘেরূপ কৌশলে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহাতে এই সকল ভৌগোলিকতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহাকেও আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। কুমার-পুরে প্রবেশ করিবার প্রাসঙ্গিক-শিলায় এবং প্রতিমা-শিলায় সন্ধান লাভ করিয়া, সাহিত্যিকগণ জমজ্বলিত “নহ্যম্‌লা”

বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। গ্রামের মধ্যে একটি স্থান সমধিক উচ্চ; তাহার পার্শ্বে পুরাতন পরিখা-চিহ্ন, উপরে বিজন বন, তাহার মধ্যে ব্যাভ্রের আশ্রয়স্থান। তাহার অনতিদূরে অনেক জরাজীর্ণ দেব-মন্দির; একস্থানে একটি ক্ষুদ্র সরোবর-তীরে চারিটি শিবমন্দির বৃক্ষমূলে জড়িত হইয়া কোনরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহার নিকটে নানা বৃক্ষমূলে দেবদেবীর পাষণমূর্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। পদ্মাবতী-তীরে উচ্চভূমিখণ্ডের উপর কুমার-পুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। নদী সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু যেখানে তাহার পুরাতন খাত বর্তমান ছিল, তাহা এখনও “খাড়ি জগাতি” নামে কথিত হইতেছে। তাহার ধার দিয়া আধুনিক রাজপথ গোদাগাড়ী অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পার্শ্বে, একটি উচ্চভূমির উপর, এক প্রস্তরমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিত্যক্ত করিয়া, জটনৈক সম্পন্ন মুসলমান আমীর এক সমাধি-মন্দির নির্মিত করিয়াছিলেন। তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কুমারপুরকে কৌতূহলের আধার করিয়া রাখিয়াছে।

হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া সাহিত্যিকগণ এই সকল পুরাকীর্তির নিদর্শন দর্শন করিতে করিতে, পদ্মাতীরে উপনীত হইলেন। পদ্মা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে; সৈকতভূমি সাহারার মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে! তাহার উপরে যে উচ্চ তট, তাহাতে অলিপুর নামে একটি গ্রাম বসিয়াছে। সেখানে এক হিন্দু ভূস্বামীর কাছারীবাড়ীর পার্শ্বে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভূস্বামী

অশীতিপর, চিরকৃষ্ণ, প্রায় চলচ্ছত্রহীন; তিনি বহুদূরে বাস করেন। তথাপি সাহিত্যিকগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং শিবিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তাহার কাছারীবাড়ীর সম্মুখে কদলীতোরণ, মঙ্গলঘট, লোকারণ্য। কিন্তু তখন শিষ্টাচারের সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল;—ধৈর্যের সীমাও অতিক্রান্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। অগত্যা সাহিত্যিকগণ স্নানাহারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন।

এক সময়ে সমগ্র বঙ্গভূমির প্রাণ বরেন্দ্র-ভূমির এই নিভৃত প্রদেশেই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা বাঙ্গালার নৈক-ব-সাহিত্যকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। “জয়স্বক্কাবারের” অনতিদূরে—সেকালের পদ্মাবতী-তীরে—গোপালপুর নামক স্থানে একটি রাজধানী ছিল। এখনও রাজপথ-পার্শ্বে বনভূমির মধ্যে তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি সংস্কৃত নাটকে সেই রাজধানীর নাম উল্লিখিত আছে। গোবিন্দ কবিরাজ “সঙ্গীত-মাধব” নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

“পদ্মাবতীতীরবর্ত্তি-গোপালপুর নগর-বাসি-গোড়াধিরাজমহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত সপ্তমতমুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ। স হি শ্রী-নরোত্তমদত্তসপ্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ ষঃ পিতৃব্যভ্রাতৃশিষ্যঃ। তেন চ শ্রীরাধামাধ-বয়্যোঃ প্রকট লীলামুসারেণ লৌকিকরীত্য্য পূর্ব্বরাগাদিবিলাসার্থ সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয়্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতোহস্তি ॥”

গৌড়াধিপতির মহামাত্য পুণ্ডরীক
দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র
ভক্ত কবি নরোত্তম দত্ত বঙ্গসাহিত্যে
সুপরিচিত; বৈষ্ণবসমাজে মহাজনরূপে
সুপুঞ্জিত। তিনি বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয়
আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁহার সাধুজীবন
নিরন্তর ধর্মপ্রচারেই অতিবাহিত হইয়াছিল।
রাজ্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, আকৃষ্মার ব্রহ্ম-
চারী নরোত্তম দাস কিরূপে ভক্তিমস্ত্রের
প্রচারকামনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া-
ছিলেন, তাহা নরহরি-বিরচিত সুবিখ্যাত
“ভক্তিরত্নাকরে” সংক্ষেপে এবং “নরোত্তম-
বিলাসে” বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।
তাঁহার অপূর্ণ আত্মত্যাগ-কাহিনী মহাকবি
বসন্তের একটি গীতে এখনও কীৰ্ত্তিত হইয়া
থাকে।

“প্রভু নরোত্তম গুণনিধি ॥

কনক কমল জিনি, সুকোমল তত্পানি,

না জানি গড়িল কোন্‌ বাধি ॥

গোরা-প্রেম মত্ত হৈয়া, রাজ্যভোগ ত্যাগিয়া,

পরম আনন্দ বৃন্দাবনে;—

পাইয়া অমূল্য ধন, কৈলা আত্মসমর্পণ,

প্রভু লোকনাথের চরণে ॥

কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ,

হইল গমন গৌড়দেশ;—

শ্রীগৌড় ভ্রমণ করি, গিয়া নীলাচলপুরী,

পুন গৌড়ে করিলা প্রবেশ ॥

প্রভু পরিকর যত, অমুগ্রহ কৈল কত,

কি অভূত গীত প্রকাশিলা;—

এ দাস বসন্ত ভণে, পাষণ্ড অসুরগণে,

করুণা করিয়া উদ্ধারিলা ॥”

ইহাই সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী,—অপূর্ণ

আত্মত্যাগ-কাহিনী,—অনির্বচনীয় প্রেম-

ভক্তি-কাহিনী,—অলৌকিক পতিভোক্তার-
কাহিনী। তাহা এখনও শতকণ্ঠে গীত
হইয়া থাকে, জয়কন্ডাবারের অনতিদূরে
সেই পুণাতপোবন, যেখানে এই মানব-
প্রীতি এবং দেবপ্রীতি উচ্ছৃঙ্খলিত হইয়া
উঠিয়াছিল। তাহার নাম খেতরি,—বৈষ্ণব-
সমাজের এবং বঙ্গসাহিত্যের চিরস্মরণীয়
তীর্থক্ষেত্র। সেখানে এখনও বর্ষে বর্ষে
মেলা বসিয়া থাকে। নরোত্তমের যত্নে রাজা
সন্তোষদত্তের আশ্রয়ে এই তীর্থক্ষেত্রে প্রথম
“বৈষ্ণবমহাদিশেশন” সুসম্পন্ন হইয়াছিল।
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম মহাদিশেশনের
স্থান বলিয়া সম্ভরণী-গুপ্ত যেরূপ সুপরিচিত,
বঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে খেতরি
গ্রামও সেইরূপ। এখানে নরোত্তমদাস
ঠাকুর মহাশয়ের “সোণার গৌরাঙ্গ” এখনও
প্রতিদিন অর্চিত হইতেছেন। স্মরণ্য
সাহিত্যিকগণ অপরাহ্নে সেই তীর্থক্ষেত্রে
দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন।

তখনও হোরার দিন অগৌড় হইয়া যায়
নাই। সে নিভৃত নিকেতনে আনীর-কুসুম
“চড়াইবার” লোক বড় অধিক না থাকিলেও
মহাপ্রভু তখনও হোরার বেশেই বিরাজ
করিতেছিলেন। শ্রীবিগ্রহ অগ্নিদে আসিয়া
আনীর গ্রহণ করিলেন;—প্রাণণ, অগ্নিদে
এবং শ্রীমূর্তি লালে লাল হইয়া গেল।
খোল ছিল না, করতাল ছিল না, সংকীর্্তন
ছিল না;—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া
আসিতেছিল, দিবসের শেষ আলোক-
রেখাও ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছিল,—
তথাপি সে নীরব হোরী বেগ সরবে গর্জন
করিয়া গাহিয়া উঠিতেছিল;—

‘আজু পরম রঙ্গে হরবে শ্রাম রলিকরাজ ।
ব্রহ্ম বিরচি বিলসত নব কুঞ্জতবনমাঝ ॥

ললিতাদলিতাজ্ঞানজল

নাগর শিরে ঢালি ;—

হো ! হো ! হো ! হরি উচরি,

বিরচই করতালি ॥

সাহিত্যিকগণ খেচরি ছাড়িয়া, প্রেম-
তলি পার হইয়া, শিবিরের দিকে অগ্রসর
হইবার পূর্ব্বেই, আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন
হইয়া গেল ; কোনরূপে শিবিরে উপনীত
হইতে না হইতে, ঝড় উঠিয়া পড়িল ! বৃষ্টি
নাই কেবল ঝড়,—পদ্মাতীরের প্রবল
ঝড়,—তাহাতে বালুকারাশি সপলে শিবির
আক্রমণ করায়, সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া
পড়িলেন । পট্টাবাসগুলি যায় যায় হইয়া
উঠিল ; দড়াদড়ি ধরিয়া কার্যক্রেমে শিবির
রক্ষা করিতে গিয়া, কেহ কেহ বিলক্ষণ
শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন । ঝড় থামিয়া গেলে,
আবার আকাশ পরিষ্কৃত হইল, আবার চন্দ্রমা

বিলসিত হইল, আবার পদ্মাতীর শান্তমূর্ত্তি
ধারণ করিয়া, নূতন শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া
উঠিল । কিন্তু রজনী বড় নিরুদ্বেগে অতি-
বাহিত হইল না ! শিবিরে ফিরিবার সময়ে
শিবিরের অনতিদূরে একটি ঝোপের মধ্যে
অনেকগুলি জোনাকী এক সঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্‌
করিতেছিল । হস্তীগুলি তাহার নিকটে
আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া আকাশে
গুঁড় উঠাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝোপ
নড়িয়া উঠিল, খেদ্যোৎপুঞ্জ সচল হইল,—
যাঁহাদের দৃষ্টি প্রথমে ছিল, তাঁহারা দেখিলেন
ব্যাব্রাচার্য্য বৃহন্নাকুল মহাশয় সাহিত্যচার্য্য-
গণকে বিনা বিবাদে পথ ছাড়িয়া দিয়া গভীর
বনে প্রবেশ লাভ করিলেন, বরেন্দ্রে একরূপ
ঘটনা অসাধারণ বলিয়া পরিচিত নয় ।
সুতরাং পট্টাবাসে রাতিঘাপন করিতে হইলে,
আগ্নেয়ান্ন নিকটে রাখিবারই ব্যবস্থা করিতে
হয় । তাহাতেও সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে
উদ্বেগ দূর হয় না ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

খাদ্য ও রন্ধন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশস্ত নিয়ম ।

১। সারা জীবজগতে খাদ্যের অভি-
ব্যক্তি দেখিলে বুঝা যায়, খাদ্যের অভি-
ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জীবের অতিব্যক্তি
চলিতেছে । উচ্চশ্রেণীর জীবেরা অবয়বের
অল্প আরতনে অধিক সারাল দ্রব্য খায় ।
উন্নতিশীল মানুষের মধ্যেও সেইরূপ দেখা
যায় এবং সকলেরই সেইরূপই কর্তব্য ।

২। খাদ্য বত শুকনা অবস্থায় খাওয়া
যায়, হজম ততই সহজে হইয়া থাকে ।

তবে কখনও শৈলী জলীয় পদার্থের সহিত
পাইলে খাদ্যে হজমের সার রস ভাল করিয়া
মিশিতে পারে না ।

৩। অনেক শ্রেণীর খাদ্য আছে । মাংস
বা ছানা জাতীয়—মাছ, মাংস, ডিম, ডাল,
ছানা । তৈল জাতীয়—তেল, ঘী । খেতসার
জাতীয়—ভাত, তরকারী । চিনি জাতীয়—
চিনি, গুড় । এ সবগুলিতেই অল্প অনেক

জাতীয় খাদ্য আছে, কিন্তু যেটি দিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে সেইটিই প্রধান উপকরণ।

৪। শরীরে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যগুলির ভিন্ন ভিন্ন কাজ। প্রথম বয়সে অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় শরীর দিন দিন বাড়ি বলিয়া মাংস বা ছানা জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ বাহারা শরীরপ্তার সাহায্য করে তাহারা এই সময়ে প্রশস্ত। মধ্য বয়সে অর্থাৎ যৌবনে বা যে বয়সে খাটিয়া খাইতে হয়, সে বয়সে তৈল, দ্বী জাতীয় খাদ্যই বেশী আবশ্যক, কারণ তাহারা শরীরে শক্তি দেয়। আর বার্দ্ধক্যে সামান্য খেতসার জাতীয় আহারই ভাল। কারণ অন্ন আরতনে তাহারা নিরুপদ্রব।

৫। ছেলে বয়সে অতি আহার তত ক্ষতিকর নহে, অনাহার বা অন্নাহার বড়ই ক্ষতিকর। কারণ তাহাতে শরীরে রীতিমত বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়। বৃদ্ধ বয়সে অতি আহার অত্যন্ত হানিকর, স্বল্পাহারে তত ক্ষতি হয় না।

৬। উত্তীর্ণ খাদ্য, যথা ভাত, ডাল, বেশী আঁচে রান্না ও প্রাণীক খাদ্য যথা মাছ মাংস, কম আঁচে রান্না ভাল। তবে সকল রান্নায় মধ্যম আঁচে অনেককণ ধরিয়া রান্না প্রশস্ত। বাষ্পে রান্না জলে সিদ্ধ করা অপেক্ষা অনেক ভাল, সাধারণ স্নাতার ও সুপাচ্য থাকে।

৭। রান্নাবার প্রধান উদ্দেশ্য বাতে খাদ্য সুসিদ্ধ, নরম ও সুপাচ্য হয়। স্নাতার করিবার জন্ত তার পরে ব্যবস্থা করা ভাল। খাইবার অব্যবহিত পূর্বেই স্নাতার ও সুগন্ধ করিলে সে গুলি যত বিদ্যমান থাকে অনেক

আগে করিলে ততটা থাকে না। ঠিক এই সময়েই তাই স্নাতলাবার ও মসলা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

৮। সদ্য রান্না ও সদ্য স্নাতলাব জাতীয় খাদ্য অতি উপাদেয় ও সহজে হজম হয়। বাল্যে খাবার ঠাণ্ডা হওয়ার পর আবার গরম করিলে তেমনটি হয় না।

৯। গরম আহার ও স্নাতার সুগন্ধ আহার সহজমের জন্ত বড়ই ভাল।

১০। আহারের পূর্বে ও পরে শাসিক-কণ করিয়া বিশ্রাম করিবে। কিন্তু অব্যবহিত পরেই দীর্ঘ নিদ্রা দিও না।

১১। আন্তে আন্তে ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে অনেক সহজে খাদ্য হজম হয়। নিয়ত তাড়াতাড়ি খাইলে হজম না হইয়া কতক উৎপাতও করিয়া খাদ্যগুলি আন্ত বাহির হইয়া যায়।

১২। আহারের সময় সর্বদা নিশ্চিন্ত মনে ও ভাল লোকের সঙ্গে সন্লাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে খাওয়া প্রশস্ত।

১৩। আহারের সময়ে তিন-চারটি তরকারী ছাড়া আর বেশী খাওয়া বিধেয় নয়।

১৪। দৈনিক আহারের পর দিনের কাজ থাকে বলিয়া, তাড়াতাড়ি হয় বলিয়া, ও ভারী পেটে গুরুতর কাজ করণ ও ক্ষতিকর বলিয়া সে সময়ে হালকা আহার করিবে। দিনান্তে অবসরের সময় সন্ধ্যার আহারই সর্বাঙ্গেক্ষা প্রশস্ত।

১৫। সচরাচর অন্নবিহীন চারবার আহার করাই ভাল। অন্ন অন্ন অনেক বারে খাইলে একেবারে গুরু আহার অপেক্ষা অনেক সহজে হজম হয়।

১৬। প্রাতে উঠিয়াই সামান্য কিছু খাওয়া চাই; গরম তরল পদার্থই এই সময়ের পক্ষে উপকারী। পূর্বাহ্নের আহার দেন তত বেশী গুরুতর না হয়। অপরাহ্নের আহারে কিছু ফল থাকিলে ভাল হয়, আর সে আহারটিও সামান্য হওয়া চাই। সন্ধ্যার আহার সর্বাপেক্ষা গুরুতর হইলে ক্ষতি নাই। কারণ তখন অবসর ও বিশ্রামের সময় বলিয়া সকল শক্তির হ্রাস-কার্য্যই ব্যক্তি হয়। তবে বেশী রাত করিয়া শুরু আহার ভাল নয়। শুইবার অনাবহিত পূর্বে অল্প তরল পদার্থ পান করা ভাল।

১৭। গুরু আহারের সময় বেশী জল বা অল্প তরল পদার্থ পান করিও না। খালি পেটে বা আহারের অনেকক্ষণ পূর্বে ও পরে জলপান করা ভাল। তাগতে হজমের সাহায্য করে ও পেট ধোবার মত কাজ হয় ও দাত্ত পরিস্কার থাকে।

১৮। আহার্য্য সামগ্রী ও ভোজনের প্রথা মাঝে মাঝে বদলান চাই। তাতে আহারে স্পৃহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

১৯। সপ্তাহে এক দিন কতকটা উপবাসের মত কম খাওয়া ভাল। তাতে অনেক হিত সাধন হয়। যথা আমাদের শরীরের হজমের মন্ত্র ও অত্যাগ্ন মন্ত্রগুলি

বিশ্রাম পায়। বাড়ীর মেয়েরা একটু বিশ্রাম পান; কি চাকরেরা ও একটু অবসর পায়। সেদিন পূর্ব দিনের রক্ষিত সামান্য আহার করিবে। কেমন করে খাদ্য কিছুদিন রক্ষা করিতে পারা যায়, সে শিক্ষাও হয়। সেটি বড় দরকারী শিক্ষা। সকল কৃতবিদ্য জাতিই সেই শাস্ত্রে পারগ। তাই তাঁহারা এত কাজ করিতে অবসর পান ও এত দেশ-বিদেশে ঘাইতে ও থাকিতে পারেন।

২০। আবার মাঝে মাঝে পাঁচ জনে একত্রে মিলিয়া আমোদ করিয়া বাড়ীতে বা বনভোজনে নিজেরা রাঁধিয়া আহার করিবে, তাতে স্থান পরিবর্তন ও আহার ও চিন্তার পরিবর্তন এবং রান্না শিক্ষাও হয়। অনেক দিন এক ভাবে এক অবস্থায় থাকিলে মানুষের অধোগতি অনিবার্য্য।

২১। প্রতি আনন্দের কার্য্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সর্বদা সঙ্গে নিও। এক ধায় যেন কখনও অগ্রথা না হয়। কখন তাহাদের সঙ্গে একত্রে আনন্দ উপভোগ করিলে তোমার শরীর মনে ঘেরূপ উন্নতি হইবে ও ভূমি ঘেরূপ বিমল আনন্দ পাইবে, বিশ্বসংসারে তেমন আর কোথাও পাইবে না।

শ্রীহিন্দুমাধব মল্লিক।

সমাজ-বন্ধন ।

ছোট জিনিষ—যাহা আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে না এবং চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া দেয় না—তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সেই জন্য কোন

ছোট কাজ করিতে আমাদের উৎসাহ জন্মে না। বড় কাজ করিতে না পারি সেও ভাল, বড় কাজ করিবার আয়োজন মাঝেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়

সেও ভাল, ভাখাপি বাহা ক্ষুদ্র বাহা লোক-
চক্ষুর অন্তরালে নীরবে সম্পন্ন হইতে
পারে, তাহার প্রতি আস্থা আমাদের নাই।
প্রকাণ্ড কল্পনা এবং অননুকারণীয় আদর্শ
লইয়া আমরা সন্তুষ্ট, কিন্তু ছোট ছোট
বিষয় লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে
আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা একে
বারে এক মহান্ ভারতীয় জাতি গড়িয়া
তুলিতে প্রস্তুত, ইংলণ্ডের জনসাধারণকে
ভারতসম্বন্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে
প্রস্তুত, কিন্তু সমাজের আশ্রয় লইয়া ছোট
ছোট কার্য্যের দ্বারা সমাজকে বলবান
করিতে এবং নিজেদেরও সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-
শালী করিয়া তুলিতে আমাদের আগ্রহমাত্র
নাই! যদি সমাজেরই উন্নতি করিতে হয়
ত একেবারে আমূল সংশোধনের দ্বারা প্রচণ্ড
বিপ্লবের দ্বারা, নূতন মতবাদের দ্বারা একে-
বারে আদর্শ স্বদেশীয় সমাজ গড়িয়া তোলা
হউক। ছোট ছোট পল্লী লইয়া ছোট ছোট
জনসমাজ লইয়া ছোট কাজ আরম্ভ করিয়া
দেওয়া—তাঁহাতে কাহারও সহায়ত্বই দেখা
যায় না।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়
এ সকল ব্যাপারে ছোট হইতে বড়তে
যাওয়াই সমীচীন পন্থা—বড় হইতে ছোটতে
আসা নহে।

সকল সমাজ্যাতিরই ব্যক্তিগত শক্তি-
পুঞ্জের কেন্দ্র—সমাজ। স্মরণ্য সমাজ স্মৃদুট
না হইলে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় না।
রাশীকৃত বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জ বৃথা অপব্যয়িত
হয়।

আবার সমাজকে দৃঢ় করিবার উপায়

সমাজের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও সহায়ত্বের
বৃদ্ধি সাধন। সমাজ যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত
ব্যক্তিবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হয়,
তাঁহাদের উন্নতি অবনতি যদি সমাজের
অতন্ত্রিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তাহা
হইলে সমাজের প্রতি কাহারও সমবেদনা
বা শ্রদ্ধার ভাব আসিতে পারে না। সমাজের
প্রতি সমাজস্থ জনসাধারণের যেমন
একটা কর্তব্য আছে, সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের
প্রতি সমাজেরও তেমনি একটা কর্তব্য
আছে। যে কোন পক্ষের কর্তব্যচ্যুতিই
জাতীয় উন্নতির পথে বিঘ্নকর।

আজ আমরা আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির বশী-
ভূত হইয়া নিজেদের বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জকে
সংহত করিতে গিয়া দেখিতেছি আমাদের
চক্ষুদিকে বিক্ষিপ্ত শক্তির শির কোন কেন্দ্র
নাই। সমাজ একেবারে শক্তিহীন। এখন
সমাজ-শাসন বলিয়া কোন একটা শাসনই
বিদ্যমান নাই। সমাজের আদেশ শিরো-
ধার্য্য করিয়া লইতে কেহই আগ্রহান্বিত
নহে। ইহার কারণ কেবল সামাজিক-
বর্গের ক্রটি নহে—সমাজেরও ক্রটি।

সমাজ জনসাধারণের সুখ দুঃখ, উন্নতি-
অবনতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপে—বাঙ্গাল-
দেশে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু
হইতেছে পানীয় জলের অভাবে সহস্র
সহস্র লোক হাহাকার করিতেছে, সমাজ সে
বিষয়ে উদাসীন।

বিবাহের জটিল সমস্যা প্রতিদিন দরিদ্র
ভদ্রসন্তানের বৃকের উপর চাপিয়া বসিতেছে
—বস্ত্রাদায়ের ভীষণ বিভীষিকা বেশের

সর্বত্র আতঙ্ক বিস্তার করিতেছে, সমাজ সে সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন।

মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্ভান লেখাপড়া শিখিয়াও অন্নসংস্থানে অসমর্থ—যিকট মৃত্যু তাহার শিরপ্রান্তে দিবারাত্রি লোলুপনেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে—সে জন্ত সমাজের উদ্বেগ নাই।

অনাথ সম্ভান, যোত্রহীনা বিধবা আশ্রয়-হীন হইয়া পথের ধুলিতে শয্যা রচনা করিতেছে—শিকার অভাবে নরসম্ভান দিন দিন পশুত্বের সোপানে অবতীর্ণ হইতেছে—কিন্তু সমাজ সে জন্ত বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নহে।

এরূপ সমাজের প্রতি প্রজ্ঞা, ভক্তির, সমবেদনা কিরূপে সম্ভব?

জাতিতে শক্তিশালী করিতে গেলে সমাজকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজন, সমাজকে সুদৃঢ় করিতে হইলে সামাজিকবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি সমাজকে অবহিত করা আবশ্যিক।

কি উপায়ে এই কার্য সাধিত হইতে পারে? অতিরিক্ত সমারোহে নহিত একটা একাঙ কার্য্যারম্ভ করিয়া দেওয়ার প্রতি আমাদের সম্মতভূতি নাই। আমাদের মতে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া অধিকতর ফলপ্রসূ। সমাজের প্রতি ক্ষুদ্র অংশই সমাজের অঙ্গ। সুতরাং এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়াই সমাজ-শরীরে শক্তিসঞ্চারের স্বাভাবিক পন্থা।

সমাজ ব্যক্তিবৃন্দের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং

সমাজের উপর একটা কাল্পনিক গৌরব ও মহত্বের আরোপ করিয়া আমার বক্তব্যকে কবিত্বপূর্ণ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।

সমাজের পক্ষ হইতে কার্য্য অর্থে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কতকগুলি লোকের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন দেশেই কোন সামাজিক কার্য্য সমাজের আপামর প্রত্যেকের [মতঃ] লইয়া সাধিত হয় না। কতকগুলি শীর্ষস্থানীয় লোক লইয়াই সমাজের কার্য্য নির্বাহিত হয়।

প্রত্যেক গ্রামে বা প্রত্যেক নগরেই কতকগুলি লোক এমন আছেন যাহাদের সকলে সম্মান করে এবং যাহাদের কথা সকলে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে। সেই সকল লোকই সেই গ্রাম বা নগরের সমাজের প্রতিনিধি।

সুতরাং এই সকল ব্যক্তি যদি আপন ক্ষুদ্র সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের সুখ-দুঃখের প্রতি অবহিত হন,—যদি সেই গ্রামের লোকদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহার সুস্থতা প্রাপ্তির উপায় করিয়া দেন,—এবং ভবিষ্যতে যেরূপে শারীরিক নিয়ম পালন করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে পারে তাহা জানাইয়া দেন—সে গ্রামে কাহারও কল্যায় উপস্থিত হইলে সে যাহাতে সে দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে সে জন্ত আগ্রহান্বিত হন—সে গ্রামের নিরাশ্রয় বিধবার যদি অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দেন—সে গ্রামে কাহারও জীবিকা উপার্জনের উপায় না থাকিলে তাহাদের জীবিকার উপায় নির্দিষ্ট করিতে যদি যত্নবান হন—তাহা

হইলে সেখানে সমাজের বন্ধন নিশ্চয়ই
শ্লব্ধ হয়।

মানুষ স্বভাবত কৃতজ্ঞ এবং মনুষ্যত্বের
পূজাপরায়ণ। মহাপুরুষগণের দ্রুত সংগৃহীত
শিষ্যসংখ্যা তাহার প্রমাণ।

অতরাং যদি কেহ ত্যাগ স্বীকার করিয়া
কাহারও উপকার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা
হইলে তাঁহার প্রতি উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞ
হইবেই এবং এই কৃতজ্ঞতাই তাঁহাকে
তাহার উপর শক্তিদান করিবে। এই
অর্জিত শক্তি সমাজকে শক্তিশালী করিয়া
তুলিবে।

তবে ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে সকল
সামাজিক এইরূপে শক্তি অর্জন করিবেন
তাঁহারা অকপটে সে শক্তি সমাজকেই দান
করিবেন—নিজের স্বার্থচিন্তা তাহার মধ্যে
স্থান রাখিবেন না। এই কারণে ধীরে ধীরে সমাজস্থ
জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন,
এবং কোন সামাজিক কল্যাণের কার্য
কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে
ও নিজের ব্যয়ে সম্পন্ন না করিয়া সে জন্ত
সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন এবং
সে কার্য যে সকলেরই কার্য, ইহা সকলকে
বুঝাইয়া দিবেন।

ইহার জন্ত সর্বসাধারণের নিকট হইতে
কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পল্লীভাণ্ডার
স্থাপিত করাই সহপায়। সেই ভাণ্ডার
হইতে সামাজিক-বৃন্দের অভাবমোচনের
জন্ত অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে এবং
সাহায্য-প্রদানের পূর্বে যথাসম্ভব সকলের
অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ কার্য আরম্ভ করিলে সহজেই

সমাজকে সামাজিকবৃন্দের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের
অধিকারী করিয়া তোলা যাইতে পারে।
কারণ সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে কার্যকে
প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তোলা অসম্ভবসাধ্য।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে শক্তি সঞ্চারিত
হইলে সকলকে মিলাইয়া বৃহৎ সমাজ গঠিত
করিয়া তোলা কঠিন হইবে না।

একটা প্রেক্ষাপট মহান আদর্শ জাতির
সম্মুখে থাকা কল্যাণকর সন্দেহ নহে। কিন্তু
আমার বোধ হয় ছোট আদর্শের মধ্য
দিয়া বৃহৎ আদর্শে পৌছানই স্বাভাবিক ও
সহজসাধ্য। জাতীয় উন্নতির এক প্রধান
অঙ্গ—জাতীয় শিক্ষার বিস্তার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
পরিবারের মধ্যে কার্য আরম্ভ হইলে লোক-
শিক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে সংসাধিত হইবার
সম্ভাবনা।

একটা উদাহরণ দিতেছি। আজিকার
দিনে ভারতে না হউক বাঙ্গালাদেশের একটি
অতি প্রধান সমস্যা—হিন্দু মুসলমানের
বিরোধ; বাঙ্গালার লোকসংখ্যার অর্ধেক
মুসলমান, অর্ধেক হিন্দু।

অতরাং বাঙ্গালাদেশে এই বিরোধ
বিদূরিত না হইলে বাঙ্গালার উন্নতি অসম্ভব।
কংগ্রেসে, সভায়, সংবাদপত্রে এই বিরোধ
বিদূরিত করিবার নানা উপায়ের কথা আলো-
চিত হইতেছে। কিন্তু যাহাদের লইয়া প্রকৃত
বিরোধ এই সকল সভাসমিতি তাহাদের
স্পর্শ করে না। বিরোধ অধিকাংশ স্থলে
উভয় জাতিরই নিয়ন্ত্রণী এবং অশিক্ষিতের
মধ্যে। শিক্ষার বিস্তারই এই বিরোধ-
ভঞ্নের এককট উপায়। যদি প্রতি পল্লী-
গ্রামে এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের অগ্রণীগণের

মধ্যে সম্ভাব্য স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা নিজ নিজ সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন তাহা হইলে এই বিরোধ বত অচিরে দূরীভূত হইবে—কংগ্রেসে, সংবাদপত্রে, প্রতি-নিধিনিয়োগে তত শীঘ্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ।

বড় কাজের আদর্শ লইয়া আমরা অনেক কালক্ষয় করিয়াছি, ছোট কাজের আদর্শ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হানি কি ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত ।

সূর্য্যমুখী ।

বিষয়জ্ঞের প্রধান চিত্র সূর্য্যমুখী । হিন্দু-পন্নীর এ আদর্শ হিন্দুর নিকট নূতন নহে, তথাপি কবিকল্পা ও প্রতিভা ব্যতিরেকে আদর্শ এক্ষণে অবয়বসম্পন্ন, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, এবং চিত্রার্পিত হইত না । মাস্থের স্থল ধারণাকে ব্যাধিভাবে, গুণানুভূতিকে সমষ্টি ভাবে, আধারগত ভাবে, ধ্যানের যোগ্য করিয়া, তাহাকে আকার প্রদানেও, কবির ক্ষমতার পরিচয় এবং সে ক্ষমতা যেক্ষণে এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে অসাধারণ বলিতে হইবে । সাবিত্রী ও সীতা সতীর আদর্শরূপে হিন্দুসমাজে পরিচিত । সাবিত্রী পৌরাণিক, পৌরাণিক দেবদেবীর স্তায় পূজিতা না হইলেও, হিন্দু-রমণীর নিকট বিশেষ সমাদৃত । সীতা কেবল সমাদৃত নহেন, জগৎলক্ষ্মীরূপে, ভগবানের অমৃত্যুর নামের অঙ্গভাব, কেবল হিন্দুরমণীর নহে, হিন্দুস্বতন্ত্রেরই পূজিতা । সাবিত্রী বা সীতা, কাহাকেও কাল্পনিক চরিত্র বলিয়া হিন্দু বিশ্বাস করে না । সূর্য্যমুখী আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের চিত্র, পৌরাণিকের গৌরববিহীন । মানবী, তাহাও আবার প্রকৃতিস্তম্ভের আধ্যানগত ।

নহেন । সাবিত্রী সতীত্বের বলে যমের নিকট মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন, হিন্দুরমণী স্বামীর জীবনে ভাগ্যবতী, বৈধব্য তাহার নিকট ভাগ্যহীনতার শেষ-বস্থা, তাই হিন্দুরমণী সাবিত্রীত্ব গ্রহণ করে । রমণীর নিকট সাবিত্রীর যেক্ষণ প্রভাব, পুরুষের নিকট সেরূপ নহে । সীতা জগৎলক্ষ্মীরূপে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই আরাধ্য । পন্নীর আদর্শরূপেও সীতার আদর্শ কম সমাদরের নহে । সীতার সে... সমাদর সাহিত্যজ্ঞের নিকটেই বিশেষভাবে, সকলের নিকট তুল্যরূপে নহে । সাবিত্রী মূলে সাহিত্যের চরিত্ররূপে পরিচিতই নহে । এখন সাবিত্রীর পৌরাণিকত্ব, সীতার দেবতার অবতাররূপিত্ব বাদ দিয়া, যদি সাবিত্রী, সীতা, ও সূর্য্যমুখী, তিনকেই কল্পিতচরিত্র ও আদর্শভাবে তুলনা করা যায়, কাহাকে শ্রেষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে, বলা সহজ নহে । সাবিত্রীর সতীত্বের বলে যে মহদ-দৃষ্ট লাভ হইয়াছিল, তাহাই সকলের নিকট বিদিত ; পন্নীর, বিশেষ পতিভক্তি ও পতিসেবার কার্য্য কি তাঁহার জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত

নহি, বা আমরা সেক্ষেপে কিছু সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া সাবিত্রী-চরিত্রের ধ্যান করি না। জগৎলক্ষ্মীরূপে সীতা, চরিত্রসমালোচনার—পত্নীত্বে তাঁহার স্থান কত উচ্চে এক্ষণে: তর্ক-মীমাংসার;—অতীত, কেননা জগৎলক্ষ্মী যিনি তিনি সর্ব প্রকারেই আদর্শস্থানীয়া, সাহিত্যের চরিত্ররূপেই কেবল আমরা সেক্ষেপে আলোচনা করিবার অধিকারী। সে ভাবেও সীতা নিত্য সাধারণাদর্শ নহেন। স্বামীকর্তৃক নির্বাসিতা হইয়াও, যে সীতা লক্ষ্মণকে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার বিরহে কাতর স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে সীতার পতিপ্রেম ও পতিপ্ৰীতি-কামতা যদি চরমোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত না হইবে, তবে সেক্ষেপে দৃষ্টান্তের কল্পনা আর কিরূপ হইছে পারে? কিন্তু জনকহৃদিতা জানিতেন তাঁহার নির্বাসন পতির স্নেহের অভাব হইতে সংঘটিত হয় নাই, স্বামী রাজধর্ম-প্রতিপালন তৎপর হইয়া, প্রজারঞ্জনানুরোধে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর বঙ্গের কবির কল্পিতা সতী, তাঁহার পতিপ্রেম ও পতিপ্রাণতার আদর্শ, নিজের ভাগ্যহীনতা জানিয়াও, তাঁহার হৃদয়সর্গস্ব, তাঁহার জীবনের একমাত্রাবলম্ব স্বামীকে অস্ত্রে নিরত দেখিয়াও, ক্ষণমাত্র কালের জন্তও পতিভক্তি ও পতিসেবায় শিথিলমনাঃ হয়েন নাই। প্রভূত, সেই স্বামীর সন্তোষের জন্ত, আপনার উদ্যোগে, তাঁহার অভীজিত পাত্রীর সহিত সম্মিলিত করিয়া, আশ্ব-বলিদানে প্রস্তুতা হইয়াছেন। এখানেও কি বঙ্কিমচন্দ্র চিরপরিচিত আদর্শ অতিক্রম

করিয়া উচ্চে আরোহণ করেন নাই? ভ্রমরের পতিপ্রেমও, তাঁহার আজীবন দুঃখের সহিত সমসাময়বর্তী হইয়া, পতির পতিত্ব-লোপের পরেও সমানভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, আদর্শ পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক বিরাগের ভাব, বালিকাস্বভাবসমূহ হইলেও, স্বর্ঘ্য-মুখীর আদর্শের উচ্চে উঠিতে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছে। স্বর্ঘ্যমুখী একদিন স্বামীসমক্ষে, স্বামিনিগ্রহদুঃখপাতর স্বয়ং, অশ্রুশোচন করিয়া স্বামীর অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, আর স্বামীসমক্ষে অশ্রুপাত করিতেন না, আশ্বসারণে অসমর্থ হইলে দূরে গিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়া আসিতেন। সর্বথা সকল অবস্থায়, স্বামীমুখ ও স্বামী-সন্তোষের ধ্যানরতা একপ রমণীরই সাহিত্য-জগতে আমরা আর কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা ভ্রমরকেও আদর্শ হিন্দুরমণী বলিয়াছি, তাঁহার আদর্শ পতিপ্রেমের কথা ভাবিয়া, কিন্তু অভ্যস্তরূপ প্রকৃতির সহিত বাক্য ও বাবহারের ভেদসাহিত্যভাবে ভ্রমর স্বর্ঘ্যমুখীর অনেক নিম্নে, স্বর্ঘ্যমুখী স্বামীর ভুলনায় আপনি যে কেহ ইহা কখনও মনে করিতেন না, ভ্রমরে আশ্বস্বব্যোধ ছিল বলিয়া তিনি সেক্ষেপে আশ্ববিলোপনে সমর্থ হইয়াছেন নাই।

কমলমণি, স্বর্ঘ্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ, তিন জনে মিলিয়া, তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহে উদ্যোগী হইয়া, কিরূপে বিষবীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কবি তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, বলিয়াছেন তথ্যসম্বন্ধে

মানুষের চিরাক্তাবশতই এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ চিরাক্ততা যে অবাজ্ঞনীয় এ কথা বলিতে পারি না। ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের অভাব না থাকিলে, মানুষে ভবিষ্যৎ-দুর্ভাগ্য নিরাকরণ জন্ত উপায়বল্বনে সমর্থ হইত, বা কার্যাবিশেষ, যাহা সে দুর্ভাগ্যের কারণস্বরূপ, তাহা হইতে বিরত থাকিয়া, তাহা পরিহার করিতে পারিত। কিন্তু নগেন্দ্র বা সূর্য্যমুখীর ব্যক্তিগত দুঃখের চিন্তায় অভিভূত না হইয়া, সমাজের মঙ্গল-মঙ্গল চিন্তা করিয়া দেখিলে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর ওরূপ দুঃখের অধীন না হওয়া যে বাজ্ঞনীয় তাহা বলিতে পারি না। দুঃখ ও দুর্ভাগ্যই অনেক সময়ে চরিত্র-মহত্বের ভিত্তিস্বরূপ, উপায়স্বরূপ, হইয়া, চরিত্রোৎ-কর্ষের বিকাশ সাধন করে, মনুষ্যসমাজ সে উৎকর্ষের দৃষ্টান্তে উন্নতি লাভ করিয়া অধিক-তর সুখসৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়। সূর্য্য-মুখীর পত্নীর মহত্ববিকাশ জন্য তাঁহার দুর্ভাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং নগেন্দ্রের সাময়িক চিন্তাবিভ্রম, তাঁহার সাময়িক চরিত্র-চ্যুতি, ব্যতীত অন্তরূপে সে সৌন্দর্য্যবিকাশ সম্ভাবিত হইত না। নগেন্দ্রেরও ভাৰ্য্যা-প্রেমের অকৃত্রিমত্ব, এই ঘটনা দ্বারা, প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বেগবতী স্রোতস্বতীর স্রোতাভাস্তরে প্রতিবন্ধকস্বরূপ দণ্ডায়মান শৈলস্তম্ভ যেমন সে স্রোতবেগের শক্তি প্রমাণ করে, কুন্দপ্রেমরূপ শৈল সেইরূপ নগেন্দ্রের ভাৰ্য্যামুরাগের প্রাবল্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, সে অমুরাগের প্রকৃত প্রবাহ প্রদর্শিত করিয়াছে। মনুষ্যসমাজ ইহাদের ব্যক্তিগত দুঃখ ও দুর্ভাগ্য দ্বারা লাভবান হইয়াছে।

অতএব ইহাদের জীবনের ঘটনা অন্তরূপ হইবার ইচ্ছার কোন প্রকৃষ্ট কারণ দেখা যায় না। তবে ইহাদের জীবন আমাদের এত বিমল সুখের বিধান করিতেছে, যাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের আনন্দগিকে উচ্চতর করিয়া তুলিতেছে, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখবোধ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বোধ হয় এরূপ চিন্তা করিলেই আমাদের সে দুঃখের নিরাকরণ হইবে যে, এই সাময়িক দুঃখ দ্বারা নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীও একভাবে লাভ প্রাপ্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র বুঝিয়াছেন সূর্য্যমুখী তাঁহার কি দরের জিনিস, সূর্য্যমুখী দেখিয়া সুখী হইয়াছেন কুন্দপ্রেমরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার স্বামীর ভালবাসা কিরূপ খাঁটি সোণা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উভয়েই পুনর্জীবনে তাঁহাদের দাম্পত্যসুখের অতি-নবত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং উভয়েই অতিমন্দর ভাবে, কবির অপূর্ণ কৌশল-ক্রমে, এ কথার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থানান্তরে সে কৌশলের ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছি, শবাগুহের দৃশ্যে সূর্য্যমুখীর সরলতা-মূলক চরিত্রসৌন্দর্য্য কিরূপ অপূর্ণ ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা আমরা দেখাইয়াছি, তাহার পুনরুজ্জীবিত নিশ্চয়প্রমাণ।

যাহার বৈরূপ প্রকৃতি তাহার কথার ও কার্যে সর্বত্র তাহা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যমুখী-চিত্রে কবি সর্বত্রই গান্ধীর্ঘ্যের রেখাপাত করিয়াছেন। সর্বস্থলে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা গান্ধীর্ঘ্যবিরোধী, বোধ হয় যে গভীর সে স্বভাবতঃ কিছু গর্জিতও হইয়া থাকে। এরূপ গর্জিত ভাব সূর্য্যমুখীরও ছিল, তাই তিনি তাঁহার

গৃহে প্রতিপালিত পৌরন্দরী-সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না। আবার, তিনি থাকিলে সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত, সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। তিনি অকস্মাৎ পৌরন্দরী-গণের মধ্যে উপস্থিত হইলে, বাজে কথা একেবারে দূর হইত, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিত। এইরূপে, কৌশলবহুল কবি, তাঁহার প্রতি আশ্রয়ের সমস্তম ব্যাংহার দ্বারা, তাঁহার চিত্রে চরিত্র-গাভীরোর রেখা স্পষ্টতর করিয়াছেন। রহস্তেও সূর্য্যমুখীর এই প্রকৃতি প্রতিভাত হইত। সাধারণ রহস্ত তিনি জানিতেন না, ব্যঙ্গোক্তি করিতে গেলেও তাহাতে প্রকৃতি-গাভীরোর ছায়া পড়িত। স্বামীর সঙ্গে কমলের রহস্তালাপ শ্রবণ করিলে, স্বামীর অনুপস্থিতি কালে স্বামী-সন্দর্শন জন্ত কমলের চাকল্যের সহিত সূর্য্যমুখীর সেরূপ স্থলে ধ্যানগত মনঃক্লেশের তুলনা করিলে, এ কথা বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায়, কুন্দকে লইয়া কমলের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছেন, কুন্দের খবর সূর্য্যমুখীকেও জানাইয়াছেন। সূর্য্যমুখী প্রত্যন্তরে কুন্দ-নগেন্দ্র সম্বন্ধে দুই একটি রহস্তাঙ্কি করিয়া, তারারচরণের সহিত কুন্দের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। সে পত্রের আরম্ভ এইরূপ :— “দাদী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি ?” প্রকৃতই তিনি দাসীভাবে স্বামীর চরণসেবার জন্ত সর্বদা ব্যগ্র থাকিতেন।

সাময়িক স্বামীবিবরণে এই খানে তাঁহারও যে হৃদয়গাথা, শ্রীচরণের কর্ণধান হইতে আসিতে বিলম্ব হইলে কমলও হৃদয়ে সেইরূপ অস্থিরতাই অনুভূত করিতেন, কিন্তু কমলের সে হৃদয়ক্লেশ প্রসূরণের প্রণালী ভিন্ন, তাহা তাঁহার নিজ প্রকৃতির উপযোগী। এরূপ স্থলে তিনি থোকা বাবুকে মধ্যস্থ করিয়া কতই না তারল্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্থলাভ্যস্তে, নগেন্দ্রগৃহে, পৌরন্দরী-গণের শাস্ত্রণে, হরিদাসী গৈরবীর গান শ্রবণ করিয়া, কমলমণি ভ্রমজি করিয়া বলিতেছেন, “বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না ?” আবার, “একটা বাবলার ভাল আন ত রে—কাঁটাফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।” সেই স্থলে, সূর্য্যমুখী মুহূর্ত্তাবে হরিদাসীকে বলিলেন, “ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।” সূর্য্যমুখী গৃহিনী, গৃহিনীর গাভীরোর সহিত বৈষ্ণবীকে এ উপদেশ প্রদান করিলেন। আর চিরপ্রেমময়ী, চিরপ্রফুল্লহৃদয়া ও চির-রহস্তপ্রিয় কমলের ভিরঙ্কারের মধ্য দিয়া তাঁহার সেই চিরপ্রেমিকতার, সকলের প্রতি সেই সপ্রেম ব্যাংহারের, প্রতিবিম্ব দেখা গেলেও, তাহার সহিত তাঁহার প্রকৃতি-গত অথচ মৌল্যবোধিত চাপল্য প্রদৃশমান। তরুণী ভ্রমরেও এ চাপল্য ছিল, তাহা কতকংশে কমলের চাপল্যের সহিত এক-প্রকৃতিক, কিন্তু অন্তর্নিহিত এবং সর্বাঙ্গিক নহে, অনেকটা সংযততাবাগম। সূর্য্যমুখীর এই প্রকৃতিগত গাভীরোর যদি কখনও বিচ্যুতি ঘটয়া থাকে, তবে সে কলঙ্কসন্দেহে,

কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁর পরস্ব ব্যবহারে। এ স্থলে তাঁহার একপ ভ্রান্তির অতি স্বাভাবিক কারণও ছিল। সে কারণের অতিক্রম, অতিমাত্রণিক চিত্রশক্তি-প্রকাশক হইলেও, বুঝি বা পতিগতপ্রাণার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইত। স্বামী কর্তৃক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া, এই রমণীরই আপনার হৃদয়মোদন্যের যে পট বিকাশ করিয়াছেন, সে দৃশ্য আমরা এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—সূর্যমুখীকে নিভতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?” সূর্যমুখী বলিলেন, “দিয়াছি।” অনন্তর হীরা ও কোণল্যার যুক্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, “মরুক! তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?”

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্যমুখীর মুখ শুকাইল, সূর্যমুখী অঙ্গুটবরে বলিলেন, “কি বলিয়াছিলাম?”

নগেন্দ্র। “কোন ভুলীকা?”

সূর্যমুখী কিম্বৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন।

বলিলেন, “তুমি আমার সপস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব? কখনও কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন একজন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুখ্যাতি বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।”

তখন সূর্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া শেষ করিলেন, আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া অপনার মরমে আপন মরিয়া আছি, দেশে দেশে তাহার তত্ত্ব লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।”

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, “তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যে রূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী তাহাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?”

সূর্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, বলিতে বলিতে সূর্যমুখী—পতিপ্রাণা সাধবী নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উত্তর চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?”

নগেন্দ্র বলিলেন, “তোমার বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অহরহ।”

সূর্যমুখী নগেন্দ্রের যুগলচরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্ত কমলতুল্য ক্রিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত

করিয়া, সর্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখ প্রতি
চাহিয়া বলিলেন, “কি বলিব তোমার?
আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহা কি তোমার
বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার
দুঃখ বাড়ে এই জ্ঞান মরি নাই। নহিলে যখন
জানিয়াছিলাম, অজ্ঞ তোমার হৃদয়ভাগিনী,
আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের
মরা নহে, যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন
মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে
মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ
লইও না।”

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থির ভাবে থাকিয়া,
শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,
“স্বর্য়ামুখি! অপরাধ সকলই আমার।
তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি
যথার্থই তোমার নিকট বিশ্বাসহস্তা, যথার্থই
আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি
বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে
যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব?
তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্তদমনের চেষ্টা
করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত
আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও
তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা,
আমার চিত্ত বশ হইল না।”

স্বর্য়ামুখী আর সহ করিতে পারিলেন
না, বোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন,
“বাহা তোমার মনে থাকে, থাক—আমার
কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি
কথার আমার বৃকে শেল বিধিতেছে।
আমার অদৃষ্টে বাহা ছিল, তাহা ঘটয়াছে—
আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার
অশ্রাব্য।”

“না, তা নয়, স্বর্য়ামুখি! আরও শুনিতে
হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের
কথা ব্যক্ত করিয়া বলি, কেননা, অনেক
দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি
এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না, কিন্তু
দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর
সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ
নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি
আর কাছে থাকিয়া তোমার ক্লেশ দিব না।
কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-
দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী
থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—
বাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত
কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই
হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি
অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে
স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া
চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে
পারি, তবে আবার আসিব, নচেৎ তোমার
সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।”

এই শেলসম কথা শুনিয়া স্বর্য়ামুখী
কি বলিলেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী
মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন।
পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন।
মাটিতে মুখ লুকাইয়া স্বর্য়ামুখী কাদিলেন
কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের
যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে
দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে
বলিতেছিলেন, সেই ত মরিতে হইবে—
তার আগ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা
আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে
ইহার প্রতিকার করিতে পারি? আমি

মরিতে পারি, কিন্তু তাহা ত সূর্যমুখী
বাচিবে ?”

* * * *

দেওক পরে সূর্যমুখী উঠিয়া বসিলেন,
আবার স্বামীর পাশ ধরিয়া বলিলেন, “এক
ভিক্ষা।”

ন। কি ?

হ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক।
ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া
যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি
মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন।
মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার
করিলেন। সূর্যমুখীও তাহা বুঝিলেন।
তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্তি প্রতি চাহিয়া-
ছিলেন। সূর্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন,
“আমার সর্বস্ব ধন! তোমার পায়ের
কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি।
তুমি পাপ সূর্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে ?
তুমি বড় না আমি বড় ?”—

এরূপ আত্মবিলোপকারী পতিভক্তি
প্রকৃত জীবনে কমই দেখিতে পাওয়া যায়।
সাহিত্যজগতেও পত্নীত্বের এরূপ আদর্শ-
কল্পনা অধিক আছে বলিয়া আমাদের মনে
হয় না। অতঃপর সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে
অন্তঃপুরোত্তানে দেখিতে পাইয়া, “কুন্দ!
এসো—দিনি এসো। আর আমি তোমার
কিছু বলিব না।” এই বলিয়া, তাহার
হস্তধারণ পূর্বক, অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া
গেলেন; লইয়া গিয়া, স্বয়ং উদ্ভোগী হইয়া,
বিধবাবিবাহের বৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে
অসমর্থ হইলেও, স্বামীর ইচ্ছানুসরণ করিয়া,

স্বামীর প্রীত্যর্থ, তাঁহার সহিত কুন্দনন্দিনীর
বিবাহকার্য সম্পন্ন করিয়া, অশ্রুবলিদানের
পরিসমাপ্তি সম্পাদন করিলেন সূর্যমুখী,
তাঁহার পতিভক্তির এই আত্ম-লাপকারী
প্রকৃতিবশতই, বিধবাবিবাহের বৈধত্ব
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পতির
প্রীতিবিধান পত্নীজীবনের একমাত্র কর্তব্য
বলিয়া যিনি জানিতেন, তাহার পতিপ্রেমের
অর্থ পতির প্রতি প্রাণপণ ভালবাসা, পতির
অর্থসন্তোষের জন্য আত্মবিসর্জন, তিনি যে
বিধবাবিবাহ-বিধানকর্তার পাণ্ডিত্যে সন্দেহান
হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয়
কি? তাঁহার এ সন্দেহ সাধারণ হিন্দুপত্নীর
বিধবাবিবাহসম্বন্ধে মত প্রকাশ নহে, ইহা
তাঁহার পতিপ্রেমের প্রকৃতি ও গভীরত্ব-
ব্যঞ্জক। কবি এই সাধারণ কথাটি সূর্য-
মুখীর মুখে তুলিয়া, তাঁহার পতিপ্রেমের
ও পতিভক্তির সেই অনির্বচনীয় নিত্য
ও অবিচলিত ভাব প্রকটিত করিয়া,
অল্প বা সাধারণ কথায় গূঢ়ার্থ হুচনার
ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ নূতন
বিবাহের সংবাদ সূর্যমুখী কমলমণিকে
লিখিয়াছিলেন। কমল অতি ব্যস্ত হইয়া
শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করি-
লেন—তাতা নগেন্দ্রনাথ যে কুন্দনন্দিনীকে
বিবাহ করিয়া সূর্যমুখীর প্রাণহস্তা হইতে
বসিয়াছেন, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া, যদি
এখনও বিবাহ সম্পন্ন না হইয়া থাকে,
এরূপ কার্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার
আশয়ে। কমল জানিতেন স্বামীই সূর্য-
মুখীর সর্বস্ব, স্বামীই সূর্যমুখীর জীবন,
সূর্যমুখীর পক্ষে সে স্বামীকে অস্ত্রে অর্পণ

করিবার উদ্যোগের অর্থ আত্মবিনাশে সংকল্প। তাই কমল, যে সতীশচন্দ্রের মুখ দেখিলে আর সকল কার্য ভুলিয়া যাইতেন, সেই সতীশচন্দ্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া, অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে গোবিন্দপুরের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়া সাহসশূন্য হৃদয়ে স্বর্য্যমুখীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভয় যদি কেহ বলিয়া ফেলে নগেজের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়া স্বর্য্যমুখী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কমল সত্যই তাবিয়া-ছিলেন। স্বর্য্যমুখী প্রাণত্যাগের সংকল্পই করিয়াছিলেন, আত্মহত্যার দ্বারা নহে, কারণ আত্মহত্যা সেরূপ ধীর, গভীর, সচিয়-প্রকৃতির পক্ষে অস্বাভাবিক হইত। স্বর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া, শারীরিক ক্লেশ, অনশনাদি দ্বারা জীবনশেষের অভিপ্রায় করিয়া-ছিলেন। বুঝি বা আত্মহত্যা করিয়া, স্বামীর মুখকান্তি দর্শনের, স্বামীর চরণসেবার, আশা হইতে একেবারে চিরদিনের জন্ত বঞ্চিত হইবার অবস্থার সহিত নিজের হৃদয়কে মিলিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার একপে আজীবনদুঃখভোগে আত্মোৎসর্গের মূলে স্ত্রীস্বলভ অভিমান থাকিয়া থাকিলে, কবি বোধ হয় ইহাও দেখাইতে চাহেন যে, সে অভিমান তাঁহার পতি-সেবার লালসাকে পরাজিত করিতে পারে নাই; অত্ৰ দিকে, সে ডাবের অমৃগামী হইয়া গৃহত্যাগ করায়, অন্তকে স্বামী দান করিয়া সে অবস্থা সহ করিবার অক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়া পতিময়জীবিতার, পতিসর্ব্বরমণীর, চরিত্রের সঙ্গতি বা স্বাভাবিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে।

আপন স্বামীতে স্বর্য্যমুখীর এত পার্থক্য ছিল বলিয়াই, স্বামীর প্রীত্যর্থ সে স্বার্থত্যাগে তাঁহার এত মহত্ব। কমলমণি স্বর্য্যমুখীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া স্বর্য্যমুখীকে এক রুদ্ধ গলাক্ষসঙ্গিধানে অপোবদনে বসিয়া দেখিলেন। পরে স্বর্য্যমুখী উঠিয়া নিকটে আসিলে দেখিলেন, “স্বর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে, নবদেবদারুতুল্য স্বর্য্যমুখীর দেহতরু-ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, স্বর্য্যমুখীর প্রকুল পরপগাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে, স্বর্য্যমুখীর পদাশ্রিত দৌৰ্ব্বাক্ত হইয়াছে।” ইহা দেখিয়া বৃদ্ধিতে বাকি থাকিল না যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখন স্বর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলের চক্ষের জলে স্বর্য্যমুখীর বক্ষ ও কেশ সিক্ত করিতে লাগিল। পরে উভয়ে কথোপকথনে সমর্থ হইলে, এইরূপ কথোপকথন হইল।—

কমল। এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?

স্বর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, “আমি কে?”—মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—বৃষ্টির পর আকাশ প্রান্তে ছিন্নমেঘে যেমন বিজ্যৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন “আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখস্তরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস;—তখন জানিবে তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন স্মরণ

আশায় তাঁকে অল্পনী রাগিব? তাঁহার এক দণ্ডের অস্থখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে। দেখিলাম, দিব্যারাত্র তাঁর মৰ্ম্মান্তিক অস্থখ—তিনি সকল স্থখ বিসর্জন দিয়া দেশভাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার স্থখ কি হইল? বলিলাম ‘প্রভু! তোমার স্থখই আমার স্থখ—তুমি কুলকে বিবাহ কর—আমি স্ত্রী হইব’—তাই বিবাহ করিয়াছেন?”

কমল। আর তুমি স্ত্রী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কঁাকর ফুটয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দেই নাই কেন, স্বামী আমার বৃকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন।

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কমল, কোন্ দেশে যেয়ে হলে মেরে ফেলে?”

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, “যেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তাঁর তেমনি ঘটে।”

সু। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সে সকলও ভূচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল!

সু। তবে এ আশায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আফ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া স্ত্রী—তথাপি বলিতেছ, এ জালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সু। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর স্ত্রী—কিন্তু আমার যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমার পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আফ্লাদ!—

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাগিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মৰ্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, “তোমার পায়ে ঠেলেছেন বলে, তোমার অন্তর্দাহ হইতেছে। তবে কেন বল, আমি কে? তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?”

সু। অনুতাপ করি না।, ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ো? কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল কথা ব্যক্ত হইতে ছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল! অন্তরে অন্তরে কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।—

অতঃপর রোদন সংবরণ করিয়া, সূর্য্য-
 ধুখী কমলমণির সহিত অত্যাশ্রিত কণোপকণন
 করিলেন, এবং গভীর রাত্রে স্নেহভরে
 তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং “বাবা!
 আশীর্বাদ করি, যেন তোমার মায়ার মত
 অক্ষয় গুণে জগবান্ হও, ইহার বাড়া আশী-
 র্কাদ আর আমি জানি না” এই বলিয়া
 সতীশচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া তাহাদিগকে
 বিদায় করিলেন। পরে কমলমণিকে এক
 পত্র লিখিয়া বিছানায় রাখিয়া গৃহত্যাগ
 করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। সে পত্রের
 কয়েকংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

(১)

“যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে,
 আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র স্মৃতি নাই,
 তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগস্ত হইবেন,
 অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই
 মনে মনে শংকর করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে
 আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে
 সমর্পণ করিয়া তাহাকে স্মৃতি করিব।
 কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি
 গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেননা, আমার
 স্বামী কুন্দনন্দিনীর . হইলেন, ইহা চক্ষে
 দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে
 পুনরীর পাটয়া তাহাকে স্বামী দান করি-
 লাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।”

(২)

“—। আমি টাকা কড়ি সঙ্গে
 লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল
 না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া
 চলিলাম—সোণারূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?”

(৩)

“তুমি আমার একটি কাজ করিও,
 আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি
 প্রণাম জানাইও। আমি তাহাকে পত্র
 লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম,
 কিন্তু পারিলাম না—চক্ষের জলে অক্ষর
 দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া
 নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া
 আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—
 আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার
 যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে
 পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না
 বলিয়া, তাহাকে পত্র লেখা হইল না।
 তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর,
 তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে
 দিও। তাহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাহার
 উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলি-
 লাম না। তাহার উপর আমার রাগ
 নাই; কখনও তাহার উপর রাগ করি
 নাই, কখনও করিব না। যাহাকে মনে
 হইলে আফ্লাদ হয়, তাহার উপর কি রাগ
 হয়? তাহার উপর যে অচলা ভক্তি,
 তাহাই রহিল, বত দিন না মাটিতে এ মাটি
 মিশে, তত দিন থাকিবে। কেননা,
 তাহার সহস্র গুণ আমি কখনও ভুলিতে
 পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই।
 এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি
 তাহার দাসী। এক দোষে যদি তাহার
 সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি
 তাহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাহার
 নিকট আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।
 জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম,

ইহাতে জানিতে পারিবে যে, আমি কত
চুখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি।”

(৪)

“তোমার কাছে আমার মত বিদায়
হইলাম, আশীর্বাদ করি, তোমার স্বামী
পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও।
আরও আশীর্বাদ করি যে, যে দিন তুমি
স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন
তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ
আশীর্বাদ কেহ করে নাই।”

উদ্ধৃত প্রথমাংশে সূর্যমুখী তাঁহার
গৃহত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সে
কারণ তাঁহার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন,
তাহা চক্ষে দেখিবার তাঁহার অক্ষমতা,
পতিগতপ্রাণা, পতিসর্বস্বা রমণীর প্রকৃতি-
গত কারণ, তাহার অজ্ঞাভাব স্বভাব-
বিরোধী। কাহার প্রতি দীর্ঘা বা রাগ
তিল পরিমাণেও তাঁহাকে এ গৃহত্যাগ-
কার্য্যে প্রণোদিত করে নাই, কুন্দনন্দিনীর
প্রতি তাঁহার কিছুই দীর্ঘা ছিল না, এ কথা
তিনি, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, স্বামী সঙ্গে
পুনর্নির্গমনের পর, নিজের কথা ও কার্য্য
স্বাগাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি আপ-
নার উদ্যোগে, কমলকে সঙ্গে করিয়া কুন্দকে
দেখিতে গেলেন, বলিলেন “সে আমার
কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার
উপর আমার রাগ নাই। সে আমার
এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।” কুন্দের গৃহে প্রবেশ
করিয়া, কুন্দ বিষপান করিয়াছে দেখিয়া,
রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন, “আমি
এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে এক
দিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার

সুখী হইবামাত্রই এমন সর্বনাশ ঘটবে
কেন?” কি সুন্দর কথা! কি সুন্দর
ভাব! সূর্যমুখী-হৃদয়ের মহত্ব কি সুন্দর
প্রকটিত হইয়াছে! স্বামীর প্রতি রাগ
করিয়া যে সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেন
নাট, উদ্ধৃত তৃতীয়াংশে তাহা স্পষ্টীকৃত।
বরং তাঁহার পরবর্তী কথায় ইহাই প্রকাশ
হইয়াছে যে, তাঁহার গৃহত্যাগে তাঁহার স্বামী
তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি
স্বামীর নিকট আপনাকে অপরাধিনী মনে
করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগসময়ে অজ্ঞ
ভাবের প্রাবল্য তেতু এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে
স্থানান্বিত করিয়া না থাকিলেও, পরে সে
চিন্তা তাঁহার মনঃক্লেশের কারণ হইয়াছিল।
এই অংশে, সূর্যমুখী কত উচ্চাঙ্গের পত্নী ও
রমণী, তাঁহার পতিভক্তি সাধারণ রমণীর
পতিভক্তি হইতে কত উচ্চ স্থাপিত, তাহাও
প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি তাঁহার প্রেম-
রাগের প্রকৃতি ব্যাখ্যানে গুণক-অমুরাগকে
স্থায়ী এবং অতি উচ্চ বলিয়া বর্ণন করিয়া-
ছেন। সূর্যমুখীর পতিপ্রেম সেই গুণাত্মক
হইতে উৎপন্ন, এবং স্বামী-বিদ্বেষে দুর্বলতা
সাম্বী রমণীর পক্ষে সাংঘাতিক, সূর্যমুখীর
হৃদয়ের ফেরে তাঁহার স্বামীতে সেই দুর্বলতার
উদ্ভব হওয়াতেও তাঁহাকে স্বামীচরিত্রের
মুগাবধারণে সমর্থ্য করিয়া, কবি তাঁহাকে
সাম্বী রমণীগণ মধ্যে অতি উচ্চ স্থান প্রদান
করিয়াছেন, উদ্ধৃত দ্বিতীয়াংশের ভাবার্থের
সহিত, এই রমণীর স্থানান্তরে স্বামীর
ভুলনায় আপনাকে যে রূপ অবহেলার শাস্ত্রী
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—“তুমি পাপ
সূর্যমুখীর জন্ত দেশত্যাগী হইবে? তুমি

বড় না আমি বড় ?—তাহার মর্ম সংযোগ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্বামী তাহার হৃদয়ে কিরূপ স্থানাধিকার করিতেন, স্বামীর তুলনায় তাহার নিকট ইহ জগতে আর সকলই কিরূপ মূল্যহীন ছিল। উদ্ধৃত শেবাংশেও তিনি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা সাক্ষ্য রমণীর জীবনের নিরর্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বর্য়ামুখীর গৃহত্যাগ, বোধ হয়, বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীতে বিতণ্ডার বিষয় হইয়াছে। এ গৃহত্যাগের প্রকৃতিনিহিত কারণের উল্লেখ স্বর্য়ামুখী নিজেই করিয়াছেন, এবং আমরাও সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ ও কমলমণির সহিত স্বর্য়ামুখীর কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া পাঠকসমীপে স্বর্য়ামুখীর প্রকৃত বিকাশে আমরা যত্ন পাইয়াছি। কবিও প্রধানতঃ উল্লিখিত ব্যাখ্যালাপ দ্বারাই সে প্রকৃতির বিকাশ সাধন সম্পাদিত করিয়াছেন। স্থলান্তরে, কমলকে পত্র লিখিতে স্বর্য়ামুখী বলিয়াছেন, “পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী, * * * * * পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ; * * * * *” আমরাও, “পতিগতপ্রাণা,” “পতিমাত্র-জীবিতা,” “পতিসর্ব্বদা,” ইত্যাকার বিশেষণ দ্বারা, সেই ভাবই প্রতিফলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। স্বামী সঙ্ক্ষেপে একরূপ ভাবাধিকৃত হৃদয়ে, স্বর্য়ামুখী তাহার একান্ত

বাহ্যিত পতিপদসেবা অত্যাধিকৃত দেখিয়া, অবিচলিত চিত্তে থাকিতে পারিলে, আমাদের বিবেচনায়, তাহার ভাবের পূর্ণতা প্রমাণিত হইত না, সে ভাবের সার্থকতার, তাহার সম্যক আন্তরিকতার, অভাব অনুমিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র প্রাণত্যাগ দ্বারা স্বর্য়ামুখী সে সংশয়ের নিরাকরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু আত্মহত্যা তাহার গান্ধীর্ষ্য-গৌরবের হানিকর হইত, তাহার ধীর সঙ্ক্ষিপ্তপ্রকৃতির সহিত অসঙ্গত হইত, তাহার পতিপদসেবার লালসারও অজ্ঞেয়ই প্রতিপাদিত হইত না। মনুষ্য প্রকৃতি সঙ্ক্ষেপে প্রভূতজ্ঞানসম্পন্ন, স্বন্দর্শী কবি সূত্রাং আত্মহত্যার ব্যাঘ্রা করেন নাই, তিনি সঙ্গতি রক্ষার জন্য অস্তোপায়াবলম্বন করিয়াছেন। আবার সে উপায়াবলম্বনও তাহার কৌশল বুদ্ধি সমৃদ্ধত। স্বর্য়ামুখীর গৃহ-ত্যাগের অর্থ স্বাধীনতাবলম্বন নহে, তাহার অর্থ প্রাণপচয়ের আয়োজন। এ গৃহত্যাগের মূলে স্বাস্থ্যগত অভিমান ছিল না, এ কথা বলা সহজ নহে; কিন্তু সে অভিমানের অর্থ স্বামীর উপর রাগ নহে, তাহার অর্থ আপনার দুর্ভাগ্যজ্ঞানে আত্মনিগ্রহ, চুঃখ-ভোগের জন্য উদ্যোগ। সূত্রাং ইহাতে দোষাবহ কিছু নাই; অথচ গৃহত্যাগ করিয়া স্বর্য়ামুখীর প্রমাণ করিবার অবস্থা হইয়াছিল সে, তিনি কোন অবস্থাতেই স্বামীমুখদর্শন ও স্বামীপদসেবা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। তাহার গৃহত্যাগে নগেন্দ্রনাথেরও তাহার ভাষ্যাবৎসলতা প্রমাণ করিবার সুবিধা হইয়াছিল, অন্তরূপে নগেন্দ্রের সে ভাব অত উজ্জ্বল বর্ণে প্রকটিত

হইতে পারিত না। এ গৃহত্যাগে সে অপূর্ণ কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টি, সে সুন্দর সুখপূর্ণ সুনির্মলনের দৃষ্টি, সে ছায়ানামক পরিচ্ছদের লামগ্রী সংগ্রহ হইরাছে। সূর্যমুখীর পুনরাগনে কমলের শঙ্খধ্বনিপূর্বক সে আনন্দের নৃত্যে কমলচরিত্রের যে মনোহর বিকাশ লাভিত হইরাছে, তাহা কি অশ্রুক্ষেপে সম্ভাবিত হইত? একটা ঘটনা কত সৌন্দর্যের মূলস্বরূপ হইরাছে। কে সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করিবে? কে এ সকল সুন্দর সৃষ্টি চক্ষের উপর দেখিরাও, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে দোষারোপ করিবে?

বিষয়ক কাব্যে, নগেন্দ্রনাথের সকল স্রবের মন্দির, সূর্যমুখীর শব্যাগৃহবর্ণনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; এরূপ সুন্দর বর্ণনা কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্যাগৃহে তাঁহার সেই ছায়াদৃশ্যের অবতারণা কি সুন্দর সৃষ্টি! এই দৃষ্টি সূর্যমুখীর চরিত্র-বিজ্ঞাপক অনেক কথা আছে। সত্যতামা ও তাঁহার তুল্যবস্তুর চিত্রের নীচে সূর্যমুখী সহস্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, “যেমন কর্ম তেমন ফল! আমার সঙ্গে রূপায় তুলা?” উমার কুসুম-সজ্জা দেখিরা সূর্যমুখী একদিন আপন ফুল পারিতে সাধ করিয়া ছিলেন। নগেন্দ্র নিজহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া সূর্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইরাছিলেন। সূর্যমুখী তাহাতে বত স্রবী হইরাছিলেন, কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিরা তত স্রবী হয়? সূর্যমুখী একদিন সুভদ্রার সারথ্যের সাধ পুরাইরা আসিরা, সুভদ্রার চিত্রকে একটি

কিল দেখাইরা বলিয়াছিলেন, “তুই সর্বনাশীই ত বত আপদের গোড়া।” কেননা সুভদ্রার দৃষ্টান্তসরণ করিতে গিরা হঠাৎ গাড়ী কটকের বাহিরে উপস্থিত হওয়ার তিনি বিবম লজ্জার দ্বারে পড়িয়াছিলেন। শব্যাগৃহ নির্মিত হইলে, সূর্যমুখী সহস্র তাহার গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

“১৯১০ সংবৎসরে

ইস্টদেবতা

স্বাণীর স্থাপনা জগু

এই মন্দির

তাঁহার দানী সূর্যমুখী

কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।”

নগেন্দ্র, সূর্যমুখী পরলোকগতা বিখ্যানে, এই শব্যাগৃহে গিরা কত বিলাপ করিতে-ছেন, শব্যাগৃহে জীবিতা সূর্যমুখী কর্তৃক আপনাকে ব্রত উন্নাদগ্রস্ত মনে করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, “গেছে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!” এবং ধরাশায়ী হইরা বাহ মধ্যে চক্ষু লুকাইরা কাঁদিতেছেন। সূর্যমুখী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন, তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন; বলিলেন, “উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিরা বসো—আমি বে এত হুংখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল হুংখের শেষ হইল। উঠ, উঠ আমি মরি নাই। আমার তোমার পদসেবা করিতে আসিরাছি।” কবি বলিতেছেন, “তখন উভয় উভয়ের স্বন্ধে মস্তক ছাপ্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—

কত রোদন করিলেন । রোদনে কি সুখ !”
তাই আমরা বলিমাছি এ ইন্দ্রজাল বুঝা
কঠিন । কুন্দ সূর্য্যমুখীর এই সুখের কারণ
হইবার জন্তই বুঝি তাঁহার হৃৎকের কারণ
হইয়াছিলেন । তবুও নিস্তরু বারিরাশিবক্ষে
শান্তির দৃশ্যে কে বাত্যাভাঙন ইচ্ছা করে,
যদিও বাত্যাভগানে সে শান্তি অধিকতর
অনুভূত হয় !

কল্পনার আদর্শ-সৃষ্টির সম্যক অভিযুক্তি
মহুযাভাষার অসম্ভাবিত মনে করিলে, তাহার
পূর্ণভাব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার জন্ত আমা-
দের কবির একটি বিশেষ প্রণালী আছে ।
যেখানে স্বকীর রেখাপাত ও বর্ণপ্রয়োগে মনের
তৃপ্তি সাধন হয় না, সেখানে তিনি, স্বপ্ন এ
মনের কণিক ভাববিশেষের সাহায্যে, বর্ণিত
চিত্রকে অলৌকিকত্ব বা অতিসামুদিকত্বে
উন্নয়ন করিয়া, তাহার প্রকৃতি পরিষ্কৃত
করেন । এ প্রণালীর প্রথম
অবধারণ সূর্য্য-চিত্রে, ইহার উৎকর্ষসাধন
বা পূর্ণবিকাশ চন্দ্রশেখরের চরিত্রমহত্ব
বর্ণনে । গিরিশুহার চৈতন্ত্যহীনা শৈবলিনী
স্বপ্নে চন্দ্রশেখরের বেরূপ ধ্যান করিতে-
ছিলেন, তাহাতে সেই মহামহিম চরিত্রের
প্রকৃতি বেরূপ বিভাসিত হইয়াছে, কবির
অসাধারণ চিত্রনৈপুণ্যেও যেন সে চরিত্রের
সেরূপ প্রদীপ্তি সাধন হয় নাই । সূর্য্যমুখী-
চরিত্রেরও পূর্ণপ্রকৃতি অবধারণ করাইবার
জন্তই যেন, কবি কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া,
বিশুদ্ধচৈতন্ত্য নগেন্দ্রনাথ, মুদ্রিত নয়নে, সূর্য্য-
মুখীকে স্বর্গাক্রান্ত বিখ্যাসে, এইরূপে তাহার রূপ
ধ্যান করিতেছেন । নগেন্দ্রনাথ দেখিতে-
ছেন, “তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাজী হইয়া
বসিয়াছেন ; চারিদিক হইতে শীতল সুগন্ধ

ঘর পবন তাঁহার অলকনাম দোলাইতেছে ।
চারিদিকে সুস্পন্দিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া
বীণারবে গান করিতেছে । দেখিলেন,
তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটরা
রহিয়াছে ; তাঁহার সিংহাসন-চত্ৰাতপে শত
চন্দ্র জলিতেছে । চারিপার্শ্বে শত শত নক্ষত্র
জলিতেছে । দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক
অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন ; তাঁহার
সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ; অস্ত্রে তাঁহাকে বেজা-
ঘাত করিতেছে ; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলীসঙ্কেতে
তাহাদিগকে নিবেদন করিতেছেন ।” সূর্য্যমুখী
রমণীকুলর রাজা, দেবীপ্রকৃতি, পুণ্যাত্মা,
পবিত্রতা উজ্জলতা ও কোমলতার আধার—
সেই কথাই কবি এ ভাবে অভিযুক্ত করিয়া-
ছেন । নগেন্দ্রনাথ সবন্ধে তিনি জীবিত
যাহা ছিলেন, পরলোকগতা হইয়াও তাহাই
আছেন—নিত্য, অপরিবর্তিত, চিরসুখ ও
শান্তিপ্রদায়িনী ; তাই তিনি অস্ত্রদিগকে
বেজাঘাত হইতে নিবর্তিত করিতেছেন ।
আবার কবি, অস্ত্রের মুখে কথা দিয়া অনেক
সময়ে অনেকটা এইভাবেই চরিত্র বিকাশ
করিয়া থাকেন । সূর্য্যমুখী মরিয়াছেন বিখ্যাসে
নগেন্দ্রনাথ বিবরের দানপত্রাদি প্রস্তুত করার
জন্ত গোবিন্দপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ।
শ্রীশ কমলও সেই স্থানে । কমলমণি শ্রীশ-
চন্দ্রকে সন্মোদন করিয়া বলিতেছেন “এ
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ভাগ করিয়া
গিয়াছেন । তাই বলে, দানদাবু বৈকুণ্ঠে
এসে কি বটপজে শোবেন ?” প্রকৃতই
সূর্য্যমুখী আপনার গুণে সে পুরীকে
বৈকুণ্ঠের জায় পবিত্র সুখের স্থান করিয়া
রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার বিহনে সত্যই
অন্ধকার ও হৃৎযন্ত্রণার পরিণত হইয়াছিল !

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী ।

মানবের জন্মকথা ।

মানুষের খদস্ত চৰ্চণ করিবার পক্ষে উত্তম। কিন্তু ওয়েন বলেন উহার অগ্র-ভাগ ছুঁচল।* তথায় একটি গোল রকম বিন্দু আছে, তাহার বাহিরের দিক কুজ, এবং ভিতরের ভাগ চেপ্টা অথবা কিঞ্চিৎ মূজ, তাহার নীচে সামান্য একটু উচ্চাংশ আছে ; ইহাতেই উহাকে খদস্ত বলিয়া বেশ বুঝা যায়। মিলানীয়ান-বর্গীয় মানবের খদস্তের ঐ ছুঁচলোভাগ বিলক্ষণ স্পষ্ট, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ানদিগের। কর্তনদস্ত অপেক্ষা খদস্তের শিকড় অধিক পুঁতিয়া থাকে, এবং ঐ শিকড় অধিক শক্ত। তথাপিও শত্রুগণকে অথবা শিকারকে ছিঁড়ি-বার পক্ষে এই দস্ত মানুষের কোন উপকারে আসে না। সুতরাং ইহার আসল কার্যো-পযোগিতা বিবেচনা করিলে ইহাকে অকর্মণ্য বলা যায়। মানুষের মাথার খুলি অনেক জুলাই বেখানেই সংগৃহীত থাকে, সেখানেই দেখা যায় যে কতিপয় খুলিতে অস্ত্রা-স্ত্র অপেক্ষা খদস্ত বেশি লম্বা, সুতরাং বাহির হইয়া রচিয়াছে,—যেন উচ্চশ্রেণীর বানরের মত, কিন্তু তাহা হইতে একটু কম। হেকেলও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐরূপ স্থলে অপর দস্তপাটির যথাযোগ্য স্থানে কিছু ফাঁক থাকে। তাহাতেই একপাটির ঐ লম্বা দস্ত অপর পাটিতে থাকিবার স্থান পায়। ওয়াগুন্যার একটি কাফিবের খুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে দস্তপাটির ঐ ফাঁকস্থান অত্যন্ত

প্রশস্ত। যখন মনে করি যে বর্তমানকালের খুলি অপেক্ষা প্রাচীন কালের কত কম-সংখ্যক খুলি পরীক্ষা করা হইয়াছে, তখন তিনটি খুলির খদস্তও যে অত্যন্ত দীর্ঘ থাকে দেখা যাইতেছে, ইহাই কোতুহলের কথা। নওলেট্ চোহালিতে যে খদস্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা ভয়ঙ্কর দীর্ঘ।

উচ্চশ্রেণীর বানরদিগের মধ্যে পুংজাতীয়-গণেরই খদস্ত পূর্ণবিবর্তিত। কিন্তু স্ত্রীজাতীয় গরিলার, এবং কতকটা স্ত্রীজাতীয় ওয়াং-ওটাঙ্গেরও খদস্ত অস্ত্রা-স্ত্র অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। সুতরাং স্ত্রীলোকের খদস্ত কখন কখন দীর্ঘ হইয়া থাকে বলিয়া পুরুষের খদস্তের অতিবৃদ্ধিকে বানরবৎ পূর্ণপুরুষগণের খদস্তের পুনরাবর্তন বলিয়া বিবেচনা করিবার বিশেষ বাধা দেখা যায় না। যিনি তাঁহার নিজের খদস্তের আকৃতি, এবং অন্য কতিপয় খদস্তের কখন কখন অতিবৃদ্ধি দেখিয়া, উহাদিগকে আমাদিগের চিরাতীতকাণীয় পূর্ণপুরুষগণের ভয়ঙ্কর অস্ত্ররূপ খদস্তের পুনরাবর্তন বিবেচনা করিতে, যুগা বোধ করেন, তিনি সম্ভবতঃ ঐ যুগাবশতঃ দস্ত-পাটি বিকাশ করিয়াই স্বকীয় প্রাচীন বংশা-বলী প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন। কারণ এই সকল খদস্ত যদিও তিনি আর অস্ত্র-রূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম মনে, এবং ইচ্ছাও করেন না, তথাপি তিনি নিজের^৪ অস্ত্রাত্মকতারও দস্তবিকাশের আবশ্যকীয় পেশি সংকুচিত করিয়া যেন আক্রমণ করি-বার ভাবে দস্ত বাহির করিবেন; কুকুর

* খুঁচল।

আক্রমণ কালে যে ভাবে বাহির করে, সেই ভাবেই করিবেন !

বানর এবং অন্তঃসত্ত্বাপারী জীবের যে সকল পেশি সচরাচর থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি সময় সময় মানুষেও দেখা যায়। অধ্যাপক ভ্রাকোভিক্ চল্লিশটি নরদেহ পরীক্ষা করিয়া উনিশটিতে ইক্কিও পির্ভরিক নামক পেশি পাইয়াছিলেন। ঐ নাম তিনিই দিয়াছেন। অশিষ্টগুলির মধ্যে তিনটিতে ঐ পেশির স্থলে এক একটি বন্ধনী পাইয়াছিলেন ; এবং বাকি আঠারটিতে উহার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হন নাই। ত্রিশটি নারীদেহ পরীক্ষার কেবল দুইটিতে ঐ পেশি উভয় পার্শ্বেই পাইয়াছিলেন, আর তিনটিতে উহার স্থলে এক একটি অব্যবহার্য্য বন্ধনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই পেশি নারী অপেক্ষা নরদেহেই বেশি স্থলে দেখা যায়। মানুষকে কোন নিম্নতর জীব হইতে হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিলে, এই কথা বোধগম্য হয়। কারণ ঐ পেশি অনেক নিম্নতর জীব-দেহে পাওয়া গিয়াছে, এবং উহাদিগের মধ্যে কেবল পুংজাতীগণেরই ইহা প্রধানতঃ ক্রিয়ার সহায়তা করে।

মিঃ উড্ তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধাদিতে মানবীয় পেশির অনেকগুলি পরিবর্তন পুঙ্খ মুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সকল পেশি নিম্নশ্রেণীর জীবের দেহে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের নিকট-আত্মীয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বানরগণের দেহে যে সকল পেশি সর্বদাই দেখা যায়, তদনুরূপ পেশি মানবদেহে এত অধিক আছে যে, এ স্থলে তাহাদিগের উল্লেখ

করাও হুঃসাধ্য। একটি নরদেহে সাতেরুটি পেশি-পরিবর্তন পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই বানর-দেহে সর্বদা দেখা যায়। ঐ নরদেহটি বেশ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট ছিল, এবং উহার মাথার খুলিও বেশ পূর্ণ গঠিত ছিল। ঐ নরদেহটিতে গলার দুই পার্শ্বেই সবল এবং আসল লেভেটার ক্ল্যাভিকিউলী নামক কর্ণাহি উত্তোলনকারী মাংশপেশি ছিল; তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর বানরেরই থাকে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ৬০ জনে এক জনের মাত্র দেখা যায়। উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বানর-গণের পারের কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর ভাগের দীর্ঘাঙ্গুর * সতি যে পেশি হাঙ্গলি ও ফ্রাওয়ার সর্বদাই সংলগ্ন দেখিয়াছেন তাহাও ঐ নরদেহে ছিল। আমি আর দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। খুলির নিম্নভাগের স্বকর্ষ্য পরিচালক পেশী মানবের সমস্ত সত্ত্বাপারী জীবেরই আছে, বোধ হয় চতুস্পদের মত চলাফেরা করার সঙ্গে ঐ পেশির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু উহা মানবের মধ্যে ৬০ জনে এক জনের থাকে। মিটার ত্র্যাত্তলি মানুষের উভয় পক্ষেই প্রদাহি-পরিচালক পেশি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার পূর্বে উহার অস্তিত্ব জানা ছিল না। কিন্তু এই পেশি উচ্চশ্রেণীর বানরের সকলেরই পারে থাকে। মানবের হস্ত এবং বাহ্যর পেশি সকল অনন্যসাধারণ, কিন্তু উহারাও অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, তজ্জন্ত ইতরজীবগণের হস্ত ও বাহ্যর পেশির তুল্য আকার প্রাপ্ত হয়। এই ঐক্য কখনও সম্পূর্ণ, কখনও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যখন অসম্পূর্ণ থাকে, তখন মানবের

* পারের পাতার অস্থি।

এবং ইতরজীবের ঐ সকল পেশির মাঝ-মাঝি একটা আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোন কোন পরিবর্তন জীলোকেরই বেশি দেখা যায়, কোন কোন পরিবর্তন পুরুষেরই বেশি হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। মিঃ উড্ বহু পরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া অবশেষে এই সারণ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—“পেশি সকলের সাধারণ আকৃতি অপেক্ষাকৃত বিশেষ পরিবর্তন হইলে তাহা নির্দিষ্ট প্রণালিতে অথবা নির্দিষ্ট পথেই হইয়া থাকে; ইহার এমন কোন অজ্ঞাত কারণ অবশ্যই আছে যাহা বুঝিতে পারিলে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক ভাবে গঠনবিদ্যা (Anatomy) বুঝিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

এই অজ্ঞাত কারণই পুনরাবর্তন, অর্থাৎ কোন পূর্বতন জীবদেহের গঠনপ্রণালীর পুনরাবৃত্তি,—এ কথা অতীব সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। মানবের সাতটি পেশি অকস্মাৎ বিকৃত হইয়া বানরের পেশির জায় হয়, ইহা সম্পূর্ণ অবিবাসযোগ্য! বংশগত সম্বন্ধ না থাকিলে এরূপ হওয়া বিশ্বাস করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি মানব বানরের জায় কোন জন্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে

বহু সহস্র বৎসর পরেও কোন কোন পেশি কেন পুনরাবিভূত হইবে না, তাহার কোনই কারণ বুঝা যায় না। অথ, গর্ভিত ও খচ্চরের পদবৃত্তিতে এবং স্বল্পে কখন কখন হঠাৎ ক্রমবর্ণ রেখা, বহুশতাদি অপবা সম্ভবতঃ বহু সহস্র বৎসর পরেও, উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; মানবেরও তদ্বৎ।

এই সকল পুনরাবর্তনের দৃষ্টান্ত এবং প্রথম অধ্যায়ের লিখিত অব্যবহার্য্য অঙ্গ-সকলের দৃষ্টান্ত এরূপভাবে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট যে প্রথম অধ্যায়েই ইহাদের উল্লেখ করিলেও চণ্ডিত। শৃঙ্গযুক্ত মানবীর জরায়ু অপূর্ণ অবস্থাতেই আছে, অথচ তাহাই অপর কোন কোন স্ত্রীপায়ী জীবের জরায়ুর সাধারণ ও পূর্ণাবস্থা। কোন কোন দেহাংশ-যেমন পুরুষের ত্বন ও স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কোকিলচকু অস্থি, মানবের অব্যবহার্য্য হইলেও সর্বদাই দৃষ্ট হয়। অস্থির নিয় ভাগে যে ছিঁকি-কণ্ড উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও কখন কখন দেখা যায়; সুতরাং তাহা পুনরাবর্তনের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল পুনরাবর্তিত অঙ্গ, এবং অব্যবহার্য্য অঙ্গ, নিয়প্রাপী হইতে মানবের জন্মের কথা অজ্ঞানরূপে বিবৃত করিতেছে। (ক্রমশঃ)
 শ্রীশশধর রায় ।

মথুরায় ।

১

“সত্যি তবে তোমার এই মাসেই বিয়ে হবে?” “হ্যাঁ, ভাই, শ্রাবণমাসেই হবে শুনচি, তোর কবে বিয়ে হবেয়ে সত্যি?”

একদিন বর্ষাকালের সন্ধ্যাবেলার বধন নীল আকাশের কোথাও একটুও মেঘশূন্য ছিল না, বধন কূলে কূলে ভরানদী ঘুয়ারে শস্তক্ষেত্রের উপর ফুটন্ত কটাহপূর্ণ দুধের

মত উথলাইয়া উথলাইয়া পড়িতেছিল, বধন আসন্ন বস্ত্রার হাত হইতে রক্ষা করিবার আশায় চাবারা সশঙ্কিত দৃষ্টি নদীর প্রত্যহ-বর্ধিত জলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রাশি রাশি ভূট্টা ও মাড়ুরার গাছ গরুর গাড়িতে বোকাই দিতেছিল, সেই সময় বাঘনাতীর তীরে বসিয়া মুক্তিকায় পিতলের কলসী মাজিতে মাজিতে একটি বালিকা তাহার বালক সঙ্গীকে এই প্রশ্ন করিল। রঘুনাথ গাছভাঙ্গা টাটকা ভূট্টা শিকে বিধাইয়া চাষাদের তামাক খাইবার আশুপোড়াইয়া আনিয়াছিল। মতিয়ার জন্ত কিছু কৌচড়ে রাখিয়া গরম গরম ভূট্টা পোড়া বিনা লবণেই পার করিতে করিতে মতিয়ার নিরুদ্যম মুখের দিকে চাহিয়া সগর্বে বলিল “সব্বাই বলচে আমার যে বউ হবে সে তাই খুব সুন্দর খুব সুন্দর হইবে, তারা সহরে কি না!—বিরের সঙ্গের আমাকে কত গয়না দেবে, খুব মজা হবে তাই, তোর খুব আফ্লাদ হচ্ছে না?” মতিয়া মুখ ফিরাইয়া জোরে জোরে কলসী মাজিতে মাজিতে ভগ্নকণ্ঠে কহিল “তোমার বিয়ে হলে আর কি না তুমি আমার কিছু দেবে? পেররা টেয়রা সব এয়ার থেকে বউকে দিয়ে দেবে, আমার কেমন করে আফ্লাদ হবে?” রঘুনাথ একটা ভূট্টা শেষ করিয়া দ্বিতীয়টার মনঃ-সংযোগ করিতেছিল, সে হাসিয়া উঠিয়া পরিত্যক্ত ভূট্টাটা অভিযোগকারিণীর প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল ও সকৌতুকে বলিয়া উঠিল “হু বউকে বুঝি আমার লজ্জা করবে না? বউএর লগে বুঝি আমার কথা কইতে

আছে? পেররা টেয়রা সব তাই তোকেই দোব, খালি একটা বউ হবে, আর গয়না টয়না হবে, বেশ হবে না!” ঈর্ষাগভীর মুখ প্রফুল্ল করিয়া মতিয়ার প্রতিশোধ স্বরূপ এক আঁজলা জল সঙ্গীর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। রঘু কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল “পোড়ারমুখী, আমার কাপড় ভিজিয়ে দেওয়া হলো, দাঁড়া তো তোকে দেখাচ্ছি মজা।”


২

রঘুনাথের বিবাহ হইল সহরে। তাহার স্বপ্তর কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির উপাধি-ধারী অজকোটের একজন উকিল। চাল-চলনেও অনেকটা তিনি নিজের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই জন্ত কাছাকাছির লোকেরা কেহই তাঁহার কত-গ্রহণে সম্মত হয় নাই। মধ্যে শিবশঙ্কর একবার একটি শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবককে কস্তাদান করিয়া বাঙ্গালী বেহারীর সম্মিলনের পথে ঈষৎ অগ্রসর হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এ মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইল না; বরং এই সংবাদে শিবশঙ্করের জ্ঞাতি বন্ধুগণ একেবারে আগুণ হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার বুদ্ধা পিতামহী অশ্রুজল ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইলেন। সংসারে অনেক শুভ সংকল্প এমনি করিয়া রোযানলে তন্মীভূত ও অশ্রুপ্রবাহে তাসিয়া যায়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে শিবশঙ্কর দূরগ্রামস্থ জমীদার বিশ্বেশ্বর প্রসাদের অশিক্ষিত কিশোর পুত্র রঘুনাথের হাতে তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্তা জ্যোতিষবর্ষীয়া কস্তা চন্দন-কুমারীকে সমর্পণ করিয়া অবিবাহ্যকারিতার

কলতোগবস্ত্রপ অহুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । মেয়ে খণ্ডরবাড়ী হইতে ফিরিয়াই দর্পণের সাহায্য ললাট ও শিখি-
লিষ্ঠ সিন্দুর মুছিয়া খণ্ডর শতদ্বিষ্য দেওয়া
‘আ-বাহ লাঠিয়া ভাঙ্গিয়া, পায়ের তোড়া
পাঁটোয়ার খুলিয়া, রাগিয়া, কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা
করিল, সেই অসভ্য, অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন
খণ্ডরগৃহের শাসনবন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে
সে এ জন্মে আর কখনও সেখানে যাইবে না ।
অভিমানে ঠোঁঠ ফুলাইয়া চোখের জলে
ভাসিতে ভাসিতে পিতাকে গিয়া নালিস
করিল—“বাবা আমাকে তবে কেন তুমি
লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন ?” মাকে বলিল
“মাগো তাদের মাটি বাড়ী, মড়ির খাটিয়া,
সে ব্যে কি আমি থাকতে পারি ! আর
একদিন থাকলেই আমি মরে যেতুম, আর
কখনও সেখানে যাকি না ।” শিবশঙ্কর
দেখিলেন মেয়েকে উপযুক্ত পাত্র দিতে না
পারিয়া, বড় সঙ্কটই করিয়াছেন । বেহাইকে
লিখিতে লাগিলেন “রঘুনাথের লেখা পড়া
শেখার বিশেষ প্রয়োজন, তাকে আমার
কাছে পাঠান ।”

প্রথমটা গোপীনাথও একমাত্র পুত্রের
নিরহ সঙ্ক করিয়া তাহার উন্নতির পথ যুক্ত
করিয়া দিতে সম্মত হয় নাই, অবশেষে মূর্খ
গোপীনাথ বৈবাহিকের মুক্তি গ্রহণ করিয়া
পুত্রকে তাহার খণ্ডরগৃহে পাঠাইতে রাজী
হইল । রঘু সংবাদ শুনিয়া বতটা খুসী
হইল, তাহার মা ও মাতামহী তেমনিই
অসন্তুষ্ট হইলেন, রঘুর মা রাগিয়া বলিলেন
“সহরের ডাকিনী-বয়ে এনে এই হলো !
যখন দেখেছি বউ ফিরিদী মেয়েদের মতন

খোঁপা বাঁধে, বাঙ্গালীদের মতন সাড়ি পরে,
খড়কে দিয়ে সিন্দুর লাগায়, তখনি জেনেছি
ছেলের আমার মঙ্গল নেই ! ছেলে আমি
ছেড়ে দোব না ।” কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি
টিকিল না, গোপীনাথের কুটিরে একদিন
তাহার বৈবাহিকের পদগুলির সঙ্গে সঙ্গে,
তাহার পুরবাসিনীদের মরাকান্নার মধ্য
দিয়া, রঘু খণ্ডরালয়ে চলিয়া গেল ।
বৈবাহিকের “অভ্যর্থনার সখের গালি”
তাঁহার মস্তকে অজস্র অতিশয়ের ধারায়
মতন পশ্চাৎ হইতে বসিত হইতে লাগিল ।

রঘুর উৎসাহ ও আনন্দের প্রথম আবেগ
মতিয়ার অশ্রু স্নান করণ দৃষ্টিতে জীবৎ
প্রতিহত হইয়া আসিল, দ্বারের পিছন হইতে
সে মুখ বাড়াইয়া অজস্র বারার কৌণদৃষ্টি
নিঃশব্দে রঘুনাথের মুখে স্থাপিত ক্রিয়া
রাখিয়াছিল । খণ্ডরের হাত নাড়াইয়া রঘু
নিকটে আসিয়া দুই হাতে,  আনি
আদরের সঙ্গে ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল
“কাঁদিস্ নে মতিয়া, আবার আসবো, আবার
আমাদের খেলা হবে, মাছ ধরা টরা সব হবে ।”

“মা রঘু তুমি যেও না, বউ তোমার আর
আসতে দেবে না, কি হবে রঘু তুমি যেও
না ।” রঘুনাথ সন্তোষে বলিয়া উঠিল “ই-স্ বউ
আমার সঙ্গে পারবে কি না, তুই কেন ভয়
করিস্ ? বউ খেলাটেলা জানে না, খালি বই
পড়ে, তার সঙ্গে কিছুতে মিল হবে না, ঠিক
চলে আসবো ।”

রঘুনাথ ছটার দিনের মধ্যেই বুঝিল,
সে সহরের চেয়ে তাহার গ্রাম্য জীবন
শতাংশে ছিল ভাল; সেই পাছে পাছে পেরান
আম ও জাম পাড়িয়া বেতান, জলে পড়িয়া

ছ তিন ঘণ্টা নদী উণোটপালট করিয়া সন্ধ্যার সহিত সাতার কাটা, তীরে বসিয়া মাছধরা, ভুট্টাক্ষেত্র হইতে তাজা ভুট্টা ভাদিয়া সন্ধ্যাবেলা আনন্দ ভোজন, পাখীর বাসা হইতে শাবক ও চাবীর ক্ষেত হইতে শশা চুরি, অবাধ স্বাধীনতার সহিত মুক্ত বিচরণ ও সব চেয়ে বাণ্যসজিনী মতিয়ার সহিত খেলা-ধুলা ও বিবাদ-কগহ এ সকলের পরি-বর্তে বন্দীর মতন জনমুখরিষ্ঠ নগরীর মধ্যবর্তী বন্দীশালায় জায় গৃহে বাস, নিয়মিত পরিমিতাহারাস্থে পাড়ি চাপিয়া জ্বলে গমন, এখানে সন্ধ্যার কঠোর কর্তব্য-পরায়ণ শিক্ষকের নিকট পাঠাভ্যাস এবং রাতে মিতভাবিনী শিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গ তাহাকে বেন মর্শের মধ্যে পৌড়ন করিতে লাগিল। বনের হরিণকে গৃহে আনিলে সে যেমন নিরস্ত্র হস্তে ধরাইয়া আনিতে চাহে না, গ্রাম্য বাসিন্দার মতন তিনিও ভীত ভেমনি পরাধীনতার কঠিন বন্দন-বন্ধ থাকিয়া হাঁক-ইয়া উঠিতেছিল। রঘু সকলকার আদর মেহ ও একান্ত সাবধানতার ভিতরে থাকিয়াও দিন দিন মনের ক্ষুধা ও শরীরের বল হারাইতে লাগিল, এত বহু এত আগ্রহ জাবাইয়ের মনকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া শিবশঙ্কর ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, প্রতিবেশিনী একজন বঙ্গ-মহিলা শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন “জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা।” তা কি করবে দিদি ও রকম হয়েই থাকে।” চন্দনও বানীর অগ্রমনস্কতা দেখিয়া অনেক সময় রাগ করিয়া হুঁচর কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না, মধ্যে মধ্যে

নিজেও অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিত, কিন্তু তাহাতেও বানীকে অবিচলিত দেখিয়া শেষে নিজেই বাচিয়া আবার কথা কহিত।

অবশেষে এক দিন আর থাকিতে না পারিয়া রঘু স্বতন্ত্রক মুখ ফুটিয়া বলিল “আমি বাড়ী যাবো” শিবশঙ্কর আদর করিয়া কহিলেন “কেন বাবা এখানে কি কষ্ট হচ্ছে?” রঘু ঘাড় নাড়িল “ই।।” শিবশঙ্কর দুঃখিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন “কি কষ্ট হয় বলো, আমি যাতে কষ্ট না হয় তাই করে দোব।” রঘু একটুখানি ভাবিয়া মাথা নাড়িল “না আমি বাড়ী যাবো, আমার মা বাবা আর মতিয়ার জন্ত বড় মন কেমন করছে, মতিয়া যে আমার শিগ্গির করে বেতে বলেছিল—” রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। শিবশঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মতিয়া কে? আমি তো কই মতিয়াকে দেখিনি।” রঘু চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল “আপনি মতিয়াকে দেখেন নি?” পরে একটু ভাবিয়া বলিল “সে এক্যানদের একটি মেয়ে,—ছোট, আমার চেয়েও ছোট, আমি তাকে খুব ভালবাসি, সেও আমার ভালবাসে। চন্দনের মতন কুঁহলে নয়”—শিবশঙ্কর একটু আশ্চর্যভাবে কহিলেন “কেন চন্দন কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বড় অজ্ঞান তো! ছেলে মানুষ, আজ্ঞা আমি বারণ করে দোব এখন।” রঘু ক্রুদ্ধিত করিয়া কহিল “ছেলে মানুষ। ইয়া বড় তো ছেলে-মানুষ! আমার ওকে ভাল লাগে না, আমি বাড়ী যাবো।” শিবশঙ্কর বিস্মিত হইয়া

উঠিলেন, “আচ্ছা তোমার বাবাকে চিঠি লিখি
আসে, তিনি বলেন তো পাঠিয়ে দেবো।”
শিবশঙ্কর কত্নাকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ
দিলে সে রাগিয়া গেল, রঘুর পড়িবার বয়ে
আসিয়া চোখ মুখ লাগ করিয়া বসিল,
“আমার নামে বাবার কাছে লাগানো
হয়েচে, আমি তোমার কি করেছি?” রঘু
চন্দনকে ভয় করিত, ধতমত খাইয়া
গেল, ভীত ভাণে উত্তর দিল “তুমি তো
ঝগড়া করো, তাই বলেছি বৈ তো না!”
“জানি জানি আমার কথায় তোমার
গায়ে ফোকা পড়ে কি না, মতিয়ার কথা খুব
মিষ্টি! বলা তো তুমি, মতিয়া মরিয়া করো
যে অতো—” রঘু সরণ চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে
কহিল “আনি যে তাকে ভালবাসি—” “কি?
তুমি তাকে—সেই ছোটলোকের মেয়েটাকে
—ভালবাসো আর আমার একটুও ভালবাসো
না; আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে আমি আর
কখনো তোমার সঙ্গে কথা কবোনা তো”
রঘু দীর্ঘ বিরক্ত হইয়া কহিল “তুমি শুধু
শুধু বডঝগড়া করিতে ভালবাসো। কেন
তুমিও তো ছোট লোক, তোমাকে তবে
সবাই কেন ভালবাসে? তারি বেলায়
বুনি যত লোক, তুমি তাকে হুচক দেওতে
পারো না, সে তোমার কি করেছে?” “কি
তুমি আমার ছোট লোক বলে? যাকি
দাঁড়াও মার কাছে!” চন্দন কী দয়া কাটিয়া
বুরুক্ষেত্র করিল। মার কাছে নালিস
করিয়া পিতার কাছে উঠাইয়া তারপর কিছু
ক্ষণ পরে আগার নিজেই আসিয়া স্বামীর
সহিত যাঁচিয়া ভাব করিল। রঘু সে দিন-
কার হাস্যামার পর হহতে মতিয়ার নাম

চন্দনের সম্মুখে বড় একটা করিত না! কিন্তু
তাহার অভাব ভিতরে ভিতরে তাহাকে
সর্বদাই পীড়ন করিতেছিল।

৩

তারপর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।
রঘুনাথ এখন আর অসভ্য অশিক্ষিত পাড়া-
গেঁয়ে বালক নয়। তাহার এলবার্ট টেরি,
সিকের পাঞ্জাবী ও ভুলুটিত উড়ানির বাহার
দেখিয়া সেট রূপার পদক ও সোণা মোড়া
খোটা বালা পরা হুটপুট গ্রাম্য রঘুর কথা
কাহারও আর মনেও পড়ে না। তাহার দেহ
ও রুচির সাহস বুদ্ধিজ্ঞানও অনেকখানি
মার্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ির কথা আর
তাহার বড় একটা মনেও পড়ে না, পড়িলেও
লেখানের উপর আবর্জনাটা কমিয়াই
গিয়াছিল। পিতা ছতিন বার লইতে
আসিয়া পুত্রের অনিচ্ছা দেখিয়া কিছু
গিয়াছেন, শ্বশুরও আনা হাটু মার
মাটির বাড়ীর ড্যান্স লাগিয়া পড়ে
অগ্রণ করে সেই ভয়ে বাইতে দিতে সম্মত
নহেন। এবার দৈবগতিক পুরা বর্ষার
সময়েই রঘুনাথকে শিশু সম্মীক বাড়ী
আসিতে হইল—ঠাং সাত দিনের অরে
রঘুর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল।—সঙ্গে কতি
ছেলে, তাহার ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে স্পিরিট-
ষ্টোভ, হরলিক্স মিক্স, বিকুট প্রভৃতি সঙ্গে
থাকা সবেও খাদ্যাভাব এবং এই সেং-
সেঁতে বাড়ী, দড়ির খাটিয়া, খাণ্ডড়ির দিন
রাত কান্নাকাটি, আত্মীয়বর্গের হা হতাশ,
তাহার উপর আবার আনোয়ারের মতন
অসভ্য লোকগুলার তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা
করিয়া ফেলিবার সন্দেহত্বল আগ্রহ, এই

সকল বিবিধ কারণে চন্দনকুমারী ভারি জ্বালাতন হইয়াই উঠিল এবং তাৎকালে এমন জ্বরগায় সঙ্গে করিয়া আনা যে রঘুনাথের নিগন্তই অর্ধাটানতা হইয়াছে, তাহা অসন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতে ক্রটি করিল না। রঘু না এত দিন পরে ছেলেকে পায়ে দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ভাসিতে লাগিলেন, কিন্তু বধুর ভয়ে কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। বথাসময়ে শ্রদ্ধা প্রভৃতি হইয়া গেল, সস্ত্রীক রঘুনাথ ফিবিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। রূপণ পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এবার রঘুনাথ খণ্ডরালয়ের নিকট পৃথক বাড়ী ভাড়া লইবে তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। শুনিয়া তাহার মা কহিলেন “আমাকেও নিয়ে ১ বাণা, এখানে কাকে নিয়ে থাকবো?” রঘু ইত্তর করিল “বেশ তো” কিন্তু চন্দন শুনিয়া রাগ করিতে লাগিল বলিল “তা তুমি আর তোমার মা থেকে, আমার বাপের বাড়ীতেই স্থান হবে; হরিণে।” কিছু দেখে সবাই হাসবে, কিন্তু একজন মাত্রে থাকতে পারবো না।” রঘু তাঁহার সহিত মাকে আনাইল—সে বাড়িতে যত কম তা তিনি গেলে না হয় সে নিজে নীচের ঘরে শয়ন করিয়া তাঁতাকে ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে, থাকার জন্য একটা মুসলমান আশা আনাইবার কথা ছিল তা না হয় তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা এখন স্থগিতই করিবার চেষ্টা করিবে।

উৎপ্লিত অভিমান রুদ্ধ করিয়া বিধবা মলিত ঘরে কহিলেন—“থাক, কাজ নেই সে সব, তোমাদের কষ্ট হবে, আমি এখানেই থাকবো।” মনের মধ্যে একটুখানি লজ্জাগোধ করিলেও রঘু তাঁতাকে একটু সান্ত্বনাও দিতে পারিল না। সীতামারি হইতে ফিরিয়া ষাটবার পূর্ণদিন বৈকালে চন্দন আমীর সহিত নদী তীরে বেড়াইতে গেল। এসব বিষয়েও সে লোক গল্পনা গ্রাহ্য করিত না। বলিয়াছি, তখন বর্ষাকাল; পূর্ণের মতন এবারও বায়ুমতী জলে উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠিয়াছে, ছুঁধারের শতক্ষেত্র সকল ভাগাইয়া দিয়াছে। জল দেখিতে দেখিতেই ঘন তর তর করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল—বায়-মতীতে বজ্রা আসিয়াছে। মাঠ জনশূন্য-প্রায়, গাছগুলি বৃষ্টিধৌত হইয়া গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছিল। জলের মধ্য হইতে কোথাও ছোট ছোট জনেরা ভুট্টার গাছ মাথা উঁচু করিয়া আছে, কোথাও সারগাছের সাদাফুল জলের উপরে জলতরঙ্গের মতন বাতাসে কাঁপিতেছে। রঘুনাথ চন্দনের হাত ধরিয়া বেড়াইতে একটা পুষ্পিত মহা গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল, ফুলে ফুলে গাছটার সবুজ পাতাগুলো হায় দেখা যাইতে ছিল না, এবং মহারার তীব্র গন্ধে মোন চরদগ আকুল হইয়া বহু দূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। চন্দন মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে গিল—“বাঃ, নদীটি বড় সুন্দর তো! এদেশেও এমন জায়গা আছে!” রঘু হাসিয়া কহিয়া কহিল—তা আছে বই কি, কোথাও কেবল বন থাকতে পারে না। এই আমার ছোট বেলার খেঁচর জায়গা”—বলিতে বলিতে তাহার স্মৃতি মন্দিরের কঙ্ক কপট যেন সহসা খুলিয়া গেল।

বিদায়ের সময়ে রোক্তদ্যমান জননীৰ পার্শ্ব রঘু একখানি পুরাতন পণ্ডিত মূখ দেখিল! খুকীকে কোলে লইয়া—ও কে? মতিয়া নয়? মতিয়াই ত! রঘুর প্রশ্নে কে বলিল—চিন্তে পাও না? মতিয়াই যে বড় অশ্রু, তোমরা যাক বলে ও কোন রকমে দেখতে এসেছে!” এণ্টু অপ্রতিত হইয়া মতিয়ার চক্ষের দিকে চাহিয়া রঘু বলিল,—কেমন আছি? মতিয়া? তোর কি আজও বিয়ে হয় নি?” মতিয়া কোন উত্তর দিল না, তার ম্লান মুখে, প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল—সে ভাড়াভাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল “চোখে কি পড়িল বুঝি”—

“ট্রেণ ফেল করবে না কি?”—“না না, এই যে বাই। খুকীকে দেয়ে মতিয়া।”

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ষড়্ দর্শন ।*

৩

প্রথমতঃ—প্রমাণদ্বারা আমাদের কি রকম প্রয়োজন সাধিত হয়? এবং তাহার (প্রমাণের) লক্ষণ কি?—তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবাদিগণ দ্বিবিধ পদার্থ স্বীকার করেন। সত্য এবং মিথ্যা।

সত্য পদার্থ জ্ঞান স্বরূপ। মিথ্যা পদার্থ সকল কল্পিত এবং জড় নামে পরিচিত। সত্য বা জ্ঞান অপ্রকাশ, মিথ্যা বা জড় অপ্রকাশ। জ্ঞান অস্ত্রের সাহায্য বাতীতই আলোকের মত প্রকাশিত হয়। জড় (মিথ্যা) পদার্থ স্বয়ং প্রকাশিত হইতে পারে না। উক্ত জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান সকল সময়ে স্বয়ং প্রকাশিত হয় না, বা অত্যন্ত ও বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে না, সে জ্ঞান অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের একটি আবরণ স্বীকার করেন।

* রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারী দাসুত কলেজে পঠিত। ১৩১৪ সালের চৈত্র এবং ১৩১৫ সালের আশ্বিনের সংখ্যায় এই প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অংশে প্রয়োজনের সাধারণ লক্ষণ, প্রয়োজনের বিভাগ, দর্শন শাস্ত্রের রচনা ও অধ্যয়নের প্রয়োজন, দর্শনশাস্ত্র রচনার সময়, দর্শন শাস্ত্রের বিভাগ, ষড়্ দর্শন-শব্দ ব্যবহারের কারণ, আন্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শনের ঐকমত্য ও মতভেদ, বেদান্ত দর্শনের প্রাধান্য, বেদান্ত শাস্ত্র রচনার সময়, শব্দ ও শব্দের ভাষ্যের সময়, অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি, জ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে বিচার প্রণালী, ব্রহ্মের লক্ষণ, কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধে মত ভেদ, ব্রহ্ম-বিষয়ণ ভাব সম্বন্ধে মত ভেদ, ব্রহ্মবিবর্তবাদ এবং ব্রহ্ম পরিণামবাদ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই আবরণই তাঁহাদের মতে অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়ী প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই অজ্ঞান অন্ধকারের মত দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ যে স্থানে অবস্থান করে, সে স্থানের প্রকৃত অবস্থা গোপন এবং ভ্রমের তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন সময়ে অন্ধ রকম পদার্থের উদ্ভাবন (অর্থাৎ উৎপাদন) করিয়া থাকে। উক্ত দ্বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া, এক অজ্ঞানেরই আবরণ ও বিক্ষেপ (অর্থাৎ উৎপাদক) নামক দ্বিবিধ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। আবরণ-শক্তির সাহায্য বাতীত বিক্ষেপ-শক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে না। সে জ্ঞান আবরণ বিদূরিত বা বিনষ্ট হইলে কল্পিত পদার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। আবরণ শক্তি দ্বারা কোন পদার্থ বিদূরিত হইলে, তখনই সেই বস্তুতে (অর্থাৎ অজ্ঞাততা) উৎপন্ন হয়। সেই অজ্ঞাত ভাবের দূরীকরণ বা বিনাশেই প্রমাণের প্রয়োজন। যেমন আমাদের হস্তাদি ক্রিয়া দ্বারা আশোকাবরণ বস্তাদি বিদূরিত বা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানালোকের আবরণ রূপ অজ্ঞান বিদূরিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই, বেদান্ত পরিভাষায় ধর্ম্মরাজাধ্বরীকৃত, প্রমাণ ও প্রমাণের লক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, অজ্ঞাত ও অবাধিত + বিবশে যে জ্ঞান হয়

+ যে স্থানে যে সময়ে যে পদার্থ বর্তমান থাকে সে স্থানে সে সময়ে সে পদার্থকে অবাধিত বলিয়া যায়

তাহার নাম প্রমাণ, এবং যদ্বারা উক্ত প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রমাণ । প্রথমতঃ আমাদের চক্ষু পাত্ত্বি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সঙ্গ হইলে, তখনই সেই পদার্থ সন্দেহ মনের একরকম আঘাত বা ভাব উৎপন্ন হয় । এই ভাব বা আঘাত বোধাত্মক প্রমাণের ‘বিষয়াকার মনোবৃত্তি’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই বিষয়াকার মনোবৃত্তি হইলে, স্বপ্রকাশ জ্ঞানের পরি-
ষ্কার হয়, সেজন্য তাৎক্ষণিক জ্ঞান বলা হইয়া থাকে । বাস্তবিক বেদান্ত মতে নিত্য-
জ্ঞানরূপ ব্রহ্মই জ্ঞানশব্দের মুখ্যার্থ । যেমন দশা ও তৈল সংযুক্ত অগ্নিদ্বারা গৃহাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ, পূর্বোক্ত মনোবৃত্তি সংযুক্ত ব্রহ্মরূপ জ্ঞানদ্বারা, বিষয় সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয়তঃ বিষয়াকার মনোবৃত্তির উৎপত্তি হইলে, বিষয় জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়, এবং সেই সঙ্গেই বিষয়ের অজ্ঞাততাব বা জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা বিদূরিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে । তখন পূর্বোক্ত মনোবৃত্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ আবরণ থাকে না ; সুতরাং তখন জ্ঞানরূপ চৈতন্যদ্বারা স্বেচ্ছা বিষয়, পূর্বোক্ত মনোবৃত্তি, এবং প্রমাণ এই তিনই প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই মতে স্মৃতি অর্থঃ স্মরণ প্রমাজ্ঞান নহে । কারণ অজ্ঞাত বিষয়ে কখনও কোন ব্যক্তিরই স্মৃতি উৎপন্ন হয় না । সুতরাং স্মৃতির কারণ প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না । যাহারা স্মৃতির কারণকেও প্রমাণ মধ্যে গণনা করেন তাহাদের মতে প্রমাণের লক্ষণ এই, বাহ্য-
দ্বারা অবাধিত বিষয় জানা যায় তাহার নাম

প্রমাণ । বিশেষ বিবেচনা করিলে স্মরণকে প্রমাণরূপ গ্রহণ করা সম্ভব মনে হয় না । কারণ, পূর্বে বাহ্য অজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা ই আমাদের স্মরণের বিষয় হইয়া থাকে । সুতরাং পূর্বতন অজ্ঞতের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে ; এই অজ্ঞাত স্মরণের পৃথক প্রামাণ্য স্বীকার নিশ্চয়াক্রম মনে হয় ।

বেদান্তমত ও তদীয় ভাষ্য হইতে প্রমাণ সন্দেহে কোন বিষয়ই স্পষ্টতঃ জানা যায় না । স্মরণ ও ভাষ্য সম্ভব প্রমাণ কত প্রকার তাহা বলা বড়ই কঠিন । বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থে প্রমাণের বৈকল্য বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, আমি তদনুসারেই এখানে তাহার বর্ণনা করিব ।

বেদান্ত পরিভাষায় লিখিত আছে যে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ, অর্থ-
পত্তি, অনুপলব্ধি ভেদ প্রমাজ্ঞান ষড়বিধ । সুতরাং তাহার কারণ প্রমাণও ষড়বিধ, অর্থাৎ ছয় প্রকার ।

প্রমাজ্ঞান ও তাহার কারণ প্রমাণ ছয় প্রকার হইলেও আমরা আপাততঃ তাতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি । প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য সর্ববাদি সিদ্ধ । অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুমিতি প্রভৃতিভেদে পাঁচ প্রকার, ইহা বৈদ্যপ্তিক ও মীমাংসকগণ স্বীকার করেন । কিন্তু বৈশেষিক ও নৌদ্ধর্মান্বিতগণ অনুমিতির অতিরিক্ত কোনও অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না । সাংখ্য দর্শনকার কপিল ও বোধদর্শনকার পতঞ্জলি অনুমিতি ও শব্দ এই দ্বিবিধ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন । নৈয়ায়িকগণ

অসূক্ষ্মিতি, উপসূক্ষ্মিতি ও শাব্দ এই ত্রিবিধ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে এই সব বিষয়ের সন্নিহিত বর্ণনা করিতে হইলে বেদান্ত মত হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, উক্ত দর্শন সকলের স্ব স্ব মতের বিচার সময়ে এই বিষয় সকলের বথাসম্ভব বিস্তৃত বিচার করিতে ইচ্ছা রহিল।

একং বেদান্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভেদ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমাদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, সকল জ্ঞানেই, তিনটী বিষয় অন্তর্ভূত হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। যিনি জ্ঞানেন তিনি জ্ঞাতা, যে বস্তুটী জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায় তাহা জ্ঞেয়, বাহ্য দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়টী নিয়মিতভাবে বুঝা যায় তাহার নাম জ্ঞান। যে জ্ঞান সময়ে উক্ত তিনটী পদার্থই এক স্থানে উপলব্ধ হয় এবং একটীর অস্তিত্ব থাকিলেই অপটী থাকিতে পারে এইরূপ মনে হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সময়ে উক্ত তিনটীই একস্থানে অবস্থান করে এবং একটীর অস্তিত্ব থাকিলেই অপটীরই সত্তা অন্তর্ভূত হইতে পারে। বথাক্রমে এই বিষয়টীর বর্ণনা করা যাইতেছে। অর্থাৎ বাদামুসায়ে জড় পদার্থ সকল, সর্বব্যাপি ব্রহ্মরূপ চৈতন্ত্বে (অর্থাৎ জ্ঞানে) কল্পিত। কল্পিত পদার্থের নিজেই অস্তিত্ব নাই, বাহ্যতে কল্পিত হয়, তাহার অস্তিত্ব দ্বারাই ঐ সকল পদার্থ সংক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত চৈতন্ত্বে অর্থাৎ জ্ঞানের স্বাভাবিক কোন ভেদ

নাই। কল্পিত পদার্থ দ্বারা তাহা বিভিন্নরূপে অন্তর্ভূত হয়। পূর্বেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটী জ্ঞান ও একমাত্র পূর্বেই সর্বব্যাপী চৈতন্ত্বে (জ্ঞানে) কল্পিত। চৈতন্ত্বে (জ্ঞানের) যে অংশ আমাদের অন্তঃকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যে অংশ আমাদের অন্তঃকরণ কল্পিত, সেই চৈতন্ত্বেই জ্ঞাতা চৈতন্ত্বে। বস্তুদি বিষয় সকল চৈতন্ত্বে যে অংশ কল্পিত তাহার নাম জ্ঞেয় চৈতন্ত্বে। অন্তঃকরণের ভাব অর্থাৎ পূর্বেই বিষয়াকার মনোবৃত্তি যে অংশ কল্পিত তাহার নাম জ্ঞান চৈতন্ত্বে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উক্ত তিনটী চৈতন্ত্বেই এক বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান সময়ে, আমাদের অন্তঃকরণ বা মন, বস্তুদি বিষয় দেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং জ্ঞান অন্তঃকরণ পরিছিন্ন পূর্বেই মনোবৃত্তির মধ্য হইতে বস্তুদি পর্যন্ত সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকে। বস্তুদি বিষয় পরিছিন্ন চৈতন্ত্বে, মাত্র বিষয়দেশে অবস্থিত, কিন্তু সে সময়ে জ্ঞাতা চৈতন্ত্বে মনোবৃত্তির মধ্য দেশ হইতে আশ্রিত করিয়া বিষয় দেশ পর্যন্ত সমভাবে অবস্থিত থাকায়, বিষয় চৈতন্ত্বে, জ্ঞাতার একাংশরূপে বর্তমান থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞাতা চৈতন্ত্বে বৃহৎ এবং জ্ঞেয় চৈতন্ত্বে তাহার অংশরূপ, সুতরাং তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বৃহৎ পদার্থ থাকিলেই, তাহার অংশ স্বরূপ ক্ষুদ্র পদার্থ অবস্থিত থাকে। যেমন দশ হাত দীর্ঘ বস্তু অবস্থিত থাকিলে, তাহার অংশরূপে এক হাত দীর্ঘ বস্তুর অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ প্রত্যক্ষ সময়ে জ্ঞাতা চৈতন্ত্বে অবস্থিত থাকিলে

জ্ঞেয় চৈতন্যের অবস্থিতিও স্বঃসিদ্ধ, কাজেই তখন, জ্ঞেয় চৈতন্য জ্ঞাতৃচৈতন্যের অভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। এবং পূর্কোক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তি, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য ও জ্ঞেয় চৈতন্য হইতে, অভিন্ন ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের অন্তঃকরণ আলোকের মত অতি অল্প সময়ে অধিক দূরে গমন করিতে পারে, সেজন্য বৈদান্তিক-গণ তাহাকে তৈজস পদার্থ মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। যেমন আলোক, পদাঙ্ক-রূপ ছিদ্রদ্বারা গৃহমধ্যে পতিত হইয়া গৃহ-কার ধারণ করে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সময়ে, আমাদের অন্তঃকরণ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় রূপ ছিদ্রদ্বারা, আংশিক ভাবে নির্গত হইয়া, ঘটাদি বিষয়ে পতিত হয়, এবং বিষয়কার ধারণ করিয়া থাকে; অন্তঃকরণের নিঃসরণে অবস্থায়, পূর্কোক্ত মনোভাব ইহাও প্রকাশিত হইয়াছে। এই অন্তঃকরণ বৃত্তি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য, ও জ্ঞেয় বা বিষয় পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য,—এই উভয়ই তখন একস্থানে অবস্থান করে। সুতরাং সে সময়ে তাহাদের পরস্পর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না, বরং জ্ঞান চৈতন্য জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্যের অভিন্ন রূপেই, পরিচ্ছিন্ন-রিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জ্ঞাতৃচৈতন্যের অভিন্ন ভাবে জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্য, এবং জ্ঞেয় বা বিষয় চৈতন্যের অভিন্ন ভাবে জ্ঞান চৈতন্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পূর্কোক্ত ত্রিবিধ চৈতন্যেরই এক অভিন্ন স্বীকার করা সম্ভব। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে, উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্যের এতাব

পরিলক্ষিত হইতে পারে না। কারণ তখন অন্তঃকরণের সহিত, জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্বন্ধ হয় না, সে সময়ে শরীরের মধ্যেই অন্তঃকরণ অবস্থান করে। এবং শরীর মধ্যস্থিত অন্তঃকরণেই, জ্ঞেয় বিষয়ের ভাব বা জ্ঞেয় বিষয়কার অবস্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন শরীর মধ্যস্থ জ্ঞাতৃ-চৈতন্য, জ্ঞেয় ঘটাদি বিষয় পরিচ্ছিন্ন বহির্দেহস্থ চৈতন্য হইতে অনেক দূরে অবস্থান করে, এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান চৈতন্য শরীর মধ্যেই বর্তমান থাকে, অতএব তাহাও বিষয় চৈতন্যের দূরবর্তী, কাজেই উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য এক স্থানে থাকিতে পারে না। অতএব অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে উক্ত তিন রকম চৈতন্য অভিন্ন ভাবে অনুভূত হয় না। এই সিদ্ধান্তদ্বারা এইরূপ লক্ষণও নির্ধারণ করা যাইতে পারে যে, যে জ্ঞানে পূর্কোক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য একত্র অবস্থিত থাকায় এক বলিয়া প্রকাশিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ, এবং যে জ্ঞানে উক্ত ত্রিবিধ চৈতন্য একত্র অবস্থিত হইতে পারে না, তাহার নাম অপ্রত্যক্ষ। জ্ঞেয় পদার্থের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধ বিশেষের নাম জ্ঞান। অর্থাৎ যে রকম সম্বন্ধ হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুকে গ্রহণ পরিত্যাগ বা উপেক্ষা করিতে পারেন, সেই রকম জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ সম্বন্ধকে জ্ঞান বলা যায়। সাক্ষাৎ ভাবে (অর্থাৎ অতি নিকট ভাবে), জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার উক্ত সম্বন্ধের নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং দূরস্থ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার উক্ত সম্বন্ধের নাম অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় বলিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎ-কার বলা হইয়া থাকে। যাহা বর্তমান ও নিকটবর্তী, তাহাষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম মাই। অতীত ভবিষ্যৎ ও দূরস্থ পদার্থ সকলও তাহার বিষয় হইয়া থাকে। সেজন্যই এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে “সম্বন্ধং বর্তমানকং গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা” ইন্দ্রিয় সংসৃষ্ট নিকটবর্তী বর্তমান পদার্থই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ববাদিসিদ্ধ এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ। সেজন্য প্রমাণ নিরূপণ সময়ে, সকল দার্শনিকই প্রথমে প্রত্যক্ষের নাম নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা সকল প্রমাণের অগ্রগণ্য ইহাও বৈদান্তিক ভিন্ন সকল দার্শনিকই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদাস্তবাদিগণ বেদান্ত বাক্যেই প্রমাণের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করেন। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানদ্বারা বিস্তৃত ভাবাপন্ন কোন বস্তুই বানা যায় না, মিশ্রিত বস্তুই তদ্বারা জানা যায়। মিশ্রিত বস্তু মুক্তলব্ধ কল্পিত। কল্পিত পদার্থ বিষয়ে, যে জ্ঞান হয়, তাহা কখনও যথার্থ জ্ঞান নহে। বিশেষতঃ কোন কৃত্রিম বাস্তবিক অপেক্ষিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ অনেক সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, দোষযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হইয়া থাকে। সেজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান কি না—ইহার পরীক্ষা আবশ্যিক।

অত্যাগত প্রমাণদ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় পরীক্ষিত হইলেই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। এই জন্য নারদ স্মৃতির সাক্ষি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে—

“তগবদৃশ্যং বোমি খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন তলং বিদ্যতে বোমি নু খদ্যোতো

হুতাশনঃ ॥

তন্মাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্টেপি যুক্তমর্থং পরীক্ষিতং”

অর্থাৎ আকাশ কড়ায়ের মত, এবং খদ্যোত অগ্নির মত দৃষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক আকাশ কড়াই নহে বা খদ্যোতও অগ্নি নহে। সে জন্য প্রত্যক্ষগত বিষয়েরও পরীক্ষা কর্তব্য। আমরা আকাশকে নীল-বর্ণ এবং চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্র রূপে দেখিয়া থাকি। কিন্তু অহুমান ও গণিত প্রধান জ্যোতিঃশাস্ত্রদ্বারা বিপরীতভাবে পরীক্ষিত হওয়ার তাহাতে কোন বিবেচক ব্যক্তিই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। বরং তাহাকে মিথ্যা জ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ফল কথা, মিশ্রিত ভাবাপন্ন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহাতে অনেক সময়েই প্রামাণ্য সংশয় হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহার বিষয় একমাত্র বিস্তৃত ব্রহ্ম। একমাত্র পদার্থ যে জানেব বিষয় তাহাতে কোন-রূপ অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা নাই। মিলিত পদার্থ জানেই তাহা ~~সত্য~~ ~~বাস্তব~~ ~~প্রমাণ~~, অদ্বৈতবাদিগণের মতে ~~সত্য~~ ~~বাস্তব~~ ~~প্রমাণ~~ মাত্রই পর-পকাশ। ~~সত্য~~ ~~বাস্তব~~ ~~প্রমাণ~~ তাহা কখনও সন্দেহ, কখনও বিপরীত, অর্থাৎ বিপরীত ভাবে জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই রকম পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহাতে সকল সময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিস্তৃত ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ। ইহাই আমাদের আত্মা। আমার জ্ঞান আছে কি না? এবং আমি আছে কি না? বা আমার আত্মা আছে কি না?—এইরূপ, কিংবা আমার আত্মা নাই এইরূপ নিশ্চয়রূপ বিপরীত জ্ঞান, কোন ব্যক্তিরই কখনও হইতে দেখা যায় না। যুক্তি প্রধান অহুমান প্রভৃতির সাহায্যে অল্প পদার্থ সমূহের মিথ্যাত্ব সন্দেহ হইলে, বেদান্ত বাক্য দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধ

কোন উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোনরূপ অপ্রামাণ্য থাকার সম্ভাবনা নাই। কারণ সংশয় জ্ঞানের বিষয় দুইটী পদার্থ। একটী মাত্র পদার্থকে অবলম্বন করিয়া কখনও তাহা হয় না। অজ্ঞানকারে কোন বস্তু থাকলে তাহাতে এইরূপ সংশয় হয়—যে “ইহা মনুষ্য কি বস্তু”। এ স্থলে মনুষ্য ও বস্তু উভয়ই সংশয়ের বিষয়। যদি কোন কারণে এরূপ জ্ঞান দ্বারা যে “ইহা মনুষ্য নহে,” তাহা হইলে উক্ত সংশয় বদ্ব্যপ্ত হয়; অধিকন্তু সেই অবস্থার “ইহা বস্তু” এইরূপ অবধারণই হইয়া, থাকে ও তাহার উপর কোনরূপ অপ্রামাণ্য বা অবিশ্বাস থাকে না। সেইরূপ, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা জড় বস্তুত্বের মিথ্যাভ্রম, অসন্দিক্ত ভাবে স্থাপিত হইলে, বেদান্ত বাক্য দ্বারা আশ্রয় বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা বিশ্বাস্য ভাবে সমাদৃত হইতে পারে। ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সিদ্ধি গ্রহে মনুষ্যদমন পরম্বীকর্তৃক এই বিষয়টী বিবৃত্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্ত প্রামাণ্য ও আশ্রয় নিরূপণ—এই অবস্থায় বিবৃত্ত বিচার করিতে ইচ্ছা করে।

প্রত্যক্ষ-নিরূপক ও সন্দিক্তক ভেদ দুই প্রকার। কোন বস্তুর সত্তি আশ্রয় উদ্ভিদের সম্বন্ধ হইলে, তখনই সেই বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই জ্ঞান দ্বারা বস্তুটী কি রসম, বা তাহার গুণ ক্রিয়া প্রভৃতি কি—তাচা বিবেচিত হয় না। উক্ত প্রকার জ্ঞানই নির্বিকল্পক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক বস্তুই সত্তি অপর বস্তুর সম্বন্ধ, নির্বিকল্পক জ্ঞানগম্য নহে। বস্তু সকল অসংসৃষ্ট ভাবে নির্বিকল্পক জ্ঞান গম্য হইয়া থাকে। সেজন্য নির্বিকল্পক গম্য বস্তু, আশ্রয় শব্দ দ্বারা অন্তকে বুঝাইতে পারি না। পূর্বোক্ত বেদান্ত বাক্য

জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। কারণ যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ সমূহের মিথ্যাভ্রম দ্বিরুক্ত হইলে, একমাত্র ব্রহ্ম সত্যরূপে অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং তখন ব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থের সত্তা অনুভূত হইতে পারে না। এই অবস্থার বেদান্ত বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহার বিষয় সংসৃষ্ট ভাবাপন্ন বস্তু তৎকালীন সম্ভব। কারণ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের জ্ঞান না থাকিলে, সংসৃষ্ট ভাব জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব একরূপ শীকার করাই সম্ভব যে, অদ্বৈত ও তৎসংসৃষ্ট পদার্থ, ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য জ্ঞান জ্ঞানের বিষয়। উক্ত জ্ঞান নির্বিকল্পক ব্রহ্মজ্ঞান নামে, বেদান্ত শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নির্বিকল্পক পদার্থ, শব্দদ্বারা অন্তকে বুঝান যায় না এবং এক্ষণে বলা হইল যে বেদান্ত বাক্য নির্বিকল্পক জ্ঞান উৎপাদন করে;—এই উদ্দেশ্যে কথার বিরোধ পরিহারার্থ আমরা বক্তব্য এই যে শব্দদ্বারা কোন পদার্থই বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। অন্য পদার্থের নিষেধ প্রদর্শন দ্বারা সাধারণ ভাবেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। শুভ ও চিনির মাধুর্যের তারতম্য কেহই শব্দ দ্বারা বুঝাইতে পারেন না। তাহা হৃদয় ও গুণ প্রভৃতির মাধুর্য হইতে ভিন্ন, ইহা মাত্র শব্দদ্বারা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। সেইরূপ নির্বিকল্প অদ্বৈত, শব্দ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তিন পরিদৃষ্টমান জড়বর্ণ হইতে ভিন্ন, ইহা মাত্র শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। সেজন্য “বদ্ব্যপন ভূতদ্বয়ং” ইত্যাদি বিষয় ক্ষতিতে উক্ত হইয়াছে। মহাবাক্যার্থ নিরূপণে এই বিষয়ের বিবৃত্ত বিচার প্রদর্শিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীগুরুচরণ ওর্কদর্শন তীর্থ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

যণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন কোহিনূর !



যেমন সমস্ত সুবাসিত কেশ তৈলের মধ্যে আমাদের মহাপুরুষকে "কেশরজ্ঞান" সর্বোপরি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ইহা কেশরজ্ঞানের আত্মগর্ক প্রসূত উক্তি নহে। কেশরজ্ঞানের গৌরবকারী আমাদের দেশের বড় বড় দেশাধিপতি রাজা, মহারাজা, তত্ত্ব, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির অগণ্য অবাচিত প্রশংসাপত্র আমাদের বিনামূল্যে বিতরিত কেশরজ্ঞান ডায়েরীতে দেখিলেই আপনাতঃ প্রম হুচিলে। কেশরজ্ঞানের অনেক গুণ— তাই চর্চা সর্বদেশ সর্বজন সমাদৃত। কেশরক্ষেপে, বৃদ্ধকরণে, পোষণে, লাংগ সাধনে, ইহা অদ্বিতীয়। সর্ববিধ মস্তিষ্কের উচ্চতা নিবারণে এবং পিত্তাদি অক্ষোণ জ্বর হস্ত পদাদির জ্বালার প্রতিকারে ইহা অদ্বিতীয়

শক্তি সম্পন্ন। কেশবৃদ্ধি করিতে, কেশ কৃষ্ণিত কোমল ও সুকৃৎ করিতে ইহার কার্য অলৌকিক উপাদান আর বিতীয় নাই। যদি কেশকে যৌবনের প্রারম্ভ হইতে নিয়মিত আয়ত্রে রাখিতে চান, যদি অকাল বার্দ্ধকোর নিদাকরণ মনস্তাপে, আত্মরানিত্যে মগ্ন হইতে না চান, তাহা হইলে যৌবনের প্রথম বিকাশেই "কেশরজ্ঞান" ক্রয় করুন। খালি সুগন্ধের জল নহে, খালি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারিতা গুণের জল নহে, শিরারোগের "কেশরজ্ঞান" অদ্বিতীয় ও মহোপকারী।

একশিশির মূল্য ...	১ এক টাকা।	মাতুলানি	১/০ আনা।
তিনশিশির মূল্য ...	২১০ আড়াই টাকা।	মাতুলানি	১১/০ আনা।

সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা।

পঞ্চমসংস্করণ।

পঞ্জীগ্রামে অনেককেই অশিক্ষিত ডাক্তারের হাতে প্রাণ সঁপিতে হয়। এই শোচনীয় দৃষ্টান্ত রূপেই এইটি ডাক্তারি-শিক্ষা পণ্যরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। উচ্চা ছিল, যেন এই পুস্তক যাহা যাহা যে কেহ চিন্তে নিজে ডাক্তারি শিখিতে পারেন। উত্তরকালে আমার দেশে যাহা পূর্ণ হইয়াছে। ডাক্তারি-শিক্ষার পাঁচটি সংস্করণে এখন হাজারটি অশিক্ষিত ডাক্তারের কবর হইতে পঞ্জীবানী রক্ষা পাটয়াছেন। একটু ভাল লা জানা থাকিলেই এই আড়াই হাজার পুস্তক যইখানি প্রস্তুত করিতে পারে যার। সেই ভগ্নই ইহার এত আদর। মূল্য ১০ টাকার ১০ টাকার মাত্র। ডাকমাতুল ৫০ হার আনা। ছইখণ্ডে সুকর বাধান ও পূঁচ টাকা।

লন্ডনে-কি ডেভিড কাল ডিম্বোয় প্রায়,

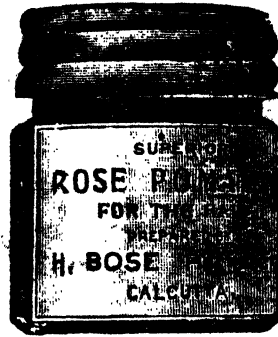
ব্রীনগেলনাথ সেন ও কবিবরাজ

১৯১৩ ও ১৯১৪ খ্রীঃ পঞ্জীগ্রাম ডিম্বোয় প্রায়, — কলিকাতা

আপনি কি

পমেটম ব্যবহার করেন?

কেশ-তৈলের পরিবর্তে বাহার পমেটম ব্যবহার করেন তাঁহার একবার



ব্যবহার করিলে অল্প পমেটম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিবেন না। ইহাতে
কিছু অথবা অল্প কোন আপত্তিকরক পদার্থ নাই। পণ্ডিত চর্চক বস্তু
— ইহা তৈলাক্ত পদার্থকে উৎকৃষ্ট গোলাপসার সহযোগে এই গোলাপ পমেটম
সংযুক্ত। কেশ বিক্রাসকালে কেশে অল্প মাত্রার ব্যবহারে দীর্ঘকাল
প্রত্যক্ষ পোষণের সৌভাগ্য চতুর্দিক আনন্দিত হইবে এবং অনেককণ
প্রকার। কোনক্রমে গোলাপের মনোরম সুবাস থাকিবে। কেশ কোমল ও চিকণ
করিতে এবং ইচ্ছামত ফিরাইতে ইহা বিশেষ সাধ্য্য করিয়া থাকে।

মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা।

এইচ বসুর সুপিরিয়র পটেম

সর্বদা ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। অগ্রে অতুল ও ব্যবহারে কেশ কোমল
হয় ও ইচ্ছামত ফিরান যায়। অনেক তত্ত্বলোক ও মহিলাগণ সুপিকি তৈলের
পরিবর্তে সর্বদা পমেটম ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের ব্যবহারে অল্প
আমরা এই সুপিকি পমেটম প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা উৎকৃষ্ট তৈলসম্মিলিত
একত্র কেশ উৎপাদনে ও বর্দ্ধনে ইহা বিশেষ কার্যকারী বিশেষতঃ এই পমেটম
ব্যবহারে কেশ কখনও চট্টটে অথবা তৈলাক্ত হয় না।

মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা।

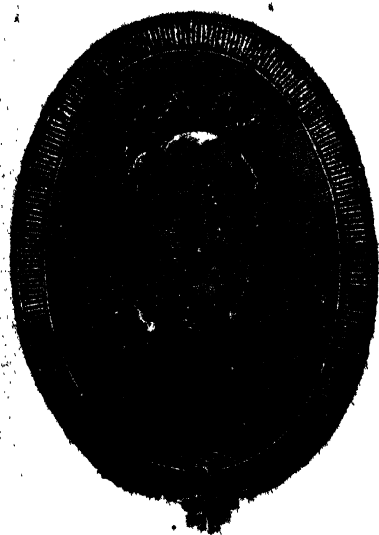
এই বসু, পারফিউমার,

দেলগোস হাউস, কৌরুজার, — কলিকাতা।

বজ্রদর্শন

(নব পর্যায়)

মাসিক পত্র



শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে এস্ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের
দেশীয় সালস।



পারদ ও রক্ত হৃদয়ের মহৌষধ ।

সুরবল্লী কবার সেবনে শরীরের হৃদয় পোষিত বিবেচনিক হয়। হুলকানি, বা, কোড়া, বাতরক্ত, আমবাত ও পারদ রক্ত হৃদয়, অস্থি, কঠোরক ঘোষ শরীরে দ্রুত হইয়া যায়, এই মহা তেজস্কর দেশীয় সালস। সেবনে, পুরুষের ও মহিলাদের কাতি বর্ধিত হইয়া থাকে ইহার প্রত্যেক মাত্রাই শরীরে নুতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার করে।

মূল্য এক শিশি ২৫০ দেড় টাকা । ডি পি কে পাইপে মোট ২/০ আনা।

জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ ।



বাঁহাদের অন্ন পরিভ্রমেই মাথা গুরে, মন বিহ্বল থাকে না, কাজের সময় মাথা গুর হইয়া তুলতুল হইয়া থাকে, তাঁহাদের পক্ষে জবাকুসুম তৈল বিশেষ উপকারী। জবাকুসুম তৈল কেশের অকালপকড়া ও উঠিয়া বাঁটা দিবার উপকার করে। জবাকুসুম তৈলের পক্ষ লক্ষ্যবীর। মহারাণী-মহারাজ হইতে সামান্য কুটারমালী পর্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য মহিলাগণ অতি পায়ের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন।

এক শিশির মূল্য ১/- এক টাকা। জবাকুসুম ১/০ পাঁচ আনা।

সকলস্থল যোগসিগা মিষ্টি-মিষ্টি রোগের বিকরণ দিগন্তে বিনামূল্যে কল্যাণ প্রেরণ করা হয়।

তিন শিশির মূল্য ৫৫০ পনের টাকা । ডি পি কে পাইপে মোট ২/০ আনা।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

ব্যাংকিং ও ইন্সুরেন্স।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

এলিক্সারপেপেন

পেপের তরল সারাংশ।

পেপারিন্ সংযোগে এই অভিনব ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জীর্ণক্ষুধা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রোটিন্ খাদ্য দ্রব্য সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। অজীর্ণতা, পাকশয়ের দুর্বলতা ও পিত্তবিহীনতায় ইহা বিশেষ উপকারী। মূল্য এক শিশির দ০০ আনা।

জামের বীচির তরলসার

(বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ।)

শর্কর বহুমূত্র অর্থাৎ যে বহুমূত্রের মূত্রে শর্করা থাকে, তাহাতে ইহা ফলপ্রদ। জামের বীচির তরলসার হইতে ইহা প্রস্তুত; ইহা কিছুদিন সেবনে দুর্বলতা, মাথাধরা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ বিদূরিত হয়। এক শিশির মূল্য দ০০ আনা।

কালমেঘের তরলসার

যকৃতের দোষ ও পুরাতন জ্বরের মহৌষধ।

কালমেঘ অগ্নিবদ্ধ ও স্নেহ রোচক। পূর্বে গৃহিণীগণ ছেলেদের জ্বর ও যকৃতের দোষের জন্য ইহারে “আলুই” করিয়া খাওয়াইতেন; আমরা ইহার তরল সারাংশ ব্যবহার করিয়া সমধিক ফল পাইতেছি। যেখানে অজীর্ণতা, যকৃতের দোষ এবং শিশুযকৃত রোগের সন্দেহ থাকে, সেখানে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইলে, নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করে।

এক শিশির মূল্য ১০ আট আনা।

কুর্চির তরলসার

(রক্তমাশয়ের মহৌষধ ।)

আয়ুর্বেদ মতে ইহা অগ্নিদীপক ও আমদোষ এবং অতিসারদোষ নাশক। রক্তমাশয় রোগে ইহার তরলসার উৎকৃষ্ট ঔষধ, এ কথা পাশ্চাত্যদেশের চিকিৎসকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আমাদের এই ঔষধটি রক্তমাশয়, অতিসার রোগে বড়ই ফলপ্রদ। রোগের পুরাতন ও নূতন উভয় অবস্থায় ব্যবহার্য। এক শিশির মূল্য ১২ এক টাকা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

KEATINGS INSECT POWDER.

কালাজ্বর এবং ছারপোকা ।

ক্যাপ্টেন প্যাটন (Capt. Patton of Indian Medical Service) সাহেব ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্কিদের জনৈক সুদক্ষ ডাক্তার--বহু পরীক্ষার পর কালাজ্বরবীজাণু ছারপোকাকার পাকস্থলীতে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় দেখিয়াছেন । তদ্বিল্প ছারপোকা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিশয় যজ্ঞগাদায়ক, কঠোর দংশনে আপনার পরিবারবর্গ এবং বিশেষতঃ স্নকুমার শিশুগুলির স্বাস্থ্য ও সুখ নষ্ট করে । প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া কিটিং সাহেবের বৈজ্ঞানিক “কীটনাশক পাউডার” সমগ্র জগতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ভারতের প্রতি সংসারে প্রচলিত হওয়া উচিত । ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ, বিষাক্ত নহে ; কোন দুর্গন্ধ নাই । কেবল ১০ মিনিট পূর্বে বিছানার চাদরের নিম্নে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া দিলে ছারপোকা মশা বাছি পরিপূর্ণ বিছানা সুখ-শয্যা পরিণত হয় । মূল্য প্রতি কোটা মাঝারী ১/০, বড় কোটা ১১/০, ছোট কোটা ০ মাত্র । এই সামান্য ব্যয়ের জন্ত দাক্ষণ কর্ত্তোগ করা উচিত নহে । লগুনে প্রস্তুত । সমস্ত বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায় ।

শ্রমজীবিসমবায় লিমিটেড্

৯০।২এ হারিসন রোড, কলিকাতা ।

একমাত্র খাঁতি স্বদেশী দ্রব্যের
সম্মিলন স্থান ।

যিনি প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবেন,

তিনি নিশ্চিন্ত মনে এই স্থানে আসিলে পরিধেয় ধুতি, চাদর, মিলের

ধুতি সাটী, তৈয়ারী জামা জ্যাকেট যাহা চাহিবেন, সাবান

এসেন্স, পুতুল এবং পাখরের এ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য

ও দজ্জির কার্য যাহা চাহিবেন তাহাই

পাইবেন । ৫ একটা অংশ ক্রয়

করিলে টাকায় ১০ কমিশন

পাইবেন ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

ম্যানেজিং এজেন্ট

সূচী

বিষয়	লেখকের নাম	পত্রাঙ্ক
১। নিমাই চরিত্র ...	শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় ...	৪৩৭
২। উৎপলা (উপজ্ঞাস) ...	" ভবানীচরণ ঘোষ ...	৪৪৫
৩। নক্ষত্রপূজা ...	তারাদর্শক ...	৪৫১
৪। শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুর্দ্দশী	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ...	৪৫৭
৫। বৈদিক সাধনার আভাস ...	" জ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার ...	৪৬৪
৬। বাঙ্গালা মাসিক পত্র ...	" যোগেশচন্দ্র রায় ...	৪৬৯
৭। এষা ...	" বিপিনচন্দ্র পাল ...	৪৭৬
৮। "ন চ দৈবাৎ—" ...	" সুধীরচন্দ্র মজুমদার বি, এ, ...	৪৮২
৯। রাডিয়র্ড কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথ	" প্রফুল্লকুমার সরকার ...	৪৯০
১০। শ্রী শ্রী কৃষ্ণতত্ত্ব ...	" বিপিনচন্দ্র পাল ...	৫০৪
১১। ভূভাগোর কাহিনী ...	" সুধীরচন্দ্র মজুমদার ...	৫০৪
১২। রসের রূপ মাধুর্য্য ...	" বিপিনচন্দ্র পাল ...	৫০৮(ছ)
১৩। রামাবতী ...	" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ...	৫০৮(ট)
১৪। রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র	৫০৮(ঢ)

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল-প্রণীত

প্রদীপ

এই নূতন সংস্করণে সাহিত্য-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিত ভূমিকা, তিনটি নূতন কবিতা ও কবির যৌবন প্রতিকৃতি সংযোজিত হইয়াছে। অতি সুন্দর মুদ্রণ। মূল্য ৬০ আনা।

অভিনব গীতিকাব্য

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ প্রণীত

পত্র পুষ্প

উর্শ্বিকা

(যন্ত্রস্থ)

নব প্রকাশিত কবিতাপুস্তক।

মজুমদার লাইব্রেরী,

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা

শিলাজত রসায়ন

বহুমূত্ররোগের মহৌষধ ।

চরক - সুশ্রুতের মতানুসারে শোধিত হিমালয় পর্বতের লৌহ, শিলাজত, নিকৃৎভস্ম সুবর্ণ, সহস্র পুটের অত্র, শোধিত বঙ্গভস্ম, চন্দ্রোদয় বিধানানুসারে প্রস্তুত স্বর্ণসিন্দূর, সহস্র পুটের লৌহ, বিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্কিক ভস্ম, বিড়ঙ্গবীজ চূর্ণ ।

যখন রোগ প্রবলভাবে আক্রমণ করে, তখন শরীর ভয় হইয়া থাকে । মাংসপেশী সমূহ লোল হয় । শরীর স্থূল হইলেও বলহীন হয় । সর্বদা শীতল জল পান, শীতল স্থানে বাস, শীতল বায়ু সেবনে ইচ্ছা হয় । এই অবস্থায় পিপাসা ও ক্ষুধা অতি প্রবল হয় । সমুচিত আহারেও শরীরে বেশ বলের সঞ্চয় হয় না । মুহুম্মুহঃ বহু পরিমাণে মূত্রস্রাব হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্বল হওয়ার্তে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির হানি ঘটে ।

শিলাজত রসায়ন সেবনে উপরি লিখিত লক্ষণসমূহ দূর হইয়া শরীর দৃঢ়, কৰ্ম্মঠ ও নীরোহ হয় । মূল্য প্রতি শিশি ৮ আট টাকা ।

বাধক-নিসূদন

বাধক রোগের মহৌষধ ।

বাধক রোগ অতি ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাপ্রদ । এই রোগ আক্রমণ করিলে ঋতুকালে কটিদেশে তলপেটে ও উরুতে ভয়ঙ্কর বেদনা, শিরঃপীড়া জ্বর, বমির ভাব ও বমি প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে । কাহারও অতি অল্প মাত্রায় রক্তস্রাব হয় । কাহারও একবারে হয়ই না । ঋতুকাল অতীত হইলে এক প্রকার শ্বেতস্রাব হইতে থাকে ।

এই সমুদায় ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে নারীজাতিকে রক্ষা করিতে বাধক-নিসূদন অব্যর্থ । ইহা সেবনে মাসে মাসে নিয়মমত রক্তস্রাব হইবে । এবং রক্তোরোধ জনিত সমুদায় যন্ত্রণা অল্পকাল মধ্যে তিরোহিত হইবে । একবার আরোগ্য হইলে আর আক্রমণের ভয় থাকিবে না । বাধকনিসূদন সেবনে বীজরক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং বীজরক্তবাহিনী সূক্ষ্ম শিরা সমূহে বীজরক্ত সমূহ সঞ্চিত হইতে থাকে । মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা ।

সর্বজন বিদিত

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ

নবাবিকৃত

ঔষধ

সর্ববিধ চূর্ণ

বনজ উপাদান ।

শ্রীবটকৃষ্ণ পাল প্রতিষ্ঠিত

ভায়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

কবিরাজ

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

৩০ নং সভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

সর্বত্র প্রসংসিত

ভায়ুর্বেদীয়

ঔষধ

ও

চিকিৎসা সম্বন্ধীয়

গ্রন্থাদির

বিস্তারিত তালিকা ।

বঙ্গদর্শন ।



নিমাই-চরিত্র

একবিংশ অধ্যায়

রামানন্দ রায় মিলন

যায মাসের শুরুপক্ষে গৌর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং ফাল্গুন মাসে পুরুষোত্তমে উপনীত হন। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস হইয়াছে। বৈশাখ মাসে গৌর বজ্রবাছবিদগকে ডাকিয়া কহিলেন “অত্র বিধব্রূপের সন্ধান আমি দক্ষিণে যাইব মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের অসুখতি হইলে আমি একাকী গমন করিতে চাই। যতদিন আমি নীলাচলে প্রত্যাগত না হই, ততদিন তোমরা এখানে আমার প্রতীক্ষা করিও।” প্রত্যঙ্গর বাক্যের আশঙ্কায় তত্তপন বিব্রত হইলেন। নিত্যানন্দ কহিলেন “একাকী বাওয়া ভাল নহে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।” গৌর উত্তর করিলেন “তুমি ত অনবরত আমাকে নাচাইতেছ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াম, তুমি আমাকে কুলাইরা লইয়া গেলে অষ্টমতের বাড়ী। নীলাচলে আসিবার পথে তুমি আমার দণ্ড ডাকিয়া ফেলিলে। তোমাদিগের মধ্যে আমার কর্তব্য-রানি ঘটিতেছে। অপরূপ ত আমাকে বিবর ভোগ না করাইরা ছাড়িতে না। যদি কখনও তাহার বাক্যের অঙ্গুরী পড়ি, তিন দিন সে আমার সহিত বাক্যলাপ করে না। আমার সন্ন্যাসগ্রহণ

মুকুন্দের অসহ। দামোদর অনবরত আমার উপর শিক্ষাদণ্ড উত্তত করিয়া আছে। ত্রীকৃষ্ণের রূপার তাঁহার লোকাপেক্ষা নাই, কিন্তু আমি ত লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারি না। আমার অন্ত ভোবাদিগকে হুঃখিত দেখিলে, তোমাদের দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া আমাকে পীড়া দেয়। তাই আমার ইচ্ছা, কিছুদিন একাকী ভ্রমণ করিয়া আসি।” অনেক বাহাদুরবাদের পর স্থির হইল, কৃষ্ণদাস নামক এক সরলমতি ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বহির্বাগ বহিবার জন্য সঙ্গে যাইবে। চারি দিন পরে গৌর বিদায়গ্রহণ করিলেন। যাত্রাকালে সার্কভৌম কহিলেন “গোদাবরী-তটে বিজ্ঞানথরে রায় রামানন্দ নামক এক ভক্ত আছেন। শ্রুত বিবরী জানে এতদিন আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। তোমার রূপার তাঁহার মহত্ব এখন বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি তোমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার সহিত অবস্ত্র অবস্ত্র সাক্ষাৎ করিও।” অঙ্গীকার করিয়া গৌর যাত্রা করিলেন। রোমন করিতে করিতে তাঁহার তত্তপন আলালদাশ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। আলালদাশে দেবদ্বিগ্রহের সম্মুখে বহু নৃত্যযীত হইল। দলে দলে লোক লোককে দেখিতে আসিয়া ভক্তি লাভ করিল।

আলালনাথ হইতে ‘হরি’ ‘হরি’ বলিয়া
গৌর বাজা করিলেন। মুখে কেবল—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, পাহি মাং ॥
রাম রাধব, রাম রাধব, রাম রাধব, রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাং ॥

ভিনি যে গ্রামের ভিতর দিয়া গমন
করিলেন, তাঁহার প্রেমমূর্তি দেখিয়া ও প্রেম-
সঙ্গীত শুনিয়া তথাকার বাবতীয় লোক হরি-
প্রেমে উন্নত হইয়া উঠিল। এসমস্ত লোক কর্তৃক
হরিনাম গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল।
দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে কীর্তন খুলি উঠিত হইল।
কুর্নস্থানে উপস্থিত হইয়া গৌর কুর্নমূর্তির
সমুখে প্রেমবিহ্বল অবস্থার নৃত্য ও কীর্তন
করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া
দলে দলে লোক দেবালয়ে সমাগত হইল।
কুর্নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে
নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং
সপরিবারে তাঁহার পাদোদক পান করত
পরম যত্নে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।
গৌর তাঁহার গৃহ ভ্যাগ করিয়া বাইবার কিয়ৎ-
কাল পরেই বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত
ব্রাহ্মণ তথায় তাঁহার দর্শনোদ্দেশ্যে সমাগত
হইল। গৌর প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া,
ব্রাহ্মণ নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল।
এমন সময়ে অকস্মাৎ গৌর তথায় প্রত্যগত
হইয়া ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার
স্পর্শে সেই গলিতকুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত
হইল। নিরাময় ব্রাহ্মণ আনন্দভরে গৌরশুণ
গান করিতে লাগিল।

বাসুদেবকে অমুগ্রহ করিয়া গৌর গোদা-
বরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গোদাবরী-
দর্শনে গৌরের বসুনার কথা মনে হইল;
তত্তীরহ বনানি দর্শনে বৃন্দাবন স্মৃতিপথে উদিত
হইল। গৌর গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার
তটে উপবেশন করত হরিনাম কীর্তন
করিতেছেন, এমন সময়ে বিবিধ আড়ম্বল
সহিত চতুর্দোলাকৃত রামানন্দ রায় সান্নাথ
নিকটস্থ ঘাটে উপস্থিত হইলেন, সন্ন্যাসী দর্শনে
রামানন্দ সসন্ত্রমে আসিয়া প্রণাম করিলেন।
পাজোখান করিয়া গৌর কহিলেন “তুমিই কি
রায় রামানন্দ?”

রামানন্দ উত্তর করিলেন “হাঁ, আমিই
সেই শূদ্রবংশোদ্ভব দাস।” উভয়ের দর্শনে
উভয়ের শরীরে স্তম্ভ, শ্বেদ, অশ্রু, কম্প,
পুলক, বৈবর্ণ্য, প্রভৃতি সাধিক লক্ষণসমূহ
আবির্ভূত হইল। উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন-
পাশে বদ্ধ হইলেন। আশ্বাসবরণপূর্বক
গৌর কহিলেন “সার্বভৌমের নিকট আমি
তোমার গুণাবলি সমস্তই শ্রুত হইয়াছি, আমি
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে
আসিয়াছি।” রামানন্দ কহিলেন “আমার
সহচর সহস্র ব্রাহ্মণ তোমার দর্শন মাগ্রেই—
‘কৃষ্ণ’ নাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের
নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে, অঙ্গ পুলকিত
হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে কি এতাদৃশ ক্ষমতা
সম্ভবপর?” গৌর কহিলেন “পরম ভাগবত
তুমি, তোমার দর্শনেই তোমার ব্রাহ্মণগণের
মন দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার মত সান্নাথদ্বী
সন্ন্যাসীও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসমান
হইয়াছে।” এমন সময়ে রামানন্দ-সঙ্গী ব্রাহ্মণ-
গণ গৌরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিয়া গৌর রামানন্দকে কহিলেন “আবার
বেন দর্শন পাই।” রামানন্দ করেকদিন তথ্য
ধাকিবার জন্ত অহরোধ করিয়া প্রণামান্তর
বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামা-
নন্দের জন্ত গৌর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন,
এখন সময়ে রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। তখন দুইজনে তত্বালাপ আরম্ভ
হইল। গৌর কহিলেন “সাধা কি, তাহা
নির্ণয় কর।”

রামানন্দ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।

বিষ্ণুরাধাতে পস্থা নাত্তত্ত্বোৎসাহকারণম্॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩।৮।৮

পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন পুরুষ
কর্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন
তাঁহার প্রীতি সাধনের বিত্তীয় পস্থা নাই।

গৌর—ইহা বাহ্য ; ইহার পরে কি বল।

রামা—

যৎ করোসি যদশ্রাসি যজুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্তসি কোত্তের তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

গীতা—৯।২৭

হে কোত্তের, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা
হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্তা কর,
তৎসমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

গৌর—ইহা বাহিরের কথা ; ইহার পরে
কি বল।

রামা—

অজ্ঞাট্রৈবং গুণান্ দোষাশ্চাদিষ্টানপি বকান্।

ধর্মান্ সংতাজ্য যঃ সর্কান্ মাং ভজ্যেৎ স চ সন্তমঃ॥

ভাগবত—১।১।১০২

যৎকর্তৃক বাহা বাহা আদিষ্ট হইয়াছে,
তাঁহার দোষগুণ বিচারপূর্বক তৎসমস্ত পরি-

ত্যাগ করত যে ব্যক্তি আমাকে ভজন করেন,
তিনিই সন্তম।

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাযেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্বপাণেভ্যো যোক্তব্যমিমাংস চ ॥

গীতা—১৮।৬৭

সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয় একমাত্র আমার
শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে
মুক্ত করিব ; শোক করিও না।

গৌর—এ ত বাহ্য ; ইহার পরে কি বল।

রামা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জতি

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাং ॥

গীতা। ১৮।৫৪।

“যিনি (জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ অবলম্বন-
পূর্বক) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তিনি
কিছুতেই শোক করেন না। তিনি সর্বভূতে
সমতাব্যবহৃত হইয়া, আমার প্রতি পরম ভক্তি
লাভ করেন।” জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই সাধ্যসার।

গৌর—ইহাও বাহিরের কথা ; ইহার পরের
কথা বল।

রামা—জ্ঞানশূন্য ভক্তিই সাধ্যসার।

জ্ঞানে প্রভাসমুদপাত্ত নমস্ত এষ,

জীবন্তি সগুণব্রিতাং ভবদীরবাক্যম্।

স্থানস্থিতাঃ প্রতিগতাঃ তত্ত্ববান্ধনোতি-

র্থে প্রারশোহজিতভক্তিতেহ্যনি

ভৈষ্ণবোক্ত্যম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১৩

জ্ঞানলাভে প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া

বাহ্যরা তোমাকেই কেবল প্রণাম করেন, এবং

সাধুগুণিনঃস্বতঃ ভবদীর কথা শ্রবণ করত

কায়মনোবাক্যে সংপথ্য হইয়া জীবন ধারণ

করেন, তুমি জিতুবলপ্রাপ্য হইলেও তাঁহা-

দিগের নিকট হুৎসল্য।

গৌর—ইহাও বাহু ; ইহার পরে কি বল ।

রামা—প্রেমভক্তিই সর্বসাধারের সাহায্য ।

গৌর—ইহাও হয় ; কিন্তু ইহার পরে কি বল ।

রামা—দাস্ত্রপেম সর্বসাধারের ।

ব্রহ্মা—প্রতিমাতে পুমান্ ভবতি নির্মলঃ ।

তত্ত্ব-তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—১।৫।১১

যাহার নাম শ্রবণমাত্র পুরুষ নির্মল হয়,
তাঁহার দাসগণের আবার কি প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে ?

গৌর—ইহাও হয়, কিন্তু ইহারও পরে কি আছে বল ।

রামা সখ্যাপ্রেম সর্বসাধারের ।

ইথং সত্যং ব্রহ্মস্বভূত্যা

দাস্ত্রং গতানাং পরদৈবতেন ।

মার্যাপ্রিতানাং পরদারকণ

সাক্ষিং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপূজাঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবত—১।১২।১১

যিনি এইরূপ ব্রহ্মস্বভূতিস্বরূপে
সাধুগণের নিকট, পরদৈবতারূপে দাস্ত্র-
রসের ভক্তগণের নিকট এবং নরশিগুরূপে
মার্যাপ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হন,
সেই ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্য ব্রহ্ম-
রাখালগণ বিহার করিয়াছিলেন ।

গৌর—উত্তম, কিন্তু ইহার পরে কি বল ।

রামা—বাৎসল্যাপ্রেম সর্বসাধারের ।

নেমং বিরিকির্ণ ভবো ন শ্রীরণ্যকসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরেগোপী যন্তং প্রাপ বিমুক্তিদাং ।

ভাগবত—১।১৫

গোপী বশোদা মুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট
যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মা, মহাদেব ও

তাঁহার বন্ধুহিতা লক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত
হইন নাই ।

গৌর—ইহাও উত্তম, ইহার পর কি আছে
বল ।

রামা—কান্ত্যাব সর্বসাধারের ।

নাথং শ্রিয়োহং উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বধোষতাং নলিনগন্ধকৃতাং কুতোহস্তাঃ ।

রাসোৎসবেহং ভূজদগুহীতকর্ষ-

লক্ষণিবাং য উদগাং ব্রহ্মসুন্দরীগাম্ ।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ বাহদগুহীতকর্ষ-
ব্রহ্মসুন্দরীগণের যে প্রসাদ সমুদিত হইয়াছিল,
অন্তের কথা দূরে থাকুক, নিতাস্তারাগিণী
লক্ষ্মী ও নলিনগন্ধবতী স্বর্গকামিনীগণেরও
তাহা প্রাপ্য হয় নাই ।

কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে ;
তাহার তারতম্যও আছে । কিন্তু বাহার যে ভাব,
তাহাই তাহার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট । তটস্থ হইয়া
বিচার করিলে তারতম্য বোধ করা যায় ।

শান্ত, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রস
পাঁচটি । আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্রিতি—
এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ
বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, তেজের
গুণ জলে ও জলের গুণ ক্রিতিতে আছে,
তেমনি পঞ্চরসের প্রত্যেকের গুণ তাহার
পরবর্তী রসের মধ্যে নিহিত আছে । শান্ত, সখ্য
ও বাৎসল্য সকলের গুণই মধুর রসে আছে ।

এই মধুর রসেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ।

ন পারয়েহং নিরবন্তসংযুজাং

স্বসাধুকৃতাং বিবুধায়ুপাং বঃ ।

বা মাং ভজন্ হর্ষরগেহপ্ৰাণাঃ

সংক্শ্য তথ্যঃ প্রতিবাতু সাধুনা ॥

ভাগবত—১।১৩।২২

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—হৃদয়গুণ, তোমাদিগের সহিত আমার প্রেমসংযোগ নিরবত; বহু ব্রহ্মপাত কাল জীবন ধারণ করিয়াও তোমাদিগের প্রতি কর্তব্যাহুতান করিতে সক্ষম হইব না। কেননা, তোমরা হৃদয়ে গৃহশুশ্রূষা ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সমর্থ নহি। অতএব নিজ নিজ সাধু ব্যবহার দ্বারা তোমাদিগের কৃত সাধু ব্যবহারের বিনিময় হইল।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—ঐহ্যকে যে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকেন। মধুর ভাবে বাহ্যরা ঐহ্যকে ভজনা করে, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে ভজনা করিতে সক্ষম হইবেন না বলিয়া সেই ভক্তগণের নিকট ঋণী থাকেন।

গৌর—সাধের ইহাই সীমা বটে, তবে ইহারও পরে বাহ্য আছে রূপা করিয়া বল।

রামা—ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক আছে—তাহা জানিতাম না। মধুর রসের মধ্যে রাধার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ। গোপীগণ বলিয়াছিলেন—

অনরাধাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
বনো বিহার গোবিন্দঃ প্রীতো বামনয়দ্রহঃ ।

ভাগবত—১০।৩০।২৪

রাধিকা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন; যেহেতু কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ইহাকেই বিজ্ঞান প্রদর্শন লইয়া গেলেন।

পদ্মপুরাণে আছে—

বাধা রাধা প্রিয়া বিকোত্ততাঃ কুণ্ডল প্রিয়ং তথা ।

সর্বগোপীবৃ সেবিকা বিকোত্তাত্তবলতা ॥

রাধিকা বেক্ষণ কৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডল ভঙ্গ্য। গোপীগণের মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অভ্যন্ত বলতা।

গৌর—তোমার যুখে অমৃতনদী বহিতেছে। আজ্ঞা, অস্ত্রের অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রস্ফুটিত হয় না। গোপীগণের ভয়ে কৃষ্ণ রাধিকাকে চুরী করিয়াছিলেন। যদি রাধিকার জন্ত গোপীগণকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেই রাধিকার জন্ত তাঁহার গাঢ় অমুরাগ প্রকাশিত হইত।

রামানন্দ—কৃষ্ণ গোপীগণের রাসনৃত্য ত্যাগ করিয়া রাধার অবেষণ করিতে করিতে বিলাপ করত বনে বনে করিয়াছিলেন। শত কোটি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাস কালে একমুষ্টি রাধাপার্থে সদা-সর্বদা বিরাজ করিয়াছিল। রাধা অভিমান ভরে রাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শনে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার অবেষণে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোথাও তাঁহার উদ্দেশনা পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শতকোটি গোপীতেও কৃষ্ণের কাম নিকাপিত হয় নাই,—এক রাধিকাতেই তাঁহার তৃপ্তি। ইহাতেই রাধিকার গুণ অসূচিত হইতে পারে।

গৌর—তোমার নিকট আমার আগমন সার্থক হইয়াছে। এখন কৃষ্ণ-রাধিকার স্বরূপ এবং রস ও প্রেমভব কিছু বল।

রাম—আমি ইহার কিছুই জানি না। তুমি বাহ্য বলাইতেছ—তাহাই বলিতেছি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাধিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণত্বাৎ ।

কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনিই সকলের
আদি, তিনি স্বয়ং অনাদি। কৃষ্ণই গোবিন্দ
এবং সর্বকারণের কারণ।

প্রফুল্ল কমলানন, পীতাম্বর বনমালী
মম্বথেরও মন মুগ্ধ করেন। নানাভাবাপ্রতিভা
ভক্তগণের রসামৃতের তিনিই বিষয়স্বরূপ।
তিনি শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তিধর, এবং অস্ত্র যাবতীর
অবতারের মনোহারী। তিনি আপন মাধুর্য্যে
আপনারই মন হরণ করেন এবং আপনাকে
আপনি আলিঙ্গন করিতে চাহেন।

কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। এখন
রাধাতত্ত্ব কিছু বর্ণনা করি। কৃষ্ণের অনন্ত
শক্তির মধ্যে তিনটা প্রধান—চিৎশক্তি, মায়ী-
শক্তি ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি অন্তরঙ্গ,
বহিরঙ্গ ও তটস্থ বলিয়াও অভিহিত হইয়া
 থাকে। ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কৃষ্ণের স্বরূপ-
শক্তি এবং ইহাই সর্বপ্রধান। কৃষ্ণ সং চিৎ
ও আনন্দস্বরূপ। অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তিও
তদনুযায়ী ত্রিবিধ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও
সংবিৎ। হ্লাদিনী শক্তি হেতু কৃষ্ণ সদা
সুখসাগরে মগ্ন থাকেন। সুখস্বরূপ নিজ
সুখ আবাদন করেন এবং ভক্তগণকে
আবাদন করান। হ্লাদিনী শক্তিই ভক্ত-
গণের সুখের কারণ। হ্লাদিনীর সারভূত
অংশের নাম প্রেম, অথবা আনন্দচিন্ময় রস।
এই প্রেমের সারতম অংশ মহাভাব বলিয়া
খ্যাত। এই মহাভাবে কৃষ্ণের বাহ্য পূর্ণ
হয়। শ্রীমতী রাধিকা মহাভাবস্বরূপা
এবং একমাত্র তিনিই কৃষ্ণের বাহ্যপূর্ত্তি
করিতে সক্ষম।

ক। কৃষ্ণ প্রেমরজনিতঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা,
কান্ত প্রেমতত্ত্বমগ্ণা রাধিকৈকা ন চাক্ষা।

জৈষ্ঠ্যঃ কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বঃ কুচেহস্তা
বাহ্যপূর্ত্ত্য প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চাক্ষা।

কৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? একা
শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অহুপম-গুণবতী
প্রেমসী কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। কেশে
কুটিলতা, নেত্রে তরলতা, স্তনে নিষ্ঠুরতা, এক
রাধিকারই আছে; একমাত্র রাধিকাই হরির
বাসনা পূর্ত্তি করিতে সক্ষম, অন্ত কেহ নহে।

নিরন্তর কামক্রীড়া বলিয়া কৃষ্ণের নাম
“ধীরললিত।” যে পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর),
নবতরুণ, পরিহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত ও প্রেমসৌবশ,
তাহারই নাম ধীরললিত। কৈশোরে কৃষ্ণ
রাত্রি-দিন রাধার সহিত কুজক্রীড়া করিয়া-
ছিলেন।

গৌর—বেশ! আর কি আছে বল।

রামা—আর আমি জানি না। তবে
আমার স্বীকৃত একটি গান শোন।

রামানন্দ গাহিলেন—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।

অহুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥

না সো রমণ না হাম রমণী।

তুঁহ মন মনোভব পেপল জানি ॥

এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।

কাহুঠামে কহবি বিচুরল জানি ॥

না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।

তুঁহ কেরি মিলনে মথত পাঁচবাণ ॥

অব সেই বিরাগ তুঁহ ভেল দূতী।

হুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি ॥

গৌর—সাধ্যবস্ত কি তাহা বুঝিলাম।

কিন্তু সাধন বিনা কেহ সাধ্য লাভ করিতে
পারে না। এখন এই সাধ্যবস্তুর উপায়স্বরূপ
সাধন-তত্ত্ব কিছু বল।

রামানন্দ—তুমি বাহা বলাইতেছ, তাহাই বলিতেছি; শোন। সাধনের কথা অতি নিগূঢ়। সখী ভিন্ন কেহ রাধাকৃষ্ণ-লীলা বুঝিবার অধিকারী নহে। সখী হইতে এই লীলার বিস্তার। সখীভাবে ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-সেবারূপ সাধ্যবস্ত কেহই পাইতে পারে না।

সখীর স্বভাব বর্ণনা করা কঠিন। কৃষ্ণের সহিত নিজে জড়ীড়া করিতে সখীর মন নাই। সখী চায় কৃষ্ণের সহিত রাধিকার লীলা সংঘটন করিতে। কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্ললতা রাধিকার স্বরূপ; সখীগণ সেই কল্ললতার পল্লব, পুষ্প ও পত্র। কৃষ্ণলীলামূতে লতা সিঞ্চিত হইলে, পল্লব, পুষ্প ও পত্র অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। এদিকে সখীগণ কৃষ্ণসঙ্গমস্থল কামনা না করিলেও, রাধিকা যত্ন করিয়া তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম সংঘটন করেন। সখীগণ স্বকীয় ইচ্ছায় সুখ বাঞ্ছা করেন না—কৃষ্ণের সুখের জন্তই তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম। যে ভক্ত সেই গোপীভাবামূতে অভাবী, বেদধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। যে রাগানুগ মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রজলোকের যে ভাবে ভক্ত তাঁহাকে ভজনা করেন—তিনি তদনুরূপ গতি লাভ করিয়া ব্রজধামে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিধিমার্গে কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে।

নায়ে সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মতুতানাং বধাতত্ত্বিমতামিহ।

বশোদানন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্মনিষ্ঠ দেহি-

বৃন্দের সবন্ধে যেক্রপ সুখলভা, আশ্বহৃত জ্ঞানিবৃন্দের পক্ষে তদ্রূপ নহেন। এই জন্তই ভক্ত গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া রাজি-দিন রাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করেন। গোপীভাব বর্জন করিয়া কৃষ্ণের ঐশ্বর্য চিন্তা করিলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লক্ষী ঐশ্বর্যশালী বিষ্ণুর ভজন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হন নাই।

ইহা শুনিয়া গৌর প্রেমভরে রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন। সমস্ত রাজি কৃষ্ণ-কথালোপে অতিবাহিত হইল। রামানন্দের অনুোধে দশ দিন গৌর তথায় অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন কৃষ্ণকথা চলিতে লাগিল। একদিন গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন “বিষ্ণুর মধ্যে সার কি?”

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি বিনা আর বিষ্ণু নাই।

গৌর—জীবের কোন্ কীর্তি সর্বশ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-খ্যাতি।

গৌর—কান্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণপ্রেম।

গৌর—হৃৎসমধ্যে গুরুতর কি?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি-বিরহ।

গৌর—মৃতসম্মুখে কে শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ—যে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করে।

গৌর—গানমধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ গান?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি বাহার মন্দ।

গৌর—শ্রেয়োমধ্যে সারতম কি?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।

গৌর—অনুরূপ জীব কি স্মরণ করিবে?

রামানন্দ—কৃষ্ণগুণ-লীলা।

গৌর—দ্যেয়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণ-পাদাশুভ।

গৌর—সর্বভ্যাগ করিয়া কোথায় বাস করা জীবের উচিত ?

রামানন্দ—শ্রীবন্দ্যবনে।

গৌর—উপাত্তের মধ্যে প্রধান কে ?

রামানন্দ—যুগল-মূর্তি।

গৌর—মুক্তি ও ভুক্তিকামের স্থিতি কোথায় ?

রামানন্দ—স্বাবর-দেহ ও দেব-দেহ। অরুণজ্ঞ জ্ঞানী কাকের মত জ্ঞানরূপ নিষ্কল চোষণ করে। রসজ্ঞ ভক্ত কোকিল-শ্রেয়রূপ আশ্রয়কুল ভক্ষণ করে।

আর এক দিন রামানন্দ কহিলেন “কৃষ্ণ-ভক্ত, রাধাভক্ত, প্রেমভক্ত, তুমি সমস্তই আমার চিত্তে প্রকাশিত করিয়াছ। বাহিরে উপদেশ না দিয়া তুমি ভিতর হইতে এই সমস্ত ভক্ত আমার অন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়াছ। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য জ্ঞান আমার বিদূরিত হইতেছে না। প্রথমে আমি তোমার সন্ন্যাসি-মূর্তি দেখিয়াছিলাম। এমন জ্ঞানবর্ণ গোপরূপে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তোমার সম্মুখে যেন এক কাঞ্চনময়ী গঙ্গালিকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার গৌর কান্তির আভার তোমার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। আর দেখিতেছি—তুমি বংশীবাদন শ্রামসুন্দর রূপে ভাবময় চঞ্চল দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ। ইহার কারণ আমাকে বল।

গৌর কহিলেন—“রাধাকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ তুমি এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক

স্বাবরজন্ম সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দেখিতে পান।”

রামানন্দ কহিলেন “আমাকে ছলনা করিতে পারিবে না। তোমার নিজরূপ আমাকে দেখাইতেই হইবে। স্বীয় রস আশ্বাদনার্থ তুমি রাধিকার ভাব ও কান্তি অলৌক্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। আপনি আপনার প্রেম আশ্বাদন করিতে করিতে তুমি আত্মবদ্বিক ভাবে জিতুবন প্রেমময় করিয়াছ। আমাকে উদ্ধার করিবার জন্তই এখানে তুমি আসিয়াছ,—তবে আবার কপটতা কেন ?”

তখন রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূর্তি গৌর রামানন্দকে দেখাইলেন। রামানন্দ দেখিয়া মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন।

দশ দিন অতিবাহিত হইল। খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে যেমন তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা, রত্ন, চিত্তামণি,—উত্তরোত্তর উত্তমবস্তু লাভ হয়, তেমনি উভয়ের কথোপকথনে ক্রমেই অধিকতর সুলাবান্ তত্ত্ব-কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অবশেষে গৌর বিহার প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ পরম হৃঃখিত চিত্তে তাঁহাকে বিহার দিলেন। বিহার কালে গৌর কহিলেন “তুমি বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন কর। আমি সত্বরই তাঁর ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইব। তখন উভয়ে একত্র অবস্থান করিব।”

(ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

উৎপল

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুধু লতায় মঞ্জরী

প্রথম বয়সে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রতি রাজাধিরাজ অশোকদেবের ব্যবহার বিশেষ উদার ছিল না। বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধ-বাদী সমাজবিপ্লবকারী ক্রমবদ্ধমান এই সম্প্রদায়ের ধৰ্ম্মমত তখনও জন-সাধারণ মধ্যে তত প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু ভিক্ষু-মণ্ডলীর বৈরাগ্য, অহিংসা, জীবে দয়া, নিরহঙ্কার, বিপদে নির্বিকার সহিষ্ণুতা, সার্বজনীন প্রীতি লোকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। অনেকে এই নবীন ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। রাষ্ট্রনীতি-কৌশল-পরিচালিত রাজসভায় ব্রাহ্মণ, শ্রমণ উভয়েই প্রায় তুল্য সমাদর পাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত ছিদ্র পাইলে অশোকদেব এই নবীন সম্প্রদায়ের লোককে দণ্ডিত করিতে ক্রটি করিতেন না।

রাজাধিরাজ অশোক অপরাহ্নে যুগয়া হইতে রাজধানীতে প্রত্যগত হইয়াছেন। ভিক্ষু উপপুণ্ড্র সম্বন্ধে কি বিধান হয়, জানিবার জন্য নগরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজি প্রভাতেই ভিক্ষুর বিচার হইবে।

সেকালেও যে রাজরাজস্বৰ্গ সাত্ত্বী গ্রহরী অথবা পার্শ্বরক্ষক দ্বারা সৰ্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিতেন, তাহা উল্লেখ করাই নিম্প্রয়োজন। নন্দবংশের উচ্ছেদসাধনের পর হইতে রাজ-

রাজড়ার রাজিবাস-গৃহও অনেক সময় অতি বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ ভিন্ন অস্ত্রের অজ্ঞাত থাকিত। কোন্ রাজিতে কোন্ রাজ্যের গৃহে, অথবা কোথায় বহুবল্লভ রাজ্যের নিদ্রার স্থান নির্দিষ্ট হইত, তাহা সকলে জানিতে পারিত না। রাজাও হয় ত পূৰ্ব্বনির্দিষ্ট গৃহে গমন না করিয়া গৃহস্থামিনীর অভিমান ক্ষুণ্ণ করিতেন এবং অল্প গৃহে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অতর্কিত অল্প-গ্রহে অপরাধে অতি সম্মানিত করিতেন। এইরূপ ক্ষুণ্ণ অভিমান অথবা অতর্কিত সম্মান যে রাজ্যের অহুরাগ-বৈষম্যে সংঘটিত হইত, তাহা নহে। দেশকালপাত্র বিবেচনায় শত্রু-সমাকুল রাজরাজড়ার পক্ষে এইরূপ অজ্ঞাত গৃহবাস সেকালে নিতান্ত বিধেয় বলিয়াই পরিগণিত হইত।

পরিচারিকা লীলা সন্ধ্যার পর হাসিতে হাসিতে আসিয়া রাজ্যী কাকবকীকে জানাইল, রাজাধিরাজ দেবী অসন্ধিমিত্রার গৃহে রাজিযাপন করিবেন।

“তুই কেমন করিয়া জানিলি?”

“মৌবিক মহাশয় প্রতীহারীদিগকে বলিয়া দিয়াছেন; অন্তঃপুরে অনেকেই তাহা শুনিয়াছে।”

“তাহা শুনিয়া তোমর আনন্দ কেন?”

“আমি মালিনীকে ফুল-মালায় জড় সংবাদ-

দিয়া আসিলাম। অণ্ডক, চন্দন, গন্ধচূর্ণ—
আর সময় নাই।—সৌবিক মহাশয় আমাকেও
কিছু বলিয়াছেন।”

“মহা হতভাগী! শেষে লোক হাসাবি
না কি?”

“আমরা হাসিব, অস্ত্রের কারা পায়,
কাঁদিবে।”

রাজা তখন স্নিহমুখে বলিলেন,—

“যাহা যাহা করিতে চয়, কর গিয়া;
কাহাকেও কিছু বলস্ না।”

দেবী কারুবকীর প্রমীতসেনকে কারাগার
হইতে মুক্তি দিয়াছেন, কিন্তু মৃগয়া হইতে
কিরিয়া রাজাধিরাজ যখন অবস্থা শুনিয়া কারণ
জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি উত্তর দিবেন,
ভাবিয়া দেবী চিন্তাযুক্ত ছিলেন। তিস্তা উপ-
শুণ্ডের অপরাধ মার্জনার জন্য রাজাধিরাজকে
অহরোধ করিবেন, মঞ্জুলার নিকট প্রতিশ্রুত
হইয়াছেন; কিন্তু ক্রুদ্ধপ্রতাপ রাজাধিরাজের
কার্য্যে অনধিকারচর্চা যে তঃসাহসের কৰ্ম্ম,
দেবী তাঃ জানিতেন। দেবীর একমাত্র
ভরসা, যদি রাজাধিরাজ অস্ত্রের নিকট অবস্থা
শুনিলে পূর্বে একবার নিজে তাঁহাকে
বলিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে কৃতকার্য্য
হইবার অনেকটা সম্ভাবনা। সে সুযোগ কি
ঘটিবে? সন্ধ্যার পূর্বে একবার সাক্ষাৎ
হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত নির্জন সাক্ষাৎ
নহে। রাজাধিরাজ অন্তঃপুরে পৌছিলে
সপত্নী, ভোগিনী, আত্মীয়, পরিচারিকা সকলে
মিলিয়া মজলাচরণপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা,
অভিবাদন করিয়াছিলেন। তখন কোন কথা
বলিবার, প্রার্থনা জানাইবার সুযোগ ত ঘটে
নাই।

দেবী কারুবকীর শয়নগৃহ সুসজ্জিত;
স্নিগ্ধ গন্ধদীপ-মালায় আলোকিত; পুষ্পস্তবক
মালা, অণ্ডক-চন্দনপ্রক্ষেপে, শুগুণ্ডল গন্ধে
সুসজ্জিত হইল। লীলা অল্প সময়ের মধ্যে
রাজ্যীর বেশভূষার শোভন পরিবর্তন এবং
তাঁহার কেশকলাপে অপূর্ণ শ্রীমতী কবরী
রচনা করিতে ভুলিল না। বহু সপত্নীপরি-
বৃত্তা বিগতোন্মুখযৌবনা রাজরানীও অঙ্গ-
প্রসাধন বাপারে ঔদাসীত প্রদর্শন করেন না;
রাজ্যী কারুবকীর ত আজ বিশেষ প্রয়োজনই
ছিল। ক্রমে রাজি বাড়িতে লাগিল। বাসক-
সজ্জা রাজ্যী উৎকণ্ঠিত হইলেন, গৃহে এবং
অলিন্দে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। পরি-
চারিকার কথায় বিশ্বাস করিয়া শেষে কি
বিপ্লবকার বিষয় মনোবাখা ভোগ করিতে
হইবে?

এমন সময় লীলা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ
দিল, রাজাধিরাজ আসিতেছেন। রাজ্যী সেই
অলিন্দেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজা-
ধিরাজ উপস্থিত হইলে রাজ্যী অগ্রসর হইলেন,
হস্তস্থিত শ্বেতপুষ্পমালা তাঁহার গলদেশে
পরাইয়া দিয়া প্রণাম ও তাঁহার পূজা করিলেন।
অশোকদেব হাতে ধরিয়া রাজ্যীকে তুলিলেন।
ফুলমালা পত্রপল্লবে সজ্জিত সুসজ্জিত গৃহের
শোভা এবং রাজ্যীর বেশভূষা ও অঙ্গরঙ্গের
পারিপাট্য দেখিয়া রাজাধিরাজ স্নিতমুখে
বলিলেন,—

“এ গৃহে যে চিরবসন্ত বিদ্যাজ করে!”

“এখানে দেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে,
তাই শুক লতারও মঞ্জরী দেখা যায়।”

দীপরশ্মি প্রভাসিত রাজ্যীর প্রফুল্ল মুখের
দিকে চাহিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন,—

“তুফলতা ?—তুফলতার সজীবনী শক্তিতে বৃদ্ধ দেবতার দেহও যে উৎফুল্ল হইয়া উঠে !”

হাসিতে হাসিতে উভয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাধিরাজ পালঙ্কে উপবেশন করিলে রাজ্ঞী বলিলেন ;—

“সৌবিক আজ রাজ্ঞী অসন্ধিমিত্রার নাম করিয়াছিল।”

“সৌবিক অসন্ধিমিত্রার নাম করিলে যে কাহাকে বুঝায়, তুমি তাহা জান।”

“কিন্তু কয়দিন পরে আজ রাজধানীতে আগমন, আমি এতটা সৌভাগ্যের আশা করিতে সাহস পাই নাই !”

“আত্মশক্তিতে তোমার বিশ্বাস কম।”

“জীজাতির আবার আত্মশক্তি !”

“নয় কেন ?”

“ত’র উপর কি নির্ভর করা যায় ?”

“চিন্তের সাহস পৃথিবী জয় করিতে পারে।”

“পৃথিবী জয়ে আমার প্রয়োজন নাই।—মাসীর একটি প্রার্থনা আছে।”

“অশোকের প্রিয়তমা মহিষীর আদেশ প্রচার হউক।”

রাজ্ঞী একটুকু হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের উৎফুল্লতা বেন একটুকু কমিয়া গেল। কণকাল বিলম্ব করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন ;—

“এই মাত্র জীজাতির সাহসের কথা বলিতেছিলেন, আমি এক অসম সাহসের কাজ করিয়া কেলিয়াছি।”

“অসম সাহস আছে বলিয়াই ত রাজ্ঞী যাক্‌বকী বোঁকিও প্রতাপ অশোকদেবের উপ-যুক্ত মহিষী।—তাপারটা কি ?” রাজাধিরাজ

হাসিয়া বলিলেন, “কোন প্রশ্নের উপদেশে ভিক্ষুণী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ ?”

“রাজাধিরাজ যেদিন রাণসিংহাসন ত্যাগ করিয়া ‘ভিক্ষু হইবেন, দাসীও তাঁহার পদাশ্রয় করিব।’

“তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে।”

রাজ্ঞী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথা কাহেতেছিলেন, রাজাধিরাজ তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে পালঙ্কের উপর বসাইলেন, বলিলেন ;—

“কি অসম সাহসের কাজ করিয়াছ ?—ধর্মপালের কারাবাদের আদেশ দিয়াছ, না কলিঙ্গ-জয়ের জন্য সৈন্ত পাঠাইয়াছ ?”

“অতদূর সাহস হয় নাই।”

“তবে কি ?”

রাজ্ঞী ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন ;—

“মঞ্জুলা আসিয়াছিল—”

“মঞ্জুলা ?—কেমন আছে ? অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই।”

“আমার অপরাধ ক্ষমা হইবে ?”

“কি অপরাধ ?”

“মৃগয়া-যাত্রার দিন সচিবপুত্র প্রমীত-সেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল—”

রাজাধিরাজ হাসিয়া উঠিলেন।

“প্রমীতসেন ত কোন অপরাধের কার্য করে নাই।”

“রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে সেদিন এক জন ভিক্ষু এবং প্রমীতসেনের কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।”

“সেই কথা ? এখন মনে পড়িতেছে।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, ভিক্ষু আমাকে সম্বোধন করিয়া কি যেন বলিবার সময় লোকের ঠেলাঠেলিতে অহরিণীদিগের রক্ত-

সীমার উপর হেলিয়া পড়ে। একজন প্রহরিনী তাহাকে শূলবিদ্ধ করিতে উত্তত হয়। প্রমীত-সেন ভিক্সকে রক্ষা করাব জন্ত মগ্নসর হয়। প্রমীত কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই। রাজি প্রভাতে তাহার মুক্তির আদেশ দিব :— এখনকোন্ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, বল।”

রাজী পরিপক্ক ব্যবহারজীবী ছিলেন না। পুনরায় ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন ;—

“মঞ্জুলা আসিয়াছিল—”

“হাঁ, তাই কি ?”

“আমি প্রমীতসেনের মুক্তির জন্ত ধর্ম্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি তাহাকে কারা হইতে মুক্তি দিয়াছেন।— দায়ী অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।”

“এই অপরাধ ?”

রাজী মুখ নত করিয়া রহিলেন।

রাজাধিরাজ তখন সেই প্রবীণ রাজীর চিবুক ধরিয়া মুখ উঁচু করিলেন এবং নিজের গলদেশ হইতে পূজা-উপহার পুষ্পমালা খুলিয়া লইয়া তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। রাজীর মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজাধিরাজের পরামর্শ

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“কত লোক ত বিচারে বিচারে দণ্ডিত হয়, কোন দিন ত তুমি কাহারও জন্ত অনুরোধ কর নাই। প্রমীতসেনের জন্ত তোমার এত ব্যস্ততা কেন ?”

“প্রমীতসেনকে চিনি না, কোন দিন তাহাকে দেখি নাই। তবে সচিবপুত্র যে নগরে একজন ভাল লোক—ধনী, দাঠা, দরিদ্রের

বন্ধু এবং আপনার বিশ্বাসভাজন, তাহা ত আপনার মুখেই কতদিন শুনিয়াছি।—আমিও এক অনুরোধে পড়িয়াছিলাম।”

রাজাধিরাজের কোতূহল উদ্ভিক্ত হইল ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“কে তোমাকে অনুরোধ করিল !”

“মঞ্জুলা।”

“মঞ্জুলা ! তাই বলিতেছিলে, মঞ্জুলা আসিয়াছিল ?”

“হাঁ।”

“সে কেন প্রমীতের জন্ত অনুরোধ করিল ? প্রমীত তাহার কে ?”

“কেহই নহে। মঞ্জুলা একদিন মাত্র প্রমীতসেনকে দেখিয়াছিল।”

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। রাজী তখন সেই চর্যোগময় সন্ধ্যায় নগরোপকণ্ঠে মঞ্জুলার সঙ্গে প্রমীতের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজাধিরাজ বলিলেন :—

“মঞ্জুলা ত এখন আর ছোট বালিকা নহে।”

“তাহার বয়স আঠার বৎসর পার হইয়াছে।”

“নগরের পথে দৈব-চর্যোগমধ্যে ক্ষণ-কালের পারচয়, তাহার জন্ত অনুরোধ।”

“ক্ষণকালের পরিচয়ে আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হইতে পারে।”

“হইতে পারে বটে, এখানেও কি তাহাই হইয়াছে ?”

“অসম্ভব কি ?”

রাজাধিরাজ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন ;—

“মঞ্জুলা বড় হইয়াছে, মাতার কাছে থাকে। শেষে কি সে সেই অভাগিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে?”

“অসম্ভব। আমি ত তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছি। মঞ্জুলার চরিত্র পবিত্র। আর, সে অভাগিনীর স্বভাবও ত অনেক দিন সংশোধন হইয়াছে।”

“সে বাহাই ইউর, এ ভাবে আর দিন যাওয়া উচিত নহে। মঞ্জুলার বিবাহের কি হইল?”

“কিছুই হয় নাই। নানা কারণে তাহার উপযুক্ত বর যে সহজে মিলিবার নহে, তাহা রাজাধিরাজের অজ্ঞাত নহে।”

“মঞ্জুলা কেন প্রমীতের জন্ত অনুরোধ করিল?”

“আমি যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।”

“বটে? প্রমীতের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইলে কেমন হয়?”

“হইলে ত অতি উত্তম হয়, কিন্তু প্রমীত-সেন যে বিবাহিত, তাহার পত্নী বর্তমান!”

রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন;—

“মহারাজা অশোকের ত একের অধিক রাজ্ঞী বর্তমান!”

রাজ্ঞীও হাসিয়া উত্তর দিলেন;—

“রাজা মহারাজার পক্ষে বাহা সম্ভব বা শোভন, অপরের পক্ষেও কি তাই?”

“নয় কেন?—প্রমীতের অতুল সম্পত্তি। সে সম্মত হইবে?”

“কাহার কথা বলিতেছেন?”

“প্রমীতের কথা।”

“প্রমীত আর একদিন মঞ্জুলার গৃহে যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছে।”

“ও হোঃ! তাহার পর?”

“প্রমীত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে।”

“আর মঞ্জুলা?”

“চিত্ত হারাইয়াছে।”

“তবে আর কি চাই?”

“রাজাধিরাজের অনুগ্রহ।”

“ঘটকতাতা কি আমাকেই করিতে হইবে?”

“না; আমিও করিব না। কিন্তু প্রমীত যে মঞ্জুলার অনুরোধে কারামুক্ত হইয়াছে, সে কথা কোনরূপে তাহাকে জানাইতে হইবে।”

“কেন?”

“উভয়ে উভয়ের নিকট ঋণী থাকা ভাল। একপক্ষ ঋণী থাকিলে অপর পক্ষের মনে অভিমান থাকিয়া যায়। সে স্থলে চিত্তের বিনিময় হয় না, ঋণী চিন্তদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করে।”

নীরব হস্তে রাজাধিরাজের মুখ প্রভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন;—

“শুনিয়াছি, পিতামহ ঠাকুরের এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম চাপক্য পণ্ডিত। রাজনীতি এবং অর্থনীতি-শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। কিন্তু বুদ্ধ পণ্ডিত ঠাকুর আজ জীবিত থাকিলে, চিত্তবিনিময় শাস্ত্রের হৃদয় বিচারে তোমার নিকট হার মানিতেন।”

রাজ্ঞীর মুখ হাসিময় হইল, তিনি বলিলেন;—

“চিত্ত বলিয়া যে একটা কিছু পণ্ডিত ঠাকুরের ছিল, তাহা শুনি নাই; স্তব্ধতা তাহার দানবিনিময় হয় ত তিনি বুঝিতেন না।—অনেক জ্ঞানীলোক চিত্তবিনিময় চায় না, অতদূর উচ্চ আকাজকা তাহাদের মনে স্থান পায় না, নিজের চিত্ত দান করিয়াই তাহারা সুখী।”

রাজাধিরাজ হাসিলেন, আদরে রাজ্যের
কবরী স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—

“সেইরূপ ছলভ চিত্তের বিনিময়ে দান
করিবার উপযুক্ত কিছু রাজরাজ্যের ভাণ্ডারে
নাই !”

লজ্জায় রাজ্যের স্মিত-প্রকৃষ্ট মুখ নত,
আরক্ত হইল।

রাজাধিরাজ বলিলেন ;—

“মঞ্জুলা যদি চিত্ত হারাইয়াই থাকে—
প্রমীতকেই দিয়া থাকে, তবে আর তাহার
জন্ত বাস্তবতা কেন ?”

“আত্মীয় সুহৃদেরা তাহাতে তপ্ত থাকিতে
পারেন না। ঘর সংসার করিতে হইবে,
আদান প্রদান দুই-ই চাই।—আর পুরুষেরাই
কি অত স্বার্থপর ?”

“সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!—তা
মঞ্জুলার অহুরোধেই যে তাহার মুক্তি হইয়াছে,
প্রমীতসেন বাহাতে তাহা জানিতে পারে,
তাহা করা যাইবে।—প্রমীতসেনকে মুক্ত
করিয়াছ, ভিক্র জন্ত কোন চেষ্টা কর নাট!—
ভিক্র কে ?”

“ভিক্র পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর।”

“উপগুপ্ত ?”

রাজাধিরাজ রাজ্যের দিকে চাহিয়া
রহিলেন, রাজ্যী বলিলেন ;—

“হাঁ ; আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টা দেশ-
পূজ্য পুণ্যাত্মা উপগুপ্ত ঠাকুর।”

রাজাধিরাজ কোন উত্তর দিলেন না। রাজ্যী
পালক হইতে নামিয়া দুই হাতে রাজাধিরাজের
পদধারণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন ;—

“ভিক্রদেবকে মুক্তি দিবার আদেশ
হউক !”

অশোকদেব অণকাল নীরব থাকিয়া শেষে
রাজ্যের হাত ধরিয়া পুনরায় তাঁহাকে নিজ
পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন ;—

“এই সকল ভিক্র শ্রমণেরা দেশের শত
অমঙ্গল ঘটাইতেছে।”

“শ্রমণ ভিক্ররা অমঙ্গল ঘটাইতেছে ?”

“হাঁ।”

“ইহারা ত অতি নিরীহ !”

“ইহারা চোর দস্যু অথবা দাতকারী
ব্যভিচারী নহে, কিন্তু ইহাদের আচারব্যবহার-
দৃষ্টান্তে দেশের নিয়ত অমঙ্গল ঘটিতেছে ;
লোকে যাগযজ্ঞ, কর্মকাণ্ড, পূজাবলি পরিত্যাগ
করিতেছে ; সনাতন ধর্ম ছাড়িতেছে।—
ইহাদের শাসন আবশ্যক।”

“রাজাধিরাজের সভায় ত ব্রাহ্মণ শ্রমণের
ভূলা সম্মান।”

“সে ত রাজনীতির কূটকৌশল।”

“অথওপ্রতাপ রাজরাজেশ্বরের রাজ্য-
শাসনে জ্ঞানের স্থলে কূটকৌশল।”

দ্বী-সদয়ের মহিমাময়ী সরলতার মুখ রাজ-
চক্রবর্তী বলিলেন ;—

“মন্ত্রণাসভায় এ প্রশ্ন উঠিলে উত্তর দিতে
বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্যী কারুবকীয়
পবিত্র শয্যায় বসিয়া উত্তর দিতে আমার সাহস
হয় না।—আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি।”

ফুরহুজ্জল নেত্র রাজ্যী কহিলেন ;—

“তবে আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হউক !”

“অবশ্যই হইবে। লীগকে বলিয়া রাখ,
প্রভাতে সৌবিক যেন আমার নিকট উপস্থিত
হয়।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

নক্ষত্র-পূজা

দুর্গোৎসব

শরৎকালে আমরা দশভূজা সিংহগাহিনী মহিষমর্দিনী দেবীর পূজা করি। এই পূজার চলিত নাম শারদীয়া পূজা।

দেবীর বাহন অনিমলিত-লোচন যুগ-রাজ সিংহ। সিংহপৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ পদ এবং মহিষাসুর-শৃঙ্গে দেবীর বাম পদ। সিংহ মহিষাসুর-শীকারে প্রমত্ত। দেবী দশভূজা এক দক্ষিণ হস্তে সর্পলাঙ্গুল এবং এক বামকরে মহিষাসুরের কেশ-পাশ ধারণ করিয়াছেন। সর্প মহিষাসুরকে বেঁধেন করিয়া রহিয়াছে।

দশভূজার দক্ষিণ করপঞ্চকে ত্রিশূল, ষড়্‌গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি এবং বাম করপঞ্চকে খেটকপূর্ণ চাপ, পাশ, অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা বা পরশু চক্ৰমক্ করিতেছে।

দেবী দশভূজার শিরোদেশে স্থিত চালে ভূতেশ ভবানী-পতি রুদ্রদেব চিত্রিত থাকে এবং দেবী দশভূজার পদতলে অমৃতপূর্ণ ঘট স্থাপিত থাকে।

দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে হতুমবাহিনী লক্ষ্মী দেবী ও মুষিকবাহন গজানন গণপতি দেব এবং নবপত্রিকাশোভিত “কলাবউ” অবস্থিত আছেন। এবং দেবীর বাম পার্শ্বে হংসাকৃতা বীণাপাশী সরস্বতী দেবী ও শিখি বাহন শক্তিধর কুমার দেব অধিষ্ঠিত আছেন।

মহামায়ার এই প্রতিমার গূঢ়মর্থ্যভেদে সাংখ্যিক উপাসকমাত্রের চিত্তে কোতুলক জন্মিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই আধিভৌতিক প্রতিমার মূল আদর্শ (আধিদৈবিক চিত্র) আমরা উপাসকের চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইব। এই আধিভৌতিক প্রতিমার আদি আধ্যাত্মিক চিত্র উপাসক স্বয়ং সাধনা-বলে স্বহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। সাধনাক্ষেত্রে উত্তর-সাধকের স্থান নাই।

ইদানীন্তন কালে হিন্দু আপনাকে নক্ষত্র-উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু হিন্দু জানেন যে, বৈদিক ঋষির নক্ষত্র-উপাসনা হইতে তাঁহার পৌত্তলিকতা উদ্ভূত হইয়াছে।

রাশিচক্রে সংহরাশি সূর্যের গৃহ, বাহন, এবং নাক্ষত্রিক প্রতিমা, এবং সিংহরাশির পরেই কন্যারাশি প্রতিষ্ঠিত আছে।

তারা-কন্যা—“জলে নৌকাহা শস্ত-অগ্নি-ধারণী স্ত্রী” এবং কন্যারাশিহ চিত্রা-নক্ষত্র তারা-কন্যার উত্তমাজ গঠন করে এবং দশভূজা-মূর্তি ধারণ করে। পঞ্জিকার মলাটে—নক্ষত্রগণের যে মূর্তি চিত্রিত থাকে, তাহাতে চিত্রার দশভূজা-মূর্তি চিত্রিত থাকিত। “গোলোকে সর্বদেবদর্শন” প্রকাশিত হইবার পর হইতে বাংলার পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠার আর নক্ষত্রমূর্তি দেবা দায় না। ভরসা করি, বারানসী-ধামের পঞ্জিকার পুরঃপৃষ্ঠা হইতে নক্ষত্রমূর্তি অঙ্কিত হয় নাই।

প্রাচীন কালে যখন উত্তর-সৌরস্থিতি (North Solstice) চিত্রানক্ষত্রে ছিল। তৎকালে তারা-কন্যার শিরোভাগ রাশি-চক্রের শীর্ষস্থানে ছিল এবং দশভুজা তারা-কন্যা তারা-সিংহের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন।

তারা-কন্যার উল্কে ও উত্তরে ভূতেশ-মণ্ডল (Bootes) (*) অবস্থিত আছে। এই ভূতেশ-মণ্ডল বায়ুদেবত্ব স্বাতি নক্ষত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। বায়ু রুদ্র-দেবের অষ্টমূর্তির অন্যতম মূর্তি। এবং তারা-কন্যার পদতলে কাংশুমণ্ডলে (Creator) স্থিত তারা-কাংশু অমৃতের ভাণ্ড।

হিন্দু আরও জানেন যে, সুদীর্ঘ কৃষ্ণসর্প (Hydra) কন্যার রাশি হস্ত-নক্ষত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে তারা-কন্যার এক ক্রবকে যামা ক্রব-তারার অদূরে মহিষাসুর (Centaur) বিদ্যমান আছে।

এই প্রকাণ্ড আধিদৈবিক তারাচিত্র দেবীর মূর্ত্ত্যু প্রতিমার অবিকল আদর্শ।

এই আধিদৈবিক তারাচিত্রের নিগৃঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই উপাসক তাঁহার উপাস্ত দেবীর প্রতিমার মূল তাৎপর্য প্রহণে সক্ষম হইবেন। নতুবা নহে।

হিন্দু সত্যত মনে ধারণা করিবেন— নক্ষত্র-উপাসক হইলেও তিনি জড়োপাসক নহেন। তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্” পরম-ব্রহ্মের উপাসক। তবে উপাসকের

হিতার্থে তাঁহার পরমব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে। তাই পরমব্রহ্ম প্রকৃতি-পুরুষ, শ্রী-চরিত্র, হর-গৌরী, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ রূপে—ভারতে উপাসিত। কেবল “বিচার-দিনে” ঈশ্বরের সহিত হিন্দুর সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর হিন্দুর আজীবন সখা। স্তবরাং তাঁহার রূপ চাই। তাঁহার এক এক মূর্ত্তি এক এক নক্ষত্রে স্থাপিত হইয়াছে। তাই বেদে প্রকাশ যে—দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি।

তাই হিন্দু “শিবাধিদেবতঃ সূর্য্যঃ অগ্নি-প্রত্যাধিদেবতম্” দেবের পূজা করেন।

তাই হিন্দু “সবিত্রমণ্ডলমধ্যাবর্তিনারায়ণম্” দেবের পূজা করেন।

এক নক্ষত্রে হরি-হর স্থাপিত। যা শ্রী। সা গিরিজা প্রোক্তা। বঃ চরিতঃ সঃ চরঃ স্রুতঃ ॥” (বরাহ পুরাণ)

তারা-কন্যা “জগৎ-প্রসবিতা সবিতা”-দেবের নারা-মূর্ত্তি বা পত্নী অর্থাৎ সূর্য্য-প্রভা সূর্য্য-দেবীর নাক্ষত্রিক প্রতিমা। তাই তারা-কন্যা সূর্য্যের সাক্ষাতিক চিহ্ন অগ্নি এক হস্তে ধারণ করেন। সূর্য্য-পত্নী তারা কন্যা সূর্য্য্যাদিষ্ঠিত নারায়ণের পত্নী শ্রী ও লক্ষ্মী। এবং তিনি সূর্য্য্যাদিষ্ঠিত রুদ্রদেবের পত্নী ভগবতী রুদ্রাণী। ঐ দেখ রুদ্রাণী “কথারূপেণ দেবানাম্ অগ্রতঃ দর্শনং দদৌ” (বঃ দেঃ স্রুঃ) এবং ঐ শুন ভগবতীকে— “সূর্য্যামগ্নেণ পূজয়েৎ” (হাত পায়ে)।

উপাসক দেখিতেছেন যে—ভগবতী নারায়ণের চক্র, রুদ্রদেবের জিহ্মূল খড়্গা, ইন্দ্রের পরশু (বজ্র), বরুণের পাশ এবং কুমারের শক্তি ধারণ করিয়া আছেন।

তারা-কন্যা চিরকুমারী এবং চিরসত্যী,

(*) গ্রীকভাষাবিশ্বরণ বলেন যে “Bootes গ্রীক শব্দ নহে”। বোধ হয় ভূতেশ হেলেনসপতি পার হইয়া Bootes নাম গ্রহণ করিয়াছেন—(লেখক)।

তাই নক্ষত্র-তারা-কল্পা সর্বত্র * “সত্যী” নাম পাইয়াছেন।

সূর্য্যপ্রভা সূর্য্য দেবী উদয়গিরিতে জাত বলিয়া “গৌরী” নাম পাইতে পারেন। অথবা সূর্য্যার প্রতিমা হেমবর্ণা। ছায়াপথ সোম-ধারা বেদে হৈমবতী নাম ধারণ করেন। এই দুই কারণে পুরাণে দেবী হিমবান্-দ্রাঘিতা হইয়াছেন। অভিধানে দেবীর এক নাম চিত্রা। চিত্রা নামের সার্থকতা উপাসকের বিশেষ বিবেচ্য। দেবীর সাবিত্রী নাম উপাসকের মনে বেদের সূর্য্য দেবীর ছায়া আনিয়া দেয়। সিংহপৃষ্ঠে তারা-কল্পা সূর্য্যের বর্ণমূর্ত্তি এবং “প্রকৃত-পুরুষের” আদি আদশ।

মহিষ ও সর্প অন্ধকারের সহচর বলিয়া তাহারা অন্ধকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মহিষাসুর-মণ্ডল এবং জলসর্প-মণ্ডল (কালীয়) অন্ধকারের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সর্পবেষ্টিত মহিষ অন্ধকারের বর্ণ-মূর্ত্তি। সূর্য্যপ্রভা সূর্য্য অন্ধকার বিনাশে সতত উদ্ভূত। আলোক ও অন্ধকারের অবিরাম সংগ্রাম জগতে নিয়ত চলিতেছে। এ সংগ্রামের আদি বা অন্ত নাই। কখন (দিনে) আলোক উচ্ছে, কখন (রাত্রে) অন্ধকার উচ্ছে। এ সংগ্রামে জয়-পরাজয় নাই। সিংহবাহিনী তারা-কল্পার হস্তে সর্পবেষ্টিত মহিষ-অশুরের মরণ নাই। তাই দেবী “মহিষ-মর্দ্দিনী” নাম ধারণ করেন। দেবী মহিষ-বিনাশিনী নহেন + পাছে

* তু। Semitic Ariadne (the very chaste one).

† মহিষি বেদব্যাস মহিষাসুর বধের এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রহ্মার কামদেবত কুমার ভদ্রল ওহের উদরে নিশাকালে মহিষাসুরের বধ কল্পিত হইয়াছে। (বনপর্ব্ব)

দেবী সূর্য্যার এই রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন উপাসকের মনে দ্বিধা জন্মে সেই সংশয় বিমোচনার্থে তারা-সিংহ দেবীর বাহন এবং ভূতেশ দেবীর শিরোদেশে এবং অমৃতভাণ্ড দেবীর পদতলে স্থাপিত হইয়াছে।

এই তারা-চিত্র মহর্ষি কাত্যায়নের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। মহর্ষির উদ্ভাবিত তারামূর্ত্তি কাত্যায়নী নাম ধারণ করে।

“উমা কাত্যায়নী গৌরী”

ইন্দ্রের শচী, আদিত্যের শ্রী ও লক্ষ্মী, রুদ্রের রুদ্রাণী, বরুণের সুদেষ্ণা, যমের ধূমানী, চন্দ্রের ‘চিত্রা’, কুমার কামদেবের ‘দেবসেনা’, সত্য সাবিত্রী সকলেই তারা-কল্পার মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্ত্তির উপাসনায় বিশাল-হৃদয় উপাসকের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি এক আধারে সকল দেবদেবীর উপাসনায় চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারেন।

অদূরদর্শী বৈষ্ণবগণ বেশ পড়েন—

(ক) যঃ হরিঃ সঃ হরঃ স্মৃতঃ

(খ) শংকরঃ ভগবান্ গৌরীঃ (বিষ্ণুপুরাণ)

(গ) রুদ্রদেবের প্রার্থনামতে শ্রী কৃষ্ণ স্বীয়

ভাৰ্য্যা পার্শ্বতীকে অর্পণ করেন।

তথাপি তাঁহার ভেদ-জ্ঞান দূর হয় না।

তিনি বেদোক্ত রুদ্রদেবকে মোগল বানাইতে চাহেন।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তড়িৎময়ী প্রভাদেবী বেদে কুমারী সূর্য্য নামে গীত ও অর্চিত হইয়াছেন।

সেই সূর্য্যাদেবী আত্মশক্তির আধিদৈবিক প্রতিমা।

নববর্ষের আদি দিনে রাশিচক্রে সূর্য্যের নব যাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। বাক্যান্তরে জগৎ-প্রসবিতা সবিতাদেবের নারীমূর্ত্তি কুমারী ভগ-

বতী সাবিত্রী সতীর নব যাত্রা প্রবর্তিত হয়। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর যাত্রা হইতে নববর্ষের প্রথম দিন “ভগবতীযাত্রা” উপাধি ধারণ করে।

খৃঃ পূঃ ১১৮১ সালের ১লা আশ্বিন হইতে আশ্বিন-আদিবর্ষ পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিনে কৃষ্ণ নবমী তিথি ছিল, তাই কৃষ্ণ নবমী তিথিতে কল্প আরম্ভ করিয়া ভগবতীর পূজা আরম্ভ হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবতী সাবিত্রী দেবীর আধিদৈবিক বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা সংহবাহিনী তারা-কন্ঠাতে সবিতাদেবের প্রবেশ দিনে নববর্ষের অবতারণা উপলক্ষে হিন্দুর এই শারদীয় মঠোৎসব হয়। হিন্দু কালক্রমে শারদীয় পূজার মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। এখন তিনি ভাবেন তিনি নক্ষত্র-উপাসক নহেন। তিনি পুরাণে পড়েন—যোগ ভঙ্গ হেতু মহর্ষি কাত্যায়ন মহিষাসুরকে অভিসম্পাত করেন যে “আত্মাশক্তি দশভুজামুদ্রি হইয়া তাহাকে সংহার করিবেন।”

পারিপাশ্বিক দেবদেবী

গণপতি

মুখিকবাহন গজানন গণপতি দেব সিদ্ধিদাতা গণেশ নামে সকল দেবের অগ্রা পূজা লইতেছেন। ইনি কে ?

ব্রহ্মপতি স্তুতে আমরা ঋক্ মন্ত্রে (২২৩১) পড়ি—

“গণানাম্ ভা গণপতিম্ হবামহে” হে ব্রহ্মপতি তুমি মরুৎগণের অধিপতি তোমার আহ্বান করি।

তাই কালিকা-পুরাণে নির্দেশ হইল “গণেশবীজং তম্ ইদম্ গুরোঃ মন্ত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্”

গণেশ দেব ও দেবগুরু ব্রহ্মপতি উভয়ের বীজমন্ত্র এক।

অর্থাৎ

ইহারা একে অন্তের প্রকৃতি। সুতরাং গণপতি ব্রহ্ম-পতির প্রতিমা তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ঋক্‌মন্ত্রে পড়ি (২২৩১৮) বজ্রধর ব্রহ্মপতি মেঘ অধোমুখ করেন।

তন্ত্রমতে ও “বারিপূর্ণাং মহীং কৃষা। পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ।”

জলবর্ষী দিগ্‌গজের কথা সকলেই জানেন। জলবর্ষী গজ জলদেবতা ব্রহ্মপতির সাক্ষাতিক চিহ্ন। বজ্রদংষ্ট্র গজমুণ্ড “এক-দন্ত গজানন” হইল।

মুখিক ভাবী ঝটিকা গণনা করিতে পরম দৈবজ্ঞ। আপতন্ত ঝড়ের পূর্বে জাতাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মুখিকদল ঝাঁকে ঝাঁকে ঝল্লপ দিয়া জাতাজ হইতে সমুদ্র-জলে পড়ে ও কিনারা লয়।

বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকিয়া শিথিয়াছেন এষ্ট ভ্যোতিষদল চম্পট দিলে জাতাজ ভাসাইতে নাই। তাই মুখিক মরুৎগণের সাক্ষাতিক চিহ্ন। মুখিক “গণানাম্ গণপতি”র বাহন হইল।

দেবগুরু ব্রহ্মপতি দেবগণের পিতা।

“দেবানাম্ যঃ পিতরম্”... (ঋ ২২৬৩)

তিনি বেদমন্ত্রের জনিতা... জনিতা ব্রাহ্মণঃ অসি (ঋ ২২৩২)। গতিকে তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি আর্ঘ্যভাতির আদি উপাসা ব্রহ্ম-পতি। তাঁহার পূজা না করিয়া হিন্দু অস্ত্র-দেবের পূজা কিরূপে করিবেন। তাই গণপতি ব্রহ্মপতির পূজা সর্বোপায় করিতে

হয়। নতুবা অস্ত্র দেবগণ পূজা লইবেন না। কাহার সাধ্য দেবগণের পিতা বেদমন্ত্রের জনিতা গুরু বৃহস্পতিকে ছাড়িয়া পূজা করে বল পূজা নয়?

মূল-তত্ত্ব জানিলে পৌরাণিক উপাঙ্গাস পাড়িতে বড়ই আনন্দ অনুভব হয়। মূলতত্ত্ব জানা না থাকিলে বড়ই বিপদ।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে সুতীক্ষ্ণ তারাদশক পদ্মপুরাণকার গণপতির মূল উদ্ঘাটনে মহাত্মমে পতিত হইয়া মূৰ্খকবাহনে কামদেবকে চড়াইয়াছেন।

তবে সাহিত্যিক নিষ্ঠাবশে আমরা দীকার করিতে বাধ্য যে “সিদ্ধি পদঃ কামদঃ” ধ্যানে মনটা যে বিচলিত না হয় এমন নহে।

বেদমতে বৃহস্পতি গীর্বাণ তাই গণেশের হাতে বাস্তভাণ্ড। জ্যোতিষমতে বৃহস্পতি গ্রহে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র উভয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ব্রহ্মাধিদেবঃ সৃষ্টিাত্ত ইন্দ্র প্রত্যাদিদেবতম্। তাই ব্রহ্মার (বিধির) কলম গণপতির হস্তে।

কান্তিকের

কুকুটশোভিত কুমার শিখিবাহন কান্তিকের কে? মহাভারতমতে কুমার স্বন্দেব অগ্নির পুত্র। অগ্নিদেব কুমারকে চিত্র-শিখণ্ডী এবং শিখণ্ডী (কুকুট) উপহার দেন। কুমার দেবসেনার পতি।

মার-গ্রহ (মঙ্গল) সৰ্ব্বদেশে দেবসেনা-পতি। জ্যোতিষ মতে ভৌম ভূমিনন্দন মার-গ্রহের অধিদেবতা স্বন্দেব।

“স্বন্দ্যাদিদেবতঃ ভৌমঃ”

কালিকাপুরাণে নির্দেশ আছে যে “কাম-দেবঃ বীৰ্য্যঃ কুমারঃ ভৌমঃ কীর্ত্তনঃ।”

কামদেব ও ভৌমগ্রহ উভয়ে একই বীৰ্য্যময় অর্জিত হইবে। অর্থাৎ ভৌমগ্রহের অধিদেবতা কামদেব।

ভৌমগ্রহের জ্যোতিষোক্ত অধিদেবতা

কুমার স্বন্দেব এবং কামদেব একই ব্যক্তি।

অপর্য্য-বেদোক্ত কামসূক্ত (৯২) পাঠে আমরা পাই যে কামদেব ত্রিমূর্ত্তিতে মানবের হিত সাধন করেন। সমরদেব, মৃত্যুদেব এবং প্রণয়দেব। ‘বৎ তে কাম! শস্য জীবরুধম্।’ কুমার কান্তিকের দেবকে আমরা এই ত্রিমূর্ত্তিতে উপাসনা করি।

পৃথিবীর উত্তর গোলাকে এশিয়া যুরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় শরৎকাল জাবের মরণের সময়। তাই কান্তিক মাসে মৃত্যুদেব কান্তিকের উপাসিত হইয়া থাকেন।

কামরপুপ্রবণ রণদ্বন্দ্ব চিত্র-শিখণ্ডী (ময়ূর) কামদেব—কান্তিকের দেবের বাহন। কামরপুপ্রবণ রণদ্বন্দ্ব শিখণ্ডী (কুকুট) কুমার কাম—কান্তিকের দেবের ভূষণ। এবং কামরপুপ্রবণ ছাগের মুণ্ড কুমার কান্তিকের দেবের সপ্তম মুণ্ড। মহাভারত-উক্ত এই “ছাগবন্ধু সপ্তম মুণ্ড” প্রাতিমায় প্রকাশ থাকে না।

কালপুরুষমণ্ডল (Orion) কামদেবত ভৌমগ্রহের নাক্ত্রিক প্রতিমা। কৃত্তিকা-নাক্ত্র সন্নিহিত এই তারামণ্ডলে ময়ূর পৃষ্ঠে কুমারদেব আসীন আছেন। এবং তারা-কুকুট কুমারের শিরোদেশে স্থাপিত করিতেছে। এই তারা-কুকুট চাক্ষুষ দৃষ্টির গোচর নহে। ফীল্ড গ্লাস সাহায্যে ইহাকে দেখিতে হয়। চক্ৰীতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ময়ূর-

কুকুটবৃত্ত কুমার-মূর্তিকে নামাবেশ দিয়াছেন।
যথা :—ময়ূরকুকুটবৃত্তে মহাশক্তিবরে অনঘে।
কোমারীরূপসংহে চ নারায়ণি! নামোহস্তুতে ॥

অহি-সর্প অহি-অন্ধকারের সাংকেতিক চিহ্ন।
অহি সর্প ভক্ষণে শিখণ্ডী ময়ূর এবং শিখণ্ডী কুকুট
উভয়েই লঘুহস্ত। অহি-সর্পনাশী সুন্দরকায়
ময়ূর কুকুট উভয়ে অহি-অন্ধকারনাশী অপরূপ
কুমারদেবের ভূষণ-বাহন হইলেন।

কুমার যে শক্তির আঘাতে মহিষ-অশুর
বধ করিয়াছিলেন ঐ শক্তি কুমার-করে
বিষাক্রমান আছে।

এই শক্তি ভোমগ্রহের হস্তে দিয়া স্বন্দ-
পূরণকার মঙ্গল গ্রহের স্তবে বর্ণিয়াছেন,—
“ধরণীগর্ভসমুৎতং বিহ্বাপুঞ্জসমপ্রভম্।:

কুমারং শক্তিঃস্তং চ লোহিতাগ্নম্ নমামাহম্ ॥”
চিন্তাশীল পাঠক বিচার করিবেন যে,
স্তবটী শুভদেবে প্রয়োগ করিলে খাটে কি না।

লক্ষ্মী

বেদমতে—শ্রী: চ তে লক্ষ্মী: চ পত্ন্যৌ।

শ্রী ও লক্ষ্মী আদিভাদেবের পত্নীদ্বয়।

পদ্মপুরাণে পড়ি—“লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মিঃ”
লক্ষ্ম-(কলঙ্ক)-ময়ী লক্ষ্মীদেবীর ভ্রাতা কলঙ্কী
চাঁদ। পূর্ণিমা তিথির স্ত্রীগ্রহ রাকাচন্দ্র
ভিন্ন শীতরশ্মিও ভগিনী আর কে হইবে?

চন্দ্র ওষধিপতি। বেদমতে (ঋ ২।৩২।৫)
রাকা ধন ও সহস্র পোষ (সাহায্য) দাত্রী।

যাঃ তে রাকে স্নমতয়ঃ

যাভিঃ দদামি..... বসুনি।

তাভিঃ নঃ অগ্ধঃ...

সহস্র পোষঃ সুভগে রণানা ॥

সকলেই জানেন যে পূর্ণিমাচন্দ্রে লক্ষ্মী স্পষ্ট
দৃষ্টিগোচর হয়। তাই রাকাদেবী লক্ষ্মী নাম

গ্রহণ করিয়া ধনধাত্তদাঙ্গিনী হইয়াছেন। লক্ষ্মী
শস্ত্রের অধিপত্নী। ততুম চন্দ্রের সহচর। সে
দিবাভাগে অদৃশ্য থাকে। শস্ত্রভক্ষক
মৃষিক বিনাশে ততুম সিদ্ধহস্ত। এই শুণে
সে লক্ষ্মীর বাহন হইল।

দ্বাদশ পূর্ণিমার মধ্যে শারদীয় পূর্ণিমা
চাঁদের জ্যোৎস্নারূপে অতুগনীয় এবং জগতের
অপার আনন্দ প্রদ বলিয়া কৌমুদী (কু+মুদ)
আখ্যা পাইয়াছে।

শরৎশস্য আহরণ সমাপ্ত হইলে উল্লাসে
ভারতের কৃষককুল কৌমুদীর নিশা আনন্দে
জাগরণ করিত। তাই এই পূর্ণিমা কো-
জাগরী নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই কো-
জাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে রাকার উদয়
ক্ষণে হিন্দুকৃষকের ঘরে ঘরে কো-জাগরী
লক্ষ্মীপূজা হয়। কিন্তু খাজানা, শেখর ও
চৌকিদারী টেক্সের দায়ে কৃষককুল ব্যাকুল
হইয়াছে। রাত্রি জাগরণ কে করে?

লক্ষ্মীদেবী অন্ধকার-মহিষ নাশে ভগবতী
স্বর্গার দক্ষিণ হস্ত। তাই দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান
পাইয়াছেন।

সরস্বতী

বৌধায়নগুলের (Lyra) পার্শ্বে আকাশ
সরস্বতী সোনধারার (The Milky way)
মধ্যে প্রবাহিত আছেন।

ঋকমন্ত্রে (১।৩।১২) পড়ি—বারিধিকে
সরস্বতী করণে আলোকিত করিতেছেন
যথ—

“মহঃ অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা”
টীকায় সায়েন বলিলেন “দ্বিবিধা হি সরস্বতী
বিগ্রহবৎ দেবতা নদীরূপা চ।” আকাশ
সরস্বতী বলিতে সাহসে কুলাইল না।

বেদমতে সরস্বতী বাক্‌দেবী। এবং
সরস্বতীর রূপায় বেদমন্ত্র রচিত হয়। সরস্বতী
প্রচণ্ড, নক্ষত্রপণ্যামিনী এবং অন্ধকার-
বিনাশিনী। যথা—ঋ ৬.৬১.৭

‘‘যোরা হিরণ্যবর্তনীঃ বৃহন্নী’’ তাই
মহিষাসুর বধে সরস্বতী ভগবতী সূর্য্যার
সঙ্গায় হইয়াছেন। তাঁহার ভূষণ তারা-বীণা
এবং তাহার বাহন তারা-হংস (Cyghus)।

তারাদর্শক ।

শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী

বঙ্গদেশের পবিত্র সারস্বতধাম নবদ্বীপের
বিদগ্ধজননী অথবা পোড়ামা তলা হইতে
একটা সবণ রাজপথ পশ্চিমাভিমুখ হইয়া
৮বুড়াশিবের কোঠা, ওলাদেবীর মন্দির ও
পাড়ার মার তলা অতিক্রম করিয়া নদীয়া ও
বদ্ধমান জেলার সামাবাজুক পলতা বা
আদিগঙ্গার খাত পর্গন্ত গিয়াছে। এই
পথের বাম পার্শ্বে ওলাদেবী তলার সম্মুখে
শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ছিল। দক্ষিণ-
দ্বারী ও উত্তরদ্বারী দুইটা মৃৎ-ভিত্তি বিশিষ্ট
চণ্ডীমণ্ডপ। উহার মেঝে, বারান্দা, সিঁড়ি
প্রভৃতি পাকা সিমেন্ট করা। পূর্বদ্বারী
সুদীর্ঘ গৃহশ্রেণী, উহাতে প্রায় সাত আটটা
ঘব। প্রত্যেক ঘরের অঙ্গাংশ উচ্চ, উহাতে
বিদ্যার্থীগণ শয়ন ও উপবেশন করিতেন এবং
অপর নিম্নার্দ্ধে পাকের উনোন ও আহারের
স্থান। প্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া দরজা
ও উহার সম্মুখপাতে ক্ষুদ্র আকারের একটা
করিয়া জানালা। পূর্বদিকে বাগান ;
উহাতে পেঁপে, কদলী, নিম, বেগুন, মেটে
আম্র, লক্ষা, নটেশাক, পেয়ারা, ফজলি আম
প্রভৃতির গাছ। উঠানের চতুর্দিকে দোপাটী,

গাঁদা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প-তরু-
শ্রেণী। তন্মিত্ত চতুষ্পাঠী গৃহ-শ্রেণীর উত্তর
ভাগে দক্ষিণদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিম পার্শ্বে
সমতলভূমিতে একটা বড় বিলতরু ও একটা
চম্পক বৃক্ষ শোভা পাইত। চতুষ্পাঠী
গৃহশ্রেণীর দক্ষিণাংশে বৃহৎ কুপ বিদ্যমান।

এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত
শিরোরত্ন মহাশয় নবদ্বীপের বিস্কৃতনামা
পণ্ডিতগণের অগ্রতম। তিনি নবদ্বীপের
প্রধান নৈয়ায়িক ৮হরমোহন চূড়ামণি ও
প্রধান স্মার্ত ৮ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয়ের
কিঞ্চৎ পরবর্তী এবং মহামহোপাধ্যায়
৮ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, ৮প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন,
৮হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মহামহোপাধ্যায় ৮রাজ-
কৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়-
গণের সমসাময়িক। মহামহোপাধ্যায় ৮বহু-
নাথ সার্কভোম, মহামহোপাধ্যায় ৮মধুসূদন
স্বতিরত্ন ও ৮শ্রীনাথ শিরোমণি প্রভৃতি
অধ্যাপক মহোদয়গণ তাঁহার পরবর্তী। শিরোরত্ন
মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের ভঙ্ক-কুলীন-
বংশসম্মত। তাঁহার বংশোপাধি বন্দ্যো-
পাধ্যায়। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার

ও ভারদর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শিরোরত্ন মহাশয় পাঠ শেষ করিয়া যদি মিশনরী কলেজে কিছুদিন চাকরি স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত অধ্যাপক-গণ অপেক্ষা অনেক অধিক প্রখ্যাত ও যশস্বী হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা রক্ষা করিতে গিয়া মিশনরী কলেজের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তাহার পরে, তিনি সুন্দর চতুষ্পাঠী নির্মাণ করিয়া পবিত্র অধ্যাপনা-ব্রতে ব্রতী হন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের দুই পক্ষ পূর্ব পর্য্যন্ত সেই ব্রত অক্ষুণ্ণ ছিল। এখনও সেই সারস্বতনিকেতন চতুষ্পাঠীর শেষ চিহ্ন মৃত্তিকা-স্তূপ রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে হইতে বাগ্‌দেবীর পবিত্র বীণাঝঙ্কার চিরকালের জন্ত নীরব হইয়াছে। সে মধুর বঙ্কার আর কখনও সেখানে শ্রুত হইবে না।

পূজ্যপাদ গুরুদেব শিরোরত্ন মহাশয়ের প্রথম জীবনে ও মধ্যজীবনে কত শত বিদ্যার্থী তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা গণনা করা অসম্ভব এবং আমি তাঁহাদের সকলের নামও অবগত নহি; আমি গুরুদেবের শেষ জীবনের ছাত্র,

(*) তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধ্যে শিরোরত্ন মহাশয়কে সমধিক ব্যুৎপন্ন শুনিয়া মিশনরী কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে শিরোরত্ন মহাশয় অস্বীকার করেন, শেষে এইরূপ নিয়ম হয়, শিরোরত্ন মহাশয় মাসিক বেতন গ্রহণ করিবেন না, তবে 'মিশনরী' সাহেব হরমাস কিঞ্চিৎ এক বৎসর অন্তর ইচ্ছা করিলে তাঁহার পুত্রদিককে কিছু টাকা উপহার দিতে পারেন। শিরোরত্ন মহাশয় হরমাসের অধিক কর্প করেন নাই, তাঁহার পুত্রদিককে কোন উপহারও গ্রহণ করিতে হয় নাই।

আমাদের সময়ে যাহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। আমি একাদশবর্ষ বয়সে মধ্য ইংরাজী বিভাগের ত্যাগ করিয়া মুক্তবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়নের নিমিত্ত এই চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করি, তখন আগমেধরীতলার ৩ম পুরানাথ তর্কবাগীশ (মথুর পুরুত) পাঠ শেষ করিয়াছেন, তবে মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের পাঠ চাওয়াইতে আসিতেন। বুড়াশিবতলার তারা-প্রসন্ন চূড়ামণি মহাশয় তখনও চতুষ্পাঠীর মেরুদণ্ডস্বরূপ বিद्यমান ছিলেন। কুমার-খালীর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্নব, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী এবং নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসন্ন গোস্বামী কিছুকাল পরে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করেন। শিবচন্দ্র দাদা কাশী ব্রূরয়া পুনরায় এহ চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছিলেন। অপর ছয়জন সংসারে প্রবিষ্ট হন। আমি প্রাতিদিন বহুতে লিখিয়া ব্যাকরণ পাঠ করিতাম, গুরুদেব আমার হাতের লেখা দেখিয়া আমার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ কাব্যার্থ ভায়ার * এবং আমার মুক্তবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য ও অমর-কোষ অভিধান পাঠ শেষ হইলেই গুরুদেব ব্যাকরণ পড়ান ছাড়িয়া দেন। তিনি ব্যাকরণ-পাঠার্থী ছাত্রদিগের ৩৬দিনে ব্যাকরণের একটা পাঠ পড়াইয়াই আমার এবং হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে পড়াইবার জন্ত অর্পণ করিতেন। যদিও পাঠার্থীদিগের কতক সংখ্যক আমার হস্তে ও কতক হরগোবিন্দ ভায়ার হস্তে দিতেন। কিন্তু একের অল্পপরিমিত্তে অপরকে

(*) বর্তমান নড়াল ভিক্টোরিয়া কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

সকল ছাত্রকেই পড়াইতে হইত। আবার ছাত্রেরা কোন মাসে আমার নিকট কোন মাসে বা চরণগোবিন্দ ভায়ার নিকট পড়িতেন। বৈবেশিক ছাত্রদের মধ্যে চাইজন আমাদের অপেক্ষা পাঠে অধিক আগ্রহের ছিলেন। একজন বিহারত্ন আখ্যায় অভিহিত, ইহার নাম আমরা কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিতীর্থ, তারকেশ্বরের মোহান্তের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক)। আমরা যাহাদের পাঠ চাওয়াইতাম, যতদূর স্মরণ আছে, নিয়ে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, বঙ্গমান বিজয় চতুষ্পাঠীর স্মৃতিশাত্তের অধ্যাপক), শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (ইদানীং বিদ্যাবৃষণ, নদীয়ার রাজপুরোহিত), ৬প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (৬হরমোহন চুড়ামণি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র), শ্রীযুক্ত সিতিকর্ণ ভট্টাচার্য্য (ইদানীং স্মৃতিভূষণ, ৬ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং হরিসভার অধ্যক্ষ), ৬কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত ৬শ্রীনাথ শিরোমণি মহাশয়ের সহোদরদ্বয়), ৬গঙ্গাদাস আচার্য্য (পরে বিহারত্ন, নদীয়ার রাজার তদানীন্তন পঞ্জিকাকার ৬তারিণীচরণ বিজ্ঞাবাগীশের পুত্র), শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ গোস্বামী ভাগবতরত্ন (চৈতন্য-চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ), ৬মাধবচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ, শ্রীগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গোস্বামী (ইদানীং সন্ন্যাসী), শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ), ৬দীননাথ রায় (বীহু খেরাল), শ্রীযুক্ত মতিলাল সায়্যাল (মতি চোল), ৬বেণী ভট্টাচার্য্য (নদীয়ার রাজার দেওয়ান

৬কান্তিকেশরচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুরোহিত স্বয়ং ভট্টাচার্য্যের পুত্র)। এত ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী (শান্তিপুত্রের শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র, ইদানীং প্রসিদ্ধ কথক), শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ ঘটক (ইদানীং বৃন্দাবননিবাসী পুরাণপাঠক), শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিহারত্ন (মুগ্ধবোধের বাঙ্গালা অনুবাদক), শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ শর্মা ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শর্মা (বশোর-জেলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী (লটাখোলা-নিবাসী), শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ মিশ্র (উৎকল বাঙ্গ-পুর নিবাসী), ৬অর্জুনাথ পরায়ণ মিশ্র পাণ্ডুর (গঙ্গাম জেলার অধিবাসী), এতদ্ভিন্ন জৈলিঙ্গ দেশ হইতে অনেক ছাত্র অনেক সময় আসিতেন যাইতেন, তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকালে ৭টার সময় ও শীতকালে ৮টার সময় চতুষ্পাঠীতে আসিতেন। তাঁহার টীকি ছিল না, পশস্ত টাক টাকির স্থান অধিকার করিয়াছিল। বর্ণ শ্রাম, শুভ্র উপবীত বক্ষঃস্থলে শোভা পাইত। একখানি সাদাপেড়ে ধূতি পরিতেন। বেশ দামী তালতলার চটি পায়ে দিতেন। তাঁহাকে কখনও জামা গায়ে দিতে দেখি নাই, শীতকালে একখানি পাতলা চাদরের উপর বনাত কিম্বা শাল গায়ে দিতেন। একটু বেঁটে ছিলেন, শুড় শুড় করিয়া যখন রাস্তা দিয়া আসিতেন, তখন চতুষ্পাঠীতে সকলে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিত। তিনি আসার সময় একটা কাগজের চৌকির বড় বড় কতকগুলি টাকা ও উৎকৃষ্ট তামাক

লইয়া আসিতেন। ছাত্রবৎসল গুরুদেব জানিতেন, অস্ত্রবাসিগণ তাঁহার প্রদাদাকাজী, সুতরাং ঐ দুই দ্রব্য একরূপ পরিমাণে আনিতেন যে, তাহাদ্বারা সান্নিপাত্ত সহিত সমস্ত দিন রাত্রি চলিত। তিনি আসিয়াই দৌহুদাদা বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র দৌহুদাদা ঈষৎ হাসিমুখে গিয়া দুই হাত বাড়াইয়া টীকা-তামাক গ্রহণ করিতেন এবং তামাক সাজিয়া টীকা ধরানোর ছলে খুব মকুখম দুই টান দিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হুঁকার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেন। দৌহুদাদার অসুপস্থিতিতে বেণীদাদার হস্তে তাম্রকূট-বিভাগের কার্যভার ন্যস্ত হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাক্ষাতে কোন ছাত্র তামাক খাইত না, কিন্তু তিনি যেন বিরূপ অভাবনীয় উপায়ে জানিতেন কে তামাক খায়, কে খায় না। যাহারা তামাক খায় না, তাহাদিগকে তিনি তামাক সাজিতে বলিতেন না। হরগোবিন্দ ভায়ার এবং আমার ও বালাই ছিল না, সুতরাং কখন তিনি আমাদের হৃৎজনকে তামাক সাজিতে বলিতেন না। পূর্বেই ১০টা কোন দিন বা ১১টা পর্যন্ত অধ্যাপনা চলিত। তাহার পর পুষ্প, তুলসী, বিষ্ণুপত্র চয়ন করিয়া গৃহে যাইতেন। একদিন কিংবা দুইদিন অন্তর বাগান হইতে ধোড়, মোচা, কলাপাতা, মেটে আলু, কাঁচা কলা, নিমের পাতা, লঙ্কা, কাঁচা পেঁপে, পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা হইত। যে দিন ঐ সকল গৃহে যাইত, সে দিন পূর্বেই পরিচারিকা বুড়ি লইয়া বলিয়া থাকিত।

চতুষ্পাঠী হইতে বাটী গিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বস্ত্র ও কোশা লইয়া গন্ধার ঘাটে

যাইতেন। সেখানে স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন। বাটী হইতে পূজোপকরণ সহ পুনরায় বৃদ্ধাশ্রমের কোঠায় আসিয়া শিবপূজা করিতেন। তাহার পর বাটীতে গিয়া নারায়ণ পূজা করিয়া আহার শেষ করিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া যাইত। আধঘণ্টা বিশ্রামের পর, পুনরায় চতুষ্পাঠীতে আসিতেন। বিকালে নিজের চতুষ্পাঠীর ছাত্র পড়াইতেন না, নবদ্বীপের অগ্রাগ্রহ চতুষ্পাঠী হইতে প্রতিদিন বহু বিদ্যার্থী ত্রায়ের শব্দধণ্ড, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কুসুমাজলি পড়িবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতেন। যদিও ভট্টাচার্য্য মহাশয় অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ত্রায়ের অন্ত্যমান-ধণ্ড পড়াইতেন, কিন্তু ত্রায়ের শব্দধণ্ডে তাঁহার ত্রায় ব্যাপ্ত অধ্যাপক সে সময়ে নবদ্বীপে আর কেহই ছিলেন না। সুতরাং নবদ্বীপের সকল ছাত্রই পাঠ শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার নিকট শব্দধণ্ড ও কুসুমাজলি (যাহাতে ত্রায়-মতে ঈশ্বর নিরূপণ করা হইয়াছে) পাঠ করিতে আসিতেন। আগন্তুক ছাত্রদের মধ্যে পাকা টোলের লক্ষণ আচারী ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী এই দুইজন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। লক্ষণ আচারী গোঁপের জন্ত ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী ছাত্রের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। লক্ষণ আচারীর গোঁপ নৈমিষারণ্যের সেই বড় হনুমানের গোঁপের মত বেটালো ছিল। সদানন্দ ব্রহ্মচারীর ছাত্রের আকার অতি বহু, উহাতে বারোটা ডাল ছিল, শাদা ডবল কাপড় এবং শাদা ঝালর চতুর্দিকে শোভা পাইত। ঐ ছাত্রটির মধ্যে চারি পাঁচটা লোকের স্থান সম্বলান হইতে পারিত, কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় একাকীই উহার ছায়া উপ-

ভোগ্য করিতেন। বর্ণটা গোর, মাংসল মেহ, মুক্তি মন্তক, মৈরিকখনন, দাঁত সাদা ধবধবে, হাসিলেই দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িত। মাঝেও গদানন্দ, কার্যোও সদানন্দ, সকলের সঙ্গেই সর্বদা হাসিমুখে কথা কহিতেন। ব্রহ্মচারী পাকাটোলে লক্ষণ আচারীর ঘরের পাশের ঘরে বাস করিতেন। আচারী কৃষ্ণ-বর্ণ শাস্ত্রোক্ত গোম্পদপরিমিত দীর্ঘশিখা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইত। পেচকের ভায় আরক্ত নয়ন ও অত্যন্ত ক্রোধাক্ত। আচারী কথায় কথায় সরলপ্রকৃতি ব্রহ্মচারীর নামে অভিযোগ করিতেন, আমাদের চতুশ্চাঠীতে উহার বিচার হইত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবাহ মিটাইয়া দিতেন। আবার দুইজনে কোলাকুলি করিয়া হাসিতে হাসিতে টোলে ফিরিয়া বাইতেন। পাকাটোলের আর একটি প্রবীণ বিজ্ঞার্থী গুরুদেবের নিকট “বাদার্থ” পড়িতে আসিতেন। ইহার জন্মভূমি পঞ্জাবের জলন্ধর নগর। ইনি একচক্ষু, ছাত্রমণ্ডলীতে কাণ্ডাভট্টের (রঘুনাথ শিরোমণির) দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাকাটোলের অধ্যাপক ৬ প্রসন্নচন্দ্র ওরফে মহাশয়ের তিরোভাবের পর ইনি কয়েক বৎসর পাকাটোলে অধ্যাপনা করেন। অকৃতদায়, এখন চরিত্রেরে বাস করিতেছেন। ইহার নাম রামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রী। পাকাটোলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিজ্ঞার্থীই বাস করিতেন। আমাদের টোলের সীমানার পরই পাকাটোলের সীমানা, সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের পঞ্চাশতিকা থাকিয়াও আমরা ঐ টোলের বিজ্ঞার্থীদের সমস্তকার আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতাম। পাকাটোলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

দুইটা পেঠেলী ছিল (নব্বীশে বৌকে পেঠেলী বলে)। ঐ দুই পেঠেলী মহাপ্রভাবা এবং ছাত্রগণের একপ্রকার পরিচালিকা। ইহাদের দু'জনের নামই শশিমুখী। একটা বরহা ও একটা প্রোটা। বরহা ছোট শশী ও প্রোটা বড় শশী নামে প্রসিদ্ধা ছিল। ইহারা দু'জনেই সংস্কার, চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, উহার সহোদরা ভগিনীর ভ্রাতৃ ছাত্রদের পরিচর্যা করিত। ভ্রাতৃশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থগুলির নাম জানিত, ছাত্রেরা চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপকের নিকট পড়িতেছে, এমন সময় কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হইলে ছাত্রের গৃহ হইতে তারা আনিয়া দিত। ত্রৈলোক্যী, তামিল, মহারাষ্ট্র ছাত্র আসিলে ঐ দেশীয় ভ্রাতৃ ছাত্রের অস্থপস্থিতিতে উহারই তাহাদের ভাষা বুঝিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিত। আমাদের চতুশ্চাঠীর বুদ্ধা পেঠেলীর সে কৃতিত্ব ছিল না। একবার আমাদের চতুশ্চাঠীতে দক্ষিণভারতের সুদূর প্রদেশ হইতে একটা বিজ্ঞার্থী ভ্রাতৃশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত আগমন করেন। প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সংস্কৃতভাষায় সকল কথা হইল। গল্পান্বন করিয়া আসিয়াই ছাত্রটা বললেন “সখি মাভবি আড়া” পেঠেলী, কিছু বুঝতে না পারিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা বলিলাম “কিং প্রার্থ্যতে” তাহান্ন ইয়ং বরাকী তন্ন উপলক্ষ্য শ্রোতি। তাহার পর, তিনি হাসিয়া বলিলেন—মহীম্ অর্জাং মেহি।” শেষে পেঠেলী বুঝিতে পারিয়া উজ্জ্বল বরাইয়া দিল। পাকাটোলের পেঠেলী হইলে ঐ ছাত্রটার ভ্রাতৃ আবাদিক কিছুই বলিতে হইত না। দূরদেশ হইতে যে সকল বিজ্ঞার্থী নব্বীশে আসিতেন, তাহারাই

প্রকার জ্ঞানযোগী, অনেক সময় তাঁহার শাস্ত্র-চর্চায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। একদিন পাকাটালের ছাত্রেরা হাত মুখ ধুইতে পলতায় (আদি গঙ্গার খাতে) গিয়াছে, দুইজন জিগীষু ছাত্রের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে। দুইজনে দুই নিশিন্দ্যার ডাল ভাজিয়া লইয়া বাঁধের উপরে দাঁতন করিতে করিতে গ্রায়শাস্ত্রের কোন পূর্বপক্ষ সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে বসিয়া গিয়াছেন। এদিকে বেলা দশটা বাজে অধ্যাপক ‘গৃহগমনোমুখ,’ বড় শশী (পেঠেলী) খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া ধমক দিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার অত্র-দিন গঙ্গাস্নান করিয়া একদল পাকাটালের মৈথিল বিজ্ঞার্থী টোলে ফিরিতেছেন, ভুবন-মোহন বিজ্ঞারত্ন মহাশয়ের টোলের একদল মৈথিল ছাত্র স্নানে যাইতেছে। পোড়ামা-তলার উত্তরদলের যেই সাক্ষাৎ হওয়া অমনি তর্ক আরম্ভ, পূর্বোক্ত দলের পক্ষাৎ একটি মুটে ছিল, তাহার মাথায় একধামা আম ও তাল। ছাত্রগণ তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের মাথা ঘুরিতেছে, টিকী হুলিতেছে, মুটে হাঁ করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া আছে। এদিকে পোড়ামাতলার বটের গাছের ডাল হইতে একটি ছোট বানর একটি একটি করিয়া আম ও তাল ভুলিয়া লইতেছে, হাতে হাতে আম ও তাল বৃক্ষের বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে চালান হইতেছে। ছোট শশী গঙ্গাজল লইয়া যখন সেখানে উপস্থিত, তখন শেষ আত্মী বানর শিশু কর্তৃক অপহৃত হইল। সে চৈত্রে বলিল “তোমরা এখানে ঘটাকাশ, পটাকাশ কছো, এদিকে তোমাদের পিত্তী যে বানরে গেলছে।” তখন সকলে ধামার মধ্যে ফলের

অভাবাব লক্ষ্য করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আবার ছোটশশী পোড়ামা-কোঠার গঙ্গাজলের কলসী রাখিয়া মুটে সঙ্গে করিয়া আম ও তাল কিনিতে গেল। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই হইত।

আমাদের চতুষ্পাঠী বৃদ্ধা শিবতলা সন্ন্যাসের দক্ষিণ পার্শ্বে, উহার ঠিক উত্তর পার্শ্বেই স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় যত্ননাথ সার্বভৌম মহাশয়ের টোল। ঐ টোলে বাঙ্গালী ছাত্র ছিল না, অধিকাংশ মৈথিল, দুই একটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছাত্র ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটি তরুণবয়স্ক দণ্ডী ঐ টোলে গ্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সম্পন্ন লোকের সম্মান, উপনয়নের পর স্বৈচ্ছায় দণ্ড ত্যাগ করেন। যেমন সুন্দর সুগঠিত দেহ, তেমনি প্রতিভাবান। তিনি আমাদের টোলে ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের নিকট বিকালে কুমুমাজলি পড়িতে আসিতেন। তাঁহার প্রতিমাসেই বাটী হইতে মণি-অর্ডার আসিত, গরদের কাপড় গিরিমাটি দিয়া ছুপাইয়া পরিতেন। দণ্ডীদের অগ্নিস্পর্শ করা নিষেধ, স্ততরাং রাম-সীতার বাটীতে মাসিক আট টাকা দিয়া হিন্দুস্তানী পাচকের হস্তে এক বেলা চকচাক্য আহার করিতেন এবং ফলমূল মিষ্টান্ন গুঞ্জে রাজ্যের বাপার সমাপ্ত হইত। দণ্ডী প্রাতঃ-কালে মুখ ধুইয়াই সেই সময়ের দোয়া দ্বিবচন একসের গুঞ্জে মধ্যে এক ছটাক ঘৃত মিশাইয়া পান করিতেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর জ্ঞা বল ছিল। ঐ দণ্ডীর নাম সোমেশ্বরানন্দ সোমেশ্বরানন্দ গৃহত্যাগী দণ্ডী অথচ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়মাসে বিকালবেলা আকাশে মেঘ উদ্ভিত হইলেই আকাশের দিকে তাকাইয়া

অতি মধুর স্বরে মেঘদূতের নিম্নলিখিত শ্লোকার্ছ পাঠ করিতেন।

“মেঘালোকে ভবতি ত্বিনোহপ্যন্তথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনদূরসংস্থে ॥”
আমরা তাঁহার জীবনের রহস্য কিছু বুঝিতে পারিতাম না। তখনও নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। গঙ্গারান্নে বাইবার সময় প্রায়ই দল বাঁধিয়া যাইতে হইত, প্রায়ই পথের মধ্যে কি গঙ্গার বাটে তর্ক-বিতর্ক হইত। সাগংকালে গঙ্গাতীরে বাইবার সময়ও ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইত।

প্রতিপদ, চতুর্থীর রাত্রি, অষ্টমী, ত্রয়োদশীর রাত্রি প্রভৃতি অনধ্যায় কালে আমরা বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃতানুবাদ ও সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিতাম। কোন কোন দিন অল্প টোল হইতেও অধিকবয়স্ক ছাত্রেরা আসিয়া আমাদের উদ্ভট কবিতা শুনাইতেন। আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে সময়ে নবদ্বীপের প্রধান কবি। আমরা তাঁহার রচিত কবিতারও আলোচনা করিতাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত উদারচরিত ছিলেন, তিনি যেমন দয়ালু তেমনি নিরোভ, গৌকে তাঁহাকে একটু ক্রোধী বলিত, কিন্তু অতটুকু ক্রোধ না থাকিলে লোকে গ্রাহ্য করিবে কেন? তাঁহার বখেষ্ঠ গাভীর্ঘ্য ছিল, তিনি চতুষ্পাঠীতে পদার্পণ করিলেই সেই ছাত্র-কলরবে মুখরিত চতুষ্পাঠী যেন “নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্” হইত। নবদ্বীপের সকল ছাত্রই গবর্ণমেন্টের বৃত্তি পাইতেন। এতদ্বিন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গরিব ছাত্রদিগকে বৃত্তি ব্যতীত মাসিক দুইএক টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু সে ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত

না। আমরা দেখিয়াছি তিনি অত্যন্ত ক্রোধাক্ত হইলেও, তিনবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেই তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত হইত। একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পড়াইয়া কেবল বাটী যাইবেন এমন সময় চাউল বোঝাই গরুর গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া টোলের কক্ষির বেড়ার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। সংবাদ পাইবা মাত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই গাড়ে-মানের প্রাণ উড়িয়া গেল। সে হতভয়ের আয় দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে একবার হাত উঁচু করিয়া মারিতে যান, তাবার পিছাইয়া আসেন, এইরূপ বার তিনেক করিয়া তাহার পর ফুলের সাজি বেলতলায় রাখিয়া আবার কি মনে হইল, হাত উঁচু করিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহার পর একবার কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। আবার বকিতে বকিতে কাছা ঝাড়িয়া কাছা দিলেন। তখন ছাত্রেরা চুপে চুপে বলিতে লাগিল, আর একটীবার কাছা ঝারিলেই বেচারী নিস্তার পায়। সত্য সত্যই আর একবার কাছা ঝারিয়া যখন কাছা দিলেন, তখন তাঁহার পুনরায় পূর্ববৎ সৌম্যভাব লক্ষিত হইল, বলিলেন “বা বেটা যা আর কখনও বেড়া ভাঙ্গিস না, সকালে কিছু খেয়েছিস্?” গাড়েমান বলিল “ঠাহুর মশাই খাব কি? শেষেরতে গাড়ী ছেড়েছি, নদের বাজারে যাব, চাউল বেচব তবে ভো পয়সা পাব।” এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় টেক থেকে তিনটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন “বা মুড়ি মুড়কী কিনে খাণে।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, তাঁহার সু-মধুর আঃ সার্কন ডাক্তার ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্কন করিতেন, তাঁহার প্রেরিত অর্থও না কি গ্রহণ করিতেন না। গুরুদেবের উপদেশ ও শাসনগুণে ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক পবিত্রতার ভিলমাত্র হানি নাই। আমরা জীবনের

প্রথম অংশ তাঁহার চতুর্পাঠ্যে অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সকলেই কুহু দেহে অতি আনন্দে ছিলাম। ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর হিংসাবেশ ভিলমাত্র ছিল না, সকলেই পরস্পর সহায়কৃতিসম্পন্ন। 'তে হি নো দিবসা গতঃ।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বৈদিক সাধনার আভাস

এইরূপে ঋষি এক অধিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে প্রথমে অব্যক্ত সৃষ্টির পরে ভৌত-ভোগ্যসৃষ্টির স্থলবিবরণ দিয়া সর্কবিধের অধ্যক্ষ সর্কজ এক জীবের অসীকার করিলেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তথাপি প্রলয়কালে তাঁহার বে নিগুণ অবস্থা বে অবস্থার গুণময়ী প্রকৃতি অভিন্নরূপে তাঁহাতে অবস্থিতা ও নিষ্ক্রিয়া, সেই অবস্থা হইতে একেবারে গুণময় জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই ব্রহ্মই সৃষ্টির সর্কপ্রথম স্তরে বিশ্বজননী তাঁহার গুণের লীলা প্রকটিত করিবার অল্প ব্রহ্ম হইতে যেন একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। "যেন" বলিবার কারণ এই যে এই সরিয়া দাঁড়ান বার্থ সরিয়া দাঁড়ান নহে। বৈতন্য অজ্ঞানের সৃষ্টিমাত্র, অনির্কচনীর অসচ্চি বিধা কর্তব্যকারের বিধা কল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরন্তু বৈতন্যপক্ষে এই বৈতন্য সূচক নহে। কর্তব্যকারবদ সীমের

পক্ষে বৈতন্যবের অসীকার করিতে বাওয়া আর মাত্রাস্পর্শের অধীন ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকে জগদ্ব্যাপী তেজঃপদার্থমাত্র বলিয়া ভ্রাতো হস্তপ্রবেশ করান সমান কথা। সৃষ্টিলীলা বৈতলীলা, সূত্রাং সৃষ্টির কথা বলিতে গেলে বৈতন্যবেরই ব্যাখ্যান করিতে হয়। এই ব্রহ্ম ঋষি সৃষ্টিসৃষ্টি অধিতীয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াও, জগতের অধ্যক্ষের অর্থঃ জীব বা সগুণ ব্রহ্মের অবতারণা করিয়াছেন। গুণ অবচ্ছেদক, সূত্রাং সগুণ জীব অবজ্ঞিত, শরীরী। সাধারণ জীব যেমন স্থলদেহে অধিষ্ঠিত, তিনি তেমনি ব্যোমদেহে অধিষ্ঠিত।

৪র্থ শ্লোকে যে মূলপ্রকৃতিকে অসংকল্য হইয়াছে, সেই মূলপ্রকৃতি বা অধ্যক্ষকেই ৭ম শ্লোকে যোম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "অব্যক্তং অব্যাক্তাকারানি-নাশবাচ্যম্" (শরচ্চন্দ্র—কর্ক ৩১১) অধ্যক্ষকে, অব্যাক্ত, অব্যক্ত, অসংকল্য, অসংকল্য

অভিহিত করা হয়। পুরুষসূক্তে (ঋ-স ১০।২০) ইহাকে বিরাট বলা হইয়াছে। এই বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাওদেহকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ, অর্থাৎ পরমাত্মা, সত্ত্বগুণরূপে জাত হন (ঋ-স ১০।২০।৫)। প্রজাপতিসূক্তে আবার (১০।১২১) এই বিরাড্‌দেহাভিমাত্রী পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে। বিরাট পুরুষের অণুরূপ কারণ বেক্রপ অণুর মধ্যে জীবের উৎপত্তি হয়, তেমনি বিরাটের মধ্যে নির্ধূল জগতের উৎপত্তি হয়। বিরাট হিরণ্যর, কারণ উহা প্রকাশস্বভাব। অতএব বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। এই বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভই জগতের স্রষ্টা এবং তিনিই প্রজাপতি অর্থাৎ জগতের অধ্যক্ষ; মার্যাবেষ্টি হইলেও তিনি মায়ার অধীন নহেন; তিনি সর্বজ্ঞ ও সচ্চিদানন্দরূপ। প্রজাপতিসূক্তে বৈদিক ঋষি ইহার জগৎকর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন। প্রজাপতি সূক্ত বা ব-সূক্তঃ—
“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতন্ত জাতঃ

পতিরেক আসীৎ ।

স মাধার পৃথিবীং তামুতেমাং কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

য আত্মনা বলদা যন্ত বিখ উপাসতে

প্রশিষং যন্ত দেবাঃ ।

যন্ত ছারামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥

যঃ প্রোপতো নিমিষতো মহিষেক ইত্ৰোজা

জগতো বভূব ॥

য ঈশে অস্ত্র দ্বিপদশত্ৰুশ্রবঃ কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

যজ্ঞেহে হিরণ্যগর্ভঃ, হবিষা বজ্র সমুজ্জ্বলয়া সংহতঃ ।

যজ্ঞেমাঃ প্রদিশো যন্ত বাহু কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥

যেন ভৌরুগা পৃথিবী ও মৃত্যু যেন যঃ

ভূতিতং যেন লোকঃ ।

যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কটৈশ

দেবার হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥

যং ক্রন্দনৌ অবস। তন্তুভানে অটোয়াক্ষতঃ

মনসা রেজমানো ।

যত্রাধি সূর উদিতো বিভ্রাতি কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

আপো হ যদৃ হতাৰ্বিষমায়নগর্ভঃ দধানা

জনয়ন্তীরশ্বিঃ ।

ততো দেবানাং সমবর্ততানুরেকঃ কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যাপশ্রজকঃ দধানা

জনয়ন্তীরজঃ ।

যো দেবেষুধিদেব এক আসীৎ কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

মা নো চিংসোজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা

দ্বিষং সত্যধর্মী অজান ।

যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কটৈশ দেবার

হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥

প্রজাপতে ন তদেতাভ্রতো বিধা জাতানি

পরি তা বভূব ।

যৎকামান্তে জুহুমন্তরো অন্ত বরং ত্রাম

পতরো ররীগাং ॥ ১০ ॥”

ঋ—স ১০।২১

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য—

১। অগ্রে হিরণ্যগর্ভ জাত হন।

হইয়া তিনি ভৌতিক জগতের এক (অবিভী)

পতি, অর্থাৎ জীবরাজ। তিনি এই পৃথিবী

ও ছালোক ধারণ করেন। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য—সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যাক্তরূপ হিরণ্য অণ্ডের গর্ভে দেব প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হন, সুতরাং হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয় এ কথা নিরর্থক। ফলতঃ বিয়দাদি উপাধি সকলের উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহারা যাহার উপাধি তাঁহাতে এই উৎপত্তির অধ্যাস হইয়াছে।

প্রলয়ান্তে পরব্রহ্মের তপঃ হইতে বিয়দাদি ভূত সকলের সৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব হয়। এই কথাট কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যঃ পূর্বং তপসো জাতমন্ত্যঃ পূর্বমজায়ত” (কঠ ২।১।৬)।

কঃ, কিম্ শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার এক-বচন। নিখিল জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ নান্যাবদ্ধ জীবের পক্ষে অনির্ণয়ের বলিয়া তাঁহাকে ঋষি কঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ জগতের অধিতার পতি বা ঈশ্বর ও ধারক।

২। যিনি আত্মা দান করেন ও বল দান করেন; যাহার প্রকৃষ্ট শাসন সকলে ভজনা করে, এমন কি দেবগণও ভজনা করেন; অমৃতত্ব যাহার ছায়া ও মৃত্যুও যাহার ছায়া সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য—এই দেব প্রজাপতি হইতে আত্মা সকল আবির্ভূত হয় যেমন অগ্নি হইতে বিদ্যুলিঙ্গ সকল আবির্ভূত হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই জন্ত ইহাকে হতাত্মা বলা হইয়াছেন। ইহার শাসন অঙ্গসারে সমগ্র বিশ্ব শাসিত হয়।

“একোবশী সর্বভূতাহারা একং রূপং বহুধা যঃ কেরোতি” (কঠ—২।২।১২)—এক অধিতার ঈশ্বর নিখিল জগতের শাসক ও সর্বভূতের অন্তঃস্থিত আত্মা; তিনি এক হইয়াও আপনাকে বহু করেন। মৃত্যু ও অমৃতত্ব তাহার ছায়া, অর্থাৎ তিনি জীবের কর্মফলদাতা। এই ঋকে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্ট্রাত্মা নিখিল বিশ্বের শাসক ও কর্মফলদাতা।

৩। যিনি মাহাত্ম্যাহেতু প্রাণনক্রিয়াশীল ও নিমেষবিশিষ্ট জগতের এক অধিতার রাজা; যিনি দ্বিপদও চতুষ্পদবিশিষ্ট এই প্রাণি-জগতের শাসক সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভদেবের শাসকত্ব বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। তিনি নিখিল প্রাণিজগতের রাজা।

৪। এই সকল হিমবান্ (পর্বত) যাহার এবং নদীর সহিত সমুদ্র যাহার মাহাত্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং এই দিক্‌সকল যাহার বাহু সেই কঃ—দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য—হিমবান্ পর্বত ও নদী সহিত সমুদ্র দ্বারা সমগ্র জড়জগৎ উপলক্ষিত হইতেছে। ৩য় ঋকে প্রাণিজগতের কথা বলা হইয়াছে। এই ঋকে জড়জগতের কথা হইতেছে। কি প্রাণিজগৎ কি জড়জগৎ সকলেই তাঁহার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতেছে, কারণ তিনি তাহাদিগের স্রষ্টা এবং তাহার তত্ত্বপে অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে, এমন কি শূন্যরূপী দিক্‌সকল তাঁহার বাহুস্বরূপ। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের বিরাটত্ব উক্ত হইল।

৫। যাহার দ্বারা ছালোক, অন্তরীক্ষ ও

পৃথিবী দৃঢ় হইয়াছে, স্বর্গের দ্বারা সূর্য্য (স্বহানে, স্থানভট্ট না হয় একপদ্যাবে:) স্তম্ভীকৃত হইয়াছে; যিনি অন্তরীক্ষে রক্তের অর্থাৎ উষ্মকের নির্মাতা, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য্য—হিরণ্যগর্ভ যে শুধু :গৎকে সৃষ্টি, ধারণ ও শাসন করেন তাহা নহে। যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগৎ রক্ষিত হয়, তিনি সেই সকল নিয়মেরও বিধান করেন। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে জগতের রক্ষক বলা হইল।

৬। দীপ্তিশালিনী জ্বাপৃথিবী লোক-রক্ষার্থ লব্ধস্বৈর্য্য হইয়া যাহাকে মনদ্বারা (আমাদের মহত্বের ইনিই কারণ এইরূপ চিন্তা করিয়া) দর্শন করে; যাহাকে আধার-রূপে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য উদ্ভিত হন ও আলোক বিস্তার করেন সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভকে ভূলোক ও দ্যালোকের উপাত্ত ও সূর্য্য প্রভৃতির আধার বলা হইয়াছে।

৭। মহতী, অগ্নির জনয়ন্তী অপ্ সকল যে গর্ভকে ধারণ করিয়া বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন সেই গর্ভ হইতে দেবগণের এক প্রাণ আবির্ভূত হয়। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য্য—অপ্ শব্দে এখানে অব্যক্ত বা বিরাট বৃত্তিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রে ইহাকেই কারণ-বারি বলা হইয়াছে। এই অপ্ হইতে অগ্নি প্রভৃতি ভূতসকল উৎপন্ন হয়। ইহা প্রজাপতির শরীর। “বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন” এই কথা দ্বারা অপের বিরাটও নির্দিষ্ট হইল।

পুরুষ প্রজাপতিরূপে ইহার গর্ভে অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি হইতে দেবগণের এক প্রাণের উৎপত্তি হয়। এক প্রাণ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জগতে প্রাণপদার্থ এক। বিরাড্ দেহী প্রজাপতির দেহে এক বিরাট প্রাণের আবির্ভাব হইল। এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণের উৎপত্তি হইল। কঠোপনিষদে এই কথাই উক্ত হইয়াছে।—

“যা প্রাণেন সংভবতি অদিতিদেবতামরী” (কঠ ২।১।৭) অর্থাৎ যে সর্বদেবাত্মিক অদিতি বা মূলপ্রকৃতি প্রাণরূপে আবির্ভূত হন। পুনশ্চ, “যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অন্তঃ যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতান্তহ-নাত্যোতি কশ্চন” (কঠ ২।১।৯), অর্থাৎ যাহা হইতে সূর্য্য উদ্ভিত হন ও যাহাতে অন্ত যান সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অবস্থিত ইত্যাদি। এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের বিরাড্-ধিষ্ঠাতৃত্ব ও তাঁহা হইতে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।

৮। যজ্ঞের জনয়ন্তী, দক্ষের ধারয়িত্রী অপ্ সকলকে যিনি মহিমা দ্বারা সমাক্ষ দর্শন করেন, যিনি দেবগণের উপরে এক অধিষ্ঠায় দেব, সেই কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য্য—বেদে জগৎ বা বিক্রান্তোৎপন্ন বিশ্ব যজ্ঞরূপে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্বিধের পুরুষসূক্ত (১০।৯০) ও সৃষ্টিসূক্ত (১০।১৩০) দ্রষ্টব্য। এই জগৎপ্রাণী যজ্ঞ অপ্ অর্থাৎ অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। দক্ষ প্রজাপতি। অপ্ তাঁহার ধারয়িত্রী অর্থাৎ

তীহার শরীর। প্রজাপতির শরীরভূত যে অধ্যাক্ষ মূলপ্রকৃতি তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি। প্রজাপতি এই শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত দর্শন করেন। তিনি জগতের দ্রষ্টা, সাক্ষী, সর্বজ্ঞ। তিনি দেবগণেরও ঈশ্বর ও অধিত্য। এই ঋকে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব ও হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি ঈশ্বরের সর্বসাক্ষিত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব উক্ত হইয়াছে।

৯। যিনি পৃথিবীর জনস্রিতি, সত্যার্থ্য। যিনি দ্যুলোকের দ্রষ্টা, এবং যিনি মর্ত্যী উদক সকলের স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কঃ-দেবকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্যা করি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্ব-স্রষ্টা ও হিংসকত্ব বা বিনাশকত্ব উক্ত হইয়াছে।

১০। হে প্রজাপতি, তোমা ভিন্ন কেহ বর্ত্তমান সমস্ত বিশ্ব জানে না কিংবা তোমা ভিন্ন কেহ সর্ববিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে না। আমরা যে সকল কামনা করিয়া তোমাকে হবির্দান করিতেছি, আমাদিগের সেই সকল কামনা পূর্ণ হউক। আমরা যেন ধন সকলের পতি হইতে পারি।

তাৎপর্য্য—এই ঋকে হিরণ্যগর্ভের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বাভীষ্টদাতৃত্ব উক্ত হইয়াছে।

সমস্ত ঈশ্বরের বতন্তালি গুণ থাকি আরম্ভক, - ঋষি তাহা এক এক করিয়া প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভে স্থাপন করিলেন। তিনি

তীহার বিরাট দেহে বিশ্বকে ধারণ করেন এবং সর্বঘণ্টে আত্মরূপে প্রকাশিত হন। তিনি জগতের স্রষ্টা, নিরস্তা, পালয়িতা ও সংহতী। নিখিল বিশ্বের তিনিই একমাত্র উপাত্ত। তিনি মায়াময়ী হইলেও মায়ার অধীন নহেন,— তীহার দৃষ্টি অবিভক্ত, অপ্রতিহত। তিনি সত্যার্থ ও সর্বজ্ঞ। তিনি ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব কেহ জানে না, সুতরাং পূর্বমুখে (১০ ১২০। ৭) যে জ্ঞাতা অধ্যাক্ষের কথা ঋষি বলিয়াছেন এই প্রজাপতিই সেই অধ্যাক্ষ। তাহা হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, যে প্রাণকে অবলম্বন করিয়া দেবগণ অবস্থান করেন। তিনি জীবের কর্মফলদাতা। মৃত্যু ও অমৃত্যু উভয়েই ছারাক্রমে তীহার অঙ্গগমন করে—উৎপত্তি ও বিনাশ, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি যন্মের তিনি অতীত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের যে নির্ণয় আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বেদের অঙ্গগামী। যোগিগণ যে “ক্লেশ-কর্মবিপাকশরীরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ” (পাতঞ্জল দর্শন ১।২৪) ঈশ্বরের ধ্যান করেন বৈদিক ঋষিও সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। এই ঈশ্বর বেদান্তের প্রভাগাত্মা, হৃদাত্মা, আনন্দময়। প্রকৃতিবিকার স্বপ্নঃখ মোহের অতীত এক অনির্কলনীয় ভাবের নাম আনন্দ। প্রজাপতি ঈশ্বর প্রকৃতির অধীন নহেন, সুতরাং আনন্দময়। “আত্মানন্দময়ঃ” (তৈত্তিরীরোপনিষৎ ২।৫)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল মজুমদার।

বাঙ্গালা মাসিকপত্র

বোধ হয় লেখক ও পাঠকের তুলনায় বাঙ্গালা মাসিকপত্র অধিক হইয়াছে। ইহাতে দেশের শুভাশুভ বিচার না করিয়া পাঠকের পক্ষ হইতে দুই চারি কথা লিখিতেছি।

নিষ্ঠা, বিক্রেতা ও ক্রেতা এই তিনের যোগে যেমন হাট; লেখক, সম্পাদক ও পাঠক এই তিনের সহকারিতায় তেমন মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা। ক্রেতা দেখিলে বিক্রেতা উপস্থিত হয়, বিক্রেতা নানা স্থানের নিষ্ঠাতার উৎপন্ন দ্রব্যাদি একত্র করে। তবে আগে ক্রেতা, পরে অস্ত্র দুই। কদাচিৎ নিষ্ঠাতার উদয় আগে হয়, কদাচিৎ নিষ্ঠাতা ও বিক্রেতা একযোগে ক্রেতার উৎপত্তি করে।

জ্ঞানদান ও আনন্দদান মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য। জ্ঞানের সহিত আনন্দ জড়িত। জ্ঞানার্জনের ফল আনন্দ,—যদি আবশ্যক জ্ঞান পাই, যদি অর্জনে কষ্ট না হয়। সকলের অর্জনের শক্তি এক নহে, সকলের জ্ঞানের প্রয়োজনও এক নহে। সে যখন চরমের নানা ভেদ আছে, তখন মাসিকপত্রেরও নানা ভেদ থাকিতে পারে। যদি বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞান নামে জ্ঞানের দুই ভাগ করি, তবে মাসিকপত্রেরও দুই ভাগ করিতে পারি। কেহ ধর্মের, দর্শনের, বিজ্ঞানের, এমন কি বাঙ্গালা ভাষার, চরম তত্ত্ব জানিতে প্রয়াসী; তিনি সেই সেই বিষয়ের বিশেষ মাসিকপত্র পড়িতে ইচ্ছা করিবেন। কেহ অসামান্যে অথবা বিনা আয়াসে নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ ইচ্ছা করেন, তিনি সাধারণ মাসিকপত্রের

গ্রাহক হইবেন। এইরূপ, পাঠকভেদে মাসিকপত্রের ভেদ অবশ্য ঘটবে।

বিলাতে এইরূপ নানাশ্রেণীর মাসিকপত্র আছে। এদেশে দুই চারিটা ছাড়া আর সব এক শ্রেণীর। বোধ হয় পাঠকের অভাবে বিশেষ মাসিকপত্রের অভাব। আরও বোধ হয় লেখকের অভাবে অথবা লেখার দোষে পাঠক হয় না। সমবায়সায়ীর মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান নিমিত্ত ব্যবসায়সম্বন্ধীয় পত্রের জন্ম হয়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রদানের গুণে অস্ত্রে সে ব্যবসয়ে আকৃষ্ট হয়। বাণিজ্যের মূলসূত্র একটা এই যে, পণ্য বাহা হউক, যেমন হউক, গ্রাহক আছে। বুদ্ধিমান বণিক গ্রাহক অন্বেষণ করে, পণ্যবিক্রয় দ্বারা অর্থ উপার্জন করে।

আমি হাটে বাজারে ব্যাপার করার সহিত মাসিকপত্র-চালনার তুলনা করিতেছি, ইহাতে হয়ত কোন কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক কষ্ট হইবেন। তিনি হয়ত মনে করেন তিনি সাহিত্যসেবা করিতেছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কামনা করিয়া ঘরের খাইয়া বনের মহিষ ভাড়াইতেছেন। এক এক মাসিকপত্রের জন্মকালে প্রথমপক্ষে এই ভাবের সূচনা থাকে। পড়িলে মনে হয়, দেশের কেবল কল্যাণ-কামনার সম্পাদক মহাশয় অসম সাহসে দাঁড়ান বোঝা যাড়ে লইতেছেন। দুইলোকে বলে সম্পাদক সাজিবার সাধও একটা আছে, সাহিত্যসেবা নামে গড়িত হইবার মাসিকপত্র অল্প নহে।

অনেক দিনের একটা কথা বলি। এক পণ্ডিত দেখিলেন, সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে তেমন সমাদর পাওয়া যায় না, কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রচার হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত কাব্যের অমুকরণে চমৎকার বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। বোধ হয় কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, দেশেরও হিত হইতে পারিত। কিন্তু জানি না, তাঁহাকে কি কারণে দেশে বিজ্ঞানচর্চার অভাব-রূপ 'ভূতে' পাইয়া বসিল। তিনি বিজ্ঞানের 'বি' জানিতেন না, কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পাদক হইলেন। লেখক জোটাইলেন কলেজের পড়ুয়া। ইংরেজী বহির তর্জমা করিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রবন্ধ যোগাইতে লাগিলেন। আজিকালি কলেজের ছাত্র বাঙ্গালা ভাষা কিছু কিছু শিখিতেছেন। সে-কালে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষণীয় ছিল না। হুইএক জনমাত্র সহজ শুদ্ধ ভাষা লিখিতে পারিতেন। অধিকাংশ ভাষা লিখিতেন তাহা অপাঠ্য হইত। সম্পাদক মহাশয় সে ভাষা যথাসাধ্য শোধিত করিয়া লইতেন, কিন্তু সব দোষ সারিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলে এবং বাঙ্গালা ভাষায় চিন্তা করিবার সুযোগ পাইলে যে সহজ ভাষা বাহির হয়, আঁধারে হাতড়াইলে সে ভাষা আসে না। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যোগাইতে লেখক ও সম্পাদক ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। এই হেতু ইংরেজী অক্ষরে ছাপা ইংরেজী শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সম্মিলন চালাইতে হইল। যেন সে বিষয়টা জানিবার জন্ত দেশের পাঠক উদগ্রীব হইয়া ছিলেন, না

জানিলে দেশের সর্বনাশ হইত। এমন কিন্তু ত-কিমাকার পত্রেরও গ্রাহক জুটিল, দেশে নূতন উদ্যম বলিয়া বিজ্ঞান ক্ষমাশূণ্যে পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তথাপি পত্রের আয় ফরাইয়া আসিল, লেখক জুটিল না।

এখনও এরূপ কিন্তু-কিমাকার পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক জনেরও হিত হইলে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করেন। এ স্থলে তাঁহার দেশহিতৈষণার প্রশংসা করি, কিন্তু পরিশ্রম, সময় ও অর্থের অপব্যয়ে দুঃখও হয়।

বস্তুতঃ বিনা উদ্দেশ্যে কাজ হয় না। জানি না, কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যদি স্পষ্টাঙ্গপাতি জানিতে পারি যে অপর সহস্র পণ্যের জায় মাসিকপত্রকে ও পণ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে লেখক ও পাঠকের এবং সে সঙ্গে সম্পাদকের সম্বন্ধ বৃদ্ধিতে পারা যায়। নূতন মাসিকপত্রের গোচরিকায় আসল কথাটা প্রায়ই চাপা থাকে, সাহিত্য-সেবার এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির যথাসাধ্য প্রয়াসী দেখিলে প্রথমে জানিতে ইচ্ছা হয় তুমি কে, তোমার কি যোগ্যতা আছে। কেহ কেহ যোগ্যতা বলিতে চান না, ক্রমে ফল দেখিয়া পরিচয় লইতে বলেন। কেহ কবি ছিলেন, অনর্গল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় তৎকালের মাসিকপত্রের সম্পাদক সে কবিতা অগ্রাহ্য করিতেন, প্রকাশের অযোগ্য মনে করিতেন। যোষে ও ক্লোভে কবি স্বয়ং এক মাসিকপত্র প্রকাশে উদ্বোধনী হইলেন, সম্পাদক হইয়া মনের সুখে নিজের ও বন্ধুজনের কবিতা একটা দুইটা তিনটা

করিয়া মাসে মাসে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল পত্র ছাপাইলে মাসিকপত্র চলে না, পত্রও প্রকাশিত হইতে লাগিল। গল্প যখন গল্পে রচিত হয়, এবং গল্পের দৈর্ঘ্য যখন নির্দিষ্ট নাই, তখন সুকুমার সাহিত্যের সেবা দিন কতক বেশ চলিয়াছিল।

গল্পলিখন-প্রবৃত্তির তাড়নাতেও দুই এক মাসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে। যে-সে গল্প যখন মাসিক পত্রের সম্পাদক ছাপাইলেন না, গল্প-লেখক প্রতিজ্ঞা করিলেন স্বয়ং মাসিকপত্র সম্পাদন করিবেন। জল্পক বন্ধুবর্গ একত্র হইলেন, নূতন মাসিকপত্রের জন্ম হইল। পূর্বে বাক্সালী শুধুই বকে বলিয়া একটা দুর্গাম ছিল; এখন বাক্সালী কিন্তু লিখিয়া বকিতে শিখিয়াছে। সব মাসিকপত্র দেখার ভাগ্য হয় নাই; কিন্তু যত দেখিয়াছি, গল্প নাই এমন সাধারণ মাসিক পত্র দেখি নাই। পত্রাক্ষ অল্প হউক, পত্রের উদ্দেশ্য বাহাই হউক, গল্প চাই। দেশে এত গল্পও ছিল!

গল্পের মতন গল্প পাইলে পাঠকের অসন্তোষের কারণ থাকিত না; নিজ-ব্যবসায়-কর্মে ক্লান্ত মন গল্প পড়িয়া শ্রান্তি বোধ করিত। কিন্তু যে দেশে কথা ও গল্প, কথা ও কাহিনী, কথা ও উপজ্ঞান, কথা ও বাক্য, কথা ও বার্তা একার্থবাচী হইয়াছে, সেদেশে মাসিকপত্রের গল্পের প্রকৃতি নিরূপণ করা দুষ্কর। গল্প শব্দের বৃথা আড়ম্বরে নহে, কাহিনীর দৈর্ঘ্যও নহে। অথচ ভাষার শব্দের গুণেও গল্প মনোহারী হইতে পারে। বস্তুতঃ আমরা যেমন মজ্জকে তাহার বস্তু সঞ্চালন করিতে দেখিয়া বিম্বিত হই, লেখককে শব্দ লইয়া লীলা করিতে দেখিলেও বিম্বিত হই। আধ্যাত্মিক

গল্প নহে, অথচ আধ্যাত্মিক থাকিলেও গল্প হইতে পারে। বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশও গল্প নহে, কিন্তু তেমন স্থানে সমাবেশই গল্পের প্রাণ হইতে পারে। কিসে গল্প সার্থক হয়, সরস হয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানি, যুবক-যুবতীর প্রেমভিনয়, মানাভিমান ঈর্ষাদ্বেষ, অতৃপ্ত বাসনা প্রভৃতি না থাকিলেও চমৎকার গল্প হইতে পারে। এক্ষণে গল্প বাক্সালা ভাষায় রচিতও হইয়াছে। অবশ্য ছলিত হইয়া আছে। কারণ কবিত্বকলার জায় গল্পরচনাও কলা-বিশেষ। অল্প কথায় গল্পের নায়ক-নায়িকার মনের একটা ভাব যিনি প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার আদর হইবেই।

ক্রেতার রুচি অনুসারে বিক্রয় পণ্য উৎপন্ন হয়। গল্পের বাজারেও যদি এই নিয়ম থাকে তাহা হইলে বাক্সালী পাঠকের কলা-জ্ঞান মার্জিত হয় নাই। লব্ধ পণ্য অনুসারেও ক্রেতার রুচি পরিবর্তিত হইতে পারে! যদি সম্পাদক মহাশয় কলার আদর্শ উচ্চ ধরিয়া রাখেন, তাঁহার পত্রের পাঠকেরও আদর্শ উচ্চ হইতে থাকিবে। আমি যে যাবতীয় মাসিকপত্রের গল্প সবই পড়িয়াছি এমন নহে। কিন্তু নূতন মাসিকপত্র পাইবামাত্র তাহার স্থচীপত্রে চোখ বুলাইয়া দেখি, গল্প কবিতার দুই এক ছত্র পড়ি। ছেলে মেয়ে লইয়া কার্যক্রেমে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, বিলাসবিভ্রমে 'চটুল' চাপল্যে দিনপাত হয় না। গল্প পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইয়াছে, মাসিকপত্রে কবিতা পড়িয়া সে পত্র-প্রেরণ নিবেদন করিতে হইয়াছে। কেবল বর্তমান লেখকের নহে, অনিবার্য আরও অনেক পাঠকের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। গল্প ও

কাখোর নামে চিত্র-বিক্ষেপের মদিরার হাব-ভাব-বিলাসের আলঙ্কারিক বর্ণনার জীবন-যাত্রার বিষয় জন্মে।

আরও তন্নানক হইয়াছে, বিজ্ঞাপন। ঔষধের বিজ্ঞাপনে অলীলতার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কারণ রোগী রোগচিকিৎসা চায়, কুৎসিৎ রোগ লুকাইতে চায়। রোগী ঔষধ-বিক্রেতার নিকট রোগের নিদান বর্ণনা, চিকিৎসাগে নিদান ও পরিণাম প্রদর্শন চায় কি? ভয় দেখাইয়া ঔষধবিক্রয় অসাধুতা। যাহা চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য, তাহা চিকিৎসাবিষয়ক মাসিকপত্রে, গ্রন্থে, স্বচ্ছন্দে প্রকাশ কর। কেহ নিদান জানিতে চাহিলে, তাহার নিকট বিজ্ঞাপন পাঠাইও। কিন্তু যে জানিতে চায় না, তাহার নিকট নিলজ্জতার বিজ্ঞাপন পেরণ কেন? অগন্ধি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনেও ইত-ভাগ্য নিলজ্জ বিক্রেতা বর্ণনার চটকে, পরারের জোরে, কুৎসিৎ নামকরণে গ্রাহক অন্বেষণ করিতেছে। যাহা বার-নারীর দ্বারেও উপস্থিত করিবার অযোগ্য, তাহা সরকারী ডাকের সাহায্যে ভদ্রপন্নীতে প্রেরণ করিতেছে।

মাসিকপত্রেও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বুঝি না, বিজ্ঞ সম্পাদক দোষ গুণ বিচার না করিয়া নিজের পত্রে যেস বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন কেন। যিনি পত্রের পৃষ্ঠা স্থলর করিতে প্রয়াসী, যিনি প্রবন্ধ-গৌরবে নিজের পত্রের গুরুত্বাসম্পাদনে মনোযোগী, তিনি কেমন করিয়া পত্রের সঙ্গে কদাকার চিত্র এবং আকাশভেরী অভিশরোক্তির বিজ্ঞাপনে শোভা কল্পনা করেন। চিত্রকলার নামে কাঠের পুতুলের কর্ণশক্তি শোভা পায় কি? যিনি

বিজ্ঞাপন দেন, তিনি কাঠের পুতুলও দেন; কিন্তু দেন বলিয়া নিজের কাগজে ছাপিতে হইবে কি?

পূর্বে মাসিকপত্রে চিত্র থাকিত না। এখন প্রায় সকল পত্রে অন্ততঃ একটা দুইটা থাকে। কোন কোন সম্পাদক 'হাকটোন' চিত্র দিয়া, 'হাকটোন' চিত্রকে অপূর্ণ পদার্থ জ্ঞান করাইয়া পাঠক ভুলাইতে চান। কিন্তু এই ভারতবর্ষেও 'হাকটোন' চিত্র হুল্লভ কি? 'হাকটোন' নামের গুণ কিছুই নাই, চিত্রই আসল; তাহাও ব্রকের ধোঁবে ছাপার দোষে শেষে কাঠের পুতুলে দাঁড়াইতে পারে। শিশু কাগজে কালী, লাল নীল রং মাখাইয়া মনে করে সুন্দর 'ছবি' করিয়াছে।

এদেশের চিত্রের রসগ্রহণ করিতে না কি আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি আবশ্যক। মানব-স্বভাবের উপরে উঠিয়া ছেলে-ভুলানো হাত-পা-শূন্য কাঠের পুতুলে সৌন্দর্য দেখিতে হইবে। ঢাকের নাদে কর্ণকূহর পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তবে কি না যখন-তখন যে-সে মানুষের কর্ণে সেটা হয় না। হয় না সত্য কথা। কেন হয় না, হওয়া উচিত, বলিলে পাঠক না-চায়। তাই বলি, যদি রস গ্রহণই না হইল, তবে কষ্ট ও অর্থব্যয় কেন? ইহাতে শিল্পীর হুঃখ হইতে পারে, কিন্তু জনগণে হুঃখের কারণ অনেক আছে।

প্রবন্ধ নির্মাচনেও অনেক সম্পাদক গুরু-লঘু জ্ঞানের অভাব দেখান। এই দর্শনের কূটত্ব, বিজ্ঞানের বিভীষিকা, পাশেই তরল-মতির চাপলা, পরে 'ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' (বস্তুতঃ বহু পৃষ্ঠা), সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপুস্তকবীর জলের অশচয়সংবাদ। প্রত্যেক পাঠক যে সব প্রবন্ধ পড়িবে এমন কথা নাই। পাঠক

বিভিন্ন, প্রবন্ধও বিভিন্ন; তথাপি সাধারণ মাসিকপত্রে যাহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে অধিকাংশ পাঠকের উপযোগী প্রবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। লেখকবর্গ একটা কথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়,—পুস্তকে যাহা চলে সাধারণ পাঠকের উপযোগী মাসিক-পত্রে তাহা প্রায়ই চলে না। গোড়া হইতে পড়িয়া গেলে হয় ত যাহা বোধগম্য হইবে, তাহার মাঝখান হইতে কিয়দংশ পৃথক করিয়া লইয়া পড়িলে ভ্রূক্ষীভাষ্য হইয়া পড়ে। এমন লিখিতে হইবে, যে, পাঠক সে বিষয় কিছু না জানিলেও তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন, আর যিনি জানেন, তিনিও সে বিষয়টা নূতন ধরণে দেখিতে পাইবেন। বিষয়বিশেষের পত্রে যাহা চলে, নানা বিষয়ের পত্রে তাহা না চলিবার কথা। প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইলে ভাল হয়; যদি এক প্রবন্ধে সম্পূর্ণ না হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধ এমন লিখিতে হইবে যেন তাহাই সম্পূর্ণ। অর্থাৎ একটা পড়িবার সময় অপরটাতে কি ছিল তাহা মনে রাখিতে না হয়। মাসিক-পত্রের প্রবন্ধের ইহাই বিশেষত্ব। একটা ভাব, একটা তত্ত্ব, একটা বা-কিছু, তাহা ধরিয়া রাখিতে হয়, ছাড়াইয়া গেলে পাঠকের ধৈর্য্য থাকে না। যদি উপভাষ্য, ইতিহাস প্রভৃতি দীর্ঘ বিষয় মাসে মাসে প্রকাশ করিতে হয়, তবে প্রথমে কতদূর কি থাকা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রবন্ধের আশ্বে দেওয়া কর্তব্য।

ওনিয়াছি, কলিকাতার ভোক্তাদের নিমন্ত্রণে ভোজন না করিলেও চলে, অন্নবাজন পরিপূর্ণ পাত্র দৃষ্টি করিয়া আরোজন উত্তম হইয়াছে

বলিলে নিমন্ত্রণরক্ষা হয়, নিমন্ত্রণকর্ত্তার কৃতার্থ হন। কিন্তু “উচ্চশ্রেণী”র এই সামাজিক ব্যবহার মধ্য ও নিম্নশ্রেণীতে পোষার না। এই শ্রেণীর লোক ভোক্তাদের নিমন্ত্রণে ভোজন করিতে চায়, দর্শনে কিংবা আত্মাণে তৃপ্ত হয় না। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নির্দিষ্ট পত্র বহুবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ করিয়া পাঠকের সমীপে প্রেরণ করিলেন, শাক হইতে মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত সবই উপস্থিত করিলেন, পাঠক উচ্চশ্রেণীর হইলে উত্তম হইয়াছে বলিয়া গাত্ৰোত্থান করেন, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর হইলে আসনে বসিয়া রীতিমত ভোজনে প্রবৃত্ত হন। সামাজিক ব্যবহারে অজ্ঞ বলিয়া কখন কখন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলেন, এটা কাঁচা ওটা আলোনা। যেটায় দস্তফুট না হয়, সেটায় কিন্তু নিজের দস্তের শিথিলতা কিংবা হুলতা অনুমান করেন। মানবচরিত্রের এ এক আশ্চর্য্য রহস্য! এই হেতু উৎকট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কঠিন শব্দরত্নাষ্য মাসিকপত্রে সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত প্রেরিত হইতেছে। জানি না, সম্পাদক মহাশয় পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন কি না,—আর কি চাই, বাঞ্ছন উত্তম হইয়াছে ত? পাঠক নিমজ্জিত বটেন, কিন্তু মূল্য দিয়া ভোজ্য ক্রয় করেন, সম্পাদক মূল্য লইয়া ভোজ্য বিক্রয় করেন। কেহ কিছু দান করেন না, কেহ কিছু দান গ্রহণ করেন না। সুতরাং সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার সহানুভব থাকা স্বাভাবিক বোধ হয়। বিলাতে সাধারণ মাসিকপত্রের সম্পাদক পাঠককে সর্বদা জিজ্ঞাসা করেন, আর কি চাই, কেমন হইয়াছে। জিজ্ঞাসার নানা কৌশল

অবলম্বন করেন, কখনও উন্নতির প্রস্তাব করিয়া অভিমত জানিতে চান, কখনও প্রস্তাব পাইবার নিমিত্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি বুঝেন, পুরাতন পাঠকে তুষ্ট রাখিলে ব্যবসায় স্থায়ী হয়, পুরাতনের সাহায্যে নূতন পাঠক সংগৃহীত হয়। এদেশে নিঃসন্দেহে মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে পারা যায়; সেদেশে মাসিকপত্র চালাইতে মূলধনের প্রয়োজন হয়। সেদিন দেখিতেছিলাম, বিলাতে মাসিকপত্রের এক একটা গল্প,— দুই হাজার শব্দের গল্প—৫০ টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না। তাহাও প্রসিদ্ধ লেখকের নহে। চলন সেই গল্প, যাহাতে প্রশংসা করিবার বড় একটা কিছু থাকে না।

বিলাত ধনীর দেশ, কলা ও বিদ্যার দেশ। সে দেশের সহিত এদেশের তুলনা করা সাজে না। কিন্তু তুলনা হয় না বলিয়াই দেশের গণ্যমান্ত পাঠক এদেশের মাসিকপত্রে পরিতোষ পান না। এমন পাঠকও আছেন যিনি ইংরেজী অক্ষরের মহিমায় মুগ্ধ হন, এবং এমন ইংরেজী গল্পও আছে যাহা পড়িতে আমাদের ভাল লাগে না। সে সব বিষয় ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালাতে অনেক ভাল ভাল মাসিকপত্র ও ভাল ভাল চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, ইহা বলিতেই হইবে। প্রবন্ধ দেখাইয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব করিতে পারেন। সময়ে সময়ে যে ক্রটি লক্ষিত হয়, তাহা প্রবীণ সম্পাদকের অর্কচীতন সহকারীর দোষে, কিংবা অব্যবহার দোষে বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক মাসিকপত্র অনেককাল চলিতেছে, সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকি কাজে পাকিয়াছেন। তবে, যেমন টক আম

পাকিলেও টক থাকে, তেমন যিনি গোড়ায় কাঁচা ছিলেন, তাঁহার ভূয়োদর্শনে কাঁচার রং পাকার মতন হয়, অল্প গুণ আসে না। পাঁচফুলে সাজি ভরানো সহজ, কিন্তু ফুল বাছা সহজ নহে।*

* বোধ হয়, এখন মাসিকপত্রের শ্রেণী-বিভাগের সময় হইয়াছে। ইংরেজীতে Journal, Review, Magazine, কৃত্ততঃ তিন শ্রেণীর মাসিক বা সাময়িক পত্র আছে। বাঙ্গালার এইরূপ জাতিবাচক নামও হয় নাই, সব মাসিকপত্র, কোনটা বা মাসিক-পত্র ও সমালোচন। সাহিত্য-পরিষদের পত্রের নাম সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা। ইংরেজী Journal শব্দের অনুবাদ করিলে বিনীকা হয়। ইংরেজী Review শব্দের অনুবাদে সমালোচন অপেক্ষা সমীক্ষণ চলিতে পারে। ইংরেজী Magazine শব্দের মূল আর্বা; সে শব্দ আমাদের পরিচিত পাজনার আছে। ইহার ধার্ষ্য স্কর। বিশেষার্থে স্করনা বলা চলে। যে নামই হউক, প্রথম প্রথম নূতন ঠেকিবে। জাতি-বাচক নাম থাকিলে পাঠক নিজের আবৃত্তক মাসিক-পত্র নির্বাচন করিতে পারিবেন, সম্পাদকও নামের বাহিরে বাইতে সজোচ বোধ করবেন। এখন কোন্‌ খানা কি, তাহা সমস্ত পত্র না পড়িলে এবং দুই চারি মাসের না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না। গল্প ও লঘু বিষয় না থাকিলে দুই একখানা সমীক্ষণ হইতে পারিত। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক দুই একখানা সমীক্ষণ আছে। অধিকাংশ স্করনা। পত্রের সম্পাদক, এই নামও কি ভাল হইয়াছে? Secretary—সম্পাদক, Editor—সম্পাদক, Manager—কার্যাব্যাক। এই নামগুলো হইতে বুঝা যায়, ইহাদের কাজ সবকিছু জান পষ্ট হয় নাই। এদেশের অভ্যাস, এদেশে Editor সংশোধক নাম পাইয়াছেন। কমিটির Secretary আর আকিসের Manager কাজে আর এক; হুতরাং ইহাদের নাম অধিকারী থাকিলে সন্দেহ হইত না। আরও শব্দ আছে। মাসিকপত্রের ভাষার দশম সংখ্যা

এখন অল্প দুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বোধ হয় চিত্রের স্থান করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন মাসিকপত্রকে প্রেসে বড় করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রেসে বড় হইলে ছয় মাসের কি বার মাসের অঙ্কগুলি একত্র একত্র বাঁধিলে পাটা হইতে পাতাগুলি ঝুলিয়া পড়ে, ফলে ক্রমশঃ আঙ্গা হইয়া থসিতে থাকে। বোধ হয়, ছাপার সুবিধা দেখিয়াও আকার বৃহৎ হইয়া থাকিবে। কিন্তু অধিকাংশ মাসিকপত্রে দেখিতে পাই চারি পাত্রে এক ফর্মা হয়। বাঁধিবার সময় ফলে দুই পাতা দুই পাতা করিয়া গাঁথিয়া যাইতে হয়। যদি প্রতি অঙ্কে দশ ফর্মা থাকে, বৎসরে একশত কুড়ি ফর্মা। গাঁথিতে কম সময় লাগে না। বিশেষ দোষ—দুই পাতার জোর কম, সহজে ছিঁড়িয়া যায়। অন্ততঃ চারি পাতা লইয়া গাঁথিতে পারিলে এই দোষ থাকিত না, গাঁথার পরিশ্রমও অল্প হইত। সুবিধা থাকিতে অনুবিধার পড়া মূর্থতা। মাসিকপত্র ধার-কাটা হইয়া পাঠকের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে সুবিধা এই, পড়িবার সময় ছুরী খুঁজিতে হয় না; অনুবিধা এই, দফতরী নিজের পরিশ্রম বাঁচাইতে গিয়া নির্দয় ভাবে ধার কাটে, পাশে শাদা কাগজ কম রাখে। আরও অনুবিধা, সব অঙ্ক সমান প্রমাণে কাটা হইয়া আসে না। কোন খানার উপরে কিংবা নীচে বেশী কাটা, কোন খানার পাশে বেশী কাটা। ফলে সব অঙ্ক বাঁধিতে গেলে ধার অসমান হয়। ধার কাটিয়া পাঠাইতে হইলে সব অঙ্ক এক

প্রমাণে কাটিয়া পাঠান কর্তব্য। যে কাজ একেবারে শেষ করিতে পারা যায়, সে কাজের অল্প পুনঃ পুনঃ সময় ব্যয় করিতে হইলে দীর্ঘ জীবন আবশ্যক হয়।

ব্যবসায়-হিসাবে বাঙ্গালা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের অধ্যক্ষের একটা ক্রটি আছে। গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর নিমিত্ত তিনি ডাক-টিকিট কিংবা 'রিপ্লাই পোষ্টকার্ড' চাহিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে ইনি ব্যবসায়-বুদ্ধি বুঝেন না, গ্রাহককে তুচ্ছ কারণে দূরে রাখিতে চান। ব্যবসায়-রীতি নিখিলে গ্রাহক ও অল্প সাধারণের জিজ্ঞাসা আকাজকা করিবেন। ইহার আলোকে গ্রাহকের আর এক অনুবিধার উৎপত্তি হইয়াছে। একবার এক মাসিকপত্র যথাসময়ে না পাওয়াতে কার্যধ্যক্ষ মহাশয়কে সে পত্র পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। উত্তর আসিল, “আপনার গ্রাহক নং কত জানালে আমরা সহজে বুঝিতে পারি আপনাকে কাগজ পাঠান হইয়াছে কি না।” আমার গ্রাহক নং কত তাহা আমি কেমনে জানিব? কাগজের মোড়কে নং লেখা থাকে বটে, কিন্তু সেটা কি আমাকে মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইবে? হিসাবের জন্ত অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার খাতায় নম্বর দিতে পারেন, ছাপ মারিতে পারেন, লাল নীল সবুজ কালীর দাগ দিতে পারেন; কিন্তু সে সব আমার জানার প্রয়োজন কি? পঁচিশ খানা কাগজের গ্রাহক হইলে আমার পঁচিশটা নং মুখস্থ করিতে হইবে কি? অধ্যক্ষ মহাশয় আমার নাম

অর্ধে দশ সংখ্যক পত্র। এখানে দশম অঙ্ক ঠিক খটাইতেছেন। ছবি শোভা দীপ্তি, এবং সামাজিক ও শৈল হইয়া চিত্র অর্থে ছবি হইয়াছে।

হইত। কেহ কেহ ছবি শব্দটার অর্থবিহার এই অর্থ মানে। বোধ হয় তদবির লোকের সহিত

ও ধাম—দুইটা নং পাঠাইলেন; নামেও নাম সবক বাহাতে যথুর হয়, তাহা ইউরোপীয় ও সংজ্ঞা বা পদবী পাইলেন। অতএব ব্যবসায়ী বুঝেন। উল্লিখিত অধ্যক্ষ আমার এই তিন মন্তরেই তাঁহার হিসাব দ্রুত প্রকাশিত করে। ফল কথা তাঁহার আলস্তের ও অজ্ঞতার মূল্য গ্রাহকের নিকট প্রার্থনা নিয়ে পোষ্টকার্ডে উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। করা গহিত কাজ। ক্রেতা ও বিক্রেতার এটা কম উন্নতি নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

“এষা”

ককণরসের অভিব্যক্তিতে “এষা”খানি, এক প্রাচীন পদকর্তাদিগের বিরহগাথা ছাড়া বাংলার আর সকল কবিতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। সচরাচর শোকের কবিতায় ‘হা হতোহস্মি’রই বাহুল্য দেখিতে পাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার একটীবারও এরূপ হা হতোহস্মি করিয়া আপনার আর্তনাদের ধ্বনি দিয়া তাঁর কবিকল্পনার দৈন্তকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁর শোক সত্য, তাই সংযত; গভীর কিন্তু একান্ত বস্তুতন্ত্র। এইজন্য যে সকল সত্যকার ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া এ সংসারে লোকের শোক ক্রমে তীব্র ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তাহারই যেন এক একটা অপূর্ণ প্রতিকৃতি আঁকিয়া এই কাব্যকে এমন অদৃষ্টভাবে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শোক বস্তুই কঠোর হউক না কেন, বস্তুতঃ নিতান্ত নির্ধম নহে। নির্ধম হইলে মানুষ তার আঘাত সহিতে পারিত না। গভীর শোকের শেল সর্বদাই যেন একটু

প্রবল অহিংস-সারসিক হইয়া মানুষের হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এই জন্যই তার বেদনা যে কতটা ইহা মানুষ প্রথম বুঝিতেই পারে না। আমাদের শূন্যতা যখন অপরের বৈজ্ঞানিক-রূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই শোকের স্বার্থপর আর্তনাদের মধ্যে কোমল কারুণ্য জাগিয়া উঠে। আর এই ভাবেই অক্ষয়কুমারের ‘এষা’তে এই অপূর্ণ কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ নিপুণতাটুকু টেনিসনের “ইন্ মেমোরিয়ামে” নাই; কালিদাসের “রতি-বিলাপে” নাই; বেহলার গানে নাই; রবীন্দ্রনাথের “স্বরণে” নাই; আছে কেবল, কোথাও কোথাও বৈষ্ণবপদকর্তাদিগের দূর-বিরহ-বর্ণনে। শ্রীকৃষ্ণ যথুরায় গেলে শ্রীকৃষ্ণাবনের কেবল ব্রজগোপ-গোপিনীগণের নহে, কিন্তু পণ্ডপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুণতা-গুলাদিরও যে দীনতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে শ্রীমতীর দূর-বিরহব্যাবহিক মিলাইয়া দিয়া, বৈষ্ণবকবিকুলককণ এই নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। রসের যে একটা আশ্রয় ও উল্লীলন আছে, বৈষ্ণব

রসতত্ত্ববিদগণ ইহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। রসকে তাঁরা কেবল আবাদন করিতেন না, পুথ্যরূপে সাধন করিতেন। এই জন্ত প্রত্যেক রসের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির নিয়ম তাঁহাদের নিকটে প্রত্যক্ষবৎ হইয়াছিল। জগতের আর কোনও কবিসম্প্রদায় এমন করিয়া প্রত্যেক রসের রূপের ও স্বরূপের সাধনা করিয়া এগুলির সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। সুতরাং বৈষ্ণবকবিগণের কাব্যে এ নিপুণতা আছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এই যুগে, এই দেশে জন্মিয়া অক্ষয়-কুমার যে এ নিপুণতাটুকু এমন করিয়া লাভ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

এইজন্য অক্ষয়কুমারের এই কবিতা-গ্রন্থকে কেবল কাব্য বলিলেই তার যথাযথ বর্ণনা হয় না। কারুণ্যরসের দ্বারা এই কবিতা-গুলি গঠিত হইয়াছে বলিয়া, ইহারা রসাত্মক হইয়া প্রকৃত কাব্য লাভ করিয়াছে। কাব্য-হিসাবে এগুলি অতি উৎকৃষ্ট ভাে হইয়াছেই; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বা Psychologyর অভিব্যক্তিরূপেও এই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব অল্প নহে। এই বইখানি মানুষের শোকে, বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগবিধুর পতির মরণের তরে তরে যে বিরহের বাধা জাগিয়া উঠে, তার একখানি পরিষ্কার, প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাস রূপেও অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে।

পতি-পত্নীর সখ্যতা কেবল দুইটা মাত্র প্রাণকে জড়াইয়া গড়িয়া উঠে না। যতক্ষণ এই সখ্য কেবল দ্বিপ্রাণ মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে, ততক্ষণ পতি-পত্নী কেবল রস ও রসের রূপেই পরস্পরকে প্রেম ও প্রেমের প্রকাশ করেন।

ততক্ষণ দাম্পত্য-সখ্যক যতই পত্নীর হৃদয় না কেন, কখনও প্রকৃতপক্ষে উদার হইতে পারে না। পতি যখন পত্নীর মাতৃশ্রুকে ও পত্নী যখন পতির পিতৃশ্রুকে ফুটাইয়া তোলেন, তখনই কেবল অভিনব বাৎসল্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মাধুর্য্যের মোহিনী চিরকল্যাণী হইয়া উঠে। দাম্পত্য-প্রেম তখন জড়াইয়া পড়ে; দ্বিপ্রাণ-প্রেম ত্রিপ্রাণে পূর্ণ হইয়া উঠে; * মাধুর্য্য তখন স্নেহসারে পরিণত হইয়া, বাৎসল্যকেও আপনার আলম্বন ও উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করে। স্নেহসারস্থিত এই দাম্পত্য-প্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তার শোক ও স্নেহ আশ্রয়হীন বাৎসল্যের দৈন্য দেখিয়াই প্রকৃত-পক্ষে আপনার তীব্রতা অনুভব করিতে থাকে। বাৎসল্যের সঙ্গে মাধুর্য্য তখন একই আঘাতে আহত হইয়া, অপূর্ণ ও গভীর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। এই অদ্ভুত ও জটিল কারুণ্যের ছবিটি এখানে যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ফলতঃ কবি এই গ্রন্থে কেবল তাঁর নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁর সমস্ত পরিবার পরি-জনদের মর্ম্মবেদনাটা তাঁর শোকাহত হৃদয়ের ছিন্নতন্তুগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া বেন এই কবিতাগুলিতে বারবার মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এই কবিতা-

গুলি বেন বিখ্যেয় সার্বজনীন দাম্পত্য-বিচ্ছেদের সাধারণ শোক-ছবিগুলিকে একে একে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই ছবিগুলি প্রত্যেক বিরহী অন্তরে যাই যাই প্রবেশ

করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ বিরহবাখ্যাটাকে জাগাইয়া তোলে। এগুলি কবিতা নয়, এক একটি উজ্জ্বল চিত্রের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম, ২য় ও ৬ষ্ঠ; অশৌচ-শীর্ষক দ্বিতীয় স্তবকের ১১শ এবং শোক-শীর্ষক তৃতীয় স্তবকের ৬ষ্ঠ ও ১০ম কবিতাগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়। এগুলি কেবল কবিতা নয়; কেবল এক একটি ভাবের উচ্ছ্বাস নয়; কিন্তু যেন এক একটি উজ্জ্বল তৈল-চিত্র। এক একটি জীবন্ত প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মতন চক্ষের উপরে ভাসিয়া উঠে। এগুলি এক একটি অপূর্ণ কারুণ্য মূর্তি লইয়া আমাদের চিত্তপটে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এ ছবিগুলির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক বর্ণবৈচিত্র্য, প্রত্যেক অণুরমাণু আমাদের অতি পুরাতন-পরিচিত বস্তু। চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এ শব্দ-চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাণে যাহা ভুগিয়াছি তাহাই এখানে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে—পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন বিস্মৃত ভাবগুলি প্রাণের অন্তঃস্থলে নড়িয়া চড়িয়া উঠে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রসচিত্র ছাড়া, আর কোথাও এমন বস্তুতন্ত্র কবিতা বেশি দেখি নাই।

তাহার উপর, কি আশ্চর্য্য নিপুণতা সহকারে কবি এ চিত্রগুলির সমাবেশ করিয়াছেন! কিন্তু এ নিপুণতা কৃত্রিম নহে, কষ্টসাধ্য নহে; নিত্য সহজসিদ্ধ। সাজাবার জন্ত তিনি এগুলিকে এ ভাবে সাজান নাই। শোকার্ন্ত প্রাণের অভিজ্ঞতাগুলি যেমন একটার পর আর একটা ভাসিয়া আসিয়াছিল, সেই ধারাকে অনুসরণ করিয়াই কবির

শোকাহত কল্পনা যেন ভাসিয়া চলিয়াছে, আর যখন বেক্রপ বাহিরের আশ্রয় জুটিয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়াই, মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্ত এই সব চিত্রগুলিই এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতার ও সারল্যে পূর্ণ হইয়া আছে। মৃত্যু-শীর্ষক প্রথম স্তবকের ১ম ও ২য় কবিতাতে বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের একটা অপূর্ণ সংগ্রাম শোকভারে সংযত হইয়া, অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“বাবা,

মা কেন এত জপে কর আজ,
করে এত ঠাকুর প্রণাম?”

এই কয়টি কথাতেই মুমূর্ষুর চরিত্রটী কেমন ফুটিয়াছে! সতী রোগযাতনার মধ্যেও ইষ্টনাম ছাড়েন নাই; কি জানি বিদায়কালে দে নাম ভুলিয়া যান, তারই জন্ত ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরের পায়ে বারবার আপনাকে অর্পণ করিতেছেন, মনে মনে বলিতেছেন—দেখো যেন ভুলি না গো! কেবল তাহাই নহে, এই মৃত্যুর ছায়া আসিয়া কি পবিত্র জীবন ও সাধী-চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাও এই কর-জপা ও প্রণামের ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে। যে যেমন লোক সে তেমন মরে। পরে, অন্তঃ অপূর্ণ প্রসঙ্গে কবি যে সতীচরিত্রের পুত্ৰ-চিত্র আঁকিয়াছেন, এই প্রথম কবিতার এই প্রথম চরণ দু’টিতে তাহারই পূর্বসূরী পাওয়া যায়।

জাহ্নু পাতি’—কোষের-বসনা,

হির-নেজে যুক্তকরে, ধর ধর অঙ্গবরে

তোমা-পানে চাহি’ একমনা।

পড়ে কি না পড়ে খাস, সিক্তহৃৎ তেজশাল

শিখিল-অঞ্চল, শ্রিতাননা।

আবার সন্ধ্যার হেথা আসি’

দীপ দিয়া, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া, প্রণমিয়া

ফুরাত না আমার তক্তিরালি !

প্রহর বহিরা যায় ধ্যান তার না ফুরায়,—

এমনভাবে যিনি দৈনন্দিন জীবন কাটাইয়াছেন, তিনিই কেবল মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও এত কর-জপ ও এত ঠাকুর-প্রণাম করিতে পারেন। তারপর কেবল মুমূর্ষুর চরিত্রের ছবিই যে এই কবিতাটিতে ফুটিয়াছে, তাহা নহে। এখানে বাৎসল্য ও মাধুর্য্যে এই দুই প্রবল রসের মধ্যে একটা নীরব নিম্পন্দ দ্বন্দ্বও বাধিয়াছে। আর এই দ্বন্দ্বে বাৎসল্যই জয়লাভ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। আসন্নমৃত্যুবিরোগ-ভয়বিহ্বল কণ্ঠার মুখ চাহিয়া আসন্নপত্নীবিরোগ-ভীতিবিধুর পতির আপনার মর্ম্মভদ্র শোকের সঙ্গে কি যে সংগ্রাম চলিয়াছে, প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু সন্তানের মুখ চাহিয়া সে শোকভয়ঝঙ্কারে যে প্রাণপণে চাপিয়া রাখিতে হইতেছে, এই ক্ষুদ্র কবিতাটিতে

(১) “বাবা,

মা—কেন এত জপে কর আজ,

করে এত ঠাকুর-প্রণাম ?”

কাছে যা, বাছারে, শুনা পে তাহারে

জনসের মত হরি-নাম।

“বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে

এলোমেলো কি বলে কখন।”

গলা-মুক্তিকার লেপে দাঁত গার,

দাঁও গিয়া মুখে গলাজল।

“চোখ বড় রাজা, গলা ভাঙা-ভাঙা,

দিদিমা ঠাকু’না বড় কান্দে।”

করবে দায়গ, বুঝাবে এখন

বাঁধিত না আর দামা-বাঁধে।

“তবে না আমার—” ইচ্ছা বিধাতার,

পুথনো ত রয়েছে জীবন।

যতক্ষণ বাস— ততক্ষণ আশ,

ভক্তি ভরে ডাক নারায়ণ !

“ডাকি বার বার—” কাদিও না আর,

যাও, তার পদধূলি লও।

বাহা, প্রাণ ভরি’ আলীকৃত করি,—

তারি মত্ত সতীলক্ষ্মী হও !

তাহাও বিশদভাবে ফুটিয়াছে। কাব্য এবং চিত্র এবং সঙ্গীত ও ভাবার্থাদি সর্ববিধ ললিতকলারই উৎকর্ষের একটা অতি প্রধান লক্ষণ এই যে, একগুলি বাহিরে কথায় বা মূরে, পস্তরে বা চিত্রপটে কোনও রসবিশেষের যতটুকু ফুটাইয়া থাকে, কেবল ইঙ্গিতমাত্রে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের মর্ম্মস্থলে, নিগূঢ় আন্তরিক অহু-ভূতিতে তার শতগুণ বেশী জাগাইয়া তোলে। এষার প্রত্যেক কবিতাতে এই লক্ষণটা খুবই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বা একটা ভূতি কথায় একটা বিশাল রস-রাজ্য পাঠকের মানসচক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন। এই মৃত্যুলীর্ণক স্তবকের ২য় কবিতাটিতেও

পত্রবাহী ডাকে,— “চিঠি আছে।”

দেখি পত্র খুলি—

কর্ম্মহল হ’তে আসিয়াছে

শুধু তিক্ত খুলি।

অমরের চিঠি ?— ভাল আছে ?”

মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাসে।

(সংবাদ দেইনি পুত্র কাছে—)

কি ভুল হতাশে !

অক্ষ ভরা কাতর নয়ন

এক ফুটে চার ;

নাহি বাস, কহরে কপাল,

উত্তর আশায়।

হে দেবতা, লই তব নাম

এই মিথ্যা শেষ—

‘ভাল আছে, করেছে প্রণাম,

পড়িতেছে বেশ।’

বন্ধ হ’তে নেমে গেল তার

গভীর নিবাস ;

মান মুখে ফুটিল আবার

ধীর হির হাস।

শাস্ত—ভৃগু, কৃতজ্ঞতা-নীরে

উজ্জল নয়ন ;

শাস্ত—ভৃগু ধীরে পার্থ ফিরে’

করিল শয়ন—

ফুরাল জীবন।

তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃস্নেহের কি
অপূর্ণ ছবিই এখানে কবি কি অসংধারণ
নিপুণতা সহকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।
সন্তানের মঙ্গল কামনা মা’র সংসারবন্ধনের
চরম তন্তুটা হইয়া, এ সংসারে তাঁর প্রাণটাকে
বাঁধিয়া রাখে। এ সংসারে মৃত্যু সর্বজন্মী
হইয়াও কেবল এই অটকতব বাৎসল্যের
নিকটে পরাজয় মানে—কবি এই ক্ষুদ্র কবিতায়
এই বিশ্বজনীন ভাবটাকে ফুটাইয়া দিয়াছেন।

তারপর এই প্রথম স্তবকের ষষ্ঠ কবিতায়

ডুবিয়া—ডুবিয়া জলে জাল না জুড়ায়।

নহে দূর—নহে দূর

ওই মরণের পুর।

আর এক পদক্ষেপে সকলি ফুরায়।

উবলি’ উজ্জলি’ দুলি’ চলে জলরাশ

হৃদয়-আশান বুলে’

* ধরণী পড়িয়া কূলে ;

নিকটে এসেছে নেমে দিবস আকাশ।

নাহি তার, নাহি তরী, জলদ ঘনায় ;

বুরে চেই’ আসল পাশে,

কত কল কল ভাবে,

খাপারে পড়িয়া বুক ভলাইতে চায়।

হৃদয় উদাস আভি, নয়ন উদাস ;

সমুখে গভীর বারি

ডাকে দীর্ঘ বাহ নাড়ি’

মনে পড়ে দূর গৃহ—পড়ে দীর্ঘ বাস।

এই ত জগতে স্থখ, এই ত জীবন !

সহে না নিমেঘ-ভর,

মরণেরি নামান্তর !

দেখি না—দেখি না তবে মরণ কেমর।

নাহি আশা, নাহি তৃষা জীবন ব্যর্থতা ;

মরিয়া জুড়াতে চাই,

মরিতে সাহস নাই !

শিখল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবনা।

অশৌচ-দীর্ঘক বিতীর্ণ স্তবকের একাদশ

সদ্যস্নাত জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুণ্ডিত-মস্তক,

বসি কুশাসনে ;

গলে উত্তরীয় বাস, পড়ে ঘন দীর্ঘ বাস,

পড়ে মস্ত গাঢ়-ঘরের’ স্মৃতি-বচনে।

কনিষ্ঠে লইয়া কোলে জ্যেষ্ঠা কস্তা বসি’,

গলে বসে। *

তবে মস্ত এক মনে, নুহে অশ্রু কণে কণে,

কণে কণে শূন্যপানে দেখিছে চাহিয়া।

গারে গারে আছে বসি’ ক্ষুদ্র কস্তা দু’টি,

মলিন বদনে

কতু ধীরে অশ্রু বরে, কতু চার পরস্পরে,

কতু দু’জনার চক্ষু মুছায় দু’জনে।

চকল অবোধ শিশু হতেছে চকল,

চাষিরিকে চায় ;

সবাই কানিছে কেন ? ভয়ে সে আড়ষ্ট যেন,

বারেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায় !

উজাড়ি সমস্ত গৃহ আনিছেন মাতা,

কিসে স্বর্গ পায় !

কতু কানি উচ্চরোলে, করেন আঁবারে কোলে,

বলেন কানিরা কতু—‘দীর্ঘ রেখে আর !

‘বে জীবা অনলদগ্ধা’ পড়ে পুরোহিত’

কতু ধোঁকাফুল।

তাহার কুণ্ডল আরে দিতেছি যতন করে
তৈলস, তুলা, লব্যা, বস্ত্র, ফল, ফুল।
কি অগের তারে আঁজ ? তেমনি হাসিয়া

সে কি লয়ে দার ?

সমস্ত অগণ দিলে যদি তার দেখা মিলে
সমস্ত জীবন যদি চাহে একবার !
পিতা নাই, মাতা নাই, পতি পুত্র নাই,

অতি অসহায়—

সকল বন্ধন ছিড়ে একাকিনী কোথা ফিরে
অনলে, অনিলে, শূন্যে কোথায়—কোথায় !
কোথায় করিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,

কোথা প্রেতপুরী !

আমি আজ ধরাতে, সমস্তি নয়ন-জলে
মাগিতেছি মুক্তি তার, হুই কর জুড়ি।

এবং তৃতীয় স্তবকের ষষ্ঠ ও দশম কবিতাতে,

অজগ্রে দ্বিজ্ঞানো দাসী—“কোথা যা তোমার ?”

মুখ পানে চেয়ে রহ,

মনে যেন হয়—হয়

“মা—মা—অম্মা(র) মা”—বলে বার বার।

যেন ক্রমে ক্রমে বোঝে,

অঁখি চারিদিকে বোঝে,

ক্রমে ফুলে ওঠে ঠোঁট, অঁখি ছল ছল।

‘নিয়াহে আমার বাড়ী ?’

সায় দেয় মাথা নাড়’

অঁচল ধরিয়া বলে,—চ(ল্)—চ(ল্)—চ(ল্)।

‘কোথা যাবে ? অজকার—’

মানা নাহি মানে আর,

লুটায়—লুটায় ক্রমে কাঁদে অবিরল।

প্রভাত-প্রশান্ত হির :

সমুখে বিহঙ্গ-বীড়

বিহঙ্গী পড়িয়া তরুণে,

যোলা চোখ কাঁদায়ুগা পড়া হুটী তুলে।

অজগ্রে শাবকগুলি,

জিহবা হেলি’ মুখ তুলি’;

মড়ে, চড়ে, চীৎকারে কাতরে—

প্রভাতবায়ুর স্পর্শে, তরুর মর্দরে।

হৃদয় কেমন করে—

শিশুগুলি মনে পড়ে !

আশঙ্কার বরে ছুটে যাই,

চাপিয়া—চাপিয়া বৃকে মুখে চুমো পাই।

মনেছে তাহার দেহ,

মরেনি ত প্রেম-ব্রেহ—

রেখে যেন গেছে সমুদ্র !

সেই ক্ষুদ্র মুখ দুখ আশা তুষা ভয়।

তারি হৃদি হৃদে ধরি’

তারি গৃহকাব্য করি ;

প্রতি কার্যে স্মরি অমুকণ,

নরমে মরমে কাঁদি, মুছি দ্র’নয়ন।

সদা কাছে কাছে রই

কত হাসি, কত কই,

রাবি চোখে চোখে, কোলে কোলে ;

কি করিলে তার কথা, তার শোক ভোলে !

তেমনি পাতিয়া কোল

দিতেছি আদর-দোল—

কত হরে করি গুণ, গুণ !

দিন দিন আমি কত ব্রেহে হনিপুণ !

ভালবাসি বৃকে পুরে,

তবু—তারি দূরে দূরে !

প্রাণ ভরে’ তেমন না হাসে,

বুমারে—বুমারে তারে লোভে আশে-পাশে !

বকাবকি বুঝাবুঝি—

আমি যদি কতু কবি,

এক জোটে মধে ওঠে কাঁদি !

আমি শেষে অপরাধী—জনে জনে মাধি।

যে কারুণ্যহবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও

অতিশয় মর্দস্পর্শী, একই সঙ্গে অতি সুন্দর

ও বহুতর হইরাছে। বহুগুলি আপাততঃ

অতি ছোট বসিয়া মনে হইতে বা পারে।

দৃষ্টান্তগুলি অতি সাধারণ—যেখানে শোক সেইখানেই এগুলি অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপকরণ সামান্য হইলেও এই কবিতাকল্পটার উপজীব্য যে কারুণ্য ইহাদের মধ্যে ফুটিয়াছে তাহা অলোকসামান্য। এই

সামান্য উপকরণ লইয়া কবি যে এমন গভীর, উজ্জল রসমুক্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, ইহাতেই তাঁর কবিকল্পনার অলোকসামান্য কৃশলতার পরিচয় দান করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

“ন চ দৈবাৎ—”

১

দেবেন্দ্রনাথের মাথা ধরিয়াছিল। কথাটা এমন কিছু নয়; রমণীমহলে এবং মারীভাব-স্থলভ বৃকদলে এটা নিতানৈমিত্তিক ঘটনা। তবে, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এটা নূতন,—এ পর্যন্ত তাহাকে মাথা ব্যথা বা অস্ত্র কোন ব্যথা অনুভব করিতে হয় নাই। তাই একটু ব্যস্ত হইয়াই অপরাক্ত সে তাহাদের গৃহ-চিকিৎসক হরেন্দ্র ডাক্তারের শরণাপন্ন হইল।

ডাক্তার সাহেব তখন বাড়িতে ছিলেন না। দেবেন্দ্র নিজের গাড়ীতেই আসিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাঁর আফিস বা consulting rooms-এর দিকে ছুটিল। ডাক্তার তখন কাগজপত্র শুছাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বলিলেন—“খুব এসে পড়েছেন,—আমি এখনই একটা ডাকে শ্রীশ্রীমপুর যাচ্ছিলাম। মাথা ধরেছে? তা ধরবেই তো!—গুরু-ভোজন, মাদক-দেহন, রক্তজীর্ণপান—এ সব ত আপনারা ছাড়বেন না,—কাজেই তার কল ভোগ করতে হয়।—”

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিল, —“গতস্ত শোচনা নাস্তি।” কিন্তু এখন যে আমি মরি। একটা ওষুধ দিন।”

“নেহাতই ছাড়বেন না ত এই নিন—” বলিয়া ডাক্তার একবার ঘড়ির দিকে চাহিলেন; তারপর তাড়াতাড়ি একটা প্রেস্ক্রিপ্শন লিখিয়া দিয়া রোগীর নাম-চালিকার তার নামটা ঢুকিয়া, আফিস বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রও প্রেস্ক্রিপ্শনটা হাতে করিয়া প্রথম যে ডাক্তারখানা পাইল তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িল। সে-টা সেনগুপ্ত কোম্পানীর ডাক্তারখানা। দেবেন্দ্রের নিতান্ত গ্রহের ক্ষয়, তাই সে সময় সেখানে ঢুকিল। কেন, তাই বলিতেছি।

২

সেনগুপ্ত কোম্পানীর হুইজন অংশীদার— এক রতন সেন, অপর ললিত গুপ্তী। হুইজনে সহতীর্থ। উত্তরে কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া সমান অংশে এই ডাক্তারখানা খোলে। স্কুলে এবং কলেজে কতকটা ‘ডানপিটে’ এবং

একটু বেশীমাত্রায় স্মৃতিবাক্য বলিয়া তাহাদের খ্যাতি ছিল। ব্যবসারে বসিয়াও কলেজের সে আনন্দ-প্রবণতা তাহাদের বিলুপ্ত হ্রাস পায় নাই। প্রমাণ—পূর্বরজনীর অভিনয় দর্শন সম্ভোগ।

থিয়েটারওয়ালাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং মিউনিসিপাল-আইন-প্রহসনে যতদিন না যবনিকা পড়িতেছে, ততদিন বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনয়-দর্শকবৃন্দের এ দুর্ভাগ্য ঘুচিবার উপায় নাই। তাই প্রতি রবিবার এবং সোমবার প্রাতঃকালে বিবর্ণমুখ কোঠর-গতাকি, সুদীর্ঘ রজনীর ঘণ্টাসিক্তবেশা থিয়েটার যাত্রীর দলকে, সুদীর্ঘকালের আসানীর স্তায়, অভিনয়-কারী হইতে একে একে বাতির হইয়া আসিতে দেখি। স্বাস্থ্যের বিনিময়ে অভিনয়-সম্ভোগ এ একমাত্র আমাদের মত হতভাগ্য দেশেই সম্ভবপর। কথাটা নেহাৎ ‘ধান ভানিতে শিবের গীত’ নয়; আমার এ গল্পের সহিত ইহা একটু বিশেষ সখ্য আছে বলিয়াই, এটা একটু বেশী করিয়া বলিতে হইল।

সে দিন প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া দুই বন্ধু যখন আসিয়া ডাক্তারখানা খুলিল তখন তাহাদের উভয়েরই অবস্থা সমান,—শরীর অবসন্ন, চক্ষু নিদ্রাহীন। তার উপর, কম্পা-উত্তারও সেদিন দিন বুঝিয়া, অসুস্থ বলিয়া রিপোর্ট করিয়া কাজে আসে নাই। কাজেই সে দিনের দোকানের সব ভার রতনের স্বন্ধে পড়িল; ললিত থাকিতে পারিল না,—ভবানীপুরে ডাক্তারখানাসংক্রান্ত একটা জরুরী কাজে কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহাকে ছুটিতে হইল।

একা রতন মুস্থিলে পড়িল। আকিসের

ছোঁড়া কালীচরণটাকে ডাকিয়া লইয়া কাজের একটু সুসার করিবার চেষ্টা করিল।—কিন্তু সে একটা অজ যব-চূর্ণ; ঔষধ-চূর্ণাদি লইয়া আহার্য্য বিশেষে রূপান্তরিত করিবার উপক্রম করিল; কাজেই বাবা হইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া রতন নিজেই সব কাজ করিতে লাগিল। বেলা যখন চারিটা, তখনও কাজের ভীড়ে তার জলযোগ করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই,—এদিকে ঘুমের ঘোরও তখন তাহাকে বেশ চাপিয়া ধরিতেছিল। তারপরও এক-ঘণ্টা কাটিয়া গেল—রতন শিব নৈয়ে তন্দ্রা-বিষ্টের মত কোন রকমে কাজ করিয়া বাইতে লাগিল। ৫ টার সময় আর সে চক্ষু মেলিতে পারিল না,—রক্তমাংসের শরীরে আর কত সময়?—হাত পা ছড়াইয়া অবসন্নভাবে এক-খানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িবে—এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ তার প্রেস্ক্রিপ্‌সনখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল—“ঔষধটা আমি নিয়েই যাব। একটু না হয় বসছি” বলিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া, কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

রতনের তখনকার মনের ভাব সহজেই অনুমেয়। তবু সে প্রেস্ক্রিপ্‌সনখানা ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া, ল্যাবোরেটরীতে ঢুকিয়া ঘুম-বিজড়িত নেত্রে বহুক্ষেপে তাহার পাঠোদ্ধার করিল। ঔষধের রকমারী বেশী ছিল না—এক সোডিয়াম ছাড়া হাতের কাছেও সবসম্পূর্ণ ছিল। সোডিয়ামটা দেয়ালে আঁটা লম্বা তক্তার উপর, অগ্রান্ত ঔষধের বোতলের সঙ্গে বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো ছিল; তার এক-পাশে সিলিসিয়াম (Silicium) এবং অপর পাশে স্ট্রিকনিনের (Strychnine) বোতল ছিল।

সে রকম ভাবে পাশাপাশি ঔষধ দুটা রাখা অবশ্য ঠিক হয় নাই। তবু স্ট্রীকুনিনের বোতলের গায়ে লাল কালির মোটা অক্ষরে “বিশ্ব” “সাবধান” বলিয়া যে লেখা ছিল তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিয়াছি। রতন দুই-বার হাই তুলিয়া, তিনবার আগন্তু ভাঙ্গিয়া, চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া অনেকক্ষণ পরে সোডিয়ামের বোতলটার আঁকর করিল। তারপর টুলের উপর দাঁড়াইয়া, তাহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিল;—নামাইয়া আনিল কিন্তু স্ট্রীকুনিনের বোতলটা।

দেবেজ্ঞ তখন চেয়ারে বসিয়া মাথার যন্ত্রণায় কিম্বাইতেছিল।

বোতলটা নামাইয়া রতন তাহা হইতে ওজন করিয়া ১৫ গ্রেণ ঔষধ বাহিব করিল, তারপর বাকী ঔষধগুলার সহিত মিশাইয়া একে একে চুরটা পুরিয়া করিল, তারপর একটা রঞ্জীণ ছোট কাগজের বাগ্জে পুরিয়া-গুলি রাখিয়া, ঘুমের ঘোরে ডবল দাম চার্জ করিয়া বলিল।—দেবেজ্ঞ তখন যন্ত্রণায় অস্থির, সে তৎক্ষণাতঃ দাম চুকাইয়া দিয়া ঔষধ লইয়া, গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিল। কোচম্যানকে ইঁাকরা বলিল—“চলে—বাড়ী।”

৩

ঔষধের দামটা বাগ্জে তুলিয়া রতন, বোতল খুলিয়া, আউন্স খানেক কি একটা রঞ্জীণ পানীর প্লাধঃকরণ করিল। ফলে, তাহার হস্তপদের শিথিলভাব কতকটা অপ-সৃত হইল; এবং তাহার শিব-নেত্র কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। সুপ্তোখিতের তার তখন সে একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—টেলিফোনের উপর কতকগুলি

ছিন্ন কাগজ, ইত্যন্তঃ বিকিপ্ত ৮১০ টা শিলি, আর ঢাকা খোলা একটা বোতল—গায়ে মোটা মোটা লাল অক্ষরে—ও কি?—“স্ট্রীক—!” রতন চক্ষু রগড়াইয়া দুইবার তিন-বার অক্ষরগুলি পড়িল, তারপর দেওয়ালে আঁটা তক্তাটার পতি দৃষ্টি ফিরাইল—সোডিয়ামের বোতলটা ত নড়চড় হয়নি, তবে!—

সন্ধ্যা: সর্পদন্তের তায় রতন একলক্ষে টেবিল টপ্কাইয়া ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল। কোথায় তখন রোগী, আর কোথায় সে ঔষধ! বিশাল জনশ্রোত বহুকণ উভয়কেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

রতন কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। একটা গভীর বিপদাশঙ্কায় তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া গেল। ক্ষণপরে কি ভাবিয়া, ফিরিয়া, প্রেস্ক্রিপ্শনখানা একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। নামের স্থানে দেখিল, শুধু—“রায়” লেখা রহিয়াছে। রায়! কোন্ রায়? ডিরেক্টরী খুলিয়া দেখিল—তিন কলাম “রায়”! তবে একটা কথা, প্রেস্ক্রিপ্শনখানা ত হরেন্দ্র ডাক্তারের, তিনি হয় ত তাকে জানিতে পারেন। ডাক্তারখানায় টেলিফোন ছিল—রতন প্রাণপণে হাতল ঘুরাইতে লাগিল।

“কোন্ নম্বর?”

“বলছি মশাই,—বলছি”—বলিতে বলিতে সে ক্রমাগত নম্বর কেতাবের পাতা উল্টাইতে লাগিল। ডাক্তারের ‘ফোন’-নম্বর তার জানা ছিল না। টেলিফোনওয়ালারা ৪৫ বার প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, অনশ্বেবে সে ইঁাকিল—“৫১৬”

“ডাক্তার হরেন্দ্র বোস ? আমি ডাক্তার বোসকে চাই, এখনই—”

অপরিস্ফুট হইতে বামাকণ্ঠে উত্তর হইল—
“আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, মুখটা বুঝি যন্ত্রের খুব কাছে নিয়ে এসেছেন ? একটু সরিয়ে নেন।”

রতন যন্ত্রটা ঠিক করিয়া ধরিল, বলিল—
“ডাক্তার সাহেব বাড়ী আছেন ?”

“তিনি কতক্ষণ হ’ল একটা ‘কল’ পেয়ে মফঃস্বল গেছেন। কি চান আপনি ?—

রতন হতাশভাবে অর্ধক্ষুণ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল।

“আমি তাঁর স্ত্রী। আমার দারা যদি আপনার কিছু—”

“দোহাই আপনার, ‘রায়’ বলে তাঁর কোন রোগীকে আপনি জানেন ?”

“রায় ! রায় !—তাই ত, শুধু ‘রায়’ বলে কি করে বুঝব ? কত রায় আছে !—”

* * *

তখন দেবেন্দ্রের গাড়ী রাস্তার ভিড় ঠেলিয়া বাড়ীর দিকে মোড় ফিরিতেছিল।

৪

রতনের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠিতেছিল। তাঁর কণ্ঠে সে বলিল—“ভাবুন, মনে করে দেখুন—ছোকরা কোন রায়কে আজ আপনার স্বামীর কাছে আসতে দেখেছেন কি না।—আমি তাকে বিষ খাইয়েছি।—”

“বিষ ?—”

“হাঁ—ভুলক্রমে। আমি ডাক্তারখানার লোক, তাকে ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছি। তার ঠিকানা চাই,—তাকে বাঁচাতে চাই,—তাকে—”

“সর্বনাশ ! কি ভয়ানক কথা !—আপনি এখনি ডাক্তার সাহেবের আফিসে যান—তাঁর খাতাপত্র সেখানেই থাকে—সেখানে গেলে হয়ত সন্ধান পেতে পারেন।”

“তাঁর ঘরের চাবি ?—”

“তাই ত, আমি ত চাবি রাখি না। তবে, দরওয়ানের কাছে হয়ত চাবি থাকতে পারে,—আপনি যান,—আমি—”

রতনের আর শেষ কথা শোনা হইল না। তিন লাফে সদর রাস্তায় পড়িয়া, ডাক্তারের আফিসের দিকে সে উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া চলিল—টেলিফোনের রিসিভারটা হকের গায়ে সবেগে চলিতে লাগিল।

ছুটিতে ছুটিতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় যখন রতন ডাক্তার বোসের আফিসে আসিয়া পৌছিল, তখন দারবান লছমন সিং, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়া আপনার ক্ষুদ্র কুঠারীতে বসিয়া, মৃৎপ্রদীপালোকে, হর ক’রয়া করিয়া, ভাবের আভিলাষে গাড়কণ্ঠস্বরে “হো রামা—আ-আ” পড়িতেছিল। সদর দরজার উপর প্রচণ্ড করাঘাতে তাহার ভাবস্রোতে বাধা পড়িল। বিরক্ত হইয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া সে উত্তর করিল—“আতে হেঁ।”

সে পর রতনের কর্ণে প্রবেশ করিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু সে প্রচণ্ড করাঘাতের বিরাম ঘটিল না। লছমন দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল—“আরে শওরাণ, ইয়ে ডাকু না কোন হ্যার ! ঠারিয়ে জী. ঠারিয়ে, —আতে হেঁ। আরে কে’রারি তোড়ো মং—” বলিতে বলিতে দার খুলিয়া, সম্মুখে সম্পূর্ণ অপরিচিত ধূলিধূসরিত শ্বেদবস্ক এক

মৃতি দেখিয়াই তাহার আপাদ মস্তক জলিয়া উঠিল; ভাবটা তখনই তাহাকে দূর করিয়া দেয়। রতন, এহা বুঝিয়াই, তাহাকে ঠেলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বলিল—“হাম ডাক্তার সাহেবকো আকিস ঘরকা ভিতর বানে মাঙ্তা। আভি উস্কা কেৎয়ারি খোল দেও।”

“কাহে ভী ? সাব আভি নেহি হায়।”

“আরে সে ত হামি জানে। একঠো আদমী বিষ খায়। হায়—মরণে বৈঠা হায়। উস্কা ঠিকানা হাম মাঙ্তা।”

“কিস্কে ঠিকানা ?”—লছমণ আগন্তুকের প্রতি সন্ধিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

* * *

এদিকে দেবেন্দ্র তখন ঔষধ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া, আপন শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

* * *

“কিস্কে ঠিকানা, ভী ?”

“আরে, ওই আদমীকো—”

“শুনিয়ে বাবু সাহেব। ডাক্তার সা’ব বাহির গয়ে হেঁ, আপকো ভি হম নেহি পছনতে হেঁ। তব্ উস্কা কামরা হম কায়সে খোল দেঁ ?”

“আরে জাহান্নামকে দাও তোমার কায়সে।

আরে ভাট তোম্ খুন করোগে ? তোমকো ভি হামরা সাথ বে লটক্ বান হোগা।—আরে খোল দেও, খোলো,—খোলো—” রতন উন্নতের জ্ঞান অক্ষিৎস কক্ষের দরজার প্রচণ্ড মুঠাঘাত করিতে লাগিল।—“আরে খোল—দেও, মেমলাহেব ভি কামকো খোল দিয়া।—”

লছমণের মেজাজ ক্রমশই চড়িয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—“উস্কা কোন্ ঠিকানা হায় ? খালি আপকো জবানীমে হাম কভি ইস্ কামরা খোলনে নেহি শকতে হেঁ। বিশ বরষ হিঁরা হাম ন করীমে হায়, বিশ—”

সহসা সে রঙ্গমঞ্চে এক মহিলার আকির্ভাষ হইল। উভয়ের বচসার কথা বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে কতকটা তাঁর কর্ণগোচর হইয়াছিল।—

“সে কি ?—আপনি এখনও ঘর খোলেন নি ?—আপনিই ত আমাকে—”

“এই হতভাগাটী—” রতনের সর্বশরীর তখন ক্রোধে উৎকণ্ঠায়, কাঁপিতেছিল,—“এই—”

“লছমণ, খেনি ডাক্তার সাহেবের ঘর খুলে দাও।”

লছমণ প্রতুপন্নর সে আদেশ অকৃত্য করিতে সাহস করিল না। তবু তালা খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল—“বিশ বরষ হিঁরা হাম—”

* * *

দেবেন্দ্র তখন জুতাজামা ছাড়িয়া, সেনগুপ্ত কোণর সে সুদৃশ্য পুরিয়ার বাক্সটা খুলিয়া তাকা হইতে সম্বন্ধে একটা পুরিয়া বাহির করিয়া গলাধঃকরণ করিবার অভিপ্রায়ে স্তব্ধ হইতে এক মাস জল গড়াইতেছিল।

* * *

তাদাতাড়িতে দরজা খুলিতে গিয়া, লছমণ চাবিটা তালার সহিত বেকায়দার আটকাইয়া ফেলিল; রতন ক্রোধে দ্বিগুণিক্‌জ্ঞানপুষ্ট হইয়া তার গলা চাপিয়া ধরিল, মিসেস বন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এখন সময় হঠাৎ সে রঙ্গমঞ্চে আর এক ব্যক্তির আকির্ভাষ

হইল,—ইনি ডাঃ সেন—ডাক্তার বহুর সহকারী বা আসিষ্ট্যান্ট। মিসেস বহু বলিলেন—“দোহাই ডাঃ সেন। আগে দরজাটা খুলুন, সব বলছি পরে।”

অল্প চেষ্টাতেই তালা খুলিল। রোগীদের লিফটটা টেবিলের উপরই ছিল, রতন তাড়াতাড়ি মাইয়া দেখিল, সব শেষে পেঙ্গিলে লেখা একটা নাম—“দেবেন্দ্র রায়, কলুটোলা—নং।”

* * *

দেবেন্দ্র ততক্ষণে ঔষধের গ্লাসে জল মাপিয়া তাহাতে এক পুরিয়া ঔষধ ঢালিয়াছিল, তারপর আরাম কেদারায় শুইয়া, গ্লাসটা—

৫

মিসেস বহু চীৎকার করিয়া বলিলেন—“বাইরে আমার গাড়ী রয়েছে, আপনারা তজনে শীঘ্র গাড়ীখানা ছুটিয়ে নিয়ে যান। আমিও দেখি টেলিফোনে তাঁকে পাই কি না।”

অনেকক্ষণ অচুসস্থানের পর মিসেস বহু একটা মম্বর পাইলেন—“যত্ননাথ রায়—কলুটোলা।”

“দেবেন্দ্র বাবু এ বাড়ীতে থাকেন?”

“আজ্ঞে হাঁ। আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?”

“আমি ডাক্তার হরেন্দ্র বহুর স্ত্রী। দেবেন্দ্র বাবু বাড়ী আছেন ত? এখনই একবার ডেকে দিন, বিশেষ জরুরী।”

মিনিট খানেক পর অপর দিক হইতে শব্দ হইল—“আপনি দেবেন্দ্র রায়কে বুঝছেন? আহিই দেবেন্দ্র। কি চান আপনি?”

“দোহাই দেবেন্দ্র বাবু, সেটা খাবেন না।”

“আজ্ঞে?—”

“সেটা খাবেন না, খাবেন না—এখনও খাননি ত?”

“কি বলছেন বুঝতে পারছি না। আপনি টেলিফোনের নম্বর উলটাপালটা করে ফেলেন নি ত?”

“সেই পুরিয়াটা—মাথাধরার ঔষধটা খাননি ত এখনো?”

‘কেন, কি হয়েছে? এইমাত্র যে আমি একটা পুরিয়া খেলাম।—ব্যাপার কি?’

কিন্তু দেবেন্দ্র আর তার উত্তর পাইল না। যন্ত্রটাকে কোনমতে হুকে আটকাইয়া ভীত-চকিত নেত্রে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে মিসেস বহু ততক্ষণ সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র ততক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া রিসিভারটা তুলিয়া রাখিল। আপন মনে বলিল—‘কে এ? পাগল না কি?’

দেবেন্দ্রের বাড়ীর দরজায় গাড়ি লাগিতে না লাগিতে রতন এবং ডাক্তার সেন লাফাইয়া পড়িয়া ঝড়ের মত একেবারে বাড়ির মধ্যে গিয়া পড়িলেন। চাকরটা আকস্মিক কোন ঘণ্টনার সম্ভাবনায় ছুটিয়া আসিতেছিল—তাহার উপর উভয়ের হৃগপৎ প্রশ্ন বর্ষিত হইল—“বাবু বেঁচে আছেন ত?”

হল-ঘরে কিসের একটা গোলমাল শুনিয়া দেবেন্দ্র আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই রতন ছুটিয়া বাইরা তার হাত হুঁখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি বেঁচে আছেন!—রাখে কক্ষ মারি কে?”

“কেন,—কি হয়েছে?”

সহসা কক্ষমধ্যস্থ টেবিলের উপর ঔষধের খালি গ্লাসটার উপর ডাক্তার সেনের দৃষ্টি পড়িল। তিনি সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—“আপনি ওষুধ খেয়েছেন?”

“কোন ওষুধ? পুরিয়াটা? হাঁ খেয়েছি, কেন? এইমাত্র খেয়ে শুয়ে ছিলাম।”

“ও ভগবান্!”—বলিয়া রতন মাথায় করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল।—“এত করেও অটিকাতে পারলাম না!” তার পর উন্মত্তের ভায়ে কক্ষমধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বলিতে লাগিল ‘মাষ্টার্ড—পাম্প—জিক সালফেট,—কে কোথায় আছে, শীঘ্র আন, শীঘ্র নিয়ে এস।’

দেবেঙ্গ কতকটা দমিয়া গেল।—

“মাষ্টার্ড—পাম্প—জিক সালফেট!—কেন, কিসের জন্ত?”

রতন পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“না না,—বলুন আপনি সত্যি সেটা খাননি!—বলুন আপনি ভুল বলেছেন।”

“বিলক্ষণ, ভুল হবে কেন?—ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না? দেখাই আপনাদের—”

এমন সময় মিসেস বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

“ওঃ হো! ষ্ট্রীকনিন—আপনাকে আমি ষ্ট্রীকনিন খাইয়েছি।—” বলিয়া রতন আপন মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিল।

আঁ!—ষ্ট্রীক—নিন!—দেবেঙ্গের মুখ-মণ্ডল সহসা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, নিম্নবিশের মধ্যে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে কক্ষতলে পড়িয়া পেল। সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া শয্যাগার শয়ন করাইয়া চোখে মুখে নাকে

জলের কাপটা দিতে লাগিল। ডাক্তার সেন উত্তেজিত হইয়া রতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “আর হাঁ করে ভাবছেন কি?—এখনি ছুটে আপনার ডাক্তারখানায় যান, পাম্প ফাম্প যা পান নিয়ে আসুন,—মুহূর্ত্তের বিলম্বে সব নষ্ট হবে। এখনও উপায় আছে—যান চলে যান।”

রতনের মাথায় তখন রক্ত চন্ চন্ করিতেছিল। নক্ষত্রবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিয়া সে হাঁকিল—‘দশ টাকা—বিশ টাকা—যা চাও বক্সিস দেবো, যত জোর আছে চালাও।’

জনসংঘ ভেদ করিয়া, কত লোককে চাপা দিতে দিতে সামলাইয়া গিয়া, মোটর-খানা ডিম্পেন্সারীতে আসিয়া পৌছিল। একটা ছোকরা অনেকগুলি হইতে রতনের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, সে আসিতেই তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—“ললিত বাবু দিয়েছেন,—বলেছেন—খুব করুণী; এখনই খুলে দেখতে।” “নিপাত যাও।” বলিয়া রতন তাহার হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া পকেটে পুরিল। তার পর তাড়াহাড়ি ঘর খুলিয়া, মাষ্টার্ড পাম্প প্রভৃতি যা পাইল একটা বাগে পুরিয়া তালা বন্ধ করিয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিল। সফারকে বলিল—“ছোটো ছোটো,—এক মুহূর্ত্তের দেরিতে একটা জীবন যাবে, প্রাণপণে চালাও—”

৬

হঠাৎ ললিতের চিঠির কথা রতনের মনে পড়িল। তাড়াহাড়ি থামটা ছিড়িয়া ও'ড়ায় ছত্র পড়িতেই, তার সব উদ্বেজন

খামিয়া গেল। আরও দুইবার ভাল করিয়া
সে পত্রখানা পড়িল। তার পর অঙ্কফুটস্বরে
বলিয়া উঠিল—ষ্টুপিড্—ছোঁড়াটা,—রাস্কল!
কি ভোগানটাই না মিছামিছি ভোগালে!

পত্রখানা এই :—

“ভাই রতন,

সোডিয়মের বোতলটা নেড়ে না—সেটা
ষ্ট্রীকনিনে ভরা। ষ্ট্রীকনিনটারও বোতলের
সবটাতেই সোডিয়ম পোরা আছে। আজ
সকালবেলা তক্তার ঝোঁকে ওলটপালট করে
ফেলেছি, ভেবেছিলাম পরে লেবেল চুটো
বদলে দেবো, আসবার সময় ভুলে এসেছি;
এখানে এসে এই কতক্ষণ মনে হল। এটা
হচ্ছে—‘বিদ্রমস্তজ্ঞাকালে চূর্ণস্থানবিপর্যায়ঃ।’
যাই হোক কাল ঠিক করে নেয়া যাবে
এখন। এটা একটা গভীর মনস্তত্ত্বের কথা,
—পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

দিনটা চালালে কেমন?

তোমার

“ললিত।”

“৩৩ভাগটা!”—বলিয়া রতন শুধু হাতে
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র তখন
শয়ান পড়িয়া গোড়াইতেছিল। ডাক্তার
সেন পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাতের নাড়ি টিপিয়া
ধরিয়া পকেট ঘড়িটার কাঁটার দিকে ঘন ঘন
চাহিতেছিলেন। মিসেস বসু তার নাকে মুখে
জল দিতেছিলেন। রতনকে শুধু হাতে আসিতে

দেখিয়া ডাক্তার সেন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া
উঠিলেন। রতন হস্তপ্রদীপ্ত চক্ষে এবং
দীর্ঘ অপ্রস্তুতের ভাবে বলিল—“আঃ বাঁচা
গেছে। সব ভুল! ভগবান্ বাঁচিয়েছেন!”

“কি রকম?”—উভয়ে সোৎকর্থে যুগপৎ
প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন।

“এই দেখুন, আমার বন্ধু ও সহকারী
ললিত গুপ্তের চিঠি—” বলিয়া সে চিঠিখানা
পড়িয়া সকলকে শুনাইল।

“আঁা?” দেবেন্দ্র এতক্ষণ পরে চক্ষু
মেলিয়া চাহিল। “তবে আমি বিষ খাইনি?”

“আজ্ঞে না।”

“সত্যি?”

“সত্যি বই কি এই চিঠিই তাহার প্রমাণ।”

“তাই ত! তবে আর আমার কোন
ভয়ের কারণ নেই?—আপনারা ঠিক
বলছেন? আমি ত তাই ভাবছিলাম—” বলিয়া
দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিল।

মিসেস বসু ধীরে ধীরে জলের পাত্রটা
ঠেলেয়া রাখিলেন; ডাঃ সেন চশমা মুছিতে
মুছিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িলেন; দাস-
দাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাঘি করিতে
লাগিল। তারপর সকলে একে একে নীরবে
কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

যাই হউক, দেবেন্দ্রের মাথা-ব্যাথাটা
কিন্তু ছাড়িয়া গিয়াছিল। *

* কোন ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

রাডিয়ান্ড কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বাত জীবতত্ত্ববিৎ ডাক্টর ইন যখন তাঁহার অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তখন বলিতে গেলে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের কেবল একটা দিকই বেশী দেখিয়াছিলেন। জীবজগতের বিকাশে, “জীবন-সংগ্রাম” ও “যোগাযোগের উদ্ভর্তন”—এই দুইটীই তিনি প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। সৃষ্টি-পর্যায়ে যে আরও একটা নিয়ম কার্য্য করিতেছে (‘জীবন-সংগ্রাম’ অপেক্ষা প্রবলতর ভাবেই কার্য্য করিতেছে), তাহার দিকে তিনি তেমন মন দেন নাই।

ডাক্টর ইনের এই মতবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু চিন্তারাজ্যে গ্রফলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সকল কুফলও ইহা উৎপন্ন করিয়াছে, যাঁহা ডাক্টর ইন স্বয়ং কল্পনাও হয়ত করেন নাই। তাঁহার শিষ্য ও সত্যর্থেরা আরও একটু অগ্রগত হইয়া বজ্রগন্তীর রবে প্রচার করিলেন যে, সংগ্রামই জীবজগতের একমাত্র নীতি; দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, প্রবল প্রতিযোগিতা, ইহা ছাড়া যেখানে অস্ত্র কোন নিয়ম খাটিতে পারে না। এই কঠোর যুদ্ধে, যে বলী সেট জয়ী হইবে;—চূর্ণল, অযোগ্য এই নিয়মের চক্রে পিষিয়া মরিবে। আধুনিক একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদের কথায়—

“They made modern literature resound with the war-cry of ‘woe to the vanquished’, as if it were the last word of modern biology. They

raised the ‘pitiless’ struggle for personal advantages to the height of a biological principle which man must submit to as well, under the menace of otherwise succumbing in a world based upon mutual extermination”. (Prince Kropotkin's ‘Mutual aid’).

নীত্রেই এই নিষ্ঠুর নীতি রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য—সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সংগ্রাম-নীতির রক্ত-রেখাঙ্কিত ভিত্তির উপরেই ইউরোপীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। রাষ্ট্র বাণ্যারে এই নীতি Imperialism মতি ধারণ করিল। অস্ত্রাশ্রমের মত এই ভীষণ Imperialism তাহার সর্বত্র প্রসারিত বাহুদ্বারা, দৃশ্যলকে, অনদ্রায়কে, ক্ষুদ্রকে টানিয়া তাহার মরণের জালে ফেলিতে লাগিল। সমাজে ইহা মহাজুল্মির বোজ নষ্ট করিয়া প্রতিযোগিতাকে বাড়াইয়া তুলিল। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতাকে ডাকিয়া আনিল। সাহিত্যে ইহা অহঙ্কার, আত্মগরিভা ও বর্ণ-বিদ্বেষের বহির্ আলাইয়া দিল। ইহারই পরোক্ষ ফল স্বরূপ নিহিলিষ্ট ও “প্রগল্ভা রমণীবলের” সৃষ্টি হইল। এই যে আজও চক্ষের সম্মুখে বকান-সমরে নিষ্ঠুর পৈশাচিক লীলা, নরশোণিতের হোলি-উৎসব দেখিতেছি;—এই যে লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ ও কোটী কোটী দরিদ্রের অর্থ উড়িয়া বাইতেছে;—ইহা সেই জীবন-সংগ্রাম-নীতিমূলক সভ্যতারই পরিণাম!

কিন্তু জীবজগতে সৃষ্টির বিকাশে আরও একটা নিয়ম কার্য্য করিতেছে। তাহার প্রভাব এই সংগ্রাম-নীতি অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে;—বরং অনেকস্থলে তাহার কার্য্যই প্রবলতর বোধ হয়। তাহাকে বলা যাইতে পারে—সহানুভূতি ও প্রেম; পরস্পরের সাহায্য ও মৈত্রী। অতি নিম্নতম কীট-পতঙ্গজাতীয় জীব হইতে সভ্যতম মানুষ-সমাজ পর্য্যন্ত সর্বত্রই এই সহানুভূতি ও মৈত্রীর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, মানুষের ধর্ম্ম ও নীতি সকলই এই নিয়মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পূর্বোক্তাংশিত গ্রন্থে * প্রিন্স ক্রপটিন এই তত্ত্বটী অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা পদানতঃ এই সহানুভূতি, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মানুষে মানুষে এই যে বিরোধ এই যে সংগ্রাম তাহা অল্পবিস্তর অপরিভাজ্য হইলেও, এই নীতিকে সে যথা-সম্ভব দূরেই রাখিতে পারিয়াছিল। প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের যে প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহা সে অতি পূর্বকালেই অনুভব করিয়াছিল। তাহার শাস্ত্র নিয়ম তপোবন হইতে উপনিষদের যে উদাত্ত সঙ্গীত উদ্ভিয়াছিল, তাহাতে এই ত্যাগ ও প্রেমের সুরই ধ্বনিত হইয়াছিল। এই খানেই “হিমাচল পাদমূলে, শৈলজা রোহিণীকূলে” যে ‘অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ’ ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী বিবোধিত হইয়াছিল, “আজিও অন্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চিত্রে” তাহা গুনিতেছে। এই

পরম সাম্যের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াই ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

আন্যোপায়োন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।

(গীতা—৬।৩২)

এই মহা মিলন-মন্দিরেই আৰ্য্য ও অনার্য্য, শক ও হুণ, তাতার ও তুর্কী সকলেই সমভাবে আলিঙ্গিত হইয়াছিল। কেবল এইখানেই রাষ্ট্র-নীতিতে অসির পরিবর্তে প্রেমের ব্যবহার প্রথম দেখা গিয়াছিল; সম্রাট অশোক প্রভৃতির পরিবর্তে মৈত্রীর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। এই ভারতীয় সাহিত্যেই স্বার্থ ও বিলাসিতার পরিবর্তে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আনন্দ কীৰ্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের (পরবর্তীকালের জাতিভেদ নয়!) প্রতিষ্ঠা দ্বারা উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অধিকার-সাম্যের চেষ্টা করা হইয়াছিল। আজ—কেবল আজ কেন বহুদিন হইতেই—সে আদর্শ মলিন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই;—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি ফুলিবার জায় কেবল প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই যে “সংগ্রামনীতি”; —“যোগ্যতমের উদ্বর্তনে”র আদর্শ, তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, ইংলণ্ডের আধুনিক প্রধান কবি রাডিয়র্ড কিপলিং—এ কিপলিং Imperialism-এর মুখপাত্র—সর্ব-প্রধান প্রবক্তা বলিলেই হয়। তাহার গান ও কবিতায় তিনি মানুষের এই সংগ্রামবৃত্তি—প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। রাষ্ট্রের জিগীষা ও ক্ষমতা-বিস্তারকেই রমণীয় আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সাম্যের আদর্শ সর্ববিধ সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মূল-

* P. Kropotkin's "Mutual aid—a factor of Evolution."

স্বত্র—তিনি তাহার উত্তরসাধক নহেন; যে আশ্চর্য্যভরিতা ও স্বাভাৱ্য অহঙ্কার জাতিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, পরজাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাহার গানে তাহারই সুর বাজিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আজ যে এই ছাড়াছাড়ি ভাব—কৃষ্ণের প্রতি ঝেঁতের এই যে ঘৃণা—যাহার প্রভাব অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোর্নিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা সর্বত্রই আমরা দেখিতে পাইতেছি,—কিপলিং তাহার পরিপুষ্টির জন্ত কম সাহায্য করেন নাই। তিনিই প্রথমে গাহিয়াছিলেন,—

“The East is East, and West is West
Never the twain shall meet.”

তাঁহার এই বাণী যে মানব-সভ্যতার কত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা হয়ত তিনি জানেন না। তাঁহারই গল্পে কাহিনীতে তিনি ভারত-বর্ষীয়দিগকে এমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহারা পাশ্চাত্যজাতির চক্ষে অত্যন্ত হীন ও বর্বর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ “Plain Tales from the Hills”-এর উল্লেখ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত বিকাশ হয় সাহিত্যে ও কবিতায়। জনসাধারণ বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা কবির বাণীতেই বেশী অনুপ্রাণিত হয়। তাই ডারুইন ও হাক্সলি অপেক্ষা, তাঁহাদের গায়ক কিপলিংই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সেই বিশ্বতপ্রায় সত্যটির—সমাহুভূতির ও প্রেমের—বিশ্ব-মৈত্রীর ও ভালবাসার সেই পুরাতন আদর্শের, বিশেষ বিকাশ হইয়াছে আমাদের রবীন্দ্রনাথে।

ভারতমাতার মন্দিরে হোম-ভগ্নের মধ্যে যে বহ্নিস্থলিঙ্গ লুকায়িত ছিল, তিনিই আজ তাহাকে ভাল করিয়া জালাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণী তাঁহার প্রাণে বাজিয়াছে; তাই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে সংগ্রামের ও বিরোধের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও সংঘর্ষের কোলাহল উঠিতেছে, তাহার দ্বারা আজ্ঞর না হইয়া, সেই সকল সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধ্যেই যে প্রেম ও মৈত্রীর মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ আপনার বাণী সেই সুরেই বাধিয়াছেন। কিপলিংএর গান শুনিয়াছেন; এইবার রবীন্দ্রনাথ কি গাহিতেছেন শুচুন—

“হে মোর চিত্র, পুণাতীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে :
হেথাই দাঁড়ায়ে তবাহ বাড়ায়ে

নমি নর দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।

* * * * *
রণ-ধারা বাহি, জয়গান গাহি উগাদ কলরবে,
ভেদি মরুপথ, গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে

কেহ নহে নত দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।

* * * * *
এসহে আর্ধ্য, এস অনাৰ্য্য হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস এস পুঠান,
এস ব্রাহ্মণ গুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত কর অপনীত

সব অপমান ভাৱ।”

কোন সাহসে কবি এই গান গাহিতেছেন?

“তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি আগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই!
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।”

তাঁহাকে জানিলে সকলকেই জানা হয়—
সকলকেই আপনার বোধ হয়, ভারতীয় সাধনার
পুণ্যকলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানিয়াছেন,
তাই এই গান গাহিতে পারিয়াছেন। এ গান
শুধু ভারতের গান নহে : এ জগতের গান—
বিশ্বমানবের গান।

সংগ্রাম ও সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় হইলেও
সৃষ্টির একমাত্র নিয়ম নহে। মৈত্রী ও প্রেমই
সৃষ্টি-চক্রের উচ্চতর নীতি। প্রবলের জয়,
‘‘যোগ্যতমের উদ্বর্তনে’’ স্বার্থের পরিপূষ্টি হইতে
পারে, কিন্তু দুর্বলের প্রতি প্রেম অসহায়ের
প্রতি প্রীতিতেই মানবের পরিকৃপ্তি হয়। তাই
সংগ্রাম ও সংঘর্ষে—স্বার্থের প্রতিযোগিতাতে
মানব-সমাজ কখন তৃপ্ত হইতে পারে না।
তাহাতে সুরাপানের উত্তেজনা আনিতে পারে,
অস্বাভাবিক উন্মাদনার উৎসাহ জন্মাইতে পারে,
কিন্তু হৃদয়ে শান্তি দিতে পারে না। সুরা-
পানান্তে অবসাদের ভ্রায় কালে এমন একটা
অবসাদ উপস্থিত হয় যে সেই সব আর ভাল
লাগে না। তখন প্রাণ মহত্তর, উন্নততর,
পবিত্রতর কিছু চায়। ইউরোপের আজ প্রায়
সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপ
তাহার সভ্যতার কর্কশ কোলাহল, জীবন-
সংগ্রামের ভীষণ সঙ্গীত, বিলাস-লালসার সেই
তীব্র হলাহল আর সহ্য করিতে পারিতেছে
না। তাহার অন্তরের অন্তরস্থল প্রেম ও
বিশ্বমৈত্রীর, ত্যাগ ও আনন্দের গান শুনিবার
জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ

হইতে রবীন্দ্রনাথ আজ সেই গান লইয়া ইউ-
রোপের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্তই
বৃষ্টি বিধাতা তাঁহাকে স্বাক্ষাতোর গণ্ডী
ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের রাজ্যের মধ্যে আহ্বান
করিয়াছেন; বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্তই
রবীন্দ্রনাথকে দিয়া বীণার তার নূতন সুরে
বাঁধাইয়াছেন। পরিশ্রান্ত ইউরোপ তাঁহার
গান বোধ হয় বৃষ্টিতে পারিয়াছে। যেটা সে
চায়, তাঁহার মধ্যে সেইটাই যেন সে আভাস
পাইয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া
পাশ্চাত্যের এত আনন্দ—রবীন্দ্রনাথের
সেখানে এত সম্বন্ধনা।

বিশ্বরাজ্যে কিছুট নষ্ট হয় না—কিছুরই
অপব্যয় নাই। একদিন যে প্রাচীন ভারতীয়
সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূখে যে
সকল মহাসভা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা
লুপ্ত প্রায়, বিস্মৃত প্রায় হইলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়
নাই। যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত বিধাতা
তাহাকে গড়িয়া উঠিতে দিয়াছিলেন, সে
উদ্দেশ্য সাধন সে করিবেই। মানব-সভ্যতার
তাহার নূতন দান যাহা দিবার আছে, তাহা
না দিয়া তাহার ফিরিবার উপায় নাই।
সেই নূতন দান—সংগ্রামের স্থানে প্রেম,
প্রতিযোগিতার স্থানে সহানুভূতি, ভোগ ও
বিলাসের স্থানে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, জাতি-
সংঘর্ষের স্থানে বিশ্বমৈত্রী। ভারতের রবীন্দ্র-
নাথ আজ পাশ্চাত্য মানব-সভায় সেই গানই
শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতেই
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব, ইহাতেই
ভারতের গৌরব। আর ইহার জন্ত শুধু ভারত-
বাসী কেন সমগ্র মানব-সমাজের তিনি
কৃতজ্ঞতার পাথ।

শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার।

খ্রীষ্টীয়ত্ব

(ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৩৬৪ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্তি)

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত

আধোবন ব্রাহ্ম-সমাজে থাকিয়া, আজ খ্রীষ্টীয়ত্বের আলোচনার প্রবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া, আমার পূর্বকার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম-সাধনকে ব্রাহ্মিবোধে পরিহার করিতেছি, এমন নহে। আমি যদি খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতাম, তাহা হইলে, আমার খৃষ্টীয়ানী বা মুসলমানী বিশ্বাসকে পরিত্যাগ না করিয়া, কোমণ্ড মতেই বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বা বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিতে পারিতাম না। কারণ খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্মের সঙ্গে কেবল বৈষ্ণবধর্মের নহে, কিন্তু জগতের অপরাধ সকল ধর্মেরই একটা আত্যন্তিক বিরোধ আছে। বাইবেলের অতিরিক্ত কোনও সত্য শাস্ত্র আছে, কিংবা খৃষ্টীয়পন্থা ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোনও পন্থা আছে, খৃষ্টীয়ান ধর্ম ইহা স্বীকার করে না। মুসলমান ধর্মও কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদকে জগতের এক মাত্র তত্ত্বগ্রন্থ ও আখেরী নবী বা প্রবক্তা বলিয়া মনে করে, এগুলিকে ছাড়িয়া এখন আর কেহ সত্যলাভ বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যিশুখৃষ্ট ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরবতার বা পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে, খৃষ্টীয়ানের ধর্মহানি হয়। কোরাণ ও হজরতের সিদ্ধান্তের বা সাধনের বাহিরে কোমণ্ড সিদ্ধান্ত বা সাধন অবলম্বন করিলে, মুসলমান কাকের হইয়া বান। খৃষ্টীয়ানের

চক্ষে বাইবেল ও যিশুখৃষ্ট, মুসলমানের চক্ষে কোরাণ শরীফ এবং হজরত মোহম্মদ—এ জগতে সত্যের এক মাত্র প্রামাণ্য ও মুক্তির অনন্ত পন্থা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিতে কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র বা অতিমানুষ অবতার কি পরগণ্য নাই। ব্রাহ্মধর্ম মানবের সহজ জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মগণ কোনও ঐশ্বরিক শাস্ত্র মানেন না, কোনও ঐশ্বরিক অবতারে বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধন সকলই একমাত্র স্বাভূত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর এই স্বাভূত্বই সকলের সমান নয়। এই স্বাভূত্বই সত্যের একমাত্র মাত্র দেখে, একাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। স্বাভূত্বই সত্যের বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্বদাই অসত্য ও ব্রাহ্মি মিশিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে। এট সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই ব্রাহ্মগণ কোনও শাস্ত্র বা গুরুকে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। আর ব্রাহ্মের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, জগতের বাবতীয় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মপ্রবর্তকগণকে সর্বপ্রকারের প্রামাণ্যমর্যাদাচ্যুত করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের সমভাগ, ব্যাপ্তিভাবে বা সমষ্টিভাবে আপনাদের স্বাভিমতকে কখনই অসত্য সত্য ও আখেরী পন্থা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। ব্রাহ্মগণ আজ সত্যের ও সাধনের বড়-টুকু জানিতে পারিয়াছেন, তার বাহিরে বা

উপরে আর সত্য বা সাধন নাই, এ কথা বলিলে ব্রাহ্মসমাজের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান এ কথা স্বীকার করিতে পারেন; তাঁদের ধর্ম শুদ্ধ-স্বাভাবিক-প্রতিষ্ঠিত নহে। এই জন্য খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্বের একটা স্বাভাবিক ও আত্মাসক্ত বিরোধ আছে; ব্রহ্মসিদ্ধান্তের বা ব্রাহ্মসাধনের সঙ্গে সেরূপ কোনও বিরোধ নাই। খৃষ্টীয়ান খৃষ্টীয়সিদ্ধান্ত পরিভ্যাগ না করিয়া, কদাপি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। মুসলমানও স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকে তাহা পারেন, তাহাতে ব্রাহ্মের ধর্মহানি হয় না। ব্রাহ্মসমাজের জনসাধারণে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে আপনাদের দলের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া গোস্বামী মহাশয় আপনি কোনও দিন আপনায় সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত ও সাধনের বিরোধী বা বহির্ভূত মনে করেন নাই।

অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব মনে করিতেছি বলিয়া আমি যে আজ আমার পূর্বকার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ভুল বলিয়া পরিহার করিতেছি, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। সেগুলিকে একটু ছাড়াইরা উঠিতেছি, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনও পুরাতন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, আর অসত্য বলিয়া কোনও সাধন সিদ্ধান্তকে বর্জন করা, এক কথা নহে। একদিন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিলাম না। দেশ-

প্রচলিত কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত গতাভ্যুগতিক বৈষ্ণবধর্মে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। এই কিম্বদন্তি-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-বস্তুই যে তত্ত্ববস্ত্ত, এখনও ইহা বুঝি নাই। হুনিয়ার খৃষ্টীয়ান অসংখ্য, কিন্তু খৃষ্টতত্ত্বের সন্ধান করজনেই বা পাইরাছে? সেইরূপ এদেশে কৃষ্ণপন্থীও অসংখ্য, কিন্তু ইহাদের করজনেই বা তত্ত্ববস্ত্ত যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবস্ত্ত সে কথা বোঝেন বা বুঝিতে চান,—সে জিজ্ঞাসারই উদয় হইরাছে কৈ? জগতের কোথাও গতাভ্যুগতিক পন্থার অনুসরণ করিয়া কেহ তত্ত্ববস্ত্ত লাভ করিতে পারে না। সর্বসংস্কারবর্জিত, মুমুক্ সাধকই কেবল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন। এরূপ সাধক সকল সম্প্রদায়েই—লাঞ্চে না মিলয়ে এক। সুতরাং গতাভ্যুগতিক বৈষ্ণবসমাজে প্রাকৃতজনে যে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বনা করিতেন, এবং আজিও করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকৃত তত্ত্ববস্ত্তরূপে প্রকাশিত হন নাই ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই কিম্বদন্তি-মাত্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসা, আর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে বর্জন করাও, এক কথা নহে। বাহাকে জানি নাই, বাহাকে পরব, করিয়া দেখি নাই, দেখিবার প্রেরণা বা অবসরও পাই নাই, তাহাকে বর্জন করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সুতরাং যে কৃষ্ণতত্ত্বকে বা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে অসত্য ও ভ্রান্ত বলিয়া বর্জন করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহাকেই আবার সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, এমন বলা যারি না। তবে প্রথম যৌবনে যে ব্রহ্মসিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাকে ছাড়াইরা যাইতেছি, এ কথা বলিতে

নই। কিন্তু সে সিদ্ধান্তের কোনও বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি এমনটা মনে করি না। আমি আজ বাহা বিশ্বাস করিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না, ইহা জানি। কিন্তু আর দশজনে কোনও মত বা সিদ্ধান্তকে সত্য মনে করে বলিয়া, তাহাদের কথায় আমি কোনও দিনই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। লোকমতের মুখাপেক্ষী হইয়া, প্রচলিত সংস্কারের আনুগত্য স্বীকার করিবার শক্তি বিধাতা আমার দেন নাই। সে সাধন আমার নাই। এ শক্তি ও এ সাধন থাকিলে, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হইয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সারাজীবন শোধের শেয়ালা মতন ভাসিয়া বেড়াইতাম না। যৌবনাবধি আপনার স্বাভিমতের উপরে নির্ভর করিয়াই নিজের ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার স্বাভিমত যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তখনকার ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের মতামত ও মতিগতির সঙ্গে তার ঐক্য দেখিয়াই, ব্রাহ্মসমাজে আসি; দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্র, শিবনাথ বা অপর কাহারো আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের মুখ চাহিয়া, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী হই নাই। যে স্বানুভূতির স্বাধীনতার খাতিরে পিতার কথা মানি নাই, স্বজনগণের অমুরোধ শুনি নাই, ব্রাহ্মসমাজের নানাদিগ্দেশাদাগত সন্তোষপরিচিত সন্তোষগণের বা আচার্য্যগণের অমুমত বা অমুগত হইয়া চলিবার অস্বুচ্ছ সাধন করিয়া, সে স্বানুভূতিকে বিসর্জন দিতে কোনও দিনই পারি নাই। এই জন্য আমার ব্রাহ্মধর্মটা চিরদিনই আমার নিজস্ব বস্তু

ছিল, আজিও তাহা আমারই নিজের অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়া আছে।

আর ইহাই তো খাঁটি স্বানুভূতির পথ। ব্রাহ্মধর্মে আগম-নিগমের প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্ত্র-শুরুর প্রামাণ্য নাই; আছে কেবল এক আনুপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি। কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরে সত্যের প্রামাণ্য বা সাধনের নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপরেও এই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর শুদ্ধ-শাস্ত্রমাত্র প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠা বালির বাধের মতন, অতি শয় ঢ়রল; সামান্য সন্দেহের বাতায়ুখে উড়িয়া নুড়িয়া যায়। ইহাতেও প্রকৃত ধর্মজীবন গড়িয়া উঠে না। ইহা হইতে এই কোমল শ্রদ্ধাতে লোককে আচারবান্ করিতে পারে মাত্র, কিন্তু সাধক করিতে পারে না। শাস্ত্র যখন তত্ত্বদর্শী শুরুর উপদেশের দ্বারাসাধক হইয়া, স্বানুভূতির দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই তাহা প্রামাণ্য-মর্গাদা লাভ করে। এই জন্যই শাস্ত্র, শুরুর ও স্বানুভূতি—এই তিনের একবাক্যতাকেই সত্যের প্রকৃত প্রামাণ্য বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত এই প্রামাণ্যের উপরে আপনার ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। রাজা রাম-মোহন এ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী আচার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে কেবল স্বানুভূতির উপরেই ব্রাহ্মধর্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত আমিও কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই চলিয়াছিলাম—এখনও সে আশ্রয় পরিত্যাগ করি নাই। স্বাভিমতের হাত ধরিয়া বিগত সত্যের সন্ধানেই প্রথমে ব্রাহ্ম-

সমাজে আসিয়াছিলাম। কোনও দিনই ব্রাহ্ম-সমাজের লোকমতকে সেই সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করি নাই। দেবেন্দ্রনাথের মতকে সংকীর্ণ ও কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও সাক্ষ্যকে কলিত বলিয়া ছাড়িয়া আসিয়া, বিজ্ঞা-বয়স-সাধন-ও-চরিত্র-গত উৎকর্ষাপকর্ষ-নির্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সত্যের মতামতকে সত্যের প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করাতে, আর কারো ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা পাইতে যদি পারে, পারুক; আমার ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা পায় বলিয়া বিশ্বাস করি না। প্রথম যৌবনে স্বাহুভূতির ধাতিরে সনাতন ঐতি ও প্রাচীন স্মৃতির প্রামাণ্যকে বর্জন করিয়াছিলাম। আজ ঐতি ও স্বাহু-ভূতি উভয়কে ভাসাইয়া দিয়া, পঞ্চাশ ষাট-বৎসরের স্মৃতিকে ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। যারা এ পথে, এই ভাবে, ব্রাহ্মধর্মের গুরুত্ব রাখিবার জ্ঞেয় চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেরই হাতে রাম-মোহন-প্রবর্তিত সমাজের অপঘাতমূর্ত্যু ঘটিতেছে। এ মরণকে যে আলিঙ্গন করিতে চাহে না, সেই যে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তকে বর্জন করিতেছে, এরূপ অনুমান সম্ভব নহে। যেখানে জীবন, সেইখানেই গতি ও বৃদ্ধি। যেখানে বিকাশ ও ক্ষুদ্রি। সেইখানেই পরি-বর্তন। স্মৃতির পরিবর্তনকে ভয় করিলে, মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে হয়, অমৃতের পথে চলা যায় না। স্বাভিমতের হাত ধরিয়া, স্বাধীনতার ও সত্যের সন্ধান, প্রথমযৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম। ক্রমে গুরু স্বাহু-ভূতির উপরে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, সঙ্গুগুরু আশ্রয়লাভ করিয়া, তাঁরই কৃপায়, ধীরে ধীরে সার্থক শাস্ত্রেরও আশ্রয়লাভ করিতেছি।

একদিন ভাবিয়াছিলাম কেবল আমি বাহ্যকে সত্য ভাবি, তাহাই বুঝি সত্য। এখন দেখিতেছি, আমার স্বাভিমত সত্যের একদিক্ মাত্র প্রকাশিত করে। আমার স্বাভিমতের সত্যাসত্যের কটিপাথর বিশ্বজনের সন্ধিত অভিজ্ঞতা। এই সন্ধিত অভিজ্ঞতারই নামা-স্তব শাস্ত্র। আর এই শাস্ত্রেরও সত্যাসত্যের কটিপাথর আছে। সে কটিপাথর সাধনা-ভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তত্ত্বদর্শী সঙ্গুগুরু। এই তিনের কেহই স্বতন্ত্র ও স্বপর্যাপ্ত নহেন। শাস্ত্র গুরুবাক্যকে সপ্রমাণ করে। গুরু শাস্ত্র-বাক্যকে সার্থক করেন। আর স্বাভিমত শাস্ত্র ও গুরু উভয়কে সপ্রমাণ করে। গুরু গ্রহণ করিয়া স্বাভিমতকে বর্জন করি নাই, তাহাকে সত্যোতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। শাস্ত্রকে মর্যাদা দিয়া গুরু এবং স্বাহুভূতির প্রামাণ্য-মর্যাদা নষ্ট করি নাই, বরং দৃঢ় করিয়াছি। যে পথ ধরিয়া প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া-ছিলাম, সেই পথেই গুরু পাইয়াছি, শাস্ত্র পাইতেছি। কুলগুরু ছাড়িয়া সঙ্গুগুরু পাইয়াছি। কুশাস্ত্র ছাড়িয়া সুশাস্ত্র পাইয়াছি। মানস-কল্পনাকে ছাড়িয়া বিস্তৃত স্বাহুভূতির সন্ধান পাইতেছি। কিস্বদন্তি প্রতিষ্ঠিত, প্রাণহীন কৃষ্ণোপাসনা ছাড়িয়া, গুরুকৃপায়, অতি অকিঞ্চন এবং অকৃতি হইয়াও, ধীরে ধীরে পরমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্বের আভাস পাইতেছি। জীবন মাত্রেরই গতিশীল। গতিমাত্রেরই পরি-বর্তন আনে। বাঁচিয়া থাকিলেই চলিতে হয়। চলিতে গেলেই বাটার পর বাটা পার হইয়া যাইতে হয়। নিত্যন্ত জড়প্রাপ্তি না হইলে, জীবনের প্রত্যেক পরিবর্তন-স্রোতের বাহিরে পড়িয়া থাকা সম্ভব হয় না। জীবনে কত

পরিবর্তন ঘটাইছে, আরো কত পরিবর্তন ঘটবে। ক্ষম্মে ক্ষম্মে কতভাবে এমনি করিয়া বিবর্তিত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। ইহাতে ভয় করি না। ইহাতে লজ্জার বা দুঃখের কথাও কিছুই নাই। তবে যেন খেই হারাটয়া না বাই, কেবল একটুমাঝে চাই।

আর, এক সময়ে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অমূল্যলন করিতাম, আজ কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধানে কিরিতেছি বলিয়া যে খেই হারাইয়াছি এমনও বলা যায় না। কি করিয়া এই নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের অমূল্যলনে প্রবৃত্ত হই, তাহারও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের মূলমন্ত্রটা ধর্ম্মা বিচার করিলেই, ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে যে এই কৃষ্ণতত্ত্বের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেশ-প্রচলিত পূজা-পদ্ধতিতে বহুবিধ সাকার দেবমূর্তির বহুল প্রতিষ্ঠা দেখিয়াই, আমাদের বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি এই বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা ও স্রষ্টা, মানুষ আপনার হাতে তাঁহার কোনও প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহা কিছুতেই যুক্তিবুদ্ধি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এই সাকারোপাসনার বিরুদ্ধেই নিরাকার ব্রাহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়। তত্ত্ববস্তুর সন্ধানে বাইরা, ব্রাহ্মসাধারণে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন নাই; সাকারোপাসনার প্রতিবাদ করিতে বাইরাই, ইহাকে অবলম্বন করেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের মূল নিরাকার-ধর্ম্ম, প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব নহে। দেশপ্রচলিত উপাসনার দেবমূর্তি সকল ঈশ্বর-মূর্তি নহে, কেবল ইষ্ট-মূর্তি মাত্র, এক রকমটা আধারা তখন বৃষ্টি নাই। এখনও

অনেকে ইহা জানেন না। ঈশ্বর-তত্ত্ব যে নিরাকার তত্ত্ব, ঈশ্বরের স্রষ্টা পাতা যিনি, তাঁর যে কোনও হাত পা নাই, হিন্দু এ কথা চিরদিনই জানেন ও বুঝেন। তিনি কখনও ঈশ্বর-মূর্তি রচনা করেন নাই। যে মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া হিন্দু পূজা অর্চনা করেন, তাহা তাঁর ইষ্ট মূর্তি মাত্র, বিশ্বনিরাকার প্রতিমূর্তি বা প্রতিচ্ছবি নহে। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ানের যিগুমূর্তি বাস্তবিকই ঈশ্বরমূর্তিজ্ঞানে পূজিত হন। এইজন্ত এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানেরা নিজেরা মূর্তিপূজা করিয়াও, অপর সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজাতে ঈশ্বরের অবমাননা হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিষ্ণুমূর্তির উপাসকেরা ঈশ্বরের অবমাননা করেন, হিন্দু শিবোপাসক কদাপি এরূপ বলেন না। তাঁরা নিজেরাই শিবলিঙ্গের পূজা করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যারা অন্ত মূর্তির তজনা করেন, তাঁরা অধর্ম্ম করিতেছেন এমন কখনও ভাবেন না। হিন্দুর উপাসনার বিভিন্ন মূর্তিসকল, ঈশ্বরমূর্তি নহে; ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অন্তরে প্রকাশিত, তাঁর বিশিষ্ট সাধনার সিদ্ধমূর্তি মাত্র। এ সকল ইষ্টমূর্তি মূলে ও আদিতে সাধকবিশেষের সমাধির অবস্থার তাঁহাদের অপরোক্ষ-সুভূতিতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মূর্তি অতিক্রিয়, চিন্ময়, তার বাহিরে কোনও রূপ-রসাদি থাকে না। সাধক এই অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে, সাধনসৌকর্য্যার্থে, আপনার মানসপটে ধরিয়া রাখিবার জন্ত, প্রথমে তার অনুরূপ শব্দাত্মিক ধ্যানমূর্তি রচনা করেন; এবং ক্রমে তাহাকে আপনার সর্বোচ্চের দ্বারা সম্বোধন করিবার জন্ত, সাকার দেবমূর্তিরূপে গড়িয়া তোলেন। ইহাই আমাদের দেশের

প্রচলিত মূর্তিপূজার ভিতরকার কথা। ইহারই অর্থ—“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।” এই “রূপ” একজন আর একজনের অল্প গড়িয়া দিতে পারে না। সাধকেরা নিজে আপনাদের সাধনসৌকর্য্যার্থে আপন আপন ইষ্টদেবতার এ সকল মানস-মূর্তি রচনা করেন। এ সকল ঈশ্বরমূর্তি নহে—ইষ্টমূর্তি মাত্র। কিন্তু গতানুগতিক কৰ্ম্মকাণ্ডের অহুসরণ করিয়া যারা এই সকল মূর্তির উপাসনা করেন, তাঁরা এ তত্ত্ব জানেন না। আমরাও ইহা জানিতাম না। এই জন্তই এই সকল বাহ্য-পূজার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, এই সাকারোপাসনার প্রতিকূলে, নিরাকারোপাসনা প্রবর্তিত করি। অর্থাৎ দেশপ্রচলিত সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে আমরা একটা নিরাকার-বাদেরই প্রতিষ্ঠা করি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কোনও নিরাকারত্বের প্রতিষ্ঠা করি নাই।

ফলতঃ শব্দরবেদান্ত-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতত্ত্বই একমাত্র সত্য নিরাকার তত্ত্ব। সে তত্ত্ব নিষ্কণ ও নির্বিশেষ। কেবলমাত্র ব্রহ্মা-দ্বৈকত্বানুভূতির দ্বারা সে নিরাকার তত্ত্বকে ধরিতে পারা যায়। কোষপঞ্চক যতক্ষণ না ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এই জন্ত ব্রহ্মের স্বরূপোপাসনাকেই শব্দরসিকান্ত একমাত্র সত্য উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল ইন্দ্রিয়-চেষ্ঠা একান্ত নিরস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ উপাসনা সম্ভব হয় না। সমাধির অবস্থা লাভ করিলে পরেই কেবল সাধক স্বরূপোপাসনার অধিকারী হন। এ অবস্থা অতি দুর্লভ। বতদিন না এ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ততদিন জীব মিয় অধিকারের সাধন

তরুণ করিবে। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে শব্দরসিকান্ত প্রতীকোপাসনার এবং মধ্যম অধিকারীর অল্প সম্প্রদায়সমূহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাস-জনিত উপাসনা বলে। ‘অন্ততঃ দৃষ্ট পরজীব-ভাসঃ—’কে অধ্যাস বলে। অল্প দেশে ও অল্পকালে যে বস্তু-বিশেষ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, যে দেশে ও যে সময়ে সেই বস্তু উপস্থিত নাই, সেখানে ও তৎকালে অল্প বস্তুতে তার আরোপ করার নাম অধ্যাস। একদিন বনে সর্প দেখা গিয়াছিল। গৃহপ্রাক্বেণে যে রজ্জু পড়িয়া আছে, তাহাতে সেই সর্পের জ্ঞান আরোপ করিয়া, এই রজ্জুকে সেই সর্প মনে করার নাম অধ্যাস। অন্তরে কোনও দিন ইষ্টদেবতার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সেই পূর্বদৃষ্ট বস্তুকে যে কাষ্ঠলোষ্ট্রে তাহা বস্তুতঃ নাই, তাহাতে আরোপ করাই এই প্রতীকোপাসনার লক্ষণ। শব্দরবেদান্ত মতে দেশ-প্রচলিত মূর্তিপূজা এই প্রতীকোপাসনারই অন্তর্গত। নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে ইহাই বিহিত। মধ্যম অধিকারীর পক্ষে বেদান্ত সম্প্রদায়সমূহের বিধান দ্বিগত। দুই বস্তুর মধ্যে কোনও সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া, ক্ষুদ্রতর ও আনন্দাধীন বস্তুর সাহায্যে বৃহত্তর ও অনান্দত্ব বস্তুর যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকেই সম্পদজ্ঞান কহে। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতন ধোঁসা—এই ভৌগোলিক জ্ঞানকে সম্পদজ্ঞান বলা যাইতে পারে। যেমন পৃথিবীর ও কমলালেবুর মধ্যে একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুরও একটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। দুই প্রকাশ—আর কিছুই দ্বারা কল্পিত

দেখা যায় না। আর সূর্য্য জগৎপ্রকাশক—
আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই জগৎকে
প্রকাশিত করেন, জগৎকে প্রকাশিত করিতে
যাইয়াই আপনিও প্রকাশিত হইয়েন। স্বপ্রকাশক
ও জগৎপ্রকাশকত্ব স্বর্গের ধর্ম্ম। ইহা ব্রহ্মেরও
ধর্ম্ম। চৈতন্যরূপ পরব্রহ্মও স্বপ্রকাশ ও
জগৎপ্রকাশক। সুতরাং স্বর্গের সঙ্গে ব্রহ্মের
এই সামান্যত্বকে আশ্রয় করিয়া, প্রত্যক্ষ সূর্য্য
গ্রহের ধ্যানযোগে ব্রহ্মোপাসনা করা সম্পদ-
পাসনা। মধ্যম অধিকারীর জন্ত বেদান্ত এই
জাতীয় উপাসনারই বিধান করিয়াছেন।

ব্রহ্মসমাজের উপাসনাকে স্বরূপ-উপাসনা
বলা যায় না। স্বরূপ-উপাসনায় সকল ইন্দ্রিয়-
চেষ্টা একান্তভাবে নিরস্ত হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম-
সমাজের উপাসনায় তাহা হয় না। বাক্য এই
উপাসনার বাহন। উপমান ও অমুমান এই
উপাসনার প্রাণ। উপমান ও অমুমান সম্পদ-
জ্ঞানেরই আশ্রয়, স্বরূপজ্ঞানের ভিত্তি নহে।
ব্রহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনাকে সম্পদ-
পাসনাই বলা যায়। এই উপাসনায় ঈষ্ট
দেবতার মূর্ত্ত্যু মূর্ত্তি রচিত হয় না বটে। কিন্তু
বাক্যময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু
প্রকৃত নিরাকারত্ব অবাঞ্ছন্যগোচর। সে
তত্ত্বকে বাক্যময়ের গোচরীভূত করিতে গেলেই
আর তার নিরাকারত্ব থাকে না। ব্রহ্ম-
সমাজের বাক্যময়ী উপাসনা ও নিরাকার ব্রহ্মকে
মানসধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকে। সুতরাং
ইহাতে অধ্যাসও আছে। এ-ও সত্য-উপাসনা
নহে। প্রচলিত তথাকথিত সাকারোপাসনার
আশ্রয় ঈষ্টদেবতার চক্ষুগ্রাহ্যরূপ; প্রচলিত
তথাকথিত নিরাকারোপাসনার উপজীব্য রূপ
নহে, কিন্তু রূপক। রূপ আর রূপকে ধ্রুবে

পার্থক্য, হিন্দুসমাজের মূর্ত্তিপূজাতে আর
ব্রহ্মসমাজের মাথুলী নিরাকার উপাসনায় সেই
পার্থক্য মাত্র রহিয়াছে। মূলে হ'এর মধ্যেই
অধ্যাস অর্থাৎ বাহ্য উপস্থিত নাই, তার
আরোপ আছে।

প্রকৃত নিরাকারত্ব আর নিষ্ঠূর্ণত্ব
একই কথা। বাহ্য নিরাকার, তাহাই নিষ্ঠূর্ণ।
তাহাই নির্বিশেষ। ভেদপ্রতিষ্ঠা করাই,
আকারের মুখ্য ধর্ম্ম। আকাশবস্তুর নিরা-
কার। কিন্তু যখনই এই আকাশ ভিন্ন ভিন্ন
আকারে আবদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ
করে, তখনই তাহা ঘটাকাশ, পটাকাশরূপে
সাকার হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্রহ্মবস্তুর যখনই
জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন,
তখনই বিশিষ্ট হইয়া, নিরাকারধর্ম্ম হারাইয়া
ফেলেন। ব্রহ্ম যদি আমি হইতে একান্ত ভিন্ন হন,
তাহা হইলে, আমার আশ্রয়ের সীমাই তাহাকে
সীমাবদ্ধ ও সাকার করিয়া তোলে। কোনও
বিশিষ্ট গুণ আরোপ করিলেও অপর বিরুদ্ধগুণ
হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া, সেই সকল
বিরুদ্ধগুণের দ্বারাই তিনি পরিচ্ছিন্ন ও সাকার
হইয়া পড়েন। এই জন্যই, এ সকল অসঙ্গতি
নিরাকৃত করিতে যাইয়া, বেদান্ত ব্রহ্মবস্তুর
নিরাকারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই
তাহার নিষ্ঠূর্ণত্ব, নির্বিশেষত্ব এবং অবৈত-
ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শঙ্করসিদ্ধান্তের
এই অবৈতত্বই একমাত্র সাক্ষা নিরাকার-
ত্ব। অপর বাবতীর নিরাকারবাদ আছে,
তাহা সত্য নহে, সত্যভাস মাত্র।

ব্রহ্মসমাজের নিরাকারবাদও তাহাই।
বিশুদ্ধ নিরাকারত্বের অমূল্যলন করিলে
ব্রহ্মসাধকে পরিণামে শঙ্করবেদান্তের শুদ্ধা-

বৈত সিদ্ধান্তে বাইয়া পৌছিতে হয়। আর আপনার সম্প্রদায়ের এই নিরাকারতত্ত্বের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, ভক্তিপন্থার অনুসরণ করিলে, তাঁহাকে পরিণামে বৈষ্ণববেদান্তের অচিন্ত্য ভেদান্তেদ সিদ্ধান্তে বাইয়াসকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া ব্রাহ্ম সাধকের সম্মুখে আর তৃতীয় গতি নাই। ব্রাহ্মসমাজের মূল সিদ্ধান্ত ও সাধনার সঙ্গে একদিকে শঙ্করসিদ্ধান্তের অল্প দিকে গোড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের উভয়েরই কোনও ঐকান্তিক বিরোধ বা প্রকৃত অসঙ্গতি নাই। জ্ঞানপ্রধান ব্রাহ্ম সাধককে শঙ্কর-বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। ভাবপ্রধান ও ভক্তিপ্রেমণ ব্রাহ্ম সাধককে সেটুকুপ বৈষ্ণব-বেদান্তের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। আযোবন যে ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের ৭ ব্রাহ্মসাধনের অনুসরণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনার কোনও ঐকান্তিক বিরোধ আছে বলিয়া বুঝি না। বরং ভাবের দ্বারে চুরি না করিয়া, লোকমতের সুপাপেক্ষী না হইয়া, যে ব্রাহ্মই আপনার সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাধন করিবেন, তাঁহাকেই ঠিক জনমে না হউক আর জনমে, কৃষ্ণতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইয়া, কৃষ্ণভজনা করিতেই হইবে, এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইতেছে। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে যতটুকু ঝাঁট সত্য আছে, তার সঙ্গে শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই ও থাকিতেই পারে না।

কলতঃ এ জগতে সত্যে সত্যে কোথাও কোনও বিরোধ নাই। কখনও কোনও বিরোধ সম্ভবে না। বাহ্য আছে তাহাই সত্য, এ সত্যের হই'পথ, এক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, আর এক অতী-

ন্দ্রিয় অপরোক্ষাহুত্ব। এ ছাড়া সত্যলভের আর তৃতীয় পন্থা নাই। ব্যবহারিক সত্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের, আর পারমার্থিক সত্য আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দুই জাতীয় সত্যই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের এই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়ীনে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু কদাপি অসত্য হইতে পারে না। অসত্যটা সর্বত্রই কল্পনার সৃষ্টি; যেখানে যে বস্তু বাঁ'বে ভাব নাই, কেবল কল্পনাই সেখানে তাহার আরোপ করিয়া অসত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই কল্পনা আমাদের মনোবৃত্তিকে নিয়তই আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই জন্তই আমরা, বাহ্য দেখি, সর্বদাই তার চাইতে চেঁচ বেণী ভাবিয়া শই। যতটুকু সত্য বা বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বা আত্মসাক্ষাৎ-কারের বিষয়ীভূত হয়; আমরা সর্বদাই আমাদের এই কল্পনাবলে তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া আপন আপন মনগড়া সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। আর আমাদের এইরূপ মনগড়া সিদ্ধান্ত সকলই হ্রনিয়ায় যত গোল বাধাইয়া তোলে।

আমাদের প্রাচীন শ্রাস্ত্রের “অন্ধের হস্তি-দর্শন ভায়”—এই কথাটাকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হাতী জন্তটা কেমন, এই কথাটা জানিবার জন্ত অন্ধের হাতীর নিকট বাইয়া প্রত্যেকে তার একটা একটা অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া আসিল। একজন হাতীর কান ধরিয়া আসিল, আর একজন তার গুঁড়ে হাত বুলাইয়া আসিল, আর একজন তার পায়ে ধরিয়া আসিল। হাতীর

কানটা যে কুলার মতন, শুঁড়টা যে অঙ্গুর সাপের মতন, পা'টা যে খামের মতন, ইহা মিথ্যা নয়। কিন্তু কান, শুঁড়, পা তো আর গোটা হাতী নয়। অঙ্কেরা সে গোটা হাতীকে তো জানিতেও পারে নাই। তারা তার কেবল একটা একটা অঙ্গের জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল; অথচ আপন আপন কল্পনা-বলে সেই অঙ্কেই অঙ্গী ভাবিয়া লইয়া পরস্পরের সঙ্গে বাক্বিতত্ত্বা বাধাইয়া দিল। যতটুকু ইহারা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু যতটুকু কল্পনা করিয়াছিল, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। ইহারা যদি কেবল আপন আপন প্রত্যক্ষ সত্যটুকুরই প্রতিষ্ঠা করিতে যাইত, কোনও গোলই বাধিত না। হাতীর কানটা কুলার মতন বলিয়া তার শুঁড়টা যে অঙ্গুরের মতন বা তার পা'টা যে খামের মতন নয় বা হটতে পারে না, —এমন কোনও কথা নাই। ইহারা যতটুকু নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তাদের কল্পিত মনগড়া হাতীগুলোকে লইয়া। আপন আপন কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াই ইহারা পরস্পরের সঙ্গে এই মারামারিটা বাধাইয়াছিল।

মানুষ-ধর্মমত ও ধর্মসাধন লইয়া এ জগতে যে মারামারি কাটাকাটি করে, তাহাও এই অঙ্কের হস্তিদর্শন ভ্রাতারই মতন। ধর্মবস্তুরিট, ভূমি অনন্ত। এ বস্তু সার্বভৌমিক, বহুস্বামী। বহুভাগ্যবলে মানুষ এই বিরটি ভ্রাতার কণামাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ কণামাত্র ধর্মকেই সে সম্পূর্ণ ধর্ম বলিয়া অপর সকলের উপরে জাহির করিতে যায়।

ইহাতেই যত গোল বাধে। আর বস্তু-বিশেষের অংশ বা অঙ্গ মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অংশ বা অঙ্কেই সম্পূর্ণ অঙ্গী বা অঙ্গিরূপে গ্রহণ করা মানস-কল্পনারই ধর্ম। ধর্মজগতে এই সকল মনগড়া সিদ্ধান্ত ও মানস-কল্পনা লইয়াই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে এত বাক্বিতত্ত্বা ও মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে। ফলতঃ কি বাবহারিক জগতে কি পারমার্থিক রাজ্যে কোথাও প্রকৃত সত্যে সত্যে কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই—থাকিতেই পারে না।

অতএব আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্তে যতটুকু খাঁটি সত্য আছে, অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তের যেটুকু ব্রাহ্মগণের নিজের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতা হইতে জন্মিয়াছে,—বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের খাঁটি সত্যের ও বৈষ্ণব-সাধনার প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার ভেদ পাকা সম্ভব, বিরোধ হওয়া অসাধ্য। কিন্তু ভেদ আর বিরোধ যে একই কথা নয়, এ কথাটাও আমরা সকল সময় মনে করিয়া রাখি না।

ব্রাহ্মসমাজের মতের কতকগুলি ভাবাত্মক আর কতকগুলি অভাবাত্মক। একতত্ত্ব ও ধর্মসাধনের কতকগুলি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত লক্ষণ আছে; আর কতকগুলি লক্ষণ, অপরাপর ধর্মের সিদ্ধান্তে ও সাধনে যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নাই ও থাকিতে পারে না;—ব্রাহ্মগণ ইহাই বিশ্বাস করেন। পূর্বোক্ত লক্ষণগুলিকে ভাবাত্মক বা “হী”-বাচক বলা যাইতে পারে; শেযোক্ত লক্ষণগুলি অভাবাত্মক বা “না”-বাচক। ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের “হী”-বাচক কথাগুলি এই :—

(১) ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বর বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্ম ; তিনি অমৃতনিকৈতন, শাস্ত্রস্বভাব, মঙ্গলসংকল্প, নিষ্কাম, অপাপবিদ্ধ, এবং একমেবাদ্বিতীয়।

(২) এই ঈশ্বর জীবের অন্তরে বাস করেন ; তিনি অন্তর্যামী পুরুষ এবং জীবের নিত্য-উপাশ্রয়।

(৩) মৃত্যুতে মানুষের দেহই নষ্ট হয়, কিন্তু তার আত্মবস্তু অবিনশ্বর ও অমর।

(৪) এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব উভয় তত্ত্বই মানবের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অর্থাৎ তাহার সহজজ্ঞান বা ইনটুইশনের দ্বারাই মানুষ এ সকল তত্ত্বকে প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারে।

এই গুলিই ব্রাহ্মসমাজের ভাবাত্মক বা হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মসাধক ও আচার্য্যাগণ এগুলিকে আপনাদের আন্তরিক অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিম্বা যাহারা সাধনবলে পূর্ব পূর্বকালে এ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যকে আপন আপন বুদ্ধি-বিচার সম্মত দেখিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল মত জগতের উন্নত ধর্মমাঝেই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব, ইহুদী, প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ই এ সকল মতে বিশ্বাস করেন। এমন কি এগুলিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট মতও বলা যায় না। এগুলির দ্বারা অপরাপর ধর্মসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের “হাঁ-বাচক বা ভাবাত্মক কোনও বিশিষ্ট মত নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাস খৃষ্টীয়ানের বিশেষত্ব নহে ; যিশুখৃষ্টে বিশ্বাসই খৃষ্টীয়ানকে বিশিষ্ট করিয়াছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস মুসলমানেরও

বিশেষত্ব নহে ; হজরত মোহাম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রবক্তারূপে গ্রহণ করিয়াই, মুসলমান আপনার ধর্মবিশ্বাসকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ কোনও “হাঁ-বাচক বা ভাবাত্মক সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া, জগতের ধর্মমাঝে কোনও প্রকারের বিশিষ্টতা লাভ করেন নাই। অভাবাত্মক প্রত্যয়ে, “না”-বাচক সিদ্ধান্তেই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মসমাজের “না”-বাচক মত ও বিশ্বাসগুলি এই :—

(১) ঈশ্বরের কোনও অবতার নাই।

(২) কোনও ধর্মশাস্ত্র ভ্রান্তিশূন্য কিম্বা সত্যের একমাত্র ও অনুল্লভ্যবনীয় প্রামাণ্য নহে।

(৩) কোনও ধর্মোপদেষ্টা বা গুরু ঈশ্বরের শক্তি ও স্বভাবসম্পন্ন এবং ভ্রান্তিশূন্য হইতে পারেন না।

(৪) দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্তি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হইতে পারে না।

(৫) কোনও মানুষকে বা অপর কোন সৃষ্টপদার্থকে, কিম্বা মানবহস্তরচিত কোনও পট বা মূর্তি প্রভৃতিকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভজন করা কর্তব্য নহে।

এই অভাবাত্মক মতগুলিতেই, বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব। এইগুলির দ্বারাই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে ব্রাহ্মসম্প্রদায় বিশিষ্ট হইয়াছেন। আর অভাবাত্মক সিদ্ধান্ত মাঝেই দ্বিবিধ ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিতে পারে ; কতকগুলি “না”-বাচক সিদ্ধান্ত মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই প্রকাশিত হয়। মানবজ্ঞানের এই মূল প্রকৃতিকে ইংরেজিতে necessity of thought বলে। এই neces-

'sity of thought হইতে যে সকল অভাব-
অক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা একরূপ স্বতঃ-
সিদ্ধ। যেমন যাহা সান্ত তাহা অনন্ত হইতেই
পারে না। যাহা দেশে আবদ্ধ তার দৈর্ঘ্য-
প্রস্থাদিধর্ম বা extension থাকিবেই থাকিবে।
যাহা কালেতে প্রকাশিত তার পৌরোপা
বা succession না থাকিয়াই পারে না। এই
“না”-বাচক সিদ্ধান্তগুলি মানব-জ্ঞানের মূল
প্রকৃতির বা necessity of thought-
এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ
তত্ত্ব হইলেও, এ সকলের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ-
বৎই প্রবল। এ ছাড়া আর যত কিছু
অভাবাত্মক বা “না”-বাচক সিদ্ধান্তের
প্রতিষ্ঠা হয় তৎসমুদায়ই অনুমানের উপরে
গড়িয়া উঠে। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা হইতে
যুক্তিপরিম্পন্ন আশ্রয় করিয়া যাহা প্রত্যক্ষ
হয় নাই, তার সম্বন্ধে কোনও সত্য মিথ্যা
ধারণা করিয়া লওয়াই অনুমানের কার্য
অনুমান সর্বদাই প্রত্যক্ষের বাহিরে চলিয়া
যায়। অক্ষের হস্তদর্শন জার এই অনুমানের

প্রভাবই প্রচার করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের
অভাবাত্মক বা “না”-বাচক মতামতগুলি হয়
necessity of thoughtএর উপরে
প্রতিষ্ঠিত, না হয় কেবল অনুমানের উপরে
প্রতিষ্ঠিত। Necessity of thoughtএর
উপরে প্রতিষ্ঠিত, অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তও প্রত্যক্ষ-
বৎই প্রবল হয়। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত স্বতঃ-
সিদ্ধেরই মতন। এগুলিকে বর্জন করা
অসাধ্য।

ব্রাহ্মসমাজের “না”-বাচক সিদ্ধান্তের মধ্যে
কোনগুলি necessity of thought এর
উপরে প্রতিষ্ঠিত আর কোনগুলি কেবল
অনুমান-প্রতিষ্ঠিত; ইহার বিচার করিলেই,
শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রাহ্মসিদ্ধান্তের বিরোধী কি না
আর বিরোধী হইলে, কোন্ স্থানে, কি বিষয়ে
বাস্তবিক এ বিরোধ বাধে, এ সকল কথা
পরিস্কার হইয়া যাইবে।

বারান্তরে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার
বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(৭)

গভীর স্বপ্নে জীবনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

এইখানে জীন ভ্যালজীনের সংক্ষিপ্ত পরি-
চয় দিব। জীন ব্রাই গ্রামের এক দরিদ্র
কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে;
বাঁল্যে লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই,
বড় হইয়া সে কাঠুরিয়ার ব্যবসা অবলম্বন
করে। ব্রহ্মপ্রবণচিত্ত ব্যক্তির জার সে

কতকটা ভাবুক গোছের ছিল। তবে
তাঁহার মুখভাবে অসাধারণ কিছু প্রকাশ
পাইত না। শৈশবেই তাঁহার পিতামাতার
মৃত্যু হয়—মাতা চিকিৎসাক্ষিপ্রাণে স্ত্রীকাগারে
মারা যান, পিতা কাঠুরিয়া ছিলেন—যুগ
হইতে পতনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সংসারে
থাকিবার মধ্যে তাঁর একমাত্র ভগ্নী ছিল। স্বামীর
জীবদ্দশা পর্যন্ত সে তাঁহাকে ‘মাতৃ’ করে;

স্বামীর মৃত্যুর পর কিছু লাভটি পুত্র-কন্যা লইয়া সে ভ্রাতার স্বন্ধে আসিয়া পড়িল। ছেলে-মেয়েরা সবাই ছোট বড়টি আঁট বৎসরের, সর্ব-কনিষ্ঠটি একবৎসরের। হৃৎপোষা শিশু। জীনের বয়স তখন পঁচিশ। কর্তব্যের বাতিরে সে নিরুশ্রম্য বিধবা ভগ্নীর ভার গ্রহণ করিল। এপর্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই,—যৌবনকাল তাহার কঠোর পরিশ্রমে অতি কষ্টে কাটিতে-ছিল, তাহার মধ্যে প্রেমের অবকাশ ছিল না, প্রণয়িনীও তাহার কেহ ছিল না।

সমস্তদিন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর অবসর-ভাষে গৃহে ফিরিয়া কাহারও সহিত কথা না কহিয়া সে সকলের সহিত একত্রে আহারে বসিত। ভগ্নী প্রায়ই তাহার খাবারের উৎকৃষ্ট-তম অংশ আপন পুত্রকন্যাদের বণ্টন করিয়া দিতেন,—ঝোলের আঁশ, মাছের মুড়া প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে তাহার থালি হইতে অন্ত-হিত হইত—জীন দেখিয়াও দেখিত না, থালির সহিত মুখ গুঁজিয়া একমনে আহার করিয়া যাইত। কিন্তু তবুও সে বৃত্তক্ষু শিশুদের ক্ষুধা মিটিত না; খাবারের জন্ত সন্ধ্যাই তাহারা চাঁৎকার করিত।—জীনের বাড়ী হইতে কতকদূরে এক গোয়ালাবাড়ী ছিল—সেইখানে যাইয়া তাহারা জননীর নাম করিয়া ডঙ্ক চাহিয়া লইত, তারপর পথিমধ্যে আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া সে ডঙ্ক কতক পান করিত,—কতক ফেলিয়া দিত। ভগ্নী এ কথা জানিলে বিপর্যয়-কাণ্ড বাধাইবে ভাবিয়া জীন তাহার অজ্ঞাত-সারে গোয়ালিম্বীকে সে ডঙ্কের স্বামি দিত, —ছেলেমেয়েরাও জননীর ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাইত। এইরূপে বৎসর দুই চলিল।

কাজ যখন ভাল চলিত তখন সে প্রতিদিন

১৮ হ্রাস করিয়া উপার্জন করিত, অল্প সময়ের মধ্যে টনাট বহিয়া, কুয়াগদের সহিত মাঠে-খাট্টা কোনরূপে চালাইত। কিন্তু তাহাতে আর কত আসে?—তার সে সামান্য উপার্জনে একা সে নরজনের ক্ষুধাবৃত্তি কি করিয়া করে? দিনে দিনে চুর্ভাগের চরমসীমায় তাহারা উপ-নীত হইতে লাগিল। তার উপর প্রচণ্ড শীত আসিয়া পড়িল;—কাজ আর মেলে না। ঘটিবাটি যাহা ছিল একে একে বিক্রয় করিয়া করদিন চলিল,—শেষে একদিন একেবারে অচল হইয়া পড়িল; তৈজসপত্রও কিছুই নাই, বরে একটুকরা খাবার নাই, প্রাতঃকাল হইতে সাতটি শিশু অনাহারে চাঁৎকার করিতে লাগিল। সমস্তদিন ধরিয়া জীন সে বৃত্তক্ষু কাতর আর্তনাদ শুনিল, শেষে সন্ধ্যার সময় উন্মত্তের ভাষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

কটিওয়ালার মাবার্ট ইসাবু সমস্তদিনের খরিদ-বিক্রয়ের হিসাবপত্র মিলাইয়া ভিতর হইতে দোকান বন্ধ করিয়া শুইতে যাইবে—এমন সময় হঠাৎ বাহিরের জানালার কাঁচখানা বন্-বন্ শব্দে ভাঙিয়া গেল; তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দোকানঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল ভাঙা কাঁচের মধ্য দিয়া একখানা হাত টেবিলের উপরে সাজানো রুটির স্তূপ হইতে একখানা রুটি লইয়া অস্ত্রহিত হইতেছে। চোর চোর বলিয়া সে পশ্চাদ্ধাবিত হইল; চোরও উর্দ্ধ্বাসে ছুটিল, কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িল; রুটিখানা আসিতে আসিতে পথে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেও, তাহার হাত হইতে তখনও রক্ত ঝরিয়াছিল। সে চোর—জীন ত্যালজিন।

১৭৯৫ খৃঃ বটে। 'বসন্ত'-

বাটীতে রাতে জাঁকাতি করার অভিযোগে জীন

বুকু হইয়া জীন দায়রা সোপর্দ হইল। বিচারে,
পাঁচ-ষোল খরিয়া কঠোর পরিশ্রমের সহিত
তাহার কারাদণ্ডাজ্ঞা হইল।

নির্মম শাসন-পাশ,—সভ্যতার পরি-
হাস!—কি যে ভয়ানক কণ, যখন দণ্ডবিধি
আইন বৈতরণীর অন্তর্গত জলে মানবভরণীখানি
ডুবাইয়া দেয়! কি সে শোচনীয় মুহূর্ত্ত, যখন
সমাজ, ভাবচিত্তাপূর্ণ মানববিশেষকে চির-
দিনের মত আপনার ক্রোড় হইতে নিকাসিত
করিয়া দেয়!

১৭৯৬ খৃঃ ২২ শে এপ্রিল তারিখে যেদিন
সমগ্র প্যারিসবাসী নেপোলিয়নের মনটেন্ট নামক
বুদ্ধজয়ের সহোদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল,—
সেই দিন বহুসংখ্যক আদামো পরস্পর সংযুক্ত
লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া প্যালি বাইবার জন্ত
প্রস্তুত হইল। জীনও তাহার মধ্যে ছিল।
কামার যখন তাহার লৌহ গলাবন্ধটা পশ্চা-
দিকে প্রেকা দিয়া আঁটিতেছিল, তখন হত-
ভাগ্য হইবারে মুখ ঢাকিয়া ফুকারিয়া উঠিল—
“ভরে আমি ত চোর—নই, আমি যে কাঠুরে
জীন রে!”—তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে দক্ষিণ
হাতখানি ফুলিয়া ধীরে ধীরে সাতবার রামাইয়া,
যেন সাতটি অসম মস্তক স্পর্শ করিল। লোকে
বুঝিল,—সাতটি শিশুর গোষণের জন্তই তার
যা কিছু অপরাধ!

কসিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল।
ভবিষ্যতের ভীষণ ছবি তাহার মানস-চক্ষে
ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কান্ডার করিয়া তুলিতে
লাগিল। নিরক্ষর অশিক্ষিত সে, অপরাধের
অনুপাতে দণ্ড গুরুতর হইয়াছে বলিয়াই যদি
সে ভাবে, তাহা হইলে আদমো তাহাকে দোষ
দিতে পারি না।

সাতাইশ দিন গো-ধানে শৃঙ্খলের ভার বহন
করিয়া অবশেষে জীন কুর্লতে আনীত হইল।
সেখানে বন্দীদের লাল টেকার্ড পরিয়া সংসারের
সহিত তাহার সকল সঞ্চ বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার
পরিচয়জ্ঞাপক নাম পর্যন্ত রহিল না;—এখন
হইতে তার নূতন পরিচয়—নং ২৪৬০১ মাত্র।
তাহার ভয়ী কোথায় রহিল? সে সাতটি
শিশুর কি হইল? কে তাহার সন্ধান রাখে?
তরুর মূল যখন কুঠায়াঘাতে ছিন্ন হয়,
তখন তাহার মুটিমের পত্রগুলির পরিণাম সন্ধান
কে করিয়া থাকে?

সেই পুরাতন কাহিনী!—‘ন পিতা ন
মাতা ন বন্ধু’ ভগবানের সে জীব কয়টি একে
একে আপনাপন অনৃষ্ট-ভরসার মাঝে ডুবিয়া
গেল। একমাত্র কোলের শিশুটি লইয়া
জননী এক দপ্তরীর বাড়ীতে সামান্য কাজ
জুটাইয়া অতিকষ্টে উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন
করিতে লাগিল। শেষরাতি হইতেই তাহাকে
কার্যো যোগ দিতে হইত, পুত্র বাহিরে পড়িয়া
থাকিত; অধাক্ষ বলিতেন—“ছেলে নিয়ে
কি কাজ হয় বাছা! তা হলে অল্প জায়গা
দেখ।” তীব্র হিমে বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া
শিশু কাঁপিতে থাকিত, তারপর বেলা
সাতটার সময় পাঠশালা খুলিলে সেখানে বাইয়া
বসিত।—নূতন এক করেদোর ঘুথে জীন এক-
দিন এসব শুনি। তাহার প্রিয়জনগুলিকে
অন্তর্হিত করিয়া যে ববনিকা পতিত ছিল,
সহসা বৃহত্তর জন্ত তাহা অপসৃত করিয়া তাহা-
দের ভাগ্যলেখা-চিত্র কে যেম তাহাকে দেখাইয়া
দিল। তারপর পুনরায় সব অন্ধকারে
আবৃত হইল,—ইহজীবনে জীন আর সে ব-
নিকার অন্তরাল দেখিতে পারি মাই। কোরা-

বাসের চতুর্থ বৎসরের শেষে একদিন তাহার পলায়ন সুযোগ ঘটিল। কয়েকদৈবের মধ্যে এ বিষয়ে পরস্পর সহায়ত্ব জুটি খুব বেশী থাকে; অল্প কয়েকদৈবের সাহায্যে পলাইয়া, জীবন দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে ঘুরিল। কিন্তু সে কি স্বাধীনতা!—বস্ত্রপত্তন জায় বন হইতে বনান্তরে বিতাড়িত হওয়া; 'পততিপতত্রে বিচলিতপত্রে' নিত্য সশঙ্কিত হইয়া ওঠা; পথিকের পদশব্দে, কুকুরের ডাকে, প্রতি বনে কণ্টকগুণ্ডে অঙ্গসরণকারীর কথা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠা—ইহাকে যদি স্বাধীনতা বল তবে সে দুইদিনের জন্য সে স্বাধীনতা সন্তোষ করিয়াছিল। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, অবসন্নশরীর জীবন পরদিন ধৃত হইল,—তখনও তার উদরে বিদ্যুৎপরিমাণ জলও যায় নাই। বিচারে তাহার আরও তিন বৎসর কারাদণ্ড হইল। ষষ্ঠবর্ষের শেষে পুনরায় সে পলাইল,—প্রহরীরা একটা জাহাজের তক্তার তলদেশ হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিল,—প্রাণ-পণ শক্তিতে তাহাদের সহিত যঝিয়াও সে উদ্ধার পাইল না। এবার অপরাধ গুরুতর—পলায়ন ও প্রহরীদের বাধাপ্রদান।—দণ্ডের কাল আরও পাঁচবৎসর বৃদ্ধি পাইল,—তন্মধ্যে ডবল শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় দুই বৎসর। দশ বৎসরের শেষে, পুনরায় পলায়ন চেষ্টার ফলে আরও তিন বৎসর। এই ১৬ বৎসর। আরও একবার সে পলাইয়া বন্দী চারেক পরে ধৃত হয়; সেই চারি বৎসর জন্ত পুনরায় তিন বৎসর। একুশে ১১ বৎসর। ১৮১৫ খৃঃাব্দে সে কারা-মুক্তি পায়, ১৭৯৬ খৃঃ একখানি ক্ষুদ্র চুরির অপরাধে সে প্রথম কারা প্রবেশ করে।

এইখানে বলিয়া রাখি, এ ঘটনা কাল্পনিক

নহে,—ইহা বাস্তব; জীবন্ত সত্য। অপরকই ইহা ঘটতেছে। দণ্ডবিধি আইন সম্বন্ধে আলোচনার ফলে গ্রহণকার আরও একটুকু আর এক হতভাগ্যের অন্তর্গত ঠিক ইহারই প্রতিচ্ছায়া দেখা গিয়াছিল। ইংরাজী অপরাধ-দিগের সম্বন্ধে আলোচনার ফলে জানা যায় যে ইংলণ্ডে শতকরা আশিটা চুরি খাজানাবেই ঘটিয়া থাকে।

কারণ নিরাশায় অশ্রুসিক্ত চক্ষে জীবন গ্যালিতে প্রবেশ করিয়াছিল; ১৯ বৎসর পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার অন্তঃকরণ—নীরস, কঠোর, দয়ামায়ী লেশ-মাত্র বর্জিত।

জীবনের প্রকৃতি বার্থ কি ছিল?

ছুভাগ্যের বিষয় সমাজ এমিকে চাহিয়া দেখে না, অথচ এ সবই তাহারই কীর্তি।

জীবন লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই সত্য; কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে গওমূর্খ বলা যায় না;—যে সহগত বুদ্ধি মানবের সাধারণ সম্পত্তি, তাহা তাহারও ছিল। জন্মদিনের শিক্ষার ভাঙ্গা বয়ঃক্রমশই ছুটিয়া উঠিতেছিল। বেজায্যতে, শৃঙ্খলের বন্ধনে, নির্জনে কারাবাসে, প্রথম সূর্যোদ্যানে, শান্তিবহনে, পরিশ্রান্তিতে, কাঠ শস্যের পড়িয়া থাকিয়া,—সব সময়েই সে আপন অন্তরের প্রতি চাহিত,—আর তাবিত।

সে যেন বিচারক—আপনার অপরাধের পুনর্বিচার করিতেছে। সে যেন ঘোষী, বিনা-পর্যায়ে যে তার শাস্তি হয় তাই—সে কথা সে মানিত। চাহিলে করত কঠিনতা সে পাইতে পারিত; অন্ততঃ অপরাধ কোন কার্য-কর্মের বা কাহারও দ্বারা প্রভাবিত সে করিতে

পারিত।—অন্যদিকে যন্ত্রিবার সময় ত তখনও তাহাদের হয় নাই; বিশেষতঃ, বহুদিন ধরিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ করিলেও সহজে মাহুষের মৃত্যু হয় না;—সুতরাং সব দিকে দেখিয়া তাহার ঐর্ষ্যাধারণ করা উচিত ছিল,—সকল পক্ষেই তাহা হইলে ভাল হইত; তাহার ভাঙ্গনগণা ব্যক্তির পক্ষে দোষীও প্রতাপ সমাজের উপর টেকা দিতে যাওয়া ভাল হয় নাই। চুরি করিয়া দ্রুত ঘোচে না; অন্ততঃ, আগের অভাব অতিক্রম করিতে গিয়া যেখানে কলঙ্কের পঙ্কিল খাদে পড়িতে হয়, সে পথ অবলম্বন না করাই ভাল;—ইত্যাদি।—মোটের উপর জীন আপনার দোষ প্রমাণ করিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল—এই দুর্দশার জন্ত কি একাই সে দায়ী?—কে সে? একজন মজুর মাত্র; পরিশ্রমে ত সে পরাশ্রয় নর, তবে সে কাজ পায় না কেন? আহাৰ্য্য পায় না কেন?—সেটা কার অপরাধ? তার উপর,—না হয় সে-ই দোষী, কিন্তু অপরাধের অমুপাত্তে তার দণ্ড কি গুরুতর হয় নাই? ক্রোড়ের তুল্যদণ্ডে দণ্ডের দিকটাই কি বুঝিয়া পড়ে নাই? এ কঠোর দণ্ড না দিলেও কি তার অপরাধ জ্ঞান হইত না? দণ্ডের অত্যাচার কি তার স্বেচ্ছাচারের মতো অতিক্রম করিয়া যায় নাই? অপরাধীকে বস্ত্রপত্তর দ্বারা বাধিয়া পিষিয়া, প্রতিহিংসা সাধন করিয়া, দণ্ডের মর্যাদা কি খর্ব হয় নাই? তার উপর কয়বার তার পলায়নচেষ্টার জন্ত এই যে অবশিষ্ট চতুর্দশবৎসরের কারাদণ্ড—এটা কি ছুর্বলেয় প্রতি সকলের অত্যাচার নয়? ব্যষ্টির উপর সমষ্টির অন্তর প্রভাব নয়?—এমন কি তার

পাপ যে ১২ বৎসর ধরিয়া তাহাকে তার প্রায় শিষ্ট করিতে হয়?

সমাজ?—সমাজের কি অধিকার যে, সে একই ঘটনার জন্ত একজনকে নিশ্চয়ভাবে দণ্ডিয়া পিষিয়া মারিবে, অথচ জনবিশেষের অপরাধ দেখিয়াও দেখিতে চাহিবে না?—কি তার অধিকার যে অল্পসংস্থানের কোন উপায় না করিয়া দিয়া, নিশ্চয় শাসনপাশে সে মাহুষকে বাধিতে আসে? অদৃষ্টের বশে বাহারা দীনদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা করুণার পাত্র; কিন্তু তাহাদের জন্ত কি যত আইনের কঠোরতা?—জীন অনেক বিচার বিভ্রম করিয়া অবশেষে সমাজকে দোষী সাব্যস্ত করিল, এবং প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত বস্ত্রপরিহর হইল; সে বুঝিল তাহার দণ্ড—অবিচার না হোক, অত্যাচার বটে। ক্রোধটা অনেক সময়ে 'বোকামি' মাত্র,—দোষী লোকেও ধরা পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; তবুও এটা ঠিক যে, অন্তর বিচারের ভাবটা মনে মনে না থাকিলে কেহ কখন নিজেকে নির্গ্যাতিত ভাবে না। জীন ভ্যালভিন আপনাকে নির্গ্যাতিত বলিয়াই মনে করিতেছিল।

সমাজ তাহার জন্ত কি করিয়াছে?—কিছুই নয়। অন্তান্ত হতভাগ্যের স্থায়, শুধু তার তথা-কথিত জায় বিচারের প্রচণ্ড মূর্তিটাই সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ পর্যন্ত খণ্ডার্থ করুণা লইয়া কেহ তাহার কাছে আসে নাই, যে কেহ কাছে আসিয়াছে সে-ই তাহাকে আশাতই করিয়াছে। শৈশবের পর হইতে, এক ভয়ীর নিকট ব্যতীত কোন বয় বা স্নেহ কাহারও নিকট হইতে সে পায় নাই। দুর্দশার পর দুর্দশার, তাহার মনে অবশেষে এই ধারণা

দাঁড়াইয়াছিল যে জীবনটা সংগ্রামমাত্র, আর সে সংগ্রামে সে-ই নিত্য পরাজিত। যুগাই শেষে তাহার একমাত্র অস্তিত্বরূপ হইল; সেই অস্তিত্ব গ্যালির নির্গাতন-শাণ্ডে ক্ষুরধার করিয়া লইয়া কারামুক্তির দিন হইতে সংসারের সহিত যুক্তিতে সে কৃতদংকর হইল। তুল্যতে কয়েদীদের জগৎ বিভ্রাণ্ড ছিল, ইচ্ছা করিলে কোন কয়েদী সেখানে মোটামুটি ধরণে শিক্ষালাভ করিতে পারিত; জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা তাহার পতিত্বসামান্যের পথ প্রশস্ত হইবে ভাবিয়া, চল্লিশ বর্ষ বয়সে জীন সেই বিভ্রাণ্ডে পবেশ করিল। সময়ে সময়ে শিক্ষা ও সভ্যতাই বস্তু পাপের আঁকর হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজের বিচার শেষ করিয়া জীন সমাজ-কর্তা ভগবানের বিচার করিতে বসিল, এবং অবশেষে তাঁহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিল।

এইরূপে ১৯ বৎসর কারাবাসের মধ্যে তাহার জীবন আলো-অন্ধকারের বিচিত্র মিশ্রণে কাটিতেছিল।

আসলে তাহাকে পাপস্বভাব বলা যায় না। গ্যালিতে প্রথম প্রবেশ কালে তাহার প্রকৃতি তোমার আমার মতই ছিল। সেখানে, নির্গাতনের ফলে, সে যখন সমাজের উপর খড়্গহস্ত হইল, তখন তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিল; ভগবানের দ্বারা বিচারে যখন সে সন্নিহান হইল, তখন তাহার মন পাপপঙ্কিল হইল।

কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

মানবপ্রকৃতি কি সম্পূর্ণভাবে এতই পরিবর্তিত হইতে পারে? ভগবানের সৃষ্ট মানুষকে কি মানুষে এত দীন করিতে পারে? আত্মা 'ক' কর্মফলাধীন হইয়া, মন্দ গ্রহের ফেয়ে, আপনি কলঙ্কিত হইতে পারে? বিশাল

মস্তিষ্কের ভারে মেরুদণ্ডের ভাঙ্গ, মানুষের চিত্ত কি স্তূপীকৃত হৃৎযন্ত্রণার ভারে প্রপীড়িত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে? প্রত্যেক মানবের আত্মায়, জীন ভ্যালজীনের আত্মায়, —এমন কি কোন সহজাত অপাপ অনন্তের দিবা বিভা নাই বা ছিল না, সংকারণের প্রতিফলিতালোকে যাহা ক্রমশঃ উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়া উঠে এবং পাপে যাহাকে কখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ধাপিত করিতে পারে না?

গ্যালির কর্মের অবসরকালে এই সব কথাই তাহার মনে হইত। নীরব ভাবুকতার ছায়াপাত সে সব সময়ে তাহার মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

অবশ্য আমরা যে ভাবে ক্রমপর্য্যয়ে তাহার চিন্তার বিকাশ দেখাইয়াছি, সে ভাবে হয়ত জীন আপনার চিত্তকে দেখে নাই,— সে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার ক্ষমতাও হয়ত তাহার ছিল না। কিন্তু এটা সত্য যে যেখানে সংশোধন অপেক্ষা শাস্তি-প্রদানের আগ্রহই অধিক পরিফুট, সে বিচার মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে একে একে পদ-দলিত করিয়া মানুষকে পত্নবৎ করিয়াই তোলে। জীনের উপর্যুপরি পলায়ন-চেষ্টাই তাহার প্রমাণ।—সে ব্যর্থ চেষ্টা মূৰ্খতা বই আর কিছু নয় তাহা ত সে জানিত; তত্রাচ সুযোগ পাইলেই, উন্মুক্ত পিঞ্জর হইতে ব্যাঘ্রের দ্বারা, সে ছুটয়া পলাইয়াছে,— পরিণাম বা শাস্তির কথা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই।—কেন? তাহার সহজাতবুদ্ধি যেন তাহাকে বলিয়া দিত—‘পালাও’; তাহার বুদ্ধি-বিচার তাহাকে বলিত—‘থাক।’ কিন্তু এমন একটা প্রলোভনের কাছে তাহার

সহজাত ভাবেরই জয় হইত, তাহার পশুভাবই প্রবল হইত। তার পর, ধৃত হওয়ার পর নূতন শাস্তির ভার তাহার চিত্তের অন্ধকার গাঢ়তর করিয়াই তুলিত।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। শারীরিক সামর্থ্যে জীবনের সমতুল্য লোক গ্যালিতে তখন কেহ ছিল না। কঠোর-শ্রমসাধ্য কার্যে একা সে চারিজননের সমতুল্য ছিল; পৃষ্ঠের উপর অনায়াসে সে বিশাল ভার বহন করিতে পারিত। কিন্তু শারীরিক শক্তি অপেক্ষা তাহার কৌশল অনেক বেশী ছিল। সুদীর্ঘকালের জ্ঞান দণ্ডিত অপরাধীরা পলায়নোদ্দেশ্যে প্রায়ই প্রতিদিন, সূর্যোগমত, নিয়মিত-ভাবে শক্তি ও কৌশলের সাধনা করে। জীন সে বিষয়ে একজন পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছিল। যে-কোন প্রাচীর উল্লম্বন করা, ক্ষুদ্রতম কার্গিশের উপর স্বচ্ছন্দে দণ্ডায়মান থাকা, তাহার পক্ষে কৌতুকমাত্র ছিল। পৃষ্ঠদেশ ও হাঁটু দিয়া, কনুই এবং হস্তের সাহায্যে দেওয়ালের কোণ বাহিয়া অনায়াসে সে ত্রিতল পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইত;—এটরূপে কতবার গ্যালির ছাদ পর্য্যন্ত সে উঠিয়াছে।

কথা সে কহিত কম; গ্যালিতে কখনও কেহ তাকে হাসিতে দেখে নাই। সে যেন সর্বদাই কি একটা গুরুতর চিন্তার মাঝে মগ্ন হইয়া থাকিত।

তাহার অসম্পূর্ণ প্রকৃতির ভ্রান্ত অনুভব-শক্তির বশে সে বুঝিত কি যেন একটা বিশাল ভার তাহার স্বন্ধে চাপিয়া আছে। জীবনের অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘেরিকে সে চাহিত সেই দিকেই দেখিত,—আইনের বন্ধন, মানবের পক্ষপাতিত্ব, এবং সভ্যতার বিশাল স্তূপ যেন

চারিদিক হইতে তাকে ঘিরিতেছে। তাহার মধ্যে,—কখনো সম্মুখে, কখনো দূরে, কখনো বহু উর্দ্ধে—এখানে অনুচর সহ কারাধ্যক্ষ, ওখানে তরবারি হস্তে যমদূতসম প্রহরী, দূরে করধূতদণ্ড প্রধান পুরোহিত, আর উর্দ্ধে আলোকের মাঝে হেমমুকুটধারী নৃপতি—আরও কত কি সে যেন দেখিত। কি এক দুর্জয়ের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাহারা যেন সব তাহাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইত,—তাহাদের সে নির্বোধ নিষ্ঠুরতা এবং চির উপেক্ষার ভারে প্রতিদিন সে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত!—সম্ভাবিত দুর্দশার অতলজলে মগ্ন শাসন-কণাহত হতভাগ্যের শিরেই, মানব-সমাজের যত ভঃসহ বিশাল ভার আসিয়া চাপিয়া বসে; জীবনেরও তখন সেই অবস্থা। সে কি ভাবিত?—পেষণযন্ত্র-মধ্যগত যবধণ্ডকে প্রশ্ন কর। তাহার যে চিন্তা, জীবনেরও তাই।

এই কায়া ও ছায়া, সত্য ও কুহকের অদ্ভুত মিশ্রণের মধ্যে পড়িয়া মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত,—অতীত, বর্তমান সবই বুদ্ধি বা ভ্রান্তি, সবই বুদ্ধি একটা স্বপ্নের ঘোর মাত্র! কাজ করিতে করিতে, পাগিয়া, কারা-প্রহরীর প্রতি চাহিয়া সে ভাবিত—কে এ, ছায়ামূর্তি! কিন্তু মুহূর্তে সে ছায়ামূর্তি হইতে তাহার পৃষ্ঠে সজ্ঞারে বেত্রাঘাত বর্ষিত হইত; চমকিত হইয়া, জীবনের চিন্তা পুনরায় বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিত; জীন আবার কার্যে মন দিত।

বহির্জগতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—সূর্য্যের কিরণ, বসন্তের প্রভাত, বিচিত্রবর্ণাভ আকাশের ছবি, সবই যেন

তাহা হইতে দূরে দূরে ছিল। শুধু একটা অতি ক্ষীণ আলো চিত্তের অন্ধোন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া আসিয়া, যেন তাহার অন্তর্জীবনে প্রবেশ লাভ করিত মাত্র।

মোট কথা,—ফ্যাবেরোল পল্লীর সে নিরীহ কাঠুরিয়া ত্যাল’তে আসিয়া ভীষণ কয়েদীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। গ্যালির শিকার ফলে দুইটি জিনিসে সে খুব অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল;—প্রথমতঃ, তাহার নির্যাতনের প্রতিহিংসারূপ একটা প্রকৃতিসিদ্ধ তীব্র আকস্মিক উত্তেজনা; দ্বিতীয়তঃ, তাহার আপন বিবেক-বিচারানুমোদিত ভ্রান্ত চিন্তাপ্রসূত পূর্বচিন্তা কার্যানুষ্ঠানে। জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও একগুঁয়েমি, এই তিন লইয়া তাহার পূর্বচিন্তা গঠিত হইত; এবং স্বাভাবিক বিদ্বেষ, আত্মার অন্ধকার, নির্যাতনের স্মৃতি ও প্রতিহিংসার ভাব (তাঁহাতে সাধু অসাধুর বিচার ছিল না)—এই কয়টি ভাবই তাহার কার্যের একমাত্র কারণস্বরূপ ছিল। কিন্তু নানবের রচিত আইনকানূনের প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষই তাহার সকল চিন্তার মূলে অহরহঃ জাগিতে থাকিত। এই বিদ্বেষ-ভাব, সময়ে দৈবঘটনায় নিয়ন্ত্রিত না হইলে, কালে, স্বাভাবিক নিয়মের বশে, সমাজের প্রতি, পরে সমগ্র মানব-জাতির প্রতি, তার পর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের প্রতি, বিস্তৃত হইয়া পড়ে; মানুষ তখন কেবলি পরের অনিষ্ট সাধন করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া থাকে।—ছাড়-পত্রে, জীনকে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়।

দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে তাহার প্রাণ-ধারা

শুক হইতেছিল। ১৯ বৎসর পরে, বিস্মক হৃদয়ে শুক নেত্রে জীন পুনরায় সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিল।

(৮)

অন্ধকার লবণাধুরাশি ভেদ করিয়া নক্ষত্র-বেগে পোত ছুটিতেছিল। সহসা এক বাত্মী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল।

একবার উঠিয়া, একবার ডুবিয়া, চীৎকার করিয়া সকলকে সে ডাকিতে লাগিল।—কে সে চীৎকার শুনিবে? সমুদ্রবক্ষে তখন ঝটিকা উঠিয়াছে; নাবিকেরা এবং সহযাত্রী-বৃন্দ পালের রসারসি লইয়াই ব্যস্ত—তাহার আর্তনাদ তাহাদের কাণে পৌঁছিল না। উত্তাল তরঙ্গমালার উপর হতভাগ্যের দেহ বিন্দুবৎ ভাসিতে লাগিল।

নিমিষে নিমিষে সে পোত দূর হইতে দূরাস্তর্গত হইতেছিল। উহারই মধ্যে সে ত এই কতক্ষণ ছিল; আর সবারই মত সেও ত উহারই একজন যাত্রী ছিল; আর সবারই মত সেও ত একদিন উহারই ক্রোড়ে সকলের সহিত একত্রে বসিয়া, স্বর্গের আলো এবং সমীরণ-সঞ্চার উপভোগ করিয়াছে। কিন্তু এখন?—মুহূর্তের পদাশ্রয়, মুহূর্তের ভুল—তাহারই ফলে চিরদিনের মত পতন,—সেইখানেই তার জীবন নাট্যের পরিসমাপ্তি!

চারিদিকে বীচি-বিক্ষোভ, পদতলে তরল বারিরাশির প্রাণসংহারিণী লীলা; বাতাসংক্ষুব্ধ উন্মিরাশি আছাড়িয়া আছাড়িয়া তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া অন্ধকার সমুদ্রতলের দিকে তাহাকে দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে! তরঙ্গের পর তরঙ্গ, জনসংঘের ঝগড়া, তাহার মুখে নিঃশব্দ ত্যাগ করিতেছে; এক একবার

তরঙ্গের তাড়নে নিমজ্জিত হইয়া সে দেখিতেছে,—চারিদিক্ হইতে হাঙ্গর কুন্তীর সরীসৃপ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, সমুদ্রগর্ভস্থ লতাপুন্ড্র যেন তাহাকে মৃত্যু-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্ত প্রসারিত হস্তে ছুটিয়া আসিতেছে!—ভয়ে শিহরিয়া, চক্ষু মুদ্রিয়া, অভাগা প্রাণপণে জীবনের মায়ায় যুঝিতে লাগিল।

কোথায় সে পোত? দূরে—বহুদূরে—অন্ধকার দিক্চক্রবালের সীমারেখায়!—আর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না!

দেখিতে দেখিতে তুফান উঠিল। চতুর্দিকে—পর্বত প্রমাণ তরঙ্গ; উর্দ্ধে—পাটলান্ধকার আকাশের নির্ধম ভ্রুকুটি। সর্বত্র যেন উন্মত্ত দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা!—সে ভীষণ শব্দ, যেন নরকের প্রতিধ্বনিত নির্ধোষ!—কি সে যন্ত্রণা!—অভাগা উন্মাদ-প্রস্থ হইল।

আকাশে বিহঙ্গম আছে, মানবের চুঃখ-যন্ত্রণা দূর করিতে দেবতারাও আছেন।—কই, তাগকে ত কেহ উদ্ধার করে না! পাখীরা ঝড়ের মুখে উড়িতে উড়িতে গান করিতে লাগিল; নীচে সে অভাগা মৃত্যুর সহিত যুঝিতে লাগিল।—সে অনন্ত সমুদ্র এবং অনন্ত আকাশ—যেন তাহারই কবরের অমুরূপ; একটি তাহার কবর,—অপরটি তাহার আচ্ছাদনী।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুঝিতে যুঝিতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে;—পোতও আর দৃষ্টিগোচর হয় না।—গভীর অন্ধকারে সে একা! ডুবিতে ডুবিতে চারিদিক্ হইতে প্রেতচ্ছবি তাহার

চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—অভাগা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

মানুষ ত তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। ভগবান্, তুমি কোথায়?

“—কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!—”

দিক্চক্রবালে, আকাশে,—কোথাও কিছু নাই, কেহ নাই!

আকাশ, তরঙ্গ, পর্বতশৃঙ্গ—সবই বধির! বাত্যাও অনন্তের আদেশই পালন করিতেছিল।

চারিদিকে—ঘনীভূত অন্ধকার, বাত্যা, নির্জনতা, দানবী-ভ্রুকুটি, উন্মত্ত তরঙ্গের মুহূর্মূহ উত্থান-পতন; পদতলে—তারল্যের রসাতল; অন্তরে—শাস্তি, বিভীষিকা! কোথায় আশ্রয়?—আশ্রয় নাই! তীব্র হিমে দেখিতে দেখিতে তাহার হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিল; উন্মত্তের গ্রাস আকাশ বাতাস নক্ষত্র তরঙ্গ ঘূর্ণাবর্ত সবই যেন সে অস্থিম আবেগে ধরিতে লাগিল!—হায়,—শূন্য মুষ্টি,—বিফল প্রয়াস!

দারুণ নিরাশাভারপ্রসীড়িত হইয়া তখন সে সব চেষ্টা ত্যাগ করিল।—পরাজিত নির্যাতিত হতভাগ্য গভীরতম অন্ধকারের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল!

হায় রে গতিশীল সমাজ! মানবের এবং মানবাত্মার অধোগতি চিহ্ন এমনি ভাবে তুমি অঙ্কিত করিয়া যাও! তোমার শাসন-নীতি এমনই ভাবে মানুষকে অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তার উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও এমনি ভাবেই কাড়িয়া লয়,—চির হৃদশার মাঝে তাকে এমনি ভাবেই দূর করিয়া দেয়! হায়, এ নৈতিক মৃত্যুর হস্ত হইতে কে হতভাগ্য মানবকে উদ্ধার করিবে?

(৯)

সে দিন প্রাতঃকালে কারাধ্যক্ষ যখন আসিয়া তাহাকে জানাইল—“আজ তুমি মুক্ত,” তখন জীন প্রথমতঃ সে কথা বিশ্বাসই করিতে পারিল না;—সেটা যেন এমনই অসম্ভব,—এতই অপ্রাকৃত! তারপর, সহসা একটা তীব্র জ্যোতিঃ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জ্ঞান? মুক্তির কথায় তাহার মনে একটা নব জীবনের ছবি জাগিয়া উঠিত। কিন্তু হুঁদিন যাইতে না যাইতেই সে বুঝিল, হরিদ্রাভ ছাড়-পত্র সহ মুক্তি অর্থে কি?

তারপর আরও কথা ছিল। জীন হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এই ১৯ বৎসরের পারিশ্রমিক হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকটে তাহার ১৭১ ফ্রাঙ্ক মোট পাওনা হইয়াছিল; অবশু রবিবার ছুটিছাটা, ও অন্ত্যস্ত বাবদে তাহা হইতে কিছু বাদ যাইবার কথা,—কিন্তু জীন তাহা বুঝিল না; তাই কর্তৃপক্ষ যখন তাহাকে সর্বশুদ্ধ ১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ স্যাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন সে সেটা অপহরণের নামাস্তর বলিয়াই মনে করিল।

মুক্তির পর দিন, চলিতে চলিতে পথে একটা আসুরের কারখানায় তার দিন মজুরি জুটিল। সে অসাধারণ পরিশ্রমী,—খুব উৎসাহে কাজ করিতে লাগিল। একটা চৌকিদার সেখান দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া সন্দেহভাবে তাহার ছাড়পত্র চাহিল,—কাজেই তখন সে হরিদ্রাভ ছাড়পত্র তাহাকে বাহির করিতে হইল। চৌকিদার চলিয়া গেল, লোকেরা পরস্পর মুখ চা’রাচায়ি করিতে লাগিল, জীন পুনরায়

আপন কাজে মন দিল। সন্ধ্যার সময় সে যখন তাহার প্রাপ্য আনিতে গেল, মেট তাহাকে মাত্র ১৫ স্যাস দিল।

সেখানে দৈনিক মজুরের বেজ ৩০ স্যাস; জীন অপর এক মজুরকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিল। তাই সে বিস্মিত হইয়া বলিল—

“কি রকম?”

“কি রকম আবার কি?—তুই আবার এর বেশী কি চাস?”

“কেন, ৩০ স্যাস? সবাই যা পেয়ে থাকে।”

মেট ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—“সাবধান; ফের যদি কথা বলবি ত পুলিশে দেবো।”

জীন নিরুত্তর হইয়া ফিরিল। ভাবিল—এ-ও দিনে ডাকাতি!

সমাজ—কর্তৃপক্ষ—তাহার উদ্ভূত অর্থের হ্রাস করিয়া ‘পাইকারি’ ডাকাতি করিয়াছে; মানুষ এখন জনে জনে ‘খুচরা’ ডাকাতি আরম্ভ করিতেছে। ভাল!

জীন বুঝিল—মুক্তি অর্থেই উদ্ধার নয়; কয়েদী কারাগার ত্যাগ করিয়া আসে বটে, কিন্তু ঘণা ও দণ্ডের হাত হইতে কখনো পরিত্রাণ পায় না—ডি-তেও সে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

(১০)

জীনের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন গির্জার ঘড়িতে চং চং করিয়া ছুইটা বাজিতেছে! প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিছানায় সে শোয় নাই; আজ এ কোমল শয্যায় নিদ্রা হওয়াই যে তাহার পক্ষে বিচিত্র!

চারি ঘণ্টা নিদ্রা তাহার ক্লান্তি অপনোদনের পক্ষে যথেষ্ট—বেশীক্ষণ নিদ্রা যাওয়া

তাহার অভ্যাস ছিল না—তবু একবার চক্ষু মেলিয়া অন্ধকারে সে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু দিবাভাগে নানাঘটনাসংঘাতে যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহার পক্ষে রাত্রি, দ্বিতীয়বার নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব সহজে ঘটে না। জ্বনেরও তাহাই হইল। ঘুমাইতে না পারিয়া সে ভাবিতে বসিল। সে চিন্তাও নানা ভাবসংঘাতের অন্ত্রুত মিশ্রণ!—অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের কথা একত্রে মিলিয়া তাহার মস্তিষ্কেব মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। কত অন্ত্রুত আকৃতি ধরিয়া, কত সম্ভবকে অসম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত করিয়া আবার নিমেষে যেন কোন পক্ষিল শ্রোতে মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সব চিন্তা সব ভাবের মধ্যে একটি মাত্র চিন্তা তাহাকে অধিকার করিয়া বসিল। কি তাহা, বলিতেছি—

সেই ছয় থানা রূপার থাল—ম্যাগলোয়ার যে গুলিকে আলমারির উপর তুলিয়া রাখিতেছিল—তাহারা যেন সজীব হইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতেছিল। যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের মূল্য ২০০ ফ্রাঙ্কের কম নয়—উনিশ বৎসর ধরিয়া খাটিয়া সে যাহা পাইয়াছে প্রায় তার ডবল দাম! অবশ্য কর্তৃপক্ষ অবিচার না করিলে সে আরও কিছু বেশী পাইত? তা' বাউক সে কথা।

পূর্ণ এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা বিরোধী ভাবের মধ্যে পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল।

ঢং—ঢং—ঢং—। তিনটা!

জ্বীন চকিতে উঠিয়া বসিল, হাত বাড়াইয়া দেখিল বিছানার পাশে তার গাঁঠিরটা ঠিক আছে কি না?—তারপর, জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পুনরায় শয্যার উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কি সে ভাবনা?—কেমন করিয়া বলিব? সে ভাবনার কোন সামঞ্জস্য নাই, স্থিরতা নাই; তাহা একবার আসে আবার মিলায়, আবার আসে আবার যায়।—কি যেন তাহার উপর চাপিয়া বসিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে কয়েদী ত্রেভেটের কথা তার মনে পড়িল,—তার ছক্কাঠা স্ততার গাটারটা যেন তাহার চক্ষের উপর জাগিতে লাগিল। এই ভাবে হয় ত তার সমস্ত রাত্রি কাটিত, কিন্তু অকস্মাৎ গির্জার বড় বাজিয়া উঠিল—ঢং! আরও অর্ধ ঘণ্টা!—সে শব্দ যেন তাহাকে বলিয়া দিল—“উঠ, ভাবছ কি?”

জ্বীন চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোক জানালার খড়খড়ির মধ্য দিয়া কক্ষে আসিয়া পড়িতেছিল। মুহূর্তের অন্ত একবার ইতস্ততঃ করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালার গরাদে ছিল না,—নীচেই বাগান; তাহাতে অনতি-উচ্চ প্রাচীরের বেটন; বাগানের পরই নাতিহ্রস্ব বৃক্ষের সারি—সম্ভবতঃ সেটা একটা রাজপথ। চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে জ্বীন ভাল করিয়া একবার সব দেখিয়া লইল; তারপর, জানালা বন্ধ করিয়া, স্থির পাদক্ষেপে ফিরিয়া আসিয়া, গাঁঠির হইতে শিকের মত কি একটা বাহির করিল। তারপর, জুতা জোড়া পকেটে পুরিয়া, থলিটা পৃষ্ঠে বাধিয়া লইয়া, চোখের

উপর টুপিটা টানিয়া আনিয়া, সেই জানালায় মিরিয়েল আপন কক্ষ অর্গলাবদ্ধ করেন নাই,
পার্শ্বে লাঠি রাখিয়া, লৌহশিকহস্তে ধীরে ধীরে উন্মুক্তই ছিল। (ক্রমশঃ)
ধীরে পার্শ্বের কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইল।

শ্রীস্বধীরচন্দ্র মজুমদার।

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(৩)

(ভাদ্রের বঙ্গদর্শনের ৪৩১ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্তি)

ফলতঃ সাধারণ লোক প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে যে বিরোধ ও বাবধান আছে বলিয়া মনে করে, তাহা সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাগা ধরিতে পারা যায়, তাহাই প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাগা ধারণা হয় না, তাহাই অপ্রাকৃত। কিন্তু লোকে ইহা বিচার করিয়া দেখে না যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে জানি না ও জানিতে পারি না, তাহাকেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া ধরিতে হয়, তার আর অগ্র পথ নাই। ইন্দ্রিয়ের অতীত যে একটা বিশাল জ্ঞানরাজ্য পড়িয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য হইতেই আমরা তাহা জানিতে পারি, আমাদের অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া যায় মাত্র, বর্জন করিয়া জন্মে না, জন্মিতে পারে না। যাহা দেখি ও শুনি তারই মধ্যে যাহা দেখা যায় না ও শোনা যায় না, তাহার সঙ্কেত ও সন্ধান পাওয়া যায়। আর এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে ইন্দ্রিয়ের ভিতরকার অতীন্দ্রিয় সঙ্কেতটা সকলে ধরিতে পারে না। সে জন্ত

সাধন আবশ্যক। সে সাধনের নাম ভূতগুণি বা দেহগুণি। আমাদের ভূতগুণি নাই বলিয়া, ইন্দ্রিয় সকল কখনও আপনার স্বরূপে অবস্থান করে না। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষও সত্য হয় না; ইন্দ্রিয়গ্রামের শক্তি-সাধা যে কি, ইহাও আমরা জানিতে পারি না। আমরা সত্যভাবে ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন বা বিষয়ের সেবাও করিতে পারি না; অতীন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষলাভ করি না। আমরা কতকগুলি পৈত্রিক ও বৈজ্ঞিক সংস্কার লইয়া জন্মিয়া, বহুবিধ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে গড়িয়া উঠি। এই সকল সংস্কার আমাদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে বহুবিধ কল্লনার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই জন্ত আমরা সত্যভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলি যে কি ও তাহাদের সাক্ষ্যই বা কি, ইহাও ধরিতে পারি না, আর অতীন্দ্রিয় বস্তু যে কি তাহাও প্রত্যক্ষ করিতে পাই না। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া রহে বলিয়া, অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাসও কেবল অনুমানের ও

কল্পনার উপরেই গড়িয়া উঠে। ধাতু-প্রসাদেই অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কূলের প্রসন্নতা লাভ হইলেই, জীব অতীন্দ্রিয়ের মহিমা জানিতে পারে। আমাদের ধাতু প্রসন্ন নয় বলিয়াই আমরা একটা বিকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়া প্রকৃত অতীন্দ্রিয়ানুভূতিলাভে অসমর্থ হই। আর এই জন্যই প্রাকৃত এবং অপ্ৰাকৃতির মধ্যে এমন একটা কল্পিত ব্যবধানেরও সৃষ্টি করি।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয় সকলকে ভাল করিয়া জানিলেই তাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে যারা ভাল করিয়া জানিয়াছে, তারাই জানে যে ইহারা কেহই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। কেবল চক্ষু দিয়া মানুষ দেখে না। চক্ষুর পশ্চাতে যতক্ষণ না মন আসিয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয়ে যতক্ষণ না মনঃ-সংযোগ হয়, ততক্ষণ চক্ষুর গোলকের উপরে সে বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে তার রূপের জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুর পশ্চাতে যেমন মন, মনের পশ্চাতে সেইরূপ বুদ্ধি; বুদ্ধির পশ্চাতে সেইরূপ সাক্ষীস্বরূপ আত্মচৈতন্য যতক্ষণ না আসিয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ চক্ষু দেখে না। এইরূপে মন, বুদ্ধি ও চৈতন্য যুক্ত না হইলে, কাণও শোনে না, ত্বক্ও স্পর্শ করে না, নাসিকাও ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, রসনাও রসাস্বাদ করে না, কোনও ইন্দ্রিয়ই আপনার বিষয়কে গ্রহণ করিয়া সে বিষয়ের শব্দস্পর্শরূপ-রসাদির জ্ঞান দান করিতে পারে না। ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ?

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ?

কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি ?

ক উ দেবো চক্ষুশ্রোত্র যুক্তি ?

কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই যে আমাদের অন্তরিক্রিয় মন, তাহা আপনার বিষয়েতে পতিত হয়? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া শরীরের মধ্যে যে প্রধান প্রাণবায়ু তাহা আপনার বিষয়ে যুক্ত থাকে? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল বাক্য অভিব্যক্ত হয়? সেই দেবতা কে? যিনি চক্ষু এবং কণকে আপন আপন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতেছেন?

সর্বপ্রকার সংস্কারবর্জিত হইয়া, সহজ ও শুদ্ধভাবে আপনার ইন্দ্রিয় সকলের অনুসরণ ও অনুশীলন করিতে করিতেই এরা যে স্বতন্ত্র ও সম্পর্গাপ্ত নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর তখনই আমরা যিনি “চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং তৎ” ও “প্রাণশ্চ প্রাণং” তাঁহাকে এই সকল চক্ষুরাদিতে আশ্রয়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সূতরাং ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে হয়—ছাড়াইয়া বটে, কিন্তু ছাড়িয়া নহে। অতিক্রম করিয়া বটে, কিন্তু বর্জন করিয়া নহে।

মনের মধ্যেই চিন্তামণি বিরাজ করিতে-ছেন। মনকে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু মনকে ধরিয়াই সে চিন্তামণিকে পাইতে হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রামের বা হৃদয়কসমাজের মাঝখানেই হৃদয়কেশ বাস করেন। তিনি ইন্দ্রিয়কূলের অধীশ্বর, রাজা। রাজাকে তাঁর স্বরাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, পররাষ্ট্রে নহে। চিন্তামণিকে চিন্তা হইতে, হৃদয়কেশকে হৃদয়কসমাজ হইতে

পৃথক্ করা যায় না। করিলে, তাহা ক্রমশঃ শুকত্ব প্রভৃতির জায় একটা ভাববাচ্য শব্দ মাত্রে পরিণত হয়, তার বস্তুই আর থাকে না। ইংরেজিতে ইহাকে abstraction বলে। এই সকল abstraction-এর উপরেই আমাদের বাবতীয় মানসকল্পনা গড়িয়া উঠে। এগুলি সত্য নহে, সত্যভাষ্য মাত্র। চিন্তামণি আমাদের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে, নিত্যকাল আমাদের প্রত্যেক চিত্তকে ধরিয়া, জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। জীবীকেশ আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রতি চোঁটেই সঙ্গে তাহাদের আশ্রয় ও পোষণিতা হইয়া নিয়ত বিবাজ করিতেছেন। আর মন প্রাকৃত বস্তু : কিন্তু সেই মনবিচারী মনোময় চিন্তামণি যিনি, তিনি অপাকৃত। চক্ষুরাদি বহির্বিদ্রিয় সকলও প্রাকৃত ; কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ও অধীশ্বর হইয়া যিনি আমাদের প্রত্যেক বক্রিয়-কোঁঠকে সম্বল ও সফল করিতেছেন, সেই জীবীকেশ অপাকৃত। মন প্রাকৃত হইলেও এই মনকে ছাড়িয়া অপাকৃত বস্তু যে চিন্তামণি তিনি তিনাকাল তিষ্ঠিতে পারেন না। নিমেষের জন্তও অপাকৃত বস্তু যে জীবীকেশ তিনি কদাপি এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রাকৃতের ভিতরেই অপাকৃতের ; অপাকৃতের আশ্রয়েই প্রাকৃতের প্রতিষ্ঠা : এ দুইকে পৃথক্ করা যায় না। প্রাকৃত এবং অপাকৃত ছায়াতপের জায় পরস্পরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছে।

অতএব শৃঙ্গাররসকে প্রাকৃত আর মাধুর্য্যকে অপাকৃত বলিলে উভয়ের মধ্যে কোনও আত্যস্তিক ব্যবধান বা স্বাভাবিক

বিরোধের প্রতিষ্ঠা হয় না। চিন্তামণি যেমন মনের মধ্যে, মনকে ধরিয়া ও জড়াইয়া, ওতপ্রোতভাবে তাহার সঙ্গে নিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন, সেইরূপ শৃঙ্গাররস বা আদিরসের মধ্যেই, আমাদের কাম-প্ৰত্যেককে ধরিয়া ও জড়াইয়া, তাহারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিশিয়া ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াই মাধুর্য্যরসও কুটিয়া উঠে। ফলতঃ কেবল প্রজনন-ক্রিয়ানামকে শৃঙ্গারপদ-বাচ্য করিলে, তাহাকে মাধুর্য্য বলা যায় না। কিন্তু যখনই এই প্রজনন-ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার সমপর্যায়ভূক্ত হইয়া, প্রকৃতক্ষে অপাকৃত হইয়া উঠে থাকে। শৃঙ্গার ও মাধুর্য্য দুটো ভিন্ন বস্তু নহে। একই অভিজ্ঞতার বা একই সত্যের দুইটা দিক্ মাত্র। ছায়াতে ছাড়িয়া যেমন অতপ থাকে না ও থাকতেই পারে না, আর আতপের আশ্রয় ব্যতীত যেমন ছায়ার প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা অসাধ্য, সেইরূপ শৃঙ্গার বা আদিরসকে বজ্জন করিয়া মাধুর্য্যরস জন্মিতে ও থাকিতে পারে না ; আর মাধুর্য্যের আশ্রয় ব্যতীত শৃঙ্গার বা আদিরসেরও জন্ম বা স্থিতি আদৌ সম্ভব হয় না।

শৃঙ্গাররস আমাদের দেহকে আশ্রয় করিয়াই জন্মে, সত্য ; কিন্তু আবার জন্মিয়াই এই রসে সেই শরীরকেই আপনার যথাযোগ্য ক্ষুণ্ণির অন্তরায় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করে, ইহাও সত্য। শরীরও এ রসসঞ্চারে আপনাকে সার্থক ভাবিয়া, তাহাকে আপনার মধ্যে রাখিতে চাহে। এই জন্ত উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়। এই সংগ্রামইতেই শ্বেদ-কম্পাদি মাধুর্য্য-চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আসক্তলিপ্সা এই রসের একটা অতি প্রধান লক্ষণ। স্বল্প-বিস্তর সকল স্থায়ী রসেতেই আপনার উপজীব্য যে বস্তু তার সঙ্গে আকাজ্জা করে। দাস প্রভুর নিকটে নিত্যকাল থাকিতে চাহে। সখা নখার সঙ্গে গলাগলি করিয়া চিরদিন কাটাইতে চাহে। পিতামাতাও আপনার বাৎসল্যকে তৃপ্ত করিবার জন্ত সর্বদা সন্তানের মুখ দেখিবার ও তাঁহাকে কোলে লইয়া, বুকে করিয়া রাখিবার ভ্রম লাগান্নিত হন। এ সকলই সত্য। কিন্তু দাস্ত্রে বা সখ্যে বা বাৎসল্যে যে আসক্তলিপ্সা দেখা যায়, মাধুর্য্যের আসক্তলিপ্সার সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না। এমন কি এই ছই আসক্তি যে একজাতীয় ইচ্ছাও মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে। আপনার দেহ-মন-প্রাণ সমুদায় প্রিয়জনের দেহ-মন-প্রাণের মধ্যে একেবারে মিশাইয়া, একেবারে তাঁহাকে আত্মসাৎ ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার বাসনা এ রসে নিরতিশয় পবল হইয়া উঠে। তার দেহটাকে এই দেহের অণুতে অণুতে টানিয়া আনিতে চাহে। এই দেহটাকে তার দেহের অণুতে অণুতে মিশাইয়া দিবার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠে। এই যে প্রবল পিয়াসা, ইহাই শৃঙ্গারের আসক্তলিপ্সা। এই অদ্ভুত আসক্তলিপ্সা আর কোনও রসেতে নাই। আর এই লিপ্সা যত বলবতী হয়, ততই এ স্থূল শরীরটাকে রসস্ফূর্তির অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়। তখন বাস্তবিকই মনে হয় এ অস্তিমাংসময় দেহ যদি গলিয়া জল হইয়া যায়, তবে সেই জলে প্রিয়-অঙ্গের অভিষেক করিয়া প্রণয়জন আপনার দেহকে সার্থক ও জীবন সফল করিতে পারিত।

অগুরু চন্দন হতাম, তুয়া অঙ্গে মাখাইতাম
ঝামিয়া পড়িতাম তুয়া পার হে !

এ কেবল একটা কথার কথা নহে। ইচ্ছাতে কেবল কবিকল্পনামূলক অতি-শয়োক্তিই আছে বলিয়া মনে করা ঠিক নয়। ইচ্ছা মাধুর্য্যের সার্বজনীন আকাজ্জা ও অভিজ্ঞতা। এ রস-শরীরটাকে ধরিয়া, শরীরটাকে নিঙারিয়া শরীরের শরীরকে নষ্ট করিয়া, শরীরকেই আপনার ইচ্ছাজাল-পভাবে আত্মময় ও আত্মকেই আবার যুগপৎ শরীরময় করিয়া তবে আপনার পরিণতি পাইবার চেষ্টা করে। চেষ্টা কবে, কিন্তু পায় না। কারণ এ রস আনন্দরূপ। যিনি রস রূপ, স্রুতি যাঁহাকে রসোহ বৈ সঃ বলিয়াছেন, এ রস তাঁহারই রসধারাকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহারই নিখিল রসহৃতিকে পাইবার জন্ত ছুটিয়া উঠে। এই জন্তই সাধক কবিকুল-চূড়ামণি চণ্ডীদাস এই শৃঙ্গার-রসের এমন মর্গ্যাদা প্রচার করিয়াছেন :—

শৃঙ্গার বুঝবে কে ?

সব রসসার শৃঙ্গার এ।

শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।

মরম বুঝিয়া শৃঙ্গারে মজে ॥

সকল রসের শৃঙ্গার সেরা।

রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা ॥

কিশোর কিশোরী ছুইটা জন।

শৃঙ্গার রসের মুরতি হন ॥

চণ্ডীদাসে কহে না বুঝে কেহ।

যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥

প্রাকৃত শৃঙ্গাররসের মধ্যেই অপ্রাকৃত মাধুর্য্য জন্মে সত্য; কিন্তু এই শৃঙ্গার-রস-সন্তোষের অধিকারীও অগতে সকলে হয় না।

উল্লাস এরসের প্রাণ ; সম্বোধনে যেখানে
স্বাভাবিক অবসাদ আনিয়া দেয়, সে ক্ষেত্রে
এই শৃঙ্গাররস ফুটিতে পায় না। নিব্বীৰ্য্য
লোকের কামক্ৰীড়াতে শৃঙ্গাররস জন্মিতে পারে
না। প্রকৃত শৃঙ্গাররস যেখানে ফুটিয়া উঠে,
সেখানে সম্বোধনে অবসাদ আসা তো দূরের
কথা, কেবল উল্লাসই আরো উত্তরোত্তর
বাড়িয়া যায়। এই জন্তই প্রকৃত মাধুর্য্যে
সম্বোধনের পরে “রসোদগার” বর্ণিত হয়। এ
রসোদগার অপূৰ্ণ বস্তু। ইহাতে প্রেমের
জলন্ত পিয়াসা ও অনন্ত মতৃপ্তি বর্ণে বর্ণে
ফুরিয়া উঠে।

সখি! কি পুছনি অমৃতব মোয়,
মোই পীড়িত অমুরাগ বাথ'নিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়।

জনম অবধি হম, রূপ নেহারিহু,
নয়ন না ভিরপিত ভেগ :
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখহু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥
ইহা প্রেমকের কথা, কামকের নহে।
আর কাম ও প্রেম এক হইয়াও এক
নহে।

আত্মোন্মিষ প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণোন্মিষ প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
এই প্রেমই মাধুর্য্যের সার। ইহা কাম
হইয়াও কাম নহে ; শারীর হইয়াও অশারীরী ;
প্রাকৃত হইয়াও অপ্রাকৃত। এ রস রূপের
মধ্যেই নিয়ত অরূপের শোভা ফুটায় ; অরূপের
মধ্যেই নিয়ত রূপ জাগাইয়া তোলে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৫)

সেকালের বাঙ্গালীর পক্ষে বাহুবলের
প্রয়োজন ছিল। বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে
হইত,—আত্মরক্ষার জন্ত বাহুবলেই আত্ম-
প্রাধাণ্য সংস্থাপিত করিতে হইত। কারণ,
বাঙ্গালাদেশের উপর অনেকেই লোলুপ-দৃষ্টিতে
চাহিয়া থাকিতেন,—অবসর পাইবামাত্র
অনেকেই বাঙ্গালাদেশের উপর আপত্তিত
হইতেন।

রাজেন্দ্র চৌড এইরূপে একবার বঙ্গভূমির
কিয়দংশ লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার
দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ

করিবার জন্ত অনেকে অনেক চেষ্টা করিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেকালের
বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার জন্ত বাধ্য হইয়াই বাহু-
বলের অনুশীলন করিতে হইত। জননমাজে
তাহার প্রশংসা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল ;—
কাব্যে ও কথোপকথনে তাহার জয়ধ্বনি
মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের
জ্ঞান রাজকুমারগণকেও বাহুবলের পরিচয়
প্রদান করিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভের
জন্ত চেষ্টা করিতে হইত।

তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের তিন পুত্রের

মধ্যে রামপাল সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতার শাসনকালেই বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, সমগ্র অরাজিকতাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালে সর্বজন-পরিচিত ছিল বলিয়া ইহার কথা মদনপাল দেবের [মনহলি গ্রামে আবিস্কৃত] তাম্র-শাসনে উল্লিখিত হইয়াছিল। যথা,—

“শাসতোব চিরং জগন্তি
জনকে যঃ শৈশবে বিষ্কুরং ।
তেজোভিঃ পরচক্র-চেতসি
চমৎকারং চকার স্থিরম্ ॥”

সে যুগে বাহুবলের প্রয়োজন ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রাধাত্য ছিল। সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, বালক বীর রামপাল যে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, লোকসমাজে “সর্বসম্মত” হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারিত। একদা অনুমান ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীতে অবলম্বিত হইবার অযোগ্য বলিয়া কথিত হইতে পারিত না। কিন্তু রামপাল যে সত্য সত্যই একদা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, গোড়াকবি স্কন্ধা করনন্দী [রামচরিতম্ কাব্যে] স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমে সর্বকনিষ্ঠ হইলেও, গুণগৌরবে রামপাল যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদানের জন্ত স্কন্ধাকর লিখিয়া গিয়াছেন,—

“কোষ্ঠেন্তেষু বিরজে রামঃ ।”

এখানে “কোষ্ঠ” বলিতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ বুঝিতে হইবে না, তাহা বুঝাইবার জন্ত রামচরিতম্ কাব্যের টীকাকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—

“প্রশস্ততমঃ ।”

রামপাল শ্রেষ্ঠ বলিয়াই “সর্বসম্মত” হইয়াছিলেন। পালসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়-কাহিনী স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়—প্রকৃতি-পুঞ্জের নির্বাচনক্রমেই পালবংশীয় প্রথম নরপাল গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে সাম্রাজ্যে প্রজাপুঞ্জের অধুরাগ-বিরাগের মূলা ছিল। তাহাদের বাহুবল ছিল; প্রয়োজন উপস্থিত হইলে একত্র মিলিত হইয়া রাজশক্তিকে সুসংযত করিবার সামর্থ্য ছিল; রাজার পক্ষে প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহাদিগকে লোকপ্রিয় হইতে হইত। লোকপ্রিয় হইবার জন্ত যত্ন করিতে হইত। যাহারা তাহাঃ কৃতকার্য হইতেন, তাঁহাদের নাম ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পথে ঘাটে ভক্তিরে গীত হইত। তাহাই তাঁহাদের সিংহাসনকে অটল করিয়া রাখিত,—শাসনকে শক্তিদান করিত,—সমৃদ্ধিকে স্ফীত করিয়া তুলিত।

রামপাল সর্বকনিষ্ঠ হইলেও, “সর্বসম্মত” হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়ে নানা আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছিল। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াই সে সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন কি না, ভবিষ্যেও সংশয় আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ততঃ রামচরিতম্ কাব্যে এইরূপ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোনও কালেই খেলের অভাব ঘটে না। সেকালেও খেলের অসম্ভাব ছিল না। তাহারাই মহীপাল দেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিল,—

রামপাল যখন “সর্বসম্মত,” তখন পিতার দেহাবসানের পর, তিনিই রাজ্যশাস্তি করিবেন। তৃতীয় বিপ্রহপাল দেব দেহতাগ করিবামাত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, এই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে শূরপাল ও রামপাল সহোদরদ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামচরিতম্ কাব্যে এই আখ্যায়িকা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে কবি-কল্পনা বলিবার উপায় নাই। কারণ, সমসাময়িক কবির পক্ষে এতদ্বিষয়ে অমূলক কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করিবার সাহস ও সম্মততা থাকিতে পারে না। সুতরাং রামচরিতম্ কাব্যের এই আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া বুঝিতে পারা যায়,—দ্বিতীয় মহীপাল দেবের কর্মদোষে গৃহকলহে তাঁহার শাসন-শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল তাহাই নয়,—তাঁহার এই ভ্রাতৃদোষে তাঁহার বিরুদ্ধে লোকচরিত প্রধূমিত করিয়া তুলিয়াছিল।

যিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অটল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার [অনীতিকারম্ভরত] নীতিবিগহিত অশিষ্ট আচরণে সিংহাসন টলিয়া উঠিল। পাল-সাম্রাজ্যের পক্ষে তাহার ফল বড় শোচনীয় হইল,—বাল্লভার ইতিহাসের পক্ষেও হয় ত তাহারই ফল অধঃপতনের প্রবণ বেগ প্রবর্তিত করিয়া দিল। দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইল।

এই সময়ে পালসাম্রাজ্যের রাজধানী যেখানেই থাকুক না কেন, তাহা যে বরেন্দ্র-মণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, সন্দ্যাকর তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বরেন্দ্র-ভূমি বহুসংখ্যক কৃষিক্ষেত্রে ও আবাসগৃহে অলঙ্কৃত ছিল বলিয়া সন্দ্যাকর তাহাকে “সৌতাবাসালঙ্কৃত” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাল-নরপালগণের জন্মভূমি ছিল বলিয়া সন্দ্যাকর তাহাকে “জনকভূ” বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। সেই জনকভূ বরেন্দ্রী [কাস্তা] কমনীয়া ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহীপাল দেবের নীতিবিগহিত আচরণে সেই জনকভূমি হইতে পালরাজগণের শাসন-ক্ষমতা উৎখাত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মহীপাল দেব নিহত হইলেন। বিপ্লবের নায়ক কৈবর্ত-নায়ক দিব্য বা দিব্যোক উচ্চরাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসনদণ্ড তাঁহারই করতলগত হইল। এই বিপ্লব-কাহিনী কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর স্মৃতিপট হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গোড়কবি সন্দ্যাকর নন্দীর কাব্যকথা তাহাকে আবার বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছে, এই বিপ্লবকাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ইহা এখন “কৈবর্তবিপ্লব” নামে কথিত হইতেছে। ইহার বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্ভিক্ষকমিশনের কার্যে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্রকে ভারতের নান্যস্থানে কমিশনের বৈঠকে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এই কার্যের জন্ত নাগপুরে অবস্থান কালে ১৯০১ সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি স্বর্গারোহণ করেন। যে কর্মক্ষেত্রে এই সুযোগ্য বঙ্গসন্তান বহুবর্ষ ধরিয়া অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন— সেখানে তাঁহার অভাব সম্যক্ অহুভূত হইতে লাগিল। এই বৎসর এপ্রেল মাসে মহারাজ সংসারচন্দ্রকে মন্ত্রী-সভার বৈদেশিক বিভাগের অন্ততম সদস্যপদে মনোনীত করিলেন। কোম্সিলের বৈদেশিক বিভাগের (Foreign Department) কার্য বিশেষভাবে ভারত-গভর্নমেন্ট ও অজ্ঞাত দেশীয় রাজ্যের সহিত সংস্রষ্ট এবং রাজ্যের সাধারণ বাবস্থার ভারও এই বিভাগের উপর অর্পিত। কাজেই প্রথম হইতেই রাজ্যশাসন-কার্যের প্রধান ভার সংসারচন্দ্রের উপর পড়িল।

সংসারচন্দ্র যখন কর্মভার গ্রহণ করেন, তখন জয়পুররাজ্যের বড় হুঃসময় চলিতেছিল। উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় ভাষণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রজাবন্দ তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রজাবৎসল মহারাজ মুক্তহস্তে প্রজাদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। ইহার উপর আবার

রাজ্যে মহামারী প্রেগ দেখা দিয়াছে। গজোত্রী হইতে ফিরিয়া অবধি সংসারচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এই সকল নানা কারণে সংসারচন্দ্রকে প্রথম বৎসরে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কর্তব্যনিষ্ঠ সংসারচন্দ্র কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া রাজ্য ও রাজ-কার্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া লইলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সর্বজনপিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ভারত সম্রাট সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ-উৎসবে যোগদান করিবার জন্ত ১৯০২ সালে জয়পুরাধিপতি ইংলণ্ডে যাইবার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলেন। স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু-নরপতির 'বলাত-গমন এক অভিনব ঘটনা— শুধু জয়পুরের কেন সমগ্র ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন। হিন্দুর চির-ক্ষুণ্ণ পথে চালিত জয়পুররাজ্যের জনসাধারণ এ প্রস্তাবের বিপক্ষে, কেবলমাত্র সংসারচন্দ্রই একা এ বিষয়ে মহারাজের সহায়। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে একত্র করিয়া যে যে কারণে বর্তমানকালে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ, সে সমুদায় নিরাকরণ করিলে এ যাত্রার কোন শাস্ত্র-সম্মত বাধা আছে কি না জানিতে চাহিলেন। তারপর, বহু আলোচনার পর পণ্ডিত-বর্গের মত গ্রহণ করিয়া সংসারচন্দ্র মহারাজের বিলাত-গমনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নব নিশ্চিত একটি সমগ্র জাহাজ ভাড়া লওয়া লইল—

কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত রহিল যে কোন কৰ্মচারীই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মাংসাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তারপর অৰ্ণবপোত-শুদ্ধি এবং সমুদ্র-পূজার ব্যবস্থা হইল। সঙ্গে সমগ্র লোকের ছয়মাসের আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। মহারাজ স্বয়ং গঙ্গাজল বাতীত অস্ত্র জল পান করেন না— তাঁহার অস্ত্র পানীয় গঙ্গাজল যথারীতি হরিদ্বার হইতে লওয়ার ব্যবস্থা হইল। মহারাজের ইষ্টদেবতা গোপালজী সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহার নিয়মিত পূজাদির দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাঁতনকাটিটি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই পরিত্যক্ত হইল না। এই সময়ে সংসার-চন্দ্রকে দৈনিক ১৮১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ব্যবস্থা স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া করা তাঁহার অভ্যাস। এ সকলের মধ্যেও রাজ্যের নিয়মমত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত— কোনও কৰ্ত্তব্যই তাঁহার দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় নাই। রাজ্যশাসনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজে মহারাজের সহিত বিলাত গমন করিলেন। এই কার্য্যে সংসার-চন্দ্র একক সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়পুর এবং মহারাজ রাধোদিংহের নাম জগতের নিকট সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পরমহিন্দু জয়পুরাধিপের বিলাতগমন ইংলণ্ডে হিন্দুনরপতিগণের কি প্রকার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার নিষিদ্ধতার মূলে যে কোন শাস্ত্রসঙ্গত বাধা নাই তাহাও মহারাজের এই বিলাতযাত্রা হিন্দুর নিকট প্রমাণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহা জগতের কাছে

হিন্দুর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রমাণ করিয়াছে। ইংলণ্ডে ভারত-সম্রাটের নিকট হিন্দুর প্রতিনিধিত্বপে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়া মহারাজ সমগ্র হিন্দুস্থানের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মহারাজের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর বৎসরই (১৯০৩) সপ্তম এডবার্ডের সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে ভারতের পুরাতন রাজধানী দিল্লীতে লর্ড কর্জন দরবার করিলেন। এই দরবারের পর রাজভ্রাতা ডিউক অফ্ কনট জয়পুরে শুভাগমন করেন। জয়পুরাধিপতিকে G. C. V. O. উপাধি প্রদান করিবার জন্ত ভারত-সম্রাটের বিশেষ আদেশই তাঁহার জয়পুর আগমনের কারণ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বর্তমান সম্রাট— তৎকালে যুবরাজ (Prince of Wales)— পঞ্চম জর্জ জয়পুরে আগমন করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনায় সংসারচন্দ্র যে প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন— তাহাতে তাঁহার রাজকার্য্যে দূরদর্শিতা কৰ্ম্মনিষ্ঠা এবং রাজ-ভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া স্বয়ং যুবরাজ এবং ভারতগভর্নমেন্ট বারংবার তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন।

সংসারচন্দ্রের মন্ত্রিস্থ-কালের কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমরা তাঁহার শাসনপ্রণালীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ছোটবড় সকল কাজেই একটা শৃঙ্খলা-বদ্ধ নিয়মের প্রবর্তন করা সংসারচন্দ্রের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ ছিল—এ কথা আমরা বার বার দেখাইয়াছি; শিক্ষকতারই হউক আর মন্ত্রিস্থের কার্য্যই হউক—তিনি কখনও কোন কাজ এলোমেলো রকমের করিতে পারিতেন

না। তাই এত কাণ্ডবাহুল্যের মধ্যেও তিনি সকল দিক্ দেখিবার সময় ও অবসর পাইতেন। মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির পর তিনি নিয়ম করেন যে সপ্তাহে তিনদিন তিনি সাধারণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন। তন্মধ্যে একদিন রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দারদিগের সহিত তাঁহাদের বৈষয়িক বিষয়ে ও অন্ত্যান্ত আলোচনা করিতেন। এক দিন রাজ্যের নানাবিভাগের কর্মচারিগণ তাঁহাদের যাহার যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা বা পরামর্শ ও উপদেশ লওয়ার থাকিত, তাঁহারা দেখা করিয়া মীমাংসা করিয়া লইতেন। তৃতীয় দিনে প্রজাসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে দিন ছোট-বড়, দীন-দরিদ্র সকলেরই অব্যাহত দ্বার; সকলেই তাহাদের অভাব অভিযোগ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি অবহিতভাবে সকলের কথা শুনিতেন এবং সর্ববিধ অত্যাচারের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন। প্ৰজাসাধারণের সহিত বাবহারে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব এবং প্রজার প্রতি সন্তানুভূতি সর্বশেষ প্রকাশ পাইত—দরিদ্র বা সহায়হীন বলিয়া কোন অত্যাচারিত বা ভয়ঙ্কর তাঁহার কাছে বিষুথ হয় নাই। কেহ অন্তায় বা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি ধীরভাবে তাহাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিতেন—কখনও বিরক্ত বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না। তাই বিফলমন্ডর হইলে প্রত্যাখী কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিত না।

রাজকর্মচারিগণ যখন যে বিষয় লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতেন—তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সং মীমাংসা করিয়া দিতেন—সে সময় তাঁহার দূরদর্শিতা এবং রাজ্যের সর্ব

প্রকার কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত এবং রাজকার্য্য-পরিচালনে বিশেষ শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইত।

সুপাণ্ডু, উদারচেতা বিজ্ঞ লর্ড মর্লির মন্ত্রিত্বকালে ভারতবাসী যে সকল সুবিধা ও ক্ষমতা পাইবার জন্য উৎসুক—সংসারচক্র জয়পুররাজ্যে সেই উদারনীতির প্রবর্তনা করিয়া তাঁহার উচ্চ আদর্শের এবং দূরদর্শিতার সম্যক পরিচয় প্ৰদান করিয়া গিয়াছেন। রাজ্য শাসনবিভাগে যখনই কর্মচারী পরিবর্তন বা নিয়োগের আবশ্যক হইত, তখনই তিনি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ যাহারা জয়পুর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাহার ফলে আজ স্থানীয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত-যুবক রাজকার্য্যের নানা বিভাগে প্রাণ প্রদান করিয়া নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বহুসংখ্যক যুবক সেটেল-মেন্ট, পুলিশ এবং কৃষিকার্য্যে বিশেষ ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া রাজকার্য্যে ও রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের উন্নতি এবং পরোক্ষ ভাবে শিক্ষালাভের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ জন্মিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এই উদারনীতির উপস্থিত ফল সম্বন্ধে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন কথা বলা যায় না। কেননা জয়পুরের শিক্ষার অবস্থা দেখিলে মনে হয় সংসারচক্র “fifty years ahead of his times” ছিলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তিনি যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, জয়পুরের ভবিষ্যৎবংশীয়ে তাহার ফলে লাভবান হইবে এবং এমন দিন আসিবে

যখন সংসারচন্দ্রের এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে সফল হইবে।

সংসারচন্দ্র জীবনের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিভাগে কাটাইয়াছিলেন। মস্তিস্ককালে তিনি শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নানাদিক হই শতাব্দী পূর্বে সুবিখ্যাত মহারাজ সবাই জয়সিংহ যে জ্যোতিষ-যন্ত্রালয় নির্মাণ করিয়া জগতের কাছে হিন্দুজ্যোতিষ-শাস্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন—আজও যাহা পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশ্বাসের বিষয়—সেই যন্ত্রালয়সমূহ এতদিন অব্যবহারে ও অপব্যবহারে ভগ্নরূপে পরিণত হইয়া পড়িতেছিল। সংসারচন্দ্র জয়পুর, দিল্লী, কালী প্রভৃতি স্থানের সেই সকল ‘যন্ত্রমন্দিরের’ সংস্কারের জন্ত বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তা গ্রহণ ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া শুধু জয়পুর-রাজ্যের কেন হিন্দুর এক প্রধান পুরাকীর্তি রক্ষা করিয়াছেন।

সংসারচন্দ্রের চেষ্টাতেই জয়পুর “মহারাজ কলেজের” বিজ্ঞান-বিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হয় এবং আজ উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান-বিভাগে উপযুক্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে D. S. C. (ডি, এস্, সি) পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে; তিনি এইখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না। মহারাজের এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্‌ এল্‌ ডি (L. L. D.) উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে যে সভা হয়, তিনি সেই সভায় প্রতি বৎসর দশটি ছাত্রকে নানাপ্রকার কার্য্যকরী শিক্ষাদিবার জন্ত বৎসরে দশ হাজার টাকা ব্যয় করাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্র বিশেষে গিয়া বাহাকে পূর্ষ, ব্যবহার-শাস্ত্র

এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া জয়পুররাজ্যের উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতে পারে, তিনি তাহার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

জয়পুররাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ সর্দারদিগের সহিত সংসারচন্দ্র নানাপ্রকারে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান সর্দারগণের মধ্যে অনেকেই সংসারচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন এবং অধিকাংশের বংশের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাঁই তিনি তাঁহাদের পুত্র বা তৎবংশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে ও যত্নে এখন অনেকেই আজমীর মেমো কলেজে (Mayo College) শিক্ষালাভ করিতেছেন। সংসারচন্দ্র সর্দারপুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিগাই নিশ্চিত ছিলেন না। নাবালক সর্দারগণের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভার তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিনি এই সকল “ঠিকানা”-পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার একান্ত যত্নে যে কত নাবালকের সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং কত ঋণভারগ্রস্ত “ঠিকানা” এই ‘মুনসরিমীর’ কালে ঋণমুক্ত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে—তাঁহার বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে।

রাজকার্য্য এবং বিচারাদি বাহাতে সুশৃঙ্খলার সম্পন্ন হয়, সেজন্য সংসারচন্দ্র মন্ত্রিসভার কার্য্যপ্রণালীর বিবিধ পরিবর্তন ও সংস্কার করেন। মন্ত্রিসভার চারিটি বিভাগ; প্রথম,—বৈদেশিক বিভাগ (Foreign Department), এই বিভাগের উপর রাজ্যের

আন্তঃসরীণ শাসন এবং ভারত গভর্নমেন্ট ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত রাজনৈতিক পত্র ব্যবহারের ভার শ্রুত। দ্বিতীয়,—রাজস্ব। তৃতীয়,—দেওয়ানী আপিল এবং চতুর্থ,—কোজদারী আপিল বিভাগ। পূর্বে নিয়ম ছিল যে সদস্তগণ প্রতিদিন প্রথমে নিজ নিজ বিভাগের কার্য শেষ করিয়া শেষে একত্র হইয়া “সমবেত মন্ত্রিসভার” নির্দিষ্ট কার্য করিতেন। এই শেষোক্ত সভার নাম—“ইজ্‌লাস্‌ জুম্লা মেম্বারান্”—ইহাদের কার্য কতকটা হাইকোর্টের Full Bench-এর মত—ইহাতে বড় বড় মোকদ্দমার আপিল এবং রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আলোচনা হয়। পূর্ব নিয়মে সদস্তগণ প্রথমে নিজ নিজ “সিগা” বা বিভাগের কার্য করিয়া—শেষে—“ইজ্‌লাসের” গুরুতর কার্য আরম্ভ করিতেন। তাহার ফলে এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্যে সর্বদা নানা গোলযোগ, অব্যবস্থা এবং ত্রুটি লক্ষিত হইত। ইহাতে রাজ্যের এবং প্রজার—উভয় পক্ষেরই বিবিধ অসুবিধা ঘটিত। সংসারচক্র এই ত্রুটি সংশোধনের জন্ত ‘সিগার’ এবং ইজ্‌লাসের কার্যের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্ধারিত করিয়া দেন। এই সামান্য মাত্র পরিবর্তনে কার্যের যে শৃঙ্খলা ও সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্বে মন্ত্রিসভার উকিলদিগের বিশেষ কোন সম্মানই ছিল না। সংসারচক্রের আমলে তিনি ইজ্‌লাসের কার্যে রাজ্যের এবং প্রজার পক্ষ সমর্থনের জন্ত আইনজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য পাওয়ার প্রথা প্রবর্তিত করিয়া

ব্যবহারাজীবদিগের বখাযোগা মর্যাদা দান করিয়াছেন। পূর্বে বেখানে অল্পশিক্ষিত মুন্সিগণ আদালতে নিজ নিজ মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিত—আজ সেখানে এল্, এল্, বি পাশ করা আইনজ্ঞ উকিল মন্ত্রিসভায় ওকালতি করিতেছেন।

বর্তমান কালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়—রেলওয়ে। রাজপুতানার মত প্রাচীন হৃদয়পিড়িত প্রদেশের পক্ষে রেলওয়ের মত হৃদয়ক নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। পূর্বে যে সকল স্থানে আবশ্যিক মণ্ডলভাদি প্রেরণের কোন উপায় ছিল না—রেললাইন সে সকল স্থান সর্বপ্রকারে সুগম করিয়া দিয়াছে। ইহা রাজ্য-প্রজা সকলেরই লাভের কারণ। সংসারচক্রের মন্ত্রিসভা কালে “জয়পুর—সবাই মাধোপুর স্টেট রেলওয়ে” খোলা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শে মহারাজ নবনির্মিত “নগদা—মথুরা” রেলওয়ের যে ৮৫ মাইল জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহার নির্মাণ খরচ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। এই দুই রেলওয়ে লাইন রাজ্যের বাণিজ্য ও রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। সংসারচক্রই প্রস্তাবিত “জয়পুর—শিখাবতী” রেল লাইনের সূত্রপাত করিয়া যান—কিন্তু নানা কারণে তাহার জীবিত কালের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইতে পারে নাই—কেবল সর্ভে ও এন্টিমেট হইয়াছিল মাত্র। এই লাইন সম্পূর্ণ হইলে—জয়পুর রাজ্যের সর্বাপেক্ষা দুর্গম প্রদেশ সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিবে।

সংসারচক্র জয়পুরের ডাকবিভাগের

কার্য্যপ্রণালীর আনুল সংশোধন করিয়া ইহাকে এক প্রকার নতুন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তিনিই জয়পুররাজ্যের ডাক টিকেট প্রথমতঃ প্রচলন করেন। পূর্বে চিঠী প্রভৃতি ডাকঘরে দিবার সময় মাণ্ডল আদার করা হইত অথবা চিঠী বা পার্সেল প্রভৃতি বেয়ারিং হইয়া মাণ্ডল আদার হইত। সংসারচন্দ্র ইংরাজী ডাকবিভাগে শিক্ষা প্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া এবং ডাকের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া এই বিভাগের সর্বপ্রকারে উন্নতি করেন। ডাকের সুব্যবস্থা হওয়ার প্রকারা রাজ্যের ডাক-বিভাগের উপর অধিকতর আস্থাবান হওয়ার রাজ্যে ডাকঘরের এবং পত্র-পার্সেলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। তিনি রাজ্যমধ্যে ডাক-বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না—তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া লর্ড মিন্টোর দরবারে জয়পুরের সহিত গভর্ণমেন্টের Postal Convention-এর প্রতিশ্রুতি আনাইয়াছিলেন, কিন্তু করাল কাল তাঁহাকে ইহা সম্পূর্ণ করিতে দিল না।

রাজকাৰ্য্যের প্রতি বিভাগেই সংসারচন্দ্র ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আমরা তাহার সবিস্তার বর্ণনা হইতে বিরত থাকিলাম। তিনি নিজের অসাধারণ চরিত্রবলে সমগ্র রাজকর্মচারী ও রাজ্যের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা অনন্তস্থলভ। যে দেশে উৎকোচ গ্রহণ কখনই অভ্যাস বলিয়া বিবেচিত হইত না—সেখানে তিনি সৎসংস্কার শিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া, দোষীকে দণ্ড দিয়া এবং উপদেষ্ট ও আদর্শের দ্বারা দেশের রাজ্যের এ কলঙ্ক

মোচনের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সর্দার ও সাধারণ প্রকার কোন ভেদ ছিল না। তিনি অত্যাচারিতের বন্ধু এবং দরিদ্রের সহায় ছিলেন। তিনি জ্ঞানতঃ কখন ভ্রাম ও সত্যের পথ হইতে রেখামাত্রও ভ্রষ্ট হ'ন নাই। কর্মক্ষেত্রে মানুষমাত্রেরই ভ্রম হইতে পারে—সংসারচন্দ্রও মানুষ—তিনিও অভ্রান্ত ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার পরম শত্রুও কখন তাঁহার ভ্রামপরতা ও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র করিতে পারে নাই।

সংসারচন্দ্র মহারাজ মাধো সিংহের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং তিনি সর্বদা বলিতেন যে আমার দ্বারা যদি রাজকাৰ্য্যের কোন সুবিধা বা উন্নতি হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ আমার নিজের ক্ষমতা নহে—মহারাজার গুণে। বাস্তবিক তাঁহার প্রাতঃমহারাজের এত গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল যে তিনি সংসারচন্দ্রের প্রবর্তিত সর্বপ্রকার সংস্কার বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেন এবং যাহাতে সে সকল নিয়ম কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে মন্ত্রী সংসারচন্দ্র দুর্বল-চাত্ত ছিলেন এবং রাজ্যাশাসনে অনেক সময় দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। যে দেশে ভ্রাম-অভ্রাম-নির্কিচারাে স্বার্থসিদ্ধিই রাজনীতির মূল মন্ত্র, যেখানে পরপীড়নেই ক্ষমতার সার্থকতা এবং বাহ্যিকভাবেই পদগৌরবের প্রকাশ, সেখানে ধর্ম্মভীক ভ্রামনিষ্ঠ এবং স্বভাবতঃ ভ্রাম ও বিনয়ী সংসারচন্দ্র যে শাসনকর্তার সে আদর্শে পৌছিতে পারেন নাই, ইহা বিশ্বাসের বিষয় নহে। সেখানকার ভ্রামনিষ্ঠের পরিমাণে

ভদ্রতা ও বিনয়-দুর্জলতা, জ্ঞানপরতা—
দুর্জলতা, ধর্মজ্ঞান—বিষয়বুদ্ধির অভাবের
পরিচায়ক। সৌভাগ্যের বিষয় সংসারচক্র
সে আদর্শকে কখনও সন্মান করিতে পারেন
নাই। তিনি শাস্ত, সংযত, আড়ম্বর-শূন্য হইয়া
নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।
তিনি স্বার্থকে ধর্মের জ্বালের আসনে বসান নাই।
কর্তব্যনিষ্ঠা এবং প্রভুপরায়ণতা তাঁহার
জীবনের সর্বকর্মের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। রাজ-
নতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে বজ্রাঘ্রাধিগিয়া ধাঁহারা
রাজ্যশাসনকার্যে। ত্রুটি হইলে, তাঁহাদের
পক্ষে এ পথ যে কত কঠিন এবং বিপদসঙ্কুল,
তাহা বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব নহে। সংসার-
চক্রে ধর্মের এবং জ্ঞানের সচ্ছ সংযমের মধ্যে
যাহা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহা তাঁহার মত
ধাঁহারা ধর্মকে একমাত্র মানদণ্ড এবং ভর
করিবার বস্তু বলিয়া জানেন—ধাঁহারা ধর্ম
বাতীত অথ কিছুতেই ভীত হ'ন না—তাঁহাদের
পক্ষেই সম্ভব।

রাজপুত এবং রাজপুতানীর বিশেষতঃ
জয়পুরের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি
সম্বন্ধে সংসারচক্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—
তাঁহা মহারাজ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যমণ্ডলীর
নিকট রাজ্যের নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসার
পক্ষে অমূল্য ছিল। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবেই
জয়পুর রাজ্যের তত্ত্বস্বরূপ দুর্জয় রাজপুত-
সদ্বিগণ সন্মান্যে এই তায়নিষ্ঠ বাক্যালীর নিকট
অবনত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারত
গভর্নমেন্ট এবং পর-পর অনেক রেসিডেন্ট এবং
রাজপুতানায়িত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিগণ

সংসারচক্রকে একান্ত বিশ্বাস করিতেন এবং
তাঁহারা একবাক্যে তাঁহার রাজভক্তি, কর্মনিষ্ঠা
এবং উদার শাসনপ্রণালীর সুখ্যাতি করিয়া-
ছেন।

মহারাজ এবং ভারত গভর্নমেন্ট কেহই
সাধুপ্রকৃতি প্রভুপরায়ণ সংসারচক্রের প্রতি
যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই।
অভিষেক-দরবারে মহারাজের সহিত বিলাত-
প্রবাস কালে সম্রাট সপ্তম এডবার্ড তাঁহাকে
“করোনেশন মেডেল” এবং তাহার পর বৎসর
দিল্লী-দরবারে ভারত গভর্নমেন্ট তাঁহাকে “রায়
বাহাদুর” উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে
বর্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ (তৎকালে যুবরাজ)
জয়পুরে আসিয়া সংসারচক্রকে M. V. O.
(Member of the Royal Victorian
Order) খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং
এই বৎসরেই জয়পুরাধিপতি তাঁহাকে রাজ্যের
“তাজিমী” বা প্রধান সদ্বিগণেরীভূক্ত করিয়া
তাঁহাকে সন্মানিত করেন। দুই বৎসর পরে,
(১৯০৭) মহারাজ প্রকাশ্য দরবারে সংসার-
চক্রকে “প্রধান মন্ত্রী” পদে বরণ করিয়া
তাঁহার কৃতকার্যের পুরস্কারস্বরূপ জায়গির
প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নববর্ষারম্ভে
ভারত গভর্নমেন্টের সংসারচক্রকে C. I. E.
উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসর মার্চ মাসে
ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি, মুতাসাফ্যার
শায়িত এই প্রবীণ, প্রভুভক্ত রাজকর্মচারীকে
তাঁহার গৃহে আসিয়া উক্ত উপাধি পদক
প্রদান করিয়া যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠার প্রতি
যথার্থ সন্মান প্রদর্শন করেন।

“বনভাসী ও গাছিক”, “সামান্য কথা”, “বেহালা”, “সুন্দর”, “সত্য” একটি সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, সম্পাদিত

৩

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ প্রকাশিত

বঙ্গবাহিনীর অক্ষর অক্ষর ভাষায়—কাব্যের আদর্শ—সত্যনিষ্ঠার প্রত্নরস

কাশীদাসী মহাভারত

ভারতের বালকবৃদ্ধবনিতার একমাত্র অবশ্যপাঠ্য পুস্তক।

সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত

সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কাশীদাস নাম প্রসিদ্ধ মহাভারত দেশী ঐতিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বাজারের খেলো সংস্করণ নহে। “যেমন কাগজ, তেমন ছাপা, তেমন বাঁধাই। বাহিরের আকার অতি মনোহর—কাগজের উপর রূপায় ছাপা অক্ষরের রূপ শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণ সহ বহু বহু করিতেছে। অভ্যন্তরের সজ্জা অস্বাভাবিক মনোমুগ্ধকর। তিনখানি জীবনে মুদ্রিত ও ছাপাশী নাম একবর্ষে মুদ্রিত ও ছাপাটোন চিত্রে মনোভিত্ত। ছবিগুলি সমস্তই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ কর্তৃক অঙ্কিত। প্রত্যেক চিত্রের পরিকল্পনাই অতীব সুন্দর। প্রায় তের শত পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্,

৩৫ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা।

জমিদারী ট্রেনিং কলেজ

৬৬ নং সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা ।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৩১৬ সাল প্রাচীন কল্যাণীতে স্থাপিত ও মহারাজা নারায়ণপ্রসূদ বহু রাজা জমিদার মহোদয়গণের সহায়ত্বাধীনে আশু ।

এই কলেজে জমিদারীর সর্বপ্রকার কাগজপত্র, সার্ভে, মকদ্দা, জরীপ, জমাবন্দি ও বন্দোবস্ত প্রভৃতির কার্য ও আইন শিক্ষা দেওয়া হয় । সুপ্রসিদ্ধি হইতে যন্ত্রসেয়ারি পর্যন্ত বস্ত্রীয় শিক্ষা এখানে হাতে কলমে দেওয়া হইয়া থাকে । দুই বৎসরে পাঠ সমাপ্ত হয় । হাইকোর্টের অধিকারকরজন উকিল, কয়েকজন বহুদলী ম্যানেজার ও সার্ভে অধিকার শ্রদ্ধি অধ্যাপনা করান । প্রাতে ও সন্ধ্যায় পড়ান হয় । উচ্চশিক্ষিত ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে এক বৎসরে পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন । আগষ্টমাসে 'সেশন্স' আরম্ভ হয় ।

প্রবেশিকা-কি তিন টাকা ও মাসিক বেতন তিন টাকা । বাহারা এক বৎসরে পাঠ শেষ করিলে, তাঁহাদের বেতন চারি টাকা । প্রবেশিকা ৫/- জমিদার মহোদয়গণের উৎসাহিকারি-জামিনদের শিক্ষার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত আছে । বিস্তারিত বিবরণ জমিদার বন্ধ অর্ড আনার-ট্যাল্পসহ সেক্রেটারীকে ২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতার চিঠী লিখিতে হইবে ।
এস্ মক্দ্দমদার,

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা ।



সর্বজনীন বলেন যে অনেকেই আচাৰিগ ক ভাল পোষকের চসমা প্রকারের বিক্রয় হয় সন্নিহিত করেন ; আমদা রায় মিত্রে কোংকেই বিশেষরূপে জানি, তাঁহাদের কথাও না কাঁড় কাঁড় । সুতরাং ভাল চসমা খরিশ করিতে হইলে, উক্ত বিখ্যাসযোগ্য কোংকে নির্দেশ করিয়া থাকি ।

কলকাতার আশুপুৰণ তাঁহাদের বসল এব্, বিবালোকে কৃত্ত কৃত্ত কলকাতা বিক্রয় দেখিতে পান একা কোলকাতা চসমা ব্যবহার করেন কি না, গিলিলে জি: পি:তে চসমা প্রদান হয় । মরকার হইলে ১০/- টাকা ডি ১-ডিট রাখিয়া তন্ম পরিদায় বহুত পাইয়া হয় । সন্নিহিত বুল তালিকা চাহিলেই ডাকে প্রেরিত হয় ।

রায় মিত্র এণ্ড কোং

২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ;—ব্রুক হোফার—পটুয়াটুলি, জামা ।

২০ নং মক্দ্দমদার স্ট্রীট, বেটিকাং জি:পি: ডপার্টমেন্ট হইবে

জিলাফতার বন্দোবস্তাধার রাজা মুক্তি

বন্দনাদি সার্বভৌম তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদ
ভক্ষণ করিলেন। গৌর প্রীত হইয়া তাঁহাকে
আলিঙ্গন করিলেন।

সার্বভৌম একদিন নিম্নলিখিত বন্দনা-
শ্লোক দুইটি জগদানন্দ দ্বারা গৌরসমীপে
প্রেরণ করিলেন।

বৈরাগ্যবিজ্ঞা-নিজভক্তিযোগ-

শিক্ষার্থমেকঃ পুণ্যঃ পুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদ্বীপদারী

কৃপাধূমির্গন্তমহং পপাণ্ডে ॥ ১

কালানুষ্ঠং ভক্তিযোগং নিজং যঃ

প্রাহুর্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।

আবিভূতস্তস্ত পাদারবিন্দে

গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভঙ্গঃ ॥২

মুকুন্দদত্ত গৌরের নিকট পত্নী পৌছিবার
পূর্বে ভিত্তি-গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাই শ্লোক দুইটি আজিও ভক্তের মুখে মুখে
উচ্চারিত হইতেছে। গৌর শ্লোক দুইটি
পাইয়াই ছিড়িয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

নক্ষত্র-পূজা

অতি প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় কি
অর্গ্য কি তুর্ক কি দ্বিভদ্র কি চীনেমান
মানবমাত্রেরই নক্ষত্র * পূজা করিত।
ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

নিশার ঘোর অন্ধকারে ভয়াকুল, হিংস্র
জহর গর্জনে কম্পবান বনবাসী আদিপুরুষ-
গণের ভয়ত্রাতা পিতা সূর্য্য ভিন্ন আর কে
ছিল? শীতে কাতর বনবাসীর দেহে তাপ-
সঞ্চার করিতে “প্রাচীন নক্ষত্র” বাতীত কে
সক্ষম ছিল? চন্দ্র ও তারাগণের বিমল জ্যোতি
মানবের শ্রান্তচিত্ত দিনান্তে যেমন শ্লিষ্ট করিতে
পারে, তেমন শ্লিষ্টকর মোহিনীশক্তি আর
কাহারও নাই। “সবিতা সত্যধর্ম্মা” উদ্ভিত
হইলেই বনবাসীর ভয় দূর হইত, দেহে
তাপের সঞ্চার হইত। বনবাসী আহার-সংগ্রহে
সাহসী হইতেন। দৈনিক পর্য্যটন অন্তে

নৈশ নভোমণ্ডলের সুবিমল জ্যোৎস্নায় বনবাসী
শ্রান্ত চিত্ত, ক্লান্ত দেহ শ্লিষ্ট করিতেন।

কাজেই তিনি কৃতজ্ঞতার বশে ভক্তির
চক্ষে নক্ষত্র দর্শন করিতেন। ক্রমে নক্ষত্র
তাহার ভয়হর্ত্তা পিতা ও শান্তিদাত্রী মাতা
হইলেন।

প্রাণ ও রয়ি আদি বনবাসীর পিতা মাতা
হইলেন। সবিতা জগতের প্রাণ, চন্দ্রমা
জগতের রয়ি। উভয়ে কৃতজ্ঞ বনবাসীর চিন্তা-
পুত্রলিকা হইলেন। সবিতা ঈগল পক্ষী,
শকুনি, রক্তবর্ণ চক্রবাক, হংসাদির জায় বিমানে
উড্ডীন হয় বলিয়া গরুদান্, শকুনি, লোহিত
পক্ষী ও হংস উপাধি পাইলেন। সবিতা প্রকাণ্ড
মহিষের বীরদর্পে বরাহের অটলবিক্রমে অগাধ
পারাবার-বারি হইতে উথিত হয়। সবিতা
ঘনঘটা-গর্জন সহ সিংহের লক্ষ লক্ষ উদয়-
গিরি আরোহণ করে। সিংহের চকুর
মত সবিতা মূর্ত্তের জন্তও মুদিত হয় না। তাই

* চন্দ্রসূর্য্যাদি নক্ষত্র।

সবিতা ‘মহিষ’ ‘বরাহ’ ‘সিংহ’ ও ‘হরি’ নাম উপহার পাইলেন।

শুক্র ও কৃষ্ণ—চন্দ্রের এই দুই পক্ষ। আবার চন্দ্র মিনিটে ৪০ মাইল চলে। বনবাসী চন্দ্রকে দ্বিজরাজ খেতাব দিলেন। বনবাসী দেখিলেন শুভ্র শশকের ছায়া, শুভ্র বিড়ালের ছায়া লক্ষ্মণ চন্দ্রমা বিমানে বিচরণ করেন। চন্দ্রমা ‘শশ’, বিড়াল, ও লক্ষ্মী নাম উপহার পাইলেন।

সবিতা ও চন্দ্রমার উদয়ে ভক্তিরসে ভুবিশা আনন্দে মগ্ন আদিমানব মূর্তিমান ‘বাউরা আদমী’র তানে বাউলের সুরে গীত ধরিলেন—

ভেবে মরি কি সগন্ধ

তোমার সনে

তুমি হবে কেউ আমার

আপনা হতে আপনার।

আপনা হতে নইলে

মন কি টানে

তোমার পানে—

আপনা হতে নইলে

প্রাণ কি টানে

ওহে জনক কি জননী

ভাই কি ভগিনী

প্রাণঘিনী কী কি

পুত্র কন্তে

এ নয় তোমাতে সম্ভব

এ কি অসম্ভব

সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।”

আদি বাউলের সংজ্ঞালাভ হইল, বাউল বিন্মিত লজ্জিত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন এবং তিনি দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন। অগ্নিময়

হইলেও সবিতা জড়বস্তু, জ্যোৎস্নাময় হইলেও “লক্ষ্মীভাতা শীতরশ্মিঃ” জড়বস্তু। বনবাসী বাউলের মনে ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন জড়বস্তু ত আমার ভক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, আমার দেবতা। “সবিতৃ-মণ্ডলমধাবর্তী” চিন্ময় বিষ্ণু, কাজেই সিদ্ধান্ত হইল “দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি”। বনবাসী বাউলের নক্ষত্র-পূজা বহাল রাখিল এবং তিনি সত্যের পথে অগ্রসর হইয়া ‘সবিতা সত্য-ধর্ম্মার’ উপাসনায় ব্রতী হইলেন।

স্বমেক্ষিত বনবাসী দেখিলেন ছয়মাস কাল জলময় পাতালে অলক্ষিত বাসের অবসানে সবিতা কুদ্রমুক্তি ধারণে তারাবুকের কবুদ-আরোহণে রৌদ্রবিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুদ্রদেবের বাহন বুধরাশি হইল। ককুৎস সূর্য্য নারায়ণের বাহন মতান্ উক্ষা হইল। তাই সূর্য্যাব শীঘ্র শ্রীরামচন্দ্রকে “কাকুৎসং ককণাময়ং” বলিয়া পণাম করিতে হয়।

তিনি দেখিলেন—আদিম কালের আদিত্য-পথ (ছায়া-পথ) ভেদ করিয়া উদিত সূর্য্য নারায়ণ নিশার অন্ধকার বিনাশ করিলেন। ছায়া-পথ ফটক শুভ্র আকৃতি; ইতিহে নারায়ণ নৃসিংহ আদিত্য-পথ ফটকশুভ্র এবং নিশা তিরণ্যকশিশু (নক্ষত্র যাহার বঙ্গ) নাম ধারণ করিলেন।

বনবাসী কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে দেখিলেন—অমৃতশ্রাবী চান্দ্র বিড়ালের পৃষ্ঠে ষট্‌কৃত্তিকা নক্ষত্র “শিশুনাগ পালয়িত্রী” ষষ্টি (ষট্‌মাতৃকা) রূপে আসীন আছেন। বিড়াল ষষ্টির বাহন হইল। প্রাতঃসূর্য্য ব্রহ্মা নামে সৌর হংসে আসীন থাকেন। হংস

ব্রহ্মার বাহন হইল। মধ্যাহ্নসূর্য্য জগৎব্যাপী বিষ্ণু। সূর্য্য-নারায়ণ মধ্যাহ্নে সৌর গরুড়ের পৃষ্ঠে অসীন থাকেন। গরুড় নারায়ণের বাহন হইল। সায়াক্ষ-সূর্য্য তেজ সঙ্কোচ করিয়া “যম” নাম গ্রহণ করেন।

স্বমেক্ষ বনবাসী দেখিলেন ; ‘যম’ দেব ছয় মাসের পর তারা বৃশ্চিকের কবলে পতিত হইলে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইতে থাকেন, কালাস্তক বৃশ্চিক সর্প—‘যম’ ‘মহা-কাল’ রুদ্রদেবের অঙ্গভূষণ হইল। এবং সৌর মহিষ ‘যম’ দেবের বাহন হইল। এই রূপে সৌর হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিত, সৌর গরুড় পৃষ্ঠে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত, সৌর মহিষ পৃষ্ঠে রুদ্র যম প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এক তিন, তিনে এক। এই হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি—স্বরূপঃ তমঃ গুণে ভূষিত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা। পাশ্চাত্যের ত্রিনিতি—ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্রভূত (যম) এই হইল ত্রিনিতি (Trinity)। কাজের বেলা মিলে নাই। ময়না পড়ে বেশ কিন্তু বুঝে না। ঈশাকাল রুদ্রদেব নারীবোশে মহাকালী হইলেন। জংঘায় বৃশ্চিক ভূষণ হইলেন। এবার মূর্ত্তিমান রুদ্রদেব বাহন। পদ-দলনে মৃত্যুঞ্জয় মরিবার নহে। “কালীর চেলা” (গ্রীক-চেলাই) হিন্দুর অবধ্য। সন্ন্যাসীর চেলা কি বস্তু !

বনবাসী জানিতেন যে বৃশ্চিক সর্পের কবলে ষ্টিপড়িলে সূর্য্যের তেজ অপহৃত হয়। তিনি এক দিন দেখেন দিনে দুপুরে অন্ধকার উপস্থিত, সূর্য্য অন্তঃ। তিনি তখনই স্থির করিলেন বৃশ্চিক সর্প অলঙ্কিত ভাবে আসিয়া সূর্য্য গ্রাস করিয়াছে। বৃশ্চিক সর্প লুক্কায়িত

(রহসি-স্থিত) বলিয়া “রাহু” নাম পাইল, আবার গ্রহণকালে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় ছটা (Corona) বাহির হয়। বনবাসী মনে করিলেন বিমানস্থ কোন ভানুর ছটা হইবে। জ্যোতির্ম্ময় ভানু সূর্য্যের তেজ হরণ করিল। যথা—সূর্য্যের উদয়ে গগনের তারা অদৃশ্যভাবে থাকে। তাই অমর সিংহ বলেন—“তমস্ত রাহুঃ ‘স্বর্ভাহুঃ’।” চিন্তাশীল পাঠক বুদ্ধিবেন—পদার্থ তিনটি পৃথক্, কিন্তু তাহাদের ব্যবসা এক। তাই অভিধানে তুল্যমূল্য হইয়াছে। একটা শব্দ অপর শব্দদ্বয়ের প্রতি-শব্দ হইতে পারে না। তমঃ=স্বর্ভাহুঃ? বনবাসীর হৃদয় নিশার সহচর হৃতুমের স্বরে কম্পিত হইত। ফলিত জ্যোতিষের আশী-র্কাদে হিন্দুর হৃদয় ফের বনবাসে গিয়াছে। টিক্‌টিকার ডাকে রক্ষা নেই। তা ত হৃতুম। তার নাম গুলিলেই “অগ্নি কীপিয়া উঠে ধাক্কা দিয়ে থাকিয়ে।” এ সব অপূর্ব্ব মহাশয়ের পরিচয়। কিন্তু হিন্দু মনে করেন না যে মূষিক তক্ষণের গুলে ঐ হৃতুম মা লক্ষ্মীর বাহন হইয়াছে। গৃহে আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা করা হিন্দুর হিতজনক। মূষিক ঝড় গুণা-পড়া করিতে বেশ দৈবজ্ঞ। ভাবী ঝড়ের পূর্বে জাহাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মূষিক-দল জাহাজ হইতে লাফাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের জলে পড়ে এবং সাঁতার দিয়া কিনারা লয়। জাহাজের বিলাতী কাণ্ডারী ঠেকে শিথিয়াছেন যে, মূষিক চম্পট দিলে জাহাজ ভাঙাইতে নাই। সেই মূষিক মনোজব বৃহস্পতির বাহন। বেদে “অং গগনানাং গণ-পতিঃ” বলায় দেবগুরু বৃহস্পতি গণেশ নামে সকলের আগে পূজা লইতেছেন। আবার

দিক্‌হস্তিগণ পৃথিবীতে জল ঢালে। আবার “বারিপূর্ণাং মহীং কৃতা পশ্চাৎ সঞ্চরতে গুরুঃ।” সঙ্কেত-তত্ত্বে হাতী বৃহস্পতির প্রতিকৃতি। তাই বলে “গণেশং পেটউগরং হাতীগুড়ং” নমোহস্ত তে।

পুরাণের আকাশগঙ্গা বেদের (আকাশ) সরস্বতী ছিলেন, কারণ উভয়েই ছায়াপথে অধিষ্ঠিত।

ছায়াপথ-তলে মকর রাশি অধিষ্ঠিত আছে এবং তাহার উত্তরে তারাংস ও পার্শ্বে বীণা-মণ্ডল (Lyra) অবস্থিত আছে। তাই আকাশ-গঙ্গাকে ধ্যান করি :—

‘সিতমকরনিষগ্নাং’

আর সরস্বতীকে নমস্কার করি—‘বীণারঞ্জিত পুস্তক-হস্তে।’ তারা-হংস আকাশ-গঙ্গার দূত। ভীষ্মদেবের নিকটে সংবাদ লইতে গিয়া-ছিলেন। আবার তারাংস সরস্বতীর বাহন।

দেবরাজ ইন্দ্র “বৃহৎ রথং” আরোহণ করেন।

“যত্র রথশ্চ বৃহতঃ বিধানম্” (ঋক্) সর্প নহষরাজ শচীলাভের হ্রাশাস্ত্র ব্রহ্মবিগণ-বাহিত “শিবিকা” আরোহণ করিলেন। এই “বৃহৎ রথ” বা “শিবিকা” সপ্তর্ষিগণ গঠন করেন। বেবিলন নগরে এই বৃহৎ রথ “মার্গিডা” নাম পাইয়াছিল। তর্জামা-রাজ যুরোপে সপ্তর্ষি-মণ্ডল Long Chariot নাম পাইয়াছে। কেহই মার্গিডা বা Long Chariot কাহার সে খবর রাখেন না। ইন্দ্রের বৃহৎরথ বা শিবিকা সামান্য বস্তু নহে। হৃদিনের জন্ত স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়া, ইন্দ্রের বৃহৎরথে নহষরাজ উঠিলেন। অগস্ত্যের

শাপে পরমব্যোম হইতে নহষ ‘পপাত ধরণী-তলে’। তবে মণিপুরের রাজবংশ অত্মাপি এই স্বর্গরাজকে নিত্য দুধকলা দিয়া পূজা করিতেছেন। এবং চীনসম্রাট এই সর্প-রাজকে রাজপতাকায় উড়াইতেছেন।

ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ঋষিরেখা কত্য়া রাশিতে ছিল। তখন তারা কত্য়া রাশি-চক্রের শীর্ষ স্থান অধিকার করিত। সিংহ রাশি কত্য়ার তলদেশে ছিল। প্রকাণ্ড জল-সর্প (Hydra) তারা কত্য়ার কর (হস্তা-নক্ষত্র) শোভিত করে।

সিংহবাহিনী তারা কত্য়া রণরঙ্গিনী মূর্তি ও সৌম্যমূর্তি এই উভয় মূর্তিতে পূজিত। তারা সর্প একের করে এবং অস্ত্রের স্বক্রে বিরাজিত। পাঠক বুঝিয়া লইবেন। তারা কত্য়ার মাথার উপর ভূতেশ মণ্ডলে (Bootes) রুদ্রদেব বসিয়া আছেন।

বনবাসী দেখিতেন যে সর্প ও ব্যাঘ্র জীবের বিনাশক। তাই তিনি মহাকাল রুদ্রদেবের দেহ “ব্যাঘ্রকৃন্তিবসানং” এবং সর্পশোভিত করিলেন। তারা ব্যাঘ্র (Lupus) বৃশ্চিক সর্পের তলে বসিয়া আছে। “সেই বৃড় বলদ আছে পুঁজি” বৃড় বলদ ছাড়িবে না। কাজেই ব্যাঘ্র বাহন হইতে পারিল না। ব্যাঘ্রচন্দ্র বসন হইল। স্মমেক্ষিত বনবাসী দেখিলেন যে ছয়মাস স্থায়ী নিশার অবসানে রৌদ্রহীন বাল-সূর্য্য বলির (Orion the Giant) শিরোনদেশে উদিত হইতেছেন। ঘটনাটি দুই হাজার বর্ষের পূর্বেকার। বাল-সূর্য্য উঠিয়াও উঠে না। আগুন খেয়ালে বসিয়া থাকিল। বনবাসী Parallanএর অধ্যায় ত পড়েন নাই, কাজেই অবাক হইলেন। তিনি দেখিলেন

বলির দ্বারে (Equinox) হরি বন্ধ হইলেন।
ক্রমে হরি-সূর্য্য বলির মস্তকোপরে উঠিয়া সৌম্য
ধ্রুব হইতে যাম্য ধ্রুব পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার
করিয়া বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বনবাসী
“নমস্তে বামন!” বলিয়া সাষ্টাঙ্গে বাল-
সূর্য্যকে প্রণিপাত করিলেন। বলি বামনের
বাহন হইলেন এবং “বলির দ্বারে বামন বন্ধ”
প্রবাদ রটিল।

ভক্তিশূণ্ড সফোক্লিস্ দেখিলেন অন্ধ বলি
বামন স্বক্ষে লইয়া পথ দোঁধিতে পাইলেন।
গ্রীসদেশ হইতে ইয়ুরোপে “Dwarf on the
Giant” প্রবাদ ভাসিল। বনবাসী দেখিলেন
যে কালপুরুষ-মণ্ডলে (Orion) স্কন্দর ময়ূর-
পৃষ্ঠে স্কন্দদেব বসিয়া আছেন। স্কন্দদেবের
শিরোদেশে তারা কুকুট অবস্থিত রাখিয়াছে।
ময়ূর ও কুকুট উভয়েই রণদুন্দ, উভয়েই
পরম রূপগান্। স্কন্দদেব চীন হইতে পেরু
পর্য্যন্ত রণবীর কুমার খ্যাতি পাইলেন। যোদ্ধা-
তারা (Bellatrix) তাহার সাক্ষী। গ্রীসদেশে
কুমার Kanda-on [=the Prince] খ্যাতি
পাইলেন। Scandinavia তাহার রাজ্য
হইল। আবার নারীবিশেষ কুমারী ময়ূর-পৃষ্ঠে
উঠিতে রাজি কি না সন্দেহ। তাই পড়ি—
“ময়ূরকুকুটবৃত্তে মহাশক্তিধরেহনবে।

কৌমারীরূপসংগে চ নারায়ণি! নমোহস্ততে॥”

(চণ্ডী)

গ্রীসদেশে কুমার (Orion) “Cock’s
fort উপাধিমাত্র পাইয়াছিলেন। ময়ূর বুঝি
গ্রীসদেশে নাই?

ভারাত্তবক মধুচক্র (Bee-hive)-
মাক্রাজ্ঞে পুষ্যা নক্ষত্র। পুষ্যরথে হরি উঠিলেই
বর্ষা আরম্ভ হইত এবং নববর্ষের আগমন

হইত। রথযাত্রার দিনে হরির বাহন পুষ্যা
রথ, গরুড় নহে। অয়নান্তের গতির ফলে
উত্তর-অয়নান্ত বিন্দু (Summer Solstice)
কর্কট-রাশি পুষ্যা-নক্ষত্র ছাড়িয়া মিথুনরাশি
অর্জুনক্ষত্রে আসিয়াছে। রথযাত্রার দিনে
গোল বাধিল। সূচতুর মন্ত্রজীবী ঠিকিবার নহে।
“আষাঢ় সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যা-সংযুতা”,
বচনের বলে হরির রথ আরোহণ চলিত
হইল। “মধু অভাবে গুড়ং দত্তাং” বচনের
নজীরে মিথুন-রাশি হরি রথে উঠিলেন
এবং রাশিচক্র পরিভ্রমণ উল্টা রথে দেখাই-
লেন। দুঃখ এইমাত্র যে দক্ষিণ-অয়নগামী
হরির রথ দক্ষিণে যাইবে। উত্তর অয়ন-
গামী হরির রথ উত্তর-অভিমুখে চলিবে।
মূল অভিনয় কেহ দেখেও না—বুকেও না।
যিনি উপদেশ দিবেন তিনি দক্ষিণা গাঁটে
বাঁধিয়া প্রস্থান করেন। হাটুরেরা যে দিকে
গাস্তা পায় সেই দিকে রথ টানে আর রথে
গোল বাধায়। হরির কি বিড়ম্বনা দেখ।

বর্ষারম্ভে রুদ্র সূর্য্য মহান্ স্বা নক্ষত্রে
(Dog Star) উপনীত হইয়া থাকেন।
তখন যুরোপে “কুকুর দিন” (Dog days)
উপস্থিত হয়। ভারতে রুদ্রদেব বলদ ছাড়িয়া
কুকুরের পৃষ্ঠে চড়েন। তাহার নাম হইল
“শাশ্ব”। সেকালে হরি-সূর্য্য পুষ্যানক্ষত্রে
উঠিলে তৎপরদিন তিনি তারা-জলসর্পের
(Hydra) পৃষ্ঠে ভর করিতেন। হরির
শয়ন আরম্ভ হইত। জলসর্প কর্কট হইতে
রশ্মিক পর্য্যন্ত লম্বান রহিয়াছে। তারা চিত্র
দেখ, সত্য কি মিথ্যা।

জলসর্প অনন্তসর্প নাম ধারণ করিয়া
সূর্য্য-হরিকে রশ্মিক রাশিতে লইয়া হাজির
করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে উত্থান একাদশীর

দিনে হরির দক্ষিণ অয়নজাত নিদ্রার অবসান হইল। সম্মুখে গরুড় (Aquila) উপস্থিত। অনন্ত স্পর্শে বিদায় দিয়া হরি-তারার গরুড়-পৃষ্ঠে উঠিলেন। সমুদ্র-শয্যা পরিত্যক্ত হইল। যুরোপের কুকুর দিন ভারতের অশু-বাচি (বর্ষাবক্তা)। অশুবাচি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত হরি সূর্য্যের নিদ্রাকালে সূর্য্য-অগ্নিকে সচেতন করিতে নাই। তাই সূর্য্য-পক্ষ অন্ন ও ফল-মূল আহায়ে মাস্তাজী ব্রাহ্মণ দক্ষিণ অয়ন অতি-বাহিত করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মাছের ঝোল ব্যবস্থা। তবে হিন্দু বিদবা অশু-বাচি পালনে ও চাতুর্মাস্ত্র ব্রত ধারণে দক্ষিণ অয়ন যাপন করেন বলিয়* বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানী চলিতেছে।

কামায়ি ছাগে প্রবল। তাই অগ্নিব্রহ্মের বাহন ছাগ এবং ব্রহ্মমণ্ডলের (Auriga) প্রধান তারার নাম অজ (Capilla)।

অজ (গ্রীক Aiz) ইত্যাদি। যুরোপ বলেন অজ তারার এখানে কেন? ঋতুদেব পবন-মুক্তিতে ভূতেশমণ্ডলস্থ স্বাতি (স্ব-অতি) নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত।

“রোহিত” তারায় স্বাতি নক্ষত্র গতিত হইয়াছে। বেদমতে রোহিত (মৃগবিশেষ), মরুৎগণের ‘পৃষতী’ রথ বহন করে। * রোহিত (Areturus) মৃগ পবনের বাহন হইল। তাই দেখি মনোজব হরিণ মনোজব পবনের বাহন হইয়াছে। পবন দেব রক্তবর্ণ, রোহিত তারারও রক্ত বর্ণ।

তাই বলি

রূপে গুণে তুল্য যেই।

দেবের বাহন ভূষণ সেই॥

যশ দেবশ্রু যদ্রূপং

তথা ভূষণ বাহনম্।

এ বচন কাণা করিব?

তারাদর্শক।

উৎপত্তি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভ্যাগতের পূজা

পথে চলিতে চলিতে সঙ্গীয় ভ্রাতাটিকে প্রণীত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“তোমাকে কি আর কোন দিন দেখিয়াছি?”

“আর এক দিন দেখিয়াছিলেন।”

“তোমার নাম বাহক?”

“হাঁ। একদিন সন্ধ্যা বেলায় ঝড়বৃষ্টির

মধ্যে আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন।”

“তোমার কতী কেমন আছেন? সেদিন নিরাপদে ঘরে পৌছিয়াছিলেন।”

*.....পৃষতীরথে

পাক্ষিঃ বহতি রোহিতঃ।

(ঋক্)

“আমাদের আর কোন বিপদ হয় নাই।
কর্ত্তী ভালই আছেন।”

“তোমরা সেদিন কোথা হইতে আসিতে-
ছিলে?”

“ঠাকুরাণী কোন প্রয়োজনে পাটলী গ্রামে
গিয়াছিলেন।”

প্রমীত দেখিলেন বাহক অধিক কথা
কহিতে চায় না। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া
তাহার কর্ত্তার কোন পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা
নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাকে আর কিছু
জিজ্ঞাসা করাও তিনি সঙ্গত মনে করিলেন
না। বাহক নীরবে পথ দেখাইয়া চলিল।

নগরের যে অংশ দিয়া প্রমীত বাইতে-
ছিলেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরই
বাস। পথের উভয়পার্শ্বে সুশোভন অট্টালিকার
সারি। মধো মধো ফলের বাগান, ফলেব
বাগান। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। গৃহে গৃহে
গৃহ-বিগ্রহের আরতি, শাকাস্তি আরম্ভ হইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা-নিম্নাদে পল্লী মুখরিত হইল। ধূপ-
ধূনা-গুগ্গল-গন্ধে সন্ধ্যার সুখদ মৃদুবাযু
স্বরভিত্তি হইয়া উঠিল। রাজপথে আলো ছিল
না, কিন্তু উভয় পার্শ্বের পুরী প্রবেশ-পথে এবং
মুক্তবাতায়ন-পথে গৃহমধ্যস্থ দীপরাশি রাজপথে
পড়িয়াছিল, সুতরাং পথ নিতান্ত অন্ধকারময়
ছিল না।

বসন্তকাল; শীত নাই, গ্রীষ্মের আতিশয্যও
হয় নাই। রাজ-পথে লোকচলাচলের
অভাব নাই। পুষ্পমালাধারী, চন্দনচর্চিত-
দেহ সৌখীন যুবক, ব্যস্তসমস্ত ব্যবসায়ী,
ভিক্ষার্থী ধ্বংস আতুর, দ্যুতকারী, সন্তিক,
নট, বৈদিক, বৈণবিক, চঞ্চলা নগর-
শোভিনী, চকিতনেত্রী অভিসারিকা, ভারিক,

মালিক, বার্তাবহ—রাজপথে অনেক লোক
যাতায়াত করিতেছিল। অনেকে প্রমীত-
সেনকে দেখিয়া নমস্কার অভিবাদন করিল,
কিন্তু প্রমীত দ্রুতপদে চলিলেন। পরিচিত
কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাই তাহার
ইচ্ছা। পথের এক পার্শ্বে একটুকু জনতা হইয়া-
ছিল। একজন মালী নানাবিধ সুগন্ধি ফুল,
ফুলের মালা, মুকুট, বলয়, কুণ্ডল ইত্যাদি
বিক্রয় করিতেছিল। কয়েক জন লোক
তাহাকে বিক্রিয়া দাঁড়াইয়া ইচ্ছাক্রমে দ্রব্য
নির্বাচন করিতেছিল। প্রমীতসেন পাশ
দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু সোমদত্ত সেখানে
ছিলেন, তিনি প্রমীত এবং তৎসঙ্গত বাহককে
দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রমীত জানিতে
পারিলেন না। কিন্তু সোমদত্ত মালা-ক্রয়
পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ
করিলেন।

বাহক অবশেষে প্রমীতসেনের অপরিচিত
এক পল্লীতে একটা বৃহৎ বাটীর নিকট উপ-
স্থিত হইল। দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিল।
প্রহরীরা নমস্কার-অভিবাদন করিল।
আলোকিত প্রবেশ-পথ অতিক্রম করিয়াই
ফুলের উগ্গান, অদূরেই উচ্চ দ্বিতল গৃহ, গৃহের
কক্ষে কক্ষে দীপালোক। প্রমীত সিঁড়ির নিকট
পৌহিতেই ছই তিন জন পরিচারিকা প্রণাম
করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। প্রথম
কক্ষেই একটা প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া-
ছিলেন। তিনি প্রমীতসেনকে অভিবাদন
করিলেন, প্রমীতসেনও প্রৌঢ়াকে নমস্কার
করিলেন। প্রৌঢ়া বলিলেন;—

“আমাদের আজ কত সৌভাগ্য!
আপনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমা-

দিগকে চরিতার্থ করিলেন। আমার কন্ডাকে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আপনি আমাদিগকে চির-অমৃতগৃহীত করিয়াছেন। আমার কন্ডা আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। চঞ্চলা, ইহাকে লইয়া যা ।’

চঞ্চলা প্রমীতসেনকে লইয়া এক সুসজ্জিত দীর্ঘ-বারান্দা দিয়া চলিল। বাম পার্শ্বে কক্ষের পর কক্ষ, দক্ষিণ পার্শ্বে মন্দিরে আচ্ছাদিত প্রশস্ত অঙ্গন, তাহার অপর তিন দিকে দ্বিতল পর্য্যন্ত সারি সারি আলোকিত কক্ষ। এই ‘উপকৃত্য’ কে, কি নাম, কাহার কন্ডা, কাহার স্ত্রী?—প্রমীত কিছুই জানেন না। কিন্তু সেই পুরীর বিশালত্ব এবং সজ্জিত মূল্য-বান দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, ‘উপকৃত্য’ যিনিই হউন, তিনি প্রভূত-সম্পত্তিশালিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই ছদ্মদিন অন্ধকারে অম্পট-আলোকদৃষ্টা, বাক্চতুরা, আলুলায়িতকুন্তলা অপূর্বসুন্দরী তরুণীর মূর্তি বারবার তাঁহার স্মৃতিপটে উদ্ভিত হইতে লাগিল। আজ তাঁহারই গৃহে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে। প্রমীতসেনের চিত্ত কোত্ৰহলে উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

চঞ্চলা পরিশেষে একটী কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রমীতসেনকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল :—

“আমার কন্ডা এই কক্ষে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

প্রমীত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহাসুগন্ধি তৈলপূর্ণ প্রদীপে প্রদীপে সমগ্র কক্ষ আলোকিত। একটী সুন্দরী যুবতী মুছপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অতি বিনীত নমস্কার করিল। সমীপস্থা অপরিচিতা সুন্দরী

যুবতীর প্রতি স্বচ্ছন্দ দৃষ্টিক্ষেপ অসম্ভব। নিমেষমাত্র প্রথম দৃষ্টিতে প্রমীত বাহা দেখিলেন তাহাতেই তিনি অতি বিস্মিত হইলেন, ক্ষণকাল নীরব স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইনি সেই নগর-প্রবেশ-পথের আকুল-কুন্তলা ‘উপকৃত্য’ই বটেন! কিন্তু আরও কোথায় যেন ইহাকে দেখিয়াছি! কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই, তাঁহাকেই পথমে কথা কহিতে হইল।

“আপনি আমাকে পত্র পাঠাইয়া ছিলেন?”

মস্তক নত করিয়া রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন ;—

“অধিনীত এই ঠঃসাহসের কাজ করিয়াছে ”

রমণীর বিনীত নির্দেশে কক্ষ মধ্যে অনতি-উচ্চ বিস্তৃত পালঙ্কে সুশোভন আসনে প্রমীত উপবেশন করিলেন। আসনের চারিপার্শ্বে, কক্ষের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিপদার উপর থালে থালে সুগন্ধি ফুল, ফুলদানে ফুলের স্তবক। শ্বেতরক্তনীলপীত নানাবর্ণের মূল্য-বান প্রস্তরে গ্রথিত চিত্রিতবৎ অতি সুন্দর ফুল-ফল-তরুলতার ছবিতে কক্ষের দেয়াল ও মেঝে সুশোভিত। একপাশে অতিপুরু সুব-স্পর্শ কয়লাসন, তাহার উপর ধৌত পটুবস্ত্রের আচ্ছাদন। কক্ষের সমস্ত তৈজসপত্র মূল্যবান এবং সুদৃশ্য। গৃহের বৈভব-শ্রী দেখিয়া প্রমীত অতি বিস্মিত হইলেন।

রমণী নিকটেই দেয়ালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—

“আমার প্রার্থনা, আমাকে ‘আপনি’ বলিবেন না।”

“আমাকে ‘আপনি’ বলিতেছেন, আমি কেন বলিব না ?”

“আমি তহপয়ুষ্ক লোক নহি। আপনি আমার কোন পরিচয় পান নাই। আমি—”

“আপনাকে কি কাল বসন্তোৎসবে দেখিয়াছি ?”

“অসম্ভব নহে ; উৎসবে আমি গীত গাহিয়াছিলাম।”

ইনিই সেই মঞ্জুলা ! বেশভূষার সে উৎসবোচিত পারিপাট্য নাই, মণি-মাণিকা-পচিত সে গলঙ্কার-সমাবেশ নাই। কিন্তু গৌরদেহেব কি অপূর্ণ লাভণা-ছটা ! শ্বেতকুম্ম-মালাবিজড়িত দীর্ঘ কেশরাশির কি তরঙ্গায়িত লীলা ! বিদ্যাদর্ভ স্থির আরক্ত চক্ষুর কি বিনয় মধুর দৃষ্টি ! প্রমত্তমেন আর সময় পাইলেন না, বলিলেন ;—

“আপনি—আপনার—”

“আমি অতি সামান্ত স্ত্রীলোক।”

“আপনার—”

মঞ্জুলা অতি বিনীত স্বরে বলিল ;—

“আমাকে ‘আপনি’ বলিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।”

“আমার বন্ধু অসঙ্গ সেন মহাশয় আপনার পরিচয়—”

“আমার প্রার্থনা !”

“তাহাই হউক।—তোমার পরিচয়, গুণ-কাহিনী আমাকে বলিয়াছেন। আপনি প্রসিদ্ধ বিদুষী এবং গুণবতী। আমার ভূঁয়গ্য, আমি ইতিপূর্বে কোন দিন আপনার—তোমার গৃহে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার সুখের অধিকারী হই নাই। সে দিন মাহুষের অবশ্রুতকর্তব্য অতি সামান্ত কাজ

করিয়া যদি তোমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া থাকি, তবে আমি বড়ই ভাগ্যবান।”

“সে দিন আপনি উপস্থিত না হইলে আমার যে কি চূর্ণদর্শা হইত, তাহা মনে করিতে ভয় হয়, আপনি চিরকালের জ্ঞাত আমাকে ক্ষমী করিয়াছেন। সে দিন আমি নিজ পরিচয় দিতে সাহস পাই নাই, আমার সে অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।”

“অপরিচিত পথিকের নিকট যাদুপ্রকাশ না করিলে কি কোন রমণীর অপরাধ হয় ?”

“আমাকে হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। এতদিন আমি কোন সুযোগ পাই নাই। তাহার পর রাজাধিরাজের যুগ্ম-যাত্রার দিন ভিক্ষু উপগুপ্তের কৃত অপরাধের জ্ঞাত নগরপাল আপনাকেও বন্দী করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত নগরবাসী আপনার বিপদে অতি দুঃখিত হইয়াছিল। আপনার স্নেহকৃতি বলে আপনি রক্ষা পাইয়াছেন।”

“আমি যে ক্ষেমন করিয়া কাহার অনুরোধে অব্যাহতি পাইয়াছি, তাহা এখনো জানিতে পারি নাই। ধর্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়, তিনি আমাকে সর্কদা অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক অনুরোধে, অনেকের অনুরোধেও প্রথম দিন তিনি আমাকে মুক্তি দেন নাই। তৃতীয় দিন কেন যে হঠাৎ আমার মুক্তিরূপ হইল, আমি তাহা এখনো জানিতে পারি নাই।”

“আপনি নিরপরাধী, ধর্মপাল মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় শেষে আপনাকে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার মুক্তিতে আমরা কত অনন্দিত হইয়াছি !—অজ্ঞ কোন উপায় না দেখিয়া শেষে আজ অতি সাহসে

পত্র পাঠাইয়াছিলাম। আমার সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।”

“ধৃষ্টতা!—তোমার মত গুণবতীর সদয় অনুগ্রহ। আমারও এক প্রার্থনা আছে। এতদিন পর্য্যন্ত আমি যে পরমসুখে বঞ্চিত ছিলাম, আজ হইতে যেন তাহার অধিকারী হইতে পারি। তোমার গৃহে অনেক ডানী এবং সুখী লোকের সমাগম হইয়া থাকে। আমার মত অকিঞ্চিৎকর লোককেও তুমি তোমার গৃহে সময় সময় আসিবার অনুমতি দিয়া আমাকে আনন্দিত করিবে?”

“আপনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন, আমার সকল কথা শুনিয়াছেন?”

“শুনিয়াছি।”

“কেহ কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, আপনিও কি ভবিষ্যতে আসিবেন?”

“আসিবার অনুমতি পাইলে পরম সুখী হইব।”

“এ গৃহের দ্বার আপনার নিকট সর্বদা উন্মুক্ত থাকিবে, যখন আপনার ইচ্ছা হইবে, আসিলে আমি নিজেই অতি সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিব।”

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;—

“দেখিতেছি, সে দিনের সেই ঝড়বৃষ্টি-হুগ্যোগেই আমার এই সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল।”

“সৌভাগ্য ত আমার!”

“উৎসবে তোমাকে দেখিয়া তুমিই যে সেই হুগ্যোগ-রাত্রির বিপন্ন রমণী, তাহা বুঝিতে পারি নাই।”

মঞ্জুলার মুখও স্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্রা এবং চঞ্চলা কক্ষের একপাশে—

দাঁড়াইয়া ছিল। মঞ্জুলার ইচ্ছিতে চঞ্চলা পাশের ঘর হইতে একখানি থালা লইয়া আসিল। থালাখানি ফুল, ফুলের মালা, অগুরু-চন্দন এবং গন্ধচূর্ণে পরিপূর্ণ। মঞ্জুলা সেই থালা প্রমীতের পদপ্রান্তে রাখিয়া যুক্ত করে বলিল :—

“আমার এই সামান্য পূজা গ্রহণ করুন।”

প্রমীতসেন তরুণীর বাক্যটুতায় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন— “আপনি—তুমি এই অকিঞ্চিৎকের সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছ।”

প্রমীতসেন সেই থালা হইতে চন্দন গ্রহণ করিলেন এবং একটা সুরতি মালা লইয়া তাহা মস্তক বেষ্টন করিয়া পরিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি হইল। প্রমীতের গৃহে ফিরিবার সময় হইয়াছে। মঞ্জুলার ইচ্ছিতে চঞ্চলা দ্বার একখানি থালা আনিয়া। থালার উপর সূক্ষ্ম ধৌত পদ্মের আচ্ছাদন, তাহার উপর অতি সূক্ষ্ম ফুল ফুলের মালা ও চন্দন-প্রক্ষেপ। চঞ্চলার হাত হইতে সেই থালা লইয়া মঞ্জুলা বলিল ;—

“সে রাত্রিতে আপনার গায়ের যে ওড়নি আমাকে দিয়া আমার লজ্জা রক্ষা করিয়া-ছিলেন, এই সেই থানি।”

আবরণ উন্মুক্ত করিয়া পুষ্পচন্দনসুরতি সেই ওড়নিসহ থালাখানি মঞ্জুলা প্রমীতের সম্মুখে স্থাপন করিল।

“একদিন ব্যবহার করিয়া আমি এই মহর্ঘ ওড়নির অবমাননা করিয়াছি, আপনি সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বাছক আজ ইহা আপনার গৃহে দিয়া আসিবে।”

“এই সামান্য বস্ত্র আপনার—তোমার

গাভ্রস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়াছে, আমি আর এ ওচনি ব্যবহার করিবার অধিকারী নই। এখানি আপনার গৃহেই থাকুক।”

“আমার গৃহে থাকিবে অনুমতি করিতে-
ছেন!—আমার গৃহে ইহা চিরদিন পূজিত
হইবে।”

মঞ্জুলা তখন অতিনমিত মস্তকে প্রমীতকে
নমস্কার করিল। তখন প্রমীত উঠিলেন।
অপরকক্ষে মঞ্জুলার মাতাকে নমস্কার অভি-
বাদন করিয়া প্রমীতসেন বিদায় হইলেন।
বাহক আলো জালিয়া তাঁহার পথপ্রদর্শক
হইয়া সঙ্গে চলিল।

প্রমীতসেন চলিয়া গেলে মঞ্জুলা পুনরায়
সেই দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিল। গবাক্ষের
নিকট দাড়াইয়া গ্রহচক্রতারকাখচিত নীলা-
কাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।
তাঁহার দৃষ্টি যেন কেমন উন্নত, মুখ যেন
কেমন উজ্জ্বলিত। মঞ্জুলা তারপর গৃহস্থ
উজ্জল দীপের নিকট দাড়াইয়া মুকুরে নিজের
মুখচ্ছবি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। মুকুর
রাখিয়া দিয়া পুষ্পদামে শ্লগ জড়িত সেই দীর্ঘ
কৃষ্ণকুণ্ডিত কুন্তলরাশি অংগের উপর দিয়া
বক্ষের দিকে আনিয়া হস্তদ্বারা যেন তাহার
মস্তক কোমলত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিল।
কেশরাশি পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আপনার
অঙ্গুলিদাম, প্রকোষ্ঠ, বাহু, অঙ্গ—সর্বত্র ভাগ
করিয়া দেখিল। শেষে নিঃসহ শরীরে
শয্যাগত হইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল,
“অত কথা বলিয়াছি, তিনি আমাকে মুখরা
মনে করিবেন।”

চঞ্চলা নীরবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল,
বিস্মিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল,—

“শুইয়া পড়িয়াছ! কেন, তোমার কোন
অমুখ হইয়াছে?”

মঞ্জুলা চমকিত হইল, বলিল,—

“না, কিছুই হয় নাই।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রক্ষা-কবচ

এই স্থানে আমরা পূর্ব কথা কিছু
বলিব। পাঠক মঞ্জুলা অথবা অলোকার
বিশেষ পরিচয় এতক কিছুই পান নাই।

অলোকা এক ধনাঢ্য ভদ্র পরিবারের
কন্যা। প্রথম বয়সেই তিনি বিধবা হন।
তাঁহার চরিত্রও মন্দ হইয়া যায়। ঋগুরকুল
পরিচর্যা করিয়া অলোকা তৎকাল-প্রসিদ্ধ
সম্রাট ধনীর রাজকুটুম্ব বিশাখদত্তের গৃহে
আসিয়া বাস করেন। এইখানেই তাঁহার
কন্যা মঞ্জুলার জন্ম হয়। বিশাখদত্ত বিপত্নীক
ছিলেন, মঞ্জুলাকে তিনি কন্যানিবিশেষে
লালন পালন করেন। বিশাখদত্তের মৃত্যু
হইলে অলোকা ও মঞ্জুলা অতুল ধনসম্পত্তির
অধিকারী হন। কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবক
কেহ ছিল না। বিশাখদত্তের পিতৃব্য-পুত্র
রাজা কারুবকী বালিকাকে কাছে আনিয়া
তাঁহার অপূর্ব রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হন এবং
প্রচুর রক্তসম্বন্ধে মেহার্দ্দ হইয়া তাঁহার রক্ষণ-
বেক্ষণ ও শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। মঞ্জুলা
জনকের গৃহে মাতার নিকটেই রহিল, কিন্তু
মহারাজার মেহ এবং অমুগ্রাহের পাত্রী বলিয়া
সংসারে তাঁহার কোন অভাব রহিল না। উপ-
যুক্ত গুরু নিকট বালিকা লেখাপড়া, নৃত্যগীত
এবং নানাবিধ ললিতকলায় সুশিক্ষিত হইতে

লাগিল। রাজ্যী সময় সময় মঞ্জুলাকে অস্থঃ-পূরে—ডাকাইয়া লইয়া তাহার শিক্ষা এবং বাবদারের পরীক্ষা করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলোকের চরিত্রও সংশোধিত হইয়াছিল। সেকালে আর একালে অনেক প্রভেদ। একালের রূপজীবিনীরা সমাজে যেরূপ হীন, সেকালে সর্বথা সেরূপ ছিল না। সেকালের কোন কোন নগর-শোভিনী উচ্চপদস্থ সন্তান্য ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া অটুট মানসন্ত্রমের সহিত 'দিন কাটা'ইতে পারিত। শিক্ষিতা এবং ধনসম্পন্ন হইলে সন্তান্য সম্প্রদায়েও তাহার মর্যাদা স্বীকৃত হইত। তাহার আমন্ত্রণে সমাজের অগ্রণীরাও তাহার গৃহে বাইতে সঙ্কচিত হইতেন না। এরূপ নগরশোভিনীরা গীতবাহ্য, নানাবিধ সুকুমার কলাবিজ্ঞা এবং বাক্চাতুর্য্যে ধনী মানী শিক্ষিত সমাজের চিত্ত বিনোদন করিত। অনেক সময় ইহাদের পুত্রকন্যা ভদ্রসমাজে বিবাহিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজভুক্ত হইত। অলোকাও কালে সমাজে এইরূপ মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

ঘোবনোদ্যমে মঞ্জুলা অসামান্য রূপবতী হইয়া উঠিল। তাহার পাণগ্রহণার্থীরা অভাব ছিল না। তাহার শিক্ষা, চরিত্র, বাবদার, রূপলাবণ্য, ধনসম্পত্তি অনেকের চিত্ত প্রলুব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু অভিভাবিকা রাজ্যী-তাহার বিবাহে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনার স্নেহ-পালিতা, রূপসী, ধনশালিনী মঞ্জুলার অরূপ বর মিলিয়া উঠিল না।

প্রমীতসেন বহু অসঙ্গের মূখে অলোকা এবং মঞ্জুলার অনেক কথা শুনিয়াছিলেন।

দে দিন বাড়ীতে পৌছিতে প্রমীতসেনের অনেক রাত্রি হইল। এদিকে উৎপলা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কি আশঙ্কা, কেন আশঙ্কা, উৎপলা তাহা বিচার করেন নাই, তথাপি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। রাত্রিকালে একা একা নগরপথে চলা যদিও সকল সময় নিরাপদ নহে, তথাপি চোর-দস্যু প্রভৃতি দ্বারা যে স্বামীর কোন বিপদ ঘটিতে পারে, উৎপলার সে বিশ্বাস ছিল না। নগরে তিনি সুপরিচিত, বশেষতঃ তিনি অপরিমিত শারীরিক বলশালী; ইহাও কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সাহস পাইবে না। সঙ্গে প্রলোভনের বস্তু কিছুই নাই, সুতরাং চোর-দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কম। পথ-ঘাটও তাঁহার অপরিচিত নহে। কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, সঙ্গী গ্রহরী অথবা বাহক কি অশ্ব সংগ্ৰহ তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। তবে এই জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী রজনীতে অপরিচিতা স্নন্দরী যুবতীর আমন্ত্রণ, একাকী গমন, স্বচ্ছন্দ আলাপের অবসর—মনে করিতে উৎপলার মুখ লজ্জা-খাভমানে রক্তিমাত হইল। না; সেরূপ কোন আশঙ্কা আসিতেই পারে না। স্বামীর প্রতি উৎপলার ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অসীম এবং অচল। কিন্তু মহার্ঘ মণিরত্ন অরক্ষিত অবস্থায় পথে ঘাটে ছড়াইয়া চোরদস্যুকে প্রলোভিত করা কি উচিত? অথবা প্রাণপ্রিয় আজীব্য অন্ত-রঙ্গ ব্যক্তিকে অপরিচিতা স্নন্দরী যুবতীর—ডাকিনী কি মায়াবিনী!—আহ্বানে একক পাঠাইয়া গভীর বিশ্বাস এবং অচলা শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে যাওয়াই কি সঙ্গত?—কি আশঙ্কা, কেনই বা আশঙ্কা, উৎপলা তাহার

বিচার করেন নাই, তথাপি তিনি বিষম উদ্ভিগ্না হইলেন। এত বিলম্ব কেন ?

বাড়ীতে পৌঁছিতে সে রাতিতে প্রমীত-সেনের অনেক বিলম্ব হইল। প্রমীত অশ্রু-পূরে পৌঁছিলে উৎপলা অশ্রুসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“কিগো, ঘর বাড়ী ভুলিয়া গিয়াছিলে না কি ?”

“তাই ত ! ঘর বাড়ী ভুলিয়া, কোন্ পথে, কোথায়, কাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম ?”

“বটে ?”—স্বামীর হাত ধরিয়া উৎপলা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

“‘উপকৃত’র সঙ্গে দেখা হইল ,”

“হইয়াছে।”

“কেমন লোক ?”

“অপূর্ব সুন্দরী।”

“তাহা ত অনেক দিন হইতেই জানি। কি নাম, কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী ?”

“শুনিলে ?”

উৎপলা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

“উপকৃত—মঞ্জুলা !”

মঞ্জুলা ! উৎপলা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

“মঞ্জুলা !—কেমন করিয়া জানিলে ?”

“দেখিয়াই চিনিলাম। বৃষ্টি-দ্রব্যোগের দিন ইহাকেই দেখি, গতকাল্য উৎসবে ইহাকেই দেখিয়াছি। ইনিই দেখানে গীত গাহিয়াছিলেন।”

উৎপলা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন;—

“তুমি কি জানিতে যে, মঞ্জুলাই ‘উপকৃত’ ?”

“আগে আর কেমন করিয়া জানিব ?—মঞ্জুলাকে উৎসবে দেখিয়াছি, মঞ্জুলাই যে সে দিনের সেই উপকৃত, তাহা ত আজ এই মাত্র জানিয়া আসিলাম।”

“মঞ্জুলা কে, কাহার কন্যা—তাহা শুনিয়াছ ?”

“শুনিয়াছি।”

“কাহার নিকট শুনিলে ?”

“অশ্রুস্রের নিকট শুনিয়াছি।”

“কি শুনিয়াছ ?”

প্রমীত তখন অশ্রুস্রের নিকট প্রাপ্ত মঞ্জুলার পরিচয়-সূচক অনেক কথা উৎপলাকে বলিলেন। শুনিয়া উৎপলার বিস্ময় বৃদ্ধি পাইল।

প্রমীত নিজ মন্তকে জড়ান সেই ফুলের মালা খুলিয়া তাহার লহর বিস্তার করিয়া অতি আদরে উৎপলার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। মহাশ্রুভি ফুলের মালা, কৌশলময় তাহার গাণনি। স্বামীর প্রণতোপহারে উৎপলার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উৎপলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“কোথায় পাইলে ?”

“মঞ্জুলার পূজোপহার।”

উৎপলার শরীর শিহরিয়া উঠিল। নগর-শোভিনীর ছন্দ প্রেমোপহার ! অথবা মন্ত্রসিদ্ধ গুপ্ত মোহনাজ্ঞ ? কিন্তু তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে সন্দেহ স্থান পাইল না। উৎপলা হাসিয়া বলিলেন ;—

“অমন সুন্দরী, অমন মিষ্ট গায়িকার পূজায় ত চিত্ত হারাইয়া এস নাই ?”

“এ চিত্ত হারাইবার ভয় নাই।—দিবা
রাত্রি সুরক্ষিত !”

“এমন নিতাজাগ্রত রক্ষাকবচ তোমার
কি আছে ?”

“তোমার পবিত্র মুখ ।”

প্রমীত জীর হর্ষ-প্রফুল্ল মুখ চূষন করিলেন ।

“—তোমার ফুরহুজ্জল চক্ষু !”

প্রমীত জীর সত্বনিমীলিত মূহ কম্পিত চক্ষু
চুষিত করিলেন ।

“—এ হৃদয়ে স্থির প্রতিষ্ঠিত প্রেমোজ্জল
তোমার মধুর মূর্তি !”

উৎপলা উরুসিত গাত্রে স্বামীর বাহ
বেষ্টন হইতে ছুটিয়া পলাইয়া কক্ষদ্বারের
নিকট গিয়া বলিলেন ;—

“মাধবী, মাধবী, আজ কি আনাদের
আহারাদি হইবে না ?”

সেদিন গভীর রাত্রিতে কি যেন স্বপ্ন
দেখিতে দেখিতে প্রমীত হঠাৎ বলিয়া
উঠিলেন ;—

“অপূর্ব সুন্দরী !”

পার্শ্বে শয়ানা উৎপলা সে শব্দে অন্ধ-
আগরিত হইয়া নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা
করিলেন ;—

“কি বলিতেছ ?”

প্রমীত নিদ্রিত !

উৎপলাও পুনরায় হৃষুপ্তি লাভ করিলেন ।
(ক্রমশ ।

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ ।

বৈদিক সাধনার আভাস

ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্য

১। তৎকালে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল
না ; রুহঃ অর্থাৎ পাতালাদি পৃথিবীস্তু লোক
সকল ছিল না, বোমোপরি বিস্তৃত যাহা
(অর্থাৎ ঢালোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত)
তাঁহাও ছিল না। কি আবরণ করিবে?
কোথায় ? কাহার স্মৃৎসংখ্যেতু ? গহন,
গভীর অন্তই কি ছিল ?

তাৎপর্য্য :—তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে
অসৎ ছিল না, কারণ জগতের মূলকারণ ছিল।
প্রলয়কালে জগতের মূলকারণ না থাকিলে,
পরে জগতের উৎপত্তি সম্ভবে না। সৎও
ছিল না, কারণ সঙ্গ্রহে অর্থাৎ পৃথক্‌সত্তাভাবে

জগতের অস্তিত্ব ছিল না। এইরূপে জগতের
সত্তা ও অসত্তা উভয়ই অস্বীকৃত হইল। সৎ
ও অসৎ, ভাব ও অভাব, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব,
ইহারা বিপরীত পদার্থ, ভেদমূলক। ইহাদের
একত্র অবস্থান পর্য্যন্ত সম্ভবে, যেমন—
যেখানে একের সত্তা, সেখানে অন্তের অসত্তা।
কিন্তু ইহাদের একত্র কিরূপে সম্ভবে ? একই
পদার্থের নিবৃত্ত সত্তা ও অসত্তা কিরূপে হইতে
পারে ? প্রলয়কালে হইতে পারে ; কারণ,
সদসদাশ্রয় ভেদ তখন ছিল না ; ভেদ না
থাকায় সত্তা বা অসত্তা বলিয়া কিছু ছিল না।
“অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না” বলিবার

ইহাই তাৎপর্য। সং ছিল না এই কথায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, পারমার্থিকসত্তা ব্রহ্মও ছিল না। দ্বিতীয় ঋকের “আনন্দবাতঃ স্বধরা তদেকঃ,” এই বাক্যদ্বারা এই আশঙ্কা নিরাকৃত হইতেছে। মায়ার পরিশেষ অর্থাৎ লয় হেতু তাহারই অন্তিস্থ “সং ছিল না” এই বাক্যদ্বারা সূচিত হইয়াছে। বলিতে পারি যে, ব্যবহারদশাতেও পরমার্থতঃ মায়ার অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা নাই, সুতরাং “তৎকালে” এই বিশেষণ অনর্থক হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যবহারদশায় পৃথিব্যাদি ব্যবহারিক সং পদার্থের অস্তিত্ব আছে। অতএব “সং ছিল না” এই নিষেধ পৃথিব্যাদির বর্তমানকালে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্ত ঋষি পুনরায় বলিয়াছেন যে, পৃথিব্যাদি চতুর্দশ ভূবনঃ ছিল না। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় মায়ার পারমার্থিকসত্তা না থাকিলেও, পৃথিব্যাদিরূপে ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু তৎকালে প্রলয়কালে, মায়ার পারমার্থিকসত্তা ব্যবহারিক সত্তা উভয় সত্তাই ছিল না। ভাল, ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ আকাশাদি কি ছিল? না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া থাকে (বিষ্ণুপুরাণ, ১, ২, ৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য)। ঋষি প্রশ্নচ্ছলে এই সকল আবরণকেও অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছেন। কি আবরণ করিবে? আবাস্য পদার্থ থাকিলে, তবেই তাহার আবরণ থাকিতে পারে? যেখানে আবাস্য ব্রহ্মাণ্ডই নাই, সেখানে আবরণ বিষয়াদি থাকিবে কিসের জন্ত? আবার, কোথায় আবরণ করিবে? কোন্ প্রদেশে অবস্থান করিয়া

আবরণ আবরণ করিবে? প্রলয়কালে আধারহৃত একপ কোন দেশও ছিল না। আবার, কাহার স্বধঃখ হেতু আবরণ করিবে? জীবগণের উপভোগার্থই সৃষ্টি। সৃষ্টি থাকিলেই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ থাকে। সৃষ্টি না থাকিলে ভোক্তা জীবসকল লয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কোন পদার্থের কেহ ভোক্তা থাকে না। এইরূপে আবরণের প্রয়োজনীয়তা লোপ পাইলে, আবরণ থাকে না। সংক্ষেপতঃ, ঋষি বলিলেন যে, প্রলয়কালে ভোগ্যপ্রপঞ্চ ও ভোক্তৃপ্রপঞ্চ—উভয়ই ছিল না। পুনশ্চ, আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তিস্থ সিদ্ধ হইলে, অন্ত অর্থাৎ জলেরও অন্তিস্থ সিদ্ধ হয়। তথাপি ঋষি পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, অন্তই কি ছিল? ইহার কারণ কি? যে প্রলয়ের কথা বলা হইতেছে, ইহা ছাড়া অপর আর একরূপ প্রলয় আছে। প্রতি কল্যাস্তে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া, এক কল্যাস্ত নিদ্রিত থাকেন। ব্রহ্মার এই নিদ্রাকালে ভূ, ভুব, স্ব এই তিনলোক দগ্ধ হইয়া একাধিব হইয়া যায়। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।৫।১; বিষ্ণুপুরাণ ১।৩.২০-২৩ দ্রষ্টব্য।) এই প্রলয়কে নিষিদ্ধ করিবার জন্তই উক্ত প্রশ্ন। বর্তমান সৃষ্টে ঋষি নির্দিষ্ট প্রলয় একরূপ আংশিক একাধিবী প্রলয় নহে। ইহাতে জলের অস্তিত্ব নাই।

২। সেই সময়ে মৃত্যু ছিল না, অমৃত অর্থাৎ অমরণও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রজ্ঞান ছিল না। স্বধার অর্থাৎ মায়ার সহিত এক সেই (ব্রহ্মাঃ স্ব) অবাত-প্রাণিত ছিল; তাহা হইতে অল্প পরকালীন কিছুই ছিল না।

তাৎপর্য :—প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া যে তাহার বিনাশক মৃত্যু ছিল, তাহা নহে ; আর মৃত্যু ছিল না বলিয়া যে অমরণ ছিল, তাহাও নহে। অর্থাৎ সেই ভেদরহিত অবস্থায় মৃত্যু ও অমৃত্যু—ভেদমূলক এই দুই বস্তুই ছিল না। সর্বজীবের পরিপক্ব কর্মসকলের যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেই সময়ে পরমেশ্বরের মনে জগৎ-সংহারের ইচ্ছা হয়। অনন্তর তিনিই মৃত্যুরূপে জগৎ সংহার করেন। অতএব প্রলয়কালে মৃত্যুরই বা স্থান কোথায় এবং তদভাবভূত-অমৃত্যুরই বা স্থান কোথায়? জীবের ভোগের জন্যই মৃত্যু ও অমরণরূপ পরিবর্তনের লীলা। ভোগ ফুরাইলে এই লীলাও ফুরায়। তখন রাত্রিও থাকে না, দিনও থাকে না, অর্থাৎ, অহোরাত্র, মাস, দিন, সংবৎসর প্রভৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট কাল থাকে না। কালের কোলে জীব ক্রীড়া করে। কালে সে সুখী হয়, কালে দুঃখী হয়, কালে জন্মে, কালে মরে। এইরূপে জীবের সুখদুঃখহেতু কালের প্রয়োজন ও অস্তিত্ব। পুনশ্চ, সূর্য ও চন্দ্রের উদয়ই কালের হেতু। প্রলয়ে এই সকল হেতুর অভাবে কালের অভাব হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি কাল ছিল না, তাহা হইলে “তৎকালে সং ছিল না” এই কাল নির্দেশ কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, উপচারহেতু অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা মায়াহেতু এই কালের নির্দেশ। মানুষ যখন কোন বিষয়ের নিষেধ করে, তখন কাল সেই নিষেধের অবচ্ছেদক হইলেও মায়ার ঐ অবচ্ছেদের হেতু।

মায়ার অধীন জীব মায়ারহিত অবস্থার যথাযথ নির্দেশ করিতে পারে না, এবং জৈব ভাষাও মায়াজনিত কালকে বাদ দিয়া ঐ অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য অবচ্ছেদকত্ব-রহিত অকাল-অবস্থাকেও কালবাচক শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিতে হয়। এইরূপে প্রলয়কালে আবরণসহ ব্রহ্মাণ্ড, মৃত্যু, অমৃত্যু ও কাল অর্থাৎ ভেদমূলক ও ভেদরূপী সমস্ত পদার্থই নিষিদ্ধ হইল। তাহা হইলে তৎকালে কি ছিল? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—সেই সকল বেদান্তপ্রসিদ্ধ এক ব্রহ্মতত্ত্ব ছিল। জীবের নিবট প্রাণই অস্তিত্বের নিদর্শন এবং প্রাণ বায়ুমূলক। ব্রহ্ম কি এইরূপ বায়ুমূলক প্রাণদ্বারা প্রাণিত ছিলেন? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—ব্রহ্মের অস্তিত্ব বায়ুর উপর নির্ভর করে না, তাহার প্রাণ আবাত অর্থাৎ বায়ুর অপেক্ষারহিত। যদি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই ছিল, তবে জগৎকারণ সম্বন্ধজন্তমো-গুণায়িতা মায়ার কোথায় গেল? (স্বধা=মায়ার। অশ্বিনু বীরতে প্রিয়তে আশ্রিতা বর্ততে ইতি স্বধা। নিজেতে ধারণ বা আশ্রয় করিয়া যে থাকে সেই স্বধা বা মায়ার বা প্রকৃতি।) মায়ার সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত এক হইয়া অনিভক্তরূপে ছিল। ঋষির এই বাক্য দ্বারা মায়ার বা প্রকৃতির সঙ্গত্ব অর্থাৎ পারমার্থিক নিবৃত্তিসত্তা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। বলিতে পার, মায়ার যদি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াছিল, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্তাকে আবাত-প্রাণিত বলিলে কিরূপে, এবং ব্রহ্মসত্তায় যখন মায়াসত্তা ছিল, তখন “সং ছিল না” এ কথাই বা বলিলে কিরূপে? এরূপ আশঙ্কা অমূলক ; কারণ, ব্রহ্ম ও মায়াকে ভিন্নরূপে দর্শন-হেতুই

অগ্নির দেবতা হইয়াছে, এককালে ইন্দ্র
কালিগে সারথীর ভিত্তি সত্তা থাকে না এবং
অগ্নিরই সত্তা প্রতিপাদিত হয়।

১। তমঃ ছিল, এই সর্ব (জগৎ) অগ্নি,
অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রলয়াবস্থায়, তমঃ
যারা আচ্ছাদিত হইয়া অনির্দেশরূপে লীন
হইয়াছিল। তমঃ তমঃ যারা বাহা সমাক্রমে
আচ্ছাদিত ও তাহার সহিত একীভূত ছিল,
তাহা ভগ্নের মাধ্যমে তারা উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য্য :—বহি প্রলয়কালে জগৎ না
ছিল, তাহা হইলে পরে তাহা আসিল
কিরূপে ? কারক না থাকিলে ক্রিয়া হয় না,
সুতরাং জগৎ জগতের জগৎক্রিয়ার কারক
অবশ্যই ছিল। পুনশ্চ, কারক কারণেব
রূপান্তর মাত্র। অতএব জগৎসৃষ্টির প্রাক্কালে
জগতের কারক বা কারণ থাকা অবশ্যস্বাভাবিক।
এইজন্ত ঋষি বলিতেছেন যে, সৃষ্টির প্রাক্
কালে তমঃ ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ ঐ
তমঃযারা আচ্ছাদিত হইয়া অপ্রকৃত বা
অনির্দেশ্য বা অনির্বাচ্যরূপে তাহাতে লীন
হইয়া ছিল। তমঃ অর্থে ভাবরূপ, অর্থাৎ
সংস্কাররূপ, অজ্ঞান, আত্মতত্ত্বের আবরণ
অপর দ্বারা বা অবিজ্ঞ। ইহাই জগতের
মূল কারণ, ইহার দ্বারা ই জগৎ গঠিত এবং
ইহাই জগৎ। প্রলয়কালে জগৎ নামরূপের
যারা বিলুপ্তি ছিল না। পরন্তু তৎকারণে
অজ্ঞান, তাহাতে তমঃ লীন হইয়া ছিল।
কখনো আর একস্থানে ক্রিয়া বুঝা আবশ্যিক।
বিত্তির কাকে বলা হইয়াছে যে প্রলয় কালে
এক অবিভীর্ণ ব্রহ্মরূপ ছিল, যারা সেই ব্রহ্ম
ভগ্নের সহিত অবিভীর্ণ ছিল, এবং প্রলয়
নাম জগৎ ছিল না। একবার ব্রহ্ম

হইয়াছে যে, যারা প্রলয়ে ভেদ উৎপন্ন হইলে,
পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি হয়। যারা প্রলয়ের
সৃষ্টিশক্তি। এই শক্তি কখন নিষ্ক্রিয় থাকে
তখন সৃষ্টি থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান
পরস্বার্থতঃ এক হইলেও, শক্তি যখন ক্রিয়াশীল
হয়, তখন উহাদের মধ্যে ব্যবহারভেদ
জন্মে। এইরূপে যারা বা সৃষ্টিশক্তি বা
প্রকৃতি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন ব্রহ্ম
হইতে ভিন্ন বলিয়া উহা ব্যবহারভেদে প্রতীক্
মান হয়। শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকে,
তখন শক্তিমান হইতে তাহার ব্যবহারিক
ভেদও থাকে না, কিন্তু সক্রিয় হইলে
শক্তিমানের দেহে ব্যবহারিক ভেদ উৎপন্ন
করে। এইরূপে শক্তিমানের দেহে যে
সকল ভেদমূলক ভাব জন্মে, তাহা শক্তিমান
হইতে পরস্বার্থতঃ ভিন্ন না হইলেও, ব্যবহারভেদে
ভিন্ন বোধ হয় ; যেমন—সমুদ্র ও বীচি। এই-
রূপে ভেদমূলক পদার্থের দুইটি সত্তা থাকে—
একটি পারমার্থিক, অপরটি ব্যবহারিক।
পারমার্থিক সত্তার উপাদান যেই শক্তিমান,
আর ব্যবহারিক সত্তার উপাদান শক্তি।
পরিদৃশ্যমান জগতের পারমার্থিক সত্তার উপা-
দান ব্রহ্ম ও ব্যবহারিক সত্তার উপাদান
মাত্রা বা প্রকৃতি। নামরূপাত্মক ভেদ উৎপন্ন
করিয়া মাত্রা বা প্রকৃতি জগৎকে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন বলিয়া দেখায়। পক্ষত্বাত্মক জগৎ
ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু ব্রহ্মস্বর্গীয়
এই যে পক্ষত্বরূপ ভেদাত্মক উপাদান ইহারি
উপাদান মাত্রা বা প্রকৃতি। এই ভেদাত্মক
উপাদান আবার প্রকৃতিরূপে ভগ্নের উপাদান
ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ভগ্ন আবির্ভাব
নাম জগৎ হইয়াছে। অপরদিকে ব্যবহারিক

ব্রহ্মস্বই রূপরূপ আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং মায়াই আবরণরূপে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ভূত ব্যবহারিক জগতের উপাদান। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন যে, প্রলয়কালে তমঃ অর্থাৎ আবরণতত্ত্ব ছিল এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহাতে লীন হইয়া ছিল। পুনশ্চ, ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখা, সংপদার্থকে অসং বলিয়া ধারণা করা, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানজ্ঞতা হয়। সুতরাং এই অবিজ্ঞাই জগতের মূল কারণ ও উপরোক্ত আবরণতত্ত্ব। মায়াক্রিয়াশীল হইয়া তাহার ভাবরূপ অবিজ্ঞাংশ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থের আবরণ হয় ও জগৎরূপ প্রকাশিত করে। মায় বা প্রকৃতির এই যে অবিজ্ঞারূপ, ইহাকে অপরা মায়ী বা অপরা প্রকৃতি বলে। মায়ী বা প্রকৃতির অস্ত্র রূপের নাম পরা মায়ী বা পরা প্রকৃতি। ইহা বিজ্ঞা বা জ্ঞান। ইহার দ্বারা জীবের জগৎরূপ ভ্রমের নাশ হয়, অবিজ্ঞা দৃষ্ট হয় ও তৎফলে জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। অবিজ্ঞা যেমন তমঃ বা আবরণতত্ত্ব, বিদ্যা তেমনি সত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্ব। এই বিদ্যা ও অবিদ্যার লীলাই জগৎ-লীলা। পরস্পর বিবর্তমান হইয়া এই দুই তত্ত্ব লীলা করে। অবিদ্যা বিদ্যাকে পরাক্রান্ত করিলে ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীয়মান হয় ও বিদ্যা অবিদ্যাকে পরাক্রান্ত করিলে, জগৎ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মকে জগৎরূপে উপলব্ধির নাম বন্ধন ও জগৎকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধির নাম মুক্তি। এইরূপে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে তমঃ বা অবিজ্ঞা বা আবরণতত্ত্ব জগতের ব্যবহারিক উপাদান ও জীবের বন্ধনবন্ধন। ঋষি ইহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন,

কারণ, ইহা ভ্রম উৎপাদন করে। বাহ্য ভ্রম উৎপাদন করে, তাহা কখনও মহৎ হইতে পারে না; কারণ, ভ্রমেব নাশ অবশ্যভাবী। অবিজ্ঞার তুলনার বিজ্ঞা মহৎ; কারণ, পরিণামে বিজ্ঞার দ্বারা অবিজ্ঞার পরাভব অনিবার্য। কিন্তু অবিজ্ঞা তুচ্ছ হইলেও উহা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সম্যকরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড এইরূপে তমঃ দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার সহিত একীভূত অবস্থার থাকে। একথা অগ্রেই বুঝাইয়াছি। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন যে, এই কারণের সহিত একীভূত জগৎ-কার্য্য সৃষ্টিকালে তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। মায়াক্রিয়াশীল হইলে, জগৎ সৃষ্ট হয়। তমোরূপ কারণাকারে পরিণত, তমঃ দ্বারা সর্বতোভাবে আবৃত জগৎ সত্ত্ব দ্বারা প্রকাশিত হইলে, তবে কার্য্যরূপে আবির্ভূত হয়। সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ করা—তমকে দৃষ্ট করা; এইজন্য ঋষি ইহাকে ‘তপঃ’ আখ্যা দিয়াছেন। অলপার্থক তপ্, ধাতুর উত্তর অস্, প্রত্যয় করিয়া তপস্, শব্দ হইয়াছে। বাহার দ্বারা অবিজ্ঞা বা তমঃ দৃষ্ট হয়, তাহাই তপঃ। ভৌতিক অন্ধকার নাশ করে বলিয়া সূর্যের নাম তপন। মানসিক অন্ধকার বা অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া সত্ত্বপ্রধান মানসিক ক্রিয়া বা পর্যালোচনার নাম তপঃ। তপঃ জ্ঞানময় (মুণ্ডকোপনিষৎ—১।১।৯), প্রকাশ-দ্বন্দ্বী সত্ত্বই জ্ঞান। অতএব তপঃ দ্বারা এখানে ক্রিয়াশীল সত্ত্বই উপলব্ধিত হইতেছে, বাহ্য আবৃত জগৎকে প্রকাশ করে। অতএব সত্ত্বকে এখানে ‘তপঃ’ আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টিকার্য্য সত্ত্বের পর্যা-

গোচনাক্রম ক্রিয়ানীল সম্ব দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই কথাই যুক্তোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; বলা,—"তপসা চোন্নতে ব্রহ্ম" (১১১৮) অর্থাৎ ব্রহ্ম তপঃ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টিসমুদ্ভূত হয়। তুচ্ছ ভবের তুলনায় ঋষি সক্রিয় সম্ব বা তপকে মহৎ বলিয়াছেন। এই মহৎ-হেতু দর্শনশাস্ত্রে সম্ব প্রধান বুদ্ধিতত্ত্বকে মহৎ নামে অভিহিত করা হয়।

৪। যেহেতু মনের সম্বন্ধী স্নেহ, অর্থাৎ ভাবী প্রপঞ্চের বীজ, প্রথমে ছিল, সেই হেতু অগ্নে, অর্থাৎ বিকারজাত সৃষ্টির প্রাগবস্থায়, (পরমেশ্বরের মনে) কাম, অর্থাৎ নিস্কাম, সজ্জাত হইয়াছিল। সতের, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের, বন্ধুকে অর্থাৎ হেতুভূত কর্ম-সতলকে, কবিগণ, অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন অতীত-নাগতবর্তমানাভিভ্রা বোগিগণ, হৃদয়ে বুদ্ধি-দ্বারা বিচার করিয়া অসতে, অর্থাৎ সবি-লক্ষণ অব্যাকৃত কারণে, নিষ্কর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ পৃথগ্‌রূপে, জানেন।

তাৎপর্য্যঃ—বুঝিলাম—তপ অর্থাৎ স্রষ্টব্য-পর্যালোচনা-রূপ সক্রিয় সম্বদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়, কিন্তু সম্ব জগৎসৃষ্টার্থ কি জন্ত সক্রিয় হয়? প্রলয়কালীন নিষ্ক্রিয় সম্বকে সৃষ্টির প্রারম্ভে কে সক্রিয় করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে কাম সজ্জাত হইয়াছিল। কাম অর্থে প্রবৃত্তি, প্রীতি রজোগুণের ক্রিয়া। এইরূপে মাদ্রাশক্তিতে তমোগুণ ও সম্বগুণ ভিন্ন রজোগুণ অলৌকিক হইল। ফলতঃ দ্বিতীয় ঋকে ঋষি প্রলয়কালে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত অতির মাদ্রাশক্তির অলৌকিক করিলেন; তৃতীয় ঋকে পরিদৃশ্যমান জগতের কারণভূত আবরণতত্ত্ব রজোগুণের ও

তমঃপরিপন্থী, প্রকাশধর্ম্মী, সৃষ্টিশক্তির হেতুভূত সম্বগুণের অলৌকিক করিলেন; এবং চতুর্থ ঋকে এই দুই গুণের প্রবর্তক রজোগুণের অলৌকিক করিলেন। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতিতত্ত্ব। অতঃপর পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে—কাম সজ্জাত হইল কেন? প্রলয়কালে রজোগুণ স্রষ্ট ছিল, তমোগুণদ্বারা গৃহ জগৎ তক্রপে লীন হইয়াছিল, সৃষ্টির প্রাক্কালে রজোগুণ কেন জাগরিত হইল, কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া সম্বকে ক্রিয়ানীল করিতে প্রবৃত্ত করিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—প্রলয়ের পূর্বকালীন সৃষ্টিবীজ প্রথমে প্রলয়কালেও ছিল বলিয়া প্রলয়ান্তে উহা রজোগুণকে জাগ্রত করে। দ্বিতীয় ঋকের তাৎপর্য্যে বলিয়াছি, সর্ব্বজীবের পরি-পক কর্মসকল বধন ভোগ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে না বলিয়া প্রলয় হয়। আলোচ্য ঋকে উক্ত হইতেছে যে, প্রলয়কালে জগতের বীজ থাকে। এই বীজ জীবের সঞ্চিত অপরিপক কর্ম। এই অপরিপক কর্ম পরিপক হইলে, তাহার ভোগার্থ জগতের প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রলয়ান্তে সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে—এই বীজ কাহার এবং কোথায় অবস্থান করে? উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, ইহা মনের, এবং মনে অবস্থান করে। প্রলয়-কালে মানস সংস্কাররূপে পরিণত এই বীজ বাসনা-শেষবহেতু মাদ্রায় দ্বিলীন সর্ব্বজীবাত্ম-করণে অবস্থান করে। তৎকালে জীবের জ্ঞান না থাকায় কাম বা বাসনা থাকে না, তুচ্ছরূপ কর্মসংস্কার স্রষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকে; কর্ম-সংস্কার নিষ্ক্রিয় থাকায় মনের কর্মবীজ কিছু

ধাক না, সুতরাং মন পরকামীন সৃষ্টির
 নিজস্বরূপ কর্তৃসংস্কারকলকে সংগ্রহ
 করিয়া মারার লীন হয়। পরে যখন কর্তৃ
 পরিপক হওয়ার সংস্কার জাগরিত হয়, মনে
 তখন বাগনা বা কামের উদ্রেক হয়—অর্থাৎ
 রজোগুণের ক্রিয়া হয়। অতঃপর রজোগুণ
 সক্রিয় হইয়া সবকে ক্রিয়াশীল করে। সমস্ত
 ক্রিয়াশীল হইয়া স্রষ্টব্যপর্য্যালোচনাদ্বারা জগৎ
 সৃষ্টি করে। এইরূপে আত্মার গুণাধারত্ব
 প্রত্যাখ্যাত ও নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রদর্শিত হইল।
 জীবের সক্রিয় কর্তৃ পরিপক হইলে, রক্ষ-
 ক্তব্দের মারাত্মকতা তাঁহারই বিধানানুসারে
 স্পন্দিত বা ক্রিয়াশীল হয়, প্রবুদ্ধ কর্তৃসংস্কার
 সকল মনস্তত্ত্বকে ক্ষোভিত করিয়া বাসনা বা
 কামের উদ্রেক করে এবং কাম উদ্রিক্ত হইলে
 অর্থাৎ ভোগের প্রয়োজন হইলে ভোগ্য জগৎ
 সৃষ্ট হয়। এই যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া ইহার
 বিধাতা সেই সকলবেদান্তবেদনা ব্রহ্মতত্ত্ব পর-
 মাত্মা যিনি এক অদ্বিতীয় চৈতন্তস্বরূপ।
 পরমেশ্বর-রূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্তময় পরমাত্মা
 জীবের কর্তৃকল প্রদান করেন এবং তদ্ব্য-
 জগৎ সৃষ্টি করেন। সাধারণ দেহী যেমন
 ইচ্ছামত নিজের দেহগত শক্তিসকলকে
 চালনা করে, সেইরূপ পরমেশ্বর মারাকে
 পরিচালন করিয়া জীবের ভুক্তি-মুক্তি বিধান
 করেন। জগৎ কর্তৃানুসারে মারার অধীন
 সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষম। মারা পরমে-
 শ্বরের অধীন, সুতরাং পরমেশ্বর সৃষ্টি-
 কার্য্যে অক্ষম। প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টির
 প্রয়োজন হয়, তখন এই সর্ব্বদাকী চৈতন্তময়
 পরমাত্মা নিজেকে স্রষ্টারূপে করণা করিয়া,
 মারাকে আত্মদেহে আবদ্ধ করিয়া, ভোগ্য-

প্রপক ও ভোগ্যলব্ধক সৃষ্টি করেন।
 পরমেশ্বর দেহ পরমেশ্বরের অধীনে এই যে
 মারার প্রয়োজন, ইহাকেই বলে পরমেশ্বরের
 সিসৃষ্টা। সাধারণ বস্তুজীবের ইচ্ছা যেমন
 তাহার নিজের কর্তৃানুগত, পরমেশ্বরের এই
 ইচ্ছা যেমন তাহার নিজের কর্তৃানুগত নহে;
 কারণ, তাহার কর্তৃবন্ধন নাই। পরন্তু এই
 ইচ্ছা নিখিল জীবের কর্তৃানুগত; নিখিল
 জীবের কর্তৃ তাহার বিধানানুসারে ক্রিয়াশীল
 হইয়া মারাত্মকিতে মনস্তত্ত্ব যে ক্ষোভ উৎপন্ন
 করে, তাহাই তাহার ইচ্ছা। নিখিল জীবের
 মনের সমষ্টিই তাহার মন এক নিখিল জীবের
 মনে যে সকল কামের উৎস হয়, তাহার সমষ্টিই
 তাহার কাম। প্রভেদ এই যে, জীব মনের
 ও কামের অধীন, তিনি মনের ও কামের
 দৈব। জীব বীর কর্তৃদ্বারা সৃষ্টি করিলেও
 তাহার স্বরূপ অবগত নহে; পরমেশ্বর জীবের
 কর্তৃানুসারে সৃষ্টি করেন এবং একমাত্র তিনিই
 ইহার স্বরূপ অবগত আছেন। সৃষ্কের শেষ
 একে ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

সৃষ্টব্যাপারে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ বিচার
 করিয়া ঋষি দেখাইলেন যে কর্তৃই সৃষ্টির মূল
 কারণ। অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, কর্তৃর
 মূল কি? ইহার উত্তরে ঋষি বলিতেছেন,
 কর্তৃর মূল অনির্দেশ্য, অনির্জটীক, বুদ্ধি—
 তথা বিচারের—অনধিগম্য। কিন্তু এই কর্তৃ-
 কারণের কারণান্তঃ বুদ্ধির অপোচন হওয়ার
 দরুন যে ইহা লক্ষ্যবিধাৎ অগত্যা, তাহা
 নহে। কর্তৃর জগৎকারণত্ব অর্থাৎ কর্তৃ যে
 সৃষ্টির বীজরূপে মারাকে অবস্থান করে, ইহা
 প্রতি প্রমাণের দ্বারা সম্বাদিত হইতেছে। এই
 প্রতিপ্রমাণ যথেষ্ট হইলেও ঋষি তদতিরিক্ত

প্রত্যেক প্রাণীকে বিবেচনা করিয়া কোন
মাতৃকামৃতিকরণে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে
অগ্রাহ্য করিয়া কর্তব্যে অগ্রসরগণে
অধিকারী হইয়া বলা,—“বিক্রমসদী বোগিগণ
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিগ্রহপূর্ণক অন্তর্গত সম্যক
জাগরিত করিয়া জগৎকেই অব্যাকৃত কারণ,
অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে, প্রকৃতির বিকৃতিজনন
দৃষ্টমান জগতের হেতুভূত কর্মসকলকে
বিস্তৃত সর্বত্রিয়ার দ্বারা বিচার করিয়া পৃথক-
ভাবে বর্ণন করিয়া তাগদিগের সম্বন্ধে
প্রত্যেক জ্ঞান লাভ করেন। উপনিষদে এই
মূলপ্রকৃতিকে অব্যাকৃত বলা হইয়াছে। শঙ্করা-
চাৰ্য্য অব্যাক্তের লক্ষণ করিয়াছেন, “সর্বত্র
জগতো বীজভূতং অব্যাকৃতনামক্ষণং সত্যং
সর্বকারণাকারণশক্তিগমাহারস্বপ্নং অব্যাক্তং”
(কঠ ২।১১ ভাষা), অর্থাৎ সমস্ত জগতের
বীজভূত সমস্ত ভবের অনতিব্যাক্ত নামকপায়ক
সর্বকারণাকারণশক্তির সমষ্টিরূপ পদার্থ
অব্যাক্ত। উপনিষদিক এই অব্যাক্ত শব্দটি
আকৃতিতে ও অর্থে থাকে অসং শব্দেই অন্ত-
রূপ। সং শব্দে নামরূপায়ক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
ভৌতিক পদার্থ বুঝায়, সুতরাং অসং শব্দে
অব্যাকৃত মূলপ্রকৃতি বুঝায়। সত্য ও ব্যাক্ততা
সমানার্থবাচক, সুতরাং অসং ও অব্যাক্তও
একার্থবাচক।

৫। এই সকলের, অর্থাৎ সৃষ্টির অবিভা-
ক্যকর্মরূপ হেতুসকলের, রশ্মি কি (প্রথমে)
জিহ্বাস্তাবে, অর্থাৎ মনো, বিদ্যুৎ হইয়াছিল,
অথবা অধোমেনে বিদ্যুৎ হইয়াছিল, অথবা
উপরে বিদ্যুৎ হইয়াছিল? জ্যোতির্বাদকল,
অর্থাৎ বীজভূত কর্তব্যে বিদ্যুত, অর্থাৎ
জ্যোতির্বাদী সকল, হইয়াছিল এবং তৎ

সকল, বিদ্যুতাবি জ্যোতির্বাদক হইয়াছিল।
অথ, অর্থাৎ জ্যোতির্বাদক, বিদ্যুৎ এবং
জ্যোতির্বাদ, অর্থাৎ জ্যোতির্বাদ, উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ
জ্যোতির্বাদক জ্যোতির্বাদকের পরে সৃষ্ট
হইয়াছিল।

তাৎপর্য্য :—“অসং ছিল না” এতদ্বারা
প্রথমকালে অবিভার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন
হইয়াছে; “অগ্রে কাম সজাত হইয়াছিল,”
এতদ্বারা সৃষ্টির পূর্বে কামের উদ্ভব উক্ত
হইয়াছে; এবং “মনের সর্বত্রিয়ারে প্রথমে
ছিল”, এতদ্বারা সৃষ্টির পূর্বে মনের অস্তিত্ব
বীকৃত হইয়াছে। বিদ্যুতাবি ভূত সকল এই
অবিভাক্যকর্মরূপ হেতুসকল হইতে সৃষ্টি-
কালে উদ্ভূত হয়। অতঃপর প্রথম হইতেই
ইহার ক্রম পথ্যায়, কত সময়ে, কোন্
দেশের পর কোন্ দেশ অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত
হয়? ইহার উত্তরে ঋষি প্রশ্নকালে বলিতে-
ছেন—বিদ্যুতাবি ভূতসকল সূর্য্যারশ্মির দ্বারা
অতি শীঘ্র নিম্নের মধ্যে একেবারে সর্বত্র
ব্যাপ্ত করিয়া উৎপন্ন হয়। শুণাশ্মার
ভূতসকল পর পর পর্যায়ক্রমে উদ্ভূত হয়;
অথ,—আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি,
অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্রিতি। কিন্তু
এই ক্রমানুসারী উৎপত্তি বিদ্যুৎপ্রকাশের
দ্বারা কিপ্রকার সহিত সম্পন্ন হওয়ার, প্রথমে
কোন্ ভূত কোন্ দেশে উৎপন্ন হইল, তাহার
নির্দেশ হয় না। এইরূপে অতিশীঘ্র সর্বত্রিকে
ভূতসৃষ্টি সম্পন্ন হয়। এখন দেখা বাউক, এ
পর্য্যন্ত সৃষ্টি কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল।
প্রথমকালে মূলপ্রকৃতি ভূতের সহিত অগ্নির
অবস্থার ছিল। অতঃপর সৃষ্টির প্রাক্কালে
“ভূতের সর্বত্রিয়ার জগৎ উৎপন্ন হয়” এই

বাক্যারা প্রকৃতির ব্রহ্ম হইতে দ্বৈতভাবে সম্বন্ধস্বক্ৰমের ক্রিয়াশীল অসাম্য অবহার উৎপত্তি সূচিত হইয়াছে। তৎকালে মূল প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপ হুঁড়িয়া জগতের আদিকারণ অংশ বা অব্যাক্তরূপে আবির্ভূত হন। এইরূপে অব্যাক্তের আবির্ভাব নির্দেশ করিয়া ঋষি ব্যক্ত বিষয়াদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অতঃপর ঋষি বলিতেছেন—ভোক্তা জীবসকল ও ভোগ্য বিষয়াদি সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ভোগ্যের অগ্রে ভোক্তার সৃজন হইয়াছিল। সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মাই কর্মের বিধাতা, কর্তা ও ভোক্তা জীব। এই সূক্ষ্মদেহ মহত্ত্ব হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বদ্বারা গঠিত। অতএব সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সৃষ্টি হইতে পারে না; এবং জীবের সৃষ্টি না হইলে ভোগ্য সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের অপয়োজন বিধায় সৃষ্টি হইতে পারে না। আলোচ্য ঋকে ঋষি সৃষ্টির এই পর্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—অগ্রে সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি, তৎপরে জীবের সৃষ্টি, তৎপরে সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের সৃষ্টি। সূক্ষ্মভূতসকলকে ঋষি রশ্মি বলিয়া তাহাদের সূক্ষ্মত্ব সূচিত করিয়াছেন এবং সূক্ষ্মভূতসকলকে যৎ বলিয়া তাহাদের সূক্ষ্মত্ব সূচিত করিয়াছেন। যথা প্রকৃতির নাম। প্রকৃতি জীবের ভোগ্যরূপে আবির্ভূত হন বলিয়া যথা শব্দে ভোগ্যপ্রপঞ্চ বুঝায়।

৬। এই পরিদৃষ্টমান বহুপ্রকারের সৃষ্টি কি উপাদানকারণ হইতে ও কি নিমিত্তকারণ হইতে জাত, তাহা কে যথাযথভাবে জানে এবং এখানে, অর্থাৎ এই জগতে, কেই বা তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিতে পারে? দেবগণ

এই জগতের বিবিধ সৃষ্টির পশ্চাদ্জাত। অতএব যাহা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা কে জানে?

তাৎপর্য্য:—উপরে ঋষি ভোক্তৃভোগ্যরূপে নিখিল সৃষ্টির ক্রম সংক্ষেপে দেখাইলেন। অতঃপর ঋষি পশ্চচ্ছলে বলিতেছেন যে, এই বিশাল ও বিচিত্র জগতের সৃষ্টির কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কেহই জানে না ও জানিতে পারে না। ভূত-ভৌতিক-ভোক্তৃ-ভোগ্যাদিরূপে এই বহুপ্রকার সৃষ্টির উপাদান-কারণ ও নিমিত্তকারণ যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমন কি, দেবতারাও এই কার্য্যকারণসম্বন্ধবিষয়ে অনভিজ্ঞ; কারণ, তাঁহারা সৃষ্টির আদিতে ছিলেন না; পরন্তু ভূতসৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছেন। বেদ-সংহিতার দেবগণকে জ্ঞাপৃথিবীর অর্থাৎ দ্রালোক ও পৃথিবীর সম্ভান বলা হইয়াছে। [“যে ত্ব জাতা অদিতেরন্তম্পরি যে পৃথিব্যাংস্তে ম ইহ শ্রুতা হবঃ।” (১০-৬৩-২)। অর্থাৎ যে সকল দেবতা দ্রালোকে অপস্কল অর্থাৎ অন্তরীক হইতে জন্মিয়াছেন, এবং যাহারা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন।] সুতরাং জ্ঞাপৃথিবীর যাহারা সম্ভান, তাঁহারা জ্ঞাপৃথিবীর—তথা সমগ্র বিচিত্র সৃষ্টির—বিস্তারিত কারণ কিরূপে যথাযথভাবে অবগত হইবেন? আর দেবগণই যদি অবগত না হইলেন তাহা হইলে আর কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? কেহই পারে না।

৭। যাহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি জন্মিয়াছে, তিনিই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন অথবা যদি না করিয়া থাকেন। যিনি ইহার

অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই যদি জানেন অথবা যদি না জানেন।

পূর্ব প্রশ্নের অনুবর্তন করিয়া ঋষি বলিতেছেন,—সৃষ্টির কারণ জীব যে কিছুতেই যথার্থভাবে জানিতে পারে না, তাহার হেতু এই যে, যে পরমায়া হইতে জগৎ জন্মিয়াছে অর্থাৎ যে পরমায়া জগতের উপাদানকারণ, এবং যে পরমায়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ যে পরমায়া জগতের নিমিত্তকারণ, সেই

পরমায়াকে কেহই জানিতে পারে না। তবে একজন আছেন, যিনি এই জগতের কারণ পরমায়া বিষয়ে অবগত আছেন। ঈশ্বর যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, ও ব্যোমে অধিষ্ঠিত তিনিই এই বিশিষ্ট জ্ঞাতা। তিনি জগৎকারণের জ্ঞাতা আর কেহই নাই। এই ঋকে ঋষি জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণের একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আজকালকার দিনে প্রভু-ভক্তের সম্বন্ধ বেতনভোগীর কর্তব্য কর্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অফিসের কাজের সঙ্গে হৃদয়ের কোন যোগ নাই। বরঞ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আমরা বুঝিয়াছি যে, কার্যের মধ্যে হৃদয়কে আনিলে কাজের ব্যাঘাত হয় মাত্র। পূর্বে আমাদের দেশে কাজের সম্বন্ধ পেমভক্তির দ্বারা মধুর ও সজীব হইয়া উঠিত; আজ আমরা তাহা হারাইয়া ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি, সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই। তবে এখন আমরা মাহুষকে ভুলিয়া প্রণালীকে, প্রীতিকে ছাড়িয়া বিধিকে গ্রহণ করিয়াছি, তাই চাকরীর দীনতার কলঙ্কই আমাদের ভূষণ হইয়াছে।

সংসারচন্দ্রে যখন নবীন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন, তখন দিনকাল অন্তরূপ ছিল। তিনি একাধারে মহারাজের শিক্ষক, সঙ্গী, বন্ধু এবং রক্ষক

হইলেন। তিনি প্রত্যুষে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত দিন তাঁহার সকল কর্মে সহায়তা করিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর আহালাদিত একত্রে হইত, তার পর রাত্রে আহালাদিত পর মহারাজ শয়ন করিলে, সংসারচন্দ্র গৃহে ফিরিতেন। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেমন করিয়া এই রাজপুত্র যুবককে তখনকার কুসংস্কার এবং প্রলোভন হইতে দূরে রাখিয়া হিন্দুর পুরাতন ধর্ম, আচার, প্রথা ও কীর্তি বজায় রাখিয়াও তাহাকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, কেমন করিয়া নিজের চরিত্রবলে ধীরে ধীরে এই নবীন নরপতির চরিত্র গঠন করিয়া এই সুবৃহৎ রাজ্যের প্রজাপালন, সুবিচার এবং উন্নতির জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন—তাহা এখন কেবলমাত্র মহারাজের কার্যকলাপ আলোচনার দ্বারাই বুঝিতে

পারা সম্ভব। জয়পুরের মত বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যের অধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ যে কত কঠিন, কত দায়িত্বপূর্ণ এবং কতটা জটিল, তাহা যাহারা দেশীয় রাজ্যের সংস্রবে না আসিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। বিনি বিশেষভাবে রাজ্যের চরিত্র, মঙ্গলের গতি এবং কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে রাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য অনুসরণ করা সম্ভব নহে। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রাখিয়া বিনি রাজা ও রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজাকে নিয়মিত করিতে পারেন, বিনি নিজের স্বার্থকে রাজ্যের স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করিতে পারেন, বিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, দূরদর্শী এবং ধৈর্য্য ও কৌশলের সহিত প্রভুর হিতসাধন প্রয়াসী, তিনিই আদর্শ প্রাইভেট সেক্রেটারী। সংসারচক্রে বিশ বৎসর ধরিয়া বিবিধ স্বার্থসংঘাতের মধ্য দিয়া আপনা ভুলিয়া ছায়ার ক্রায় মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন, এই বিশ বৎসরে মহারাজ যে সকল রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—তার সঙ্গে সংসারচক্রে বোগ লোকচক্রে সম্পূর্ণ অন্তরালে—তিনি এমন করিয়াই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিদিনের জলবায়ু বেনন করিয়া মনুষ্য-শরীরকে গঠন করে, তেমনি করিয়া তিনি নিজ চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই ক্ষণে এ সময়ে আমরা রাজকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। বান্ধব-জীবনে বিশ বৎসরকাল সামান্য বলিতে পারা যায় না। সংসারচক্রে বোধনের উত্তম এবং সংসার-সাইরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, এই বিশ বৎসর তাঁহার জীবনের

তপস্তায় কাল, বাহার কালে তিনি ভবিষ্যতে রাজা গজা সকলের হিতসাধনে কৃতকার্য্য হইরাছিলেন। রাজপুতানা এবং রাজপুতগণের ইতিবৃত্তের সহিত, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, তাঁহাদের প্রকৃতি এবং দেশীয় রাজস্ববর্গের মধ্যে যে সকল প্রথা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে সকলের সহিত সংসারচক্রে যে বনিষ্ট পরিচয় ও অভিজ্ঞতা তাঁহার মস্তিষ্ককালে লোককে আশ্চর্য্য করিত, তাহাও তাঁহার জীবনের এই সাধনায় সময়ে উপার্জিত। তিনি শুধু শিক্ষা দেন নাই, নিজেকে সর্ব্বোভাবে গ্রস্ত করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী গরিখারী দাসের সংস্রবে এবং উপদেশে মহারাজ মাধোসিংহ হিন্দুধর্মে পরম আস্থাবান। মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা এবং তীর্থভ্রমণ, মহারাজ হিন্দুর জীবনের এক প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। সংসারচক্রে এই সকল ধর্ম্মকার্য্যে প্রধান সহায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থদর্শন করিতে মনস্থ করিয়া সংসারচক্রে উক্ত তীর্থে যাইবার রাত্তা প্রভৃতি দেখিবার জন্ত প্রেরণ করেন। কর্তব্যনিষ্ঠ সংসারচক্রে যে কর্গ ছাটে পথের গঙ্গোত্রী গমন করেন—তাহার বিতারিত বিবরণ তাঁহার নিজ লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মৃগৌরী হইতে বোড়া, ভাণ্ডি এবং কুলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গঙ্গোত্রী যাত্রা করেন। পথে স্থানে স্থানে কোথাও বা ধর্ম্মশালায়, কোথাও বা পাহাড়ঝাড়ের কুটীরে এক অধিকাংশ সময়ে অসাবৃদ্ধ স্থানে কাটাইতে হইত। সংসারচক্রে যখন যে বিকরের তার লইতেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে অনুসরণ করিতে একাধিক বার করিতেন,

সে বিষয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। গঙ্গোত্রীর পথে যেখানে যেখানে থাকিবার সুবিধা এবং পথে কি কি প্রয়োজন হইতে পারে, আহাৰ্গ্যদ্রব্যের মূল্যাদি, কুলী-ভাড়া, পথের বিবরণ, গ্রাম, নদী, পাহাড় প্রভৃতির নাম—সমস্তই তাঁহার দিনলিপিতে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীর কোন জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিন মাস পরে তিনি জয়পুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। যে বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর নানাপ্রকার পরিশ্রম করিয়াও অটুট ছিল, এই গঙ্গোত্রী যাত্রাতে তাহাতে রোগ প্রবেশ করিল। সঙ্গের লোকেরা তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। মহারাজের কাজে তাঁহাকে যে শারীরিক ক্রেশ সহ করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি কদাচ মুখে আনিতেন না। কর্তব্যাকর্মে আত্মত্যাগ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, নিজের কোন সুবিধা অসুবিধা তিনি কখন গণনা করেন নাই। কি রাজ্যের হিতকর কার্য্যে, কি ধর্ম্মকর্মে, কি আনন্দ-উৎসবে বা শিকারে, সংসারচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে বিশ বৎসরকাল মহারাজের সাহচর্য্যে কাটাইয়াছিলেন; কিন্তু কখনও নিজের কর্তব্যপথ হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হ'ন নাই, মহারাজের হিত-চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তিনি মনে স্থান দেন নাই। তাই মহারাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু কর্ম্মের গভীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। একদিকে শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ও হৃদয়ের আকর্ষণ এবং অন্য দিকে ঘেহ, প্রীতি ও কর্তব্যনিষ্ঠা—এই মণিকাঞ্চন-সংযোগে এ

সম্বন্ধ পরম আত্মীয়তার পরিণত হইয়াছিল। তাই উত্তরকালে অধরাধিপতির মহিষী মহারানী যাদোনজী সংসারচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে মাতৃ-সম্বন্ধে সম্মানিত করিয়া “রাণী” বোধিয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজ সবাই মাধোলিংহ সিংহাসনে আরোহণ করার তিন মাস পরে সংসারচন্দ্র আইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মজ্জিপদে রূত হয়েন। তাঁহার জীবনী বৃত্তিতে হইলে, এই বিশ বৎসরের জয়পুররাজ্যের একটা মোটামুটি বিবরণ জানা আবশ্যিক। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ইহা সুবিখ্যাত সচিবপ্রবর স্বর্গীয় রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের মস্তিষ্ককাল। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এ জীবনবৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র প্রথমে জয়পুর স্কুলের প্রধানশিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া আসেন; পরে যখন উক্ত স্কুল ‘মহারাজ-কলেজ’ পরিণত হইল—তখন তিনি তাহার অধ্যক্ষ হয়েন।

গবর্ণমেণ্টের সহিত যখন সম্বন্ধের স্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব চলিতেছিল, সেই সময় ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও নির্ভীকতা স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাহার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ রামসিংহ বরোদাধিপতি মহারাজ সন্নাজী গায়কোয়াড়ের যৌবল্যমায় অল্পতম বিচারকের পদে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রূত হ'ন, তখন তাঁহার রায় প্রকাশকালে তাঁহার তদানীন্তন আইভেট সেক্রেটারীকৃত অণুবাদ মহারাজের

মলোমত্ত না হওয়ার, তিনি কান্তিবাবুকে অজুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই সময়েই মহারাজ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ দক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হ'ন। তাহার ফলে জয়পুরে ফিরিয়া তিনি কান্তিবাবুকে কোঙ্গিলের অগ্রতম সদস্যের পদে নিযুক্ত করেন।

মহারাজ রামসিংহের স্বর্গারোহণের এবং বর্তমান মহারাজের সিংহাসন প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল কান্তিবাবু মন্ত্রিসভার সাধারণ সদস্যের পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাজ দাবিংশবর্ষে পদার্পণ করেন এবং রাজত্বের পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হ'ন, তাহার পর ইহাতেই কান্তিবাবু ক্রমে ক্রমে প্রধানমন্ত্রিপদে উন্নীত হ'ন এবং ১৯০১ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত অসাধারণ দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। বর্তমান মহারাজের রাজত্বকালের বিবরণের মধ্যে এই সুদক্ষ মন্ত্রীর কৃতকার্যের ইতিবৃত্ত পাওয়া যাইবে বিবেচনায়, পৃথকভাবে দেওয়া বাহুলা মনে করি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র যখন মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন, তখন শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে প্রকার বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অবিচার এবং স্বার্থ-প্রণোদিত চক্রান্ত বর্তমান ছিল, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম স্থাপন করিয়া যে সকল অসাধারণ কার্যের অকল্পিত করিয়াছিলেন এবং দেশীয় রাজ্য সকলের মধ্যে জয়পুরকে যে প্রকারে উন্নতির পথে অগ্রণী করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বর্ষপ্রধান কীর্তি। রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র নিজের প্রতিভা ও

দক্ষতার যেমন রাজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, জয়পুরাধিপতি এবং গভর্নমেন্টও তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান শ্রেণীর তাজিমী সর্দার মধ্যে গণ্য করিয়া জায়গীর প্রদান করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি দান করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি সি, আই, ঈ, উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ এই প্রতিভাশালী কন্ঠিত ব্রাহ্মণকে “বিজ্ঞাশুর” পদে বরণ করিয়া যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সিংহাসনপ্রাপ্তির পর মহারাজ মাধো-সিংহের কিশণগড় ও ব্রাহ্মাড়া এই দুই রাজ্যের রাজকুমারীর সহিত শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ১৮৮১ সালে মহারাজ বোম্বাই, কলিকাতা, গয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। এই বৎসর আগষ্ট মাসে জয়পুরে ইকনমিক্ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম্ (Economic and Industrial Museum) নাম দিয়া এক শিল্পশালা স্থাপিত হয়। ইহারই অলুপ্তি ও পোষকতায় ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে জয়পুর-শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইল। দেশীয় রাজ্যে ইহা এক অভিনব অলুপ্তি। “রাজ্যমধ্যে এবং রাজ্য-সীমাগত প্রদেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং কি কি শিল্প প্রচলিত আছে, তাহা জামা এবং তৎসমুদয় একত্র করিয়া শিল্প-দিককে উৎসাহ দিয়া স্থানীয় শিল্পের উন্নতি বিধান এবং অসাধারণ শিল্পী এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।” কান্তিচন্দ্র ও সমসাময়িক উভয়েই জয়পুর মিউজিয়ম্ সমিতির সভ্য ছিলেন

এবং ইহাদের বহু পরিশ্রমের ফলে এই শিল্প-সমিতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শিল্পপ্রদর্শনীর জবাবদি পরে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) নবনির্মিত এলবার্ট হলে রক্ষিত হয়।

স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহ রাজ্যের ও প্রজার হিতকল্পে যে সকল সদগুণান আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মহারাজ মাধোসিংহ সে সকল সম্বন্ধে রক্ষা এবং তৎসমুদয়ের উন্নতিবিধান করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে জয়পুর বর্তমানের রাজপুতানার মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর কলেজে এফ্ এ শ্রেণী খোলা হয়; তারপর ১৮৮৮ সালে ইহাতে বি এ এবং ১৮৯৬ সাল হইতে এম্ এ, বি, এন্স সি, এম্ এন্স সি পর্যন্ত অধ্যাপনা হইতেছে। সংস্কৃত কলেজেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে বহু ছাত্র এই কলেজ হইতে কালী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। কলেজের সংস্বেব আরবিক ও পারসিক ভাষা শিক্ষার জন্ত পৃথক বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত জয়পুরে শিল্প-বিদ্যালয় এবং রাজ্যের নানা স্থানে প্রাথমিক ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রাজপুতানার ত্রায় প্রদেশে কেবল মাত্র বৃষ্টিয় জলই কৃষকের ভরসা। অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলে প্রজার দুর্দশার সীমা থাকে না। প্রজাপালক মহারাজ জয়পুরের এই হুঃখ নিবারণের জন্ত প্রায় অর্ধকোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাজ্যের নানা স্থানে সুবহু বাঁধ বাঁধিয়া তাহা হইতে জলপ্রণালী কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্যের সুবিধা এবং হুর্ভিক্ষ

নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৮ সালে জয়পুর রাজ্যে যে ভীষণ হুর্ভিক্ষ হয়; সে সময় মহারাজ প্রজারক্ষার্থে অকাতরে রাজকোষ খুলিয়া দিয়াছিলেন। রাজ্যের নানা স্থানে বৃহৎ প্রকার জন্তু অল্পপত্র খোলা হইয়াছিল। সে সময় মন্ত্রিবর কান্তিচন্দ্র হইতে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই কেবলমাত্র ক্ষুধার্তের আহার দান এবং পীড়িতের সেবা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন—রাজ্যের অল্প সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রজাবৎসল মহারাজ এই দুর্দিনে তাঁর পুত্রোপম প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের উৎসাহ অন্যের মনে সঞ্চারিত করা কান্তিচন্দ্রের এক প্রধান শক্তি ছিল—তাই সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই হুর্ভিক্ষ-নিবারণ-ব্যবস্থা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার ফলে গভর্ণমেন্ট ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কান্তিবারুকে “হুর্ভিক্ষ কমিশনের” সদস্য নিযুক্ত করেন। নিজ রাজ্যে হুর্ভিক্ষে প্রজার অবস্থা দেখিয়াই করুণহৃদয় মহারাজ সমগ্র ভারতের হুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এক ধনভাণ্ডার স্থাপনের উদ্দেশ্যে গভর্ণমেন্টের হস্তে প্রথমে ষোল লক্ষ টাকা দান করেন এবং ক্রমে ক্রমে আরও ১০১২ লক্ষ টাকা এই ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

মোগলসত্রাটদিগের সময় হইতে কি ভারতে কি বিদেশে জয়পুরের রাজগণ বরাবর সত্রাটদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ ডগবান দাস, মহারাজ মানসিংহ ও জয়সিংহের কীর্তি ইতিহাস অল্প অল্পে প্রচার করিতেছে।

মহারাজ রামসিংহও সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে গভর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজভক্ত মহারাজও তাঁহার পূর্ণবর্তিগণের অগ্রসরণে নিজরাজ্যে Imperial Service Transport Corps স্থাপন করিয়াছিলেন। এই Transport Corps ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টিরা প্রভৃতি অভিযানে ভারত-গভর্ণমেন্টের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া ইহার কার্য-কারিতার পরিচয় দিয়াছে।

সংসারচক্রে মজ্জিকাল সমাক্ষেপিত হইলে বর্তমান মহারাজের ও তদীয় রাজ্যের

কাণের একটা ধারাবাহিক বিবরণ জানা দরকার, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান পরিচ্ছেদের অবতারণা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ সন পর্য্যন্তের ইতিহাস মজ্জিবর কান্তিচক্রে সহিত জড়িত। তাই সংসারচক্রে মজ্জিব-প্রাপ্তি পর্য্যন্তের একটা মোটামুটি বিবরণ এ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হইল মাত্র; বিস্তারিত ইতিহাস দেওয়া এ স্থানে সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

“এষা”

(২)

জীবন-মরণের সমস্তা মানব সমাজে নূতন নয়। চিরদিনই মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দিশাহারা হইয়াছে। জীবনের প্রহেলিকাও ভেদ করিতে পারে নাই, মৃত্যুর মর্শও উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই। বর্ষের সাধনার শৈশব-কল্পনা এ পারের ছবিগুলিকে পরপারে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা পরলোক রচনা করিয়া লইত, এবং সে লোকের যাত্রীদের সঙ্গে তাহাদের নিত্যাবহাৰ্য্য অস্ত্র শস্ত্রাদি, ক্রমে গোমেঘাদি এবং পরে তাহাদের দাসদাসী, এমন কি জীবন সঙ্গিনীদিগকেও পাঠাইয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইত। আমরা আর এ সকল করি না বটে, কিন্তু এখনও অনেকেই যে একটা কল্পিত পর-লোকের সৃষ্টি করিয়া, শোকে সাহসনা অশ্বেষণ করে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি

না। তাহারা একটা স্থল, সাকার পরজগৎ কল্পনা করিত; আমরা একটা স্থল, নিরাকার পরলোক গড়িয়া সেখানে সর্ববিধ আনন্দের ও ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি—বেশ কম এই মাত্র। ফলতঃ পরলোকতত্ত্বটা পূর্বে যেমন, আজিও সেইরূপই অজ্ঞাত ও অনাবিস্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সমস্তাটা অত্যন্ত পুরাতন হইলেও, যুগে যুগে মৃত্যু মানুষকে নূতন নূতন ভাবে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষের সাধনার অল্প অপূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, বর্ষের সমাজের প্রজ্জ্বলিত অত্যন্ত কোমল, ও কল্পনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিধাতাপুত্র যেন এই প্রজ্জ্বলিত ও কল্পনার দ্বারা বর্ষের সমাজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কতিটা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যাহাকে জড়

বলিয়া এখন উপেক্ষা করিয়া থাকি, তাহা তারই ভিতরে চৈতন্তের অধ্যাস করিয়া, বিশ্বসংসারকে সচেতন করিয়া রাখিত। জড়ে ও জীবে তখন এমন একটা মাখামাখি ছিল, এমন একটা আলাপ-আস্বীয়তার আদান-প্রদানের ভাব ছিল, যাহা এখন আমরা কেবল কবি-কল্পনার মায়িক সৃষ্টিতেই দেখিতে পাই, দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করিতে পারি না। আমরা আর প্রাচীন দেবতাদের দ্বারা নৈসর্গিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের জড়বিজ্ঞান ও শক্তিবাদ পুরাতন দেবতাদিগকে নির্কাসিত করিয়াছে। আমরা এখন বিশ্ববিবর্তনের অন্তরালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করি না, কিন্তু এক ভীষণ ও বিরাট শক্তি-পুঞ্জের লক্ষ্যধীন সংঘর্ষ এবং সংগ্রামই প্রতিষ্ঠিত করি। আর প্রাচীন দেবতাদের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের পরলোক-বিষয়িনী কোমল শ্রদ্ধা-টুকুও হারাইয়াছি। তাহারা মৃতদিগের জন্ত সুশোভন চন্দ্রলোক, সূর্যালোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোকাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ সকলে বিশ্বাস করিয়া তাহারা শোকে অশেষ সান্ত্বনালাভ করিতেন। আমাদের সে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া আমরা আজ যত অধীর হইয়া পড়ি, মৃত্যু আমাদের যতটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়, প্রাচীনেরা সেসকল হইতেন না, কাল তাহাদিগকে এতটা কার্পণ্যোপহত করিতে পারিত না। প্রাচীনেরা যেমন পরলোক কল্পনা করিতেন, আমরা যে তাহা একেবারেই করি না, এমনও

নয়। কিন্তু তাহাদের সে কল্পনার সঙ্গে তাহাদের সমসাময়িক সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ও সঙ্গতি ছিল, আমাদের পরলোক-কল্পনার মধ্যে সে যোগ ও সঙ্গতি থাকে না। এই জন্ত অনেক সময় আমাদের শোক লঘু ও সান্ত্বনা অলীক হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মৃতদিগের জন্ত আপন আপন কর্মোচিত লোক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সাধু-অসাধু, তত্ত্ব-অভক্ত নির্বিশেষে সকলেই যে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইত, এমন অদ্ভুত কল্পনা তাহারা করিতেন না। এইজন্ত, তাহাদের পরলোক-রচনা কল্পিত হইলেও, সেই কল্পনার অন্তরালেও একটা সত্য ও সংঘম বিद्यমান ছিল। শ্রদ্ধা যেখানে—সংঘম সেখানে আপনা হইতেই আইসে। আর ইহলোকের বস্তুর ধারণা যেখানে সহজ ও সরল অথচ দৃঢ় থাকে, সেখানে পরলোকের কল্পনাও নিতান্ত সত্য-ভ্রষ্ট হয় না। আমাদের দৃষ্টের স্থিতি যেমন দুর্বল, অদৃষ্টের কল্পনাও সেইরূপ অলীক হইয়া পড়ে। আধুনিক কবিদিগের পরলোক-চিত্রে এইজন্ত অনেক সময় বস্তুতন্ত্রতার লেশমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা জীবিতকে তেমন সমগ্র প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরি না বলিয়াই, তাহাদের প্রজলিত-চিত্রালোকে দাঁড়াইয়া, গলা ছাড়িয়া গান করিতে পারি—
 বাও রে অনন্তধামে মোহময়া পাসরি.
 হুংধ আঁধার বধা কিছুই নাহি।
 জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে
 কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।
 বাও রে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
 অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।

দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে,
ধানভরে গান করে একতানে।

যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ময় আলয়ে,
সুভ্র সেই চির-বিমল পুণ্য-কিরণে।

যায় যথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান্।

যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে ॥

অক্ষয়বাবুর শোকগাথাতে কোথাও এই-রূপ কোনও অলীক কল্পনার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অক্ষয়কুমার তত্ত্বদর্শী সিদ্ধপুরুষ নহেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিবাক্যে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, অক্ষয়কুমার এ পর্য্যন্ত তার সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই। করিলে, কবিতাগুলি তিনি লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু সে তত্ত্ব কয়জনার ভাগ্যেই বা প্রকাশিত হইয়া থাকে? সে তত্ত্বের উপদেষ্টা অতিশয় দুর্লভ; উপযুক্ত অধিকারী শ্রোতাও অতিশয় দুর্লভ। “দেবৈরব্রাহ্মি পুনঃ বিচিকিৎসিতা পুরা”—অতি প্রাচীনকাল হইতে দেবতারাও এ সম্বন্ধে সন্দেহান ছিলেন। “ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ”—এই সূক্ততত্ত্ব মনুষ্যদিগের পক্ষে সুবিজ্ঞেয় নহে। অক্ষয়কুমার এটী দেবদুর্লভ তত্ত্ব আয়ত্ত করেন নাই, এ কথা বলিলে এই তত্ত্বেরই কেবল মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমারের কবি-প্রতিভার বা মনীষার কোনও অবমাননা করা হয় না। অক্ষয়কুমার, ইদানীন্তন কালে সভ্যজগতে যে শিক্ষাদীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই লাভ করিয়াছেন। তিনি একালেরই কবি ও মনীষী। এ কালটা যুক্তিপ্রধান, অতিশয় প্রত্যক্ষবাদী। এ কালের শিক্ষা ও সাধনার অভীক্ষার দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্রীণ,—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরেই বিশেষভাবে এ

যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আপনাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং তর্কের দ্বারা যে তত্ত্ব লাভ করা যায় না, অক্ষয়কুমার সে তত্ত্ব লাভ করেন নাই বলিয়া, কোনও নিন্দার কথাও হয় না। তবে অক্ষয়কুমার এই অতর্ক্যপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার না পাইয়াও যে ইহার কল্পিত উপদেশ দিতে যান নাই, ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রশংসার কথা। এই জন্তই এই গ্রন্থে কোনও অলীক কল্পনার বাহুলা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থে এক দিকে যেমন কোনও গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ-পরিচয় নাই, অন্য দিকে সেইরূপ কোনও প্রকারের লঘু-চিত্ততারও নামগন্ধ নাই। লঘুচিত্ত লোকেই কেবল মাখিক কল্পনার গোলাপী নেশা করিয়া, নানাবিধ জল্পনার সাহায্যে, আপনার গভীর শোকে সাস্থ্যনা অব্রেষণ ও লাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ লঘুচিত্তের উপরে, শোকের দাগ কখনও গভীরভাবে পড়ে না। তাহার প্রেমা যেমন হাল্কা, শোকও সেইরূপই হাল্কা হইয়া থাকে। রোজা যেমন তিলার্দ্ধমাত্র একটা মস্তাদ্দি পাঠ করিয়া, অপস্মার-রোগীর কল্পিত রোগঘন্ত্রণার উপশম করিতে পারে; লঘুচিত্তের শোকবেদনাও সেইরূপ একবার চক্ষু বুঝিয়া, নষ্ট করিতে পারা যায়। লঘুচিত্ত বিরহীর শোক কদাপি সর্বগ্রাসী হয় না। সে শোকে মর্ম্মের অন্তস্তলকে আলোড়িত করিয়া তোলে না। তাহাদের হাল্কা প্রেমের হাল্কা বিচ্ছেদে, হাল্কা শোকই জাগিয়া উঠে। আর সে শোকের আঘাতে জীবন-মৃত্যুর গভীর ও জটিল সমস্যাকে জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অক্ষয়কুমারের প্রেম

প্রগাঢ়, বিচ্ছেদ দুর্কিবহ, শোক সর্পগ্রাসী ; তাই এই শোকের আঘাতে তাঁহার পুরাতন জগৎটা চুরমার হইয়া গিয়া, সমগ্র বিশ্ব সমস্তকে নূতন ও বিকট আকারে, তাঁহার চক্ষের উপরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কোনও রস যতক্ষণ না গাঢ় হইয়া উঠে, ততক্ষণ তাহার নিজস্ব রূপটা সম্পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠে না। অক্ষয়কুমারের শোক অতিশয় গভীর ; তাঁহার বিরহ-আগুনে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইয়া এ শোক যেন নিরেট হইয়া উঠিয়াছে। আর এইজন্যই তাঁহার এই শোকগাথাতে সে গভীর শোকের বিচিত্র রূপগুলি এরূপ বিশদভাবে ফুটিয়াছে। যেখানেই কোনও বিশেষ রস, কোনও ক্ষেত্রবিশেষে, তাহার আপনার নিজস্ব রূপগুলিকে ফুটাইয়া তোলে, সেখানেই তাহা আপনার বিশিষ্ট আধারের সঙ্গীত সীমাকে অতিক্রম করিয়া, সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন হইয়া উঠে। একের রস তখন সকলের রস, একের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা,—তখন বিশ্বের ভয় ও ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ ও শ্রদ্ধা হইয়া পড়ে। দর্পণে লোকে যেমন আপন আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রস-চিত্রের মধ্যে বিশ্বজন আপন আপন অন্তরের অদৃষ্টপূর্ব রসের রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বিস্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়া উঠে। এই লক্ষণাক্রান্ত রস-পটই সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই,

অক্ষয়কুমারের 'এষা'খানি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

'এষার' প্রথম ও প্রধান গুণ—ইহার অসাধারণ বস্তুতত্ত্বতা। কবি আপনার জীবনের বাহিরের ও ভিতরের অতি ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত অভিজ্ঞতার উপরে এই কবিতাগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন। যে যেমন দেখে, সে তেমন আঁকে। চিত্রের অস্পষ্টতা চিত্রকরের দৃষ্টির অক্ষমতাই প্রমাণ করে। 'এষার' চিত্রগুলিতে কোথাও এরূপ অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না। ইহার মধ্যে কোথাও কিছুই হ্রস্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। অক্ষয়কুমার অকুমার গোষ্ঠীলগ্নে তাঁহার কবিতাসুন্দরার অবশুত্বনথানি ঈষদপস্বত করিয়া, সেই আলো-অঁধারের ইন্দ্রজাল-প্রভাবের মধ্যে, তাহার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন না। তিন কাব্যই সৃষ্টি করেন, স্থূলগিত শব্দ যোজনা করিয়া, ইন্দ্রসভার আনন্দ্য সঙ্গীতের স্বাক্ষর তুলিয়া, কবিতার নামে কেবল ঘোহিনী হৈয়ালি রচনা করেন না। এই বিষয়ে অক্ষয়কুমার আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের আদর্শের অনুকরণ করেন নাই, প্রাচীন কবিকুলশিরোমণিদিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভাপতি বা চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম কি ভারতচন্দ্র, ইহাদের কেহই কাব্যের ছল করিয়া হৈয়ালি গড়েন নাই। স্থনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞের মতন, কেবল শব্দহীন রাগরাগিনীর আলাপও করেন নাই। হৈয়ালি জিনিষটা হয় নহে ; উৎকৃষ্ট, স্থনিপুণ হৈয়ালি সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নবিশেষ সন্দেহ নাই। রাগিনীর অনর্থক আলাপও নিফল হয়

না। কিন্তু সে সকল কবিতা নহে। বিখ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি সাংখ্য অথচ সহজবোধ্য, সুসংলিত অথচ গভীরভাবে গভীরতম যোজনা করিয়া গভীর রসের ছবি সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতাগুলি পড়িলেই বোঝা যায়, তাহাতে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য কিছুই নাই। আর বৈষ্ণব-কবি-গণের রসানুভূতি সত্য ও গভীর ছিল বলিয়া, তাঁহাদের এই সকল অনুপম রসচিত্রও এমন অদ্ভুতভাবে এতটা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন সকল আন্তরিক রসানুভূতি আছে, সত্য, যাহাকে কোনও ভাষায় ভাল করিয়া প্রকাশ করা যায় না। সে সকলকে কেবল ঠারে-ঠোরে ব্যক্ত করিতে হয়। বৈষ্ণব-কবিগণ এ সকল গভীরতম রসের রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহা কেমন সরল ও সূচু, কেমন সুন্দর অথচ রসিকজনের নিকটে কেমন সহজবোধ্য হইয়া আছে! শরীরের যেমন একটা যৌবন আছে, প্রাণেরও সেইরূপ একটা যৌবন আছে। এই প্রাণের যৌবন অতিশয় অন্তরঙ্গ বস্তু; তাহার এমন শক্তি নাই যে, সে যৌবনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারে। অথচ চণ্ডীদাস এক কথায় কেমন সুন্দর ও সহজ ভাবে সে বস্তুটাকে প্রকাশ করিয়াছেন :—

“তব্ যৌবন বব্ সুপুরুষ সঙ্গ।”

অথবা অতৃপ্ত, জলন্ত রূপ-লালসার এমন চিত্রই বা আর কোথায় দেখিতে পাই ?—

কি পঞ্চলু ব্রজরাজকুলনন্দন

রূপে হরল পরাণ।

নিরানন্দা রসানিধি, আমারে না দিল বিধি

প্রতি আছে অধিক নয়ান।

অথবা অন্তর্যমী শ্রীমদ্রূপ-দর্শন-মুগ্ধা শ্রীরাধিকা পাগল-পারা হইয়া ইচ্ছা করিতেছেন—এ ভুবনমোহনরূপ—

এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো।

ভাগিনা ভাগিনা উহা খাই।

এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ গভীরতম রসানুভূতিকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা কথায় বলা যায় না—যে গভীর অভিজ্ঞতার প্রকাশে “বুদ্ধি-বচন হারে”— তাহাকেও সহজভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কোথাও কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া আপনাদের রসচিত্রগুলিকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখেন নাই। তাঁহাদের অন্তরের অনুভূতিগুলি অতিশয় গভীর ও অস্পষ্ট ছিল বলিয়া, সে সকল অনুভূতি যতই গভীর ও অবাঞ্ছনীয়সংগে হউক না কেন, তাহার অভিব্যক্তি কখনই অস্পষ্ট বা কুস্মটিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই।

অক্ষয় বাবুর কবিতায় বৈষ্ণবকবিদিগের গভীর রসানুভূতি আছে, এমন কথা বলি না। বৈষ্ণবকবিগণ যে গভীর, নিদারুণ বিরহের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু জগতের আর কোনও সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেমন জলের তুলনা হয় না, বৈষ্ণব কবিগণের বিরহ-চিত্রের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর এই শোকগাথারও সেইরূপ কোনই তুলনা হয় না। অক্ষয়কুমারের বিরহ কেবল বিরহ; ইহার মধ্যে নিগূঢ়তম মিলনের অনুপম আনন্দটুকু লুকাইয়া নাই। বিরহের দশ-দশার সকল অক্ষয়কুমার এখনও গান নাই; তাহার তত্ত্বগতাব এখনও আত্মদান করেন নাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যে বৈষ্ণব-কবিতার

নিগূঢ় রসাকুতী ফুটিয়াছে, তাই এমন কথা বলি না। এ'কালে সে বস্তু ফুটিতে পারে না। আবার যদি সে সহজ সাধনা ও সহজ প্রেম কখন জাগিয়া উঠে, তবে হয় ত কখনও পুনরায় বাংলা-সাহিত্যে বৈষ্ণবকবিকুল-গুরুদিগের শূভ আসন কোনও ভাগ্যবান সাধক-কবি-শিরোমণির দ্বারা পূর্ণ হইতেও বা পারে। কিন্তু বৈষ্ণবকবিরিগের রসাকু-ভূতি ও সাধনসম্পদ লাভ না করিয়াও, আপনার অধিকারে, অক্ষয়কুমারের কাব্য-সৃষ্টি, সত্য ও সারল্যে, প্রাচীন কবিকুল-গুরুদিগের কাব্য-সৃষ্টি অপেক্ষা বড় বেশী হীন হইয়া আছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের নিজেদের সময়ের ও নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ়-তম ও সার্বজনীন তত্ত্ব এবং ভাবগুলিকে আপনারদের কবিতাতে গাথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও তাঁর কাব্যে আমাদের সমসাময়িক বিশিষ্ট সাধনার নিগূঢ় ও সার্বজনীন সমস্তা ও ভাবগুলিকে অতি বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁর কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা তিক সে চক্ষে দেখিতে পারি না। একদিকে তাঁদের অন্তরে পরলোক-সম্বন্ধিনী একটা কোমল শ্রদ্ধা ছিল, অত্রদিকে একান্তভাবে বিষয়ভোগে লিপ্ত হইয়াও, তাঁহাদের চরিত্রের ভিতরে, লোকচক্ষুর অন্ত-রালে, প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের যম-নিয়ম'দ্বার সাধনে, একটা অকৃত বৌগশক্তি প্রায়ই লুকাইয়া থাকিত। এইজন্য অনেক সময় তাঁহারা নিতান্ত নির্ভীকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন

হইতে পারিতেন, প্রিয়জনকেও ধীর-স্থি-তিতে মৃত্যুর হস্তে অর্পণ করিতেন। আমরা হিন্দুর গঙ্গাবাত্রা-অমৃতানটাকে, একটা অভ্যস্ত নিষ্ঠুর ও নিশ্চয় রীতি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। শবদাহ-প্রথাটাকেও যে সর্বদা ভাল মনে করি, এমনও বলা যায় না। কিন্তু যুমুর্ষ, প্রিয়জনকে যারা গঙ্গাতীরস্থ করিয়া, গঙ্গাশ্রোতে আকণ্ঠ ডুবাইয়া, সেই শ্রোত-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবনপ্রবাহকে নিঃশেষ মিশাইয়া দিতে পারিত; আর যারা মৃত প্রিয়জনের দেহে বহুস্তে অগ্নিসংযোগ করিয়া, ভগ্নদাহ হইতে দেখিতে পারে, তারা মৃত্যুটাকে কত যে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়,—এ কথাটা তলাইয়াও দেখি না। শোক করিও না—এ উপদেশ সকল ধর্ম্মেই আছে। শোকে ভগবানের মঙ্গলবিধানের মুখ চাহিয়া, তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া, সান্ত্বনালাভ করিবে—এ কথাও সকল উন্নত ধর্ম্মেই বলে। The Lord gave, the Lord hath taken away, Blessed be the name of the Lord।—খৃষ্টীয়ান-সাধনা এইভাবেই শোকার্ন্তের সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু হিন্দু কেবল ভগবানের মঙ্গলবিধানের দিকে চাহিয়াই, বৃথা শোক করিবে না, এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৃতব্যক্তির কল্যাণের মুখ চাহিয়া,—যাকে এতই ভাল-বাস, তার সুখশান্তির অন্ত শোক হইতে বিরত হও,—কেবল হিন্দুই এক কথা বলেন। ইহ-লোকে তোমাদের অশ্রদ্ধা ও অর্জিত্য যেরন তাহাকে তোমাদের কাছে জীবিত আনিও, মৃত্যুর পরেও সেইরূপ, সেই যোগদায়ক

বন্ধনই তাঁর প্রেতাশ্বাকে এই নিরীক্স অবস্থায় এই ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য জগতে টানিয়া রাখে। এ উপদেশ আর কোনও ধর্মোত্তীর্ণ নাই। এই সকল কারণে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে ভাবে দেখিতেন, তাঁদের সে শ্রদ্ধা হারাওয়া ও যে সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতির ভিতর দিয়া তাঁদের ইহজীবনটা গাড়িয়া উঠিত, সেই সকল আচার-ব্যবহার ও রাজনীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া,—আর সে ভাবে আমরা মৃত্যুকে দেখিতে পারি না। তাঁদের শ্রদ্ধা কোমল ছিল, সংজ্ঞা ছিল, গতাহুগাতকে আশ্রয় করিয়াই সে শ্রদ্ধা বাঁচিয়া থাকিত। তারা বিনা বিচারে, বিনা যুক্তিকে কার্য্যহীন, প্রচলিত মতামতে শ্রদ্ধাবান হইয়া জীবন-যাপন করিতেন। আমরা তাঁদের সে কোমল শ্রদ্ধা হারায়াছি; অথচ শাস্ত্রবৃত্তির দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসকে সংশোধিত ও প্রকৃত করিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধারও আধিকার্য্য হই নাই। আমাদের চিন্তা সংশয়প্রবণ। আমাদের অধ্যাত্মবৃত্তি অত্যন্ত ক্ষণ। ওষুধটি নাই বলিলেও চলে। অতীতকে আমরা যে কেবলই প্রত্যক্ষবাদী ও নিতান্তই জড়বাদী এবং ইহসর্কীয়, এমনও নহে। হিন্দুধর্মোত্তীর্ণ আমরা একান্ত তুষ্ট নাই। শুদ্ধ পশুপাক্তিতেও আমাদের মন উঠে না। কেবল হিন্দুধর্মোত্তীর্ণ ভোগেতে হৃদয়ের যে নিম্মমতা ও কাঠিন্য জন্মে, আমাদের তাহাও জন্মে না। এ আত্মরী সম্পদও আমরা লাভ করি না। কলাবিজ্ঞানের অনুশীলনে, ললিতকলার উৎকর্ষ-সাধনে, আমাদের মধ্যে একান্ত হিন্দুধর্মোত্তীর্ণ লালসার, ভিতরেও একটা অতীন্দ্রিয়মুহূর্ত্ত

অগ্নে অগ্নে জাগিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সামাজিক জীবনের উদ্যোগ ও বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায়, আমাদের হৃদয় একটা অভূতপূর্ব কোমলতা লাভ করিয়াছে। জীবনের পারসর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সুখঃখানুভূতির শক্তিটাও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে জীবন-মৃত্যুর সমস্তটা আমাদের নিকটে নিতান্তই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কলারস-সংস বিষয়প্রবণ কোমল চিন্তাকে মৃত্যু যেরূপভাবে অভিভূত করে, আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাকে যেরূপ অভিভূত করিতে পারিত না। প্রাচীনরা আবার আমাদের অপেক্ষা অশেষগুণে সমাদিক শোণিতাশাস্পন্ন ছিলেন। বাঁধাবান্ লোকের কষ্টসাংস্কৃত্য, হানবায় বা নিকরীয়া লোকের অপেক্ষা অশেষগুণে বেশী। কষ্টসংস্কৃত্য প্রতিষ্ঠার একটা মুখ্য অঙ্গ ও উপাদান; আর মৃত্যুর আঘাতও তিতিক্ষু লোককে একেবারে বিচলিত বা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা পূর্বপুরুষদের এই সকল অনায়াস-লব্ধ সাধনসম্পদদ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া ছি বলিয়া, জীবন-মৃত্যুর সমস্তটা আমাদের নিকটে এক নূতন ভাবে, নূতন অর্থে, নূতন শক্তিতে উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজে পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারিও না, আবার বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি একপ্রকারের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু আমাদের প্রাণ সে সিদ্ধান্তকে ধরিয়া সাহসনা পায় না বলিয়া, তাহার বিরোধী বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়। এই দু'টানার পড়িয়া, আমরা কখনও একদিকে,

কখনও বা অতৃষ্ণাকে বুঝিয়া পড়ি। ইহাই আধুনিক সাধনার সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। বর্তমান যুগের ইহাই সর্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শক ট্রেজ্জেডি (tragedy)। অক্ষয়বাবু তাঁর 'এষা'তে এই ট্রেজ্জেডটিকেই অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্যে লর্ড টেনিসন্ তাঁর 'ইন্ মেমোরিয়ামে'ও (In Memorium) এই আধুনিক ট্রেজ্জেডির চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। এই আধুনিক সাধনার এই বিগ্গসমস্ত্রাটাকে আশ্রয় করিয়াই, টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম'—বিগ্গসাহিত্যে এতটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়-কুমারের 'এষা'খানি ও টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়াম' একই শ্রেণীর কাব্যসৃষ্টি। অক্ষয়কুমার টেনিসন্ জানেন, ভাল করিয়াই পড়িয়াছেন তাঁর কবিকল্পনায় কোনও কোনও রস, এমন কি তার অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত, এই আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী কবি একেবারে আত্মসং করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। এইজন্ত 'এষা'তে কোথাও কোথাও 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র ছায়া পড়িয়াছে, এমনও বা মনে হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও 'এষা'খানি অক্ষয়-

কুমারের, টেনিসনের নহে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে বাঙালী কবির প্রাণের ছাপ, হিন্দু কবির যুগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার সহিমোহর অঙ্কিত হইয়া আছে। আমরা ইংরেজি শিখিয়া টেনিসন না কি বহুবার পড়িয়াছি। টেনিসনের কতকগুলি কথা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে প্রবাদবাক্যের মতন প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজি পড়িতে ও লিখিতে, শুনিতে ও বলিতে, এই সকল ভাব ও ভাষা আমাদের চিন্তার সঙ্গে একে বারে জড়াইয়া গিয়াছে তাই টেনিসনের সঙ্গে সামান্য বাঙালী কবির নাম করিতে আমাদের শঙ্কা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, 'এষা'তে টেনিসনের অমূল্য-করণের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ামে'র এমন যেটা সর্বপ্রথম কবিতা, তাহাই বস্তুতঃ তার শেষ কবিতা। ইহার সঙ্গে 'এষা'র শেষ কবিতাটির তুলনা করিয়া দেখিলেই, অক্ষয়কুমার টেনিসনের নিকটে কতটা স্বাধীন, আর কতটাই বা এ কবিতাগুলি তাঁর কবিপ্রতিভার মৌলিক-সৃষ্টি, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারা যায়। টেনিসনের প্রথম কবিতাটী এই :—

Strong Son of God, immortal Love,

Whom we, that have not seen thy face,

By faith, and faith alone, embrace,

Believing where we cannot prove ;

Thine are these orbs of light and shade ;

Thou madest Life in man and brute ;

Thou madest Death ; and lo, thy foot

Is on the skull which thou hast made.

Thou wilt not leave us in the dust :
 Thou madest man, he knows not why,
 He thinks he was not made to die ;
 And thou hast made him : thou art just.

Thou seemest human and divine,
 Thou highest, holiest manhood, thou ;
 Our wills are ours we know not how ;
 Our wills are ours, to make them thine.

Our little systems have their day ;
 They have their day and cease to be :
 They are but broken lights of thee,
 And thou, O Lord, art more than they.

We have but faith : we cannot know ;
 For knowledge is of things we see ;
 And yet we trust it comes from thee,
 A beam in darkness : let it grow.

Let knowledge grow from more to more,
 But more of reverence in us dwell ;
 That mind and soul, according well,
 May make one music as before

But vaster. We are fools and slight :
 We mock thee when we do not fear :
 But help thy foolish ones to bear ;
 Help thy vain worlds to bear thy light.

Forgive what seem'd my sin in me ;
 What seem'd my worth since I began ;
 For merit lives from man to man,
 And not from man, O Lord, to thee.

Forgive my grief for one removed,
 Thy creature, whom I found so fair.
 I trust he lives in thee and there
 I find him worthier to be loved.

· Forgive these wild and wandering cries,
 Confusions of a wasted youth ;
 Forgive them where they fail in truth,
 And in thy wisdom make me wise.

অক্ষয়কুমারের 'এষা'র শেষ কবিতাটি এই :—

হা প্রিয়ার—আশান-দক্ষা, তও পরকাশ !

তাজিয়াছ মর্ত্তভূমি,

তবু আছ—আছ তুমি !

তুমি নাই—কোথা নাহি, হয় না বিশ্বাস ।

এত রূপ গুণ ভক্তি,

এত প্রীতি অমুরক্তি—

স্বপ্ননে যে পূর্ণতার নাহিক বিনাশ !

নয়—এ মরণ নয়, দু'দিন বিরহ !

আলোকে স্ন-বর্ণ ফুটে,

আঁধারে স্নগন্ধ ছুটে ;

মিলনে নিঃশব্দ প্রেম—বহু অনাগ্রহ ।

বিরহে ব্যাকুল প্রাণ—

সেই জপ তপঃ ধ্যান,

সেই বিনা নাহি আন, সে-ই অহরহ ।

প্রতি কর্ম্মে—প্রতি ধর্ম্মে—উঠেছিলে সতী,

উচ্চ হ'তে উচ্চস্তরে !

নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে

নামিতোছিলাম আমি অতি কৃতগতি ।

ক্রমে বাড়ে ব্যবধান,

তাই হ'লে অগুরুদান—

তোমাতে স্মরিয়া যাহে হই শুদ্ধমতি !

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !

তোমাতে হেরিনি, প্রভু,

বিশ্বাস করি হে তবু,—

সর্ব্বজীবে সর্ব্বকালে দাও পদে স্থান ।

তোমারি এ বিশ্ব-সৃষ্টি,
 আলো—অন্ধকার—রুষ্টি,
 জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান !
 ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেম. ওহে প্রেমময় !
 মরণে নহি ত ভিন্ন,
 প্রেম-সুত্র নহে ছিন্ন—
 স্বর্গে মর্ত্যে বৈধে দেহ সঙ্কর অক্ষয় !
 শোকে ধু ধু হৃদি-মরু
 আছে তার কলতরু !
 নেত্র-নীরে ইন্দ্রধনু হইবে উদয় !
 তুমি নিত্য সত্য শুদ্ধ তোমারি ধরনী ;
 তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা
 আমরা এ প্রতিজ্ঞা,
 শোকে তঃখে ভ্রমে কেন পরমাদ গণি ?
 বাপি' সর্ব কাল-স্থান
 তব পভা দীপ্যমান,
 ব্যোমে ব্যোমে কম্পমান তব কর্ণধ্বনি !
 ছরন্ত বাসনাবর্তে সতত বর্ণন,
 নিরন্তর আত্মপূজা,
 তোমারে যাগ না বুঝা—
 সৌভাগ্যে বিস্তৃতি বাহু, ত ভাগ্যে দূষণ ।
 মলিন চঞ্চল মনে
 যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
 বৃষ্টিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !
 অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার ।
 আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'
 কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,
 করি কত সত্য-মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার !
 নিজ স্বথ হুঃখ দিয়া,
 তোমারে গড়িয়া নিয়া,
 বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার ।

মজিয়া আপন জানে আপনা বাথানি।

রোগে শোকে ভাবি ডরে

জন্ম নাই মৃত্যু তরে—

যদিও এ জন্ম-মৃত্যু কেন নাহি জানি !

জানি—মনঃ প্রাণ দেহ

নহে আপনার কেহ—

তোমাতে হোমারি দান দিতে অভিমানী !

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চির-প্রেমময় !

আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,

আরো আত্মজয়-শক্তি—

তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা নয় !

জীবন-মরণ-পানে

ব'হে বাক্ সুরে গানে,

হোক প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !

ক্ষম' এ ক্রন্দন-গীতি—শোক-অবসাদ !

সে ছিল তোমারি ছায়া—

তোমারি প্রেমের মায়া !

তার স্মৃতি আনে আজ তোমারি আশ্বাদ !

এখনো সে যুক্তকরে

মাগিছে আমার তরে—

তোমার করুণা-স্নেহ শুভ-আশীর্বাদ।

এই দুইটি কবিতাই একরূপ একই বিষয়ে, একই উপসঙ্গে রচিত। দুইটিতেই মানব-প্রাণের একটা গভীর প্রার্থনা, মানবমনের একটা গভীর সমস্তা, মানবহৃদয়ের কতকগুলি গভীর ও জটিল রসকে অভিযুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। টেনিসনের কবিতাটা পূর্বে রচিত, অক্ষয়বাবুরটা পরের লেখা। অক্ষয়বাবুর কবিতার জ'একটি স্থানে মনে হয় যেন টেনিসনের একটু ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান !

তোমাতে হেরিনি, গভু,

বিশ্বাস করি হে তবু—

সর্বজীবে, সর্বকালে দাও পদে স্থান।

তোমারি এ বিশ্বস্থিতি,

আলো—অন্ধকার—টি,

জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক তোমারি প্রদান ।

এখানে কেহ বা এমন মনেও করিতে পারেন যে, টেনিসনের—

Strong son of God, immortal love,

Whom we, that have not seen thy face,

By faith, and faith alone, embrace,

Believing where we cannot prove ;

Thine are these orbs of light and shade ;

Thou madest life in man and brute ;

Thou madest Death : and lo, thy foot

Is on the skull which thou hast made.

এই কবিতাংশের একটু ছায়া পড়িয়াছে । আবার—

তোমারি ত ক্ষুদ্রকণা

আমরা এ প্রতি জনা—

এখানে টেনিসনের

They are but broken lights of thee,

এই উক্তির গন্ধ পাওয়া যায় : আর—

দাও প্রেম—আরো প্রেম, চরপ্রেমময় !

আরো জ্ঞান, আরো ভক্তি,

আরো আত্মত্যাগ-শক্তি—

তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা গয় !

জীবন-মরণ-পানে

বহে যাক্ হুয়ে গানে,

হোক প্রেমামৃত-পানে অমর হৃদয় !

এখানে টেনিসনের—

Let knowledge grow from more to more,

But more of reverence in us dwell ;

That mind and soul, according well

May make one music as before

But vaster.

এই পঙক্তির একটু আভাস যেন পাওয়া যায় । এবং সর্বশেষে—

Forgive my grief for one removed,
 Thy creature, whom I found so fair.
 I trust he lives in thee, and there
 I find him worthier to be loved.

এই ভাবটা যেন অক্ষয় বাবুর—

কম' এ ক্রন্দনগীতি—শোক-অবসাদ !

সে ছিল তোমারি ছায়া—

তোমারি প্রেমের মায়ী !

এই পদগুলিতে আসিয়া গড়িয়াছে। কিন্তু এই সকল ভাবের আংশিক ঐক্য, হু'এক স্থলে, এমন কি, কোনও কোনও শব্দের অনুবাদ সত্ত্বেও, কিছুতেই অক্ষয়কুমারের এই কবিতাটিকে টেনিসনের অনুলকরণ বলা যায় না। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায়, হিন্দুর ভাবে, হিন্দুর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া, তাঁর এই কবিতাটি লিখিয়াছেন। টেনিসন সেইরূপ খৃষ্টীয়ানী ভাষায়, খৃষ্টীয়ানী ভাবে, খৃষ্টীয়ানী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁর কবিতা গড়িয়াছেন। টেনিসনের কবিতাটি যতই সুন্দর ও সু'মঠ হউক না কেন, অক্ষয়কুমারের কবিতার তুলনায় অভ্যস্ত লজ্জা—হাল্কা।

দুরন্ত বাগনাবস্টে সতত ঘূর্ণন,

নিরন্তর আত্মপূজা,

তোমায়ে যায় না বুঝা—

সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যঙ্গ, দুর্ভাগ্যে দুষণ।

মলিন চঞ্চল মনে

যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,

বুঝিতে দেয় না—তুমি কত যে আপন !

অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার !

আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি'

কত ভাঙ্গি—কত গড়ি,

করি কত সত্যমিথ্যা নিস্তা-আবিষ্কার।

নিজ সুখ দুঃখ দিয়া,

তোমায়ে গড়িয়া নিয়া,

বসি তব ভালমন্দ করিতে বিচার !

অক্ষয়কুমারের এই পদ দুইটির সঙ্গে টেনিসনের—

Forgive these wild and wandering cries,

Confusions of a wasted youth;

Forgive them, where they fail in truth,
And in thy wisdom make me wise.

এই পদের কোনই তুলনা হয় না। আর—

তার স্মৃতি সনে আজ তোমারি আশাদ !

টেনিসন কোথাও এই গভীর যোগের সন্ধান পান নাই। ইহার কাছে

I find him worthier to be loved—

নিভাস্তে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই অন্ধকারে বসিয়া দিবানিশি পড়িয়াছি। মনে হয়। আর এই দুইখানি কাব্যের কিন্তু তাহাতে জীবন-মৃত্যুর সমস্তাটিকে শেষের এই দুই আত্মনিবেদনে যে বৈষম্য, যে এষার মতন এমন তন্ন তন্ন করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছে, এমনটা কখনও অসম্ভব করি নাই। টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়ামে আত্ম স্মরণ, অতি পানোদ্যাপক; অতি মধুর কথা অনেক আছে। কিন্তু ভাবের ত্রিক্য, রসের সঙ্গতি, রচনার ঘনিষ্ঠতা বড় বেশী নাই। কবি বহু দিন ধরিয়া এই কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন। বিবিধ বিষয়কণ্ঠের বিক্ষিপ্তের মাঝখানে, এক একবার ছুটিয়া গিয়া এক একটা অংশ রচনা করিয়াছেন। যোগস্থ হইয়া, একে করসামুভূতিতে বিভোর হইয়া, লেখেন নাই। সুতরাং তাহার এই কাব্যে অনেক অবাস্তর কথা আছে। একটা রসের অভিব্যক্তি, স্তরে স্তরে একটা ভাব মাহুকের মনে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, শোকার্তের চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা; কিরূপ, আর বিবহরণটারই বা প্রকৃতি কি, ইহা একেবারেই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের “এবা” টেনিসনের “In Memorium” অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। “In Memorium”এর বুহনী আলগা, “এবা”র বুহনী ঠাসা। তারপর শোক-

গাথার মূল লক্ষ্যই করুণারসের অভিযুক্তি। নিদারুণ, মৰ্ম্মস্পর্শী কারুণ্য-অশ্রু বরিষা টেনিসনের কাব্যে যে গভীর কারুণ্য কোথায়? পড়িতেছে।

অক্ষয়কুমারের এই কাব্যখানির প্রতিছন্দে

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল !

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

(উপন্যাস)

৬)

পচণ্ড ধাক্কার দরজা 'হাট' হইয়া খুলিয়া গেল—দরজার সম্মুখে ভীষণ দর্শন এক মনুষ্যমূর্তি! পাঠক, এ মূর্তির সহিত পুঙ্কেই আমাদের প'রচয় হইয়াছে।

জীন কক্ষমধ্যে ছ' এক পদ অগ্রসর হইয়াই থামিয়া গেল। তাহার পৃষ্ঠের থলি, হস্তের গাঁইটযুক্ত যষ্টি, এবং তীব্র কঠোর দৃষ্টি—পেত-ছবির স্থায়ী ভীষণ! ম্যাগ্‌লোয়ারের চ'ৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যাণ্ড লোপ পাইল; সে শুধু ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ব্যাপ্তিস্থতাই প্রথমতঃ তাহাকে দৈর্ঘ্য ভয়ে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, তার পর ভ্রাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতে, পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন। মিরিয়েল শাস্ত্র-দৃষ্টিতে আগন্তকের প্রতি চাহিয়া ছিলেন।

জীন, মিরিয়েলকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই উচ্চকণ্ঠে ঝড়ের মত বলিয়া চলিল—

“শুনুন আমার নাম জীন ভাল্‌জিন। আমি একজন দাঙ্গী আসামী, ১৯ বৎসব গ্যালিতে কাটিয়েছি। চার দিন আগে ডাল' থেকে কারামুক্তি পেয়ে পঁয়তাল্লিশারের দিকে বরাবর হাঁটা পথে চ'লে আসছি। আজও

আঠারো ক্রোশ পথ হেঁটেছি। সন্ধ্যার সময় এ সহরে এসে পৌঁছেছি—এ পর্যাণ্ড যে হোটেল বা বাড়ীতে গিয়েছি সবাই আমার হ'ল্‌দে ছাড়পত্র দেখে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। জেলখানার গেলাম—তারাত ঠাই দিলে না। মাঠে গেলাম—অ'কাশ জুড়ে মেঘ উঠল, তারা নিভে গেল, ভাবলাম—বৃষ্টি হয় ত কোথায় দাঁড়াব! ভগবান্‌ নেই, বৃষ্টি থামাবেই বা কে! কাজেই ফিরে এসে বাগানের সামনে পাথরের বেঞ্চে শুয়ে ছিলাম;—এক রজ্জা এ' বাড়ী দেখিয়ে দিলে। এটা কি রকম বাড়ী? সরাইখানা কি? ভয় নেই, আমার পয়সা আছে। উনিশ বছর ধ'রে কয়েদ খেটে আমি ১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ সুস জমিয়েছি। ক্ষুধার আর চলতে পারিনে। আপনাদের এখানে জায়গা হবে?”

“ম্যাগ্‌লোয়ার, আর একখানা থালা আন।”

লেকটা ভাড়াভাড়ি অগ্রসর হইয়া মিরিয়েলের কথার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—
“করেন কি?—শুনুন, শুনুন—বুঝেছেন আমি কে?—আমি কি? আমি গ্যালির কয়েদী, সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছি। এই দেখুন—”

বলিয়া সে কোর্টার জেব হইতে একখানা ছাড়পত্র বাহির করিয়া বলিল—“এই দেখুন, এতে কি লিখছে।—‘জীন ডাল্‌জীন, সাং—, ১৯ বৎসর ধরিয়া গ্যালির করেরদী। পাঁচ বৎসর ডাকতির জন্ত, এবং চারিবার গলায়ন-চেষ্টার অপরাধে বাকী চৌদ্দ বৎসর। লোকটার প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর।’ এ দেখেও আপনারা আমাকে খেতে দেবেন?—শোবার জায়গা দেবেন? এটা কি একটা সরাই?—আপনাদের ঘোড়শাল আছে ত?”

“মাগলোয়ার, কোণের ঘরের বিছানার একটা ফরসা চাদর পেতে দিরা।”—তার পর আগন্তকের দিকে ফিরিয়া মিরিয়েল বলিলেন—“আমুন মশায়, এই আগুনের দিক্টার এগিয়ে এসে বসুন। খাবার হ’ল বলে; খেতে খেতে আপনার বিছানাও হ’য়ে যাবে এখন।”

লোকটা যেন ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল—কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এ ব্যবহার তাহার পক্ষে অপভ্রান্ত, অপূর্ব! তাহার ভীষণ-কঠোর সে মুখের উপর একে একে বিষয়, সন্দেহ এবং আনন্দের লেখা ফুটিয়া উঠিল! সে ছবি—নানাতাবসংঘাতের সে অপূর্ব মিশ্রণ—বাস্তবিকট দেখিবার জিনিষ! লোকটা উন্মাদের ভায়ে অসংবদ্ধ ভাষায় বলিতে লাগিল—“সত্যি? মিথ্যা নয়? ‘দূর হ, কুকুর’ ব’লে আর সবারই মত আমাকে ডাড়িয়ে দেবেন না? আমি জান্তাম—আমাকে দূর ক’রে দেবেন, তাই আগে থেকেই পরিচয়টা দিয়েছিলাম। আমার খেতে দেবেন?—গদি-চাদর-ওরালা বিছানার শুতে দেবেন?—বিছানা! হায়, উনিশ বছর ধ’রে বিছানার আর শুইনি। আপনার নাম?

আপনি বা চান, তাই দেবো। আপনি খুব ভাল লোক। আপনারই এ সরাই বুঝি?”

“আমি একজন ধর্ম্মবাজক। এই বাড়ীতে বাস ক’রে থাকি।”

“ধর্ম্মবাজক!—ওঃ, তা হ’লে আর আমাকে টাকাকড়ি কিছু দিতে হবে না, কেমন? আপনি ঐ বড় গির্জাটার পাদরী বুঝি? কি বোকা! এতক্ষণ আপনার টুপির দিকে চাই-ই নি—” বলিয়া, যষ্টি ও থলিটা সে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল।

“আপনার খুব দয়া! কই আমাকে ত যুগা করলেন না—তা হ’লে আমার কাছ থেকে আপনি টাকা চান না, কেমন?”

“না, টাকা আপনি রেখে দিন। কতদিনে আপনি টাকা ক’টি উপার্জন করেছেন?”

“উনিশ বছরে।”

“উনিশ বছরে!” মিরিয়েল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

জীন বলিতে লাগিল—“আমার সে টাকা সবই জমা আছে। পথে আস্তে আস্তে মজুরী খেটে কিছু পেয়েছিলাম, তাতেই এ চার দিনের খরচ চ’লে গেছে। আপনি একজন পাদরী না?—তবে একটা কথা বলি শুধুন—আমাদের জেলখানায় একদিন সর্দার পাদরী উপদেশ দিতে এসেছিলেন। আমরা বত করেদী তিন দিকে সারবন্দী হ’য়ে দাঁড়িলাম; পাছে আমরা কেউ কিছু করি ব’লে আমাদের ঠিক সামনে গোলন্দাজেরা গোলাস্তরা কামান নিয়ে পলাত জালিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর হুমুখের সেই ফাঁকা দিক্টার অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সেই সর্দার পাদরী বক্তৃতা করতে লাগলেন। তাঁর সে বক্তৃতা শুনতে পাওয়া

ত দুয়ের কথা, ভাল করে তাকে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। খালি তাঁর মাথার উপর কি একটা সোণার জিনিষ চক্‌মক্‌ করছিল, তাই দেখতে লাগলাম। এই হ'ল সর্দার পানরী, আর এই তাঁর ধর্মের উপদেশ!”

দরজাটা খোলা ছিল; মিরিয়েল নিজেই যাইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলেন।—বলিলেন—“রাত্রিটা বড় কনকনে। আপনার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।—মাগলোয়ার্‌ এঁর খাবারের জায়গাটা আঙনের দিকে করে দিয়ে।”

যতবার মিরিয়েল তাকে ‘আপনি’ ‘মহাশয়’ বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, ততবারই আগন্তকের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কয়েদী, বিশেষতঃ গ্যালির আসামীর পক্ষে স সম্মানভা, মরুভূমে তৃণায় কণ্ঠাগত শাপ জীবের পক্ষে শূন্যতা বা রূপ পাত্রের তায়ই লোভনীয়। শীতলা সম্মানের জন্ত এমনই দালায়িত হয়।

মিরিয়েল অকস্মৎ বাতিদানের প্রাণ চাহিয়া বলিলেন—“তাই ত, আলোটা বড় মিটমিট করছে যে!”

মাগলোয়ার্‌ তাহার অর্থ বুঝল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের আলমারী হইতে গোপানিধিত দুইটি বাতিদান আনিয়া, আলাইয়া, টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল।

জীন উত্তরোত্তর বিম্বিত হইতেছিল। বলিল—“এত দয়া আপনার! আমার ঘুগা না করে গুণে ঠাঁই দিলেন; আমি কে, তা জেনে শুনেও আমার জন্ত এত সম্মান দেখাচ্ছেন!”

মিরিয়েল পাশেই বসিয়াছিলেন; মৃদুভাবে

তাহার কর্ণস্পর্শ করিয়া বলিলেন—“আপনি কে, সে কথায় আমার প্রয়োজন নেই। এ গৃহ আমার নয়—ভগবানের। এখানে অতিথির নাম কেউ জানতে চায় না, তার কোন হুংখ আছে কি না, সেইটুকুতেই তার প্রয়োজন। আপনি ডঃ, ক্ষুধাতৃষ্ণার কাতর, এখানে আপনার অব্যবহৃত স্বার। না, ধন্যবাদ দেবেন না; আমি যে আপনাকে আমার বাড়ীতে আশ্রয় দিচ্ছি—এ কথা ভাববেন না। এ বাড়ীতে আমার বা অধিকার—আপনারও তাই,—বরঞ্চ বেশী। আপনার নাম আমি জানতে চাই না,—আপনি বলবার আগেই তা জেনেছি।”

লোকটা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে মিরিয়েলের প্রতি চাহিয়া বলিল—“সে কি?—কিলে জানলেন?” গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে মিরিয়েল উত্তর করিলেন—“কেন, আপনি যে আমার ভাই।”

লোকটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল—“আপনি মানুষ নন, দেবতা। কি বল্‌ব—ভাষা জানি না। আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই—সব ভুলে গেছি।”

“আপনি কি জীবনে অনেক হুংখ কষ্ট পেয়েছেন?”

“হুংখ কষ্ট! উ, সে কথা আর কেন বলেন? সেই লালপোস্তা, লোহার শিকল আর গোলা, কাঠের তক্তার শয্যা, অসহ্য গ্রীষ্ম, তীব্র শীত, কারণে অকারণে কশাঘাত আর নির্ণাতন, কথায় কথায় অকারণে নির্জন কারাগারে নির্দাসন, রোগশয্যা পড়েও শৃঙ্খলের হাত হতে নিস্তার নেই—উঃ, ককুরোও এর চেয়ে হুংখ থাকে।”

উনিশ বছর এইভাবে কেটেছে। এখন
আবার বয়স ছ'চল্লিশ। এতদিনে ছাড়া
পেরেছি, তবু এখনও তার জের চলছে এই
হৃদয়ে ছাড়পত্রই তার প্রমাণ।”

“সত্য বাট, আপনি অসহ্য ভ্রুংখয়প্রণা সহ্য
ক'রেছেন। কিন্তু এটা স্থির জ্ঞানবেন—স্বর্গ
একজন মাত্র যথার্থ অমৃত্যুপীর অশ্রুতে যে
আনন্দোচ্ছ্বাস জাগে শতজন সাধুপুরুষের
আগমনেও তা জাগে না। সে ভ্রুংখের কাণ
থেকে যদি মানবের প্রতি শুধু ঘৃণা ও বন্ধ্য
নিম্নে বাতিব চ'য়ে এসে থাকেন—তবে আপ'ন
করণার পাও; আর যদি সে ভুদ্ধির শিক্ষা
থেকে মহত্ত্বভাবকতা, চিত্তের প্রশান্তি এবং
সাধু সংকল্প লাভ ক'রে থাকেন—তা হ'লে
আপনি আমাদের মত সাধারণ যে কোন
লোকের চেয়ে অনেক বড়।”

মাগ্‌লোয়ার ইতিমধ্যে খাবার লইয়া
আসিয়াছিল,—নিতান্ত সাদাসিদা রকমের
অংগুরা; তবে মাগ্‌লোয়ার, কি বুঝিয়া,
আপনা হাতে এক পাত্র ভাল পানীয়ও
আনিয়াছিল।

“ব'সে পড়ুন, আর কি?”—বলিয়া
মিরিয়েল নিজেই আভাগ্য বন্টন করিতে
আরম্ভ করিলেন। আগন্তুক গোত্রাসে গিলিতে
লাগল। সহসা মিরিয়েল বলিয়া উঠিলেন
—“তাই ত, টেবিলটা খালি খালি লাগছে
কেন?” আসল কথা, অতিথি অভ্যাগত
আসিলে, রূপার ছয়খানা থালাই টেবিলের
উপর সাজাইয়া রাখার তাঁর নিয়ম ছিল।
মাগ্‌লোয়ার তিন জনের উপযোগী তিনখানি
মাত্র থালা বাহির করিয়াছিল।—মিরিয়েলের
‘বড়মাহুবি’র মধ্যে এইটুকুই ছিল। এত

বে কৃত্রিম বড়মাহুবির ভাব, ইহাতে এমন
একটা শিশুগলভ সরলতা মিশ্রিত ছিল, যাহা
তাহার সাংসারিক দারিদ্র্যকে মহিমামণ্ডিত
করিয়াই তুলিত। আজ সে লোকও নাই,
সে মনস্ত-গৌরবও আর দৃষ্টিপথে বড় পড়ে না।

মাগ্‌লোয়ার বাকী তিনখানা রূপার থালা
আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল।
লোকট তখন কোন দিকে না চাহিয়া ঘাড়
হেঁট করিয়া খাইয়া যাঁতেছিল। আহা!দির
পর সে বলিল—“মহাশয়, আমার পক্ষে এ
খাবার আশার অ'তিরিক্ত। কিন্তু তবু সত্য
কথা বলিতে কি—সে গাড়েমান গুলিও
অ'পনার চেয়ে ভাল খায়।”

অন্ত কেহ হইলে হয় ত এ কথায় ক্ষুব্ধ
হইত, কিন্তু মিরিয়েল সহজভাবে উত্তর
করিলেন “তা হবে, হয় ত আমাদের
চ'ইতে তাদের বেশী পরিশ্রম করতে হয়।”

“তা নয়। তারা আপনার মত এত
গরীব নয়। আমি যা ভাবছিলাম, আপনি
বুঝ তাও নন। ভগবান যদি ভ্রাতৃবিচারক হন,
তবে একদিন আপনি কুারে হবেন।”

“ভগবান খুবই ভ্রাতৃবান।” বলিয়া
একটু থামিয়া মিরিয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—
“মহাশয়, তা হলে পরিত্যক্তগারেই বাবেন?”
“হাঁ, আর কোথায় যাব? কাল
প্রভাতেই রওনা হ'তে হবে। অনেকটা পথ।
এ অঞ্চলে রাজিটা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাটলেও
দিনমানটা বেশই গরম থাকে দেখছি।”

“তা, পরিত্যক্তগার বেশ জায়গা।
কাজেরও সেখানে অভাব নেই। কাগজের
কল, তেলের কল, চামড়ার কারবার, ঘড়ির
কারখানা, ইস্পাতের তাঁমার কারখানা, আরও

অসংখ্য ছোট বড় কারবার সেখানে আছে। আমাদের জানা শুনা লোকও সেখানে আছেন। তবে ছুথের কারবারটাই সেখানে খুব বড়—কত শত মণ ধূস ছানা দই ক্ষীর সেখান থেকে প্রতিদিন বিদেশে চালান হয়।” বলিয়া মিরিয়েল বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সে যেন অপর দশজনের মতই সাধারণ একজন মানুষ—তার জীবনের কোনখানটাই যেন কলঙ্কমণ্ডিত নয়! বস্তুতঃ এমন একটা সুন্দর সুযোগ, পানীর প্রাচ্য সাধুর উপদেশ-চেষ্টা, নিঃস্বার্থভাবে ছুরিকা চালাইয়া পানের ক্রেদপরিপূর্ণ শ্বেষণ-নাশী উন্মুক্ত করিয়া পানের প্রাচ্য পানীর বাগাতে যথার্থ যুগা জন্মে, তাহার প্রয়াস—এ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া বরং তিনি তাহার অত্যন্ত জীবনটাকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবাইতেই চাহিতে-ছিলেন। যথার্থ করুণা এইখানেই নয় কি? অতীতের ভারে যে প্রতানয়নতই প্রপীড়িত হইতেছে—তাহাকে মুহূর্তের জন্তও সে কথা ভোলানই কি যথার্থ করুণা নহে?—এই যে মর্থাপ্রাণতা, যাহা সকল বস্তুতঃ উপদেশ দূরে রাখিয়া, হৃদভাগের জীবনের ক্ষত স্থানে চক্ষুস্পর্শ করিয়া তাহার যন্ত্রণা আর বৃদ্ধি করিতে চায় না;—এই যে সঙ্কোচের ভাব,—ইহাতে কি যথার্থ দেবত্বের ভাষাপাত নাই?

আহারান্তে উপাসনাদির পর মিরিয়েল বলিলেন—“চলুন মশায়, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই আসি।”

একতালার সবশেষের কক্ষটি অতিথির জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। মিরিয়েলের শয়নকক্ষের মধ্য দিয়াই তাহার একমাত্র প্রবেশ-পথ।

অতিথির সঙ্গে মিরিয়েল যখন আপন কক্ষ দিয়া যান, তখন ম্যাগ্লোয়ার তাঁহার শয্যা-শিখরস্থ দেওয়াল-আলমারিতে রূপার পাত্র-গুলি তুলিয়া রাখিতেছিল; শয়নের পূর্বে এটা তাহার প্রতিদিনের কাজ ছিল।

শয্যা প্রস্তুত ছিল। মিরিয়েল বলিলেন—“ভা হ’লে আপনি এখন শু’ন। স্নানিয়া হোক! কাল সকালে রওনা হবার আগে একবাটি গরম দুধ খেয়ে তবে যাবেন।”

“সে আপনার অসুগ্রহ।”—বলিয়া সহসা লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। সতর্ক করিবার জন্ত, না ভয় দেখাইবার জন্ত, না তাহার সহজাত-বাক্যের বশবর্তিতায়—কে জানে কিসের জন্ত। সে সহসা উত্তেজিতস্বরে বাকিয়া উঠিল—“সে কি মশায়? আপনার এত কাছে আমাকে শুতে দিচ্ছেন? আপনি পংগল না কি? আমি যে একজন খুনী নই, আপনাকে কে বললে?”

মিরিয়েল ধীরস্বরে উত্তর করিলেন—“সে ভাবনা ভগবানের—আমার নয়।” বলিয়া বৃদ্ধ আগন্তকের দিকে ধীরে ধীরে আপন দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন করিয়া নীরবে তাহাকে আলীকর্ষাদ করিলেন, তার পর নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তখনও তাঁহার শয়নের সময় হয় নাই। বাগানে আদিয়া তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন এবং ভগবানের যে রহস্যময় অপূর্ণ লীলাটৈচিত্র্য সভীর রজনীতে ভাবময় মানব-চক্ষে ফুটিয়া ওঠে, তাহারই ধ্যানধারণায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

এদিকে, লোকটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিল যে আমাজুতা না ছাড়িয়াই—হুঁ দিয়া

বাতিটা নিভাইয়া দিয়া, একেবারে বিছানায় আসিলেন। ক্ষণপরেই সে ক্ষুদ্র বাড়ীটি
 গিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তপরেই গাঢ় নিদ্রাভিত্তিত গভীর শ্রুষ্টির কোড়ে মগ্ন হইয়া গেল।
 হইল। (ক্রমশ)

মিরিয়েল অনেকক্ষণ পর ফিরিয়া

শ্রীশ্রীধীরচন্দ্র মজুমদার।

সুখ-স্মৃতি

১

চির-সাবধী বীণাখানি ছিল মোর করে !

প্রভাতে গাহিত পাখী,

ফুলে ছেয়ে যেত শাখী,

জাগিত হৃদয় মোর কি পুলক ভরে।

আকাশ-বাতাস-ভরা—

কি যেন আকুল-করা—

হরষ-প্রাবন আসি' পড়িত অন্তরে—

আজি মনে পড়ে।

২

গগনে প্রথর রবি,

শ্রামল প্রান্তর-ছবি,

অলস মধ্যাহ্ন-বেলা—পতঙ্গ-গুঞ্জন ;

নিবিড় প্রচ্ছন্ন বট,

জনহীন নদীতট,

বন্ধ-তরী হলে শ্রোতে—বার্ষ আকিঞ্চন—

টুটিতে বন্ধন।

৩

পাখী উড়ে নীলাকাশে,

কৃষ্ণ বিন্দু যেন ভাসে,—

আঁখি ছুটি তারি পানে—সে যেন আপন !

মেঘ তপ্ত স্নিবিড়

কোথা' তার আছে নীড়,

ক্ষুদ্র স্বপ্ন হৃৎ তার—গৃহীর মতন

কলহ-মিলন !

৪

কুটিত সন্ধ্যার তারা,

গুহ্র জ্যোৎস্নারধারা

ঢালিত আকাশে চাঁদ—হাসি' সুধাহাসি ;

বসিতাম বীণা নিয়া,

তৃপ্তরূপা কাছে প্রিয়া,

ভাবিতাম—প্রিয়ার সে স্কন্দরূপরাশি—

কত ভালবাসি !

৫

বীণায় কাঁপিত সুর,

প্রেমস্বপ্নে পরিপূর—

চাহিতাম প্রিয়ামুখ—সুখমার সার !

এই স্বর্গ—এই সুখ,

জানি না কোথায় তখ,

কোন শূন্য কোন দৈন্ত নাহি প্রাণে আর—

এত সুখ কার !

৬

হেরি' নিদ্রালস-ভরে—

আঁখি-পাতা ঢুলে পড়ে

প্রিয়ার আমার—বীণা রাখিতাম পাশে !

সুখস্বপ্নে বাত তার

বাধিত গলার হার।

হারি ! সে সুখের নিশি যদি ফিরে আসে—

এ বিদহ নাশে !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

পাথরের সন্দেশ

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগে প্রস্তর কত কথাই বলিতেছে, কত সংবাদই দিতেছে, অতীতের কত গৌরবকাহিনী বিবৃত করিতেছে। যে ইতিহাস মানুষ লিপিবদ্ধ করে নাই, অথবা লিপিবদ্ধ করিলেও জলবায়ুর দৌরাত্ম্যে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পাষণ সে ইতিহাসও বক্ষে ধারণ করিয়া যুগযুগান্তের পর মানুষের ঘরে আসিয়া হাজির হইতেকে। সহস্র সহস্র বৎসর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকিয়া আব্বা রক্ষা করতঃ যে কাহিনী সে এত দিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া জসংকে চমৎকৃত করিতেছে, কত কুসংস্কারের মণ্ডকে কুঠারাঘাত করিতেছে। কি উড়িয়ায়, কি দাক্ষিণাত্যে, কি পাঞ্জাবে, সর্বত্রই পাষণ-স্থপতি ও ভাস্কর্য্যের অভুলনীর কীৰ্ত্তি সকল ঘোষণা করিতেছে। খণ্ডগিরি, উষ্মগিরি, পুরী, ভুবনেশ্বর বা কণার্ক, ইণোর, এলিফ্যান্টা, অজন্তা বা পাণ্ডুবগুফা, দিল্লী, আগ্রা বা কুতুব—যেখানে বাওয়া যাক্, সকলেই নীরবে জাতীয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া কেবল মাত্র বাঙ্গালীই একটা আক্ষেপ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে—তাহার দেখাইবার কিছু নাই। স্বদেশের এই সম্ভাপ নিবারণের জন্য তাহার একমাত্র বাজনী ছিল এই যে, এই প্রস্তরবিহীন প্রদেশে তখনও ভাস্কর-শিল্পের স্থান নাই। বাহাও বা ছিল, তাহাও আর হাওয়ার প্রতিকূলতার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। একবার একজন বাঙ্গালী ডেপুটীর হুখে

শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন যে উড়িষ্যার অনেক কীৰ্ত্তি বাঙ্গালী শিল্পীর রচিত। যে বাঙ্গালী নিজের দেশে কিছুই করিতে পারে নাই, সে বাহিরে বাইরা কৃতিত্ব দেখাইতেছে, ইহার পক্ষে যুক্তি এই যে, দেশে প্রস্তরের অভাব। দেশে পাথরের ব্যাখ্যাতা নাই বলিয়া বিদেশ হইতে ব্যাখ্যাকার আমিয়া-ছিল বলিয়া যে জাতির প্রবাদ, তাহায়া কি বিদেশ হইতে প্রস্তর আনিয়া আপনাদের কীৰ্ত্তি স্বদেশেই চিরস্থায়ী করিতে পারিত না? এই সন্দেহ মনে আগিলেও, খোসা খবরের কুটাও ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গিয়াছিল। সময়ে সময়ে শিল্পচাতুর্য্যের উই একটা নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিদেশ হইতে আনীত বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্বারিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটয়াছে, বাহাতে বাঙ্গালীকে আর মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে না। মৃত্তিকার নিম্ন হইতে এমন বৃহদাকার প্রস্তর-খণ্ড সকল পাওয়া গিয়াছে যাহা তৎকাল-কার্য্যের উপযোগী করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, কোনও দৈব-হুর্নিশাকে কার্য্যক্ষেপ হয় নাই। ইহাতে অসম্ভাব্য হয় যে, প্রস্তর বিদেশ হইতে আনীত হইলেও, শিল্পী দেশীয়। বিষয়টি এখন আর কেবল মাত্র অসম্ভাব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। যেরূপ অস্ফলকান-সমিতি বাঙ্গালী জাতির এই বিধ্বংস কৃতিত্ব প্রত্যক্ষী-কৃত করাইয়া সমগ্র জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আরও দৌরবের কিঞ্চিৎ এই যে, এই সমিতি সম্পূর্ণরূপেই বাঙ্গালীর

কীৰ্ত্তি—ইহার অনন্যাতা বাঙ্গালী, ইহার পরিচালক বাঙ্গালী।

বরেন্দ্র-অম্বুসন্ধান-সমিতি নানা দিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে তোলপাড় কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস যে লক্ষ্মণেন্নের পলায়নের ইতিহাস নয়, কিন্তু যে সময়ে উত্তর ভারত বিদেশীর আক্রমণে বিধ্বস্ত, সেই সময়ে বাঙ্গালীই সগর্বে সাম্রাজ্যস্থাপনের জন্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান—এই ইতিহাস সেই গৌরবজনক ইতিহাস। বাঙ্গালী কোনও কালেই যে ষষ্ঠাংশ দিয়াই আপনার রাষ্ট্রবিষয়ক কর্তব্য শেষ করে না, কিন্তু সেই অন্ধকার-যুগেও অরাজকতার সময়ে স্বনির্বাচিত রাজা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল এবং যুরোপ যে সময়ে ধর্ম্ম লইয়া কাটাকাটি করিতেছিল, বাঙ্গালী সেই সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা দিয়া রাষ্ট্র চালাইতেছিল—আমরা সেই ইতিহাস, গুনিতে পাইতেছি। অতীতকে সমিতি যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা বারা ভারতের ধর্ম্মবিকাশের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোঠা আলোকিত হইবে। কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস তত্ত্বে প্রাপ্ত হওয়া বাইবে। কিন্তু সে কথা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। আজ কেবলমাত্র তত্ত্ব ও ভাষ্য-শিল্প-বিষয়ক সংগ্রহের কথাই বলিব—এবং তাহাও অতি সংক্ষেপে। বিশেষ বিবরণ, বাঙ্গালী পাঠক ১৩১২ সালের কার্তিক মাসের ‘সাহিত্যে’ প্রাপ্ত হইবেন।

বরেন্দ্র-অম্বুসন্ধান-সমিতি রাজসাহীতে যে সংগ্রহাগার স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটয়াছিল। কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গিয়াছিলাম, জনস্রের চিরদিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা মিটিবে—এ ধারণাই তখন ছিল না। কত দ্রুত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, কত শিলালিপি, কত প্রস্তর-মূর্ত্তি! ধাতু ও দারুনির্ম্মিত সংগ্রহও আছে। কিন্তু প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ হৃন্দর স্মৃতি আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যবদীপে কতকগুলি মূর্ত্তি পাইয়া পণ্ডিতগণ মহাসমস্তায় গড়িয়াছিলেন—এগুলির আদর্শ কোথা হইতে আসিল? কিন্তু ভরসা হয়, বরেন্দ্র-অম্বুসন্ধান সে সমস্তার মীমাংসার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছেন। স্বর্গ্যমূর্ত্তি, অন্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের কত কথা যে খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চক্ষুমান খুঁজিয়া বাহির করিবেন। আমি মাত্র একটা মূর্ত্তির কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মূর্ত্তিটা বিষ্ণুর বাহন গরুড়। ইহা যে বাঙ্গালীর হস্তরচিত, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ঐ মূর্ত্তিটির মধ্যেই রহিয়াছে। বিষ্ণু যেন স্বীয় বাহনের উপর ইচ্ছা করিয়াই একটু চাপ দিয়া বসিয়াছেন, গরুড় সে চাপ অগ্রাহ্য করিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে, ইহাই মূর্ত্তিটির বাহ্যদৃশ্য। কিন্তু শিল্পীর সমস্ত শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে গরুড়ের মুখে। শিল্পী আপনার প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া তন্ময়ভাবে একটা মহান আধ্যাত্মিক ভাবকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। ভগবান, সর্ব্বদাই তত্ত্বকে

পরীক্ষায় কেলিয়া অনল-দগ্ধ সর্পের ভায় উজ্জল করিয়া তোলেন।—
“যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ ;
তবু যদি না ছাড়ে পাশ, হই তার দাসের দাস।”
ইহা ভক্তি-শাস্ত্রের কথা। ভক্ত সর্বদাই আনন্দ-হৃদয়ে ভগবানের সকল ভার বহনে প্রস্তুত। মৃত্যুতেও তিনি আনন্দ-চিন্ত। ভগবান্, তুমি যত ভারই চাপাও না কেন, তোমার প্রসাদে আমি সকল ভারই অতিক্রম করিতে সমর্থ—গুরুদমুর্তি যেন দিব্যকণ্ঠে এই কথা বলিতেছে। প্রস্তরখানিতে বিখ্যাদের দৃঢ়তা, নির্ভরের আনন্দ এবং সর্বোপরি ভগবন্তের সন্ধানন্দ হাসিমুখ যেন মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে। ভক্তিকে এমন প্রকট মূর্তি দিবার ক্ষমতা বাঙ্গালী ভিন্ন জগতে আর কাহারও নাই। মূর্তিখানিতে বাঙ্গালিহ যেন দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সমিতির ভোষাখানায় আমি যতক্ষণ ছিলাম, অধিকাংশ সময় এই রত্নটির নিকটেই ফেপণ করিয়াছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারই নিকটে আসিয়াছি এবং এই আবিষ্কারের জন্ম

অনুসন্ধান-সমিতির যিনি মেরুদণ্ড, তাঁহাকে মনে মনে শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। মনে মনে এইজন্ম যে, ধন্যবাদ লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হওয়া এক কঠিন কার্য্য। তিনি আদর্শ-কর্ম্মী। অস্ত্রে যে স্থানে একগুণ কার্য্য করিয়া দণ্ড গুণ প্রশংসার জন্ম লাগিয়াছে, তিনি সে স্থানে আত্মগোপন করিবার জন্মই বাস্তু। অথচ অকাতরে তিনি এই কার্য্যের জন্ম সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া স্থানান্তরে দুই কথা লিখিয়াছিলাম, প্রফু-দেখিবার সময় তিনি স্বহস্তে তাহা কাটিয়া দিলেন। বজ্রের জমিদারগণ ঘরে বাহিরে অনেকেরই চক্ষুঃ শূল কিন্তু তাঁহারা যদি কুমার শরৎকুমারের অনুকরণে দেশের মঙ্গলে আপনাদিগকে নিয়োজিত করেন, তবে জনসাধারণের শুভাকাঙ্ক্ষার উপর তাঁহাদিগের আসম প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং সে শূল তাঁহাদিগের গাত্রও স্পর্শ করিবে না, কেবলমাত্র প্রতিপক্ষেরই চক্ষের বেদনা জন্মাইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

বধন জগদীশবাবু বালেশ্বর জেলার পুলিশের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন সেই সময়ের পুলিশের ইন্স্পেক্টার জেনারেল কর্ণেল পিউ সাহেব উক্ত জেলার পুলিশের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ম তথায় যান ; গিয়া

জগদীশ বাবুকে বলিলেন—“আমি আপনার পুলিশের কর্ম্ম দেখিতে চাহি না ; আমি আমি, উহা উত্তম ; বীমস্ সাহেবও আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন। আমি আপনার বিশিষ্টাঙ্গী সৎকার্য্য দেখিতে চাহি।” জগদীশবাবু উত্তর

করিলেন—“আপনি ঐ কর্ণ দেখিবেন বলিয়া আমি আর ভিন শত কনষ্টবল স্ত্রীজাতি আনিয়া রাখিয়াছি; তাহাদের অস্ত্র লইয়া সজ্জিত হইয়া এখনই আনাইতেছি।” কনষ্টবলেরা লাইনের মাঠে সমবেত হইলে, পিউ সাহেব বয়ং স্থানে স্থানে নিশান গাড়িলেন এবং বলিলেন—এইটী জঙ্গল, এইটী নদী, এইখানে শত্রুরা আছে; আপনি বয়ং হুকুম দিয়া আপনার কোজকে লইয়া যান, বাইবার সময় সমস্ত ম্যাঙ্কয়েল ও গ্লাস্টন এক্সারসাইজ্ দেখাইয়া যান।” অগ্নীশবাবু তাহাই করিলেন এবং এমন সূচকরূপে ঐ কর্ণ সম্পন্ন করিলেন যে, পিউ সাহেব ছুটিয়া আসিয়া হতমর্দন করিয়া উল্লক্ষে অরম্ভ ঘোষণা করিলেন; বলিলেন—“দেখুন, আপনি বাবালী, এই কর্ণে আপনার দোষ আমি নিশ্চয় পাইব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু যেতিয়া যে, আমার পন্টুনে কন্স-চারীদের অপেক্ষা আপনি ভাল কাজ করিয়াছেন, আমি গবর্ণমেন্টে আপনার সব্বদে পেন্সিয়াল্ রিপোর্ট করিব। আশ্চর্যের কথা, আপনি শিখিলেন কেমন করিয়া? বিউগল ধ্বনি করিবার সময় ভুল করিয়াছিল; তাহাও আপনি জানিতে পারিয়া ভুল ধরিয়া তাহার ছই টাকা জরিমানা করিয়াছেন। খজ্ঞ আপনার অধাবসার!” বালেশ্বরে থাকিবার সময় সার্জ রিচার্ড টেম্পল্ ইহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রদান করিবার জন্ত বড়লাটকে লেখেন। অগ্নীশ বাবু এ সম্বাদ পাইয়া, তখনই ছোটলাটকে লিখিলেন এবং রায় বাহাদুর লিষ্ট হইতে আপনার ক্রম কাটাওয়া নিষিদ্ধ হইলেন। টেম্পল্ সাহেব মৃত্যু বিবক হইলেন, কিন্তু উপর অল্পকালও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

বালেশ্বরে একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ অগ্নীশ-বাবুর আদালী ছিল; এ লোকটি সাত হাত লম্বা এবং গৌরবর্ণ, ভাল আঁক বলিয়া পূর্ববর্তী পুলিশ সাহেবেরাও ইহাকে আদালীর পদে রাখিয়াছিলেন; এই লোকটার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা উড়িয়া যুবতীকে দেখিয়া তাহার প্রেমানন্দি হইল। গতীয় রাত্রে পুলিশ সাহেবের বাটী তাগ করিয়া সে বুড়াবলং নদীর ধারে সেই জী-লোকটার ঘরে বসে এবং প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই জীলোকটা অপর একটা ধনী ব্যবসায়ী মাইতি কায়স্থকে আপনার নিকট আসিতে দিত। কনষ্টবল এ কথা জানিতে পারিয়া ইহাকে বণে—‘দেখ, তোমার জন্ত আমি জাহ্ দিয়াছি এবং তোমার প্রেমে আমি পাগল, তুমি আর কাহাকে আসিতে দিও না।’ জীলোকটা সে কথা শুনিবে কেন? মাইতি যথেষ্ট পরমা দিত, স্ত্রতরাং সে তাহাকে আসিতে নিবারণ করিত না। একদিন রাত্রে কনষ্টবল যেমন উভার ঘরে ঘাইতেছে, সেই সময়ে মাইতিও ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। যেমন তাহাকে দেখা, অমনি কোথর হইতে তলোয়ার খুলিয়া আদালী এক কোণে তাহাকে কাটিয়া, নদীর জলে কাপড়, তলোয়ার ধোত করিয়া, পুলিশ সাহেবের বাটী আসিয়া শয়ন করিল। প্রাতঃকালে যখন জেল ও টেজরীর গার্ড এক লাইনের স্বামীর রিপোর্ট করিতে আসে, তখন কনষ্টবলও সেলাম করিয়া (ভালুট) দাঁড়াইয়াছিল। সকলে লাইনে প্রোভট্রাফ রোজ দিয়া ফিরিতে লাগিল, কনষ্টবল হাতে

মাঠে চলিল। ইত্যবসরে সিনিয়র টাইন্স ইন্সপেক্টর সারদাপ্রসাদ বহু আসিয়া রিপোর্ট করিলেন—“সহরে একটা খুন হইয়াছে।” জগদীশ বাবু উত্তর করিলেন—“তদারক করগে।” সারদাবাবু অধপৃষ্ঠে উঠিয়া চলিয়া গেলেন; লাইনে পৌছিয়া, কনষ্টবল, হেড্ কনষ্টবল প্রভৃতি অত্যন্ত করুণারূপে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কাপড়-ওরালা মাইতি কায়স্থটি যে খুন হইয়াছে, তাহাকে কি তোমরা কেহ চেন? যদি জান, তবে বলিতে পার, বুড়াবলং মদী তীরে সে অত রাত্রে কেন গিয়াছিল।” জনৈক কনষ্টবল বলিল—“হুজুর, ওখানে একটা বেঙ্গা আছে, তাহারই নিকট রাত্রে ঐ মাইতি যাইত।” সারদাবাবু বলিলেন—“সে বেঙ্গাটার কাছে আর কেহ যাইত, তাহা কি জান?” কেহ সঠিক বলিতে পারিল না। একজন বলিল—“পুলিশ সাহেবের আদালী শোভন সিংহকে ঐ জীলোকটার বাটিতে যাইতে দেখিয়াছি।” তখন সারদা বাবু বলিলেন—“শোভন সিংহের চরিত্র খুব উত্তম, সে ২০টা গুড্ কন্ডাক্ট্ ট্রাইন্স পাইয়াছে, সকল পুলিশ সাহেবদের সে প্রিয়; অমন লোক বেঙ্গাবাড়ী কেন যাইত? যাহাই হউক, তাহাকে ডাকিয়া এ বিষয়ের কিছু জানে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষতি কি, একজন কনষ্টবল গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আন।” কনষ্টবলটি ডাকিতে চলিল এবং লাইনের মাঠের উপর দিয়া চলিল, পুলিশ সাহেবের বাটি এবং লাইনের মধ্যবর্তী স্থানে, এক বৃক্ষের তলায়, শোভন সিংহকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাইল; কাছে গিয়া তার মুক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল,

মুখখানার যেন চিনের সিন্দূর মাখাইয়া দিয়াছে; আরক্তিম মুখ এবং চক্কু দুটিও যেন লাল হইয়াছে এবং ঘুরিতেছে। তবুও সাহসে ভর করিয়া কনষ্টবল বলিল—“শোভন সিংহ, তোমাকে সারদা বাবু বোলাওতা ছায়া; নদী-কিনারে ক্যা খুন হয়, উস্কা বাত্ তোমাকে কেয়া পুছেগা।” যেমন ঐ কথা শুনা, শোভন সিংহ অমনি তলোয়ার খাপ হইতে খুলিল এবং বঙ্গগস্ত্রীরস্বরে বলিল—“যাও, তোমারা ইন্সপেক্টর শালাকো কহো মেয় নেহি জায়েঙ্গা, মেয় খুন কিয়া, মেয় ফাঁসি জায়েঙ্গা।” কনষ্টবল আর দিকৃক্তি না করিয়া লাইন অভিযুখে ছুটিল এবং সমস্ত সংবাদ জানাইল। সারদা বাবু, সাহেব রিজাভ ইন্সপেক্টর, সাহেব হেড্ কনষ্টবল, ~~পুঞ্জাবী~~ সুবেদার এবং নানাদেশীয়, নানাজাতীয় কনষ্টবলগণ ছুটিল। কনষ্টবলদের ভিতর উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, গুরখা, পাঠান, আফগান প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকই ছিল; লাঠী, শোটা, তলোয়ার, বন্দুক, বেগনেট লইয়া সকলে ছুটিল। গাছ-তলার নিকট পৌছিলে শোভনসিংহ বলিল—“দেখো, হামারা নগিচ্ কই মং আও, আনেসে যেয়সা উস্কা কাটা, তেরসা তোম্ লোককো বি কাটেগা, হাম বোলতা ছায়া মেয় খুন কিয়া, মেয় ফাঁসি যায়েঙ্গা।” কেহই অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না, ছররা দিয়া বন্দুক ভরিয়া রাখা হইল। শেষে সাব্যস্ত হইল—পুলিশ সাহেবকে খবর দাও। জগদীশবাবু সংবাদ পাইয়া, যে বেশে ছিলেন, সেই বেশেই চলিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটা কিন-পাঁও ইজের, একজোড়া মোজা ও চটি জুতা, একটা জামা, তার উপর একটা আলখাল্লা

মতন। দ্রুতপদে তিনি চলিলেন এবং নীচ গাছতলার নিকট পৌঁছিলেন। তাঁর পৌঁছিবাব পূর্বে সকলে বলিতেছিল “যদি পুলিশসাহেবের উপর চড়াও করে, তবে আমরা ছঁরা-গাদা বন্দুক উহার গায়ে মারিব।” জগদীশবাবু কাহাকে কিছু না বলিয়া কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, একেবারে খুনে শোভন-সিংহের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন “তলোয়ার ফেঁকো, আবি তলোয়ার ফেঁকো।” এই ছকুম দিবার সময় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; শোভনসিংহ তাঁহার মুখের দিকে তুই একবার তাকাইয়া তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া জ্বালুট করিয়া দাঁড়াইল। তখন জগদীশবাবু ছকুম দিলেন—“ইহার হাতে হাতকড়ি দাও।” কেহ অগ্রসর হয় না; তখন তাহার জামার আস্তিন ধরিয়া বলিলেন “লাগাও হাতকড়ি।” সুবেদার দৌড়িয়া গিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন। তখন জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“তান এ খুন কিয়া?” “হাঁ ছজুর” উত্তর আসিল। তখন “লে বাঙ” বলিয়া জগদীশবাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল এবং একবাক্যে বলিতে লাগিল—“কি সাহস, কি বীরত্ব।” কতকগুলি লোক যারা পূর্বে পল্টনে কাজ করিত এবং যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিয়াছে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—“এ রকম বিক্রম আমরা যুদ্ধে কিবা অপর কোন কার্যে দেখি নাই।”

বালেশ্বরে চাঁদবালী বন্দর খুলিবার জন্ত জগদীশবাবু বিস্তৃত করিয়া রিপোর্ট করেন। তাঁহারই রিপোর্ট পাঠিয়া গবর্নমেন্ট এই বন্দর খুলিলেন। বালেশ্বরে সমুদ্রের কিনারে নিমকের

পোক্তান এখনও হয়। সমুদ্রকিনারা জঙ্গলপূর্ণ, নানা হিংস্রক জন্তুতে পরিপূর্ণ। স্তত্রাং চোরাই পোক্তানি খুব চলে। গবর্নমেন্টের তহাতে বহু ক্ষতি হয়। চৌকি পাহারা করিবার জন্ত ছয়মাসের জন্ত অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত হয়। তাহাদের ঠিকা চাকরি, স্তত্রাং অতিরিক্ত রোজগারের আশায় তাহারা পোক্তানকারীদের সহায়তা করে; সরকারের নিয়মিত লোকসান হয়। কাপ্তেন চেম্বার্স নামক জনৈক ডিপুটি ইন্স্পেক্টার জেনারেল চুরি বন্ধ করিবার জন্ত জঙ্গলের ভিতর হস্তিপুষ্ঠে পুলিশ বসিয়া পাহারা দিবার ব্যবস্থা করেন; বায়ামিক্য হয় বলিয়া তাঁহার পস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। জগদীশবাবু এক অ্যেকশন করিয়া চুরি বন্ধ করেন, নিমকের অস্থায়ী পুলিশকে তিনি স্থায়ী পুলিশের কার্য করিতে দিলেন এবং স্থায়ী পুলিশকে নিমক মহলে কার্য করিতে পাঠাইলেন, স্থায়ী দলকে বলিলেন—“দেখ, তোমাদের চিরদিনের রুটি, লোভে পড়িয়া তাহা হারাইও না, এক ছটাক অতিরিক্ত লবণ যেন পোক্তান না হয়। ভাল কাজ করিলে আমি তোমাদের নীচ পদোন্নতি করিয়া দিব।” অস্থায়ী পুলিশকে বলিলেন,—“তোমাদের ছয় মাসের জন্ত ঠিকা কর্ণ। যদি স্থায়ী পুলিশে আসিতে চাও, চোরাই লবণ ধরিতে চেষ্টা কর; এক ছটাক ধরিলেও তোমাদের মঙ্গল হইবে।” এই রকম উভয় পুলিশদিককে উত্তেজিত করার অতিরিক্ত আইনবিরুদ্ধ পোক্তান একেবারে বন্ধ হইল। অতিরিক্ত পোক্তানিটা কি, তাহা বুঝাইয়া বলি। ব্যবসায়ীরা কেহ জিশ হাজার মণ, কেহ পঞ্চাশ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে সরকারকে

মাণ্ডল প্রদান করেন। লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে, সমুদ্রের জল চাই; সুতরাং সকল পোস্তানই (লবণ তৈয়ার করা) সমুদ্রের কিনারে হয়। এখন এ সব স্থান জঙ্গলপূর্ণ, হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি; ঐ সামান্য অতিরিক্ত পুলিশদল বাতাত পাহারা দিবার অপর কেহ নাই, এই দলকে টাকায় বশীভূত করিয়া জিশ হাজার মণ করিব বলিয়া পঞ্চাশ হাজার মণ 'তৈয়ার' করিয়া লইলে, কে আমার প্রতিরোধ করিবে? সরকারকে বিশ হাজার মণ তৈয়ার করিবার জন্য মাণ্ডল ফাঁকি দিলাম, অনেক টাকার সুবিধা হইয়া গেল।

জগদীশবাবুর বাঙ্গালা নামের উপর কি যত্ন ছিল এবং কেমন করিয়া তিনি পুলিশদলের উপর ডিসিপ্লিন্ (discipline) রক্ষা করিতেন, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি— নৌগারি জঙ্গলের ভিতর, গড়জাত এলাকার একটা পুলিশ ষ্টেশনে ঘর নির্মাণ হইতেছিল, জগদীশবাবু ঐ ঘরটা দেখিতে যান। ঘরটির দরজা জানালা তখন কিছুই বন্ধ নাই, চতুর্দিক খোলা ছিল। জগদীশবাবুকে এ ঘরে রাখে বাস করিতে হয়। সামান্য একটা খাটিয়ায়, তিনি শয্যা করিয়া শয়ন করিলেন। রাজি যখন গভীর হইল, চতুর্দিকে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক এবং অপরাপর জন্তুর ভীষণ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। জগদীশ বাবুর নারায়ণ বলিয়া একটা বাঙ্গালী খান্দামা, ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে সেই প্রভুর খাটিয়ার নিম্নে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রহরী বলিয়া উঠিল— “দেখো, বাঙ্গালিকা কাম, পুলিশ সাহেব নিদ্ যাতা হায়, এ বাঙ্গালি উন্কো খাটিয়াক। তলেমে যাকে ঘুমা।” এ কথা শুনি, জগদীশ বাবুর কর্ণে গেল,

তখন তিনি সহসা উঠিয়া, মে অন্ধকারে একাকী ষ্টেশন-ঘরের চারি পার্শ্বে অকুতোভয়ে বেড়াইয়া আসিলেন এত নিকটে জন্তু-গুলি চিংকার করিতেছিল যে, প্রদক্ষিণের সময় কেন না কোন একটা জন্তু তাঁহার সম্মুখে আসিতে পারিত, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ অকারণ বিপদ আহ্বান করা কেন? তিনি বাঙ্গালী, পাহারাওয়ালা বাঙ্গালী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী নামের গৌরব-রক্ষার্থে এবং তাঁহার অধীনস্থ ফোর্সের (force) ঠিক চাল বজায় রাখিবার জন্য, তিনি বিপদকে অগ্রাহ করিয়া, নিজ মহত্বের পরিচয় দিলেন।

বানেশ্বরে একটা দৈব ঘটনার কথা উল্লেখ করি, মেজিষ্ট্রেট-কলেজের নরমান্ সাহেবের বাটীতে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া জগদীশ বাবু যান। বাইবার সময় কাপবরটান হারপারের বাড়ীর তৈয়ারি একজোড়া জুতা (shoes) পরিতেছিলেন, সহসা তাহা খুলিয়া কেলিয়া মন্টিন কোম্পানীর প্রস্তুত একজোড়া ব্যাল-মোরাল বুট (Balmoral boot) পরিলেন। পরিবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—“দেখ, রাত্রে আসিব, ‘হু’র পরিবর্তে একজোড়া বুট পরা ভাল।” স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন— “কেন, আনিতে গাড়ি বাইবে না?” তিনি বলিলেন—“দিবসে ‘হু’টা বোড়া অধিক খাটিয়াছে, রাত্রে জুতিবার আবশ্যক নাই, বরং সর্দার বেহারাটা একটা লঠন লইয়া যেন যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিও।” রাজি দুইটার সময় যখন মজলিস ভাঙ্গিয়াছে, তখন জগদীশ বাবু বেহারার তত্ত্ব লইলেন। সে ব্যাটা সুখে স্বচ্ছন্দে সাহেবের বেহারার ঘরে

নাসিকার রব করিয়া নিদ্রা বাইতেছিল; সাহেবের চাকরদের ভিতর কেহই তাহার থাকিবার স্থানের কথা অবগত ছিল না, কোন সন্ধান না পাইয়া জগদীশবাবু পদব্রজে চলিয়া গেলেন। একটা খ্রীষ্টানপাড়ার ভিতর দিয়া যেমন বাইতেছেন, পথ জুড়িয়া একটা গোথুরা সর্প শয়ন করিয়াছিল, জগদীশবাবু তাহার মধ্যস্থলে যেমন পা দিয়াছেন, অমনি সে বিষধরটা তাঁর পায়ে ৩৪ ছোবল মারিল; কামড়গুলো বুটের উপর পড়িল, তাহার কিছু হইল না, বাঁচিয়া গেলেন, জুতা জোড়াটি পরা থাকিলে, কি অনর্গহই ঘটিত, কে যেন তাঁহাকে জুতা ছাড়িয়া বুট পরিতে বলিল, ভগবান এই প্রকারে তাঁর রক্তদের

বাঁচাইয়া থাকেন। রাত্রে বাটা পৌছিয়া জগদীশবাবু আদালীকে লঠন আনিতে হুকুম দেন। লঠন আসিলে, তাহার আলোকে দেখিলেন বুটের উপর তখনও বিষ রহিয়াছে, সর্পটা ছুটিয়া আসিয়া পাছে কামড়ায়, এই আশঙ্কায় জগদীশবাবু তাহার মাথা পদদলিত করিয়া ডাঙ্গিয়া দিয়া ছিলেন, কনষ্টবলদের সেই সর্পটাকে তুলিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহারা সেটাকে আনিলে, দেখিলেন—তখনও সে গর্জন করিতেছে, এক ‘বাণ’ অপেক্ষাও লম্বা, কনষ্টবলরা তখন সেটাকে লণ্ডাঘাতে সংহার করিয়া অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিল।

(ক্রমশ)

রসের রূপ—মাধুর্য্য

(২)

রস দুই জাতীয়;—এক স্থায়ী, অপর অস্থায়ী। রসতত্ত্ববিদেরা হস্তান্তরাদিকে অস্থায়ী বা আগন্তুক, আর দাস্তাদিকেই স্থায়ী রস বলিয়া থাকেন। হস্তান্তর আগন্তুক রস ইতর কল্পনাও আশ্রয়ন করিয়া থাকে। দাস্তাদি স্থায়ী রস কেবল মাতৃবেই আশ্রয়ন করিতে পারে। আর স্থায়ী এবং অস্থায়ী—এই উভয়বিধ রসের মধ্যে মাধুর্য্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরাকাশ্চ্য জটিল। মাধুর্য্য দাস্তাদির গুণ

আশ্রয় করিয়া হস্তান্তর আগন্তুক রস সকলও অতি মৃদুভাবে ফুটিয়া উঠে। সচরাচর হস্তান্তর আগন্তুক রসের পরস্পরের মধ্যে একটা স্থিতি-বিরোধ জাগিয়া রহে। যে আধারে যে সময়ে ইহার কোনও একটা রস ফুটিয়া উঠে, সেই সময়ে সেই আধারে অপর কোনও আগন্তুক রস ফুটিবার স্থান ও অবসর পায় না। রসের আবির্ভাবে হস্তান্তর বিরোধ অনিবার্য্য। কোথের সঙ্গে কার্ণেশ্বর সমাবেশ ও সমন্বয় অনন্তর ও

অসাধ্য। কিন্তু মাধুর্য্যেতে সর্বদাই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে। মাধুর্য্যরস-নিমগ্ন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ক্রোধ ও কান্দনা, ভয় ও অভয়, কোমল ও ক্রূর প্রভৃতি বিপরীতভাব সকল জাগিয়া উঠিয়া পরস্পরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দেয়। এই কারণে মাধুর্য্য এত জটিলতা প্রাপ্ত হয়। আর এইজন্যই মাধুর্য্যের রূপ বা মূর্তিও একদিকে যেমন নিরতিশয় মনোহর, অন্যদিকে সেইরূপ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে।

রসের যাবতীয় রূপই জীবদেহে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু দাস্ত-সখাদি স্থায়ী রসের মধ্যে মাধুর্য্য রস যেমন করিয়া মানুষের দেহকে অধিকার ও অভিভূত করে, এমন আর কোনও রসে করিতে পারে না। অন্যদিকে অপর কোনও রসে মানুষের শরীরকে অধিকার ও অভিভূত করিয়াই, আবার পলে পলে তাহাকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া যাইবার ক্ষমতা এতটা পলয়নয় সংগ্রামও উপস্থিত করে না। এ রস মানুষের এই দেহে, তার ইন্দ্রিয়গ্রামকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়, সত্য। কিন্তু আবার এই দেহের দেহত্ব অর্থাৎ তার জড়ত্বকে এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব অর্থাৎ তাহাদের আপনার বিশিষ্ট বিষয় ভোগ করিবার যে প্রবল লোভ আছে, সেই লোভকে নষ্ট না করিয়া, এ রস কিছুতেই আপনার চরম চরিতার্থতাও লাভ করিতে পারে না। এই রস সত্যসত্যই “দধেধন-মিবানলম্”—দধেধনানিস্থত অনলের ভায়। কাঠে কাঠে ঘষণ করিয়াই প্রাচীনকালে আশ্বিন জালাইতে হইত। কিন্তু যে কাঠ-খণ্ডের ঘর্ষণে এই অগ্নির প্রথম উৎপত্তি

হইত, সেই অগ্নি আপনার প্রথম আগ্রহ সেই কাঠকলককে বা অরণীকে নিঃশেষ দহ্য করিয়াই ক্রমে আপনার পূর্ণতম ও উজ্জ্বলতম রূপ এবং স্বরূপকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিত। মাধুর্য্যরসেরও এই ধর্ম্ম। মাধুর্য্যও মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া, তার ইন্দ্রিয়-গ্রামের মনন হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ক্রমে সেই দেহের জড়ত্বের ও তার ইন্দ্রিয়কুলের স্বাভাবিক বিষয়লিপ্সার একান্ত নিরসন না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাতে এই অপূর্ণ রসের স্বকীয় রূপ ও স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

রসমাত্রাই প্রবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তির পথই রসের পথ। নিবৃত্তিমার্গে এ বস্তু মিলে না। আর মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তির মধ্যে কাম-প্রবৃত্তিই সর্বোপেক্ষা বলবতী। জীব এ জগতে দুইটা প্রবৃত্তির তাড়নায় এত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এক তার ক্ষুৎপ্রবৃত্তি, আর অপর—এই কামপ্রবৃত্তি। জীবের ক্ষুধার প্রেরণা অতিশয় বলবতী। তার কামের সজ্জকণ এই ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষা কোনও অংশে দুর্বল নহে। কলতঃ মূলে একই প্রয়োজন হইতে জীবের ক্ষুৎপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি,—এ দুয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে। জীবস্থিতিরক্ষাই সেই মূল প্রয়োজন। জীব আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবে, এইজন্য ভগবান্ তাহাকে এই বলবতী ক্ষুধা দিয়াছেন। সে আপনার বংশরক্ষা করিবে, এইজন্য তাহাকে এই দুর্বল কাম-প্রবৃত্তি দিয়াছেন। জীবস্থিতিভঙ্গনিবারণই জীবের ক্ষুধার তাড়না ও কামের সজ্জকণের মূল প্রয়োজন। দুইটাই জীবের আদিপ্রবৃত্তি। কিন্তু ক্ষুধাটা কদাপি রসপদবাচ্য হয় না।

ক্ষুধাটা একান্তই একটা শারীর ক্রিয়া। অন্নময় কোষেই তার উৎপত্তি, অন্নময় কোষেই তার বিলয়। ক্ষুধা আপনি জীবকে কোনও আনন্দ দান করে না। ক্ষুধার তৃপ্তিতে একটু আরাম ও আনন্দ লাভ হয় বটে; কিন্তু অতৃপ্ত ক্ষুধায় কেবল যন্ত্রণাই আছে, কোনও আনন্দ নাই। এই বিষয়ে কামের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কামের সফলতাই আনন্দ জাগিয়া উঠে। ক্ষুধার বৃদ্ধির সঙ্গে জীবের বেদনাই কেবল বাড়িয়া যায়; সে যাতনার ভিতরে কোনও সুখ, কোনও উল্লাস, কোনও আনন্দ কখনও থাকে না। কিন্তু, কাম যত বাড়ি, তার পিপাসা যত পবল হয়, সে পিপাসার যাতনা যত গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে, ততই সে ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গেই, আবার অক্লান্ত উৎসাহ, অতুপম উল্লাস এবং প্রমাদও জাগিয়া উঠে। এ অদ্ভুত প্রবৃত্তিকে বিধাতা বিষম্মতে একত্র করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। এই কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে মাধুর্য্য রসের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এইজন্তই “কামগায়ত্রী” মাধুর্য্য সাধনের বীজমন্ত্র। কিন্তু পক্ষ আর পক্ষজ যেমন এক বস্তু নয়, সেইরূপ কাম আর মাধুর্য্যও ঠিক একই বস্তু নহে। হৃৎক্ষেত্রে স্বর্গনরক প্রভেদ রহিয়াছে। হীন ও হেয় পক্ষেই যেমন পক্ষজের জন্ম হয়; সেইরূপ লোকে সচরাচর যাহাকে হীন ও হেয় কামপ্রবৃত্তি বলে, তাহা হইতে মাধুর্য্যেরও উৎপত্তি হয়। কয়লা হইতে হীরক জন্মে, তাই বলিয়া কয়লা আর হীরক এক হয় না। সেইরূপ কাম হইতে জন্মে বলিয়া, কাম আর প্রেমও এক হয় না। ফলতঃ সচরাচর, বিশেষতঃ আজিকালিকার কাম-

প্রধান সভাভা ও সাধনা কামকে যেরূপ হীন এবং হেয় মনে করে, তাহাও ঠিক সঙ্গত নহে। প্রজননই কামের কর্ম্ম। এইজন্ত কামের অভিমানী দেবতা কন্দর্পও শ্রীভগবানেরই বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। “প্রজননশচামি কন্দর্পঃ”— প্রজননের জন্ত আমিই কন্দর্প। সৃষ্টিলাভায় এই কন্দর্প বা কামই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ সহায়। এই কামাদেবতা বা কন্দর্পই বিশ্বের বিশাল প্রাণস্রোতকে পুষ্ট করিয়া, জীবিস্থিতি রক্ষা করিতেছেন। ভগবদ্বিভূতি বলিয়া কন্দর্পও নমস্ত। কামও হীন বা হেয় নহে। প্রজনন-ধর্ম্মের পুনরুৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে, ইউজেনিকের (Eugenics) প্রতিষ্ঠার কল্পে, আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনাতেও কামের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রজননসম্পর্কবধান হইয়া, কাম যখন কেবলমাত্র ভোগপরম হইয়া উঠে, তখনই তাহা হেয় ও হীন হইয়া পড়ে। জীবিস্থিতি-রক্ষার জন্ত যে প্রবৃত্তির সৃষ্টি, স্বধন্যভূত হইয়া, তখন সেই প্রবৃত্তিই জীবিস্থিতিভঙ্গের সহায় হইয়া উঠে। আর ভোগপরম লোকে পবিত্র কামপ্রবৃত্তিকে তার স্বধন্যভূত করিয়া তার বর্তমান অধোগতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনেরা প্রজননের জন্তই কামের সেবা করিতেন। তাঁহাদের কাম ভোগপরম ছিল না। এইজন্তই সেকালে লোকে কামের নাম করিতে একটুও সঙ্কুচিত হইতেন না। তাঁরা “কামায় কামপত্যে”—বলিয়া সর্বলোক-সমন্বয়ে, মিতান্ত নিঃসঙ্কোচে কল্পা সম্প্রদান করিতেন। আর কামের মর্যাদা তাঁরা জানিতেন বলিয়াই, সকল রসের সেরা,

সর্বাংগে; আধ্যাত্মিক-সম্পদ-সম্পন্ন যে মাধুর্য্য-রস, তাহাকেও শৃঙ্গার বা আদিরসের সঙ্গে একপার্থ্য্যরভুক্ত করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠা বোধ করেন নাই।

ফলতঃ শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য একই বস্তু। সাহিত্যে যাহাকে শৃঙ্গার-রস বা আদিরস বলে, রসতত্ত্বে তাহাকেই মাধুর্য্য বলিয়াছেন। সাহিত্যের রস আর ভক্তির রস একান্ত বিভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে। ভক্তির সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভক্তি শ্রীভগবানকে নিখিলরসামৃত-মূর্তিরূপেই ভজনা করে। আর শ্রীভগবানেতে যে সকল রস নিত্য ফুটিয়া থাকিয়া, তাঁর এই নিখিল রসামৃতমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই সকল রসই সাহিত্যেরও উপজীব্য। মানবের যাবতীয় রস-পরিমাসা ও রসসৃষ্টি সেই ভগবল্লীলারসকে আশ্রয় করিয়া, তারই উদ্দেশে অবিরাম ছুটিতেছে। সত্য বটে যে শ্রীভগবানের রসমূর্তি অতীন্দ্রিয়, অপ্ৰাকৃত; আর সাহিত্যের সাধারণ রসমূর্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং প্রাকৃত। কিন্তু

প্রাকৃত আর অপ্ৰাকৃত গুণবাচক শব্দমাত্র, বস্তুবাচক শব্দ নহে। ইহারা বস্তুর গুণমাত্রই প্রকাশ করে, সে বস্তুর বস্তুত্বকে নির্দেশ করে না। ইহাতে বস্তুর গুণেরই বৈষম্য বুঝায়; কিন্তু কোনও মৌলিক পার্থক্য বুঝায় না। রস-বস্তু এক, দুই বা বহু নহে। যাহাকে প্রাকৃত বলি, তাহাও সেই রস, যাহাকে অপ্ৰাকৃত বলি তাহাও সেই একই রস। আকারের বৈষম্য, প্রকাশের ইতর-বিশেষ, গুণের তারতম্য আছে, কিন্তু বস্তু এক। কেবলমাত্র গুণভেদে প্রাকৃতাপ্রাকৃতের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত রস রাজসিক বা তামসিক, তাহা মলিন। প্রাকৃত দেহের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-দিগকে আশ্রয় করিয়া, প্রাকৃত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও প্রেরণায় যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা প্রাকৃত রস বলিয়া থাকি। কিন্তু এই প্রাকৃত রসই যখন আবার নির্মল হইয়া সাত্বিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই অপ্ৰাকৃত পদবাচ্য হইয়া থাকে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রামাবতী

(৪)

পাল-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেও আশ্বমক্যর অস্ত্র বিপুল উত্তমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। রামাবতী-নির্মাণ তাহার প্রমাণ-রূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। রামাবতী নির্মিত হইবার পূর্বে রাজধানী কোন্ স্থানে

বর্তমান ছিল, তাহার পরিচয় অত্যাশি উদ্ঘাটিত হয় নাই। সে রাজধানী পরিত্যক্ত ও নূতন স্থানে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল কেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

রামাবতী-নির্দ্বাভা রামপালদেবের পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল ইতিহাস-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার আমগাছী গ্রামে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এক কৃষক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইবার পর, তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য নানা চেষ্টা প্রবর্তিত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত কোলকাত্ত তাহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণমাত্র প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হরনালি একবার সম্পূর্ণ পাঠের উদ্ধার-চেষ্টায় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গভ্যংশের সম্পূর্ণ পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। গভ্যংশের পাঠ এখনও বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অন্ত চেষ্টা করিতেছেন।

এই তাম্রশাসনে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহার দীর্ঘকাল পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক পরিচয়-বিজ্ঞাপক প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবদেবের কমোলি গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, মদনপালদেবের মনহলী গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে, এবং গোড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দি-বিরচিত রামচরিতম্ কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের নাম ও কৌতুকলাপ উল্লিখিত থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব এখন মদীপালদেবের পৌত্র এবং মদনপালদেবের পুত্র। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পরিচয় সকল তাম্রশাসনেই একরূপ,—তাঁহাকে কোমল

ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই। তাঁহার নিজের তাম্রশাসনে এবং তাঁহার পৌত্র মদনপালদেবের তাম্রশাসনে আছে,—তিনি “শক্রকুল-কালকৃত্ত” ছিলেন। বৈষ্ণবদেবের তাম্রশাসনে আছে—তিনি “সর্কাকারজি-সংসিদ্ধ” ছিলেন। একরূপ সাধারণ ভাবের পরিচয়ে ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

রামচরিতম্-কাব্যে এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া, একটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। তাহার সহিত তাম্রশাসনোক্ত প্রশংসা বাক্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সত্য সত্যই “শক্রকুল” ছিল। তাঁহার শত্রু প্রবলগরাক্রমশালী ছিলেন। অবশেষে সেই শত্রু তৃতীয় বিগ্রহপালের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া, “কপাল-সন্ধি” সংঘটিত করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কর্ণ,—তিনি দাহলাধিপতি ছিলেন। রামচরিতম্-কাব্যের (১১২) শ্লোকটি এই,—

সহসা-বিতরণ-জিতকর্ণঃ কৌলীঃ

যৌবনশ্রিয়োদূহে।

অশ্রীকৃত-দানবারাতি-শরো যোহভূদ্‌বাহুচরঃ ॥

এক অর্থে এই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের জনক দশরথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অন্য অর্থে এই শ্লোকেই আবার রামপালদেবের জনক তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দশরথ-পক্ষে যে তাৎপৰ্য্য পাঠ করিতে হইবে, শ্লোকটি সেইভাবে উপরে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল-পক্ষে যে তাৎপৰ্য্য পাঠ করিতে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সহস্রাবিত-রণজিত-কর্ণ: কোণী:

যৌবনশ্রিষোদুহে।

অশ্রান্ত-দানবারা-তিশয়ো যোহুত্বাংসুচরঃ ॥

রামচরিতম্-কাব্যের টীকায় উভয়পক্ষের অর্থ উদঘাটিত হইয়াছে ; এবং তৃতীয় বিগ্রহ-পাল-পক্ষের অর্থোদঘাটন-সময়ে টীকাকার বলিয়া দিয়াছেন, — দাহলাধিপতি কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়া, তৃতীয় বিগ্রহ-পালদেব রণপরাজিত কর্ণকে উন্মূলিত না করিয়া, তাঁহাকে “রক্ষিত” করিয়াছিলেন। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য টীকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

[দশরথ-পক্ষে]

“সহস্রেনত্যাদি। যো দশরথো যৌবনশ্রিয়া তর্কণিয়সংপত্ত্যা সহ কোণী মুদুহে। সহসা বিতরণেন অবলম্বিত-দানেন জিতঃ কর্ণঃ কানীনো যেন। অশ্রান্ত অপ্রাপ্তশ্রমো দান-বারাতীনঃ দেবানাং শয়ঃ করো যশ্মাং। অতএব চি অমুর-পরাজয়-সন্ধে: বিবুধৈঃ করণে গ্রহরণ-গ্রহণ-শ্রমোহপি নাসাদিতঃ। তথাহি বুঝাংসুচরঃ শচীসহচরাংসুচরোহুভুং।”

[বিগ্রহপাল-পক্ষে]

“অন্তঃ। যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণন্ত রাজ্ঞঃ সূতয়া সহ কোণীমুদুহবান্। সহসা বলেন অবিতো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণো দাহলাধিপতি যেন। রণজিত এব পরন্ত রক্ষিতো, ন উন্মূলিতঃ। কপালসঙ্ঘি-ঘটনাং। দানবারো দান-সমুচ্চরো ভূমি-কাঞ্চন-কল্প-ভূষণাদিভিনামাপ্রকারং দানঃ

তত্ত্ব অতিশয়ঃ প্রাচুর্যং স চ অশ্রান্তোহ-
বিজ্রিয়ো যন্ত অত এব বুঝাংসুচরো ধর্মীভূগতঃ।”

টীকাকার এইরূপে সমসাময়িক ঐতি-
হাসিক ঘটনার সন্ধান প্রদান না করিলে,
মূল শ্লোক হইতে সমাক্ত অর্থ সহসা প্রতিভাত
হইত না। শ্লেষের অনুরোধে কবি ইচ্ছামত
শব্দ চয়ন করিতে পারেন নাই;—যেদ্রুপ
শব্দ চয়ন করিলে, উভয়পক্ষের অর্থ প্রকাশিত
হইতে পারে, সেইরূপ শব্দ চয়ন করিতে বাধ্য
হইয়াছেন। সকল শ্লিষ্ট কাব্যের অবস্থাটি
এইরূপ। তজ্জন্ত সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নিকট
যে অর্থ অনায়াসলভ্য থাকে, উত্তর কালে
টীকার অভাবে তাহা লুপ্ত হইবার আশঙ্কা
থাকিয়া যায়। রামচরিতম্-কাব্যের যে
অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই, সেই অংশের
শ্লোকাবলীর অর্থবোধে নানা গোলযোগ
উপস্থিত হইয়াছে। তাহা যথাহানে উল্লিখিত
হইবে। কর্ণপরাজয়-কাহিনী রামচরিতের
ভূমিকায় এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ;
যথা,—

“Within a short time of the
accession of Vighrahapala, he came in
conflict with Karna, who was very
severely beaten. His kingdom lay
at the mercy of Vighrahapala. But
Vighrahapala spared both the king
and his kingdom. Karna entered
into a treaty with him, acknow-
ledging his supremacy ; and Kar-
na's daughter Yauvanasri was
married to Vighrahapala”

এই বিবাহোৎসব বিজয়োৎসব। কাব্যের

উপাধানরূপে গৃহীত হইলে, ইহা একখানি সরস কাবেরি আখ্যানবস্তুকে রনসিক্র করিতে পারে। বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই আখ্যান-রস্তু এখনও সেরূপ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। বেলাবো-লিপি আবিস্কৃত হইবার পর, আরও একটু অধিক সমাচার প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, —কর্ণের বীরশ্রীনায়ী কস্তার সহিত বিক্রম-পুরাধিপতি জাতবন্ধার বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে দাহলাধিপতি সকল বঙ্গভূমির সহিত শ্রীতিশূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকালে আর কোনও ঘটনা সংঘটিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব কতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহা অত্যাপি নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে নাই। তাঁহার আমগাছী-লিপিতে তদীয় বিজয়রাজ্যের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত থাকায়, কেহ কেহ তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র মনে করিয়া কালগণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অমুকুল প্রমাণ আবিস্কৃত হয় নাই; বরং কিছু কিঞ্চিৎ প্রতিকূল প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় মহীপাল, মধ্যম শূরপাল ও কনিষ্ঠ রামপাল। রামপাল-পুত্র মদনপালদেবের মনহালি-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাম-

পাল তাঁহার জনকের “দীর্ঘ শাসন-সময়ে” শৈশব হইতেই বাহুবিক্রমের পরিচয় প্রদানে শত্রুরাজ্যকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের এই পুত্রস্বর্য যৌবন-শ্রীর গর্ভেৎপন্ন ছিলেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বরং প্রসঙ্গাধীন বর্ণনায় মনে হইতে পারে,—তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সহিত দাহলাধিপতি কর্ণের সংগ্রাম-সংগর্ষ-সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও বাহুবল প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাহা হটক, তৃতীয় বিগ্রহপাল-দেব যে [চিরং] দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া ছিলেন, এই স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে, তাঁহার শাসনকালকে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র বলিয়া কালগণনা না করাই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকাল গৌরবমণ্ডিত বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাঁহার বাহুবল অল্প ছিল না। তাঁহার বাহুবলে দাহলাধিপতিও পরাভূত হইয়া, কস্তাদানে সন্ধি সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন-সময়েই আর একটা অচিন্তিতপূর্ব বিপ্লবের বীজ ধীরে ধীরে লোকলোচনের অগোচরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বিপ্লব এখন ইতিহাসে “কৈবর্ত-বিপ্লব” নামে কথিত হইতেছে। তাহার কথাই রামচরিতম্-কাব্যের প্রধান কথা,—তাহার কথাই রামা-বতী নির্যাতনের প্রধান কথা। সুতরাং তাহার আলোচনা অপরিহার্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

নারী

পূর্ণ-প্রস্ফুটিত খেত-শতদল-সম
 মাধুরী বিকাশি'
 প্রথম যে দিন, নারি, মানবের গৃহে
 দেখা দিলে আসি'—
 নিশীথ-সমুদ্র পারে—সহসা যেমন
 রবির উদয়—
 সে দিন জাগিল বিশ্বে কি মহাপুলক,
 অসীম বিশ্বয় !
 অনন্ত-বিস্তৃত এই গ্রহ-তারাবিহীন
 নিখিল ভুবনে,
 কে জানিত এত শোভা—রহস্য অপার—
 আছিল গোপনে !
 হে নারি, তোমার দিবা নরতির মাঝে
 লভিয়া উপমা—
 সে দিন সার্থক হ'ল জগতের বসন্ত
 বিচিত্র সুধমা !

উষার অরুণ রাগ বিধিত—তোমার
 তরুণ অধরে,
 নিবিড় কজল-মেঘ—তরঙ্গিত ওই
 কৃষ্ণ কেশতরে !
 স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আকাশের নীলিমা তোমার
 প্রশান্ত নয়নে,
 মুগ্ধ পূর্ণিমার শশী হেরে প্রতিকল্প
 তোমার আননে !
 সেই হ'তে, নারি, তোমা' কত ছন্দে গীতে
 বন্দিয়াছে কাব,
 কল্পনার শত বর্ণে চিত্রকর তব
 আঁকিয়াছে ছবি।
 শিল্পীর সাধনা নিত্য গড়িতে তোমার
 অনিন্দ্য প্রাক্তমা,
 কবিতা-সঙ্গীত-শিল্পে বিভাসিত, নারি,
 তোমার মহিমা।
 শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা

উজানি—শ্রীকৃষ্ণদরজ্ঞন মল্লিক প্রণীত। রাতের
 ক্ষুদ্র পল্লী উজানিতে বসিয়া কবি পল্লীজীবনের
 প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের রেখা-চিত্র
 আঁকিয়াছেন। সমালোচনা করিবার পূর্বে
 কবির উৎসর্গ-পত্র হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত
 করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।
 —“মা, মহাকবি কবিকল্প তোমার উজানির
 গুণগৌরবগাথা, তোমার খুলনা, ধনপতি,
 শ্রীমন্তের অপূর্ণ কাহিনী—অমর সঙ্গীত তোমার

গুনাইয়াছেন। আজ তোমার ক্ষুদ্র কবি
 তোমার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথা তোমার
 গুনাইবে।” আমাদের মনে হয়, কবির এই
 উৎসর্গ-পত্রই সমস্ত গ্রন্থখানির key-note.
 বাস্তবিক, বাংলার এই ছায়ালীতল, শাস্তি-
 সৌন্দর্য্যপূর্ণ গ্রামের ও গ্রামবাসীর যে চিত্র কবি
 আমাদের আজ গুনাইয়াছেন, তাহা আধুনিক
 কৃত্রিমতাপূর্ণ কবিতার দিনে একান্ত দুর্লভ।
 পল্লীগ্রামবাসী আমরা, এ কবিতাগুলি

পড়িতে পড়িতে, মনে হয় আমরা যে দিন
‘হারিহর’—তাহা আবার যেন ফিরিয়া পাই
—আবার সেই বালাকালেব স্নেহময়ী পল্লী-
মাতার সুখখানি যেন আমাদের চোখের সামনে
আদিয়া দাঁড়ায় চক্ষু জলে ভরিয়া আসে।
স্বপ্নার ঔপজাদিক শ্রীশচন্দ্রের পরে—আমা-
দের খাটি বাংলার নিখুঁত চিত্র বঙ্গভাষার আর
কেহ আঁকিয়াছেন কি না, জানি না। আজ
‘উজানি’র কবি—সেই বাংলার রেখা-চিত্র
লইয়া উপস্থিত—ইহাতে রংয়ের বাহুল্য, বৃহৎ
উদ্দেশ্যের জটিলতা নাই বটে; কিন্তু তিনি যে
সামান্য রেখাপাতে খাটি বাংলার এবং খাটি
বঙ্গালীর প্রতিদিনের সুখ-দঃখের চিত্র
আঁকিয়াছেন—তাহা আমাদের হৃদয়ে এমন
একটা স্থান-স্পর্শ করিয়াছে, যাহা বহুদিনেব
হারান পুরাতন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রিয়জনের
আঁখি সোপানে রক্ষিত ছিল। ‘উজানি’ পড়িতে
পড়িতে আমাদের মনে হইতেছিল—

‘ইন্দ্ৰমাণি বীক্ষ্য মধুরাংশে নিশমা শব্দান্
পশুংসুকো ভবতি যং সখিতোহপি সন্তঃ।
‘ভক্ততঙ্গা স্মরতি নুনমবোধপূর্বস্ম
‘ভাবস্তিরাপি জননাস্তরসৌহদানি’”

দ্বীচি (নাটক)—শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়
রচিত। মূল্য (কাগজের গলাট)
১ টাকা। দেবানন্দ-বুদ্ধে দেবগণের
‘কল্যাণার্থ মহবি দ্বীচির আশ্রয়দানের ঘটনা
লইয়া এই নাটক রচিত। গ্রন্থকার নিবেদনে
বলিয়াছেন—“ভক্তি ভিন্ন দেবজয় সম্ভব নয়;
ভক্তি-বলেই ভক্তি ভগবানকেও ভয় করে না।
বুঝ যে কেবল শওবেই স্বর্গ অধিকার
করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া

বিবেচনা করি না; তাই ধর্মের, ভক্তির ভিত্তি
উপরে ব্রহ্ম-চরিত্র স্থাপন করিয়াছি।” প্রবন্ধ
উপস্থাপ্ত বিষয়—অধ্যাত্মিক অহঙ্কৃত দেবগণের
পতন ও উদ্ধৃতি এবং ধর্মাত্মের পুনরায়
তাঁহাদের উত্থান; ব্রহ্ম ‘মাত্র উপলক্ষ
বিশ্বের বিধান’। দেবানন্দ-বুদ্ধের নামে যে
বিশ্ববিকার চিত্র, ভীমকান্তি কঠোর দানব-
রাজ্যে যে ছবি, স্বতঃই আমাদের সম্মুখে
ফুটিয়া ওঠে—এখানে তাহার কিছুই দেখা যায়
না। তাড়বলীলাবত রূপের পক্ষান্তে শিবের
শান্ত নোমামূর্তি, বজ্রপীড়িত শুকগজীর বরষার
বর্ষণের পর ধরিত্রীব শান্ত্রী—সে ছবি তেমন
ভংগ ফুটে নাই। তেজোহীন, নিষ্ক্রিয়, নিলিপ্ত
ব্রহ্ম যেন অনাসক্ত মুমুকু ধোঁগীর স্থায়।
কোথাও তাহার চবিত্তের একটা স্বাতন্ত্র্য
ফুটিয়া ওঠে নাই। ব্রহ্ম ভক্ত বটে, কিন্তু
ভক্তির তেজ তাহাতে নাই, তেজের গোরবও
নাই। ব্রহ্ম-চরিত্রে সামান্য মানবের মত
এতটা পরাধীনতার ভাব—এতটা আত্মশক্তির
অভাব আমরা দেখিতে চাই না। আত্ম-
শক্তির বিকাশের সহিত যে ধর্মের ও ভক্তির
সম্বন্ধ, তাহাই যথার্থ স্পৃহণীয়। ধর্ম প্রাণ
ভারতে নিষ্ক্রিয়তা—অসামান্তির কথা অনেক
গুনিয়াছি,—সকল চরিত্রকেই এক তুলিকার
আঁকিলে চলিবে না। নাটকটি মুখ্যতঃ ভক্তি-
মূলক। দ্বীচি, দ্বীচি, ব্রহ্ম, জগা, শক্তি—সবই
এক ছাঁচে ঢালা;—ইঞ্জের চরিত্র চলিত কিংব-
দন্তীয় (tradition) অল্পরূপেই হইয়াছে। তবে,
ভক্তি-মূলক নাটক হিসাবে ইহা ভাল হইয়াছে।
ইহাতে ভাব আছে, ভাষা সরলস্বাভাবী,
লিখনস্বাভাবিক, ছাপা কাগজের পরিষ্কার।

সম্পাদক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেউতাকার বাড়ি, ১৩২৬ বঙ্গবর্ষে দেউতাকার বাড়ি।

[ত্রয়োদশ বর্ষ]

কার্তিক, ১৩২০

[৭ম সংখ্যা]

বঙ্গদর্শন

(নব পর্যায়)

মাসিক পত্র



শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে এন্স মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ।

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ১/০

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩০/০

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের দেশীয় সালসা



পারদ ও রক্ত দ্রুতির মহৌষধ।

সুবর্ণী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি, বা, কোড়া, বাতরক্ত, আমবাতি ও পারদ্রুজ্ঞ রক্তদ্রুতি, প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়, এই মহা তেজস্কর দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষ ও শরীরের কাণ্ডি বর্ধিত হইয়া থাকে, ইহার প্রত্যেক মাত্রাই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চায় করে।

মূল্য এক শিলি ১।০ দেড় টাকা। ডি পিতে লইলে মোট ২/০ আনা।

জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ।



বাঁহাদের অন্ন পরিভ্রমেই মাথা ধরে, মন স্থির থাকে না, কাজের সময় মাথা গরম হইয়া ভুলচুক হয়, তাঁহাদের পক্ষে জবাকুসুম তৈল বিশেষ উপকারী। জবাকুসুম তৈল কেশের অকালপকতা ও উষ্ণতা হাওয়া নিবারণ করে। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অতুলনীয়। মহারাণা-বিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য মহিলাগণ অতি আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন।

এক শিলির মূল্য ১/০ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১/০ পাঁচ আনা।

যকশ্বলন্ত রোগিগণ নিজ নিজ রোগের বিবরণ লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রেরণ করা হয়।

তিন শিলির মূল্য ৩।০ পনের টাকা। ডাক মাণ্ডল ৬/০ আনা।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

বিরাজ ব্রীডপেন্সনাথ সেন।

এলিক্সারপেপেন

পেপের তরল সারাংশ।

পেপায়িন্ সংযোগে এই অভিনব ঔষধটী প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জীর্ণক্ষুধা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে এবং পোটাইড্ খাদ্য দ্বাৰা সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। অজীর্ণতা, পাকায়ের দুর্বলতা ও পিত্তবিহীনতায় ইহা বিশেষ উপকারী। মূল্য এক শিশি ৮০০ আনা।

জামের বীচির তরলসার

(বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ।)

শর্কর বহুমূত্র অর্থাৎ যে বহুমূত্রের মূত্রে শর্করা থাকে, তাহাতে ইহা ফলপ্রদ। জামের বীচির তরলসার হইতে ইহা প্রস্তুত; ইহা কিছুদিন সেবনে দুর্বলতা, মাথাধরা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ বাদ্ধরিত হয়। এক শিশির মূল্য ৮০০ আনা।

কালমেঘের তরলসার

যকৃতের দোষ ও পুরাতন জ্বরের মহৌষধ।

কালমেঘ অগ্নিবদ্ধক ও ঈষৎ রেচক। পূর্বে গহিণীগণ ছেলেদের জ্বর ও যকৃতের দোষের জন্য ইহারে “আলুই” করিয়া খাওয়াইতেন; আমরা ইহার তরল সারাংশ ব্যবহার করিয়া সমাধক ফল পাইতেছি। যেখানে অজীর্ণতা, যকৃতের দোষ এবং শিশুযকৃত রোগের সন্দেহ থাকে, সেখানে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইলে, নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করে।

এক শিশির মূল্য ১০০ আট আনা।

কুর্চির তরলসার

(রক্তামাশয়ের মহৌষধ ।)

আয়ুর্বেদ মতে ইহা অগ্নিদীপক ও আমদোষ এবং অতিসারদোষ নাশক। রক্তামাশয় রোগে ইহার তরলসার উৎকৃষ্ট ঔষধ, এ কথা পাশ্চাত্যদেশের চিকিৎসকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আমাদের এই ঔষধটী রক্তামাশয়, অতিসার রোগে বড়ই ফলপ্রদ। রোগের পুরাতন ও নূতন উভয় অবস্থায় ব্যবহার্য। এক শিশির মূল্য ১০০ এক টাকা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

KEATINGS INSECT POWDER.

কালাজ্বর এবং ছারপোক

ক্যাপ্টেন প্যাটন (Capt. Patton of Indian Medical Service) সাহেব ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের জনৈক সুদক্ষ ডাক্তার - বহু পরীক্ষার পর কালাজ্বরবীজাণু ছারপোকার পাকস্থলীতে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় দেখিয়াছেন। তত্ত্বিগ্ন ছারপোকা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর দংশনে আপনার পরিবারবর্গ এবং বিশেষতঃ স্নহময় শিশুগুলির স্বাস্থ্য ও সুখ নষ্ট করে। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া কিটিং সাহেবের বৈজ্ঞানিক “কীটনাশক পাউডার” সমগ্র জগতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ভারতের প্রতি সংসারে প্রচলিত হওয়া উচিত। ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ, বিষাক্ত নহে; কোন হুর্গন্ধ নাই। কেবল ১০ মিনিট পূর্বে বিছানার চাদরের নিম্নে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া দিলে ছারপোকা মশা মাছি পরিপূর্ণ বিছানা সুখ-শয্যায় পরিণত হয়। মূল্য পতি কোটা মাঝারী ১০/-, বড় কোটা ১৫/-, ছোট কোটা ১০ মাত্র। এই সামান্য ব্যয়ের জন্য দারুণ কষ্টভোগ করা উচিত নহে। লগুনে প্রস্তুত। সমস্ত বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

শ্রীমজীবিসমবায় লিমিটেড

৯০/২এ হারিসন রোড, কলিকাতা।

একমাত্র ঋণী স্বদেশী দ্রব্যের
সম্মিলন স্থান।

যিনি প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবেন,
তিনি নিশ্চিন্ত মনে এই স্থানে আসিলে পরিধেয় ধুতি, চাদর, মিলের
ধুতি সাটী, তৈয়ারী জামা জ্যাকেট যাহা চাহিবেন, সাবান
এসেন্স, পুতুল এবং পাখরের এ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য
ও দর্জির কার্য যাহা চাহিবেন তাহাই
পাইবেন। ৫/- একটি অংশ ক্রয়
করিলে টাকায় ১০ কমিশন
পাইবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

ম্যানেজিং এজেন্ট।

সিটি ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

হেড্‌ আপিস ৭ নং সোয়ালো লেন, রাধাবাজার, কলিকাতা ।

মাসিক চাঁদা শ্রেণীভেদে—২১, ১১ ও ১০ আনা ।

কয় প্রকার বীমা—দুই প্রকার

জীবন বীমা ও বিবাহ বীমা ।

ছয় মাসে মাত্র চাঁদা দিবার পর বিবাহ স্থির হইলেই দেয় চাঁদার দ্বিগুণ ও বাৎসরিক হিসাব নিকাশান্তে আরও টাকা পাওয়া যায় ।

জীবন বীমায় ১ বৎসর পরে মৃত্যু ঘটিলে বা ১০।১২ বৎসর জীবিত থাকিলে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত “ক্রেম” পাওয়া যায় ।

এই কোম্পানী সঞ্চয় বীমার শ্রেষ্ঠ কোম্পানী ! সর্বত্র দক্ষ ও সাধু এজেন্ট আবশ্যক ।

ঠিকানা—

দি পাইওনিয়ার এজেন্সী কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্,

৭ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা ।

১৩শ বর্ষ]

বঙ্গদর্শন

[কার্তিক, ১৩২০

সূচী

বিষয়	লেখকের নাম	পত্রাঙ্ক
১। নিমাই-চরিত্র ...	শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়, বি,এ ...	৫০৯
২। দ্বিজেন্দ্রলাল	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ...	৫১০
৩। উৎপলা (উপভাস) ...	” ভবানীচরণ ঘোষ ...	৫৩২
৪। বৈদিক সাধনার আভাস ...	” জ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার ...	৫৪৪
৫। দুর্ভাগ্যের কাহিনী ...	” সুধীরচন্দ্র মজুমদার ...	৫৫২
৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ...	” বিপিনচন্দ্র পাল ...	৫৬০
৭। রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র	...	৫৭২
৮। অমৃতসর	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭৬

কভার ও বিজ্ঞাপন—মেট্রিক প্রিটিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীআণ্ডতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত এবং ১ হইতে ৯ ফর্ম্যা—মেট্রিক প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র

অধিকারী দ্বারা মুদ্রিত ।

শিলাজত রসায়ন

বহুমূত্ররোগের মহৌষধ ।

চরক সুশ্রুতের মতানুসারে শোধিত হিমালয় পর্বতের লৌহ, শিলাজত, নিরুণভস্ম সুবর্ণ, সহস্র পুটের অভ্র, শোধিত বঙ্গভস্ম, চন্দ্রোদয় বিধানানুসারে প্রস্তুত স্বর্ণসিন্দূর, সহস্র পুটের লৌহ, বিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম, বিড়ঙ্গবীজ চূর্ণ ।

যখন রোগ প্রবলভাবে আক্রমণ করে, তখন শরীর ভগ্ন হইয়া থাকে । মাংসপেশী সমূহ লোল হয় । শরীর স্থূল হইলেও বলহীন হয় । সর্বদা শীতল জল পান, শীতল স্থানে বাস, শীতল বায়ু সেবনে ইচ্ছা হয় । এই অবস্থায় পিপাসা ও ক্ষুধা অতি প্রবল হয় । সমুচিত আহারেও শরীরে বেশ বলের সঞ্চার হয় না । মুহুমূর্ছঃ বহু পরিমাণে মূত্রাস্রাব হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্বল হওয়াতে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির হানি ঘটে ।

শিলাজত রসায়ন সেবনে উপরিলিখিত লক্ষণসমূহ দূর হইয়া শরীর দৃঢ়, কশ্মঠ ও নীরোগ হয় । মূল্য প্রতি শিশি ৮ আট টাকা ।

বাধক-নিসূদন

বাধক রোগের মহৌষধ ।

বাধক রোগ অতি ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাপ্রদ । এই রোগ আক্রমণ করিলে ঋতুকালে কটিদেশে তলপেটে ও উরুতে ভয়ঙ্কর বেদনা, শিরঃপীড়া, অর, বমির ভাব ও বমি প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে । কাহারও অতি অল্প মাত্রায় রক্তাস্রাব হয় । কাহারও একেবারে হয়ই না । ঋতুকাল অতীত হইলে এক প্রকার শ্বেতাস্রাব হইতে থাকে ।

এই সমুদায় ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে নারীজাতিকে রক্ষা করিতে বাধক-নিসূদন অব্যর্থ । ইহা সেবনে মাসে মাসে নিয়মিত রজঃস্রাব হইবে এবং রজোরোধ জনিত সমুদায় যন্ত্রণা অল্পকাল মধ্যে তিরোহিত হইবে । একবার আরোগ্য হইলে আর আক্রমণের ভয় থাকিবে না । বাধকনিসূদন সেবনে বীজরক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং বীজরক্তবাহিনী সূক্ষ্মশিরা সমূহে বীজরক্ত সমূহ সঞ্চিত হইতে থাকে । মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা ।

সর্বজন বিদিত

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ

নবাবিকৃত

ঔষধ

ও

সর্ববিধ চূর্ণ

বনজ উপাদান ।

শ্রীবটকৃষ্ণ পাল প্রতিষ্ঠিত

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

কবিরাজ

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

৩০ নং সভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ।

সর্বত্র প্রসংসিত

আয়ুর্বেদীয়

ঔষধ

ও

চিকিৎসা সম্বন্ধীয়

দ্রব্যাদির

বিস্তারিত তথ্য ।

বঙ্গদর্শন



নিমাই-চরিত্র

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞানগর ত্যাগ করিয়া—গৌর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া চলিলেন। দক্ষিণাত্যে কন্সী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ, শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ সম্প্রদায়াবলম্বী লোক ছিল। গৌর সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোককেই স্বীয় মতাবলম্বী করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে গোতমী গঙ্গার স্নান করিয়া গৌর মল্লিকার্জুন তীর্থে মহেশ্বর দর্শন করিলেন। তথা হইতে আদ্যোবলম্বনগরে নৃসিংহমূর্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধিবটে গমন করতঃ সীতাপতিমূর্তিকে নমস্কার করিলেন। সিদ্ধিবটে এক রামোপাসক ব্রাহ্মণ গৌরের আতিথ্য সংকার করেন। ব্রাহ্মণ একমাত্র রামনাম ভিন্ন অন্য কোনও নাম গ্রহণ করিতেন না। সিদ্ধিবট হইতে গৌর স্বল্পক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় স্বল্প দর্শন করিয়া ত্রিমূর্তি গমন করতঃ ত্রিবিক্রমমূর্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমূর্তি হইতে গৌর সিদ্ধিবটে প্রত্যাগমন করিয়া পুরোক্ত রামোপাসক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ গৌরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন “তোমাকে দর্শন করা অবশিষ্ট কৃষ্ণনাম আমার বসনার বসিয়া গিয়াছে। আমি

রামনাম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছি।” সিদ্ধিবট হইতে গৌর বুদ্ধকালী গমন করিয়া শিবদর্শন করিলেন এবং বুদ্ধকালীর সম্মিহিত একগ্রামে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তাকিক, মীমাংসক, মাদ্ভাবাদী, স্মার্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি বহুবিধ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া এক বৌদ্ধাচার্য্য গৌরের সহিত তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তর্কে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বহু বৌদ্ধ মিলিয়া গৌরকে অপদম্ব করিবার জন্য এক বড়বজ্র করিল। তাহারা এক পাতে অপবিত্র অন্ন স্থাপন করিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া তাহা গৌরকে দিবে আসিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক মহাকাশ পক্ষী অন্তরীক্ষ হইতে আপতিত হইয়া সেই অন্নসহ পাত্র লইয়া আকাশমার্গে পুনরুত্থিত হইল। অনতিবিলম্বেই সমস্ত অন্ন বৌদ্ধ গণের শিরে এবং সেই ধাতুপাত্র বৌদ্ধ চার্য্যের মস্তকে পতিত হইল। আচার্য্য মুক্তি হইয়া ভূপতিত হইলেন। মুক্তি

ভজ্ঞে স্বীয় অপচার হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচার্য্য শশিষ্যে গৌরের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম লইয়া কৃতার্থ হইলেন।

ত্রিপদী ত্রিমল্ল যাইয়া গৌর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করিলেন এবং বেষ্টিগিরি হইয়া ত্রিপদীনগরে যাইয়া রামসীতাকে নমস্কার করিলেন। অতঃপর পানা নরসিংহ দর্শন পূর্বক শিবকাঞ্চী, ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পঞ্চতীর্থ, বৃদ্ধকেরল, পীতাম্বর, শিয়ামী ভৈরবী, প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কাবেরী গমনপূর্বক বহুসংখ্যক শৈবকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। দেবহান, কুন্তকর্ণ শিবক্ষেত্র, পাণনাশন ভ্রমণ করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করতঃ গৌর রঙ্গনাথের সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গৌর বেষ্টি ভট্টনামক এক শ্রীসম্প্রদায়চতুর্ভুজ ব্রাহ্মণের গৃহে চারিমাস অবস্থিতি করিলেন। বহুসংখ্যক লোক তথায় তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বসিয়া প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতেন। তাঁহার অন্তর্ভুক্ত উচ্চারিত গীতাপাঠ শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ক্রোধ ছিল না। গৌর দেখিলেন গীতাপাঠের সময় ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, তাঁহার শরীরে অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হইত, এক দিন গৌর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“গীতার কি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনি এত আনন্দলাভ করেন?” ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন “আমি মূর্থ; শকার্থ আমি কিছুই জানি না। শুধু অন্তর্ভুক্ত কিছুই

বুঝি না। কিন্তু যতক্ষণ গীতা পাঠ করি, দেখিতে পাই শ্রামল স্তম্ভের কৃষ্ণ অর্জুনের রথে সারথিবশে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাই আমার এত আনন্দ।” “তোমারই গীতাপাঠ সার্থক।” বলিয়া গৌর ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। গৌর যতদিন রঙ্গক্ষেত্রে ছিলেন ব্রাহ্মণ তদবধি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।

বেষ্টি ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। গৌর একদিন হাসিতে হাসিতে কহিলেন—“ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ত পতিব্রতার শিরোমণি; কিন্তু তিনি গোপবালক কৃষ্ণের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন বলিতে পার?” ভট্ট কহিলেন—“কৃষ্ণ ও নারায়ণ ত একই, সুতরাং লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গ-কামনায় কোনও দোষ হইতে পারে না।”

গৌর বলিলেন—“শাস্ত্রে আছে, লক্ষ্মী কৃষ্ণের সহিত রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। কিন্তু প্রতিগণ তপশ্চা করিয়া সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি?”

ভট্ট কহিলেন—“এ সমস্ত আমার বুদ্ধির অগম্য। তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও।”

গৌর কহিলেন—“শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিত না। কেহ তাঁহাকে পুত্রজ্ঞানে উদ্ভূতলে বাঁধিয়াছে; কেহ সখাজ্ঞানে তাঁহার স্বন্ধে আরোহণ করিয়াছে, ব্রজবাসী তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানিত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাহা-
দিগের ছিল না। এই ব্রজবাসীর ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন

প্রাপ্ত হয়। প্রতিগণ গোপীদেহ গ্রহণ করিয়া ভজেন্দ্রনন্দনের ভজন করিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণসঙ্গে রাসলীলার অধিকারী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোপ, তাঁহার প্রেমসীও গোপী। দেবী অথবা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী-দেহে রাসবিলাস কামনা করিয়াছিলেন; তাই সফলকামা হইতে পারেন নাই। ভট্ট সন্দেহ করিও না—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাসমূর্তি।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ।

ভাগবত ১।৩।২৮

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হইল লক্ষ্মীর মন।

গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥

ভট্টের বিশ্বাস ছিল—নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, এবং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ। গোরের বচনে তাঁহার গর্ব চূর্ণ হইল। তাহাকে বিষন্ন দেখিয়া গৌর কহিলেন “ভট্ট, হুংখিত হইও না। শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত তাহাই তোমাকে বলিলাম। কৃষ্ণ-নারায়ণে ভেদ নাই। গোপী ও লক্ষ্মী অভিন্ন। ঈশ্বরত্বে ভেদ স্বীকার করিলে অপরাধ হয়। একই বিগ্রহ নানারূপ ধারণ করেন।”

“তোমার কৃপায় ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিলাম” বলিয়া ভট্ট গোরের চরণে প্রণত হইলেন।

শ্রীমদ্বৈক্যে ত্যাগ করিয়া গৌর ঋষভ-পর্বত পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় পরম ভাগবত পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তথা হইতে শ্রীশৈল ও কামকোজী হইয়া দক্ষিণ মথুরায় গমন করিলেন। এই

শেষোক্ত স্থলে গৌর এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ রন্ধনের কোনও আয়োজন করিলেন না। গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন—“প্রভু, আমি অরণ্যবাসী, সম্প্রতি অরণ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য দুস্ত্রাপ্য হইয়াছে। লক্ষ্মণ ফলমূল আহরণার্থ গমন করিয়াছেন; তিনি ফিরিয়া আসিলে সীতা রন্ধনের আয়োজন করিবেন।” রামোপসক ব্রাহ্মণের রীতিমতচিত্ততা দেখিয়া গৌর প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে রন্ধন করিয়া গৌরকে ভোজন করাইলেন, কিন্তু নিজে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। গৌর পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ কহিলেন—“রাক্ষস রাবণ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাদেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে, এই হুংখে আমার শরীর জলিয়া যাইতেছে। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিব।” তাহাকে প্রবোধ দিয়া গৌর কহিলেন—“রাবণের সাধ্য কি লক্ষ্মীস্বরূপিনী ঈশ্বরপ্রেমসী চিদানন্দমূর্তি সীতাকে স্পর্শ করে? তাঁহাকে দেখিবার শক্তিই তাহার নাই, স্পর্শ ত দূরের কথা। রাবণ আসিবার পূর্বেই সীতা অন্তহিত হইয়াছিলেন; রাবণ যান্না-সীতাকে হরণ করিয়াছিল। বেদপুরাণের ইহাই অভিমত। বিশ্বাস কর এবং ছুর্ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভোজন কর।” ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন। গৌর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চর্কেশন গমন করিলেন ও তথা হইতে মহেন্দ্র শৈলে পরশুরাম দর্শন করিয়া সেতুবন্ধে আসিয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। তদনন্তর রামেশ্বর-তীর্থে গমন করতঃ তথায় কয়েক দিন বিশ্রাম

করিলেন। রাঘবেশের এক ব্রাহ্মণ-সুতার কুশপুত্র পাঠ শুনিতে গিয়া গৌর পতিব্রতার উপাখ্যান মধো রাবণ-কর্তৃক মায়াদীতা-হরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের পূর্বকৃত ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ মথুরার গমন পূর্বক পূর্বোক্ত রামোপাসককে দান করিলেন। বিপ্র পরম দণ্ডষ্ট হইয়া গৌরের নানা-সুবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে গৌর পাণ্ডাদেশান্তর্গত তাম্রপর্ণী গমন করিলেন। তৎপরে তিনি যে সমস্ত স্থানে গমন করিলেন তাহার নাম—নরদ্বিপদী, চিড়ভালা, তিল-কাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, কামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্বত, কতাকুমারী এবং আমলকীতলা। শেযোক্ত স্থান হইতে গৌর মল্লাদেশে গমন করিলেন। তথায় ভট্টমারী নামে এক ধর্মসম্প্রদায় ছিল। গৌরের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে যে ব্রাহ্মণ ছিল, ভট্টমারিগণ স্ত্রী ও ধনের লোভ দেখাইয়া, তাহাকে ভূলাইয়া লইয়া গেল। গৌর ভট্টমারিগণের নিকট বাইয়া কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিতে কহিলেন। প্রত্যর্পণ করা দূরের কথা—ভট্ট-মারিগণ তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র-সহ আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ভট্টমারিগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। গৌর কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্বক লইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেই দিনই পরষিনী নদীর তীরস্থ এক গ্রামে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানে আদিবৈব কেশব-মন্দিরে তাঁহার নৃত্য-কীর্তন দেখিয়া কলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

এইখানে “ব্রহ্মসাহিত্য” নামক এক ভক্তিপুণ্ড্র গ্রন্থ পাইয়া গৌর অতি দূরের দরিত্র ভাণ্ডা লেখাইয়া লইলেন। অনন্তর অনন্ত শতাব্দিক, শ্রীজনার্দন, পরোক্ষী, শুকসিঁরি ভ্রমণ করিয়া গৌর উদ্বিনী আসিয়া উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন করিলেন। মধ্বাচার্য্য এই মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং তদীয় শিষ্য তত্ত্ববাদিগণ এই মূর্তির সেবক। সেই নৃত্যপর গোপালমূর্তি দেখিয়া গৌর প্রেমোন্মত্ত হইয়া বিস্তর নৃত্য-গীত করিলেন। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদী সম্যাসী মনে করিয়া, প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ করেন নাই। অবশেষে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গৌরের সহিত সাধাসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথা হইতে গৌর অনন্ততীর্থ, ত্রিতকুপ, বিশালা, পঞ্চাপরা, গোবর্ধ বৈপারনী, সুপরিম, কোলাপুর ও পাণ্ডুপুর গমন করিয়া তত্ত্বাত্ম দেবমূর্তি সমুদয় দর্শন করিলেন। পাণ্ডুপুরে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর দাক্ষাং লাভ করিয়া গৌর পরম প্রীত হইলেন। গৌর বধন তাঁহাকে প্রেমাবেশ প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীরঙ্গপুরী কহিলেন “শ্রীপাদ, নিশ্চয় আমার গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে, অস্ত্রত্ব একরূপ প্রেম হুলাভ।” গৌর দৈবরপুরীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করিলেন। মাধব-পুরীর সহিত শ্রীরঙ্গপুরী একবার নবদ্বীপে গমন করিয়া লগ্নমাধ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। গৌরের জন্মস্থানের পরিচয় পাইয়া তিনি প্রসঙ্গক্রমে শচীদেবীর প্রসঙ্গ অন্তর্যাতনের প্রসঙ্গোদয় করিয়া করিলেন—

“তাহার এক পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণকর শ্রীশঙ্করায়ণ নাম পরিগ্রহ করিয়া পাণ্ডপুরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইরাছিলেন।” শুনিয়া গৌর কহিলেন, “পূর্বাশ্রমে শঙ্করায়ণ আমার ভ্রাতা ছিলেন।” শ্রীরঙ্গপুরী তথা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন—গৌর পাণ্ডপুরে কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় বহির্গত হইলেন—এবং কৃষ্ণ-বেণা মদীতীরে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তথায় “কৃষ্ণকর্ণামৃত” নামক সুন্দর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। মাছিয়াতী, ধনুতীর্থ, ঋষ্যমুখ, পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নানিদ্ভাষক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গৌর বিজ্ঞানগরে প্রত্যাগত হইয়া রামানন্দের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। গৌর রামানন্দকে ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থদ্বয় প্রদান করিলেন। রামানন্দ কহিলেন “তোমার নির্দেশমত আমি রাজ্যকে লিখিয়াছিলাম। রাজা আমাকে নীলাচলে বাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি বাইবার আরোজন করিতেছি। তুমি আগমন কর, বিন দশ মধ্যে আমি নীলাচলে উপস্থিত হইব।” গৌর অচিরে নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নীলাচলে প্রত্যাগমন, উৎকলীয় ভক্তগণের সহিত মিলন, গোঁড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন, রথযাত্রা মহোৎসব
গৌর দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বহির্গত হইলে সার্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়া জগ-
দ্বাদশমন্দিরের পরিধানে একটী গৃহ গৌরের
বাগের জন্ত দিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।
কুটীরা বাড়ীনির্মের। গৌর অবস্থান করিলেন

শুনিয়া কালীমিশ্র সারনৈ গৃহ দান করিয়া-
ছিলেন। গৌর প্রত্যাগত হইয়া সেই গৃহে
অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নীলাচলের বহু ভক্ত উৎকণ্ঠিতভাবে
গৌরের পত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।
সার্বভৌম একে একে সকলের সহিত গৌরের
পরিচয় করাইয়া দিলেন। জগন্নাথের সেবক
জনার্দন, জগন্নাথের স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস,
লেখক শিখি মাইতি, তাহার ভ্রাতা মুরারি,
প্রচ্যন্ন মিশ্র, সিংহেশ্বর মুরারি, প্রহররাজ
মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি সকলেই
আসিয়া একে একে গৌরের চরণে প্রণত
হইলেন। রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ
চারি পুত্র সহ আসিয়া গৌরকে প্রণাম করিলেন
এবং পুত্র বাগিনাথ পট্টনায়ককে তাহার সেবার
জন্ত নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর গৌর
কৃষ্ণদাসকে আহ্বান করিয়া তাহার ভট্টমারি-
গণের সহিত গ্রন্থান ও উদ্যারবৃত্তান্ত বর্ণনা
পূর্বক কহিলেন “এখন তোমাকে আমি
বিদায় দিতেছি। যণা ইচ্ছা তথায় বাইতে
পার।” অমৃতপু হইয়া কৃষ্ণদাস রোদন
করিতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ প্রভৃতি
ভক্তগণ গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ প্রদান
করিবার জন্ত গৌরের অমৃতমতি লইয়া তাহাকে
নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন।

যথাকালে কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে পৌছিয়া
শচীমাতা ও অভ্যন্ত সকলকে গৌরের নীলাচল
প্রত্যাগমনসংবাদ প্রদান করিল। ভক্তগণ
নীলাচলে গমনের আরোজন করিতে ব্যত
হইলেন। পরমানন্দ পুরী তখন নবদ্বীপে
অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে
পুনর্বাতনে আসিয়া গোঁড়ীয় ভক্তগণের

আগমনবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। গৌর স্বীয় ভবনের একটি ঘর পরমানন্দের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে গৌরের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। গৌরের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে তিনি স্বরূপ দামোদর নাম গ্রহণ করেন। গৌর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে স্বরূপ প্রেমবিহ্বল অবস্থায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর পরমসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, আপনার সহিত বাস করিবার অনুমতি দিলেন। স্বরূপ অনতিকালমধ্যেই গৌরের প্রধান সেবক রূপে পরিগণিত হইলেন। কেহ কোনও সঙ্গীত অথবা কবিতা রচনা করিয়া গৌরকে দেখাইতে আসিলে স্বরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। তাঁহার অভিমত হইলে তবে তাহা গৌরসকাশে পঠিত ও গীত হইতে পারিত।

কতিপয় দিবসান্তে গোবিন্দ নামক শূদ্র-বংশীয় এক ব্যক্তি গৌরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল “আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ছিলাম। পুরী মৃত্যুকালে আমাকে তোমার সেবা করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমাকে গ্রহণ কর।” গুরুর সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে গৌর প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; পরিশেষে গুরুর আদেশ পালনার্থ গোবিন্দকে সেবকরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

একদিন মুকুন্দ দত্ত আসিয়া সংবাদ দিল যানন্দ ভারতী নামক একজন বিশিষ্ট ভক্ত

গৌরের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌর অনতিবিলম্বে ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়া দেখিলেন, ভারতী যুগচন্দ্র পরিধান করিয়া আছেন। বৈষ্ণবের চন্দ্রাধর দেখিয়া গৌর বিরক্ত হইলেন এবং মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “ভারতী গোসাঞি কোথায়?” মুকুন্দ ভারতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন। গৌর কহিলেন “তোমার কথা অসম্ভব! ভারতী কেন চন্দ্র পরিধান করিবেন?” ভারতীর অমুতাপ উদ্ভিক্ত হইল এবং তিনি চন্দ্রাধর বর্জন করিয়া বহির্বাস গ্রহণ করিলেন। তদবধি ব্রহ্মানন্দ ভারতী গৌরের সহিত একত্রাবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুইশত ভক্ত নবদ্বীপ হইতে গৌরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া গৌর স্বরূপ দামোদর ও গোবিন্দকে তাঁহাদিগকে প্রত্যুপগমন করিয়া আনিতে প্রেরণ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর বিজ্ঞানিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচার্য্যারত্ন, পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরি ভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাহুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাহুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, শ্রীধর, বল্লভ সেন, পুরুষোত্তম সঙ্কর, কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান, রামানন্দ বহু, মুকুন্দ দাস, নরহরি, রঘুনন্দন, হিরণ্মী, স্থলোচন প্রভৃতি ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের মন্দিরান্তিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ বাইরা প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের

গলদেশে মায়া দান করিলেন। পুরীরাজ প্রতাপরুদ্র ভক্তগণের দর্শনলালসায় রাজ-প্রাসাদের উপরিভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন—গোপীনাথ আচার্য্য একে একে সকলের পরিচয় দিতে লাগিলেন। গৌর নিজগণ সহ বহির্গত হইয়া পশ্চিম মধ্য ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন, এবং প্রথমে অষ্টৈতাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া একে একে সকলকেই আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে সকলকে লইয়া স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে গৌর কিছু ক্ষণ সকলেরই সহিত নানাবিধ ভাবালাপ করিলেন। অনন্তর দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত “ব্রহ্ম-সংহিতা” ও “কৃষ্ণকর্ণামৃত” গ্রন্থদ্বয় বাসুদেব ঘোষকে প্রদান করিয়া কহিলেন “তোমার জন্মই আমি গ্রন্থ দুই খানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।” সকলের সহিত কুশল প্রশ্ন শেষ হইলে গৌর হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দূর হইতে গৌরকে দেখিয়া হরিদাস কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করেন নাই, গৃহসমীপে রাজপথে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া ছিলেন। গৌরের আদেশে কয়েক জন ভক্ত তাঁহাকে লইতে আসিলেন। কিন্তু হরিদাস কহিলেন—“আমি পাণিষ্ঠ যবন, আমার মন্দিরের নিকট যাইবার অধিকার নাই।” গৌর এই কথা শুনিয়া তাঁহার গৃহসম্বন্ধিত উত্তানস্থ একটা ঘর কালীমিশ্রের নিকট হইতে হরিদাসের জন্ত চাহিয়া লইলেন এবং স্বয়ং হরিদাসের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করতঃ সেই গৃহে আনিয়া স্থাপিত

করিলেন। এখানে প্রত্যহ হরিদাসের জন্ত গৌর খাত্ত পেরণ করিতে লাগিলেন।

গোড়ীয় ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীত-কীৰ্ত্তনে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। এ দিকে রথযাত্রার দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিলে গৌর সার্কভোম, কালীমিশ্র ও উড়িয়াপাত্রকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট স্বয়ং শুভিচামন্দির * মার্জনা করিবার অহুমতি চাহিলেন। সার্কভোমাদি গৌরের ইচ্ছায় সম্মতি দান করিয়া মন্দিরমার্জনার্থ পর্য্যাপ্ত কলসী ও সম্মার্কনীর আয়োজন করিয়া দিলেন। প্রচুর উল্লাসে ভক্তগণের সহিত গৌর শুভিচামন্দির মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন এবং মার্জন শেষ হইলে সকলের সহিত ইজ্রদ্ব্যম্ন-সরোবরে জলকেলি করিলেন।

রথযাত্রার দিন সমাগত হইল। প্রাতঃ স্নানান্তে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া গৌর জগন্নাথের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন। বলিষ্ঠ দয়িতগণ জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে মন্দিরবহির্ভাগে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের কটিদেশে পট্টডোরী বন্ধন করিল এবং সেই পট্টডোরী সহযোগে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া সুসজ্জিত রথে স্থাপন করিল। অমনি চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে “জয় জগন্নাথ, জয় মহাপ্রভু” ধ্বনিত হইল। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র সপারিষদ স্বর্ণমার্জনী হস্তে রথাগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া

* রথযাত্রার সময় যে মন্দিরে জগন্নাথমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তাহার নাম শুভিচামন্দির। ঐমন্দির হইতে ইহা প্রায় এক মাইল দূরে—ইজ্রদ্ব্যম্নদীধিকাতীরে অবস্থিত।

তত্ত্বপরিচয়-কল-সেচন করিলেন, গৌড়ীয়াগণ
রথাকর্ষণ করিতে লাগিল। রথ শুণ্ডিচাভিমুখে
অগ্রসর হইল। বীর ভক্তগণকে চারিদলে
বিতর্ক করিয়া গৌর চারিটা কীর্তনসম্প্রদায়
গঠন করিলেন। ইহারা রথের অগ্রে নৃত্য
ও কীর্তন করিতে করিতে চলিল। এতদ্ব্যতীত
আরও তিন সম্প্রদায় রথের দুই পাশে ও
পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।
গৌর সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে
লাগিলেন। কিরংক্ষণ নৃত্য করিয়া শ্রীবাস,
রামাই, স্বরূপ প্রভৃতি দশজন প্রধান গায়ককে
লইয়া গৌর স্বয়ং কীর্তন করিতে আরম্ভ
করিলেন। প্রথমে যুক্ত করে জগন্নাথের
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৌর ভক্তিব্যাকুল
কণ্ঠে স্তব পাঠ করিলেন।

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষগহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”
“জয়তি জয়তি দেবো দেবকৌন্দিনোঃসৌ।
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃক্ষিবংশপ্রদীপঃ ॥”
“জয়তি জয়তি মেঘশ্রামলঃ কোমলাক্ষো।
জয়তি জয়তি পৃথুভারনাশো যুক্লবঃ ॥”
“জয়তি জননিবাসো দেবকৌজয়বাদো।
যজুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরত্নম্বর্ষম্ ॥”
“স্থিরচরবৃজিনয়ঃ স্তম্ভিতশ্রীযুধেন।
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধন্য কামদেবম্ ॥”
“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্রো

ন শূদ্রো।

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি ন বনহো যতি বর্।
কিন্তু প্রোক্তদ্বিধলপরমানন্দপূর্ণামৃতাকে
গৌপীভট্টঃ পদকমলয়োদাস দাসামুদাসঃ ॥”
স্তব পাঠ শেষ হইলে গৌর হকার পূর্বক
উচ্চ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অবৈতাত্যাব্য

গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন।
হরিদাস কেবল “হরিধোল” “হরিবোল”
বলিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র
পলকহীন দৃষ্টিতে নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন।
গৌরকে প্রথম দর্শনাবধিই তাঁহার মন
শ্রীগৌরের প্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল,
অধুনা ভক্তসহ গৌরের নৃত্য দর্শন করিয়া
তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িলেন। বরষ্ত
হরিচন্দনের কঙ্কদেশে হস্ত ক্রান্ত করিয়া তিনি
নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে
পশ্চাৎস্থিত শ্রীবাস পণ্ডিতের নৃত্যদর্শনের
ব্যাঘাত হইতেছিল। শ্রীবাস হরিচন্দনের
গাঙ্গম্পর্শ করিয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে
কহিলেন—কিন্তু গৌরের নৃত্য দেখিতে
দেখিতে বাহজ্ঞানশূন্য হওয়ার শ্রীবাসের
কথা হরিচন্দনের কণে প্রবিষ্ট হইল না।
শ্রীবাস নৃত্যদর্শনের বিষয় দেখিয়া ক্ষিপ্ত
হইয়া উঠিয়া হরিচন্দনকে চপেটাঘাত
করিলেন। তখন হরিচন্দন প্রকৃতিহীন হইয়া
শ্রীবাসের অসমসাহসিকতার প্রতিবাদ করিতে
যাইতেছিলেন; কিন্তু প্রতাপরুদ্র তাহাকে
নিষেধ করিলেন।

দর্শক সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গৌরের
অমাহুযিক ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন।
দামোদর গাহিয়া উঠিলেন—

“সেই শু পরাণনাথে পাইতু,”

যার লাগি মদন নাহনে সুরি গেহু ॥”

গৌরের তদানীন্তন মানসিক অবস্থার
সহিত গান মিলিল। গৌর বিরহাকুল হইয়া
রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। জগ-
ন্নাথের বিরাট রথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।
গৌর নাচিতে নাচিতে পড়িতে লাগিলেন—

“বঃ কৌশার্যঃ ন এব হি

বরুতা এব চৈত্রকপা-

স্তে চৌধীলিতমালতী-

স্বরতঃ প্রোচাঃ কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবান্নি তথাপি তত্র

স্বরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবারোধসি বেতসী-

তরুতলে চেতঃ সমুৎকর্ষতে ॥”

“আচ্ছ তে নলিননাভপদারবিন্দং

যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিস্ত্যমাগধবোধৈঃ।

সংশারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং

গেহং জ্বামপি মনস্বাদিরাং সদা নঃ ॥”

“ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতস্বয়ং কল্পতে।

দীপ্তা বদানীম্বৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥”,

রেবাতটে বেতসী-তরুতলে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারের
অল্প রাধালাবাবিষ্ট গোবরের চিস্ত উৎকর্ষিত
হইয়া পড়িল। বিরহবিধুর হইয়া তিনি
ভূমিতলে উপবেশন করতঃ তর্জুনী দ্বারা
মুক্তিকায় লিখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল
পরেই দত্তারমান হইয়া নৃত্য করিতে করিতে
রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে গিয়া পতিত
হইলেন।

গৌর যখন দ্বাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া
বেড়াইতেছিলেন—তখন অবধিই প্রতাপরুদ্র
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল
হইয়াছিলেন। কিন্তু গৌর সন্ন্যাসী, তিনি
রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া সার্কভোম
তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌর
নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে, একদিন সার্ক-
ভোম তাহাকে রাজার অভিষেক জ্ঞাপন
করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরক্ত হইয়া গৌর
বলিয়াছিলেন পুনরায় তাহাকে কেহ রাজ-

দর্শনের কথা বলিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ
করিয়া যাইবেন। রামানন্দ রায় পুরীতে
উপস্থিত হইলে রাজা তাহার নিকট নানারূপ
বিলাপ করিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার
ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তখন রামানন্দ
ও সার্কভোম গৌরের প্রতি রাজার প্রগাঢ়
ভক্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন “ভক্তাধীন
গৌর কখনও ভক্তের আকুল ইচ্ছা অপূর্ণ
রাখিবেন না। রথযাত্রার দিন যখন তিনি
রথাগ্রে নৃত্য করিবেন, তখন দীনবেশে তাহার
চরণ ধারণ করিলে, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে
আলিঙ্গন দান করিবেন।” আজ নৃত্য
করিতে করিতে গৌর যখন প্রতাপরুদ্রের
সম্মুখে পতিত হইলেন, তখন রাজা সমস্তই
তাহাকে ধারণ করলেন। কিন্তু তাহার স্পর্শ-
মাত্র বাহুজ্ঞান লাভ করিয়া গৌর “হার হার”
করিয়া উঠিলেন। দেবদাস রাজা ভীত হইয়া
পড়িলেন। সার্কভোম তাহাকে অস্তর দিয়া
কহিলেন “আপনার ভক্তি প্রভুর অবদিত
নাই, তিনি আপনার প্রতি প্রসন্নই আছেন।
তবে ভক্তগণের শিক্ষাবধানার্থ তিনি রাজ-
সংস্পর্শে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অংসর
পাইবে ই আমি আপনার কথা পুনরায় প্রভুকে
বলিব। তখন বাইরা আপনি প্রভুর সহিত
মিলিত হইবেন।”

রাজসংস্পর্শ অল্প ক্ষণিক ক্ষোভ প্রকাশ
করিয়া গৌর রথের পশ্চাতে গমন করিলেন
এবং মাথা দিয়া রথ তৈলিতে লাগিলেন।
তাহার স্পর্শমাত্র রথ ক্ষণবেগে চলিতে
লাগিল এবং অচিরে বলগণ্ডি নামক স্থানে
গিয়া উপনীত হইল। ওখার লোকের
অত্যধিক জনতা হওয়ার নিকটই এক উচ্চৈশ্বর্য

আরোহণ করিয়া গৌর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

গৌর বিশ্রাম করিতেছেন—এমন সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে উত্তানে প্রবেশ করিলেন—এবং যাবতীয় ভক্তগণের অহুমতি লইয়া গৌরদম্যপে গমন করতঃ তাঁহার পদমূলে পতিত হইলেন। গৌর চক্ৰ মুদ্রিত করিয়া ছিেন—রাজা তাঁহার পাদ সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং রাস-লীলার শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শুনিয়া গৌর পেমাভিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং “বোল” “বোলা” বসিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। রাজা পড়িলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং

কবিভিরীড়িতং কল্যাণপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং

ভূবি গুণপ্তি বে ভূরিদা জনাঃ ॥

হে । প্রহর, তোমার কথামৃত সমুপভোজন করি, ব্রহ্মজ্ঞানের ভোগ্য শ্রবণমঙ্গল, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পাপনাশক । যাহারা উচ্চ পান করাইতে পারেন—তাঁহারা এই প্রকৃত দাতা ।

শুনিয়া গৌর দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমভরে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং “তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দান করিয়াছ, তোমাকে দিতে পারি আমার এমন কিছুই নাই, তাই আলিঙ্গন দান করিলাম।” বলিয়া রাজার পঠিত শ্লোকটা বারংবার পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বাহুজান লুপ্ত। কণকাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া গৌর কহিলেন “আমার পরম বান্ধবকে তুমি কোথা

হইতে আনিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলায় পান করাইতেছ?” রাজা কহিলেন “আমি তোমার দাসানুদাস, আমাকে তোমার ভৃত্য করিয়া লও।” গৌর প্রীত হইয়া রাজাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন এবং অন্তর প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। রাজা কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনাগ্রে গৌর দরিত্রদিগকে অন্নবাজন মিষ্টান্নাদি বিতরণ করিয়া রথ টানিতে গমন করিলেন। রথ অচল ভাবে দাঁড়াইয়াছিল—গোড়ীয়গণ রথ নাড়াইতে অপারগ হওয়ায় রাজাদেশে রথ টানিবার জন্ত হস্তী যোজিত হইয়াছিল। হস্তগণ অঙ্গশায্যে বিচলিত হইয়া উন্মত্তভাবে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল—কিন্তু রথ নড়িল না। তখন সমস্ত হস্তী খুলিয়া দিয়া গৌর নিজে মাথা দিয়া রথ চেলিতে লাগিলেন—রথ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং কোটি কণ্ঠের হারধ্বনির মধ্যে অচিরে শুভিচার-মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইল। তখন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামমূর্তি রথ হইতে নামাইয়া মন্দিরস্থ সিংহাসনে স্থাপন করা হইল।

জগন্নাথ নীলাচলের অধীশ্বর। তিনি বৎসরান্তে একবার বনবিহারার্থ রথে চড়িয়া শুভিচারমন্দিরে আগমন করেন। ইহাই রথোৎসব। জগন্নাথ নয় দিন শুভিচার অবস্থান করেন। গৌর ভক্তগণসহ নয় দিন তথায় নৃত্যাগীতে অতিবাহিত করিলেন। জগন্নাথের বনবিহার দেখিয়া তিনি বৃন্দাবন ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং শুভিচারমন্দির-সম্মুখস্থ উদ্যান ও ইন্দ্রচ্যায়নরোবরে ভক্তগণ সহ নয় দিন যাবত বৃন্দাবনলীলা অভিনয়

করিলেন। একদিন অষ্টবতচার্য্যকে সরো-
বরের জলে শয়ান করিয়া তিনি শেষণারী
বিষ্ণুর জ্ঞায় তত্ক্ষণি গুইয়া থাকিলেন।
আচার্য্য তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া জলের
উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।
আচার্য্যের বক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া গৌর
দেখিতে পাইলেন সার্কভোম ও রামানন্দে
জলযুক্ত বাঁধিয়া গিয়াছে। উভয়ে অবিরাম
উভয়ের গাত্রে জল নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন।
তাঁহাদের চপলতা লক্ষ্য করিয়া গোপীনাথ
আচার্য্যকে গৌর কহিলেন “সার্কভোম ও
রামানন্দ উভয়েই পরম পণ্ডিত। উঁহারা
বালকের মত চপলতা করিতেছেন, তুমি
নিষেধ করিতেছ না কেন?” তখন—

গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিদ্ধ,
উচ্ছলিত কর যাব তার এক বিন্দু।
মেরু মন্ডার পর্বত ডুবায় যথা কণা,
দুই এক গণ্ড শৈল ইহার কি কথা।
শুক তর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার
তারে কৃপামৃত পিয়াও, এ কৃপা তোমার।

পঞ্চমী তিথিতে হোরাপঞ্চমী মহোৎসব।
রাজা প্রতাপরুদ্র মহাসমারোহে উৎসবের
আয়োজন করিলেন। জগন্নাথ তখন সুন্দরা-
চলে শুণ্ডিচামন্দিরে, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী নীলা-
চলের শ্রীমন্দিরে। নীলাচলে লক্ষ্মীর সম্মুখে
হোরাপঞ্চমী অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। কালীমিশ্র
গৌরকে উৎসব দেখিবার জন্ত নীলাচলে লইয়া
আসিলেন। নানা আড়ম্বরের সহিত লক্ষ্মী-
বিগ্রহ মন্দিরবহির্ভাগে আনীত হইলেন।
তাঁহার সেবকগণ জগন্নাথের সেবকগণকে

বাঁধিয়া আনিয়া তাঁহার চরণে নিষ্ক্ষেপ করিল।
সুন্দরাচলে পুষ্প স্থান বহাবের জন্ত সেবক-
গণ জগন্নাথকে লইয়া গিয়াছিল এই অপরাধে
বিরচকান্তা লক্ষ্মীর আদেশে তাঁহারা বন্ধন
পাপ্ত হইল। লক্ষ্মীভাতিভূক্ত ভূগণ
মুক্তকণ্ঠে নিবেদন করিল,—“আজি আমরা
জগন্নাথকে আনিয়া দিবা।” তখন লক্ষ্মী শাস্ত
হইয়া গৃহ পদবেশ করিলেন। গৌর স্বরূপকে
জিজ্ঞাসা করিলেন “সুন্দরাচলে লক্ষ্মীকে
জগন্নাথ সঙ্গে লয়েন না কেন, বল দেখি?”
স্বরূপ কহিলেন “সুন্দরাচলে বৃন্দাবনলীলা
করাই জগন্নাথের অভিপ্রায়, বৃন্দাবন-
লীলায় লক্ষ্মীর অধিকাংশ নাই, শাশুর গোপী-
গণের অধিকার। তাই লক্ষ্মী সঙ্গে যাঠিতে
পান না।” গৌর কহিলেন “বৃন্দাবনলীলা
ত তাঁর ভ্রাতা বলদেব ও ভগিনী সুভদ্রার
সম্মুখ প্রকট হইতে পারে না—তবে লক্ষ্মীর
রাগ কেন?” স্বরূপ কহিলেন “প্রোক্ষণী
লক্ষ্মী স্বামীর উদাস্তেট বিচলিত হইয়া
উঠেন।”

অটদিন পরে জগন্নাথ শুণ্ডিচা হইতে
শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রথার্থে
নৃত্য করিতে করিতে গৌর ভক্তগণ সহ
আসিলেন। পথিমধ্যে রথের পটুডারী
ছিড়িয়া গেল। তখন কলীনগ্রামবাসী
রামানন্দ সারাজ খাঁকে (বহু) গৌর
পরিবহণের ঠাকুরের পটুডারী সরবরাহ
করিবার ভার দিলেন। তদনুযায়ী প্রবাসের
রামানন্দ জগন্নাথের রক্ত পটুডারী লইয়া
রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিলেন। (কল্প)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল *

আজ আমরা বঙ্গের প্রগতিবশা লেখক, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতির তর্পণের জন্য মিলিত হইয়াছি। এতদিন বাংলার অমূল্য রচনাবলী বঙ্গীয় পাঠকবর্গে চিত্র মোচিত করিয়া রাখা ছিল, বাংলার নব নব প্রাণের আবির্ভাব দর্শনার্থ সাগ্রহে সকলে প্রতীক্ষা করিতেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই।

বাঁহাঙ্গ মানস-উৎস হইতে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সঙ্গিল অবিরাম উৎকণ্ঠ হইত, বাংলার মানস গিরি হইতে সরস কোতুক সরিৎ প্রবাহিত হইয়া পাঠকের মনোমুগ্ধতা স্রব-শব্দে দর্শিত করিত, বাংলার মনোবীণা হইতে প্রসঙ্গ ও নীটকে, জাতীয় জীবনের উদ্বোধনকল্পে, কথক ও মুহ কথন ও বা গম্ভীর সঙ্গীতরসের উদ্ভিত হইত, সে দ্বিজেন্দ্রলাল আর নাই।

বিদেশী সঙ্গীতের সুর ও ভাব যিনি নিজ অসাধারণ শক্তিতে বাঙ্গালা ভাষার সুকোমল আবরণে ঢাকিয়া বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, বঙ্গীয় নাট্যালাপার প্রসাধনকল্পে যিনি সাগরের মত বিচাট বিচা ভজিমায় নীটকাবলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পাটন সংকুচিত কবিতার সম্মেলনায় বাংলার গম্ভীর বিচিত্র গুণ ও রসপ্রাচীনা প্রকাশিত, কবিতারচনার বিশেষরূপে বাঁহাকে বঙ্গীয় কবিতামণ্ডিরে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে, সেই দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী আজ

নিশ্চল। বীণাপাণির শ্রেষ্ঠ সেবক-মঙলীর মধ্যে একজন প্রধান ভক্তের জীবন আজ অবসান। পূজার সজ্জার লইয়া, অসমাপ্ত কর্ম ফেলিয়া তিনি আজ 'পরপারে' উপস্থিত। তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন অতুলনীর গ্রন্থাবলীর কিছু পরিচয় ও তাঁহার সাহিত্য-সাধনার চিত্র আজ মনোময় অক্ষয় তুলিকার অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইব।

১২৭০ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার নাম কার্তিকেশ্বরচন্দ্র রায়। কার্তিকেশ্বরচন্দ্র নিজে সাহিত্য-চর্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের বিবরণ পাঠে আমরা তৎকালীন বাঙ্গালাসমাজের কল্পনা করিতে পারি। কার্তিকেশ্বরচন্দ্র 'আত্মব্রিত' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাগতে তাঁহার কর্মবহুল জীবনের উজ্জল চিত্র অঙ্কিত আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার নিকট হইতে সাহিত্যের প্রতি অসীম আস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রাজসরকারে দেওয়ানী করিয়া সাহিত্য-সাধনা করা বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্তিকেশ্বরচন্দ্র দেওয়ানের সমা ব্যস্ত জীবন বাণন করিতে করিতেও যে গ্রন্থ রচনা

করিয়াছিলেন, তাঁহা তাঁহার ঐকান্তিক সাহিত্য-
স্বার্থের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিজ্ঞান-
গণিত পিতার জ্ঞান রাজকর্মে নিযুক্ত থাকিয়া
অবসরকালে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন।
আমাদের দেশে সাহিত্য-সেবক সাহিত্য-
সাধনার রত হইয়া নিজ-রচিত গ্রন্থাদির আয়ে
জীবিকানির্ভর করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত
খুব অল্প। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যের অবসরে গ্রন্থ
লিখিয়াছিলেন, বিজ্ঞানলালও ঐ পথের পথিক।

সাহিত্যসুযোগ ব্যতীত বিজ্ঞানলাল আর
একটি গুণ পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন—সেটি তাঁহার গীতপ্রিয়তা। কাক্তিকের-
চন্দ্র অতি সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন।
তাঁহার রচিত বহু গীত দেশপ্রিয়তার গান
নামে প্রসিদ্ধ ও জনসাধারণ কর্তৃক গীত হইয়া
থাকে। দীনবন্ধু মিত্র নিজ ‘সুরধুনী কাব্য’
বিভিন্ন নদীর মুখে, বিভিন্ন দেশ ও সমসাময়িক
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বর্ণনা করিয়াছেন। এই
সুরধুনী কাব্য বিজ্ঞানলালের পিতার বিষয়ে
দীনবন্ধু বলিতেছেন;—

কাক্তিকেরচন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান।

সুন্দর, সুশীল, শাস্ত, বদান্ত বিদ্বান ॥

সুজলিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি।

ইচ্ছা হয় শুনি হয়ে উজানবাহিনী ॥

জগদীশ নদীর মুখে উক্ত বাণী প্রদত্ত হইয়াছে।
ইহা হইতেই কাক্তিকেরচন্দ্রের সঙ্গীতগুণতা
অনুমানিত হইবে। বিজ্ঞানলালও পিতার
নিকট হইতে এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।
তাঁহার প্রথম খ্যাতি—হাসির গানে। বাঁহারা
বিজ্ঞানলালের মুখে “আমরা ইরান দেশের
‘কাফী’ প্রভৃতি সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহার

তাঁহার সঙ্গীত নৈশুণ্যের বিষয়ে সত্যক্য বিবেচনা
পারিবেন। হাসির গানে বিবিধ জর ও
ভঙ্গী, নাটকের গানেও অপরূপ সাদৃশ্য বিজ্ঞান-
লালের বালাকাল হইতে একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত-
শিক্ষার কল। বিজ্ঞানলাল যখন ইংলণ্ডে
অবস্থান করিতেন, তখন বিদেশীয় সঙ্গীত-
বিজ্ঞান বিশেষভাবে চর্চা করিয়াছিলেন।
স্বাভাবিক সঙ্গীতানুরাগ এইরূপে শিক্ষা ও
সাধনার কমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বিজ্ঞানলাল কৃষ্ণনগর কলেজে বিজ্ঞানভাষা
করেন। বালাকালেই তিনি বাঁহরগণের স্বাস-
ফ্রেড, চাইল্ডি হারল্ড, মেবুথ ও উত্তর চরিত্রের
অধিকাংশ মুখস্থ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের
পরীক্ষাগুলিতে তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ
হন। এম, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে তিনি
সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তির সাহায্যে
তিনি কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন।
মেথানকার বিখ্যাত সাইরেনসেটার কলেজে
তাঁহার কৃষিবিষয়ক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। কিন্তু
কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া তিনি যখন বাঙালার
কিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার কৃষিচর্চা
আর হইল না। বঙ্গের লেপ্টেনেন্ট গভর্নর
সার চার্লস্ হিলিট্ট বিজ্ঞানলালকে ডেপুটি
ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। জনৈক
সাহিত্যসেবী তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া-
ছিলেন “সাইরেনসেটারে শিক্ষা লাভ করিয়া
আসিয়া শেষে বিজ্ঞানলালকে ‘কলা মূল্য’
চুরির বিচার করিতে হইল। বিজ্ঞানলাল
কৃষিকার্য্যসম্বন্ধীয় একখানি ইংরাজী গ্রন্থ রচনা
করিয়াছিলেন। তাহার নাম Crops of
Bengal. তাঁহার কৃষিশিক্ষার একমাত্র কল
এই পুস্তকখানি।

বিলাত বাইবার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ ‘আর্য্যগাথা’। ইহা কতকগুলি গীতের সমষ্টি। ইহা বিলাতযাত্রার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ১২ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি যে সকল গান লেখেন তাহাই ইহাতে ছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ‘আর্য্যগাথা’র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত করেন।

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়াই জানি। কিন্তু তিনি ইংরাজীতেও কবিতা ও হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। Lyrics of Ind নামক ইংরাজী পুস্তক তাঁহার ইংরাজী ভাষার কবিতা লিখিবার শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। Light of Asia গ্রন্থে সার এডুইন্স আর্গন্ডকে তিনি এই পুস্তক উৎসর্গ করেন। আর্গন্ড এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজী হাসির গান ইংরাজমহলে গীত হইত। তাহাদের সুর-ভাষা প্রভৃতি ইংরাজী ধরণের। ইংগণ্ডে থাকিয়া তিনি ইংরাজী সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও ইংরাজী গানের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। কাজেই তাঁহার রচিত সঙ্গীত যে ইংরাজ-সমাজে আদৃত হইবে ইহা আর বিচিৎ কি ?

দ্বিজেন্দ্রলাল ত বিলাত হইতে ফিরিলেন। সমাজে এ দিকে হলুহুল পড়িয়া গেল। তিনি বারেন্সপ্রেশেণীর ব্রাহ্মণ। সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার জাতি সিদ্ধাচ্ছে বলিয়া হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পৃথক করিবার উদ্যোগ করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ক্রোধে রচনা করিলেন—‘একঘরে’।

এই ‘একঘরে’ পুস্তিকার হিন্দুসমাজের উপর অতি তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের শ্লেষ ও বাঙ্গপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হইল। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের উপর ‘একঘরে’ পুস্তকখানিতে বিক্রূপের বাণ বর্ষিত হইল। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সম্প্রদায়বিশেষের ভণ্ডামি প্রচার করিয়াছিলেন। ‘ককি অবতার’ নামক প্রঃসনে এইরূপ ভণ্ডামির উপর কশা-ঘাত হইয়াছে। ‘শ্রীহরি গোবিন্দ’ নামক কবিতায় পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ খাণ্ডতর্কণ বর্ণিত—

‘একদা শ্রীহরি প্যাণ্টটা কোটটা পরি’
খাচ্ছিলেন ত টেবিলেতে কাটলেট রোস্টে ক্যারি;
চতুর্দিকে বিহারত, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
জ্ঞানরত্ন, স্মৃতিরত্ন, হিন্দুধর্মধনি।”
এই অতি গম্ভীর সভা ; সবাই ধ্যানে মগ্ন ;
ছুরি এবং ফর্কে, ধারাল সব তর্কে

কট্টম এবং কোমল প্রসঙ্গ কছেন বলে তথ্য ;
সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, সবার বাক্য শুদ্ধ,
ঠুংক ঠিনিক টঙাস্ ‘ভন্ন নাইক কোনই শব্দ ;
কেবল টিকি নেড়ে, ‘মধুর বাহা বেড়ে’
একবার বলেন চুড়ামণি পুনঃ সবাই স্তব্ধ।
হোল একটু ভুল ভাবী তর্কের মূল
সে ‘মধুর’টা চরির নাম কি পক্ষীমাংসের ঝোল
শ্রোতবর্ণ মধো কিঞ্চিৎ রয়ে গেল গোল।”

সমাজে থাকিয়া গোপনে নিষিদ্ধ খণ্ড গ্রহণ করিলে জাতি বার না কিন্তু বিলাত অখ্যাত ভ্রমণ করিয়াছে বলিয়া বিলাত-প্রহা-গতকে একঘরে করা হয়। তাই উপরে উদ্ধৃত অখাদ্যভোজী পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কিত করিলেন। তাঁহার Reformed

Hindoos নামক হাসির গানেও এইরূপ
তাদের কশাঘাত করা হইয়াছে—

"It must be understood

যে একটু heterodox আমাদের food
কারণ, চলে মাঝে এ'টা ও'টা পে'টা

যখন we choose ;

কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think

তা হ'লে you are an awful goose."

বিলাত-প্রত্যাগতকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ
করে না, ইহাতে বিজ্ঞানস্রল বিশেষ ক্ষুব্ধ
হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ কর্মবীরগণকে
একে একে আচারগত বৈষম্যের জন্ত সমাজ-
চ্যুত করিয়া দূরীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এই
কথাই বিজ্ঞানস্রল 'সুরজাহান' নাটকে (১র্থ
অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে) প্রকটিত করিয়াছেন—
"যখন মনে হয় যে—ধর্মভীরু, কর্মবীর
ব্যক্তিকে গুটিকতক আচারগত বৈষম্যের
জন্ত আপনার ব'লে জাতির মধ্যে আলিঙ্গন
ক'রে নিতে পারি না, তখন বুঝি—
কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে
জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিষ টেনে
নিজের ক'রে নেয়, আর যেখানে মরণ,
সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গ'লে খ'সে
পড়ে।"

কবির জীবন কাব্যের উপর অসীম
প্রভাব বিস্তার করে। মানসিক অবস্থানুযায়ী
বিবিধ গ্রন্থাদিতে বিভিন্ন ভাবের ছাপ পড়ে।
সমাজবহির্ভূত হইবার আশঙ্কা যখন বিজ্ঞানস্রল,
তখন 'একব'রে' রচিত হয়। আবার প্রফুল্ল
বৌধনের সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া বিজ্ঞানস্রল
'হাসির গান' রচনা করেন। যখন তাঁহার
গর্ভস্থজীবন সুখময়, প্রচুর অর্থসমৃদ্ধ হইতেছে,

অফুরন্ত স্বাস্থ্য লইয়া তখন বিজ্ঞানস্রল হাসি-
মুখে 'হাসির গান' লিখিয়াছিলেন। এই
'হাসির গান' বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন জিনিষ।
বিশেষায় সাহিত্যে Comic Songsএর
অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে হাসির
গানের বিশেষ অভাব ছিল। বিজ্ঞানস্রল সে
অভাব পূর্ণ করেন। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রথম
এই শ্রেণীর গীত রচনা করেন। বিজ্ঞানস্রল
নিজে লিখিয়াছেন যে, ইংরাজী Ingoldsley
Legendsএর অনুকরণে তিনি 'আবাড়ে'
লিখিয়াছিলেন, এই গানগুলির অধিকাংশের
স্বর ইংরাজী। কিন্তু বিজ্ঞানস্রল এমন
সুকৌশলে সেই স্বরগুলি বাঙ্গালা গানে
মিলাইয়াছেন যে, আমাদের কর্ণে তাহা
শ্রুতিকটু বলিয়া আদৌ মনে হয় না। কতক-
গুলি গান একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গায়।
ইংরাজীর Chorusএর মত মধ্যে মধ্যে
সমবেতকণ্ঠে কতকগুলি পংক্তিগান বিজ্ঞান-
স্রল অতি সুন্দরভাবে প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

কবি দুইপ্রকারে হাসিতে পারেন। এক
প্রকার হাসি তীব্র ব্যঙ্গশ্লোকের আবরণে ঢাকা,
লেখক যে সকল দোষ দেখাইতেছেন, সে
সকল হইতে তিনি নিজে যেন মুক্ত। নিজে
উচ্চগিরিশিখরে বসিয়া নিজে সমতলভূমিতে
বিচরণকারী মানবদের যেন তুচ্ছ করিতেছেন,
ইহাতে সহৃদয়তা নাই, আছে কেবল নির্দম
কশাঘাত। ভল্টেমার এইরূপ হাসিয়া-
ছিলেন। সুইক্টুও এইরূপ হাসিয়া-
ছিলেন।

আর একপ্রকার হাসি আছে, বাহ্যে
লেখক নিজেকেও হাসির পাত্র বলিয়া মনে
করেন। অপরের দোষ দেখাইতেছেন বটে,

কিন্তু নিজের যে সে দলের মধ্যে আছেন, তাহা গোপন করিবার কোনও চেষ্টা নাই। এই হাসি সমবেদনা ও সহানুভূতিপূর্ণ। বিজ্ঞানলাল এই শেখোক্ত হাসি হাসিয়াছেন। Reformed Hindoos গানে হিন্দুমাগ্ন হৃদয়ের বিক্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু “বিলাতক্ষেত্র” নামক গানে নিজের দলের প্রতি উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

“আমরা বিলাতক্ষেত্র ক’ ভাই,
আমরা সাচেব সেক্রেজি সবাই,
তাই কি করি নাচার, বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।”

বিজ্ঞানলাল নিজে যে বিলাতক্ষেত্রের দলে এককালে বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, এ কথা অস্বরণ রাখিলে, উপরোক্ত পংক্তিগুলির সার্থকতা বুঝা যাইবে।

সামাজিক দোষ দূর করিতে অনেক প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁর আক্রমণ, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, সংবাদপত্রে লেখা প্রকৃতি তুণুণ আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে ফল না হইয়াছে, বিজ্ঞানলালের হাসির গানে তাহা হইয়াছে। হুকুমপ্রিয় ব্যক্তিগণ “নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো” গানে উপহাসিত হইয়াছেন, তত্ত্ব সংশোধিতব্য ‘নবজ্বালের’ চিত্রে অনেক কপটকারীর গাত্রদাহ হইয়াছে। ধর্ম্মে বিশ্বাসহীন ভক্তি অনবরত ধর্ম্মমত পরিবর্তন করিতেছে। তাহার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক বাকা— “ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা অল্প অল্পহার প’ড়লে সবারই মত বদলায়।” কলঙ্কগুলি গানের মধ্যে করুণ রসের অন্তঃসম্মিলিত বহিঃক্ষেপে। বাহিরে শুনিয়া হাসি বটে,

কিন্তু মনের মধ্যে গভীর শোকপ্রকাশ প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে।

কবি “ইরাণ দেশের কাজী”তে বলিয়াছেন—

“ইমাম সবাই সত্যপ্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী,
পার্সী ইমামে বিবাদ বাধলে,
পার্সীই অপরাধী।

পার্সী ঠেকিলে ইমাম গায়,
মাথাটি বাঁচান হইবে দায়,
পার্সীর শির কাটিয়া লইলে,
হইতে হইবে রাজী।”

এই ইরাণ দেশের কাজীদের নূতন আইন।

খুসরোজ উৎসবে বার্ষসাধকের চিত্র আছে—

“আজি এই শুভ রাত্রে আল্‌বো বাতি,
ঘরে ঘরে ভক্তিভাষে

নইলে যে চাকরি বাবে,

নইলে যে চাকরি বাবে;

আমাদের ভক্তি যা এ,

সে যে গো পেটের দারে;

নিরে আর চেরাক বাতি,

নিরে আর দিয়েসলাই ;

সাধে কি বাবা বলি,

ওস্তোর চোটে বাবা বলার।”

এই সকল হাসির গানের সাহায্যে ভগ্নাত্মিক সাধারণের চক্ষে হের বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া উচ্চ আদর্শের পথে চাঙ্গিত করা বিজ্ঞানলালের শক্তিতেই সম্ভব। তাই হাসির গানে আমরা শুধু হাসি না, নিজেদের সমাজের দোষ দেখিয়া ও নিজেদের কপটকার চিত্র দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে কাঁদিয়া ও থাকি। হাসির গানে যে সংশোধন হয়, শত গুণিভেদ তাহা অসম্ভব।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময় “সাধনা”, “সাহিত্য” “বঙ্গীণ” “ভারতী” প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। “অবলম্বন” “হরিনাথের স্বপ্নব্যাড়ী যাত্রা” সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। “কৈরাণী” কবিতা সাধনার প্রথম মুদ্রিত হয়। এই কবিতাগুলি ছন্দের বিষয়ে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। অক্ষর হিসাবে ইহার ছন্দ নির্ণীত হয় না। যাত্রা হিসাবে ও উচ্চারণ হিসাবে ইহার ছন্দ দেখিতে হইবে। কৃত্তিকার দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দো-বদ্ধ অতীব শিথিল; ইহাকে সমিল গত নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেক্রপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের স্বপ্নব্যাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের হৃন্দুভি-নিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?” বাস্তবিক কৌতুকজনক কাহিনী এইরূপ তরল ভাষায় বঙ্গসাহিত্যে প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালই প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল দুইটি বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়াছেন। অমৃষ্টপু, ছন্দে রচিত “কলিযজ্ঞ” এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে—

ব্যারিয়ার উকীলাদি মহাবজ্র সমাধিলা ।
ভারতে ভারি অমৃত আশ্রয় মহতী সভা ॥
আদ্রিলা সে মহাবজ্র মহারাত্রীর পশ্চিমে ।
মাত্রাজী উদ্ভিরা শিক বঙালী চন্দ্রে দলে ॥
কাহারো পরণে কৃষ্টি,

কাহারো উড়ুণী উড়ে ।

কাহারো বা ঝুলে চাপকান,

কাহারো সাহেবী ধরা ।

কাহারো সমুখে টেড়ী

কাহারো পিছনে টিকী ।

কাহারো উপরে কুটি—কা কস্ত

পরিবেদনা ॥”

‘কর্ণ-বিমর্দন-কাহিনী’ নামক কবিতা পঞ্চ-বাটিকাছন্দে লিখিত—

জানো না কি কদাচন মুঢ়

কর্ণ-বিমর্দন-মর্দ কি গৃহ ?

কর্ণ দিবার কি কারণ অস্ত,

যদি না তা আকর্ষণ জন্ত ?

এই সকল কবিতায় বাঙ্গালীর ঘরের কথা, ঘরের ছবি বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর অনেক বাঙ্গালীই ঘরে গিয়া নিম্নলিখিত দৃশ্য দেখিয়া থাকেন।

“খেটে খেটে খেটে

আপিস ছেড়ে এলাম যদি আপনারই ‘টেটে’।

কোণেতে জড়ান দেখি তরুণোঘের পাটি,

করাসের সতরঞ্জে এক কোমর মাটি ;

পুত্ররত্ন গিয়ে হুকোগাছটি নিয়ে

ভেঙ্গে সেটি, কালি মেখে, ককে ফেলে দিয়ে,

ঘুন্সি পরে তাকিয়াতে কচ্ছেন বসে নৃত্য ;—

ঘুমোচ্ছেন তাঁর পার্শ্বে শ্রির রামকান্ত ভৃত্য।”

এইরূপ অনেক ছবি দ্বিজেন্দ্রলাল নিখুঁতভাবে

আঁকিয়াছেন। ভাষা সরল, তাহার অবিয়াম

প্রবাহ। রহস্তের আলোকে এক একবার

দীপ্ত হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর ঘর, স্থখ, দুঃখ,

দোষ, গুণ হাসির মধ্য দিয়া উকি দিতেছে

এ সকল কবিতার সহিত করনামূলক কবিতার

পরিমাণ হইতে পারে না। শেলি বা কীটসের

কবিতার যাপকাঠিতে এ সকল কবিতার

পরিমাণ হইতে পারে না। ইহার জন্ত স্বতন্ত্র

মানদণ্ড আবশ্যক।

বর্তমান যুগের সাহিত্যের অবস্থা কি ? ইউরোপে দেখিতে পাই,—গল্প, উপভাস, রঙ্গ-রহস্য প্রভৃতিরই বেশী আদর। আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ, বর্তমান সমাজের অবস্থা বেকার, তাহাতে অতি অল্প লোকেই গভীর গবেষণা-পূর্ণ রচনা পাঠ করিতে সমর্থ। ইউরোপে জনসাধারণ সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করে। কৃষক সমস্ত দিন হলচালনায়, মজুর কারখানায় কেরানী আফিসে, বণিক একস্টেজে, উকীল আদালতে, সকলেই অর্থোপার্জনের জন্য সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর মূল লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে—অর্থোপার্জন। সারাদিন পরিশ্রমের পর অবসর বাপন করিবার জন্য বাহারা পুস্তক পাঠ করে, তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন। দার্শনিক জটিল তত্ত্বের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে চায় না, প্রকৃতত্বের গোলকধাঁধায় তাহারা দিশাহারা হইতে চায় না। তাহারা চায়—হুই একটা গল্প বা উপভাস, একটু রসিকতা বা হাসির গান। আমাদের দেশেও সে অবস্থা আসিয়াছে। প্রতি বৎসর গল্প ও উপভাস বৎ প্রকাশিত হয়, অল্প কোন শ্রেণীর গ্রন্থ সংখ্যায় তত অধিক নয়। মাসিক-পত্রের পাঠকেরা আগে গল্প ও উপভাসের অনুসন্ধান করেন। বতদিন না সামাজিক জীবনের পরিবর্তন হইবে, ততদিন অল্প কিছু আশা করাও সম্ভবপর নহে।

আরও একটা কারণ—গভীর-পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর স্বর্ষগ্রহণ করা সর্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব। একখানি স্বর্ষগ্রহ পাঠ করিতে গেলে, প্রকৃতত্বের আলোচনা করিতে গেলে

পূর্ক হইতে প্রস্তুত হইতে হয়। যনকে সেই সকল পথে প্রবর্তিত করিবার জন্য অত্যাস আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র একবার এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “লোকে গল্প বা উপভাস পাঠ করে, কিন্তু অন্তঃস্ব-বিষয়ক রচনা তাহাদের ভাল লাগে না। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই ও কোনও গভীর বিষয় ভাবিতে অভ্যস্ত হয় নাই। জনকতক শিক্ষিত ব্যক্তি অবশ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকসংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অস্বল্পপক্ষে গণনা করা যাইতে পারে বলিলেও চলে।”

দেখা গেল, বর্তমান সমাজের অবস্থায় সাধারণ পাঠক কি চায় ? দ্বিজেন্দ্রলাল এই শ্রেণীর পাঠকদের উপযুক্ত জিনিষই দিয়াছিলেন। তাঁহার হাসির গান, তাঁহার কৌতুকজনক কবিতা ও তাঁহার প্রহসন সকলেই সাগ্রহে পাঠ করিয়াছেন। মজলিসে তাঁহার হাসির গান গীত হইয়াছে, নাট্যালায় তাঁহার প্রহসন অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের কৃতিকর পদার্থ দিয়াছেন বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যে সাহিত্য-সেবকের উচ্চ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার বয়সের চেষ্টা ছিল—কবিতার গানে প্রহসনে, হাস্য ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া। যোগীকে চিনি-মাধান কুইনাইনের বড়ি খাওয়ানার মত রুগ সমাজকে তিনি হাসি মুক্তিয়া তিক্ত শিক্ষা-বড়ি খাওয়াইয়াছেন।

এই হাসির গান শুনিতে শুনিতে সহসা দ্বিজেন্দ্রলালের “মজ্র” বখন ধ্বনিত হইয়া

উঠে, তখন আমরা শুরু হইয়া বাই। দৈনিক
চা-পান সরপুরিয়া, রসগোল্লা গান হইতে
বখন বায়রণের উদ্দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চাস
পড়ি, তখন মনে করি, এ কি সেই কবি? যে
কবি বায়রণকে বলেন,—

“উঠনি জ্যোৎস্নার মত তুমি ;

উঠেছিলে তীর বিদ্যাতের ছটা

প্রাবৃত আকাশে ; চতুর্দিকে তব,

খোর কুৎসা-কৃষ্ণ ঘনঘটা

তোমাতে ঘেরিয়াছিল ;

তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ

তাহার উপর দিয়া, করিয়া

চকিত স্তব্ধ বিস্মিত জগৎ।

তুমি গাহ নাই গীত,

বসন্তের পিক-সম ললিত উচ্চাসে

কুঞ্জবনে ; গেয়েছিলে তুমি কবি,

পাপিয়ার মত নীলাকাশে,

প্রবণ মধুর স্বনে।

তোমার সঙ্গীত একাকী হিংলও নহে,

আরল'ও, ফটল'ও, করাস,

জর্জরী, রোম, বিয়ুৎ বিশ্বয়ে

গুনেছিল তাহা ; আর যে

বেথানে ছিল, করি তব কাব্য পাঠ

তোমাতে মানিয়াছিল,

একবাক্যে সবে, কাব্যজগতে সম্রাট।”

সেই কবিই কি হাসির গান-রচয়িতা? যে
কবি ভাঙ্গনহলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবোন্মত্ত,
বাহার কর্তে এই বাণী—

“হৃদয় অতুল হৃদ্য! হে প্রত্নরীভূত

প্রেমাক্ষ! হে বিরোগের পাষাণ-প্রতিমা!

মর্দরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস! আপ্লুত

অনন্ত আঁকপে, শুভ্র হে মৌন-মহিমা!

এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ স্থির,

এত নিকলক, এত করুণা হৃদয়

তুমি হে কবর! আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর

স্থিতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্ব ভিতর,

কিন্তু যবে ধূলি-লীন হইবে তুমিও,

কে রাখিবে তব স্থিতি? হে সমাধি!

চিরস্মরণীয়।”

তিনিই কি “আবাড়ে” লিখিয়াছেন? “হিমা-

লয়”, “নবদ্বীপ” “সমুদ্রের প্রতি” প্রভৃতি

কবিতায় কবি এক বস্তুকে বহু দিক্ হইতে

দেখিয়াছেন। এই সকল কবিতার মধ্যেও

আমাদের দেশের উচ্চ আদর্শের কথা জলন্ত

ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। দিল্লীর ও আগ্রার

মোগল-বিলাসের পার্শ্বে আর্ধ্যদের জীবনের

চরিত্র বড় সুন্দর। কবি বলিতেছেন,—

“বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে

মোগল। গুলাব ব্রান মর্শ্বর-আগারে ;

উজ্জল বসন, পূর্ণ আতর সৌরভে

শোলাও কালিয়া খাণ্ড ; মধমল ঝাড়ে

মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন ;

উদ্ভান, নির্ঝর, প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে

মধুর ন'বৎ বাণ্ড ; নুপুর-নিকণ,

সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে,

মরণের ও জন্ত চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ,

মরণের পর স্বর্গ, তাও সেই রূপসীর বক্ষ।

আর আর্ধ্যজাতি? ঠিক তার বিপরীত

রূপ—প্রকৃতির শোভা ; রস—পৃথিবীর ;

স্পর্শ—মিষ্ট বায়ু ; শব্দ—নিকুঞ্জ-সঙ্গীত ;

গন্ধ—বা বহিরা আনে উদ্ভান-সমীর।

পুণ্য-নদীজলে স্নান—অঙ্গে শুভ্রবাস ;

আহার—তণ্ডুল দ্রব্য ; শয্যা—ব্যাজচর্ম ;

আবাস—কুটীর-কক্ষ ; চরম বিলাস

জীবনের—তীর্থযাত্রা ; বিবাহও—ধর্ম ;

এ সংসার—স্বাধীন ; যুক্তা—মোক, হুগহীন,

শ্রমশানে নদীর তটে ; স্বর্গ—হওয়ার

পরতক্ষে লীন ।

এইরূপ কবিতা ও হাসির গানে বিজ্ঞেন্দ্র-লাল বধন বঙ্গসাহিত্যে নূতন সুর আনিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন সুখময় । তিনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন । পত্নীর নামেই তাঁহার গৃহের নাম-করণ হইয়াছিল—সুরধাম । কিন্তু প্রায় আট বৎসর পূর্বে বিজ্ঞেন্দ্রলালের পত্নী স্বর্গারোহণ করেন । একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া বিজ্ঞেন্দ্রলাল এই দুর্ভিক্ষ শোকভার বহন করিতে লাগিলেন । তাঁহার হাসির গান ফুরাইয়া গেল । গভীর শোকের ধারায় তাঁহার চিত্ত ধোঁত হইয়া নূতন মুক্তি ধারণ করিল । তাঁহার প্রতিভা এবার নূতন দিকে ধাবিত হইল । সেই চেষ্টার ফল তাঁহার সর্বজন-প্রশংসিত নাটকাবলী ।

বাল্যায় রঙ্গালয় দীনবন্ধু ও মাইকেলের নাটক ও প্রহসন লইয়া জন্মগ্রহণ করে । পরে রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্র ইহাকে বহু নাটো সাহায্য করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় প্রতিভা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটকে চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবের অপরূপ ব্যাখ্যায় বাল্যায় চক্ষে নূতন আদর্শ ধরিয়াছিল । বিজ্ঞেন্দ্রলাল নিজের নাটকাবলীতে যে বিশ্ব-প্রেম ও উদারতার আদর্শ অবতারণা করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও বহু পূর্বে তাহা নিজ নাটকে প্রকটিত করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্র

ও বিজ্ঞেন্দ্রলালের নাটকাবলীর তুলনায় সর্বা-লোচনার অবসর ইহা নহে ; তবে ইহা নিশ্চয়, গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে, বিজ্ঞেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম বঙ্গীয় নাট্যশালায় প্রসাধকগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে ।

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে বিজ্ঞেন্দ্রলাল প্রথমে প্রহসন-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তাঁহার “বিরহ” “ত্ৰ্যাহম্পর্শ” “প্রায়শ্চিত্ত” বা “বহুৎ আচ্ছা” রঙ্গক্ষেত্রে বহুবার অভিনীত হইয়াছে । রামায়ণের অহল্যা-চরিত্র লইয়া তিনি “পাষাণী” নামক একখানি নাটক রচনা করেন । এই নাটকে ধর্ম্মি গোতম আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত হইয়াছেন । বিজ্ঞেন্দ্রলালের কতিপয় ঐতিহাসিক নাটকের ভিত্তি রাজ-স্থান । তাঁহার “তারাবাই”, “হুর্গাদাস”, “রাণা প্রতাপ,” “মেবার-পতন” রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । মোগল-সাম্রাজ্যের একাংশের চিত্র “সুরজাহান” ও “সাজাহান” নাটকে প্রকটিত হইয়াছে । বিজ্ঞেন্দ্রলাল মেবার-পতনের ভূমিকার নিজেই নিজের নাটকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—“পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র, রাণা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয়-চরিত্র, হুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ-চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বলিয়াছিলাম ।” এইরূপ আদর্শ চরিত্র চিত্র করিবার পর বিজ্ঞেন্দ্রলালের কইনক কল্প তাঁহাকে বলিয়াছিলেন “তোমার সৌভাগ্য, প্রতাপসিংহ, হুর্গাদাস সব দেবতা ; দেখিতেছি তুমি কয়নার স্বর্ণরাজ্যে উড়িতেছ ; একবার বাস্তব জগতে নামো দেখি ;” বঙ্গব্যাক্তিক

দেখাও, বাহা দেখাইরা সেজনীর অমর হইরাছেন।” [ছুরজাহান—ভূমিকা] বন্ধুর এই উপদেশ বিজ্ঞানসঙ্গীত পালন করিয়াছিলেন। মেবার-পতনের ভূমিকার তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে “ভারাবাই ও ছুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইরাছিলাম।” মেবার-পতন নাটকে বিজ্ঞানসঙ্গীত একটি উদ্দেশ্য লইয়া বসিয়াছিলেন। একটি মহানীতি নাটকখানির মধ্যে প্রচার করা হইরাছে। “সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র বথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কর্তৃত্ব হইরাছে। এই নাটকে ইহাই কীৰ্ত্তিত হইরাছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।” [মেবারপতন ভূমিকা] বিজ্ঞানসঙ্গীত “চন্দ্রগুপ্ত নামক নাটকে সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নাটক হইতে বহু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সামাজিক নাটক লিখিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। “পরপারে” নামক সামাজিক নাটকে বর্তমান সমাজের নীতির বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন। ‘ভীম’ নামক একখানি পৌরাণিক নাটক ও ‘সিংহলবিজয়’ নামক একখানি নাটক লিখিয়া তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল নাটকের রচনা ও অভিনয়ে বাঙ্গলা নাটকের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানসঙ্গীতের নিজের কথাকে প্রকাশ যে, তিনি বাঙ্গলার রসমঞ্চ-মুহুরে প্রহসনের স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইরাছিলেন, নাটকের স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তু গঠনে নৈপুণ্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহসনে কুচিৎ ও নাটকে কাব্যশক্তি

অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। নাটকে কাব্যসৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে তাই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই কাব্যসৌন্দর্য্যের হই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। জাহাঙ্গীর ছুরজাহানকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন “সেদিন গবাকপথে দেখলাম—কি সে মূর্তি! কেম তুষারের উপর উষার উদয়; যেন স্তম্ভ নিশীথে ইমনের প্রথম স্বপ্নার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত! সে একটা নিঃসঙ্গ স্নেহের মত নয়, একটা মধুর রাগিনীর মত নয়, একটা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নয়। সে যেন একটা আনন্দের উদ্ভাস, একটা সৌন্দর্য্যের তরঙ্গকল্লোল, একটা মহিমার সমারোহ। সে যেন ভারতের নয়, ইরানের নয়, আরবের নয়; ভূত, ভবিষ্যৎ কি বর্তমানের নয়, স্বর্গের নয়, মর্ত্যের নয়! সে যেন সব দেশের, সব কালের; স্বর্গের ও মর্ত্যের উভয়েরই দেখবার জন্ত উভয়ের মধ্যে সংরক্ষিত একটা পৃথক সৃষ্টি। যেন দেবতার প্রেরণা, কবির সকল স্বপ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বাস! কি সে মূর্তি!” [ছুরজাহান, ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য] আমাদের মনে পড়ে সাজাহানের জাহান্নার প্রতি অমুরোধ “কি জাহান্নার! তবু নিশ্চয়! চেয়ে দেখ, এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে, দেখ: সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ ঐ আকাশের দিকে, দেখ: সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ ঐ কুজবনের দিকে—দেখ: সে কি স্নান! আর চেয়ে দেখ—ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাক্র, ঐ অনন্ত আক্ষেপে আগ্রস্ত বিরোধের অমরকাহিনী ঐ স্থির মৌন নিকলজ গুল্ল মন্দির, ঐ তাজ-মহলের দিকে চেয়ে দেখ—সে কি করুণ—

তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর।” [সাজাহান শেষ দৃশ্য] মনে পড়ে রাণা প্রতাপে ইরার সন্ধ্যা-আবাহন “কি গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে! সমস্ত আকাশে আর কেউ নাই, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের মরুভূমি বিচরণ করে এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্বজগৎ প্রাণিত করে’ অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল তেমনি গরিমায় নেমে যাচ্ছে। ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাম্বা ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে! আর যেন দেবারতির জন্ত সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে। কত সন্ধ্যা! প্রিয়সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে? কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন? এত নীরব এত কাতর?” [প্রথম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য] বিজ্ঞেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা এইরূপ কবিত্বময়। তিনি কদাচিত্ সমাস-বহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ছোট ছোট কথাগুলিতে তিনি বেক্রপ নিপুণতার সহিত মানবের সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ভাষার এই তেজ বঙ্গসাহিত্যে এক বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞেন্দ্রলালের এই ভাষার উপর অসীম অধিকার তাঁহার বৈচিত্র্য।” হাসির গানে ও হাসির কবিতায় তিনি যদৃচ্ছাক্রমে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। কত অপক্লপ দিল করিয়াছেন, কিন্তু কোনও থানে ভাষার জন্ত ভাবকে আড়ষ্ট হইতে হয় নাই। তাঁহার নাটকগুলিতেও অনাড়ম্বর ওজস্বিনী

ভাষার প্রবাহ। রাজপুতগণের যুদ্ধোৎসাহবাহী, সাজাহানের উন্মত্ত প্রলাপ, মুরজাহানের কুটিল বাক্য, সব এই ভাষার বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকটিত হইয়াছে। বিজ্ঞেন্দ্রলাল উপমার উপর উপমা পূঞ্জীভূত করেন—“তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈবশক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস [মেবার-পতন, ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য] “ঝটিকাঝিক্কু নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘন-কৃষ্ণমেঘাস্তরিত হির নীল আকাশের মত, ছাংখের উপর করুণার মত—এ কি মূর্ত্তি! একটা সৌন্দর্য্য! একটা গরিমা! একটা বিষয়! [মেবার-পতন—১ম অঙ্ক ৭ম দৃশ্য]

বিজ্ঞেন্দ্রলালের সমালোচনার শক্তি তাঁহার “কালিদাস ও ভবভূতি” নামক প্রবন্ধে প্রকটিত। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে ‘সাহিত্য’ প্রকাশিত হয়। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সকলে সর্বাংশে সায় না দিলেও, তিনি যে নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। জীবনের শেষভাগে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি কর্ম্ম হইতে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্য-সাধনায় রত ছিলেন। ‘ভারতবর্ষ’ নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদনভার তিনি গ্রহণ করেন। তাঁহাকে বহু পরিশ্রমও করিতে হইয়াছিল! মৃত্যুর দিন লিখিতে লিখিতে সহসা ক্লান্ত। তাহার পরই তাঁহার সংজ্ঞালোপ হয়। রোগবশত্বে সহ্য না করিয়া সাহিত্য-লোচনা করিতে করিতে বিজ্ঞেন্দ্রলাল অমর-ধামে গমন করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও নাটকের বিস্তৃত সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। আমাদের এই অবসরও অল্প। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার বিবিধ ভঙ্গীর কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কিন্তু দুই চারিটি তরঙ্গ দেখিয়া বেরূপ সমুদ্রের কলনা করা অসম্ভব, সেইরূপ এই উদাহরণ হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার সম্যক ধারণা করা হুজুহ। আমরা দেখিব—দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গলা ভাষাকে, বাঙ্গলা দেশকে, বাঙ্গালীকে কি দিয়া গিয়াছেন? বাঙ্গলা ভাষাকে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান দিয়াছেন। তাহার পূর্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় হাস্যরস অবতারণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। আগেকার হাসি ব্যক্তিগত আক্রমণ-পূর্ণ, কখনও বা কুরুচিসূলক। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ব্যক্তিগত আক্রমণবর্জিত, শুভ্র সংঘত হাস্যরসে অভিষিক্ত। হাসির কবিতার মাত্রা ছন্দ ও কৌতুককর কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গলাভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আর দিয়াছেন—নাটকগুলি। বিবিধ বিচিত্র চরিত্র অঙ্কনে ও ঘটনার স্বাভাবিক-প্রতিবাত্তে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের সৌন্দর্য্যবিধান দ্বিজেন্দ্রলালের কার্য্য। সেই নাটকের জলন্ত ওজস্বিনী ভাষা বাঙ্গলা গল্পের সুপ্ত নিব্বরের স্বপ্নভঙ্গ করিয়াছে। বাঙ্গলাভাষায় তেজ আনিয়াছে। আরও দিয়াছেন—সঙ্গীতগুলি। “আমার দেশ” প্রভৃতি সঙ্গীত শত শত কণ্ঠে গীত হইয়াছে। যতদিন বাঙ্গলাভাষার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এ সঙ্গীত-স্বাক্ষর নীরব হইবে না।

বাঙ্গলাভাষাকে ত পূর্বোক্ত সম্পদশালিনী করিয়াছেন। বাঙ্গলা সমাজের তিনি কি করিয়াছেন? বাঙ্গলার সমাজের দোষ স্পষ্টাঙ্করে বর্ণনা করিয়াছেন। কখনও তীব্র তিরস্কার, কখনও মৃদু বাণী দ্বারা সমাজের ভণ্ডামি প্রকটিত করিয়াছেন। হাসির গানের অন্তর্নিহিত উদ্বেগ, এই সমাজের দোষ প্রদর্শন, প্রহসনগুলিতেও এই সামাজিক দোষের ব্যঙ্গচিত্র, নাটকে গভীর উপদেশবাণী সমাজকে স্বার্থপথে চলিতে বলিতেছে।

আর বাঙ্গালীকে দ্বিজেন্দ্রলাল দিয়া গিয়াছেন—এক মহান আদর্শ। যে আদর্শ টেনিসন্ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই চিরশাস্তিময় বিশ্বপ্রেমের আদর্শ। যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, মানবজাতি একত্র ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত, মনুষ্যত্বের যেখানে চরম বিকাশ, সেই মহিমাময় ভবিষ্যতের চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। মেঘমস্ত্রে বলিয়াছেন “আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের মধ্য দিয়া নয়—জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া।” [যেবারপতন ৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য]।

কবিবর! মহৎ উদ্বেগ লইয়া সাহিত্য-সাধনা করিয়া আজ তুমি চিরশাস্তিলাভ করিয়াছ। সত্য ও সাহসে অদ্বিতীয়, জন্ম-ভূমিবৎসল নির্মলচরিত্র, উদারহৃদয় তুমি বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরে শ্রেষ্ঠ পূজকদিগের অন্ততম। তোমার ভাবায় তোমাকে বলি—

“তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মত।

তুমি কত উপহাস

কলিরাহ ; কহু বাক ; কহু স্থণী ;
 কেলিরাহ বিবাহ নিম্নাঙ্গ
 কহু ; কহু অমৃত্যুপ ; গভীর গর্জন
 কহু ; কহু তিরস্কার ;
 অগ্নেসিগিরির মত জ্বলিত জালা
 কহু করেছ উদ্গার,
 কহু প্রকৃতির উপাদান, ঘোড় করে,
 ক্ষুদ্র বালকের প্রাণ
 “আপন” দেশের জন্ত
 জলিরাহ কহু তীর মর্ষবেদনার ।”
 [বাইরণের উদ্দেশে] ।
 বাঙ্গালার দুর্ভাগা, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তাই আজ

তোমার অসমাপ্ত কৰ্ম্ম স্মরণ করিয়া অশ্রু
 মোচন করিতেছি । বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে
 তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে সুদ্রিষ্ট—বাঙ্গালীর
 স্বাভি-কল্পকে তোমার নাম সর্বদা পরি-
 বেষ্টিত হইয়া থাকিবে । কালিদাসের মরদেহ
 ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি মরেন নাই,
 ভবভূতি, ভারবি, শ্রীহর্ষ, তাঁহারও অমর ।
 মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের
 মত তুমিও বাঙ্গালীর কাছে অমর । তোমার
 প্রভাব, তোমার আশাসবাণী, তোমার উচ্চ
 আদর্শ, নাটকে, কবিতায়, সর্বোত্তম চিরদিন
 বাঙ্গালীকে মহান পথে পরিচালিত করিবে ।
 শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল ।

উৎপলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যের নিরসন—তথাপি সন্ধ্যহ ।

এক দিন ধর্মপাল অর্জুনদেবের সহিত
 অলঙ্গসেনের দেখা । অসঙ্গ তাঁহাকে নমস্কার
 অভিবাধন করিয়া বিদায় হইতেছিলেন,
 কিন্তু ধর্মপাল মহাশয় তাঁহাকে নিজের গৃহে
 বিশ্রামককে লইয়া গেলেন । সেখানে উভয়ে
 অনেক কথা হইল । অর্জুনদেব কহিলেন ;—
 “অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়
 নাই ।”

“স্বর্গাধরাজের সুগয়াবাসের দিন হইতে আমরা
 কতক দিন নানা বিপদে নিভাত উদ্বিগ্ন ছিলাম ।”

“ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং প্রমীতসেনের
 কারাবাসের কথা বলিতেছ ?”

“হাঁ, আমরা মহা-অশুভের পড়িয়াছিলাম ।

শুধু কয়েক দিন কারাবাসের ভয় নহে ।
 বোদ্ধ প্রমণ ভিক্ষুদের প্রতি যে কঠোর শাসন,
 তাহাতে ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং তাঁহার অপরাধের
 সহকারী প্রমীতসেনের জীবন সম্বন্ধেই আমরা
 মহা ভীত হইয়াছিলাম । ভগবানের আশী-
 র্বাদে আর আপনার অতুগ্রহে সে বিপদ
 হইতে রক্ষা পাইয়াছি ।”

“প্রমীতসেন ভাল আছেন ? এক কথা,
 মজ্জা—গারিকা মজ্জার সঙ্গে তোমার পরিচয়
 আছে ?”

অসঙ্গ বিস্মিত হইলেন, ধর্মপাল স্বহৃদে
 এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?—
 বলিলেন ;—

“হাঁ, আছে। মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।”

“প্রমীতও তাহাকে চিনেন?”

“প্রমীত যে তাহাকে চিনেন, অথবা তাহার গৃহে কোন দিন গিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই।”

“সেখানে ত অনেকেই বাইরা থাকে?”

“তাহা সত্য, কিন্তু প্রমীত ত কোন দিন যায় নাই।”

“মঞ্জুলা বিছরী, মঞ্জুলা রূপসী, মধুর-গারিকা; তাহার গীত শুনিবার জন্য কি প্রমীত কোন দিন বাইরা থাকেন না?”

“না; তবে সেদিন বসন্তোৎসবে প্রমীত মঞ্জুলাকে দেখিয়াছেন।”

“সেই কি প্রথম দেখা?”

অসঙ্গ আরও বিস্মিত হইলেন, বলিলেন;—

“আমি যতদূর জানি, সেই প্রথম দেখা।”

ধর্মপাল কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন,—

“সেদিন তোমাদের অত অহুরোধেও আমি প্রমীতকে ছাড়িয়া দি নাই, কিন্তু শেষে তৃতীয় দিনে হঠাৎ তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছি। কেন দিয়াছি, জান?”

“না। আমরা অভ্যস্ত বিস্মিত হইরা-ছিলাম। রাজাধিরাজ রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি কিরিয়া আসিয়া বিচার করিবেন, ইতিমধ্যে প্রমীত মুক্তি পাইলেন।”

“অবশ্যই ইহার মধ্যে একটা গুঢ় রহস্য আছে।”

“মিস্ত্রই আছে।”

“প্রমীতের নিষ্কৃতির জন্য মঞ্জুলা অহুরোধ করিয়াছিল!”

“মঞ্জুলা! আপনি মঞ্জুলার অহুরোধে প্রমীতসেনকে বিনা বিচারে ছাড়িয়া দিয়াছেন।”

“পাগল তুমি!—মঞ্জুলা মহারাজী দেবী-কারুবকীকে ধরিয়াছিল। দেবীর আদেশে আমি প্রমীতকে ছাড়িয়া দিয়াছি।”

কণকালের জন্য পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধর্মপাল তখন বলিলেন,—

“তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, প্রমীতের সঙ্গে কি মঞ্জুলার পরিচয় আছে? প্রমীত মঞ্জুলার কে?”

“আমি ত জানি কেহ নহে, কোন দিন আলাপ-পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎও নাই।”

“এমন গুরু অপরাধে রাজবিচার-প্রতীকার কারারুদ্ধ সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিষ্কৃতির জন্য মহারাজী দেবীকে অহুরোধ! তুমি জান, প্রমীতের পিতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুতা ছিল, প্রমীত আমার স্নেহের পাত্র; এত সহজে প্রমীত মুক্তি পাওয়াতে আমি আনন্দিত হইরাছি। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য আছে। তুমি প্রমীতের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তুমি সহজে এ রহস্য উদ্ধার করিতে পারিবে।”

ধর্মপালকে নমস্কার করিয়া অসঙ্গ বিদায় হইলেন। কুমুদিনিবাস অভিযুখে বাইতে বাইতে অসঙ্গ অনেক ভাবিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কান্নাগার হইতে মুক্তিলাভের পরেই ত বসন্তোৎসবে প্রমীত মঞ্জুলাকে প্রথম দেখিয়াছেন, তাহার পূর্বেই

মঞ্জুলা দেবী কারুবকীকে অহুরোধ করিয়াছিল। আর, বসন্তোৎসবের দিনও তাহাদের মধ্যে কোন আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই পারিকাই যে মঞ্জুলা, প্রমীত তাহা অসঙ্গের নিকটেই জানিয়াছিলেন। কতদিন ত অসঙ্গ প্রমীতকে মঞ্জুলার কথা বলিয়াছেন, মঞ্জুলার গৃহে বাইবার জন্ত অহুরোধ করিয়াছেন, প্রমীত সে অহুরোধ রক্ষা করেন নাই। তবে কেন এই অপরিচিতের জন্ত মঞ্জুলার অতটা আগ্রহ? প্রমীত কি মঞ্জুলাকে পূর্বেই জানিতেন, পূর্বে হইতেই তাহাদের মধ্যে পরিচয় ছিল, প্রমীত সে পরিচয় গোপন করিয়া চলিয়াছেন?—না। তবে ব্যাপারটা কি?

প্রমীত যেন কোথায় বাইতেছিলেন, অসঙ্গকে দেখিয়া বলিলেন;—

“সে কি! আজ ক’দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন?”

“নগরে ছিলাম না। তুমি কোথায় বাইতেছ? বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?”

“না।”

“বাইয়া কাজ নাই, বিশেষ কথা আছে, ঘরে চল।”

উভয় বন্ধু তখন প্রমীতের এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রমীত জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“কি কথা?”

উভয়ে শব্দ্যর বসিলে অসঙ্গ বলিলেন;—

“কি স্মৃতিবলে, কাহার অহুরোধে সেদিন কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছিলে, জানিতে পারিয়াছ কি?”

“না। কেমন করিয়া জানিব?”

“আমি জানিতে পারিয়াছি।”

“তুমি জানিতে পারিয়াছ। কেমন করিয়া জানিলে? কি জানিলে?”

“ধর্মপাল মহাশয় স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন।”

• “কবে?”

“এই এখনই বলিলেন, তাঁহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।”

প্রমীতের মুখ কোঁচুহলময়, কিন্তু অসঙ্গ কেমন যেন স্থিরগভীর!

“মঞ্জুলা—বিহ্বলী, রূপসী, কলকণ্ঠা মঞ্জুলা তোমার জন্ত অহুরোধ করিয়াছিল।”

“মঞ্জুলা!”

“হাঁ, মঞ্জুলা। মঞ্জুলা মহারাজী কারুবকীকে ধরিয়াছিল, তাঁহার আদেশে ধর্মপাল তোমাকে মুক্ত দিয়াছিলেন।”

বিস্মিত প্রমীত জিজ্ঞাসনত্রে চাহিয়া রহিলেন।

“এ নগরে শত সহস্র লোকের বাস, মঞ্জুলা কেন তোমার জন্ত এত ব্যস্ত? সে কেন রাজ্যীকে ধরিল?—মঞ্জুলাকে কি তুমি চিনিতে, তাহার সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল?”

“কোন দিন ত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ নাই।” প্রমীতের মুখ যেন হঠাৎ হর্ষ-বিকশিত হইয়া উঠিল।—“ও হোঃ। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মঞ্জুলা কেন আমার জন্ত এত করিয়াছে।”

“কেন করিল?—সে তোমার কে? আমার কাছে কিছু গোপন করিয়াছে?”

অসঙ্গের কথার স্বর কিঞ্চিৎ স্নেহবৃত্ত, কথার ভঙ্গিতে যেন আহত সৌহারদের ঐষৎ

বন্ধার, কেমন বেন কুণ্ড অভিমানের আভাস।

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;—

“আমার কেহই নহে। তোমার কাছে কিছুই গোপন করি নাই, কিন্তু একটা বিষয় গোপন রাখিয়া গিয়াছে।”

“বটে ?”

“আগে শুন।”

তখন প্রমীত সেই দুর্যোগময় রাত্রিতে নগরোপকণ্ঠে সেই বিপন্ন রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং উদ্ধারবৃত্তান্ত সমস্ত অঙ্গকে বলিলেন। ঘটনা শুনিয়া অঙ্গ চমৎকৃত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কে সে রমণী ?”

“শুন, তাহার কোন পরিচয় সেদিন পাই নাই। তাহার পর রাজার মৃগয়া-যাত্রার পর আমার কারাবাস। তথা হইতে মুক্তির পর সেদিন বসন্তোৎসবে, তুমি জান, সেই গায়িকাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তুমি আমার বিষয় এবং কোতুহল দেখিয়া পরিহাসও করিয়াছিলে। রাত্রিকালে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্ট সেই বিপন্নর সঙ্গে গায়িকার বেন কেমন একটুকু সাদৃশ্যের আভাস পাই। কিন্তু গায়িকা যে নগরপ্রসিদ্ধা মঞ্জুলা, তাহা তোমার মুখে শুনি। তাহার পর সেই বিপন্নর এক আশ্রয়পত্র পাইয়া একদিন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্ত তাহার গৃহে যাই, সেদিন সকল সন্দেহ দূর হয়। বিপন্নাই যে মঞ্জুলা সেই দিন তাহা জানিতে পারি। আজ দুই দিন হইল, তোমার সঙ্গে দেখা নাই, তোমাকে এ সকল কিছুই জানাইতে পারি নাই।”

কিটল ঘটনার এই অকপট বিবৃতিতে

অঙ্গের আশঙ্কা, সন্দেহ চলিয়া গেল।

শ্রিতমুখে অঙ্গ বলিলেন,—

“আমার কাছে তোমার কথা মঞ্জুলা অনেক দিন শুনিয়াছে, কিন্তু তুমিই যে প্রমীতসেন, মঞ্জুলা তাহা সে রাত্রিতে কেমন করিয়া জানিল ?”

“সেদিন ঝড়-বৃষ্টির পরে তাহাকে গৃহে পাঠাইবার সময় মঞ্জুলা মিনতি করিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি আমার পরিচয় তাহাকে দিয়াছিলাম। কিন্তু মঞ্জুলা নিজ-পরিচয় আমাকে দেয় নাই, আমিও বিপদগ্রস্তা অপরিচিতা সজ্জাস্তমহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। আমি তাহাকে তাহার নিজ-গৃহে পৌছাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মঞ্জুলা তাহাতে স্বীকার হয় নাই; সৌভাগ্য থাকিলে সময়ে একদিন পরিচিত হইয়া জীবন সার্থক করিবে, এরূপ বলিয়াছিল।”

“মঞ্জুলা তাহার পর কবে নিজগৃহে তোমাকে আহ্বান করিয়াছিল ?”

“বসন্তোৎসবের পর দিন।”

“সে ত তোমার কারাবাসের পরে। দেখিতেছি তার পূর্বেই তোমার মুক্তির জন্ত মঞ্জুলা রাজ্যকে ধরিয়াছিল ?”

“হাঁ, সেই দুর্যোগময় রাত্রিতে তাহার যে সামান্য কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ করিয়া মঞ্জুলা অব্যাহতভাবে আমার এই মঞ্চ-সংস্কার করিয়াছে।”

তখন দুই বন্ধু মঞ্জুলার চারদিক হাওয়া মুখ হইলেন, অঙ্গ বলিলেন ;—

“ধর্মপাল মহাশয়ের সন্দেহ, ইহার মধ্যে একটা বৃহৎ রহস্য আছে। তোমাদের মধ্যে

জানাত্তনা, আলাপ-পরিচয়, আরও কিছু” —
অসঙ্গ হাসিয়া বলিলেন,—“অবশ্যই কোন
নিগূঢ় সঙ্কল্প আছে ; সামান্য কারণে মঞ্জলা
মহারাজ্যকে অহুরোধ করিবার সাহস পাইত
না ।”

“এখন তোমার সন্দেহ দূর হইল ?
নিগূঢ় সঙ্কল্প কিছুই নাই । দূর হইতে এক
দিন দেখা, নিকটে যাইয়া এক দিন সাক্ষাৎ,
তাহাও আমার মুক্তিলাভের পরে । তুমি বস,
আমি উৎপলাকে এই সংবাদ দিয়া আসি ।”

“আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমি
বিলম্ব করিতে পারিব না । পাটলীগ্রামে
বাইতেছিলাম, ধর্মপাল মহাশয়ের নিকট
সংবাদ শুনিয়া তোমাকে জানাইতে এবং গৃঢ়
রহস্য ভেদজ্ঞাত আসিয়াছি । আমার
ভাগিনের অরুণ অভ্যাস্ত অমুহু, এখনি
আমাকে সেখানে বাইতে হইবে ।”

“আমি সঙ্গে আসিব ?”

“আজ আবশ্যক নাই ; পীড়া যদি
বাড়ে, তোমাকে সংবাদ দিব ।”

অসঙ্গ উঠিলেন, প্রমীতও উঠিলেন ।
রাজাকালে অসঙ্গ বলিলেন ;—

“মঞ্জলা অতি গুণবতী ।”

“তোমার মুখে তাহা বহুদিন শুনিয়াছি ।”

“মঞ্জলা রাজ্যী কারুবকীর স্নেহ পালিতা
কন্তা, মহাধনশালিনী ।”

“তাহার গৃহ, গৃহের সাজ-সজ্জা রাজ-
রাণীর উপযুক্ত ।”

“মঞ্জলা অপূর্বরূপসী ।”

“হৃলভ রূপ ! নিজচক্ষে দেখিয়াছি ।”

“মঞ্জলা হৃদয়শালিনী, উপকারীর প্রত্যা-
শকার করিতে জানে ।”

“আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে,
আমাকে চিরঞ্জলী করিয়াছে ।”

“দেখিও—ধনমান, রূপমোহন, বাক-
চাতুর্য, ললিত-কলা আর কোমল কৃতজ্ঞ
হৃদয়—ইহাদের অজের রক্তমাংসগঠিত মাহু
সংসারে বড় হুলভ ।”

প্রমীত হাসিয়া কেলিলেন, বলিলেন ;—

“তুমি পাগল !—আমার কিসের
অভাব ?”

রক্ষা-কবচের দ্বিগুণবিত্তপ্রভাবে ত
প্রমীতের চিত্ত নিত্য স্তব্ধ ! কিসের
ভয় ?

অসঙ্গ চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুরে জীর
কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করিয়া প্রমীত ব্যস্ত-
সমস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

“কৈ গো, কোথায় ?”

গৃহকোণে উৎপলা যেন কি করিতে-
ছিলেন, অগ্রসর হইয়া বলিলেন ;—

“এই ত এখানে,—এত ব্যস্ত কেন ?”

“শুনিয়াছ, কাহার অহুরোধে, কেমন
করিয়া আমি কারাগুরু হইয়াছিলাম ?”

“না, তুমিই ত তাহা কিছুই জানিতে
পার নাই, আমি আর কেমন করিয়া
জানিব ?”

“আমি জানিতে পারিয়াছি ।”

স্মিতসকৌতুকমুখে উৎপলা আরও
অগ্রসর হইয়া স্বামীর সম্মুখে অতি নিকটে
আসিয়া দাঁড়াইলেন ।

“কি জানিলে ? কে তোমাকে
বাচাইল ?”

“মঞ্জলা ।”

“মঞ্জলা ?”

উৎপলার গা শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়ে যেন সহসা নিমেষস্থায়ী শূচীবেধ-যন্ত্রণা অনুভূত হইল। সেই “চির-উপকৃত্য” রূপসী যুবতী মঞ্জুলা!

“হা, মঞ্জুলা! মঞ্জুলা আমার কারামুক্তির জন্ত মহারাজ্যী কারুবকীকে ধরিয়াছিল, দেবীর আদেশে আমি নিষ্কৃতি পাইয়াছি।”

“তুমি ব'স। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সব কথা বল। মঞ্জুলা কেন এত করিল?”

প্রমীত পালকে বসিলেন, হাত ধরিয়া উৎপলাকেও বসাইলেন। তখন অসজ্জের নিকট প্রত সকল কথা দীর কাছে বিবৃত করিলেন। উৎপলা বলিলেন ;—

“তুমি সেদিন তাহার গৃহে যাইবার পূর্বে—বসন্তোৎসবের পূর্বেই তবে মঞ্জুলা মহারাজ্যীকে ধরিয়াছিল। তখন ত তোমার সঙ্গে তাহার আলাপ-পরিচয় সাক্ষাৎও হয় নাই।”

“সেই বৃষ্টি-দুর্যোগময় রাত্রিতে মঞ্জুলা আমার পরিচয় পাইয়াছিল।”

“সেদিন তুমি যে তাহার সামান্য উপকার করিয়াছিলে, তাই মনে করিয়াই কি মঞ্জুলা তোমার এই মহত্বপূর্ণ—তোমার মান-সম্মত রক্ষা করিয়াছে?”

“হা, নিশ্চয়ই তাই।”

“তারপর সে দিন তাহার আমন্ত্রণে তুমি তাহার গৃহে গিয়াছিলে, সে দিনও কি তাহার কথাবার্ত্তা আলাপ-প্রসঙ্গে সে যে তোমার জন্ত এত করিয়াছে তাহা কিছুই বুঝিতে পার নাই?”

“কিছুই না। মঞ্জুলা যে আমার এই

মহাপ্রভাশকার করিয়াছে, আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাহা আমরা কোন মতে জানিতে না পারি, তাহাই তাহার ইচ্ছা।”

উৎপলার চিত্ত বিগলিত হইল। অমূলক সন্দেহ অনুদার দৈর্ঘ্যর স্নান-ছায়া তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। এমন গুপ্ত পরমোপকারিণী রমণীকে সন্দেহ? নেহ, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, অকৃত্রিম, সৌহার্দ্য উৎপলার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবেগময় হৃদয়ে উৎপলা বলিলেন ;—

“আমি মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা করিব।”

“আমি তোমার অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছি, আমি এখনি যাইব।”

“অনুমতি? এখন হিতকারিণী পরম সুহৃদের কাছে যাইবে, তাহার জন্ত আমার অনুমতি? আমরা যে চিরদিনের জন্ত মঞ্জুলার নিকট বিক্রীত। যখন তোমার ইচ্ছা, তখনই যাইবে। তবে, আজ এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

“তুমি আজ না-ই গেলে, কখনো যাও নাই। পরে আর এক দিন যাইও, আজ আমি যাই।”

“যাও, আমার কথা বলিও। আমি যে চিরকাল তাহার নিকট বাঁধা রহিলাম, তাহা বলিও। একটুকু বিলম্ব কর, আমি মঞ্জুলার জন্ত কি পাঠাইব? কিছু ফুলমালা পাঠাইব, কে লইয়া যাইবে? তোমার সঙ্গে কে যাইবে?”

“বাদল যাইবে, আরও যেন কেহ যায়, তুমি সব ঠিকঠাক কর।”

উৎপলা মাধবীকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি

স্তম্ভস্বয়ংক্রিয় স্থপতিতন পুষ্ক, পুষ্কগুচ্ছ এবং
মাল্য সংগ্রহ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্র ও বামন

রাজধানীতে সোমদত্ত একজন বিখ্যাত
পরিচিত লোক। পিতা প্রচুর ধনসম্পত্তি-
শালী ছিলেন, কিন্তু সোমদত্ত প্রথম বয়স
হইতেই বড় উচ্ছলপ্রকৃতি। পিতার মৃত্যুর
পর সেই ধনের অধিকারী হইয়া নানাপ্রকার
অবধাব্যয়ে সোমদত্ত তাহা প্রায় নিঃশেষ
করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি ব্যয়ের শমতা
নাই। বড় হাত ছোট করা সহজ নহে।
দাসদাসী, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবের অভাব
ছিল না। আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত, পান-
প্রসঙ্গে ব্যয়ের মাত্রা বরং বৃদ্ধি পাইতেছিল।
লোকে মনে করিত, অগাধ সম্পত্তি, অক্ষয়
ভাণ্ডার। কিন্তু যাহারা তাঁহার প্রকৃত অবস্থা
জানিতেন, তাঁহারা ভাবিতেন, আর কয়
দিন? দ্যুতগৃহে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে লোকে
দেখিয়াছে, গ্রামে সভিকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ
হস্ততা থাকায় লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল।

বেলা অপরাহ্নে সোমদত্ত মঞ্জুলার গৃহে
আসিয়াছিল। বাহকগণ ভারে ভারে ফল-
ফুল মাল্যসস্তার আনিয়াছে। মাতা অলোকার
সঙ্গে সোমদত্তের কথা হইতেছিল। চঞ্চলা
আসিয়া জানাইয়াছে, মঞ্জুলার অস্থখ, দেখা
হইবার সম্ভাবনা নাই। অলোকা বলিলেন,—

“আজ কতদিন যাবৎ মঞ্জুর শরীর যেন
কেমন হইয়াছে। একটা দিনও ভাল
যাইতেছে না।”

“কত দিন তাহাকে দেখি নাই। কি
হইয়াছে?—আর একবার সংবাদ দিবেন?”

অলোকা আর একবার পরিচারিকাকে
পাঠাইলেন। সে কিরিয়া আসিয়া জানাইল,
ভারি অস্থখ। পরিচারিকা চলিয়া গেল।
কিছু কাল নীরব থাকিয়া সোমদত্ত বলিলেন,—

“আমার সৌভাগ্যোদয় কবে হইবে!”

“আমার মনের ভাব আপনি জানেন।”

“তাহা ত জানি, কিন্তু মঞ্জুর মনের ভাব
আজও বুঝিতে পারিলাম না। সে দিন কেয়ুর
ফিরাইয়া দিয়াছিল, বন্ধুবান্ধবের সাদর উপহার
গ্রহণে কি দোষ?”

“দোষ কিছুই নহে। মঞ্জুর দুই তিন
গ্রন্থ কেয়ুর আছে, কেন আপনি অর্থব্যয়
করিয়া অত মণি মুক্তা খচিত মূল্যবান উপহার
পাঠাইলেন?”

“যথাসর্বস্ব দিয়াও যেখানে তৃপ্তির
সম্ভাবনা নাই, সামান্য মূল্যের কেয়ুর সেখানে
উল্লেখযোগ্যও নহে।”

“মঞ্জুলার বালিকা-বুদ্ধি আজও যায় নাই।
ধনসম্পদ, মানসদত্ত, যশগৌরবে আপনার মত
আর কোথায় মিলিবে? আপনি যান্ত্র
হইবেন না।”

“অনেক দিনের আশা!”

শুধু আমার হাত হইলে এতদিন আপনার
আশা এবং আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে বিলম্ব
হইত না। কিন্তু রাজ্যী কারুবকী মঞ্জুর অভি-
ভাবিকা।”

সোমদত্তের মনে পড়িল, প্রমীতের কারা-
মুক্তির পূর্বদিন ত মঞ্জুলা রাজ্যের নিকট
গিয়াছিল। মঞ্জুলা কি প্রমীতের জন্ত
রাজ্যীকে অস্বরোধ করিয়াছিল? মঞ্জুলা ত
প্রমীতকে চিনে না! তখন আর এক দিনের
কথা সোমদত্তের মনে পড়িল; সে দিন সন্ধ্যা

সময়ে প্রমীতসেন এই দিকেই আসিতেছিলেন
মঞ্জুর ভৃত্য বাহক তাঁহার সঙ্গে ছিল।
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“তুনিতে পাই, রাজ্ঞী কারুবকীর পিতা
ভিক্ষু উপগুপ্তের শিষ্য ছিলেন?”

“আমিও তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু বৌদ্ধমত
অবলম্বনের পূর্বেই তাঁহার অভাব হয়। রাজ্ঞী
কারুবকী কিন্তু ভিক্ষুকে পিতৃগুরু বলিয়া
চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।”

“তাই বুঝি রাজাধিরাজের মৃগয়াযাত্রার
দিন অতিগুরু অপরাধ করিয়াও শেষে রাজ্ঞীর
অনুরোধে ভিক্ষু নিষ্কৃতি লাভ করেন?”

“অতি সম্ভব।”

“প্রমীতসেনও অপরাধী ছিলেন; তাঁহার
মুক্তি কেমন করিয়া হইল, কিছু শুনিয়াছেন
কি?”

প্রকৃত অপরাধী ভিক্ষুই যখন মুক্তি
পাইলেন, তখন তাঁহার সহকারী বলিয়া ধৃত
প্রমীতসেন আর কেমন করিয়া দণ্ডিত
হইবেন?”

“ভিক্ষুর মুক্তির পূর্বেই ত প্রমীতসেন
নিষ্কৃতি পাইয়াছে।”

“হাঁ, তাঁহার অতি সৌভাগ্য।”

সোমদত্ত আর কথা বাড়াইলেন না।
তাঁহার মনের সন্দেহ মিটিল না; কিন্তু আর
কিছু জিজ্ঞাসা করা তিনি সমীচীন বোধ
করিলেন না। বলিলেন;—

“অমন বিপদ হইতে অত সহজে রক্ষা
পাওয়া অতি সৌভাগ্যের ফল, তাহাতে
কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার মুক্তিতে সমস্ত
রাজধানী আনন্দিত।—মঞ্জুর সঙ্গে আজ আর
দেখা হইল না, আপনি আমার কথা তাহাকে

বলিবেন। আপনি ভরসা দিয়াছেন, তাই
আশায় বুক বাধিয়া আছি।”

“আমি ত সাধামত চেষ্টা করিয়াছি।”

বিনীত নমস্কার করিয়া সোমদত্ত তখন
বিদায় হইলেন।

কন্যা বয়স্কা হইয়াছে, মাতা অনেক দিন
হইতে তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন।
মঞ্জুর রূপগুণ-ধন-মুগ্ধ প্রার্থীর অভাব ছিল
না। কিন্তু তাহার সম্যক উপযুক্ত বর সংঘটন
পক্ষে যে সকল অন্তরায় ছিল, অলোকা তাহা
জানিতেন। বিশেষতঃ রাজ্ঞী কারুবকীর
অভিমত না হইলে, অনুমতি না পাইলে মাতা
কিছুই করিতে পারেন না।

মঞ্জুর অসামান্য রূপগুণবিষ্ঠা-গৌরবের
কথা শুনিয়া অনেক সম্রাট প্রবীণ লোক
তাহার গৃহে সময় সময় আসিয়া আপ্যায়িত
হইয়া যাইতেন। কোতূহল-পরবশ হইয়া
সোমদত্তও একদিন মঞ্জুর পরিচিত এক
জনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; আসিয়া,
দেখিয়া শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। সেই
হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন।
শেষে একদিন নিজের মনের ভাব প্রকাশ্যে
মাতা অলোকাকে জানাইলেন। সোমদত্তের
প্রস্তাবে মাতার মন বিচলিত হইল। এমন
লোকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে মাতা
অমত করিতে পারিলেন না। সোমদত্ত
বিপত্নীক। সমাজে, নগরে সোমদত্ত
সুপরিচিত, মানসম্মত সোমদত্ত প্রার্থনীয়।
কিন্তু মঞ্জুরা বয়স্কা হইয়াছে। অবস্থা, শিক্ষা
এবং সংসর্গগুণে আশৈশব স্বাধীনচিত্তা কন্যার
অভিমত অথবা মনের গতি না জানি পর্য্যন্ত
মাতা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

কন্যার মন জানিতে পারিলেই রাজ্যীর নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন।

এদিকে সোমদত্তের মনে আশার সঞ্চার হইল। আশা ক্রমে ঔৎসুক্যে পরিণত হইল। রূপগুণে মঞ্জুলা আকাঙ্ক্ষনীয়, কিন্তু সোমদত্তের পক্ষে তদপেক্ষাও গুরুতর আর এক হেতু ছিল। সোমদত্তের অবস্থা ভাল নহে, বরং তাহা ক্রমে অতিমন্দ হইয়া আসিতেছিল, অর্থাভাবে সমাজে মানমর্যাদা প্রভৃতি রক্ষা তাঁহার পক্ষে ক্রমে কঠিন হইতেছিল। মঞ্জুলার বিপুল সম্পত্তি; মঞ্জুলা হস্তগত হইলে, সেই অর্থাভাব দূর হয়। সোমদত্ত ক্রমে অতি ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

সোমদত্ত চলিয়া গেলে অলোকা অনেক ভাবিলেন; কেয়ুর গ্রহণে/অসম্মতি প্রকাশ করার পর হইতে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; শেষে বয়স্থা কন্যার অভিমত প্রতীক্ষায় বিলম্ব করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কন্যাকে তিনি কিছু ভয় করিয়াই চলিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুর গোরব

সেদিন সন্ধ্যায় প্রাকালে মঞ্জুলা নিজের কক্ষে শয্যায় বসিয়া বীণার স্বরলরে গীত গাহিতেছিল;—

কায়সে কহো শ্রাম ভিখারী।

তোহারি ঘরশ বিহু, নিঠুর কালাইরা,

অঁখিসে লোর ঝরে সো পেরারী।

বরিথয়ে সুখা গগনে চক্ৰমা,

বিথে জরে অঙ্গ গোপনারী।

দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী,

তুঁহ পরদেশে চিত চোরী!

মঞ্জুলার সুন্দর সুগোল গোর মুখমণ্ডলে শারীরিক কোন প্রকার অসুখের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই। বিচ্যাংগর্ভ নবীন মেঘবৎ নিবিড়রুক্ষ তারকাযুক্ত তাহার আরত চক্ষু, দীর্ঘ সুন্দর ঘোররুক্ষ কোমল পদ্মশ্রেণী আর চিত্রলিখিতবৎ মিলনোন্মুখ বক্সিম ক্রমুগের মূঠ আকৃকন এবং স্পন্দনে গীতকথার গুপ্ত ভাব এবং বীণার স্বরসঙ্গতির অভিব্যক্তি হইতেছিল। সাজসজ্জা অলঙ্কার সমাবেশের কোন আড়ম্বর নাই, তথাপি তাহার সুদূরজ্জলন্ত্রী ক্ষীণ দেহ বসন্তে নবকুমুমিতা মাধবীলতার মনোহর স্বাভাবিক লাভণ্যময়।

মঞ্জুলা গাহিল;—

বরিথয়ে সুখা গগনে চক্ৰমা,

বিথে জরে অঙ্গ গোপনারী।

দহতি অঙ্গ মল্লিকা মালতী,

তুঁহ পরদেশে চিত চোরী!

চক্ৰমা বলিল;—

“চাঁদের কিরণে শরীর জালা করে, মল্লিকা মালতী অঙ্গ দহু করে, তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে?”

“জানিব আবার কি? লোকে চিরকাল ওরূপ বলিয়া আসিতেছে; তুই শুনিছ নাই?”

“অমন অনাস্থষ্টি কথা আমরা শুনি নাই।”

“তুই শুনিছ নাই বলিয়াই কি তা মিছা হইবে?”

“প্রতিদিনই ত চাঁদের কিরণে কত ইঁাটি, বসিয়া থাকি, কাজকর্ম করি; মল্লিকা মালতী যুঁই জাতি তুলিয়া কত মালা গাঁধি; কোমদিনও শরীর জালা করে না।”

“তোমার ত পাথরের শরীর, তার আর জ্বালা-যন্ত্রণা কি?—শোন;”—

তুঁহ পরদেশে চিত চোরি!

চঞ্চলা হাসিয়া উঠিল, বলিল;—

“ওহো! এখন বুঝিলাম, কেন জ্বালা!”

“তুই কি ও ভাবের জ্বালা কখনো মরিয়াছিস?”

“আমার ত পাথরের শরীর। তবে শুনিয়াছি, আমার এক বড় ভগ্নী ছিল, তার ননদ না কি ঐরূপ জ্বালায় জলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল।”

“কি হইয়াছিল রে?”

“তার শ্রমী না কি বিদেশে চলিয়া যায়, আর ফিরাই আসে না। ঘরে আর কেহ ছিল না, অনাহারে জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে সে না কি মরিয়া যায়।”

“দূর অভাগী! অনাহারে মরা হইল এক, আর আশাভঙ্গে—প্রিয়জনের অদর্শনে—জলিয়া মরা হইল আর এক কথা।”

“তা হ’লে এই যে সোমদত্ত মহাশয় কত আশা করিয়া কতদিন এখানে আসেন, আজও আসিয়াছিলেন, তিনিও জলিয়া পুড়িয়া মরিবেন!”

“কে কোথায় জলিয়া পুড়িয়া মরে, আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব? আর তাহাতে আমার কি?”

“সোমদত্ত মহাশয়ের কথা তুমি জান। আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, ঠাকুরাণীর যেন সেই ইচ্ছা!”

মঞ্জুলার হাসিমুখ গম্ভীর হইল। কোড় হইতে বীণা সরাইয়া রাখিয়া মঞ্জুলা বলিল;—

“তুইও কি সেই দিকে?”

চঞ্চলা একটুকু অপ্রতিভ হইল। সোমদত্তের সঙ্গে একদিন তাহার কিছু কথাবার্তা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। শুধু গৃহস্থের মন বুঝিবার জন্য আজ এ ঢিল মারিয়াছে। চঞ্চলা অভিমান-দুঃখ স্বরে কহিল;—

“আমি! কেন তোমার এ সন্দেহ হইল? আমার কোন দিক-বিদিক নাই; তোমার যে দিক, আমারও সেই দিক।”

মঞ্জুলার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। মঞ্জুলা বলিল;—

“শোন, চাঁদের কারণে যে গা জ্বলে, তাহা আমি জানি না; আমার গা ত কোন দিন জ্বলে নাই। সে কথা যাক। তুই না এক দিন বলিয়াছিলি, দ্যুতগৃহ হইতে সোমদত্ত মহাশয়কে বাহির হইতে দেখিয়াছিস?”

“একদিন দেখিয়াছিলাম বটে।”

“ম’র মনের ভাব আমি কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিয়াছিস?”

“আজ বুঝিলাম।”

“তবে আর সে কথায় কাজ নাই। সন্ধ্যা হইল, চিত্রাকে আলো জালিতে বল।”

চঞ্চলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুলা বীণা তুলিয়া লইয়া পুনরায় মৃদুমৃদু ঝঙ্কার দিতে লাগিল। এমন সময় চিত্রা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল;—

“প্রমীতসেন মহাশয় আসিয়াছেন।”

মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিল।

“কোথায় তিনি?”

“ঠাকুরাণীর ঘরে।”

“তুই আলো জ্বাল। চঞ্চলা, চল আমরা বারান্দায় যাই।”

বিস্তৃত কেশে, বিপর্যস্ত বেশেই মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আয়তচক্ষে অতর্কিতে চলৎবিহীন চমকিয়া উঠিল, অধরে স্মিতরেখা দেখা দিল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। চতুরা চঞ্চলা সকলই লক্ষ্য করিল। সে মনে মনে ভাবিল, বটে? এখন হইতে তাঁদের কিরণে গা জ্বালা করিবে!

দাসী পরিচারিকারা আলো জ্বালিতে লাগিল। চঞ্চলা দ্রুতহস্তে মঞ্জুলার কেশপাশ এবং বেশভূষার একটুকু শৃঙ্খলা করিল। একখানি ঈষদলক্তকরক্ত ওড়নি আনিয়া তাহার অঙ্গে পরাইয়া দিল।

বারান্দায় ছোট ছোট বেত্রাসন, পাল, তাহাতে পুরু শয্যা। নিম্নে কত লতা—মুক্তা, মাধবী, লবঙ্গ—দক্ষ মালী যত্নকৌশলে ক্রমে বর্জিত হইয়া বারান্দার গুহগুণি ঘিরিয়া ঘিরিয়া উপরে ছাদ পর্যন্ত উঠিয়াছে। লতার কত ফুল! অগোমুখ রক্তরবি-কিরণে পশ্চিমাকাশ তখন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে সে অপূর্ব শোভা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে পৌ ছয়া মঞ্জুলা বলিল;—

“মালী নিত্যকার ফুলমালা দিয়াছে?”

“হাঁ, এখানে আনিব কি?”

“এখন না, সময় হইলে আনিবি। চঞ্চলা, এখানে থাক; চিত্রা, তাঁহাকে এখানে লইয়া আয়।”

প্রমীতসেন বারান্দায় পৌছিলে মঞ্জুলা সলজ্জ মুদ্রপদে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্বর্দন করিল। স্মিতমুখে বলিল;—

“কি সৌভাগ্য আমার! এ সামান্য স্ত্রীলোককে আপনি বিস্মৃত হন নাই!”

“বিস্মৃত হইব? আপনি—তুমি এ অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিকে চিরজীবনের জ্ঞান করিয়াছ। আগে জানিতে পারি নাই, জানিতে পারিলে কোন্ দিন আসিয়া এমন হিতকারিণীকে ধন্বাদ—ধন্বাদে কি কখনো চিত্তের তৃপ্তি হইতে পারে?”

“কি জানিতে পারিয়াছেন?—আপনি বসুন।” প্রমীতসেন একখানি আসনে বসিলেন, বলিলেন,—

“জানিতে পারিয়াছি—তোমার অমুগ্রহে কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াছি, তোমার অমুগ্রহে আমার মান, সম্মান, জীবন রক্ষা পাইয়াছে। সেদিন তোমারগৃহে আসিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট যে আমি এত ঋণী, তাহা ত জানিতাম না।”

“আপনার কারামুক্তিতে আমাদের যে কত আনন্দ হইয়াছে, তাহা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব?”

“আমার এমন মহোপকার তুমি করিয়াছ; কিন্তু সে কথা অপ্রকাশ রাখিয়াছ! আজ আমি সকলই শুনিয়াছি।”

প্রমীত তখন অসম্মত নিকট শ্রুত নিজের কারামুক্তির ইতিবৃত্ত মঞ্জুলাকে জানাইলেন। কিন্তু ধর্মপালের নাম প্রকাশ করিলেন না, অসঙ্গ তাহা নিষেধ করিয়াছিলেন। মঞ্জুলা বলিল;—

“আমি সেদিন দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় নিরপরাধে আপনার কারাবদ্ধের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম মাত্র। দেবী দয়াময়ী, তিনি আপনার নির্দোষিতা বুঝিতে পারিয়া আপনার

মুক্তির জন্তু ধর্মপাল মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দেবীর দয়ায় আপনার মুক্তি হইয়াছে। আমি কিছুই করি নাই।”

“তুমি কিছুই কর নাই?—তোমার অমুরোধেই যে রাজ্যীর চিত্ত আত্ম হইয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।”

“এই সামান্য কার্যের পুনরুল্লেখ করিয়া আমাকে আর লজ্জিত না করেন, আমার এই প্রার্থনা।”

“কার্য সামান্য নহে, আমার জীবনরক্ষা। আমরা যে তোমার কাছে চিরদিনের জন্তু বাঁধা রহিলাম, তাহা তোমাকে জানাইবার জন্তু আমার স্ত্রী আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। পরম সুহৃদের নিকট পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আমার সঙ্গেই আসিবার জন্তু প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রাত্রি হইবে বলিয়া আজ তাঁহাকে বিরত করিয়াছি।”

“তিনি আমার এখানে আসিবেন?—সে কি! আমার সহস্র মিনতি”—মঞ্জুলা নতজাহ্নু হইয়া ভূমিতে প্রণাম করিল।—“আমার সহস্র প্রণাম তাঁহাকে জানাইবেন। তিনি আমার এখানে আসিবেন! তাঁহার অমুমতি পাইলে আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইব।”

“তুমি যাইবে?”

“রাজাধিরাজের জন্মদিনের উৎসব আসিতেছে। দেবীর আদেশ, আমাকে দেবীর নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে। আপনি অমুমতি করুন, তাহার পরে শীঘ্র একদিন কুমুদনিবাসে যাইয়া জীবন সার্থক করিব।”

“তুমি যাইবে! গেলে আমার স্ত্রীর

আনন্দের অবধি থাকিবে না। তিনি কিছু ফুল ও মালা উপহার পাঠাইয়াছেন, অমুমতি পাইলে ভৃত্যেরা এখানে উপস্থিত করিবে।”

“মঞ্জুলা ইচ্ছিতে চিত্রা বারান্দার অপর পার্শ্ব হইতে ফুলমালোর ভার সেখানে লইয়া আসিল। মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিত্রার হাত হইতে সেই পুষ্পভার গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিজ মস্তক স্পর্শ করিল।

“এখানে আঁধার হইয়া আসিল, আপনি ভিতরে চলুন।”

প্রমীত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গন্ধদীপাবলীতে কক্ষ আলোকিত হইয়াছে। প্রমীত উপবেশন করিলে মঞ্জুলা সেই পুষ্পভারের আচ্ছাদন খুলিয়া একটা সুরতি মালা বাহির করিল, অতিবস্ত্রে তাহা নিজ কণ্ঠে পরিল; তখন নতমস্তকে পুনর্বার প্রণাম করিয়া বলিল;—

“আজ আমার দেহ পবিত্র হইল।”

শিখদীপরাশ্মিপাতে ওড়নির অলঙ্করণে মঞ্জুলা হর্ষপ্রফুল্ল গৌরমুখ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

উৎপলা পরমসুন্দরী। বয়সসম্প্রদায়ে প্রমীতসেনের গৌরব—অমন সুন্দরী স্ত্রী আর কাহারও নাই। প্রেমিকের চক্ষে ত কত কুরূপাও সুন্দরী, কিন্তু উৎপলা স্বভাব-সুন্দরী। প্রমীতের বিশ্বাস এবং অহঙ্কার অমন রূপবতী রমণী আর কোথায়ও নাই। কিন্তু প্রমীতের সে বিশ্বাস, সে গর্ব আজ বা ক্ষুণ্ণ হইল! নগরোপকণ্ঠে অস্পষ্ট আলোকে দৃষ্টা আকুল-কুস্তগা অপরিচিতা মঞ্জুলা পরম-রূপসী, বসন্তোৎসবে মণিমুক্তালঙ্কারে মণ্ডিতা গায়িকা মঞ্জুলা আরও সুন্দরী, নিজগৃহে

প্রথমসম্ভাষণে আমন্ত্রণকারিণী উপকৃতা মঞ্জুলা তদপেক্ষাও সুন্দরী, আর আজ সম্পূর্ণ নিরাভরণা শুধু উৎপলার উপহারমালাধারিণী পরমহিতকারিণী মঞ্জুলার রূপ প্রমোদের চক্ষে অতুলনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইল।

কি রূপ! মুগ্ধ প্রমোদ নিম্পন্দ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলার মধুর উকির উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। মঞ্জুলার আরক্ত মুখ নত, রক্তাভ হইয়া উঠিল।

চঞ্চলা অপর কক্ষ হইতে ফুলমালাচন্দন-গন্ধচূর্ণ-পরিপূর্ণ একখানি থালা লইয়া আসিল। কম্পিত হস্তে সেই থালা প্রমোদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মঞ্জুলা বলিল;—

“আমার এই সামান্য পূজা—”

তখন প্রমোদের চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার মুখও আরক্ত হইয়া উঠিল।

“পূজা! তোমার নিকট যে আমায় চির-বিকাণ্ড!”

প্রমোদ থালা হইতে একটু মালা তুলিয়া গলায় পরিলেন, চন্দনগন্ধচূর্ণ গায়ে প্রক্ষেপ করিলেন; বলিলেন;—

“রাজাধিরাজের জন্মোৎসবে আমারও উপস্থিত হইতে হইবে। রাত্রি হইয়াছে, আমি বিদায় প্রার্থনা করি। আমার স্ত্রী তোমার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইবেন।

“আমি শীঘ্রই তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইব।”

মঞ্জুলা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রণত হইয়া বিদায়সূচক অভিবন্দনা জানাইল। তারপর চঞ্চলা, চিত্রা এবং অজ্ঞাত পরিচারিকাসহ বহির্দ্বার পর্যন্ত প্রমোদের অনুগমন করিল।

পথে চলিতে চলিতে বার বার প্রমোদের মনে হইল, কেন আজ এই আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। মঞ্জুলা কি মনে করিবে? মঞ্জুলা পরমরূপবতী? ভাল, তাহাতে আমার কি?

মাহুষের চিত্ত যখন প্রথম বিচলিত হয়, কারণ জানিতে পারিলেও তাহা সহজে স্মৃতি করিতে চাহে না।

রক্ষাকবচ, জাগ্রত হও! আপাতঃ পূর্ব অমোঘ বিষের গুপ্ত প্রভাব প্রথমে কে বুঝিতে পারে?

(ক্রমশ)

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বৈদিক সাধনার আভাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অব্যাক্তশরীর আনন্দময় ঈশ্বর হইতে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি। প্রজাপতিদেহকপিণী অব্যাক্তপ্রকৃতি হইতে নিখিল প্রকৃতি-বিকারের উৎপত্তি। প্রকৃতির এই বিকৃতিকে

সাধারণভাবে জড়-সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে। পরন্তু একান্ত জড় বা চৈতন্যবিহীন কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভবে না। ব্যাখ্যার সৌকর্য্যার্থই শাস্ত্রব্যাখ্যাভ্রগণ জড় ও চৈতন্যের

বিভাগ করিয়া করিয়াছেন। মূলতঃ প্রকৃতিকে জড় বা অচেতন বলা আর চৈতন্যকে অচেতন বলা সমান কথা। পূর্বোক্ত সৃষ্টিসূক্তে বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন যে প্রলয়-কালে স্বধা বা প্রকৃতি এক অভিন্নভাবে ব্রহ্মে লীন থাকে। স্তবরাং প্রকৃতি জড় হইলে ব্রহ্মও জড় হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই লৌকিক চেতন ও অচেতন পদার্থরূপে লোক-চক্ষে প্রতীয়মান হন। কৰ্মসংস্কারবশে অজ্ঞান জীব যখন তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হয়, তখনই সে তাঁহাকে কোথাও চেতন ও কোথাও অচেতনরূপে দেখে। জীবের কৰ্মসংস্কারদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সৰ্ব্বশক্তিমানের সৃষ্টিশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বিকাশ করিয়া বিধময় ভেদ উৎপন্ন করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানচক্ষু সম্যক উজ্জ্বলিত না হয়, ততক্ষণ জীব এইরূপে বিধময় ভেদ দর্শন করে, বেদপ্রতিপাত্ত ব্রহ্মপদার্থকে দর্শন করে না। জ্ঞানসূক্তে (ঋঃ সংঃ ১০।৭১) ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

“উত ভুঃ পশুন্ন দদর্শ ভুঃ শূদ্রঃ শৃণোত্যোনাং ।
উতো ঋগ্মৈ তনং বি সস্ত্রে জায়েব পত্য উশতী
সুবাসাঃ ॥” ১০।৭১।৪

“একজন বাক্কে দেখিয়াও দেখে না, একজন তাঁহাকে শুনিয়াও শুনে না ; আবার একজনের নিকট তিনি তাঁহার নিজেকে প্রকাশ করেন যেমন সঙ্গমাতলাষিণী শোভন-বসনা কামিনী ভর্জসকাশে নিজেকে প্রকাশ করে।” অর্থাৎ, অজ্ঞান ব্যক্তি বেদার্থের পর্য্যালোচনা করিলেও অথবা বেদবাক্য শ্রবণ

করিলেও তাহার ফলশ্রুতি সমর্থ হয় না, পরন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে বেদার্থ স্বতঃই প্রতিভাত হয়।

ভৌতিক প্রপঞ্চের মোহ কাটাইয়া, অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে নিরোধ করিয়া যে জীব শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানজ্যোতিতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহারই নিকট বেদার্থ সম্যক্ প্রতি-ভাত হয়। তাই উক্ত জ্ঞানসূক্তে ঋষি আবার বলিতেছেন :—

“ইমে যে নাবাণ্ডুন পরশ্চরন্তি ন

ব্রাহ্মণাসো ন মূঢ়ো কসাসঃ ।

ন গতে বাচমভিপদ্য পাশয়া সিরীস্বত্নং

তনুতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥” ১০।৭১।৯

“এই সকল ব্যক্তি যাহারা অধোবর্তী এই পৃথিবীতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত আচরণ না করে ও যাহারা পববর্তী স্বর্গলোকস্থ দেবগণের সহিত আচরণ না করে সেই সকল ব্রাহ্মণ বেদার্থ জানিতে সমর্থ হয় না, মাত্র সোমের অভিষেক যাহারা কবে তাহারাও জানিতে সমর্থ হয় না। অজ্ঞানী এই সকল ব্যক্তি বাক্যমাত্র প্রাপ্ত হইয়াও পাপকারিণী বাকের সহিত মিলিত হইয়া কেবল হল-চালকরূপে ভূমিকর্ষণ করিতে থাকে।”

কেবল ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মন্ত্রবিৎ যাজ্ঞিক হইলেই বেদার্থ জানা যায় না, কেবল সোম অভিষুক্ত করিলেই বেদার্থ জানা যায় না। বেদের বাক্যমাত্র অধিগত করিলে সেই বাক্য-গত পশুহননাদি পাপদ্বারাই কেবল বিদ্ধ হইতে হয়। বেদার্থ জানিতে হইলে বিদ্বান্ সন্তোষকরণ হইয়া যথার্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্য করিতে হয় এবং এমন কি ইহলোকের

অতীত দেবলোকের সহিত যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

এই যে বেদার্থ-জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান ইহা যে একেবারে সমাক্রূপে সকলের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় তাহা নহে। বহু আয়াসে, বহু তপশ্চার ফলে এই জ্ঞানকে শনৈঃ শনৈঃ লাভ করিতে হয়। সম্বন্ধের আশ্রয়ে চিত্ত যত উত্তরোত্তর নির্মল হইতে থাকে, জ্ঞানের আলোক ততই তাহার ভিতরে ফুটিতে থাকে। এইরূপে ঐহাদের চিত্ত নির্মল ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে তাঁহারা যথার্থ চক্ষুস্থান হইলেন। তাঁহারা বাক্যের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, স্মরণে তাঁহারা যথার্থ কর্ণস্থান হইলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সর্ব পদার্থে সমদর্শী হইলেন, অবৈত জ্ঞান ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আয়ত্ত হয়। বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর তত্ত্ব সকল তাঁহারা তখন অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে থাকেন। স্বল্প আয়ত্ত হইলেও এই জ্ঞান মানুষকে অতুলনীয় করে। যিনি কিস্কিন্দ্রাজ ও এই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি সংসারের পঞ্চ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। এই কথাই ঋষি জ্ঞানহুকে পুনরাবলিভেছেন :—

অক্ষুণ্ণতঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো

মনোজবেষমমা বভূবুঃ।

আদ্যাস উপকক্ষাস উ হে হ্রদা ইব

দ্রাশ্বা উ হে দদৃশ্রে ॥ (১০।৭।১।৭)

“চক্ষুস্থান কর্ণস্থান সমজ্ঞানিগণ মনোদ্বারা গন্তব্য বিষয় সকলে অতুলনীয় হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হৃদে মুখ পর্যন্ত নিমজ্জমান হন, কেহ কেহ কক্ষ পর্যন্ত নিমজ্জমান হন, কেহ

কেহ সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া স্নান করেন দেখা যায় (অর্থাৎ, কেহ কেহ মধ্যমজ্ঞানী, কেহ কেহ স্বল্পজ্ঞানী, কেহ কেহ মহাজ্ঞানী হন)।”

দেখা যাইতেছে যে, ঋষি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম অজ্ঞানী ও দ্বিতীয় জ্ঞানী। যাহারা অজ্ঞানী তাহারা যজ্ঞবেদ সহস্র অধ্যয়ন, শ্রবণ ও আলোচনা করিলেও তাহাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হয়, এমন কি তাহারা যে সকল নোমযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে তদ্বারা পুণ্যলোক লাভ করে না। যাহারা যথার্থ জ্ঞান দ্বারা দেবগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারে ও ব্রহ্মবিদগণের সহবাসে চিত্ত মাস্কিত করিতে না পারে তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয়। পক্ষান্তরে যাহারা যথার্থ জ্ঞানসহকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহারা উহা দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হয়। সূক্তান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

অবনো ব্রজিনা শিলীহৃচ্চা বনেনানুচঃ।

নাত্রক্ষা যজ্ঞ ঋগ্জ্যোষতি হে ॥

উর্ধ্বা যন্তে ত্রেতিনী ভূতজন্ত ধূয়ু সগান্।

সজুর্নাবৎ স্বযশসং সচায়োঃ ॥

১৭-১০৫-৮, ৯

“হে ইন্দ্র, আমাদিগের বর্জনীয় (পাপ) সকল বিনাশ কর। আমরা ঋক দ্বারা, অর্থাৎ স্তুতি দ্বারা, অগ্নিদ্বিগকে, অর্থাৎ অস্তিত্বদ্বিগকে, হিংসা করিব। অত্রক্ষা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিরহিত বা উৎকৃষ্ট স্তুতিবিরহিত, ঋক্, অর্থাৎ সস্তিত্ব যজ্ঞ হইতে পৃথক্, যজ্ঞ তোমাকে প্রীত করে না।

হে ইন্দ্র, কাম্বিদ্বিগের মধ্যে যজ্ঞগৃহে যখন তোমার ত্রেতিনী, অর্থাৎ অগ্নিযজ্ঞবিশিষ্ট

ক্রিয়া, উক্তে উঠে তখন তুমি প্রীত হইয়া
আয়ুৰ, অর্থাৎ যজমান মনুষ্যের, সহিত
তরুণীতে আয়োজন কর ।”

অঙ্কক, অত্রক, ঋধক এই সকল শব্দ
দ্বারা দেবতাজ্ঞান-বিবজ্জিত কেবলকর্মের
নির্দেশ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ অজ্ঞ পরমার্থ-
জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি কর্মদ্বারা উৎকৃষ্ট লোক
লাভ করে না, ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাহাদিগকে
স্বর্গে আয়োজন করাইয়া লইয়া যান না।
পক্ষান্তরে যাহারা সঙ্কক, অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানের
সহিত কর্ম করে, তাহাদিগকে তিনি প্রীত
হইয়া স্তুতি প্রদান করেন।

যজ্ঞের দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে
হইলে যে, সাধককে পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ছেদন করিয়া
দেবলোকে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়, ইন্দ্রিয়-
গ্রাস বিষয়ের জ্ঞাত অতীন্দ্রিয় বস্তুর
উপলব্ধি করিতে হয়, বহির্জগৎ ত্যাগ করিয়া
অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা বৈদিক
ঋষি বশিষ্ঠ ভরদ্বাজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে
দেখাইয়াছেন। যথা,—

প্রথমঃ যজ্ঞঃ সপ্ৰথমঃ নামানুষ্ঠুভ্য

হবিষো হবির্ঘণ ।

ধাতুহ্যতানান্ সবিতুশ্চ বিষ্ণো রথাস্তরমা

জভারা বশিষ্ঠঃ ॥ ১

অবিংদন্তে অতিহিতং যদাসৌগজশ্চ

ধাম পরমং গুহা যৎ ।

ধাতুহ্যতানান্ সবিতুশ্চ বিষ্ণো র্ভরদ্বাজো

বৃহদাচক্রে অগ্নেঃ ॥ ২

তেহবিংদন্তনসা দীধানা যজুঃ কল্পং

প্রথমং দেবযানং ।

ধাতুহ্যতানান্ সবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভবন্

ঘর্মমৈতে ॥ ৩ ॥ ১০।১৮১

“প্রথম নামক (পুত্র) যাহার ও সপ্ৰথম
নামক (পুত্র) যাহার তাহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ
অনুষ্ঠপ্-ছন্দযুক্ত হবির, অর্থাৎ ঘর্মের, যে
হবি তৎসম্পাদক রথস্তর (সামবিশেষ) ধাতা,
জ্যোতমান সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১।

যাহা তিরোহিত ছিল, যজ্ঞের যে পরম
ধাম, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ধারক, গুহায় নিহিত
ছিল তাহা তাঁহার (ধাতা প্রভৃতি) লাভ
করিয়াছিলেন। ধাতা, জ্যোতমান সবিতা ও
বিষ্ণুর নিকট হইতে ও অগ্নির নিকট হইতে
ভরদ্বাজ সেই বৃহৎ (সামবিশেষ) সংগ্রহ
করিয়াছিলেন। ২।

তাঁহার দীপ্যমান হইয়া মন দ্বারা
সেচনীয় প্রথম (অর্থাৎ মুখ্য), দেবযান (অর্থাৎ
যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়), যজুঃ
(অর্থাৎ যাগসাধন) স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
এই সকল (ঋষিকৃ) ধাতা, জ্যোতমান
সবিতা ও বিষ্ণুর নিকট হইতে ও সূর্যের নিকট
হইতে সেই স্বর্গ সংগ্রহ করিয়াছেন। ৩।”

বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি জ্ঞানী বৈদিক
ঋষিগণ ধাতা, সবিতা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের
নিকট হইতে রথস্তর, বৃহৎ প্রভৃতি সাম
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল সাম
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা যায়, দেবযান
পথের অধিকারী হওয়া যায়। ইহাদের তত্ত্ব
অতি গূঢ়, সাধারণের নিকট এই তত্ত্ব অজ্ঞেয়,
তিরোহিত, লুক্কায়িত। দেবগণের নিকটেই
এই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়, এবং যে সকল মহাপুরুষ
দেবগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন,
তাঁহার তাঁহাদিগের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত

হন। দেবগণ দীপ্যমান হইয়া মন দ্বারা এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে প্রকারে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিলে দেবলোকের অধিকারী হওয়া যায় তাহা জানিয়াছিলেন ; অর্থাৎ, তাঁহারা বহির্বিদ্যার অতীত মনের দ্বারা সাধনা করিয়া, রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি সাম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নৃচক্ষুসো অনিমিষংতো অহীণা বৃহদেবাসো।

অমৃতত্বমানশুঃ।

জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো

বস্যাঃ বসতে স্বস্তয়ে ॥ ১০।৬৩।৪

“মনুষ্যাদিগের দ্রষ্টা, নিনিমেষ অর্থাৎ সর্বদা জাগরুক, দেবগণ যোগ্যতা দ্বারা মহৎ অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। দীপ্যমান রথযুক্ত অহস্তব্যপ্রজ্ঞ, পাপরহিত দেবগণ ছ্যালোকের উর্দ্ধস্থানে লোকহিতার্থ বাস করেন।”

রথন্তর সাম ঋগ্বেদের ৭ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ২২ ও ২৩ ঋক্ ও বৃহৎ সাম উহার ৬ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ১ ও ২ ঋক্। রথন্তর সাম অগ্নিষ্টোম যাগের স্তোত্র ও বৃহৎ সাম জ্যোতিষ্টোম যাগের স্তোত্র। ঋগ্বেদের গেষ অংশ সামবেদ। উক্ত ১০।১৮১ সূক্তে সামকে ঋকের মধ্যে শ্রেণীপদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ছান্দোগ্যোপনিষদে যে উক্ত হইয়াছে, “বাচ ঋগরসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম উদ্গীথো রসঃ” (ছা-উ ১।১।২) (বাক্যের সার ঋক্ বেদ, ঋকের সার সামবেদ, সামবেদের সার উদ্গীথ অর্থাৎ ওঙ্কার) তাহা সম্পূর্ণ বেদের অন্তর্গামী। সে যাহা হউক রথন্তর ও বৃহৎ সামে কন্মার ঈশ্বরজ্ঞান ও সর্বকর্মে ঈশ্বরে নির্ভরতা

স্পষ্টরূপে প্রতিকলিত হইয়াছে। রথন্তর সাম—

“অভি ত্বা শূর নোহুমোহুগ্ধা ইব ধেনবঃ :

ঈশানমস্ত্র জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিদ্ৰ তস্থুধঃ ॥

ন ত্বাবা অসো দিবো ন পাথিবো ন জাতো

ন জনিষ্যতে।

অশ্বায়ংতো মঘবল্লিঃ বাজিনো গব্যাতস্তা

হবামহে ॥” (৭।৩২।২২, ২৩)

“হে শূর ইন্দ্র, এই জগতের ঈশ্বর ও স্বাবরের ঈশ্বর সর্বদৃক্ তোমাকে আমরা অহুগ্ধা ধেনুর ত্রায় নিরন্তর ইচ্ছা করিতেছি (অর্থাৎ অহুগ্ধা ধেনু যেমন দুগ্ধদানার্থ বৎসকে ইচ্ছা করে আমরা তেমনি হবির্দানার্থ তোমাকে ইচ্ছা করিতেছি)।

ছ্যালোকে বা পৃথিবীতে তোমার ত্রায় কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। অশ্ব-ইচ্ছাকারী, হবি-ইচ্ছাকারী ও গাভী ইচ্ছাকারী তোমাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।”

বৃহৎ সাম—

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্ত কারবঃ।

ত্বাং বৃত্রেষিঃ সৎপতিং নরস্তাং

কাষ্ঠাশ্ববর্তঃ ॥

স ত্বং নশিত্ব বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো

অদ্রিষঃ।

গামশ্বং রথামিদ্ৰ সৎ কির সত্যা বাজং

ন জিগৃষে ॥

(৬।৪৩।১, ২)

“হে ইন্দ্র, স্তোতা আমরা অন্ন দিবার জন্য তোমাকেই আহ্বান করিতেছি। লোকে সংব্যক্তির পালক তোমাকে বৃত্রগণ, অর্থাৎ আবারক শত্রুগণ, দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আহ্বান

করে, তোমাকে অখপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকাম
হইয়াও আহ্বান করে ।

হে হৃদয়, বজ্রবাহু, বজ্রবনু ইন্দ্র, শত্রুধ্বংসক
মহানু তুমি আমাদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া গাতি,
অর্থ সম্যক প্রদান কর যেমন অন্ন পুরুষকে
বহু অন্ন প্রদান করিয়া থাক ।”

এই দুই সামের ঋষির দেবতাজ্ঞান প্রস্তুতিত
হইয়াছে, স্বাবর জন্ম নিখিল জগতের
ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থচিত হইয়াছে ।
বৎসকামী গাভীর দ্বারা ব্যাকুল হইয়া ঋষি
ঈশ্বরকে হবিঃসম্প্রদান করিতে ব্যগ্র ।
ঈশ্বরের মহিমা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে ।
হবিঃ অথ, গাভী প্রভৃতি সমস্ত কাম্য পদার্থই
যে তাঁহার তাহার ধারণা হইয়াছে । অনন্ত-
নির্ভর হইয়া ঋষি তাঁহাকেই আহ্বান করিতে-
ছেন, প্রার্থনিতবা পদার্থ তাঁহারই নিকট
প্রার্থনা করিতেছেন ।

এইরূপ দেবতাজ্ঞানের সহিত যজ্ঞ
করিলেই দেবদান পথের অধিকারী হওয়া
যায়—এই কথাই পূর্বোক্ত ১০ ১৮১ স্তোত্রে
উক্ত হইয়াছে । জ্ঞান ও অজ্ঞান ভেদে বৈদিক
কর্মের ভিন্ন ফল হয়, জ্ঞানীর দ্বারা নিষ্পন্ন
বাগাদি শ্রেষ্ঠলোকপ্রাপ্তির হেতু হয় ও
অজ্ঞানীর দ্বারা নিষ্পন্ন বাগাদি নিকৃষ্টলোক-
প্রাপ্তির হেতু হয়, বেদের এই সিদ্ধান্ত ও
উপদেশ উপনিষদাদি শাস্ত্রে গৃহীত ও বিপদী-
কৃত হইয়াছে । বথা, যুক্তোপনিষৎ—

ইষ্টাপূর্তং মন্তমানা বরিষ্ঠং

নাশুচ্ছন্নো বেদয়ন্তে প্রমুঢ়াঃ ।

নাকন্ত পৃষ্ঠে তে স্কৃত্তেহহুভূষেৎ

লোকঃ হীনতরং বা বিশন্তি ॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হু পবনস্তারণে,

শাস্তা বিদ্যাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ ।

স্বর্গাধারেন তে বিরজাঃ প্রযান্তি

যত্রামৃতং স পুরুষো হবারায়া ॥

মুণ্ডক ১।২।১০, ১১ ।

“অত্যন্ত মুঢ়গণ ইষ্ট (অর্থাৎ বাগাদি শ্রেষ্ঠ
কর্ম) ও পৃষ্ঠ (অর্থাৎ বাপীকূপতড়াগাদি
স্মার্ত্ত কর্ম) কর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে,
এতদ্ভিন্ন অত্র কোন শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে
না । তাহার কৰ্ম্মলব্ধ ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে
ভোগসম্পন্ন করিয়া পুনরায় এই লোক
অথবা এতদপেক্ষাও নিকৃষ্ট লোকে প্রবেশ
করে ।

পক্ষান্তরে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক
অরণ্যে বাস করিয়া যে সকলে শাস্ত (অর্থাৎ,
জিতেন্দ্রিয়) ব্যক্তি (বান প্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমী) ও
বিদ্বান্ (অর্থাৎ, জ্ঞানসম্পন্ন) যে সকল ব্যক্তি
(গৃহস্থ) তপঃ (অর্থাৎ, আশ্রমবহিত কর্ম) ও
শ্রদ্ধার (অর্থাৎ, চিরণাগর্ভাদিবিষয়া বিজ্ঞার)
সেবা করেন, তাঁহার বিরজন্ত (অর্থাৎ, পাপ-
পুণ্যরহিত) হইয়া স্বর্গাধার দিয়া (অর্থাৎ
সূর্য্যোপলব্ধ উত্তরায়ণ পথে) যেখানে সেই
অবারায়া (অর্থাৎ, অব্যয় স্বভাব) অমৃত পুরুষ
(অর্থাৎ, প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ) বাস করেন
সেখানে গমন করেন ।”

এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই বলিয়াছি যে,
অবিজ্ঞাবশেষেই জীব বিশ্বময় ভেদ দর্শন করে ।
পরন্তু জ্ঞানচক্ষু যে পরিমাণে উন্মীলিত হইতে
থাকে ভেদজ্ঞানও সেই পরিমাণে বিদ্রুিত হইয়া
যায় । জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ অনুসারে জীব
উত্তরোত্তর অবিজ্ঞার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ
করিতে থাকে । পূর্বোক্ত ১০।১১।৭ ঋকে

জ্ঞানের এই ক্রমিক বিকাশের কথা বলা হইয়াছে। মাত্র বহির্জ্ঞানের সাহায্যে জীব যে জ্ঞান লাভ করে তাহা বস্তুতঃ অজ্ঞান, জ্ঞান-পদবাচ্য নহে। চক্ষু, কণ, নাসিকা, ত্রিহা ও শ্রবণ এই যে পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয়, ইহাদের দ্বারা যে জ্ঞান অর্জিত হয় তাহা সত্যের জ্ঞান নহে, মিথ্যার জ্ঞান—জগতের চৈতন্যাংশের জ্ঞান নহে, জড়াত্মের জ্ঞান নহে, স্থূল বিকৃতির জ্ঞান—আত্মার জ্ঞান নহে, অনাত্মার জ্ঞান—মৌলিক পদার্থের জ্ঞান নহে, তাহার উপাধি নামরূপের জ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা জীব সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। ইহা দ্বারা সংসারে উন্নত হইতে পারে, কিন্তু ইহা জীবকে সংসারের বাহিরে লইয়া বাইতে পারে না; কারণ, এ জ্ঞান যে সংসারেরই জ্ঞান, সংসারবহির্ভূত বিষয়ের সহিত ইহার যে পরিচয় নাই, প্রপঞ্চ ভিন্ন ইহা যে কিছু জানে না। এই মিথ্যাজ্ঞান সহকারে মনুষ্য যে সকল সংকল্প করে তদ্বারা তাহার উদ্ধৃতি হয় না। পূর্বোক্ত ১০। ১০। ১৮ শ্লোকে ও যুক্তোপনিষদের ১২। ১০ শ্লোকে বৈদিক ও উপনিষদিক ঋষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অন্নময় কোষের সাধককে পুনঃ পুনঃ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়। অতঃপর বথার্থ জ্ঞানের কথা, যে জ্ঞান উদ্ভিত হইতে থাকিলে জীবের চক্ষে জগতে মহা বিপ্লব ঘটয়া যায়, ক্রিয়াপ্-তেজোমক্ষণো'ম আর তাহার নিকটে ভোগ্য-বস্তুমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয় না, জড়ের পশ্চাতে চৈতন্য আসিয়া দাঁড়ায়, ঐশ্বর্যগ্রাহ্য-বিষয়ে অতীজ্ঞের আবির্ভাব অকৃত্রিম হয়, বিশ্বজননী প্রকৃতিদেবী ত্রিগুণের স্বয়ং দ্বারা যে

বস্ত্র নির্মাণ করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া ছিলেন তাহা দূরে নিক্ষেপকরতঃ নগ্নবেশে সাধকের সমক্ষে আবির্ভূত হন, সাধক প্রপঞ্চ ভূলিয়া প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ-শুদ্ধ পরম পুরুষকে দর্শন করে। বিশ্বময় তেজের মধ্যে সাধক তখন অভেদ দেখিতে থাকে। জ্ঞানের জ্যোতি যতই বিকশিত হইতে থাকে ততই সাধকের চক্ষে ভ্রমোন্নয় জড় আর দৃষ্ট হয় না, সৎপ্রধান দেবগণের অস্তিত্ব ও স্বরূপের উপলব্ধি হইতে থাকে। বেদের উদ্দেশ্য এই সকল দেবতাকে জ্ঞান সহকারে পূজা করা, কর্মকে অধোমুখী হইতে না দিয়া উর্দ্ধমুখী করা, জীবকে স্থূল জগতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমমুক্তির পথে স্থাপন করা। বেদে দেবগণের যে সকল স্তুতি প্রভৃতি আছে দেবতাজ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইলে তাহাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, স্তোত্রাং বেদের বাক্যার্থ জানিয়া কর্ম করিলেই যে জীবের সঙ্গতি হয় তাহা নহে। পূর্বোক্ত জ্ঞানমুক্ত বৈদিক ঋষি এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু দেবতাজ্ঞান সহকারে বেদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম করিলে সাধকের দেবলোক প্রাপ্তি হয়। এ কথাও ঋষি উক্ত জ্ঞানমুক্তে, ১০। ১৮। ১ শ্লোকে ও ১০। ১০। ১৯ শ্লোকে নিঃসংশয়িতরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, সাধকের হৃদয়ে দেবতা জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে আর তাঁহাকে মরজগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অমরত্বলাভ করিয়া তিনি দেবলোকে স্থান প্রাপ্ত হন। অন্নময় স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি প্রাণময় সূক্ষ্ম-দেহে বিরাজ করেন। জ্ঞানের আলোক সাধকের হৃদয় উজ্জ্বলিত করিতে আরম্ভ করিলে সাধক প্রথমেই স্থূলবিষয়ের অসারত্ব

উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বিগতস্পৃহ হইলেন, সুতরাং প্রারম্ভ কর্ত্তব্য ভোগাবসানে তাহার স্থলদেহের পতন হইলে তিনি আর স্থলদেহ পরিগ্রহ করেন না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০।৫৬ সূক্তের ব্যাখ্যায় এ কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য স্থলবিষয়ে বীতরাগ হইলেই যে সাধক পূর্ণজ্ঞানী হইলেন তাহা নহে, স্থলদেহের নাশ হইয়া সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করিলেই যে জীব পরমপদ লাভ করিল তাহাও নহে। বাহ্য স্থলবিষয়েই অবিস্তার একমাত্র সৃষ্টি নহে, বাহ্যেতে জীবকে বন্ধন করে। স্থলপ্রপঞ্চের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেও জীব মন ও বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ থাকে। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহাকে মন ও বুদ্ধিক্ষেত্রে সাধনা করিতে হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই দুই ক্ষেত্রে মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ বলে। উক্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে জীব বিজ্ঞানময় কোষের সাধনার পক হয়। আবদ্ধতার বশত নাশ হইতে থাকে, তত সে স্বর্গস্থলে বীতস্পৃহ হয়, আত্মোপলব্ধি ততই তাহার বৃদ্ধি হইতে থাকে, হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান ততই তাহার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, এক ঈশ্বর যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন এই উপলব্ধি তাহার অন্তরে জাগরিত হয়, অব্যাকৃত প্রকৃতির বিকারেই যে তাহার সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি সে তাহা বথার্থ অনুভব করে। বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা সম্পূর্ণ

হইলে সে বিশ্বময় সূক্ষ্মাত্মা প্রজাপতি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দেখে না, ভগবানের বিরাট সৃষ্টিতে সে আপনাকে হারাইয়া কেলে, সে তাহার নিজের খণ্ড চৈতন্যকে ভগবানের পূর্ণ-চৈতন্যে মিলাইয়া দেয়, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা সে যে স্বর্গভোগ করিতেছিল তাহাতে তাহার আন্তরিক বিরাগ জন্মে। এই বৈরাগ্যের ফলে তাহার আর সূক্ষ্ম শরীরের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সে তখন সূক্ষ্ম দেহ হইতে মুক্ত হইয়া কারণদেহ মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপতিত্ব লাভ করে। সে তখন বথার্থ সোহহং হইয়া যায়। ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া সে তখন বিশ্বভূতন শাসন, পালন, সৃজন ও ধারণ করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত ১০।৫৬ সূক্তে বৈদিক সাধনার ক্রমোন্নতির যে নির্দেশ আছে, এই ঈশ্বরত্ব লাভ সেই উন্নতির চরম সীমা। জ্ঞান-হকারে সাধনা করিলে বেদ জীবকে এই পরমপদে পৌছানো দেয়।

অচো অকরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্বেবা

অধি বিবে নিষেতুঃ।

বস্ত্রং বেদ কিমূচা করিষ্যতি য ইতদ্বিত্ত্বম্

ইমে সমাসতে ॥ ১-১৬৪-৩৩

“ঋগাদি বেদের প্রতিপাত্ত অক্ষর পুঙ্খ-পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত, বাহ্যেতে বিশ্বদেবগণ বাস করেন। যে ইহা না জানে ঋগাদি বেদ তাহার কি করিবে? বাহ্যে ইহা জানে তাহার স্বরূপে অবস্থান করে।” (ক্রমণ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

১১

জীন ভ্যালজিন কবাটের গায়ে কাণ দিয়া শুনিতে লাগিল। নিম্নক্স সে কক্ষ।

তখন মার্জ্জ বের সাবধানে ধীরে ধীরে, সে দ্বার ঠেলিল, দ্বার ঈষদুন্মুক্ত হইল।

সাহসে ভর করিয়া সে আবার ঠেলিল ; কবাট আরও একটু সরিয়া গেল। কিন্তু প্রবেশপথে বিষ ছিল,—পার্শ্বেই একখানা চেয়ার ; দ্বার আরও কতকটা উন্মুক্ত না করিলে চলে না।

এবার অপেক্ষাকৃত জোরে সে কবাট ঠেলিল। অকস্মাৎ মরিচাধরা কজা হইতে একটা তীব্র কর্কশ ধ্বনি উঠিল। শিচরিয়া সচকিতে জীন ছুট পদ পিছাইয়া আসিল,—তাহার শিরোদেশ হইতে নখগ্র গর্ঘাস্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে ধ্বনি, মৃত্যুর পরপারে অস্তিম-বিচার-দিনের তুণ্যধ্বনিবৎ স্পষ্ট নির্ঘোষে তাহার কর্ণে নিম্নাদিত হইয়া উঠিল।

আকস্মিক বিভীষিকায় তাহার প্রথমতঃ মনে হইল যেন সে কজা জীবন্ত হইয়া উঠিয়া লোলজিহ্ব সারষেরের দ্বার সকলকে সতর্ক করিবার জন্য শ্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

তাহার সর্বাপেক্ষা খেদসিক্ত, অন্তরাঙ্গা কম্পিত হইয়া উঠিল ; কপালের শিরা যেন হাতুড়র মত বা দিতে লাগিল ; নিঃশ্বাস-

প্রবাস যেন গূহাস্তর্গত ঝটিকার ন্যায় বহিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন সে শব্দ ভূমিকম্পের দ্বার সমগ্র বাড়ীখানাকে টলাইয়া দিয়াছে ;—কবাটখানা চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া দিয়াছে ;—ওই বুকি বুক ওঠে!—এখন ত প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিবে,—কয় মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সहर জাগিয়া উঠিবে, পুলিশ হাতকড়ি লইয়া আসিবে!—আর কি তাহার উদ্ধার নাই!

নিশ্চল পাষণ মূর্তির ন্যায় জীন দাঁড়াইয়া রহিল। এক দুই—তিন,—কয় মুহূর্ত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গেল। তখন কক্ষের মধ্যে সে একবার উকি দিয়া দেখিল,—কই কিছুই ত নড়ে না! কতক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল,—কই কোন শব্দই ত নাই! তাহা হইলে কেহ উঠে নাই? জীন নিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রথম ধাক্কা ত কাটিল, কিন্তু তাহার মনের চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে গেল না। তত্রাচ সে ফিরল না। বত শীঘ্র কার্যোদ্ধার হয় তাহাই তাহার লক্ষ্য। স্থির পদে সে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

কক্ষের মধ্যে যেন গভীর শান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইতস্ততঃ রক্ষিত কাগজপত্র ও পুস্তকাদি অতিক্রম করিয়া অতি সতর্কপণে সে অগ্রসর হইল। কক্ষের অপর প্রান্ত

হইতে মিরিয়েলের ধীর সম নিঃশ্বাস গ্রহণের শব্দ আসিতেছিল।

সহসা জীব সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সে কি, সে যে একেবারে মিরিয়েলের শব্দের উপর আসিয়া পড়িয়াছে!

মানুষের অনুষ্ঠিত প্রায় কার্যের উপর প্রকৃতিদেবী সময়ে সময়ে এমন সহজ-সুন্দর-ভাবে আপনাদি চারাপাত করেন যে, মানুষ সে সব সময়ে আপন কার্যের পর্যালোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না, কিছুতেই সে ভাবকতার স্পর্শ অতিক্রম করিতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে হইতে যে ঘেষ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন স্বচ্ছর তাগ এখন সরিয়া গেল,—উজ্জ্বল বাতাসের মধ্য দিয়া চন্দ্ররশ্মি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ধর্ম্মজ্ঞকের মুখমণ্ডল সহসা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। মিরিয়েল প্রশান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন;—নিদ্রালস শির উপাধানে ন্যস্ত, ধর্ম্মবাজকীয় অঙ্গুরীয়যুক্ত দক্ষিণ হস্তখানি শয্যাতে লুপ্তিত, তৃপ্তি, আশা এবং আনন্দে সে আনন্দ প্রাপ্ত; মুখের সে অমিয় হাসি যেন কোন প্রতিকূলিত দিব্যালোকসম্পাত; ললাটে অপূর্ণ জ্যোতিঃ। সাধুর আত্মা যেন অমরের ঐশ্বর্য্য-মহিমার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিল। সে অমরতা, সে স্বর্গ তাঁহার আপন অগরেই ছিল; অন্তরের বহুতার মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ সে আননে ফুটিয়া উঠিত।

নিরীক্ষা নিশ্চল সন্তুষ্ট জীব লৌহ-শিক হস্তে অরুকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে অপূর্ণ সৃষ্টির প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই চন্দ্রালোকে সুষ্পষ্ট ধরণী, তজ্জাতুর প্রকৃতি, নির্জনপ্রায়

গৃহ, নিলীধ রাত্রি, শুদ্ধ সে যুহুর্ভ,—সবই যেন কি এক গাভীরো মাধুর্য্যে বৃদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া জাগিতেছিল।—সেই নিদ্রাবদ্ধ চন্দ্রধর, খেত অলকগুচ্ছ, বিশ্বাসনির্ভরতাপূর্ণ আনন্দ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দেহে নিদ্রিত শিশুছবি—সে যেন কি এক অপূর্ণ দৈবী লীলা! এমনটি ত জীব ইহার পূর্বে আর কোথাও দেখে নাই! তাহার ন্যায় পিশাচের এত নিকটে, এমন অবস্থিত ভাবে অথচ পূর্ণ বিশ্বাসে নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন মধুর সে সৃষ্টি তাহার অন্তরতম অন্তরের এমন একটা স্থান স্পর্শ করিল যে, তুলনার সমালোচনার সে না শিহরিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে সুষ্পৃমগ্ন আত্মা সাধু, অপর দিকে পাপাহুষ্ঠানী জীবের অন্তরের তীব্র চাকুল্য;—নৈতিক জগতে ইহা অপেক্ষা দর্শনীর মহত্তর কিছু আছে বলিয়া ত আমি জানি না।

জগতে এমন কোন দার্শনিক নাই যিনি জীবের সে সময়ের অন্তর-ভাবে যথার্থ বিশ্লেষণ করিতে পারেন। অতি প্রচণ্ড ভাবের সহিত শাস্ততম মাধুর্য্যের মিশ্রণ যদি অনুভব করিতে পার, তবেই তাহার আভাষ কতকটা পাইতে পার। জীবের সে মুখভাব একটা শুদ্ধ বিশ্বাসের ছবি, তাহাতে কোন একটা ভাবের নিশ্চয়তা ছিল না। সে দেখিতে লাগিল,—মস্তমুগ্ধবৎ মিরিয়েলের সে অপূর্ণ ছবির প্রতি চাহিয়া রহিল,—এই পর্য্যন্ত! কি সে ভাবিতেছিল,—কে বলিবে? তাহার মুখভাবে কিসের চাকুল্য পরিফুট হইতেছিল,—কে জানিবে?

বৃদ্ধের মুখ হইতে সে আর চন্দ্র কিরাইতে পারিল না। ত্রিশঙ্কর মত, স্বর্ণের ও রঙ্গা-

ভুলে—পুণ্য ও পাপের—সন্ধিরলে সে হতবুদ্ধি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিতে বা তাঁহার চরণে লুটাইতে,—তঁহের জন্ত সমভাবেই বুঝি সে প্রস্তুত ছিল।

দেয়ালের গায়ে একটা পিত্তলক্রশ অস্পষ্টনক্ষত্রালোকে দীপ্তি পাইতেছিল;—প্রসারিত দুই হস্তে যেন সে তাহাদের একের শিরে আশীর্বাদ, এবং অপর শিরে ক্রমা বর্ষণ করিতেছিল।

সহসা জীন সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, শব্দা অতিক্রম করিয়া, একেবারে আলমারির কাছে গিয়া পড়িল; শোহাশিহলের প্রয়োজন হইল না, চাবিটা আলমারির গায়েই ছিল;—চকিতে বাসনের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া ক্রতপদে কক্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া, লাঠিটা তুলিয়া লইয়া, জানালা খুলিয়া একেবারে বাগানের উপর আসিয়া পড়িল; তার পর বাসনগুলা খলিতে পুরিয়া, ঝুড়িটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, পাচার অতিক্রম করিয়া রাস্তায় পড়িয়া উজ্জ্বলসে সে ছুটিয়া পলাইল।

(১২)

পরদিন প্রত্যুষে মিরিয়েল বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধা ম্যাগলোয়ার আসিয়া সোৎকর্ষে জিজ্ঞাসা করিল—“কর্তা মশায়, ক্লোর বাসনের ঝুড়িটা কোথায় আনেন?”

“জানি।”

“কি জানা, আমিও জানি; শুধু জানার কথা বলছি; বলছিলাম কি, ঝুড়িটা যে—”

অরুণ পূর্বে একটা কুলগাছের নীচে

মিরিয়েল ঝুড়িটা দেখিয়াছিলেন। সেটাকে কুড়াইয়া আনিয়া ম্যাগলোয়ারের হাতে দিয়া বলিলেন—“এই যে তোমার ঝুড়ি।”

“ও দেখেছি আমি। ঝুড়ি ত খালি বাসন কই?”

“ও, তাই বল। বাসনের খোঁজ করছ? বাসন কোথায় আছে তা ত বাছা আমি জানি নে।”

“সর্বনাশ! তবে ত যা ভাবছিলাম তাই। সেই মিসেসটাই—” বলিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অতিথির ঘরটা দেখিতে সে ছুটিয়া গেল; মিরিয়েল কক্ষগার্দ চক্ষে লতিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন—ঝুড়ির চাপে সেটা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

“কই সে ত নেই কর্তামশাই!—” ম্যাগলোয়ার চীংকার করিয়া উঠিল।—“সেই তবে নিশ্চয় চুর করে পালিয়েছে।”

অকস্মাৎ পাচার-গায়ে তাহার দৃষ্টি পড়িল।—“ওই দেখুন, কর্তামশায়!—বালি চূর্ণ ষসে পড়েছে, ওইখান দিয়ে পাঁচিল উপক্কে পালিয়েছে। ওমা কি সর্ব্বনেশে মিলে গো!—ডাকাত!—ডাকাত!—”

মিরিয়েল কয়েক মুহূর্তের জন্ত চিন্তামগ্ন থাকিয়া, আপন গভীর দৃষ্টি ম্যাগলোয়ারের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

“সে বাসনগুলো কি আমাদের বলতে পার?”

ম্যাগলোয়ার উত্তর দিল না, শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

“দেখ ম্যাগলোয়ার,—এতদিন আমি অজ্ঞান করে সে গুলো নিজের কাছে আঁইক

রেখেছিলাম, দরিত্রের জিনিস নিজে ভোগ করছিলাম। গরীবের জিনিস গরীবের নিয়েছে—এ ত অন্যর কিছু নয় নি।’

“কর্তা, আমার বা মাঠাকরণের জন্ত বলতি নে। আপনি আজ থেকে কিসে থাকবেন?”

মিরিয়েল যেন বিস্মিত হটলেন, বলিলেন “কেন যার কি টিনের থালা নাই?”

“টিনের থালা? মা গো, গন্ধ করবে যে!—”

“তবে লোটার থালা?”

“তাতে খাবার যে কষে যাবে?”

“ভাল কাঠের রেকাবি ত আছে?”

প্রাতরাশের সময় ব্যাপ্তিস্থাইন এ বিষয়ে ভ্রাতাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। কষ্টপাড়ে আগর করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে মিরিয়েল বলিলেন—“এক টুকরা রুটি আর এক বাটি দুধ। এই তো? এর জন্ত আবার কাঁটা চামচের কি দরকার?”

মাগলোয়ার কিছু গজরাইতেছিল—“ওমা কি সৰ্ব্বনেশে মিলে গো! এখনো ভয়ে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে” ইত্যাদি।

প্রাতরাশ শেষ হয় হয়—এমন সময় বহির্দেশে করাঘাত পড়িল।

‘কে মশায়? আসুন।’

দরজা খুলিতেই এক অসুস্থ দৃষ্টান্তীদের চক্ষে পড়িল। তিন জন লোকে আর একটা লোকের গলা ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে; সে তিন জন—পুলিশ কর্মচারী; সে লোকটা—জীন ভ্যালজিন।

পুলিশ কর্মচারী যথারীতি অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—“প্রভু!”

“প্রভু”!

জীন নিরাশাতারে এতক্ষণ অবসর হইয়া ‘ছল, স্তম্ভিত হইয়া সে বলিল—

“প্রভু?—তবে ইনি ক্যুয়ে নন, আরও বড়?”—

“চুপ” হ’রামজাদ, ইনি এখনকার প্রধান ধর্মযাজক তুই জানিস্ নে?”

মিরিয়েল ততক্ষণে কেদারা ছাড়িয়া যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিয়া পড়িয়া ছিলেন, জীনের দিকে চাহিয়াই বলিলেন—“এই যে আপনি ফিরে এসেছেন! আমি তাই ভাবছিলাম যে রূপার বাতিদান দু’টো আপনি ফেলে গেলেন কেন? সে দুটোও ত আপনাকে দিয়েছিলাম, তাদেরও দাম প্রায় ২০০ দু’শ’ ফ্রাঙ্ক হবে যে!”

বিস্ফারিত নেত্রে জীন মিরিয়েলের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার মুখভাবের বর্ণনা করি আমার সে সাধ্য নাই, মানুষের ভাষা এখানে মুক।

“প্রভু! তা হলে লোকটা যা বলছিল তা সত্য? লোকটা চোরের মত পালাচ্ছিল দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাকে ধরে দেখি তার থলির মধ্যে এই সব রূপার জিনিস।”

মিরিয়েল স্মিতহাস্তে বলিলেন—“আর উনি বল্লেন যে এক বুড়ো ধর্মযাজক যার কাছে রাত্রিটা উনি ছিলেন, সেই ঠুকে এ সব দিয়েছে? তাই ধরে এনেছ? না, না, ধরে আনবার মত ত উনি কিছু করেন নি। আমি নিজে হ’তেই ওগুলো ঠুকে দিয়েছি।”

“তা হলে একে ছেড়ে দিতে পারি?”

“নিশ্চয়ই।”

গ্রহরী জীনের পৃথল মোচন করিল।

কীর্ণ অর্ধচুটবরে জীন বলিল—“সত্যই আমি ছাড়া পেলাম ?”

প্রহরী। হাঁ, ছাড়া পেয়েছ। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

“দাঁড়াও ভাই। বাতিদান দু’টো এনে দিই” বলিয়া বৃদ্ধ আলমারী হইতে রূপার বাতিদান দুইটি আনিয়া জীনের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্যাপ্তিস্তাইন ও ম্যাগলোয়ার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে সে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

জীনের আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছিল। কলের পুতুলের জায় সে বাতিদান দুইটি গ্রহণ করিল।

“তবে এস ভাই। একটা কথা বলে রাখি, এবার থেকে যখন আসবে বাগানের পথে এসো না; সদর দরজা দিয়ে ত যখন ইচ্ছা তুমি যাওয়ার কর্ত্তে পার। শুধু একটা ছিটকিনি তাতে লাগানো থাকে, তালা তো আমি কখনো দিই না।” তার পর পুলিশ কর্মচারীর প্রতি চাহিয়া মিরিয়েল বলিলেন—“তা হলে আপনারা এখন যেতে পারেন।”

পুলিশের দল কক্ষ হইতে নিঃসৃত হইল।

জীনের সর্কশরীর তখন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল; তাহার সুচর্চার উপক্রম হইল। মিরিয়েল ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া ধীর শাস্ত্রবরে বলিলেন—“এই টাকার উপযুক্ত সম্বাবহার করে তুমি যে সাধু হবে বলে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ, দেখো ভাই সে কথা জীবনে কোন দিন ভুলো না।”

জীন কি সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল? কই তাহার তো কিছু মনে পড়ে না। মিরিয়েল কিন্তু কথাগুলির উত্তর যেন একটু জোর দিয়াই বলিলেন; আরও বলিলেন—“ভাই, আজ থেকে তুমি আর পানী নও। আজ যে আমি তোমার আত্মাকে কিনে নিয়েছি; যা কিছু তোমার পাগচিন্তা যা কিছু তোমার কলঙ্ক সে-সব থেকে তোমাকে মুক্ত করে আজ যে আমি ভগবানের চরণে তোমার আত্মাকে নিবেদন করলাম, তাই।”

(১৫)

অলিগলি খিড়কী সড়ক বা সম্মুখে পড়িল, তাহারই মধ্য দিয়া জীন পলাইতে লাগিল। সহর হইতে বাহির হইয়া সারা সকালবেলা সে এইরূপে ঘুরিল। অনাহারে থাকলেও তাহার ক্ষুধা বোধ ছিল না। শত শত অননুভূত-পূর্ব চিন্তায় তাহার চিত্ত ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। অন্তরে তার কোন্ স্রবের—কোমলতার না দৈন্তের—কিসের স্বভাব উঠিতেছিল তাহা সে বুঝতে পারিল না। ক্ষণিকে যেন কাহার উপর একটা ক্রোধ, ক্ষণিকে আবার চিন্তের দ্রবীভূত ভাব; একদিকে, সুদীর্ঘ বিংশবর্ষব্যাপী চিন্তের কঠোরতা,—অপর দিকে কোন্ মান্ব্যস্পর্শে চিন্তের এ নব আর্দ্রতা, এত বর্ষের সাধনার ফলে চিন্তের যে ভীষণ শুষ্কতা সে লাভ করিয়াছিল—আজ কোন্ প্রলয় ঝটিকায় তাহা বুঝি লুপ্ত হইয়া যায়। এ কি অস্থিরতা, এ কি অশান্তি। কারাবাস যে ইহা অপেক্ষা শতগুণে প্রেরকর ছিল। কোন্ গ্রহে তাহার এ ছন্দশা ঘটাইল?—অস্থিরচিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে জীন তাহাই

ভাবিতে লাগিল। বস্ত্রকটকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহাদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বহুবৃগবিশ্বত অতীত বাল্যের কথা তাহার মনে জাগিতে লাগিল। হায়, কোথায় সে দিন !

সমস্ত দিন এইরূপে কাটিল। অপরাহ্নে, তরু লতা এবং উপলব্ধের ছায়া ক্রমবদ্ধিত করিতে করিতে বখন সূর্য্য অন্তাচলগত হইতে-ছিলেন, তখন অবসর জীন, নির্জন প্রান্তরে, এক ঝোপের অন্তরালে বসিয়া ছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না ; ঝোপের অপর পার্শ্ব দিয়া একটা পথ সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে মাত্র। বহুদূরে গাড় নীল আলস্ পর্ব্বতের তরঙ্গায়িত অনন্ত বিস্তার।

সহসা, দূর হইতে একটা আনন্দকলধ্বনি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিল। মুখ ফিরাইয়া জীন দেখিল, আশ্চর্য্যমণি দাদশবর্ষীয় এক বালক, পৃষ্ঠে একটা খেলনার বাক্স বঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে পার্শ্বের পথ দিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে, আনন্দে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কয়টি রোপ্য মুদ্রা লইয়া লোফালুফি করিতে করিতে সে আসিতেছিল। ঝোপের পার্শ্বে আসিয়া দৈবক্রমে সেবার তাহার হাত হইতে সমস্ত মুদ্রাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ৰিপ্ত হইয়া পড়িয়া গেল ;—তাহার মধ্যে ৪০ স্রাসের একটি বড় মুদ্রা ছিল ;—সেটা গড়াইতে গড়াইতে জীনের পারের কাছে আসিয়া পড়িল ; অমনি জীন সেটাকে জুতা দিয়া চাপিয়া ধরিল। বালক কিন্তু সেই মুদ্রাটির উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল, সুতরাং সেটা তাহার দৃষ্টি অভিক্রম করিল না।

সেই নির্জন স্থানে, সন্ধ্যার সময় সেরূপ বেশ এবং আকৃতির লোকের সম্মুখীন হইতে অনেকেই প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিয়া থাকে ; কিন্তু বালকের মনে কোন শঙ্কাই ছিল না। কিপ্রভাবে জীনের সম্মুখে আসিয়া সে বলিল—“মশাই, আমার টাকাটা ?”—প্রবন্ধনাবোধ-হীন অজ্ঞান শিশুর সরল প্রশ্ন।

জীন মুখ তুলিয়া চাহিল। অন্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগ তাহার মুখের উপর পতিত হইয়া সে আকৃতিকে ভীষণতর করিয়া তুলিল। তবু বালক ভীত হইল না ; ধীর স্বরে বলিল—

“মশাই, আমার টাকাটা ?”

“কে তুই ?”

“আমি ছোকরা জারভিস্, মশাই।”

“দূর হ—”

“আমার টাকাটা দিন।”

জীন উত্তর দিল না, মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

“আমার টাকাটা দিন।”

জীন নিরুত্তর, ভূমিসংলগ্নদৃষ্টি।

“দিন না মশাই টাকাটা। বাঃ রে, বেশ মজার লোক ত !—”

তথাপি জীন নিরুত্তর।

জারভিস্ তখন অধৈর্য্য হইয়া জীনের আশ্রয় কলারটা ধরিয়া খুব একটা ঝাঁকুনি দিল। তবুও জীন নির্বাক।

তখন সে প্রাণপণ শক্তিতে ছই হাত দিয়া জীনের পা'টা সরাইতে চেষ্টা করিল। হায়, বুধা চেষ্টা, গাধুনির মত পৃথিবীর সহিত যেন তাঁহা আঁটিয়া গিয়াছে !—বালক কাঁদিয়া ফেলিল।

অবশেষে জীন, মাথা তুলিয়া, শূন্য দৃষ্টিতে একবার সম্মুখের দিকে চাহিল; বালকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে, সে যেন বিস্মিত হইয়া উঠিল; তার পর যষ্টির দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কৰ্কশ কণ্ঠে বলিল—

“কে তুই? কি চাসু?”

“আমি জারভিস্, মশাই। আমার টাকাটা কেন পা দিয়ে চেপে রেখেছেন, মশাই? দিন না,—আমি চলে যাই।”

কিছুতেই যখন জীন সে মুদ্রা প্রত্যাৰ্পণ করিল না, তখন বালক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। উত্তোজিত স্বরে বলিল—“টাকাটা দেবেন কি না, শুনি?—সরান্ বলছি এখনো পা”—

“এখনো রয়েছিস ছোড়া এখনো?”—বলিয়া জীন মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিল,—রোপ্যমুদ্রাটা তখনো তার বুটের নীচে। গর্জ্জন করিয়া বলিল—“বেরো হতভাগা, দূর হ,—নইলে মরুবি বলছি।”

ভয়ে বালকের মুখ শুকাইয়া গেল; তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল; কয়েক মুহূর্ত চলৎশক্তিহীন হইয়া স্তব্ধভাবে সে দণ্ডায়মান রহিল; তার পর, পশ্চাতে আর না চাহিয়াই, উর্দ্ধ্বাঙ্গে সে ছুটিল।

কিছুদূর গিয়া সে একবার থামিল, তার পর আবার ছুটিতে লাগিল।

চিন্তাময় জীনের কর্ণে একবার যেন তাহার ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া গিলিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; চারিদিকে অন্ধকার ক্রমশ জমাট হইয়া উঠিতেছে।

কখন বালক চলিয়া গিয়াছে,—তবু এখনো জীন সেই একই ভাবে দাঁড়াইয়া। তাহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সমতা নাই; সমস্ত দিন সে

উপবাসী; শরীর ক্লান্ত, অসুস্থ। অনতিদূরে ঘাসের উপর একটা কাঁচের খেলানা পড়িয়াছিল,—তাহারই প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সহসা তাহার প্রবল শীতাহুভূতি হইতে লাগিল; টুপিটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া, আনমনে জামার বোতামগুলো আঁটিয়া, জ্বৎ অগ্রসর হইয়া, অবনতভাবে লাঠিটা সে তুলিয়া লইল।

অকস্মাৎ সেই রোপ্যমুদ্রার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।—বিদ্রোহম্পুষ্টের জায় তাহার সর্ব্ব দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল।—সভয়ে সে কয়েক পদ পিছাইয়া আসিল। কালনাগের চক্ষুর জায়, অন্ধকারে সে রজতমুদ্রা যেন জ্বলিতেছিল। মস্তাবিশ্ট মুগের জায় অপহৃত-শক্তি জীন সে দিক হইতে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না।

সহসা ছুটিয়া গিয়া, সেটাকে তুলিয়া লইয়া, চারিদিকে সে চাহিতে লাগিল;—দিগন্তে দিক-চক্রবালে যদি কিছু তাহার দৃষ্টিতে পড়ে! আশ্রয়ভিক্ষু সমস্ত মুগের জায় উদ্বেগাণকায় সে কাঁপিতে লাগিল।

নির্জন প্রান্তর। দিগন্তের কোল হইতে ধীরে ধীরে কুজাটিকা উঠিয়া সন্ধ্যাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে।

একটা অশ্রুট ধ্বনি করিয়া, বালক যে পথে গিয়াছে সেই পথ ধরিয়া জীন দ্রুত চলিতে লাগিল। কিয়দূর অগ্রসর হইয়া সে একবার চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল। জনমানবের চিহ্নদাত্ত নাই। চীৎকার করিয়া সে ডাকিল—

“জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—”

কয়েক মুহূর্ত সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

কেহ সে আশ্বানের প্রভাস্তর দিল ন চারি
দিকে অন্ধকার,—দৃষ্টি চলে না; দিগন্তে,
ভক্ততার মাঝে তাহার সে কণ্ঠস্বর ডুবিয়া
গেল!

এবল হিম বায়ু উত্তর দিক হইতে বহিতে-
ছিল। নাতিদীর্ঘ কণ্টকশূন্য যেন প্রচণ্ড
রোষে কাহার উপর আশ্রয় করিতেছিল।

জীন পুনরায় অগ্রসর হইল; ক্রমে ক্রমে
গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া অবশেষে ছুটিতে আরম্ভ
করিল।—মাঝে মাঝে সে গভীর নিঃশব্দতা
ভঙ্গ করিয়া, তাহার সে ব্যাকুল বিহ্বল বিকৃত
কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল—

“জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—

জারভিস তখন অনেক দূরে। নিকটে
থাকিলেও, সে আর কখনও তাহার সম্মুখীন
হইতে সাহসী হইত না।

কতক্ষণ পরে অস্বাভাবিক এক ধর্ম্মবাজকের
সহিত জীনের সাক্ষাৎ হইল।

“মশাই, একটা ছেলেকে এ পথ দিয়ে
যেতে দেখেছেন?”

“কই, না।”

“তার নাম ছোকরা জারভিস্। তাকে
দেখেছেন কি?”

“কই, কাউকে ত এ পথ দিয়ে যেতে
দেখিনি, বাপু।”

জীন, জেবেয় মধ্য হইতে পাচ ফ্রাঙ্কের
ছোট স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া ধর্ম্মবাজকের
হাতে দিয়া বলিল—“গরীবদের দেবেন।”
তারপর তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—

“তার নাম ছোকরা জারভিস্। বছর
দশ বারো আন্দাজ তার বয়স হবে। পিঠে
তার খেলনার একটা বাল্ল আছে, হয়ত সে

তারি ফেরি করে বেড়ায়। এইদিক দিয়েই
সে গেছে।

“হবে; আমার চোখে কিন্তু পড়ে নি।”

“ছোকরা জারভিস্ তার নাম। এই
কাছেই বুঝি কোন্ গাঁয়ে সে থাকে! জানেন
আপনি কোথায় সে থাকে?”

“কি করে বলব? তবে সে যদি হা মরে-
দের ছেলে হয় তা হলে তার সন্ধান পাওয়া
মুশ্কিল। তারা আজ এ গাঁয়ে কাল সে গাঁয়ে
এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।”

জীন আরও ছোট স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া
তাহার হাতে দিয়া বলিল—“এও গরীবদের
দেবেন।” তারপর সহসা উন্নত ভাবে
বলিয়া উঠিল—“ঠাকুর মশাই, আমার ধরুন,
আমায় বেঁধে নিয়ে চলুন।—আমি চোর,,
আমি ডাকাতি—”

সমস্ত ধর্ম্মবাজক, অধপৃষ্ঠে সবেগে কশাঘাত
করিয়া, নক্ষত্রগতি সে স্থান হইতে অন্তর্হিত
হইলেন।

জীন পুনরায় ছুটিতে লাগিল। পথিপার্শ্বে
ঝোপগুলা মাঝে মাঝে মানুষের মত দেখাইতে
ছিল; সেগুলো আতিপাতি করিয়া দেখিয়া
আবার উর্দ্ধ্বাঙ্গে সে ছুটিয়া চলিল। শেষে,
তিনটি পথের সংযোগস্থলে আসিয়া
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল।—কোন্ পথে
সে বালক গিয়াছে?

“জারভিস্!—ছোকরা জারভিস্!—”
অন্ধকার সে শব্দকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল,
তাহার প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত উঠিল না।

পুনরায় সে ডাকিল—“জারভিস্!—”
এবার কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ।—সেই তাহার
শেষ আশ্বান! সে তখন টলিতেছিল।—কি

বেন এক অদৃষ্ট শক্তি তাহার সমস্ত পাপের বোঝা লইয়া একই আঘাতে তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল।—অবসরভাবে একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর পতিত হইয়া জাহ্নতে মুখ লুকাইয়া তীব্রকণ্ঠে সে আর্তনাদ করিয়া বলিল—“ওঃ, আমি এমনই পশু !”

অকস্মাৎ তাহার অন্তঃকরণ উবেলিত হইয়া উঠিল ; অভাগা ক্রন্দন করিয়া উঠিল ! তাহার গুহ নয়ন হইতে, উনিশ বৎসর পরে, আজ সর্বপ্রথম অশ্রধারা ছুটিল ।

কিসে জীবনের এ পরিবর্তন ঘটিল, তাহাই আমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রাতঃকালের সে ঘটনার পর হইতে, চিত্তের চাকল্যে তাহার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল ; কি যে ঘটতেছে, কি যে ঘটিয়াছে—কিছুই যেন সে বুঝিতে পারিতেছিল না। মিরিয়েলের সেই গভীর স্বর—“তুমি সাধু হব ব’লে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক’রেছ। সব পাপ থেকে তোমার মুক্ত ক’রে আজ আমি ভগবানের চরণে তোমার আত্মাকে নিবেদন করলাম”—সেই কথা, সেই কণ্ঠস্বর অমূল্য তাহার কর্ণে বঙ্কিত হইতেছিল।

গর্গ, আত্মাভিমানই, পাপীর আশ্রয়—পাপের দুর্গস্বরূপ। সেই দুর্গের মধ্যে থাকিয়া, সাধুর করুণার আক্রমণ হইতে সে আপনাকে দূরে রাখিতেছিল। সে দুর্গে এমন প্রচণ্ড আঘাত এ পর্যন্ত কেহ করে নাই ! সে বুঝিল,—যদি এ করুণার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তবেই তাহার চিত্তের কঠোরতা সম্পূর্ণ হইবে ; যদি না পারে, তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া যে হিংস্র আনন্দে সে ভিলে ভিলে আপনায় চারিদিকে পাষণ-

প্রাচীর তুলিয়াছে, তাহা চূর্ণ হইয়া বাইবে, তাহাকে হর জরী নয় বিজিত হইতে হইবে ; তাহার পাপ এবং মিরিয়েলের গুণ্য—এ দু’য়ের সংগ্রামে এক পক্ষকে পরাজিত হইতেই হইবে ; এ যুদ্ধে সন্ধির কোন কথা নাই।

মাহুষের জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন কি এক রহস্তময় অর্ধক্ষুট ঝঙ্কার, তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতে থাকে—তাহার অনুষ্ঠিতপ্রায় কার্যের বিষয়ে তাহাকে অম্লনয় বা বাধা প্রদান করিতে চায়। সে ঝঙ্কার কি সে আজ শুনিয়াছিল ? এমন কোন অশরীরী বাণী কি তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছিল যে, জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত আজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত, এখন হইতে তাহাকে খুব সাধু হইতে হইবে, নয়ত পাপের চরম-সীমায় পৌছাইতে হইবে ; যে, তাহার পক্ষে, আজ হইতে হর-মিরিয়েলের অপেক্ষাও উচ্চ আসন, নয় গ্যালির কয়েদীর অপেক্ষাও নিয়গতি,—দু’য়ের মাঝামাঝি অস্ত কোন স্থান নাই ; যে, আজ হইতে, যদি সে ভাল হইতে চায় তবে দেবতা-স্বরূপ, যদি মন্দ হইতে চায়, তবে দানবের অপেক্ষাও ভীষণ হইবে ?

দুদিনে মাহুষের বুদ্ধি উৎকর্ষ লাভ করে, লোকে বলিয়া থাকে বটে। তব্রাচ আমাদের বোধ হয়, সব কথা তেমনি ভাল করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা জীন ড্যানজিনের ছিল না। সবই আব্‌ছার মত তাহার চিত্রপটে ভাসিত-ছিল ; কি যেন একটা বস্ত্রপাকর চিত্ত-বিক্ষিপ্ততার সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। গ্যালির সে পৈশাচিক অন্ধকার হইতে সত্য-নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাহিরে আসিতেই, প্রথম সূর্য্যকিরণে অন্ধকারাত্যক্ত চক্ষুর জ্বল,

মিরিয়েলের অপূর্ণ করণার তাহার অন্তঃস্থল আহত হইয়া উঠিল। পবিত্রোচ্ছল সম্ভাবিত ভবিষ্য-জীবনের যে ছবি তিনি তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন,—তাহার কথা ভাবিয়া সে চকিত কম্পিত হইয়া উঠিল। সে যে কোথায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সে ভালমত বুঝিতে পারিতেছিল না! অকস্মাত্মনিত সূর্য্যাকিরণে পেচকের ভ্রম, অভাগা আত্ম পুণ্যের কিরণ-সম্পাতে অন্ধশ্রাব হইয়াছিল। তবে একটা কথা সে বুঝিল; এই কর ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃতির একটা মহা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে,—মিরিয়েলকে একেবারে ঘুরে রাখা আর তাহার সাধ্যাত্ত নয়।

মনের যখন এই অবস্থা, তখন ছোকরা জারভিসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে, এবং তাহার স্বর্ণমুদ্রাটি সে চুরি করে। কেন করে? তার উত্তর সে জানিত না। তবে আমরা বলিতে পারি, বোধ হয় সেটা তাহার সংস্কারের ফল, তাহার এত বর্ষব্যাপী অন্তর চিন্তারূপ পাপের সর্বশেষ চেষ্টা; নির্ক্ষাণের পূর্বে দীপশিখার শেষ দীপ্তি। বৃষ্টি তাহাও নহে। সে চুরি সে করে নাই; মন যখন তাহার শত শত অজ্ঞাত চিন্তার মধ্যে পড়িয়া সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখন তাহার পশুভাবই, স্বভাব এবং সংস্কারের বশবর্ত্তিতার, নির্ক্ষাণের ভ্রম সে মুদ্রা পদ-দলিত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার সে পাশবিক কার্য্য বুঝিতে পারিল তখনই সে ব্যথিত সন্নত হইয়া উঠিল। তাহার মন প্রকৃতিস্থ থাকিলে সে কার্য্য তাহার দ্বারা কখনই সম্ভবপর হইত না। এইটুকু যদি আমরা বুঝিয়া থাকি,

তাহা হইলে জীন ভ্যালজিনের এ পরিবর্তন-চিহ্ন আমরা সবটাই বুঝিয়াছি।

বাহা হউক, এই শেষ ঘটনাই তাহার জীবন-সংগ্রামের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল; তাহার এতক্ষণের সমস্ত কুহেলিকা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, আলো এবং অন্ধকারকে দুইভাগে পৃথক করিয়া দিল। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় যেমন কোন দ্রবীভূত নিশ্রণে অংশবিশেষ পাত্রতলে, এবং অংশবিশেষ স্বচ্ছতারল্যে উপরাংশে পৃথকীকৃত হইয়া পড়ে,—তাহারও চিন্তার সেইরূপ পরিবর্তন ঘটিল। যখন সে “ওঃ, আমি এমনই পশু” বলিয়া আত্মনিদ করিয়া উঠিল, তখনই আপনার বথার্থ মূর্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। নিজেকে তখন তাহার একটা ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে,—অপহৃত বাসনাদি স্বপ্নে লইয়া যষ্টিহস্তে দণ্ডারমান, রক্তমাংসদেহধারী, ভীষণ-কঠোর-মুখচ্ছবি গ্যালির করেদী জীনের মূর্ত্তি-খানা স্পষ্ট-দেখিতে লাগিল। পূর্বেই বলিয়াছি, দুর্দশায় পড়িয়া জীন কতকটা কালনিক হইয়া পড়িয়াছিল। কলনার চক্ষে তাই সে আপনার প্রতিমূর্ত্তিখানা দেখিতে দেখিতে এক একবার ভাবিতে লাগিল,—‘কে এ’? পরক্ষণেই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

ধীরে, অতি ধীরে, সে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটি ক্ষীণ আলোক ফুটিয়া উঠিল। ধীরে, অতি ধীরে, সে আলোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। জীন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল,—সে ত আলোক নয়, সে যে কোন্ দিব্যমূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি যে বিয়েকুঁ মিরিয়েলের!

বিবেকের তুলান্দে সে হৃৎকেন্দ্রে ভৌল
করিতে বসিল। মিরিয়েল ব্যতীত আর কেহ
বুঝি তাহাকে এত অবনত করিতে পারিত
না! তখন তন্ময়চিত্ত জীন দেখিতে লাগিল
যেন মিরিয়েলের মূর্তি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে
উজ্জ্বলতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া
ফুটিয়া উঠিতেছে; আর তাহার নিজের মূর্তিখানা
ক্রমশঃ স্নান হইতে স্নানতর হইয়া পড়িতেছে;
তাহার রক্তমাংসময় দেহটা যেন ছায়ামূর্তিতে
রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে
সে ছায়ামূর্তিও যেন মিলাইয়া গেল; তাহার
চক্ষের সম্মুখে শুধু একটি মূর্তি—মিরিয়েলের
মূর্তিখানি স্থির নিষ্কম্প ভাবে দীপ্তি পাইতে
লাগিল। অভাগার জীবনখানিকে যেন তাহা
নবীন মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিল!

* * *

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরিয়া অভাগা
কাঁদিল; তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া তপ ধারাস্রোত
ছুটিতে লাগিল। রমণী—চিন্তা দৌরল্যে,
শিশু, ভীতি ব্যাকুলতায়—যেভাবে ক্রন্দন করে
তাহার অপেক্ষাও অধিক আবেগে সে কাঁদিতে
লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চিন্তের অঙ্ককার
কাটিতে লাগিল; সে আলোকমূর্তি প্রথর

ভেঙ্গে, তীব্র উদ্গাদনায় তাহার অন্তঃস্তলকে
ওতপ্রোত ভাবে অধিকার করিয়া বসিল।
তাহার অতীত জীবন, প্রথম পাপাশ্রয়,
সুদীর্ঘ কারাবাস, তাহার ভীষণ বহিরাঙ্কতি,
কঠোর অন্তঃপ্রকৃতি, প্রতিহিংসা-স্বধ-সম্ভাবনা-
মধুর কারামুক্তির কথা, মিরিয়েলের আবাসে
ঘটনাপরম্পরা, তাঁহার তেমন ক্ষমার পরও
জারভিসের মুদ্রাপহারণ, এ সমস্তই একে একে
তাহার মনে জাগিতে লাগিল; কি এক
অচিন্ত্য অননুভূতপূর্ব্বক ভাবে নিজের
জীবনটাকে পুণ্ড্রিকময়, আত্মাকে ভয়াবহ
বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। তবুও
যেন সে জীবনে সে আত্মায় একটা প্রশান্ত
আলোকের প্রতিবিম্ব পড়িতেছিল! যেন
স্বর্গের আলোকে শয়তানের মূর্তিখানা সে
দেখিতেছিল।

কতক্ষণ সে কাঁদিল? তার পর সে কি
করিল? কোথায় সে গেল? কেহ
তাহা জানে না। এইমাত্র শুধু আমরা জানি
যে, শেষরাত্রে যখন ডিসহরের মধ্য দিয়া
রাত্রের ডাকগাড়ীখানা যায় তখন শকট-
চালক একজন লোককে, বিয়েভূঁ মিরিয়েলের
বাটীর বহির্দ্বারে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া পড়িয়া
থাকিতে দেখিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশুধীরচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত — অবতারবাদ

(আশ্বিনের বঙ্গদর্শনের ৫৪৪ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক বা ‘না’-বাচক মতের সঙ্গে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের কোনও কোনও স্থলে অতিশয় গুরুতর বিরোধ আছে। ব্রাহ্মগণ বলেন—“ঈশ্বরের অবতার হয় নাই ও হইতে পারে না।” ব্রাহ্মসমাজ অবতার মানেন না। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধনা অবতারবাদের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। ঈশ্বরের অবতার স্বীকার না করিলে, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিশেষত্ব ও বৈষ্ণব-সাধনার অনুরূপ বিচিত্রতা, এই সকলই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মমত ও ব্রাহ্মসাধন বর্জন করিতেই হয়।

আপাততঃ এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্জন করিতে হয় না, অতিক্রম করিতে হয় মাত্র। “ঈশ্বরের অবতার হয় নাই ও হয় না”—এটা একটা অভাবাত্মক বা ‘না’-বাচক কথা। যাহারা কোনও অতি-প্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের অভাবাত্মক বা ‘না’-বাচক মতের একটা প্রবল ভিত্তি আছে। খৃষ্টীয়ান্ বলেন,—“যিশুখৃষ্টের আশ্রয়লাভ ব্যতীত জীবের মুক্তির আর অন্য পথ নাই।” এটা একটা ‘না’-বাচক খৃষ্টীয়ানী মত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে খৃষ্টীয়ান্ সাধক এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে—“আমি খৃষ্টাশ্রয় পাইয়া মুক্ত

হইয়াছি।” ইহার বেশি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা নাই ও থাকিতেই পারে না। অর্থাৎ তিনি যখন বলেন যে, এ পথ কেবল আমার পথ নয়, সকলেরই এই এক পথ, মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই; তখন তিনি একটা সর্বজ্ঞতার দাবী করেন। এই দাবী তাঁর নিজের নাই, কিন্তু বাইবেলের আছে। কারণ বাইবেল ঈশ্বরের বাণী। আর ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়া, তাঁর বাণীও সর্বজ্ঞতার দাবী করিতে পারে। ঈশ্বর সকল জ্ঞানেন বলিয়াই, মুক্তির যে আর পথ নাই, ইহাও জ্ঞানেন। বাইবেল এই জ্ঞানই প্রচার করিতেছে। এইরূপে মুসলমান ধর্মের ‘না’-বাচক মত বা উপদেশেরও একটা অতি প্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য আছে। সে শাস্ত্র প্রামাণ্য সত্য কি মিথ্যা, এ বিচার এখানে উঠে না। এখানকার কথা কেবল এই যে যঁারা অতি প্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানেন, তাঁদের পক্ষে সর্বজ্ঞতার দাবী না করিয়াও, সেই সর্বজ্ঞ ও অল্লাহ শাস্ত্রের বলে, যাহা নিজেরা জ্ঞানেন না, তাঁর সম্বন্ধেও দৃঢ় ভাবে একটা অস্তি-নাস্তি মত ব্যক্ত করিতে পারেন। খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের ‘না’-বাচক মতের এইজন্ত একটা জোর আছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র মানেন না। আত্মপ্রত্যয় বা স্বাহুত্বই ইহাদের নিকটে সত্যের একমাত্র মুখ্য

প্রমাণ। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয়ান বা মুসলমানের মতন, ইহারা তেমন জোর করিয়া কোনও 'না'-বাচক মতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না।

মানুষ সাক্ষাৎভাবে না জানিয়াও অনেক বিষয়ে ইঁা, না বলিয়া থাকে। না জানিয়া যখন সে 'ইঁা' বলে, তখন অপরের সাক্ষ্যের উপরে সে নির্ভর করিয়া থাকে। আর না জানিয়াও যখন সে 'না' বলে, তখন তার এই উক্তি হয় মানবজ্ঞানের মূল প্রকৃতির উপরে, না হয় শুদ্ধ অমুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ ও কালের জ্ঞান মানুষের স্বতঃসিদ্ধ। আর ইঙ্গিত-সাক্ষাৎকারে বস্তুর যে একটা আয়তন-বা-দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি-বোধ জন্মে, আমাদের এই স্বতঃসিদ্ধ দেশের জ্ঞান তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ ইঙ্গিত-সাক্ষাৎকারে জাগতিক সর্ববিধ ঘটনার যে একটা পারস্পর্য্যের বোধ জন্মে, তাহারই উপরে আমাদের সহজসিদ্ধ কালের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। দেশের সঙ্গে আয়তনের বা extension-এর, আর কালের সঙ্গে ঘটনাপারস্পর্য্যের বা succession-এর যে একটা নিত্যযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা আমাদের জ্ঞানের মূল প্রকৃতির সাক্ষ্য। ইংরেজিতে এই সাক্ষ্যকে necessity of thought বলে। চিন্তা করিতে গেলেই, জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই, যে সকল সিদ্ধান্তকে আলস করিতে হয়, তাহাকেই necessity of thought বলে। সর্বজ্ঞতার দাবী না করিয়াও জ্ঞানের মূল প্রকৃতি যে সকল সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে কণ্ঠ করে, সেই সকল স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনও কিছু যে কোনও দিন হয় নাই,

কোনও দিন হইবে না, ও কোনও দিন হইতেই পারে না,—ইহা সকলেই বলিতে পারেন। আয়তন বা extensionশূন্য দেশ, পারস্পর্য্য বা successionবিহীন কাল, কোথাও কখনও হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না,—এ কথা 'না'-বাচক হইলেও, যে ব্যক্তি জ্ঞানবস্তুর যে কি, দেশজ্ঞান ও কালজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহা জানেন, তিনিই নিঃসন্দেহরূপে এই কথা বলিতে পারেন। এই জাতীয় 'না'-বাচক কথা, অজ্ঞাত হইলেও জ্ঞাতেরই মতন সত্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্বজ্ঞতার দাবী করা আবশ্যক হয় না। এইরূপ 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক সিদ্ধান্তকে ভ্রান্তিবশতঃ বর্জন করা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও নূতন অভিজ্ঞতালাভে বা অভিনব জ্ঞানের উন্মেষে ইহাকে অতিক্রম করা যায় না। কারণ এই জাতীয় 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক প্রতিজ্ঞা মাত্রেই এক একটা সনাতন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে।

“ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না”—ব্রাহ্মসমাজ এই যে 'না'-বাচক বা অভাবাত্মক মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা কোনও অপ্রান্ত ও সর্বজ্ঞ শাস্ত্রের কথা নহে। কারণ ব্রাহ্মসমাজে এরূপ কোনও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। ব্রাহ্মসমাজে আত্ম-প্রত্যয় বা স্বাহুত্বই সত্যের একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। অর্থাৎ—“ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না ও হইতে পারে না” ইহা আত্মপ্রত্যয় বা স্বাহুত্বের কথাও নহে। কারণ আত্মপ্রত্যয় বা স্বাহুত্ব-লব্ধ সত্য

মাত্রেরই ই'-বাচক। যাহা নাই তার প্রত্যয়ও হয় না, অমুভূতিও অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন আত্মপ্রত্যয় এই কথা বলিতে পারে। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ,—এ সকলের সাক্ষ্য স্বামুভূতি দিতে পারে। কিন্তু তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন কি না পারেন, ইহা আত্মপ্রত্যয় বলিতে পারে না। স্বামুভূতি ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। এ সকল কথা আত্মপ্রত্যয় ও স্বামুভূতির অধিকারের বহির্ভূত। অতএব যে মূল প্রামাণ্যের উপরে ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা, তাহার দ্বারা অবতারবাদ সপ্রমাণও হয় না, অপ্রমাণও হয় না।

যাহা আছে বলিয়া জানি, তার বিপরীত কিছু নাই ও থাকিতেই পারে না—এইভাবেও না-বাচক প্রতিজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি ভাবাত্মক মত আছে। পূর্ব প্রবন্ধে এগুলির উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল ভাবাত্মক মতের বিরোধী কোনও মত বা সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মসমাজে কখনোই সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, ও হইলে, সে ভাবাত্মক মত পর্যাস্ত পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সে অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ আর ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্মধর্ম থাকিবে না—তাহার বিপরীত কোন একটা সমাজ ও ধর্ম হইয় উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি মতে 'ই' দিয়াছেন বলিয়াই, তার বিপরীত মত সম্বন্ধে 'না' বলিতে বাধ্য। এইভাবেও 'না-বাচক মতের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের 'ই'-বাচক মতগুলির সকলই অপরাপর ধর্ম্মেতেও সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ব্রাহ্মসমাজের 'ই'-বাচক মতের

প্রথমটীতে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন; তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ—ইত্যাদি সত্তো খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৈষ্ণব, শাক্ত সকলেই বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর অন্তর্যামী ও সর্বদাক্ষী, তাঁর হস্ত-পদাদি কোনও ইন্দ্রিয় নাই, এ সকল কথাও খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেই স্বীকার করেন। অর্থাৎ এই সকল মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও খৃষ্টীয়ান্, বৈষ্ণব ও শাক্ত ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মুসলমান্ পয়গম্বর ও নবীতে বিশ্বাস করেন। অবতারবাদের বা নবীবাদের দ্বারা ঈশ্বরের সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপের বিষয় তাঁর অদ্বৈতত্বের কোনও ব্যাঘাত হয়, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভৃতি সাধকেরা এরূপ আশঙ্কা কোনও দিন করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই সাধারণ ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে অবতারবাদের বা নবীবাদের একটা নিগূঢ় বিরোধ থাকিতে পারে না, এমনও বলা যায় না, কারণ মাত্র অनेক সময় পরস্পরবিরোধী মতকেও অজ্ঞতা বা অসাধনতানিবন্ধন সত্য বলিয়া গ্রহণও করিয়া থাকে। এক্ষেত্রেও যে তাংই হয় নাই—এ প্রশ্নটা উঠিতে পারে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-তত্ত্বের সঙ্গে সত্যই কি অবতারতত্ত্বের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ আছে? ব্রাহ্মসাধারণে এরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে করেন। তারই জন্ত তাঁহারা অবতার অস্বীকার করেন। কিন্তু এই না-বাচক মত ও ইচ্ছাচার মূলতত্ত্বের বা needs-

sity of thoughtএর উপরে প্রতিষ্ঠিত, না কেবলমাত্র লৌকিক জ্ঞানের বা formal logicএর একটা অসঙ্গত অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহাও তাকাইয়া দেখা আবশ্যক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই জানা যায়। যেমন দেশ ও কালকে, সেইরূপ কার্যাকারণসম্বন্ধকেও আশ্রয় করিয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিশেষ দেশেতে, বিশেষ কালেতে, কোনও কার্যাবিশেষের কারণ বা কাণ-বিশেষের কার্যরূপেই আমরা যাবতীয় বিষয়ের বা বস্তুর জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এই কার্যাকারণশৃঙ্খলকে ধরিয়াই আমাদের বুদ্ধি পরিণামে অনাদি আদিকারণরূপ ঈশ্বরতত্ত্বে যাইয়া উপনীত হয়। লৌকিক জ্ঞান বা formal logic এই কারণ-ত্রয়েরই প্রতিষ্ঠা করে। এই কারণ-ত্রয়ের যে অবতারণা হয় না বা হইতে পারে না, জ্ঞানের মূলস্বত্র হইতে এমন কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না। অপিচ কারণ মাত্রকেই যখন কার্যরূপে পরিণত হইতে দেখা যায়, কারণের আত্মপরিণামকেই যখন আমরা সর্বত্র কার্য বলিয়া দেখি ও জানি, তখন কারণ-ত্রয়ই যে জগৎ ও জীবের মধ্যে জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হইতেছেন ইহা মানিতেই হয়। লৌকিক জ্ঞান বা formal logic এই পরিণামবাদেরই প্রতিষ্ঠা করে। এই পরিণামবাদ সত্য হউক, মিথ্যা হউক, জ্ঞানের মূলপ্রকৃতির সঙ্গে ইহার কোনও ঐকান্তিক বিরোধ নাই। আর এই পরিণামবাদের সঙ্গে অবতারণাবাদের কোনও অসঙ্গতি নাই।

যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেইরূপ তাঁর স্বরূপও মানবজ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই জানা যায়। যাহা বোঝে নাই তাহা বুঝিতে ফোটে না। যাহা কারণেতে নাই, কার্যেতে তাঁর প্রকাশ হয় না ও হইতেই পারে না। জগতে যখন জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি তখন জগৎ-কারণে অবশ্যই জ্ঞানক্রিয়া বিদ্যমান আছে। জীবের চেতনাই ঈশ্বরের নিত্য-চৈতন্ত্যের সাক্ষী দেয়। মানবের জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপের পরিচয় প্রদান করে। ঈশ্বর যে জ্ঞানস্বরূপ, অনাद्यনন্ত, সর্বগত ও সর্বব্যাপী, আনন্দময়, শিবস্বরূপ,—এ সকলই মানবজ্ঞানের ও মানবপ্রকৃতির সাক্ষ্য হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ নিজের প্রকৃতিকে জানিতে গিয়াই এই সকল ঈশ্বরস্বরূপেরও জ্ঞানলাভ করে। ঈশ্বর যে অন্তর্ধ্যামী, সাক্ষী-চৈতন্ত্য, ইহা আমাদের জ্ঞানেরই সাক্ষ্য। এই অন্তর্ধ্যামী পুরুষ আমাদের ভিতরেই বাস করিতেছেন, তিনিই পরমচৈতন্ত্যরূপে দিবানিশি আমাদের সঙ্গে বিরাজ করিয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়-চেষ্টা ও রসসম্ভোগ সকলই সম্ভব করিতেছেন। অথচ দেহপুর্বে থাকিয়াও দেহের বিকারের দ্বারা তিনি কদাপি বিকৃত হন না। আমাদের ভুলভ্রান্তির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছেন, অথচ এ সকল পাপ-তাপ-মোহ ও অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আর আমাদের দেহপুর্বে পূর-স্বামী হইয়া আছেন বলিয়া যদি তাঁর স্বরূপের কোনও হানি না হয়, তাহা হইলে অবতার অঙ্গীকার করিলেই যে সেই স্বরূপের হানি হইবে, জ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতে এরূপ কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না।

ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ—ইহা সমাজের একটা হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত। আর যামূলী ব্রাহ্মমতে এই জড়ই অবতারবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। কিন্তু জীবাশ্মাও ত নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ; অথচ এই জীবাশ্মা যখন দেহধারণ করে, তখন তার নিরাকারত্ব ও চৈতন্যস্বরূপ হ'এর কোনটাই নষ্ট হইয়া যায় না। অবতীর্ণ ঈশ্বর দেহধারণ করেন বলিয়া, তাঁরই নিরাকারত্বের ও চৈতন্যস্বরূপের ব্যাঘাত জন্মিবে কেন? জীবাশ্মা যখন দেহবদ্ধ হইয়াও আপনার স্বরূপভ্রষ্ট হন না, তবে পরমাশ্মাই বা অবতার স্বীকার করিলে স্বরূপভ্রষ্ট হইবেন কেন?

যদি বল জীবাশ্মা দেহধারণ করিয়া, এই দেহের ও এই সকল ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং এই ইন্দ্রিয়ের অধীনতা নিবন্ধন জড়ের নিয়মের অধীন হইয়া পড়ে, অবতার স্বীকার করিলে পরমাশ্মাকেও এই সকল অধীনতা গ্রহণ করিতে হয়, আর তাহা হইলে তাঁর সর্বাভীত্ব, সর্বনিয়ন্ত্রিত্ব ঈশ্বর ও স্বতন্ত্ররক্ষা পায় না। তাহাই বা কল্পনা করিব কেন? কারণ এই জীবাশ্মাই তো সাধনপ্রভাবে, জীবমুক্ত অবস্থায়, এই জড়জগতের সর্বপ্রকারের অধীনতা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। জীবাশ্মার পক্ষেই যখন এই দেহেতে থাকিয়াও দেহের অতীত হওয়া সম্ভব, পরমাশ্মার পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

আর এই সকল যোগসিদ্ধিতে যদি অবিশ্বাসই বা কর, তথাপি ব্রাহ্মমতেও তো জীবাশ্মাকে স্বাধীন বলিয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থই এই যে জীব ইচ্ছা করিলে আপনার রক্তমাংসের প্রেরণা ও প্রবৃত্তি

সকলকে পদানত করিয়া তাহাদের অতীত হইতে পারে। জীবাশ্মাকে জড়ের নিয়মাধীন করিলে, তাহার আর কোনও সত্য-স্বাধীনতা থাকে না। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শরীরের সহজ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি সকল তাহাকে যে দিকে টানে, জীব তার বিপরীত দিকেও চলিতে পারে। আর দেহধারী হইয়াও যখন দেহের অধীন থাকা বা না থাকা জীবাশ্মার স্বৈচ্ছাধীন, তখন ইচ্ছাময় সর্বশক্তিমান পরমাশ্মা দেহ স্বীকার করিয়া সেই দেহের অতীত থাকিতে পারেন না, এমন বলা যায় কি?

অতএব অবতারবাদে ঈশ্বরত্বের নিরাকারত্ব বা চৈতন্যস্বরূপের কোনও ব্যাঘাত করে, এমন বলা যায় না।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরত্বের সঙ্গে অবতারত্বের যে কেবল কোনও সাংঘাতিক বিরোধ নাই, তাহাই নহে। গতাত এই ঈশ্বরত্ব গ্রহণ করিলে, এক আকারে না এক আকারে, অবতারত্বও মানিতেই হয়।

ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরত্ব অদ্বৈতত্ব। ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর—“শান্তঃ শিবঃ অদ্বৈতঃ”। প্রাকৃত জনে এই অদ্বৈতের একটা অসদর্থ করিতে পারে, কখনও কখনও করিয়াও থাকে, ইহা জানি। ঈশ্বর একজন,—দুইজন বা তিনজন বা তেত্রিশ কোটিজন নহেন, কেহ একগুণও মনে করেন বটে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ কোনও দিন অদ্বৈত শব্দের এই কদর্থ করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় বিগুহ্য বৈদান্তিক অর্থেই ব্রহ্মোপাসনায় অদ্বৈত শব্দের প্রয়োগ করিতেন। রাজরা সিদ্ধান্তে ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র সত্য ও

নিত্য তত্ত্ব। পরমার্থতঃ বিধে তত্ত্ববস্ত্ত এক, দুই নাই, তাহাই ব্রহ্মবস্ত্ত। এই ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ, ব্রহ্মই ইহার উপাদান-কারণ। সুতরাং—সদেব ইদং অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। রাজা শঙ্কর-বেদান্তমতাবলম্বী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। রাজার ব্রাহ্মধর্মের চরম সাধ্য ছিল—কৈবল্য। মহর্ষি জীবব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়া, নিত্যকাল জীব ব্রহ্মসত্তায় নিঃশ্রয় হইয়া, জ্ঞান-প্রেম-কর্ম-যোগে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত থাকিবে, ইহাকেই ব্রাহ্মধর্মের চরম সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন। কিন্তু ইহা স্বগতভেদমাত্র, স্বতন্ত্রভেদ নহে। সুতরাং জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মেতেই স্থিতি করে, এবং ব্রহ্মের প্রতিই নিত্যকাল গমন করে। অতএব, অদ্বৈতবাদী না হইয়াও, ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, মহর্ষিও কোনও দিন এ কথা অস্বীকার করেন নাই। “ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ”—“সদেব, সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং”—মহর্ষিও এই সকল শ্রুতি উদ্ধার করিয়া তাঁর ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে, ব্রহ্মকেই একমাত্র পরমতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতেও ইহার প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
বোর দিগন্তপ্রসারী।

ইচ্ছা হইল তব, ভাষু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।

কেশবচন্দ্র দীক্ষরের সঙ্গে জীব ও জড়ের

নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াও, কখনও ইহাদের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন নাই, কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তেও তত্ত্ববস্ত্ত এক, দুই বা তিন নহে। সেই এক হইতেই এই বহুর সৃষ্টি হইয়াছে। জীব ও জগৎ সেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জীব তাঁহারই চিৎকণা। জড় তাঁহারই চিন্তাঘন। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল সিদ্ধান্ত। আর এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সঙ্গে অবতারবাদের কোনও ঐকান্তিক বিরোধ যে কেবল নাই, তাহা নহে; ফলতঃ এই অদ্বৈত ব্রাহ্মসিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, কোনও না কোনও আকারে, অবতারবাদও মানিতেই হয়; না মানিলে, জীব ও জগতের সত্তার কোনও ভিত্তি ও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মই যদি জগতের একমাত্র পরমতত্ত্ব ও চরমবস্ত্ত হন, বিশ্বের অনাদি আদিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও কিছু ছিল না, ইহাই যদি সত্য হয়; সেই ব্রহ্মবস্ত্ত হইতেই সমুদায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া, তাঁহারই মধ্যে স্থিতি করিতেছে এবং অন্তিমে তাঁহাতেই প্রবেশ করে, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে উদ্ধৃত এই শ্রুতিবাক্য যদি মিথ্যা না হয়; তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ; তাঁহারই রূপান্তর বলিতে হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,—এই কথা অস্বীকার করা অসম্ভব হয়। আর ইহাও তো এক প্রকারের অবতার। জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াও জীব ও জগতের ধর্ম ব্রহ্মকে সঙ্গী বা সাকার করিতে পারে না। সেইরূপ দীক্ষর দেহ ধারণ করিয়া অবতার স্বীকার করিলেও, দেহের ধর্ম তাঁহাকে স্পর্শ করে

না। তাঁর অনির্বচনীয় অঘটনঘটনপটীয়সী
মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই জগৎকারণ এই
জগৎরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন।
দেই মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি
অবতারও গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা বিশ্বাস
করিলে, ব্রাহ্মমতের কোনও ব্যাঘাত হইবে
কেন? গীতার অবতারবাদ এই মায়া
উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছেন—
ভগবান্ আপনায় মায়াপ্রভাবে যুগে যুগে জন্ম
গ্রহণ করিয়া থাকেন—“সম্ভবাম্যায়মায়য়া।”

অন্ততঃ গীতার অবতারবাদের সঙ্গে ব্রহ্ম-
সিদ্ধান্তের কোনোই অসঙ্গতি নাই। ব্রাহ্ম-
মতের সঙ্গেই বা তার বিরোধ থাকিবে কেন?

রাজা রামমোহন রায় গোস্বামীমতের
অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। শঙ্কর-বেদান্তা-
বলম্বী তান্ত্রিক-সাধক রাজা যে বাংলার
বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না,
ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু
রাজা রামমোহনও গীতার অবতারবাদ একে-
বারে অস্বীকার করিতেন বলিয়া বোধ হয় না।
তিনি যে বিশ্বরূপের উপাসনা করিতেন, ইহা
অস্বীকার করা যায় না। তিনিই
মহানির্বাণতত্ত্বের ব্রহ্মস্তোত্রকে ব্রাহ্মসমাজের
উপাসনাপদ্ধতিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।
মহর্ষি পরে এই স্তোত্রটিকে কতকটা কাটিয়া
ছাটিয়া নিজের মনোমত করিয়া লইয়াছিলেন,
রাজা তার একটা অক্ষরও পরিবর্তন করেন
নাই। রাজা ব্রহ্মতত্ত্বকে নিগূর্ণ ও বিশ্ব-
রূপাত্মক হই-ই মনে করিতেন। তাই
তিনি—

“নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়”

বলিয়া ব্রহ্মের স্তুতি করিতেন। মহর্ষি বিশ্ব-

রূপাত্মকায় কাটিয়া “সর্বলোকাশ্রয়ায়” করিয়া-
ছেন। আর পরবর্ত্তী পদে নিগূর্ণায় কাটিয়া
শাখতায় করিয়াছেন। মহর্ষি অবৈতবাদের
ভয়ে সর্বদা জড়সড় হইতেন। অবৈতবাদের
গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁর সহ্য হইত না। রাজার এ
ভয় ছিল না। অবৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই
রাজা বিশ্বরূপের ভজনাও করিতেন, আর
গীতায় যতটুকু অবতারবাদ ফুটিয়াছে, ততটুকু
অবতারবাদ স্বীকার করিতে তাঁর কোনও
আপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

জ্ঞানার্চ্য কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে অবতার-
বাদ স্বীকার না করিলেও, মহাপুরুষবাদের
প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের
ব্যক্তিবিশেষে সময়ে সময়ে এই মতের প্রতি-
বাদ করিলেও, কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ যে
ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী ইহা প্রতিপন্ন হয় নাই।
এই মহাপুরুষবাদের সঙ্গে অবতারবাদের
পার্থক্য অতি সামান্য। ফলতঃ কেশবচন্দ্রের
এই মহাপুরুষবাদ কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান-
ধর্মের পয়গম্বরবাদ বা নবীবাদেরই মতন।
মহাপুরুষের ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্মোপদেষ্টা।
অধর্মের ক্ষয় এবং ধর্মের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা-
সাধনের জন্ত, তাঁহার যুগে যুগে মানবসমাজে
আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন ও ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্ম
সাধন করিয়া চলিয়া যান। ইহারা যখন
বিশেষ বিশেষ ধর্মবিধান প্রবর্ত্তিত করিবার
জন্ত আদিষ্ট হইয়া সংসারে আসেন, তখন
দেহধারণের পূর্বে তাঁহার অবশ্য ঈশ্বরের
নিকটে তাঁরই দরবারে বাস করেন। নতুবা
প্রেরিতবাদের মার্থকতা থাকে না। কেবল
তাঁরা নিজেরাই যে আসেন, তাহাও নহে;
তাদের সাক্ষোপাঙ্গ লইয়াই তাঁরা যুগধর্ম-

প্রতিষ্ঠার জন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।
একদিক্ দিয়া এই মহাপুরুষবাদের সঙ্গে
গীতার অবতারবাদের যথেষ্ট ঐক্য আছে।

যদা যদা হি ধর্মশ্চ লান্ধবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং স্বরাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দ্রুততাং।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগধর্মপ্রবর্তনই গীতার অবতারের মুখ্য
প্রয়োজন। এই যুগধর্ম-প্রবর্তনই কেশব-
চন্দ্রের মহাপুরুষদের জন্মেরও মুখ্য হেতু।
তবে গীতার ভগবান সাক্ষীপাদ সহকারে
অবতীর্ণ হন, এ কথাও কোথাও বন্ধন নাই;
বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব
কেশবচন্দ্রের প্রেরিত মহাপুরুষবাদ গীতার
অবতারবাদের অপেক্ষাও বৈষ্ণবীয় অবতার-
বাদের বেশী নিকটে গিয়াছে।

কিন্তু কেশবচন্দ্র কেবল প্রেরিত মহাপুরুষ-
বাদের প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন নাই।
খৃষ্টীয়ানদের লগস (Logos) বা শব্দব্রহ্মবাদ
পর্যন্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মানুষের
চিন্তা বা ভাবের সঙ্গে তার ভাষার যে সম্বন্ধ,
পরমতত্ত্বের সঙ্গে লগসেরও সেই সম্বন্ধ।
আমাদের ভাব ও চিন্তা ভাষার ভিতর দিয়া
প্রকাশিত হয়, আমাদের ভাষা আবার আমা-
দের মনের ভাব ও চিন্তা হইতে, সেই ভাব ও
চিন্তার আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া, সেই ভাব ও
চিন্তাকে ধরিয়াই আপনায় স্থিতি ও সার্থকতা
সম্ভব করে। সেইরূপ পরমতত্ত্বও লগসের
(Logos) ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন।
আর লগসও (Logos) সেই তত্ত্ব হইতে
প্রসূত হইয়া, তাহারই আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা ও
সার্থকতা লাভ করে। “বাগধর্মিব” নিত্যযুক্ত

হইয়া লগস এবং পরমতত্ত্ব অনাদিকাল হইতে
পরস্পরের সঙ্গে বাস করেন। আর এই
লগসই সৃষ্টিমূল। লগসই বিশ্বের হাঁচ। এই
লগসই সাকার হইয়া জগৎ ও জীবরূপে
প্রকাশিত হন। এই লগসই অবতীর্ণ ঈশ্বর
বা যিশুখৃষ্ট। এই লগস-বাদের উপরেই খৃষ্টীয়
অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই লগসকেই
ইংরেজি বাইবেলে the Word বলা হইয়াছে।

In the beginning Was the Word.

The Word was with God.

The Word was God.

ইংরেজি বাইবেল এখানে এই লগস-তত্ত্বই
ব্যক্ত করিয়াছেন। এই খৃষ্টীয় লগস-তত্ত্বের
সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সাদৃশ্য অতি
ঘনিষ্ঠ। সে কথা যথাসময়ে ও যথাগানে বলিব।
ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র
এই লগস-বাদ স্বীকার করিয়াছিলেন।
যিশুখৃষ্টকে তিনি লগস বলিয়া মনে করিতেন।
এমন কি তাঁহাকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র
বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। দার্শনিক অর্থে
কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয় অবতারতত্ত্বকে সত্য বলিয়া
মনে করিতেন, এ কথা বলিলেও বোধ হয়,
কোনও অপরাধ হইবে না। এমন অনেক
খৃষ্টীয়ান আছেন, যারা খৃষ্টীয়ান ধর্মের মামুলী
ত্রিত্ববাদ বা Trinity অস্বীকার করিয়াও
লগস-বাদ স্বীকার করেন এবং যিশু খৃষ্টকে
ঈশ্বরের প্রেমের ও তাঁর অন্তর্জীবনের
প্রতিচ্ছবি, প্রতিমূর্তি ও সাকার বাহ্যপ্রকাশ
বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাও
একপ্রকারের অবতারবাদ বই আর কি?
আর কেশবচন্দ্র, বিশেষতঃ প্রতাপচন্দ্র
মজুমদার মহাশয়, যিশু খৃষ্টকে অনেকটা

এই চক্ষেই দেখিতেন। অতটুকু অবতারবাদ স্বীকার করাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্মের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই।

অতএব ব্রাহ্মমতের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবীয় অবতারবাদেরও যে একটা ঐকান্তিক ও সাংঘাতিক বিরোধ আছে, এ কথা বলা যায় না। ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না,—ব্রাহ্মগণ যে এ কথা বলেন, ইহা তাঁহাদের আত্মপ্রত্যয়ের বা স্বাভূতভূতির উপরেও প্রতিষ্ঠিত নহে; মানবজ্ঞানের মৌলিক প্রকৃতি হইতেও এই মত প্রসৃত হয় না। ইহা স্বতঃপ্রামাণ্য সত্য নহে। অনুমান-প্রতিষ্ঠা সত্যভ্রাস মাত্র। আর অনুমানের উপরে যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে বর্জন করিতে হয় না, অতিক্রমই করিতে পারা যায়।

ফলতঃ নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে অবতারবাদের কোনওই বিরোধ নাই। এই বিরোধ কল্পনা করিতে যাইয়া, আমরা আমাদের ঈশ্বরতত্ত্বকেই স্বল্পবিস্তর সাকার ও বিশিষ্ট করিয়া তুলি। ঈশ্বরতত্ত্ব যে দেশ-কালেরঅতীত,—এবং অতীত বলিয়াই যুগপৎ সমভাবে সর্বকালে ও সকল দেশে বিद्यমান রহিয়াছেন, এবং একই সঙ্গে প্রকট ও অপ্রকট, তটস্থ ও তুরীয় অবস্থায় বাস করেন, একই সময়ে ব্যক্ত হইতে এবং অব্যক্ত রহিতে পারেন,—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াই, ঈশ্বরের অবতার হয় শুনিলে আমরা শিহরিয়া উঠি। ফলতঃ আমরা ঈশ্বরবত্বের কথা শুনিলে এমনই ভাবি যে ঈশ্বর যদি জুড়িয়ায় বা নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন, তবে সে সময়ে যতক্ষণ দিওদেহে বা চৈতন্তদেহে তিনি আবদ্ধ

থাকেন, ততক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি অনাথ হইয়া থাকে? আর এইজন্তই একেবারে অবতার-তত্ত্বটাকে উড়াইয়া দেই। কিন্তু ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের অর্থ বুঝিলে আর এ খট্কা বাধে না। ঈশ্বর তো বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কিন্তু এ ব্যাপ্তি জড়বস্তুর কিম্বা এমন কি আকাশবস্তুর ব্যাপ্তির মতনও নহে। তড়াগগর্ভে যেমন জলরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপভাবে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপিয়া আছেন, তাহা নয়। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াও সর্বত্রই তিনি যুগপৎ পরিপূর্ণরূপে, আত্ম-স্বরূপে বিद्यমান রহিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব ভাগবাটোয়ারা করা যায় না। এ তত্ত্ব অখণ্ড, অবিভাজ্য, অদ্বৈত। ঈশ্বর সর্বত্রই সমভাবে পূর্ণরূপে বিद्यমান। বিন্দুতে যেমন পূর্ণ সিদ্ধুতেও সেইরূপ পূর্ণ। এমার্সনের কথায় বর্ণিত গেল—He is as perfect in the atom as in the universe. এই ঈশ্বর-তত্ত্ব আমাদের আত্মতত্ত্বেরই মতন। এই যে অস্মদপ্রত্যয়বাচক আত্মবস্তু তাহা এই দেহের সর্বত্র বিद्यমান রহিয়াছে। আমাদের এই আঁমি বস্তু, এই প্রাণবস্তু, এই চৈতন্তবস্তু, যে নামেই ইহাকে ব্যক্ত করি না কেন, এই দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সমভাবে অধিকার করিয়া, সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। কোন একটা অঙ্গ নষ্ট হইয়া গেলে এই বস্তুর ভ্রাস হয় না। এ বস্তু যেমনটী ছিল তেমনটীই থাকে। পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যেমন কেশমূলে, সেইরূপ হৃৎপিণ্ডে, দেহের সর্বত্র এ বস্তু যুগপৎ পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করে। এক অঙ্গ হইতে ইহাকে টানিয়া আনিয়া অপর অঙ্গে ইহাকে ফুটাইতে হয় না।

যেখানে অক্ষুট থাকে, সেখানেও ইহা পরি-
পূর্ণভাবে আত্মস্বরূপেই থাকে। যেখানে পরি-
ক্ষুট হয়, সেখানেও পরিপূর্ণভাবে সেই আত্ম-
স্বরূপেই বিস্তৃত থাকে। প্রকাশের ইতর-
বিশেষে তাঁর স্বরূপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ইহাই
আত্মার লক্ষণ। ইহাই জীবাত্মার লক্ষণ।

ইহাই পরমাত্মারও লক্ষণ। এই জন্তই শ্রুতি
বলিয়াছেন যে এই আত্মবস্তু—

“আদীনো দূরং ব্রজতি, শ্যানো যাতি সৰ্বত্র।”

এই শক্তিকেই ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের যোগমায়া
বলিয়াছেন। এই শক্তিপ্রভাবেই কোনও
বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ আধারে, বিষয়ভাবে

আবির্ভূত হইলেও, অল্প ক্ষেত্রে, অল্প
আধারে ঈশ্বরত্বের তিরোভাব হয় না।
সুতরাং অবতার অঙ্গীকার করিলে ঈশ্বরের
নিরাকারত্বের বা সর্বব্যাপিত্বের কোনও
ব্যাঘাত হয় বলিয়া যে আশঙ্কা হয়, ইহা
নিতান্তই অজ্ঞান কল্পনা মাত্র।

ফলতঃ যতদিন নিরাকার ঈশ্বরত্ব কি
ইহা বুঝি নাই, ততদিন অবতার অদম্য ও
অসাধ্য বলিয়া ভাবিতাম। যে পরিমাণে
প্রকৃত নিরাকারত্ব কাহাকে বলে ইহা
বুঝিতে পারিতেছি, সেই পরিমাণে অবতার-
বাদের ভয়টাও কমিয়া যাইতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংসারচন্দ্র বহুদিন হইতে সাংঘাতিক
বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কর্তব্য-
পরায়ণ কর্মবীর, কিন্তু সেজন্ত রাজ্যের গুরু
কর্মভার বহন করিতে একদিনের জন্তও বিরত
হ'ন নাই। এমন সময় গিয়াছে, যখন এই
ভয়ঙ্কর লইয়া তাঁহাকে দৈনিক ১৬।১৭
ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ১৯০৭
খৃষ্টাব্দের জাম্বারী মাসে আফগানিস্থানের
অধিপতি আমীরের ভারতগমন-উপলক্ষে
আগ্রায় বে'দরবার হয়—তখন আগ্রায়
অবস্থানকালে অত্যধিক পরিশ্রমে ও অনিয়মে

সংসারচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন।
আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসার পর চিকিৎসক-
গণের বিশেষ আদেশে এবং মহারাজের
আগ্রহে তিনি কিছুদিন জয়পুরের নিকটবর্তী
'রোডপুরা'য় গিয়া বাস করেন। সেখানকার
স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে এবং বিশ্রামলাভে শীঘ্রই
তিনি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিলেন।
তাঁহার আরোগ্যলাভসংবাদে রাজকর্মচারীগণ
ও প্রজাবৃন্দ সকলেই আনন্দিত হইল। এই
পুরাতন বিশ্বস্ত সচিবের আরোগ্যলাভে
আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্ত মহারাজ স্বয়ং

প্রধানা মহিষী সমভিষাহারে রোড়পুরা গমন করিয়া দিবসব্যাপী উৎসব করিলেন। মহারাজ সংসারচন্দ্রকে যে প্রকার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন—এ আনন্দোৎসব তাহারই ফল। এমনি করিয়া মহারাজ সাধারণের নিকট সংসারচন্দ্রের সুদীর্ঘ চল্লিশ-বর্ষব্যাপী একান্ত প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগের সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সংসারচন্দ্রের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্বে মহারাজ মহিষী সহ তাঁহার কুণল জিজ্ঞাসার জন্ত সংসারচন্দ্রের গৃহে অগমন করেন। জয়পুরাধীশ্বরীর পক্ষে রাজমন্ত্রীকে একপ সম্মানপ্রদর্শন এ রাজ্যে বোধ হয় অনন্তপূর্ব্ব।

১৯০৯ সালের নববর্ষারম্ভে ভারত-গভর্নমেন্ট সংসারচন্দ্রকে C. I. E. উপাধি প্রদান করিলেন। লোকপ্রিয় সচিবের এই সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্ত এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তাঁহার পুরাতন ছাত্রবর্গ, সমগ্র রাজকর্ম্মচারী, কৌশলের ব্যবহারাজীবগণ মিলিত হইয়া সংসারচন্দ্রকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই সকল অভিনন্দনপত্র * এবং তৎকালীন রেসিডেন্ট কর্ণেল হার্বার্ট জয়পুরের ইংরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইয়া যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সংসার-

চন্দ্রের দেবতুল্য চরিত্র, তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা—সর্বোপরি রাজ্যের হিতের জন্ত তাঁহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা—তাঁহাকে জয়পুর-অধিবাসীদের নিকট কতদূর সম্মানভাজন ও লোকপ্রিয় করিয়াছিল। সংসারচন্দ্র ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় এই সকল অভিনন্দনপত্রের যে উত্তর দেন তাহা তাঁহার জ্ঞান সহস্র ধর্ম্মভীক ব্যক্তিরই উপযুক্ত।

রেসিডেন্ট কর্ণেল হার্বার্ট তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—“I have never heard other than good spoken of you by all sorts and conditions of men—indeed every one has spoken of you with affection and regard and I have ever found you courteous, upright, with a fine sense of justice and the highest integrity—* * *” বাস্তবিক তিনি দেশীয় রাজ্যস্থলত বিবিধ দলের সকলেরই প্রীতি ও ভক্তির পাত্র ছিলেন—রাজকার্য্যে কর্তব্যের অহুরোধে অনেক সময় অনেককেই তাঁহাকে শাসন করিতে বা নিরাণ করিতে হইয়াছিল—হয়ত অনেক সময় তাঁহার কার্য্যে অনেকের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে ব্যতীত কমে নাই। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে একস্থানে সংসারচন্দ্র যে মহাবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—“Be just and fear not, let all the ends, thou aimest at, be thy country's, thy God's and Truth's—” ইহাই তাঁহার জীবনে সর্ব্বকার্য্যে মূলমন্ত্র ছিল।

কিন্তু হায়! কালের ক্রমল হস্ত সংসার-

* অভিজ্ঞ পাঠকের জন্ত নানা ভাষায় লিখিত এই সকল অভিনন্দনপত্র ও সংসারচন্দ্রের উত্তর, যদি কখন এই জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে পরিশিষ্টে প্রস্তুত হইবে। মাসিকপত্রে সে সকল প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে।

চন্দ্রকে এই স্বতঃ-উৎসারিত ভক্তি, এই অযাচিত সম্মান, এই বিপুল গৌরব, বেশীদিন ভোগ করিতে দিল না। অভিনন্দন-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি আবার যে রোগশয্যায় শায়িত হইলেন, তাহার পর আর তাঁহার পূর্ববৎ নিয়মিত রাজকাৰ্য্য পরিচালনের সামর্থ্য রহিল না।

১৯০৯ সালের ১১ই মে সৰ্ব্বজনপ্রিয় সচিব, সংসারচন্দ্র অধররাজ্যের রাজা প্রজা সকলকে গভীরতম শোকে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন—রাজ্যে হাহাকার উখিত হইল। মহারাজের আজ্ঞায় রাজ্যের সমস্ত আফিস-আদালত, ‘ছত্রিশ কারখানা’ এবং সৰ্ব্বপ্রকার রাজকাৰ্য্য দুইদিনের জন্ত বন্ধ হইল। প্রথম শ্রেণীর সর্দারদিগের মৃতদেহ যে প্রকার সম্মানের সহিত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়, সেই প্রকার ‘লণ্ডরাজ্যামা’র সহিত সংসারচন্দ্রের মৃতদেহ দাহ-স্থানে লইয়া যাওয়ার হুকুম প্রচারিত হইল। প্রথমে দুইটি হস্তীর উপর জয়পুররাজ্যের ‘পাঁচরজা’ পতাকা, তাহার পর ‘নগ্নী-নাকাড়া’-বাহী উষ্ট্র ও ঘোটকশ্রেণী, তৎপশ্চাতে এক রেজিমেন্ট রাজসৈন্ত, তাহার পর সুসজ্জিত ‘বিমানে’ মৃত সর্দারের দেহ, সঙ্গে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দার ও সমগ্র রাজকর্মচারী ও সর্বশেষে সহস্রাধিক শোকসন্তপ্ত প্রজা-বৃন্দ। এমনি করিয়া যে সংসারচন্দ্র সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর জয়পুররাজ্যের হিতের জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যিনি মহারাজ সবাই মধোদিংহের একাধারে সংপরাধর্শ-দাতা সচিব, সর্ব সময়ে একান্ত বিশ্বাসভাজন বন্ধু ও সর্বসংকার্য্যের সহায় ছিলেন—সেই

মহাপ্রাণ বঙ্গসম্রাটের নখরদেহ শ্মশানভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। যেখানে এই ধার্মিক, কর্ম্মী, সত্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত বাঙ্গালীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, সেখানে আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পুণ্যার্থীর্ণে পরিণত হইয়াছে। জানি না, আমরা সেই অমায়িক, আড়ম্বরহীন কর্তব্য-নিষ্ঠার, সেই নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি ও জ্ঞান-পরায়ণতার, সেই উদার হৃদয়ের প্রকৃত সম্মান করিব কি না। কীৰ্ত্তিমান স্বদেশীর সম্মান করিতে পরাশ্রুত বলিয়া বাঙ্গালীর যে কলঙ্ক আছে,—তাঁহা কি কখনও মোচন হইবে না? আর, অধররাজ্য আজ যে নিঃস্বার্থ প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারাইল—কে জানে কবে তাহা পূরণ হইবে? যদি কখনও অধরবানী তাহাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস লেখে, তবে, বাঙ্গালী-গৌরব বিস্তারের তট্টাচার্য্য, হরিমোহন সেন, কান্তি-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সংসারচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই সকল মহাপ্রাণ বঙ্গসম্রাট জয়পুররাজ্যের যে উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, যে সকল প্রবল বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া বর্তমান ভারতের প্রধান হিন্দুরাজ্যের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া জগতের নিকট জয়পুরের নাম সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন—সে সকল কীর্ত্তি জয়পুর ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন উজ্জল করিয়া থাকিবে।

দানশোণু মহারাজ তাঁহার পরম হিতকারী সচিবের প্রাজ্ঞাদি যথাযোগ্য সমারোহে সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারচন্দ্রের দ্ব্যষ্টপুত্র অবিনাশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। বুধোৎসর্গ, দানসাগর, কালী-নবদীপ-মিথিলা প্রভৃতি স্থানের মহা-

মহোপাধ্যায় অধ্যাপক-বিদ্যার এবং ব্রাহ্মণাদি-ভোজন ও কান্দালীবিদ্যার বিপুল আয়োজন হইল। সংসারচন্দ্রের পিতৃভক্ত পুত্র অ'বিনাশচন্দ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এই বৃহৎ-ব্যাপারের যে প্রকার নিখুঁত বন্দোবস্ত করিলেন—তাহা তাঁহার পিতৃভক্তিরই পরিচায়ক। সমাগত শিষ্য অধ্যাপকদিগের এবং অতিথি অভ্যাগত ও আত্মীয়স্বজনদিগের বাসস্থান ও আহারাদির বিশেষ ব্যবস্থা হইল। বিরাট মণ্ডপতলে আঠারটি রোপা ও পিস্তলের ঘোড়শ, ও শ্রাকোপকরণ এবং শ্রাদ্ধসভা সজ্জিত। সভা-মণ্ডপের একস্থানে রাজগুরু, মন্দিরের মহান্ত-বর্গ এবং নানাস্থানের সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণের স্থান, অত্রাজ রাজ্যের সর্দার ও প্রধান-অপ্রধান রাজকর্মচারিগণ সমবেত। একধারে বঙ্গ-দেশীয় কীৰ্ত্তনীয়া 'মাথুরে'র করুণ-সঙ্গীতে শোভবৃন্দকে নির্দীপ করিয়া রাখিতেছে। সেদিন সকলের অব্যাহতধার। পরদিবস প্রায় ষষ্ঠিসহস্রাধিক ব্রাহ্মণাদি নানা ক্রান্তিকে পরি-তোষে ভোজন করান হইল। একদিন জয়-পুরস্থিত কান্দালিগণ, একদিন রাজ্যের সর্দার-গণ ও রাজকর্মচারিগণকে ভোজন করান হইল। আহারাদির এই বিরাট ব্যবস্থা, অধ্যাপক ও সমাগত ব্যক্তিদিগের জন্ত সর্ব-প্রকার সুবন্দোবস্ত এবং দানসাগর প্রাক্কর ব্যাপার, সর্বোপরি সংসারচন্দ্রের পুত্রগণের বিনীত আপ্যায়নে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বিভিন্ন দেশীয় অধ্যাপকগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে এরূপ বিরাট অখচ সুনিয়মিত সমারোহব্যাপার তাঁহাদের জীবনে কেহ দেখেন নাই, ইহা কেবল দেওয়ান গঙ্গা-

গোবিন্দ সিংহের বিখ্যাত মাতৃপ্রাক্কর সহিত উপমিত হইতে পারে। মহারাজ এমনি করিয়া সংসারচন্দ্রের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ প্রভুভক্তির বর্ধার সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

এ দিকে জয়পুররাজমন্ত্রী মৃত্যু-সংবাদে পারোনিয়র, * সিভিল-মিলিটারী গেজেট প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্র এবং উত্তরভারতের অধিকাংশ হিন্দী ও উর্দু পত্র সংসারচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া তাঁহার নানা সন্দৃগ্ধের ব্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। মহা-মাত্র ভারত-গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের গণ্যমাত্র ব্যক্তিগণ ও রাজপুতানার প্রধান প্রধান রাজস্ববর্গ সংসার-চন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মৃত মহাত্মার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ড ও ভারতের নানাস্থানের প্রধান, অপ্রধান, ধনী, গৃহস্থ, দরিদ্র, বিদ্বান ও কর্ম্মিগণের এই সকল সমবেদনা-স্বচক পত্রাদি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা এই বঙ্গসন্তানকে কতদূর সম্মান করিতেন এবং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে কেমন করিয়া বন্ধুবৎসল সংসারচন্দ্র এত প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তির বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার সংসারচন্দ্র নিজ চরিত্রবলে, নিজের কঠোর সাধনায় যে প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিকলঙ্ক বশের উচ্চনিখরে আরোহণ

* বর্গকৃত সংসারচন্দ্র সম্বন্ধে বিখ্যাত 'পারো-নিয়রে' যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা গ্রন্থপরিশিষ্টে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। দেশের করেকজন বিখ্যাত ব্যক্তির পত্রও সেই সঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে,
আমরা দেখিতে পাই যে, সংসারচক্রে জীবন
নিম্নলিখিত সত্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-
হল—

“The heights of great men reached
and kept

Were not attained by sudden

flight ;

But they, while their companions

slept

Were toiling upward in the night.

(ক্রমশ)

অমৃতসর

(কাপিতেন রুড-লাকটেনের করাসী গ্রন্থ * হইতে)

১

এইখানে একটি অতি সুন্দর, অতি
মনোরম, ও পবিত্র নগর অধিষ্ঠিত ; অমৃতসর
শিখদিগের ‘রোম,’ খালুসাদিগের,—ঈশ্বর-
নির্বাচিতদিগের—মেকা। এইখানেই আমি
শিখদিগের ধর্মগ্রন্থ দেখিতে পাইলাম,
তাহাতে শিখদিগের অত্যুৎকৃষ্ট ধর্মমতগুলি
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

উজ্জল প্রভাত। চারিদিকেই জীবন-
চাক্ষুর একশেষ। স্বর্ণমন্দির দর্শনোদ্দেশে
জনতার মধ্য দিয়া অতিকণ্ঠে সহর অতিক্রম
করিলাম। সুন্দর সুন্দর উদ্যানের মধ্যস্থিত
দীর্ঘ বীথিগুলি অমৃতসর করিয়া, মস্তক-
গুজিত অসংখ্য বিপণির মধ্য দিয়া, পুরাতন
অমৃতসর অতিক্রমপূর্বক, অবশেষে পুণ্য-
সরোবরের তীরে উপনীত হইলাম। এইরূপে
বিবিধ গতি অতিক্রম করিয়া, এই পথটি

কেন্দ্রস্থলে আসিয়া—২০ লক্ষ শিখ যে গ্রন্থ
মানিয়া চলে, সেই গ্রন্থের অধিষ্ঠানভূমিতে
আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রথমেই উদ্যানের
একটি বহির্বেষ্টন; পরে, ইংরাজি কেতা-
অমৃতসরী ফুলের কেয়ারী-সমূহ, তাহার পর
পুরাতন দেশী সহর, তাহার পর পুণ্য-নগরী,
—এই নগরী অমৃত-সরোবরকে ঘিরিয়া
রহিয়াছে। সরোবরের মধ্যস্থলে, স্বর্ণমন্দির;
মন্দিরের ভিতর “গ্রন্থ সাহেব”।

সাদা কালো মার্বেল-প্রস্তরে নির্মিত
সমচতুষ্কোণ স্তম্ভীতল ঘাট সরোবরটিকে রমণীয়
করিয়া তুলিয়াছে। জনতার নগ্নদ্বর্ষণে মন্থণ
ঘাটের সানগুল। সূর্যালোকে ঝিক্ ঝিক্
করিতেছে! চারিদিকে বড় বড় বাড়ী ও
দেবালয়ের প্রাচীর হইতে সূর্য্যকিরণ দর্পণের
জ্বর প্রতিকলিত হইতেছে, এবং মন্দির-

* “A Travers L' Inde”—খৃঃ ১৯১৩ অব্দে প্রকাশিত।

গাত্র হইতে বিজ্ঞ কাকনদীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়া পরীদৃষ্টের জায় আলোক-উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

মন্দিরটি চমৎকার ; মনে মনে কল্পনা কর,—একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ইয়ারং, তল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত, বেশ অক্ষুন্ন অক্ষত, মধ্যস্থানে একটি ছোট গম্বুজ চূড়াদেশে স্থাপিত, চারি পার্শ্বে চারিটি ক্ষুদ্র কাক-বিশিষ্ট স্তম্ভের অটুচূড়া, তাহাতে আবদ্ধ ধাতব ঘণ্টিকা-গুলি জলন্ত আকাশতলে তীব্ররূপে ধ্বনিত হইতেছে। একটা প্রশস্ত বাঁধের উপর দিয়া তথায় উপনীত হইলাম—ইহা একপ্রকার সেতু, তীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত—‘মোজেরিক’-কাজ করা এই সেতু-পথের দুই ধারে খোদিত বারান্ডা ; ইহা বিচিত্র বর্ণের লঠনে বিভূষিত ; সেতুর যে প্রান্তটি ঘাটে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে হস্তিদন্তখচিত একটি জমকালো রৌপ্যময় দ্বার।

যে সোনার কথা বলিয়াছি, উহা মোটা সোনার পাত, এবং যে রূপার কথা বলিয়াছি ঐ রূপা তাঁবার মত ঢালাই করা। শিল্প-অলঙ্কারগুলি, দশপুঙ্খ-পরম্পরাগত শিল্প-কলার ও ধৈর্যের পরিচয় দিতেছে। সমস্ত ভায়ত ভ্রমণ করিয়া আমি এইরূপ কথা কচিং কখন বলিতে সমর্থ হইয়াছি।

সর্বজনপ্রশংসিত প্রাসাদ, প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির, মসজিদাদি, রাশি রাশি দেবমন্দির অনেক সময়ে আমাকে প্রতারিত করিয়াছে ! কোন পরমার্শ্চর্য্য ইয়ারং, বাহা কল্পনার অতুলনীয় বলিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, আসল জিনিসটা যখন দেখিলাম, তখন স্থূল বলিয়া মনে হইল :—(প্রাচীরগুলি পুরাতন

ইটের), কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তবৎ (চূণের পোঁচ দেওয়া, অন্নবিস্তার রং করা, সর্বত্রই চটা-উঠানো) বিশেষতঃ নির্দিষ্ট কালপ্রভাবে বিবম ভগ্ন-দশাগ্রস্ত।

কিন্তু এখানকার এই পরমার্শ্চর্য্য মন্দিরটি একটি রত্ন বিশেষ ; স্থান্যরূপে খোদিত, স্থান্যরূপে সন্নিবেশিত এবং যারপরনাই সমৃদ্ধ।

অভ্যন্তরে,—জরির কাজ-করা লাল মথ-মলের একটি চন্দ্রাতপ-তলে, কতকগুলি পুরোহিত একখানি গ্রন্থের চতুর্দিকে বসিয়া আছে। আমাদের ‘ফোলিও’ (Folio) আকারের গ্রন্থের অপেক্ষা চতুর্গুণ বড় এবং সেই অনুপাতে স্থূল। গ্রন্থখানি মেজের গালিচার উপর খোলা রহিয়াছে ; একটা জরির কাপড়ে উহার কিয়দংশ ঢাকা। মধ্যে মধ্যে, একজন পুরোহিত খাড়া হইয়া, কতক-গুলি শব্দ পাঠ করিবার জন্ত ঐ কাপড়ের একটি কোণ উঠাইয়া ধরিতেছে, তাহার পর আবার ভাঁজভাবে স্থানে পুনঃ স্থাপন করিতেছে। তিনজন বাদক,—দুইজন পাথোয়াজিয়া ও একজন সারেন্জী ; উহার বেশ একটি মনোরম ছন্দে অবিরাম বাজাইয়া বাইতেছে। ভক্তেরা নগে দলে আসিয়া ঐ বৃহৎ গ্রন্থের সম্মুখে ঘোড়হস্তে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণিপাত করিতেছে এবং সম্মুখে বিস্তৃত গালিচার উপর এক একটি মুদ্রাধণ্ড নিঃক্ষেপ করিতেছে। পাণ্ডনার অঙ্কটা মন্দ নহে। পরস্যা, আনা, টাকা অজস্র ব্যতিত হইতেছে। ইহার জন্তই কি, পুরোহিতেরা, বাদকেরা, ভক্তেরা, একরূপ সহাস্তবন্দন ও হর্ষোৎফুল্ল ? আমি ঘরের বে কোণটিতে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে ঘরের দৃশ্যটি অতি রমণীয়—ঘরটি স্বর্ণভূষণে ও

চিত্রাদিতে বিভূষিত। একটি সূর্য্যাম্বি
ভিত্তিকভাবে পতিত হইয়া, ধূপ-ধূনার
তরঙ্গায়িত লঘু ধূমরাশিকে উদ্ভাসিত করিয়া
তুলিয়াছে। যেন নিজ গৃহের মধ্যেই অধিষ্ঠিত,
এইরূপভাবে কপোতেরা পক্ষসঞ্চালন পূর্ব্বক
গৃহ-আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক
প্রান্তে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ভক্তেরা
যে রূপভাবে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতেছে,
সেই ভঙ্গিটিতে বেশ একটু শ্রী আছে।

যাহারা গ্রন্থকে ষ্মিরিয়া বসিয়াছিল, তাহার
মধ্য হইতে একটি পুরোহিত গাত্রোথান
করিয়া গভীর ভাবে সাদা ফুলের একটি মালা
আমাকে দিবার জন্য আসিল। তাহার সমস্ত-
বিন্যস্ত দীর্ঘ কেশকলাপ স্বক্কে উপর ঝুলিয়া
পড়িয়াছে, এবং দীর্ঘ শ্রুঙ্গরাঙ্গি তাহার বক্ষকে
চাকিয়া ফেলিয়াছে। ঐ মালা আমার
গলার পরাইয়া দিল—আমি নিবারণ করিতে
পারিলাম না। আর আমি নিবারণ করিবই
বা কেন? তাহার ভঙ্গিটি অতি সুন্দর
এবং আমি যে একটি টাকা গালিচার উপর
নিষ্কেপ করিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস, উহাই
এই শিষ্টাচারের একমাত্র কারণ নহে। আবার,
প্রধান পুরোহিতের তরফ হইতে সে আমাকে
একখণ্ড মিছরিও দিল, তাহাও আমি
আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম।

তাহার পর আমাদের মধ্যে বাক্যালাপ
চলিতে লাগিল। তাহাদের মন্দিরটি আমার
বড় ভাল লাগিয়াছে,—ইহা একজন দোভাবীর
মুখ দিয়া তাহাকে জানাইলাম। এই কথার
শ্রীত হইয়া, সে ঔৎসুক্য ও ভয়ভীর সহিত
আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি যুরোপীয়
কোন জাতিভুক্ত, আমার কি ব্যবসায়। সে

আমার ধর্ম্মের কথা পাড়িল এবং স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে
খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। “সাহেব, তুমি
আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ—আমাদের “আদিগ্রন্থ”—
দেখিতে আসিয়াছ? তুমি এই সকল গ্রন্থ
পাঠ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ; কেননা
এই সকল গ্রন্থের ভাষাপ্রয়োগ-পদ্ধতি বুঝিতে
পারে এরূপ লোক আমাদের মধ্যেও অতি
অল্প আছে। কিন্তু ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়;
কেননা, ঐ গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর অনেক কথা
লেখা আছে—সমস্তই ধ্রুপদ সত্য;—ঈশ্বর এক
ও অদ্বিতীয়; তাঁহাকেই আরাধনা করিতে
হইবে, কোন প্রতিমাকে নহে। আত্মা অমর,
ঈশ্বর পর্যান্ত উৎখিত হইবার জন্য, এই আত্মা
বহু জন্মের মধ্য দিয়া, যুগায়ুগি করিতেছে।
কেবল চিন্তাশুদ্ধির দ্বারাই তাঁহার নিকট উপ-
নীত হওয়া যায়। হৃদয় বিশোধিত হইলে,
ঈর্ষ্যাকে জয় করা যায়। রসনা বিশোধিত
হইলে, মিথ্যাবাদকে জয় করা যায়। চক্ষু
বিশোধিত হইলে, কামকে জয় করা যায়।
কর্ণ বিশোধিত হইলে, নিন্দাবাদকে জয়
করা যায়।

একণে সূর্য্য যথেষ্ট উজ্জ্বল উঠিয়াছে।
বাহিরে, এই সূর্য্যের প্রথম কিরণে, সর্বোবরটি
বিক্রমিক করিতেছে। এইবার একটু ত্বর
করিতে হইবে; অটলের ধ্বজমন্দিরটি
দেখিতে বাইতে হইবে। এখান হইতে খুব
নিকটে। ঐ ধ্বজমন্দির হইতে এক দৃষ্টিতে
সমস্ত সহরের দৃশ্যটি দেখা যায়। এই
ধ্বজমন্দিরটি দুই উদ্দেশ্যে নিৰ্ম্মিত হয়।
ইহা নানকের সমাধি-মন্দির এবং অটলের
স্মৃতিমন্দির। এই অটল, এক শিশুর
বিনিময়ে আপনাতঃ প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল।

উহার উপর হইতে—প্রায় ১২৫ হস্ত পরিমাণ উচ্চ—দৃশ্যটি পরীদৃশ্যের জ্ঞায়। প্রথমই দর্শকের দৃষ্টি স্বর্ণচূড়ার উপর আসিয়া নিপতিত হয়। শুভবর্ণ সরসী ৩লের মধ্যস্থলে উহা স্নান-পীতবর্ণ বলিয়া অঙ্গভূত হয়; এবং ঐখান হইতে বীধিগুলি, সরোবর-অভিমুখী পথগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পথগুলি,—চিত্রের পশ্চাদ্ভূমির জায় ঘন-ঘোর উদ্ভিজ্জরাশি হইতে বাহির হইয়া এই পুণ্যনগরীর প্রাচীরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

কোথাও কোথাও, ধনবান্ শিখদিগের বাগান বাড়ী দেখা যাইতেছে; উহারা উৎসবদির সময় ঐখানে কয়েক দিবস অতি-বাহিত করে। কোথাও বা গৃহের সমতল ছাড়াইয়া মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে; কোথাও বা একটি মসজিদ; আর একটি সরোবর; আরও দূরে একটি অসমান-আকৃতি চত্বর; কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্বর্ণমন্দিরটির উপরেই দর্শকের ঔৎসুক্য সতত কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে;—রত্নাধারের মধ্যে যেন একটি সুকুমার বহুমুলা রত্ন নিহিত।

২

অমৃতসর হইতে ছাড়িবার পূর্বে, এখান-কার কোন সুন্দর স্থিতিচিহ্ন, বা কোতুক-সামগ্রী বা কোন টুকি-টাকি দ্রব্য সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিরাছি। আমার পরিচারক (boy) গালিচা ও পুরাতন জিনিসের দোকান্দার চব্বা-মলের নাম করিল।

আমরা তখনই সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম; আমার ‘বর’ একটা দরজা ঠেলিয়া খুলিল; আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

চূণ-কাম করা দুটি ছোট ঘর,—প্রায় খালি। আমাদের দোকানের টুকি-টাকি দ্রব্য স্রবণ করাইয়া দেয়,—এখানে এমন কিছুই নাই; দেয়ালের ধারে লম্বালম্বি, গোটানো গালিচাগুলি সাজান রহিয়াছে। একটা খোলা আলমারীতে কতকগুলি “কৌতুক-সামগ্রী” (curiosities); একটা কোণে, টেবিলের উপর, একটা বড় বুদ্ধমূর্তি গৃঢ়মর্থ সূচক পদ্মের উপর উপবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দেশ করত জীবৎ হাশু কারতেছে।

আমাকে দেখিয়া, তিনটি বালক অগ্রসর হইল; ইহারা চণামলের মুহুরী;—নতনেত্রে, যোড়হস্তে, শোভনভাজতে একটু নতকায় হইয়া, আমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতে লাগিল; এবং সাদর সঙ্কেতে আমাকে দ্বিতীয় ঘরটিতে আসিবার জন্ত আহ্বান করিল। চম্বামল ঐ ঘরে থাকেন।

লোকটি স্থলকায়; একটা আরাম-কেন্দ্রারায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে এবং গড়্গড়ার দীর্ঘ নল মুখে দিয়া তামাক সেবন করিতেছে। এক ক্ষুদ্রকায় মুসলমান তাহাকে পাথার বাতাস করিতেছে; এবং আর দুইজন তাহাকে আমোদ দিবার জন্ত বাস্ত বাজাইতেছে।

অবশ্য এই নাট্যদৃশ্যটি পূর্ণ হইতে আরোজন করিয়া রাখা হয় নাই। কাল-কর্ম্ম করিবার কি মধুর রীতি! আমাদের যুরোপের বণিকেরা তাহাদের অমৃতসরের সহযোগীকে দেখিয়া কত না জীব্যা করিবে!

স্থলকায় লোকটি আমাকে দেখিতে পাইয়া, একটু হাসিমুখে আমার দিকে মুখ

কিরাইল। এ কি! লোকটা, ওর বুদ্ধমূর্তিরই মত যে কুৎসিত।—সে ইংরাজিতে বলিল :—

—Step in, Sir .you will see my shop? I feel quite honoured. This way...please to follow me ..

অপ্রত্যাশিত লঘুগতি-সঙ্গারে চম্ভামল, তাহার গালিচা-কারখানার মধ্য দিয়া, আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। আহা! কি সুন্দর দৃশ্য! ...একটি সঙ্ক গলি-পথ, ১০০ হাতের কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ; বামদিকে একটি দেয়াল, দক্ষিণে অসংখ্য ধোপের মত ঘর, সেইখানে গালিচার তাঁতগুলি ঝাড়া রহিয়াছে; প্রত্যেক তাঁতের সম্মুখে ৪৫ জন অল্পবয়স্ক লোক—বালক ও বালিকা—বসিয়া আছে। এক প্রকার নিস্তব্ধ কর্তৃত্বপূর্ণতা ঐ সকল মানব-যন্ত্রদিগকে ঘেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে। কার্যপ্রকরণটি বড়ই কোভুকা-বহ; প্রত্যেক ধোপে, প্রধান কারিগর অনুল্লস্বরে একটা আদেশবাক্য উচ্চারণ করিতেছে; তাহার অর্থ,—“একটা লাল পংক্তি”, “একটা নীল পংক্তি”, এবং তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ কারিগরদিগের কর্তৃক পালিত হইয়া মূল-নকশাটা অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের প্রণালী স্বতন্ত্র; আমাদের কারিগরেরা একটা স্থূল ধরণের নমুনা চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তাহারই অনুসরণ করে।

উহাদের কার্যপ্রকরণ দেখিবার সময়, দর্শক আর কোন দিকে মন দিতে পারে না; উহাই দর্শকের মনকে ঘেন গ্রাস করিয়া ফেলে। এই তান্ত্রবর্ণ সঙ্ক-সঙ্ক আঙ্গুলগুলির ক্ষিপ্ৰকারিতা দর্শককে ঘেন মগ্নমুগ্ধ করে। উহাদের মধ্যে খুব ছোট-ছোট ছেলেও আছে, তাহারা ভারী গম্ভীর ও কার্য-গৌরবে গর্ভিত।

— ... কিন্তু চম্ভামল, এই গালিচা-গুলি দেখিতে কদাকার...

—তা’সঙ্গেও আমি ত সাহেব খুব উচ্চ-মূল্যে—বিশেষত বিলাতে—এইগুলি বিক্রয় করি; এই দেখ, আজই রাত্রে এই তিন বাক্স প্যারিসের জন্ত চালান হইবে। প্রতি সপ্তাহে অতগুলি করিয়া বাক্স প্যারিসের বড় বড় দোকানে পাঠাইয়া থাকি...

...একই কথা! তার চেয়ে, পারস্যের পুরাতন গালিচার নকল কর না কেন তোমরা? পারস্যীক গালিচার রং-এর কেমন সামঞ্জস্য, কেমন মাধুর্য; দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, ও তাহার উপর বসিয়া ঈশ্বর-আরাধনা করিতেও বেশ। এই রকম মূঢ় ধরণের গালিচার বসিয়া তুমি কি ধ্যানধারণা করিতে পার?

—না সাহেব, তা পারি না! ...কিন্তু ও জিনিস নকল করিতে ক’খরচ পড়ে। আচ্ছা যদি পছন্দ না হয়, আমার ও-গুলি রেখে, এইগুলি লও। এই গালিচাগুলি সার্থবাহেরা কাবুল ও পেশোয়ার পর্যন্ত আনিয়াছিল;—খুব পুরাতন; অনেক লোকের হাঁটু উহাতে পড়িয়াছে...এই দেখ। এই ছোট হলদে গালিচা, আর এই লাল গালিচা,—মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র... ...

অনেক কথার পর, অবশেষে আমি ত্রিশ টাকা মূল্যে ঐ দুইটি গালিচা লইলাম। ত্রিশ টাকার বিনিময়ে এমন চমৎকার বেমালুম-মিশ্রিত রং-এর পুরাতন জিনিস—সে হিসাবে মূল্য বাস্তবিকই খুব কম। তাহার বুদ্ধেরই মত দেখিতে সেই চম্ভামল, আর আমি—আমরা দু’জনেই প্রীত হইলাম...

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

“বলভাষা ও সাহিত্য,” “সামান্য কথা,” “বেহালা,” “সুন্দর,” “শ্রী” প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. সম্পাদিত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স প্রকাশিত

কলিকাতার কলকাতা অফিস—কাবোয় কলকাতা—সত্যমিতার প্রসঙ্গ

কাশীদাসী মহাভারত

ভারতের বালকবৃদ্ধবনিতার একমাত্র অবশ্যপাঠ্য পুস্তক

সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত

সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কাশীদাসী-দাস প্রণীত মহাভারত দেশী এণ্টিক কাগজে বড় বড়
অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বাজারের খেলো সংস্করণ নহে। যেমন
কাগজ, তেমন ছাপা, তেমন বাঁধাই। বাহিরের আকার অতি মনোহর—
কাগজের উপর রূপায় ছাপা অক্ষরের রং শ্রীকৃষ্ণ-সারথি সহ বক্ বক্
করিতেছে। অভ্যন্তরের সজ্জা আরও মনোমুগ্ধকর। তিন খানি ত্রিবার্ণ
মুদ্রিত ও ছাব্বিশ খানি একবার্ণে মুদ্রিত ছাফটোন চিত্রে সুশোভিত।
ছবিগুলি সমস্তই দেশের সর্বপ্রথম শিল্পীগণ কর্তৃক অঙ্কিত। প্রত্যেক
চিত্রের পরিকল্পনাই অতিমনোমুগ্ধকর। আর তের শত পৃষ্ঠার
সম্পূর্ণ।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স,

৩৫ নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা

জমিদারী ট্রেনিং কলেজ

৬৬ নং সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

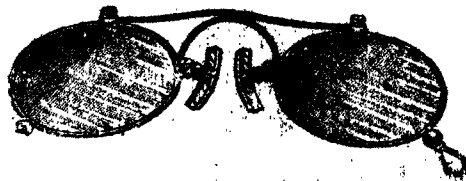
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৩১৮ সাল প্রাপ্ত জন্মদিনীতে
 প্রতিষ্ঠিত ও মহারাজা নাটোরপ্রমুখ বহু রাজা জমিদার মহোদয়গণের সহায়ত্বাধীনে প্রাপ্ত।

এই কলেজে জমিদারীর সর্বপ্রকার কাগজপত্র, সার্ভে, নকশা, জরিপ, জমাবন্দি ও
 বন্দোবস্ত প্রভৃতির কার্য ও আইন শিক্ষা দেওয়া হয়। সুহৃদগণের হইতে ম্যানেজারি পর্যন্ত
 বৃত্তীয় শিক্ষা এখানে হাতে কলমে দেওয়া হইয়া থাকে। দুই বৎসরে পাঠ সমাপ্ত হয়।
 আইকোর্টের অভিজ্ঞ কয়েকজন উকিল, কয়েকজন বহুদর্শী ম্যানেজার ও সার্ভে অভিজ্ঞ
 ব্যক্তি অধ্যাপনা করান। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পড়ান হয়। উচ্চশিক্ষিত ছাত্রেরা ইচ্ছা
 করিলে এক বৎসরে পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন। আগষ্টমাসে 'সেশন' আরম্ভ হয়।

প্রবেশিকা-ফি তিন টাকা ও মাসিক বেতন তিন টাকা। বাহারা এক বৎসরে পাঠ
 শেষ করিবেন, তাঁহাদের বেতন চারি টাকা। প্রবেশ-ফি ৫/-। জমিদার মহোদয়গণের
 উদযোগিকারি-ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত আছে। বিস্তারিত বিবরণ
 জানিবার জন্য অর্ক আনার্দ্ গ্যাম্পসহ সেক্রেটারীকে ২০নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতার চিঠি
 দিখিতে হইবে।

এস্ মফুমদার,

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা



সম্রাটনী বলেন যে অনেকই আমদানিগত ভাল পোষালের চসমা কোথায় কিনার হয়
 দস্তাগা করেন; আমরা রায় মিত্র কোংকেই বিশেষরূপে জানি, তাঁহাদের কথাও বা কানও
 নাই। সুতরাং ভাল চসমা খরিন করিতে হইলে, উক্ত বিবাসযোগ্য কোংকে নির্দেশ
 দিয়া থাকি।

মকমলসহ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স এবং দিবালাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে
 পান এবং কোনরূপ চসমা ব্যবহার করেন কি না, লিখিলে ভিঃ শিতে চসমা পাঠান
 য়। দরকার হইলে ১০/- টাকা ডিঃজিট রাখিয়া চক্ষু পরীক্ষার বস্ত্রও পাঠান হয়।
 চিত্র মূল্য তালিকা চাহিলেই ডাকে প্রেরিত হয়।

রায় মিত্র এণ্ড কোং

২০ নং রাইট স্ট্রীট, কলিকাতা;—ব্রাহ্ম বোকান—পাহুরটলি, ঢাকা।

৩৪ নং মেছুয়াবাড়ার স্ট্রীট, মেট্রিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ স্ট্রীট

ঐআজ্ঞাতোর কল্যাণাধার দ্বারা মুদ্রিত।

ত্রয়োদশ বর্ষ]

অগ্রহায়ণ, ১৩২০

[৮ম সংখ্যা]

বঙ্গদর্শন

(নব পর্য্যায়)

মাসিক পত্র



শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

কলিকাতা, ২০ নং কণ্ডিয়ালিস্ স্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে এন্ড মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ।

বর্তমান সংখ্যার মূল্য ১/০

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩০/০

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের
দেশীয় সালস।



পারদ ও রক্ত দুষ্টির মহৌষধ ।

স্বরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি, ঘা, ফোড়া, বাতরক্ত, আমবাত ও পারদ জন্ম রক্তদুষ্টি, প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়, এই মহা তেজস্কর দেশীয় সালস। সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ইহার প্রত্যেক মাত্রাই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার করে।

মূল্য এক শিশি ১৫০ দেড় টাকা। ভি পিতে লইলে মোট ২/০ আনা।

জবাকুসুম তৈল।

শিরোরোগের মহৌষধ ।



যাঁহাদের অল্প পরিপ্রমেই মাথা ধরে, মন স্থির থাকে না, কাজের সময় মাথা গরম হইয়া ভুলচুক হয়, তাঁহাদের পক্ষে জবাকুসুম তৈল বিশেষ উপকারী। জবাকুসুম তৈল কেশের অকালপকতা ও উঠিয়া যাওয়া নিবারণ করে। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ অভুলনীয়। মহারাজা-ধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈলের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্ত মহিলাগণ অতি আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন।

এক শিশির মূল্য ১/ এক টাকা। ডাকমাণ্ডল ১/০ পাঁচ আনা।

মকম্বলহ রোগিগণ নিজ নিজ রোগের বিবরণ লিখিলে বিনামূল্যে ব্যৱস্থা প্রেরণ করা হয়।

তিন শিশির মূল্য ২৫০ এগার টাকা। ডাক মাণ্ডল ১০/০ আনা।

সি, কে, সেন কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

সিটি ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

হেড্ আপিস ৭ নং সোয়ালো লেন, রাধাবাজার, কলিকাতা।

মাসিক টাঁদা শ্রেণীভেদে—২১, ১১ ও ১০ আনা।

কয় প্রকার বীমা— দুই প্রকার

জীবন বীমা ও বিবাহ বীমা।

ছয় মাসা মাত্র টাঁদা দিবার পর বিবাহ স্থির হইলেই দেয় টাঁদার দ্বিগুণ ও বাৎসরিক হিসাব নিকাশান্তে আরও টাকা পাওয়া যায়।

জীবন বীমায় ১ বৎসর পরে মৃত্যু ঘটিলে বা ১০।১২ বৎসর জীবিত থাকিলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ‘ক্লেম’ পাওয়া যায়।

এই কোম্পানী সঞ্চয় বীমার শ্রেষ্ঠ কোম্পানী! সর্বত্র দক্ষ ও সাধু এজেন্ট আবশ্যক
ঠিকানা—

দি পাইওনিয়ার এজেন্সী কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্,

৭ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

১৩শ বর্ষ]

বঙ্গদর্শন

[অগ্রহায়ণ, ১৩২০

সূচী

বিষয়	লেখকের নাম	পত্রাঙ্ক
১। নিমাই-চরিত্র ...	শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়, বি,এ ...	৫৮০
২। উপলা (উপত্যাস) ...	” ভবানীচরণ ঘোষ ...	৫৮৭
৩। বেহার-চিত্র ...	,, যশোজ্যোতীনাথ গুপ্ত ...	৫৯৬
৪। দুর্ভাগ্যের কাহিনী ...	” সুধীরচন্দ্র মজুমদার ...	৬০৫
৫। রেখা-চিত্র ...	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬১৭
৬। রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র	৬২০ (খ)
৭। প্রার্থনা ...	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬২০ (চ)
৮। পূর্ব রাগ ...	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ...	৬২২
৯। স্বর্গীয় জগদীশনাথ কর	৬৫৫
১০। জিজ্ঞাসা	৬৫৬

মেট্রিকাল্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত এবং

৬ ও ৭ ফর্মা—মেট্রিকাল্ পেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র

অধিকারী দ্বারা মুদ্রিত।

গুলিক্সারপেপেন

পেপের তরল সারাংশ ।

পেপাগ্নিন্ সংযোগে এই অভিনব ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে । ইহার দ্বারা জীর্ণক্ষুধা শক্তির বৃদ্ধি ঘটে এবং পোটিড্ খাদ্য দ্বাৰা সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে । অজীর্ণতা, পাকশয়ের দুৰ্বলতা ও পিত্তবিহীনতায় ইহা বিশেষ উপকারী । মূল্য এক শিশি ৮০/০ আনা ।

জামের বাঁচির তরলসার

(বহুমূত্র রোগের মহৌষধ ।)

সর্শকর বহুমূত্র অর্থাৎ যে বহুমূত্রের মূত্রে শর্করা থাকে, তাহাতে ইহা ফলপ্রদ । জামের বাঁচির তরলসার হইতে ইহা প্রস্তুত ; ইহা কিছুদিন সেবনে দুৰ্বলতা, মাথাধরা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ বিদূরিত হয় । এক শিশির মূল্য ৮০/০ আনা ।

কালমেঘের তরলসার

যকৃতের দোষ ও পুরাতন জ্বরের মহৌষধ ।

কালমেঘ অগ্নিবদ্ধক ও ঈষৎ রেচক । পূর্বের গৃহিণীগণ ছেলেদের জ্বর ও যকৃতের দোষের জন্য ইহারে “আলুই” করিয়া থাওয়াইতেন ; আমরা ইহার তরল সারাংশ ব্যবহার করিয়া সমধিক ফল পাইতেছি । যেখানে অজীর্ণতা, যকৃতের দোষ এবং শিশুযকৃত রোগের সন্দেহ থাকে, সেখানে ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইলে, নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করে ।

এক শিশির মূল্য ১০/০ আট আনা ।

কুর্চির তরলসার

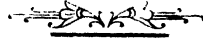
(রক্তামাশয়ের মহৌষধ ।)

আয়ুর্কেদ মতে ইহা অগ্নিদীপক ও আমদোষ এবং অতিসারদোষ নাশক । রক্তামাশয় রোগে ইহার তরলসার উৎকৃষ্ট ঔষধ, এ কথা পাশ্চাত্যদেশের চিকিৎসকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন । আমাদের এই ঔষধটি রক্তামাশয়, অতিসার রোগে বড়ই ফলপ্রদ । রোগের পুরাতন ও নতন উভয় অবস্থায় ব্যবহার্য্য । এক শিশির মূল্য ১/০ এক টাকা ।

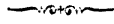
বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা ।

বঙ্গদর্শন



নিমাই-চরিত্র



চতুর্বিংশ অধ্যায়

গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন, গৌরের বৃন্দাবনযাত্রা, শাস্তিপুৰ-গমন,
রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ, রঘুনাথ দাসের সহিত সাক্ষাৎ

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গৌরের আবাসে উপস্থিত
হইলে, গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কোথা
হইতে আসিলেন?”

অদ্বৈত—জগন্নাথ দেখিয়া আসিতেছি।

গৌর—আপনি জগন্নাথ দর্শন করেন
কিরূপে বলুন দেখি।

আচার্য্য—কেন, দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ
করি।

গৌর—আমি ওরূপভাবে ঠাকুর দেখি
না। প্রদক্ষিণ করিলে কিছুক্ষণ ঠাকুরের
মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ক্ষণেকের
অদর্শনও সহ্য করিতে পারি না। তাই
প্রদক্ষিণ না করিয়া অপলক নয়নে ঠাকুরের
মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

এইরূপ নানা আলাপে গৌর গৌড়ীয়
ভক্তগণের সহবাসে চারিমাস কাটাইলেন।
এ চারিমাস ভক্তগণের বড় সুখেই অতিবাহিত
হইল। তাঁহারা একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া
সকলেই গৌরকে খাওয়াইলেন। গৌর তাঁহা-

দিগের সহিত নিত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার
করিতেন। চারি মাস তিনি তাঁহাদিগের
সহিত নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিলেন;
জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহাদিগের সহিত গোপীবেশ
ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিলেন; বিজয়া
দশমীর দিন তাঁহাদিগকে বানর সাজাইয়া ও
নিজে হনুমান্ সাজিয়া রামলীলা অভিনয়
করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহবাসে গৃহের
কথা ভুলিয়া রহিলেন।

অবশেষে বিদায়ের দিন সমাগত হইল।
ভক্তগণ শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। গৌর
সুমিষ্ট বচনে সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া
কহিলেন, “তোমরা সকলে প্রতি বৎসর
রথযাত্রার সময় আসিয়া চারিমাস আমার
সহিত নীলাচলে অবস্থান করিবে; এখন দেশে
ফিরিয়া যাও।” অদ্বৈতাচার্য্যকে কহিলেন,
“আচার্য্য, দেশে তোমার জগৎ প্রচুর কণ্ঠ
পড়িয়া আছে; তুমি দেশে ফিরিয়া গিয়া
আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ কর।” নিত্যা-

নন্দকে কহিলেন, “নিতাই, তোমাকে গৌড়-দেশে যাইতে হইবে। রামদাস, গঙ্গাধর প্রভৃতি ভক্তকে সঙ্গে লইয়া তুমি তথায় প্রেমভক্তি-প্রচারের ভার গ্রহণ কর।” অতঃপর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “শ্রীবাস, তোমার প্রাঙ্গণ আমার নিত্য-বিহারভূমি। আমি প্রত্যহ তথায় নৃত্য করিব; কিন্তু তুমি ভিন্ন কেহ আমার দেখিতে পাইবে না।” একথানা বস্ত্র, শ্রীবাসের হস্তে দিয়া কহিলেন, “আমার মাতাকে এই বস্ত্র দিয়া বলিবে, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে আমার ধর্ম্মনাশ হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি। মাঝে মাঝে তাঁহার চরণ-দর্শনাভিলাষে আমি তাঁহার নিকট যাই। কিন্তু তিনি দেখিতে পান না। একদিন নানাবিধ আহাৰ্য্য প্রস্তুত করত ইষ্টদেবতাকে নিবেদন কালে আমাকে স্মরণ করিয়া তিনি কাদিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতে পারিয়া, সেই আহাৰ্য্য ভক্ষণ করিয়া আসিয়া-ছিলাম। তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বালগোপাল তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল; তাঁহাকে বলিও আমিই গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম।” শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন। মুকুন্দ ও নরহরি দুই সহোদর। গৌর হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে কহিলেন, “মুকুন্দ, তুমি রঘুনন্দনের পুত্র না রঘুনন্দন তোমার পুত্র?” মুকুন্দ কহিলেন, “রঘুনন্দন হইতেই আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি। সুতরাং রঘুনন্দন পিতা, আমরা তাহার পুত্র।” তখন গৌর কহিলেন,

“মুকুন্দ ছিলেন স্নেচ্ছরাজার বৈষ্ণৱ। একদিন এক ভৃত্য স্নেচ্ছরাজার মাথার উপর এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী ধরিয়াছিল। মুকুন্দ সেই শিখিপুচ্ছ দেখিয়াই মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। মুকুন্দের মত ভক্ত বিরল।” কিন্তু মুকুন্দ ও রঘুনন্দনকে গৃহস্থান্ত্রমে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গৌর আদেশ করিলেন। নরহরি তাঁহার নিকট থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া গৌর ভক্তগণকে কহিলেন, “মুরারির ভক্তি অনন্ত-স্বলভ। ইনি রঘুনাথমন্ত্রের উপাসক। একদিন আমি তাঁহাকে বারবার বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের ভজনা করিতে মত লওয়াইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়া কিরূপে তিনি রঘুনাথের সেবা ত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইলেন। সমস্ত রাত্রি কাদিতে কাদিতে গেল,—পরদিন প্রত্যুষে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, “আমি রঘুনাথের চরণে মাথা বেঁচিয়াছি। তাহা আর ফিরিয়া লইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? তুমি দয়া করিয়া এইরূপ কর—যেন আমি এখন তোমার সম্মুখে মরিয়া এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই।” এই ঐকান্তিকী ভাঙ দেখিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, “শুভ, তোমার ভজনই সার্থক। প্রভুচরণে তোমারই মত দৃঢ়প্রীতি প্রভুর গ্রাহ্য। প্রভু যদি পদ ছাড়াইয়া নিতে যান, তবু সে পদ ছাড়িয়া দিতে সেবক পারে না। আমি পরীক্ষা করিবার জন্তই তোমাকে রঘুনাথমন্ত্র ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। তুমি সাক্ষাৎ হুমানু—তুমি

কেন শ্রীরামের চরণ ত্যাগ করিবে।” তখন বাসুদেবকে আলিঙ্গন দিয়া গৌর তাহাও গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—

“জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার,
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে,
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লইয়া মুক্তি করোঁ নরকভোগ,
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।”

গৌর কহিলেন, “ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কখনও ভক্তবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। তুমি যখন ব্রহ্মাণ্ডের জীবের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তখন সকলেই উদ্ধার লাভ করিবে।”

কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরচরণে প্রণাম করিয়া ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কানীশ্বর গৌরের সহিত নীলাচলে রহিলেন।

ভক্তগণ প্রস্থান করিলে সার্কভোম একদিন গৌরকে মিনতি করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে মাংসাবধি ভিক্ষা করিতে হইবে।” গৌর কিছুতেই রাজী হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিনের জন্ত নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ করিলেন। সার্কভোম-গৃহিণী পরম যত্নে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া গৌরকে পরিবেশন করিলেন। অত্যধিক প্রীতিবশতঃ অত্যধিক দ্রব্য গৌরের পাত্রে পরিবেশিত হইল। গৌর তাঁহাদের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া ভোজনে বসিলেন। এমন সময় সার্ক-

ভোমের জামাতা, তাঁহার কন্যা ষাঠীর স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য্য ভোজনগৃহের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “বাপরে খাওয়া দেখ, ১০।১২ জনের ভাত সন্ন্যাসীটা একা খাচ্ছে।” সার্কভোম এই কথা শুনিয়া ক্রোধাক্ত হইলেন এবং একলাটি হস্তে লইয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্ত ধাবিত হইলেন। অমোঘ পলাইয়া গেল। সার্কভোম-গৃহিণীও জামাতার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন “অমন পাষাণের জ্ঞী হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, ষাঠী বিধবা হউক।” গৌর হাসিতে হাসিতে তাহাদের ক্রোধ শান্তির জন্ত নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বজনকর্তৃক প্রভুর অপমান হইল ইহা ভাবিয়া সার্কভোম মহা দুঃখিত হইলেন। ভোজনান্তে সার্কভোম গৌরকে গৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন জামাতার আর মুখদর্শন করিব না। এদিকে অমোঘ পলায়ন করিয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই রাত্রিতেই তাহার বিস্মৃতিকা রোগ হইল। গৌর সেই সংবাদ শুনিয়া দ্রুত তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাহাকে নানা-বিধ উপদেশ দিয়া অবশেষে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। অমোঘ নিরাময় হইয়া পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে গৌর রামানন্দ ও সার্কভোমের নিকট বৃন্দাবন গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা বিচ্ছেদাশঙ্কায় কহিলেন—“সম্মুখে রথযাত্রা, রথযাত্রার পরে গমন করিও।” রথযাত্রা অতিক্রান্ত হইলে গৌর স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় ব্যক্ত করিলেন।

তখন তাঁহারা কহিলেন—“কার্তিক মাসে
যাইও।” কার্তিক মাসে দ্রুস্ত নীত বলিয়া
আপত্তি হইল। এইরূপে চারি বৎসর গেল।
পঞ্চমবৎসরে গৌর দৃঢ়ভাবে স্বীয় সংকল্পের
কথা ব্যক্ত করিলেন। এবার আর ওরূপ
আপত্তির কোনও ফল হইল না। বিজয়া
দশমীর পর দিন গৌর বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে পুরী
ত্যাগ করিলেন। কটকে রাজা প্রতাপরুদ্র
তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার গমনের
সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। রামানন্দ,
স্বরূপ-গদাধর ও অগ্র কয়েকজন বিশিষ্ট
ভক্ত কটক পর্য্যন্ত গৌরের সঙ্গে আসিয়া-
ছিলেন। কটক ত্যাগ কালে গৌর গদাধরকে
পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া
কহিলেন—“তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ।
তাহা ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসা
তোমার অকর্তব্য।”

পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥
প্রভু কহে, ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে, কোটিসেবা তৎপাদদর্শন ॥
প্রভু কহে, সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥
পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর ॥
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর।

গদাধর গৌরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী
চলিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে ডাকিয়া
তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গৌর কহিলেন—
“আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ স্মৃথ,
তোমার হই ধর্ম্ম যার আমার হয় দুঃখ ॥
মোর স্মৃথ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥

বলিয়া গৌর নৌকায় আরোহণ করিলেন।
গদাধর মুচ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন।
সার্বভৌম তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া
পুরী লইয়া গেলেন। রামানন্দ যমুনা পর্য্যন্ত
গৌরের সঙ্গে গিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ
করিলেন। গৌর উড়িষ্যা দেশের সীমা অতি-
ক্রান্ত হইবার পরে, বঙ্গদেশীয় এক যবন-রাজা
তাঁহার অলৌকিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া
তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার
নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন।
যবনরাজ পিছলনা পর্য্যন্ত গৌরের সহিত
গমন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন।
গৌর অবশেষে পাণিহাটি গ্রামে উপ-
স্থিত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন
অবস্থান করিলেন। তথা হইতে কুমারহট্টে
শ্রীনিবাসের গৃহ হইয়া শিবানন্দ সেনের
গৃহে ও তৎপরে বাসুদেবের গৃহে গমন
করিলেন। অনন্তর সার্বভৌম-ভ্রাতা বিজ্ঞা-
বাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইয়া পথশ্রান্তি
অপনোদন করিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ
চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে
লোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে বিজ্ঞাবাচস্পতির
গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৌর গৃহমধ্যে
ছিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখাইবার জন্ত
বিজ্ঞাবাচস্পতির চরণ ধরিয়া কাকূতি করিতে
লাগিল। গৌর বাহিরে আসিলেন—তখন
তাঁহার হই নয়নে অবিরল জলধারা, মুখে
হরিশব্দ, হই হস্ত উত্তোলিত। ভক্তগণ সে
মূর্ত্তি দেখিয়া পাগল হইল। সকলে তাঁহাকে
বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল,
এবং লক্ষ কণ্ঠ হইতে “পাপিষ্ঠ আমাকে উদ্ধার
কর” যুগপৎ এই প্রার্থনা সমুখিত হইল।

“শ্রীকৃষ্ণে মতি হউক” বলিয়া গৌর সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল এবং গৌরকে দেখিবার জন্ত উন্মত্তের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই জনতার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে গৌর এক রাত্রিতে পলায়ন করিয়া কুলিয়া গ্রামে গমন করিলেন। পরদিন অগণিত লোক আসিয়া যখন শুনিল গৌর পলায়ন করিয়াছেন—তখন প্রথমে তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিল না; অবশেষে সকলে বিত্বাচম্পত্যিকৈ তিরস্কার করিতে লাগিল। বাচম্পতি লোকস্বখে শুনিয়াছিলেন যে গৌর কুলিয়া গমন করিয়াছিল। তিনি সেই কথা বলিয়া সকলের সমভিব্যাহারে কুলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌর কুলিয়ার মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সকলে তথায় তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। কুলিয়ার কয়েক দিন অবস্থানপূর্বক গৌর বহুলোককে হরিনাম দান করিলেন। এইখানে দেবানন্দ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব অপরাধের জন্ত ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। গৌর তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিয়া ভাগবত অধ্যাপনা করিবার আদেশ করত বিদায় দিলেন।

কুলিয়া হইতে গৌর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। পুত্রবিধুরা শচীদেবী আসিয়া তথায় পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কতিপয় দিবসান্তে গৌর গৌড়নগরের সম্মিহিত রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া অসংখ্য নরনারী তাঁহার দর্শনাশায় তথায় উপনীত হইল।

হোসেন সাহ তখন গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। গৌরের রামকেলি আগমন বাদশাহের কর্ণগত হইল। বাদশাহ তাঁহার হিন্দু অমাত্যদিগকে গৌরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হিন্দুসভাসদৃগণ প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন। হিন্দু-বিদ্বৈষী যবনরাজ পাছে সন্ন্যাসীর কোনও অনিষ্ট সংকল্প করেন এই ভয়ে তাঁহারা কহিলেন, “কোথাকার এক ভিখারী সন্ন্যাসী তীর্থে চলিয়াছে, তাহার সহিত দুই গরি জন লোক আসিয়াছে। বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন গুণ তাহার নাই।” কিন্তু গৌরের কথা শ্রবণ করিয়া বাদশাহের মনে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি কাজী ও কোটালগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন—যেন তাঁহার প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার অহুষ্ঠিত না হয়। এই হোসেন শাহই উড়িষ্যায় বাহুবলমুর্তি ভগ্ন ও মন্দির বিদ্বস্ত করিয়াছিলেন।

বাদশাহের ব্যবহারে হিন্দুসভাসদৃগণ প্রীত হইলেন, কিন্তু অস্থিরমতি রাজা কখন স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করে, এই ভয়ে তাঁহারা গৌরের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে দ্বারায় রামকেলি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। গৌর তাঁহাদের উপদেশ অবলোকে করিয়া তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিলেন।

বাদশাহের হিন্দুপারিষদগণের মধ্যে রূপ ও সাকর মল্লিক নামক দুই সহোদর ছিলেন। সাকর মল্লিক দবীর-খাস পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বহু পূর্বেই গৌরের নবদ্বীপলীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাকর কয়েক বার কয়েকখানা চিঠিও গৌরকে

লিখিয়াছিলেন। গৌরের রামকেলি অবস্থান-
কালে একদিন দুই ভ্রাতার আসিয়া তাঁহার
চরণে প্রণত হইলেন, এবং নানা প্রকার দৈন্ত
প্রকাশ করিয়া তাঁহার রূপাভিক্ষা করিলেন।
সাকর নানাবিধ স্তব করিয়া কহিলেন—

শ্লেচ্ছজাতি শ্লেচ্ছসেবী করি শ্লেচ্ছকর্ম
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।
মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া,
কুবিষয় বিজ্ঞাগর্ভে দিয়াছে ফেলিয়া।
আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজ বল,
পতিতপাবন নাম তবে সে সকল।

তখন—

শুনি মহাপ্রভু কহেন, শুন দবীরধাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥
আজি হৈতে দৌহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্ত ছাড় তোমার দৈন্তে ফাটে মোর মন ॥
দৈন্তগজী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সেই পত্র দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহি বারে বারে ॥
পরবাসিনী নারী বাগ্রাপি গৃহকর্মস্থ।
তদেবাগাদয়তাস্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥

পরপুরুষে আসক্ত নারী গৃহকর্মে ব্যাপ্ত
থাকিয়াও মনে মনে জারসঙ্গ-জনিত স্নেহেরই
আশ্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনন্তর গৌর কহিলেন “আমি তোমা-
দিগকে দেখিবার জন্তই এখানে আসিয়াছি—
নহিলে গোড়ে আমার কোনও প্রয়োজন
ছিল না। তোমরা বহু জন্ম বাবৎ ত্রীকৃষ্ণের
সেবা করিয়াছ, ত্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই তোমাদিগের
উদ্ধার সাধন করিবেন; এখন গৃহে গমন কর।”
গৌর উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশী-

র্বাদ করিলেন। অনন্তর উভয়কে আলিঙ্গন দান
করত ভকুগগকে কহিলেন “তোমরা ইহা-
দিগকে অনুগ্রহ কর।” রূপ ও সনাতন তখন
সকল ভক্তের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায়
গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে সনাতন
বিনীত ভাবে কহিলেন “প্রভু! গৌড়াধিপতি
যবন, যদিও বর্তমানে সে তোমার প্রতি ভক্তি-
মান আছে, তথাপি তাহার মনের ভাব যে
পরিবর্তিত হইবে না তাহার নিশ্চয় নাই। আর
তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্টও ভাল নহে।
যদিও তোমার নিজের ভয়ের কোনই কারণ
নাই, তথাপি লৌকিক লীলা লৌকিক ভাবেই
হয়। তাই নিবেদন করিতেছি—এরূপভাবে
বৃন্দাবনে না গিয়া, এখান হইতে প্রত্যাবর্তন
কর।”

পরদিন রামকেলি ত্যাগ করিয়া গৌর
কানাইর নাটশালা গ্রামে গমন করিলেন।
তথায় সনাতনের উপদেশ মনে মনে চিন্তা
করিয়া স্থির করিলেন “এত লোকজন সহ
বৃন্দাবন যাওয়া বাস্তবিকই বিধেয় নহে।”
এই ভাবিয়া গৌর বৃন্দাবনগমনের ইচ্ছা ত্যাগ
করিলেন এবং সত্বরই শান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত
হইলেন।

শান্তিপুরে গৌর দশদিন অবস্থান করিলেন।
এখানে সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র
রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ
করিলেন। গোবর্দ্ধন মহা ধনী। তিনিও
তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্য সংকুলসম্বৃত, সদাচার-
পরায়ণ ও পরমধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।
নদীয়ার এমন কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না যিনি
হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের বৃত্তি ভোগ করিতেন না।
নীলদ্বার চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে উভয়

ব্রাতা বিশেষ ভক্তি করিতেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। শৈশব হইতেই রঘুনাথ সংসারে উদাসীন ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গৌর প্রথম যখন শাস্তিপুরে আসিয়াছিলেন, রঘুনাথ তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-
ছিলেন। তখন গৌর তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া রঘুনাথ পাগলের মত হইলেন। গৃহ তাঁহার নিকট কারাগারের মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই কারাগার হইতে উদ্ধার লাভের জন্ত কয়েকবার পলায়ন করিলেন—
কিন্তু কয়েকবারই পিতৃ-প্রেরিত লোক কর্তৃক ধৃত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে গৌর শাস্তিপুরে আগমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথ পিতার নিকট তদর্শনে গমন করিবার জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অনেক অহুন্নয়ের পর অনুমতি লাভ করিলেন। শাস্তিপুরে আগমন করিয়া রঘুনাথ গৌরের নিকট নীলাচলে বাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং পিতার শৃঙ্খল ছেদন

করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু গৌর তাঁহার সংসারত্যাগের সংকল্পের অঙ্গ-
মোদন করিলেন না ; তিনি কহিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল ।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিদ্ধি কুল ॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর, লোক দেখাইয়া ।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার ।
অচিরাত্ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥

রঘুনাথের সংসারে প্রত্যাগমন করিবার নিতান্ত অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া গৌর অবশেষে কহিলেন “এখন গৃহে যাও, আমি যখন ব্রহ্মাধন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইব, তখন তথায় গিয়া আমার সহিত মিলিত হইও।” রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং প্রভুর আদেশে পূর্ব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতীপালন করিতে লাগিলেন।

গৌর বজ্রবান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন। (ক্রমশঃ)
শ্রীতারকচন্দ্র রায় ।

উৎপল

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্যোৎসবে

গঙ্গা ও হিরণ্যবতীর সঙ্গমস্থলে বিশাল পাটলীপুত্র নগর। উপকণ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিলেও দীর্ঘে বিংশতি এবং প্রস্থে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত এই মহানগরের চারিদিকে চারিশত

হস্ত পরিসর, বিংশতি হস্ত গভীর, জলপরিপূর্ণ পরিখা। পরিখার প্রান্তে প্রান্তে সমস্ত নগর-
বেষ্টিত ইষ্টক, প্রস্তর এবং বিশাল কাষ্ঠদণ্ড-
নির্মিত দৃঢ়গঠিত প্রাচীর। প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরপ্রবেশের চতুষ্বেষ্টি দ্বার। প্রাচীর-

শিরে পরম্পর সমদূর ব্যবধানে নির্মিত সু-উচ্চ শত শত প্রহরিকক্ষ। প্রতিকক্ষে পর্যায়ক্রমে নিত্যজাগ্রত বর্মধারী ধনুর্ধর প্রহরী। প্রহরীর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া লোকের নগরপ্রবেশ অথবা নগর হইতে বহির্গমন অসম্ভব।

আজ রাজাধিরাজ অশোকদেবের জন্মদিন। নগরে মহা উৎসবঘটা। প্রতি প্রহরিকক্ষশিরে পতাকা। নগরপ্রবেশের প্রতিদ্বারের উভয় পার্শ্বে পূর্ণকুন্ত, তাহাতে আত্র, অশোক অথবা অশ্বখপল্লব। ফুলমালা পত্রপল্লবে দ্বারের অপূর্ব শোভা। প্রতি প্রহরিকক্ষে, প্রতি দ্বারপার্শ্বে বাদিত্র। মৃদঙ্গ, ভেরি, পটহ, খরতাল, ঝংঝর, মর্দলের উচ্চরবে সমস্ত নগর কোলাহলময়।

সমস্ত নগর সজ্জিত। প্রতিগৃহচূড়ে চীনাংগু-পতাকা, গৃহদ্বারে ফুলপাতার মালা, মঙ্গলঘট। সমস্ত পথে লোকের সমাবেশ। ধৌত উদগমনীয়, ক্ষৌম, কোশেয় নানাবর্ণের বস্ত্রপরিহিত ৬দ্বৈব উল্লসিত লোকসঙ্ঘ রাজপুরী অভিমুখে চলিয়াছে।

রাজপুরীর সম্মুখে অতি প্রশস্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ। প্রাঙ্গণের প্রান্তে নানা ভাগে বিভক্ত রঙ্গভূমি। ভৌমকায় মল্ল, যষ্টিক, খড়্গধারী, কুঠারী, মুদগরী, প্রাসিক যোদ্ধারা অমাহুষিক বল, অপূর্ব ক্ষিপ্তকৌশল দেখাইয়া সহস্র সহস্র লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। যশে যশে, গুণে গুণে, মহিষে মহিষে, গজে গজে, মেঘে মেঘে ভয়ানক যুদ্ধ। মল্লগণের আশ্ফালন, হুহুকার, বাহুর আশ্ফোটন, দর্শকবৃন্দের উৎসাহধ্বনি অথবা টিটকারী, বিজয়ী

দ্বন্দ্বীর বহুবাহুবের উল্লাস-কোলাহল, বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর শুভাকাঙ্ক্ষিগণের আপত্তি ও প্রতিবাদ; যুগ্মপশুগণের উচ্চ গর্জন, ভয়াবহ সংঘর্ষ; পলায়মান পশুর বিকট আর্তনাদ, বিজয়ী হুহুকার শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত; ধ্বাতল কল্পিত।

অঙ্গনের স্থানে স্থানে সুরহং সুরশোভন পট্টাবাস। তাহাতে নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, বৈণিক, বৈণবিক, মোরজিকগণ নৃত্যগীতবাণ-কৌশলে শত শত শ্রোতা দর্শকের চিত্ত উৎফুল্ল করিতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্রবেশ ভণ্ডের কোতুক অথবা বাক্চাতুর্য্যে শ্রোতার অট্টহাস্য, করতালি; কোন স্থানে মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত কর্মে মুগ্ধ দর্শকের স্তম্ভিতদৃষ্টি। শত সহস্র নাগরিক, গ্রামিক—আবালবৃদ্ধ—আজিকার মহোৎসবঘটার উন্মত্ত, উল্লসিত।

বাগ, বজ্র, পূজা, বলি, হোম, বেদপাঠ, অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। রাজাধিরাজ স্বর্ণরৌপ্য, মণিরত্নে তুলিত হইয়াছেন। তুলিত স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিরত্ন—সহস্র সহস্র মুদ্রা, রাশি রাশি বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে। রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় অধবর্ষী, উল্লগাতা, হোতা, ঋষিক, স্নাতক, শ্রোত্রিয়, সামিক, ব্রহ্মচারী, পরিত্রাজক, সদস্য, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, ভিক্ষু, অন্ধ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, ছঃস্ব, দরিদ্রের জন্মোচ্চারণ শব্দে সমস্ত ভূভাগ কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যভাগে রাজসভা। ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ নির্মিত অতি বৃহৎ সভাগৃহের স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ চূড়া হইতে বিশাল রাজপতাকা বায়ুপ্রোতে তরঙ্গান্বিত হইতেছে। চারিদিকে

সভাগৃহ প্রবেশের চারি-দ্বার, ফুল-মালা লতা-পল্লব মঙ্গলকুণ্ডে সুসজ্জিত। দ্বারমুখে বৌণা-বংশী, মুরজ-মন্দিরা সংযোগে অনতি উচ্চ মধুব-গম্ভীর বাতধ্বনি। গৃহমধ্যে স্বর্ণবিমণ্ডিত সারি-সারি উচ্চ স্তম্ভশিরে কোশেয় চন্দ্রাতপ। তাহাতে স্বর্ণহস্তপ্রাথিত মণিরত্নখচিত লতা পত্র-পুষ্প-পল্লবের ছবি। প্রতিস্তম্ভগাত্রে নিপুণ শিল্পা-নির্মিত স্বর্ণলতা, তাহাতে স্তবকে স্তবকে মণিমুক্তা-রত্নের ফল, আর সেই ফল ভক্ষণ-প্রয়াসী রক্ততপস্ক, স্বর্ণচক্ষু, রত্নচক্ষু বিহঙ্গ। স্থানে স্থানে ত্রিপদীর উপর রক্ষিত কৃত্রিম ষুঁই জাতি কুন্দ মালতীর গাছ, কোনটীতে রোপ্য-পল্লব, সোণার ফুল; কোনটীতে স্বর্ণপল্লব, রূপার ফুল। স্তম্ভ হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত, কালক হইতে কালক পর্য্যন্ত স্তম্ভবিলাসিত ফুলের মালা। চন্দ্রাতপ হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলে বিলম্বিত কত স্বর্ণ-প্রদীপ পাত্র, সন্ধ্যাসমাগমে তাহাতে গন্ধতৈল-বতি জ্বালিত হইয়া সেই বিশাল গৃহ আলোকিত করিবে।

সভাগৃহের মধ্যভাগে স্বর্ণবিমণ্ডিত উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনে আসীন মণিরত্নখচিত মুকুট এবং মহার্ঘ্যপরিচ্ছদ-পরিহিত রাজা-ধিরাজ মৌর্য্যকুলচূড়া অশোক দেব। কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, ললাটে হরিচন্দন-লেপ। মহারাজ অশোক কমনীয় কান্তিমান সুন্দর পুরুষ ছিলেন না; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সূচক তাঁহার তেজোময় আরক্ত আগ্রত চক্ষু, দৃঢ়গঠিত বলশালী বিশাল বাহু, আর সেই উচ্চ সিংহাসনে তাঁহার স্থিরস্বচ্ছন্দ উপবেশনচ্ছন্দ রাজপ্রতিভা সূচিত করিতেছিল, জনমণ্ডলীর ভয় বিশ্বয় ও অতর্কিত পূজা আকর্ষণ করিতেছিল।

মস্তকে সেবকদ্বত মাণমুক্তাখচিত দীপ্তিমান রাজছত্র। রাজাধিরাজের পশ্চাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে দণ্ডায়মান চামরদণ্ডব্যঞ্জনধারিণী, তাড়ুল করস্ক গন্ধমালাধারিণী, মর্দনদণ্ডহস্ত সংবাহক, আর অসি-ভল্লকুঠারধারী পার্শ্বরক্ষী-বর্গ।

সিংহাসন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সম্মুখে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে যথোপবৃত্ত বিচিত্র মৃণ্যবানু আসনে আসীন মিত্র ও করদ রাজগণ, রাজত্বক, রাজ-প্রতিনিধি, ধর্ম্মপাত্র, মহাপাত্র, সামন্ত, মহা-সামন্ত, দণ্ডনায়ক, সচিব, সেনানী প্রভৃতি সভা-সদগণ; সুদূর সাগরাস্তর হইতে মিশর, সিরিয়া, ইপিরাস, মাসিডোনিয়ার অগ্রদ্রাম্য বিশাল-দেহ রাজপ্রতিনিধিগণ; চেণ, পাণ্ডা, কেরল হইতে স্বাধীন ভারতীয় নৃপতিগণের প্রতিনিধি; তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্তাগণ; কাশী, কোশল, চেরী, অঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্ত, গান্ধার, কাষোজ, বাহ্লিক প্রভৃতি দেশের রাজা রাজ-প্রতিনিধিগণ; বৃজ, মল্ল, লিচ্ছবিগণের প্রতিনিধি। ভট্ট, বন্দী আগ্র, চর, দৈবজ্ঞ, দূত, লেখক, প্রতিবেদক, শ্রেষ্ঠী, সাংঘাতিক প্রভৃতির পদভেদে আসীন অথবা দণ্ডায়মান। একপার্শ্বে গুরু-পুরোহিত, স্নাতক-অধ্যাপক, ষতী-ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ; অপর পার্শ্বে উচ্চমঞ্চে যবনিকার অন্তরালে শুক্রাঙ্গ-বাসিনী মহিলাগণের সমাবেশ; মঞ্চের নিম্নভাগে অসি-ভল্লধারিণী প্রহরীগণ।

রাজাধিরাজের জন্মদিন-মহোৎসবে কোন রাজা, রাজ-প্রতিনিধি অথবা সভাসদ শূন্য-হস্তে রাজদর্শনে আগমন করেন নাই। সিংহাসনের সম্মুখে খাত্ত দুর্কী বব তিল ফল ফুল

প্রভৃতি মাজলিক দ্রব্য, তৎপর বহুবিধ বহুমূল্য রাজভেট, উপায়ন-সামগ্রী। মণিমুক্তা হীরক বৈদূর্য্য প্রবাল কাঞ্চন; ক্ষৌম কোশেয় রাস্তব নানাবিধ বস্ত্র। অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী হরিনন্দন প্রভৃতি গন্ধ; হার বলয় কেয়ূর কুণ্ডল পড়তি অলঙ্কার; মণিমুক্তারত্ন-খচিত কোষমুষ্টিযুক্ত দীপ্তিমান অসি, ছুরিকা; হস্তদস্ত নিশ্চিত, মর্শ্বর প্রস্তর-চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত দেশবিদেশ হইতে আগত বহুবিধ সুদৃশ্য মূল্যবান দ্রব্য। আর, হয় ০ত্তী, শকট শিবির প্রভৃতি সভাভঙ্গে রাজদর্শন জ্ঞাত সভাগৃহের বাহির চত্বরে রক্ষিত হইয়াছে।

মহাপাত্র উপস্থিত রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, সম্রাট সভাসদগণকে ক্রমে রাজাধিরাজের নিকট পরিচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের আনীত উপায়ন-সামগ্রী সকল রাজগোচর করিয়াছেন। অশোকদেব তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদন, আপ্যায়ন করিয়াছেন। সভাভঙ্গের আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমন সময় প্রহরীপরিরক্ষিত একটা যুবক সেখানে আনীত হইল। তাহার দৃঢ়গঠিত বলিষ্ঠ শরীর, বিশাল বক্ষ, অশ্রুত ডজ্জল চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাট; কিঞ্চ পরিধানে অতি সামান্য গ্রাম্যবেশ। যুবক সিংহাসনের সম্মুখে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া মস্তকে ভূমিস্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দনা করিল।

রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কি নাম তোমার?”

“হ্যাসের নাম মাণিক্যদেব।”

“কোন দেশে বাড়ী?”

“মহারাজ্য কলিঙ্গে।”

“কি প্রয়োজনে আমার রাজধানীতে আসিয়াছিলে?”

যুবক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল;—

“মহানগর পাটলীপুত্র দেখিবার সাধ কাহার না হয়? রাজাধিরাজের রাজধানী দর্শন করিতে আসা যে অপরাধের কার্য্য, তাহা জানিতাম না।”

যুবকের পক্ষয বাক্যে সভাসদগণ বিস্মিত হইলেন। রাজাধিরাজ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন;—

“ছদ্মবেশে চোরের ছায়া প্রবেশ, পর-রাজ্যের সৈন্তসংখ্যা-নিরূপণ-চেষ্টা, চিত্রে চূর্ণ-সংস্থান অঙ্কন—সাধু অভিপ্রায়ের পরিচায়ক নহে।”

পাত্র অগ্রসর হইয়া রাজাধিরাজের হস্তে একখণ্ড চতুষ্কোণ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহাতে বিকীর্ণ রশ্মিজাল চিহ্নযুক্ত গোলাকার সূর্য্যমূর্ত্তি, নিম্নভাগে সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন। রাজাধিরাজ সেই মুদ্রাঙ্কিত স্বর্ণখণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“এখানি কি?”

যুবক সমস্ত্রমে মস্তক নমিত করিয়া সেই মুদ্রাঙ্কিত সূর্য্যধ্বজ স্বর্ণখণ্ডে নমস্কার জানাইয়া বলিল;—

“রাজাধিরাজের নিকট আমার পরিচয় বিদিত হইয়াছে; যে দণ্ডবিধান অভিপ্রায় হয়, আদেশ প্রচার হউক।”

“এখানি কি?”

“রাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্তচরের পরিচয় চিহ্ন।”

সূর্য্য-মুদ্রাই তোমার প্রভুর রাজধ্বজ, সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন কেন?”

“আমার প্রভু যাহাকে আপুণ্ড প্রদান করেন, তাহার পরিচয়ের জন্ত সূর্য্যমুদার নিয়ে ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। এই ক্ষুদ্র অধম প্রভুর প্রধান চর, সেই জন্ত ‘ই সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন।’”

“তুমি ভিন্নদেশের গুপ্তচর, আমার রাজ্যের গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে আসিয়া ধরা পড়িয়াছ; তোমার প্রাণদণ্ড কেন হইবে না?”

যুবক নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল;—

‘গুপ্তচর রাজসেবক। রাজাধিরাজ সমস্ত ঋণ্যাবর্তের অধাধর, পাটলীপুত্রের চর কোন রাজ্যে না যায়?’

রাজাধিরাজ বলিলেন;—

‘যায় বটে, তাহাদেরও চিরদিন এরূপ বিপদ সম্ভব।’

“তাহারা সাহসী এবং প্রভুভক্ত, ভয় করেন না। এই ক্ষুদ্র অধমও আজ দৈবহর্ষিপাকে বিপদে পড়িয়াছে। যে মুদ্রাঙ্কিত ধ্বজ দেখাইলে গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে গোদাবরী-তীর পর্য্যন্ত ত্রিকলিঙ্গে এমন মাগুয নাই যে মস্তক নত না করে; যাহার সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ দাস শত রক্ষী সাহায্যকারী সংগ্রহ করিতে পারিত; আজ তাহার কোন শক্তি নাই।—কিন্তু এ অধমও অদৃষ্টলাপ অখণ্ডনীয় মনে করে। রাজাধিরাজের অখণ্ড রুদ্র প্রতাপ;—দণ্ডদেশ প্রচার হউক!”

সেই মহাসভা-সমাগান সকলের চিত্ত শিহরিয়া উঠিল। এই দৃঢ়চিন্ত নবীন যুবকের প্রতি নিশ্চয়ই শূলদণ্ডের আদেশ হইবে! কিন্তু রাজাধিরাজ বলিলেন;—‘মহারাজ কলিঙ্গপতির শৌর্য্য-প্রতাপের কথা আমার

অবিদিত নাই। তাহার বিশ্বাসী চরেরও যে অতুল সাহস, তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমার মৃত্যুভয় নাই। সংসারে মৃত্যুভীতের মৃত্যুসংঘটনে বিলম্ব হয় না। শুন, অশোক-দেব প্ৰকৃত সাহসীর অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তুমি সাহসী এবং বিশ্বাসী প্রভুভক্ত, তোমার অপরাধ ক্ষমা করা গেল।’

রাজাধিরাজের মহামহিমময় আদেশে সভাসমাসীন সমস্ত লোক চমৎকৃত হইল। যুবক পুনরায় ভূমিতে মণ্ডক স্পর্শ করিয়া রাজাধিরাজের সম্বর্দ্ধনা করিল এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল;—

“রাজাধিরাজের জয় হউক!”

“তোমার প্রভু আমার সীমান্ত-প্রদেশে অহেতুক গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার প্রজাগণ অত্যাচারিত হইতেছে, বণিক-ব্যবসায়ীর বহু ক্ষতি হইতেছে। আমার প্রেরিত দূত সমুচিত সম্বর্দ্ধিত হয় নাই। তিনি গুপ্তচর পাঠাইয়া আমার দৈন্ত এবং দুর্গ-সন্নিবেশের তত্ত্ব করিতেছেন।—যুদ্ধ করাট কি তাহার অভিপ্রায়?”

যুবক যুক্তকণ্ঠে নিবেদন করিল;—

“দাস ক্ষুদ্র সেবক, ত্রিকলিঙ্গেশ্বরের গুপ্ত অভিপ্রায় আমার জ্ঞাত থাকার কি সম্ভাবনা?”

“ভাল, অর্চরেই তাহা জানা যাইবে। তুমি এখন পরিচিত, ছদ্মবেশে আর তোমার প্রয়োজন নাই। পাত্র তোমার বেশ, বান, বাহন, আহার, বাসস্থানের উপযুক্ত বিধান করিয়া দিবে। সপ্তাহ কাল আমার রাজধানীতে থাকিয়া যাহা যাহা দেখিবার ইচ্ছা হয়, দেখ। পরে আমার লোকেরা তোমাকে

তোমার প্রভুর রাজ্যসীমায় রাখিয়া আসিবে।”

যুবক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; ওই বাহু উর্দ্ধ করিয়া, উচ্চ গভীর স্বরে বলিল;—

“রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী অশোকদেবের জয় হউক।”

রাজাধিরাজ সভাভঙ্গের ইচ্ছিত করিলেন।

মাগধগণ স্তুতিগীত আরম্ভ করিল।

বহির্দ্বার চত্বঃ রাজ প্রাসাদ—সমস্ত নগর মৃদঙ্গ ভেরি পটহ ঝরঝর মর্দল বেণু বংশী রবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুখরার মুক্ধ

এক দিন অপারঞ্জে মঞ্জুলা কুমুদ-নিবাসে উপস্থিত হইল। সঙ্গে পরিচারিকা চঞ্চলা ও চিত্রা, ভৃত্য বাহক এবং ৬ পায়ন-গন্ধ-পুষ্প-মালাবাহী ভারিক। প্রমীতসেন এবং উৎপলা প্রস্তুত ছিলেন। শিবিকা অন্তঃপুর-দ্বারে পৌঁছিতেই মাধবী তাহার দ্বার খুলিয়া দিল। মঞ্জুলা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া প্রমীতকে নমস্কার অভিবাদন করিল এবং সহজ অনুমানে গৃহকর্ত্রী উৎপলাকে চিনিতে পারিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। উৎপলা অতি আদরে হাতে ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রমীত বলিলেন;—

“আজ আমাদের কত আনন্দ।”

মঞ্জুলা মুখ নত করিয়া হাসিমুখে পুনরায়

প্রমীতকে অভিবাদন করিল।

“তোমরা উপরে বাইয়া বিশ্রাম কর।”

প্রমীত বহির্দ্বারীতে চলিয়া গেলেন।

উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া দ্বিতলে নিজ কক্ষে গেলেন। সেখানে নিজের শয়ন-পর্যায়ের নিকট দ্বিতীয় পালকে কোমল শয্যায় নিজের পার্শ্বে মঞ্জুলাকে বসাইলেন।

উৎপলা বলিলেন;—

“আমার কত সৌভাগ্য, তুমি আমাদের গৃহে আসিয়াছ।”

মঞ্জুলা বলিল;—“আপনার গৃহে আসিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম।”

রাজকোপ হইতে স্বামী যে মঞ্জুলার অন্তঃগৃহে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া উৎপলা কত কথা বলিলেন। মঞ্জুলা তৎসম্বন্ধে নিজের কৃত্ত্ব অস্বীকার করিয়া সেই দুর্ঘ্যোগময় রাত্রিকালে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা এবং নিরাপদে নিজগৃহে পৌঁছার জ্ঞাত প্রমীতসেনের মহত্ব এবং অনুগ্রহের কথা তুলিয়া কত কৃতজ্ঞতা জানাইল।

অনেক কথা হইল। শেষে উৎপলা বলিলেন;—“সে দিন কোথা হইতে আসিতে এই রুষ্টিদুর্ঘ্যোগের মধ্যে পড়িয়াছিলে?”

“পাটলীগ্রামে আমার এক আত্মীয়া আছেন। তাঁহার আমন্ত্রণে ভিক্ষুদেব উপগুপ্ত ঠাকুর সে দিন তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া ছিলেন। ভিক্ষুদেবের চরণ দর্শন জ্ঞাত আমি পাটলীগ্রামে গিয়াছিলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হয়, বড়-রুষ্টির সময় দস্যু-হস্তে পড়িয়াছিলাম। বহু পুণ্যফলে সে সময় আমার উদ্ধার-বর্ত্তার সমাগম হইয়াছিল।”

“দেবতার অনুগ্রহে আমরাও সেদিন তোমার মত স্নহদের নিকট পরিচিত হইয়া ভয়ঙ্কর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।”

মঞ্জুলা হাসিল, বলিল ;—

“তিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়া-
ছিলেন .”

“তুমি আমাদের পাণ-মান মর্যাদা রক্ষা
করিয়া চিরদিনের জন্ত আমাদিগকে কিনিয়া
কেলিয়াছ ।”

“শ্রীচরণের দাসীকে ও কথা বলিবেন
না ।”

“তুমি আমার পরম স্বহৃদ, প্রাণপিয়
ভগিনী !”

মঞ্জুলা পালঙ্ক হইতে নামিয়া উৎপলার
পদে মস্তক লগ্নিত করিয়া প্রণাম করিল ।
উৎপলাও নামিলেন এবং ছই হাতে মঞ্জুলাকে
ধরিয়া তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাহাকে গাঢ়
আলিঙ্গন করিলেন ।

উৎপলা তখন হাতে ধরিয়া মঞ্জুলাকে
লইয়া অন্তঃপুরস্থ গৃহকক্ষ পুরুর উদ্যান
ইত্যাদি দেখাইতে লাগিলেন ।

উৎপলার কক্ষগুলি সুন্দর ও সুসজ্জিত ।
মঞ্জুলা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, কমলপুরে
তাহার নিজের কক্ষগুলি কারুকার্য্যে
অথবা মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারে উৎপলার কক্ষ-
গুলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু নির্কাচন
ও সন্নিবেশ-পারিপাট্যে, পিয়জনের প্রীতি এবং
পরোজন সম্পাদনে এই গৃহিণী গৃহের নিকট
কমলপুরের সেই প্রয়োজনহীন মার্ঘ্য সাজ-
সজ্জাপূর্ণ অতি-অলঙ্কৃত কক্ষগুলি সজ্জিত
বিপণী বা দ্রব্যাভাণ্ডার মাত্র ।

উৎপলার শয়নকক্ষে বিস্তৃত পালঙ্কে
হৃৎপুত্র আন্তর্য্যগত প্রশস্ত শয্যা, তাহাতে
গৃহ উপাধান । শয্যাপার্শ্বে অযত্নরক্ষিত
সপ্ত-আবলী স্বর্ণমেখলা, তাহারই পার্শ্বে মনোহর

স্বর্ণ-শৃঙ্খল । এক কোণে শুভ্র পাছকা,
মণিখচিত সিংহমুখ যষ্টি ; অত্র কোণে ত্রিপদীর
উপর মুকুর, কঙ্কতি, গন্ধচূর্ণ, কবরীবন্ধন যন্ত্র,
বিবিধ অঙ্গরাগ-সামগ্রী । কক্ষের এক
পার্শ্বে মন্মথ কাষ্ঠদণ্ডের উপর রক্ষিত পুষ্ক-
পরিধেয় ধোত কোশেয় : ধুতি, উত্তরীয় ;
নিকটেই রমণী-পরিধান-যোগ্য সাটী, প্রাবৃত
ওটনি, কঙ্কলিকা ।

মঞ্জুলা বিস্মিতনেত্রে সাগ্রহচিত্তে দেখিতে
লাগিল, কক্ষের সর্বত্র এক নবীন ভাব,
অদৃষ্টপূর্ব্ব এক কমনীয় চিত্র । শৌর্য্য-
মাধুর্য্যের এরূপ মিলন, সুন্দর আর সুন্দরীর
এরূপ সামঞ্জস্য, যুগ্মের এরূপ অবিচ্ছিন্ন একত্ব
আর কোথায়ও তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই ।
তাহার নিজগৃহে ত সে ভাবের লেশ মাত্র নাই ।
মহারাজ্যী কারুবকার কক্ষ ত রাজকক্ষ,
সেখানেও মঞ্জুলা এ ভাব লক্ষ্য করে নাই ।
অত্র গৃহস্থ লোকের ঘর সংসার মঞ্জুলা কমই
দেখিয়াছে ।

দেখিয়া দেখিয়া মঞ্জুলা মুগ্ধ হইল । তাহার
জীবনে সে কখনো এ সৌন্দর্য্যের লীলা দেখে
নাই, সুতরাং তাহার মহিমা কি অভাব কোন
দিন অনুভব করে নাই । স্বাধীনার জীবন
যে চির অভাবময়, আর পরাধীন যে ঐশ্বর্য্য-
শালিনী—এক যে কিছুই নয়, ত্র্যয়ের একত্বই
যে পূর্ণ জীবন, মঞ্জুলার মনে ত কোন দিন
সে কথা উদয় হয় নাই । অত্রের ঐশ্বর্য্য
দেখিয়াই লোকে নিজের অভাব বুঝিতে
পারে, অনাসক্ত সংযমীর চিত্ত তাহাতে
বিচলিত হয় না । কিন্তু সংসারে তেমন
মহাত্ম্যঙ্গী সংযতবৃত্তি কয় জন ? মঞ্জুলা বুঝিতে
পারিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলদেশে

কি যেন এক অজ্ঞাতপ্রকৃতি ক্ষীণ স্বচ্ছ মুহূ-
উন্মাদক নবীন ভাব জাগিয়া উঠিল। মঞ্জুনার
উৎফুল্ল মুখ দ্বিগুণ উন্নত হইল।

চঞ্চলা বলিয়াছিল, উৎপলা পৰমসুন্দরী।
মঞ্জুলা দেখিল উৎপলার দুর্লভরূপ। উৎপলার
দেহে বেশভূষা বা অলঙ্কারের কোন পারিপাট্য
নাই, প্রায় সম্পূর্ণনিভারণা উৎপলার রূপ-
বৈভব অতুল। সৌমন্তশোভা একমাত্র সিন্দূর-
বিন্দু যেন সেই অতুল রূপরশি উদ্ভাসিত,
অপূর্ণ লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তখন
তাহার নিজদেহে মণিরত্ন-অলঙ্কারের ছটা
তাহার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর এবং মনৈ-
স্বর্ঘ্যের পরিচায়ক মাত্র বোধ হইল। মঞ্জুনার
চক্ষু লজ্জায় নত হইল।

অবশেষে উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া আর
এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে
প্রশস্ত বৃহৎ শয্যা, শয্যার উপর এবং প্রাচীরের
গায়ে বিবিধ বাস্তবস্ত্র—বেণু, বাণা, বংশী,
মন্দিরা, মৃদঙ্গ। দেখিয়া মঞ্জুনার চক্ষু স্থিত
বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা বলিল—

“আপনার গৃহে এত যন্ত্র, গীতবাগ্গে
আপনার অভ্যাস নাই?”

উৎপলা হাসিলেন, বলিলেন—

“আমার অভ্যাস! তোমার ‘পরম সুহৃদ’
কোন কোন দিন গান করিয়া থাকেন, এবং
আমোদ করিয়া আমাকে শিখাইতে চাহেন।”

“তবে আপনিও গাহিতে পারেন?”

“কিছু না।”

“অভ্যাস করিতেছেন?”

“তুমিই আমার সে বিপদের মূল!”

“আমি!”

“এবার বসন্তোৎসব হইতে করিয়া অবধি

গীতের চর্চা অধিক হইতেছে। আমাকে
না শিখাইয়া ছাড়িবেন না! এই কাককণ্ঠ
হইতে পঞ্চম বাহির হইবে!—সে কথা থাকুক,
শুনিয়াছিলাম তুমি অপূর্ণ রূপবতী—”

মঞ্জুলা লজ্জায় মুখ নত করিল। উৎপলা
অতি আদরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া
বলিতে লাগিলেন,—

“আজ স্বচক্ষে দেখিলাম, তোমার রূপের
তুলনা নাই, চক্ষু সার্থক হইল। শুনিয়াছি,
গীতবাগ্গেও তোমার অসীম ক্ষমতা—”

“আপনি কাহার নিকট এত অলীক
কথা শুনিয়াছেন?”

“অতি বিশ্বস্ত লোকের মুখেই শুনিয়াছি।”
—সহাস্ত্রে—“সেই দুর্যোগ দিনে সাক্ষাৎ
হইতে তোমার অপূর্ণ রূপের, আর বসন্তো-
সবের দিন হইতে তোমার গীতের কথা প্রতি
দিন শুনি। অমন মিষ্ট স্বর, অমন সুন্দর
গীত না কি তিনি আর কখনো শুনেন
নাই।”

“আপনি আমার অতি-প্রশংসা শুনিয়া-
ছেন আমি তাহার উপযুক্ত নই।”

“অতি প্রশংসা-যে নয়, তোমার রূপ
দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার
গীত যে অতি মধুর হইবে, তাহাতে আমার
কোন সন্দেহ নাই।—একটা গান শুনাইতেই
হইবে।”

মঞ্জুলা মহা বিপদে পড়িল, তাহার মুখ
আরক্ত হইয়া উঠিল। উৎপলার সঙ্গে আজই
প্রথম দেখা। প্রথম দিনেই গীতবাগ্গ, আমোদ
প্রমোদ প্রকৃত-প্রগল্ভা মঞ্জুনার নিকটও
চঞ্চলতা বলিয়া বোধ হইল। দেশ-কাল পাত্র-
ভেদে মুখরাও মুক হইয়া পড়ে। উৎপলা

বীণাটা তুলিয়া লইয়া মঞ্জুলার হাতে দিলেন।
শেষে মঞ্জুলা বলিল;—

“আজ ক্ষমা করিবেন, আমার মুখে আজ গীত আসিবে না। আরও ত কতদিন আসিব, আর একদিন শুনাইব।”

“তোমার মুখের গীত শুনিবার বড় সাধ ছিল। ভাল, শুধু একটুকু বাজাও।”

বাধ্য হইয়া মঞ্জুলা বীণা লইয়া তাহার তার চড়াইয়া নামাইয়া সুর বাঁধিতে লাগিল এবং দ্বারের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। বুঝিতে পারিয়া উৎপলা হাসিয়া বলিলেন;—

“কোন ভয় নাই এখানে কেহ আসিবে না।”

কম্পিত হস্তে মঞ্জুলা বীণাতে ঝঙ্কার দিয়া সুর তুলিতে লাগিল। এমন সময় মাধবী আসিয়া জানাইল, প্রমীতসেন আসিতেছেন। প্রমীত কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বীণা রাখিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া একটুকু সরিয়া বসিল।

প্রমীত বলিলেন;—“আমি বাধ্য দিলাম। আমি যাই।”

মঞ্জুলা বলিল,—‘না, আপনি যাইবেন না। বেলা। গয়াছে, আপনি অনুমতি করুন, আমি এখন বিদায় হইব।’

“এখন যাইবে?”

“হাঁ, আপনি অনুমতি করুন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।”

উৎপলা বলিলেন;—“তবে আজ আর হইল না। আর এক দিন আসিয়া গীত শুনাইবে?”

মঞ্জুলা মুহু মুহু বলিল;—“শুনাইব।”

প্রমীত বলিলেন;—“আমার প্রার্থনা, সেদিন আমিও উপস্থিত থাকিব।”

মঞ্জুলার লজ্জা-বিজড়িত সুন্দর মুখ স্মিত-বিভাসিত হইয়া উঠিল। মঞ্জুলা প্রমীতসেনকে নমস্কার করিয়া উৎপলাকে প্রণাম করিল।

গন্ধপুষ্প-মালাভারে বরিতা মঞ্জুলা বিদায় হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

মঞ্জুলাকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রমীত পুনরায় উৎপলার কক্ষে ফিরিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“কেমন দেখিলে?—মঞ্জুলা রূপসী নয়?”

“অপূর্ব রূপসী, অমন রূপবতী আমি আর দেখি নাই।”

“আমিও—” বলিতে বলিতে প্রমীত খামিয়া গেলেন।

“কি বলিতেছিলে?”

“না,—আবার কবে তাহাকে আনাইবে?”

“লজ্জায় মঞ্জুলা আজ গীত শুনাইতে পারে নাই—”

“শীঘ্রই আর একবার তাহাকে আনাইও; দেখিবে, সে কেমন সুকণ্ঠ!”

“শীঘ্রই আনাইব।—একটা কথা, মঞ্জুলা বসন্তোৎসবে প্রকাশ্যে এত লোকের সম্মুখে গীত গাহিল, আর আজ এই নিরিবিলি অস্তঃপুরে আমার কাছে গাহিতে অত লজ্জা বোধ করিল?”

“তোমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, ক্রমে লজ্জা যাইবে। মঞ্জুলা প্রায় তোমার সমবয়সী, অল্প দিনেই তোমাদের মনের মিল হইবে।”

“মঞ্জুলা আজও অবিবাহিতা কেন? অমন শিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনশালিনীর বর জুটে না?”

“বর জুটে না।—অভাব কি! কতলোক ত তাহার বিবাহপ্রার্থী। বোধ হয়, মঞ্জুলার

মনোমত কেহ এতক জুটে নাই! দেবী কার-
বকী স্বয়ং মঞ্জুলার অভিব্যক্তি; যে সৌভাগ্য-
বান মঞ্জুলাকে লাভ করিবে, সে ত রূপ গুণ
ধন সম্পদ—আকাঙ্ক্ষার সমস্ত বস্তু একাধারে
লাভ করিবে!”

স্মিতমুখে উৎপলা বলিলেন :—

“লোভ হয় কি?—দোখও উপকৃতাই
বা শেষে বাঞ্ছিত হয়!”

প্রমীত হাসিয়া উঠিলেন; উৎপলার মুখ
চুখন করিয়া কাহিলেন;—“রূপ গুণ ধন
সম্পদ কি কবচ ভেদ করিতে পারে!”

প্রমীত হাসিলেন; কিন্তু সে হাসনে
ফুল হৃদয়ের স্বচ্ছন্দজাত ললিত হৃষ্ট হাসি নহে,
কিছু যেন উদ্বেগজড়িত, সঙ্কুচিত হাসি। মুগ্ধা
উৎপলা কিন্তু উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে স্বামীদত্ত ঋণ
সদ্য পরিশোধ করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

বেহার-চিত্র

রেলপথে

অপরূহ হইয়া আসিয়াছে; জামালপুর
হইতে গয়ার গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব
নাই। “পুরি—মিঠাই,” “পান—বিড়ি—
দেয়াসলাই,” “ক্ষীরা—কাঁকড়ি—তরমুজা”—
ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র সুর ক্রমে মন্দীভূত
হইয়া আসিতেছে; গার্ডসাহেব হরিৎ নিশান
হস্তে ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছেন।
এমন সময় একজন বিশালদেহ মাড়োয়ারি
গলদ্বন্দ্বকলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মধ্য-
শ্রেণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন কুলি এক বিশাল মোট
এবং বাস্ক লইয়া উপস্থিত হইল।

শেঠজি মোট নামাইয়া লইয়া কুলিকে দিয়া
‘বেঞ্চার’ উপর আপনার শয্যা রচনা করাইয়া
লইলেন, তাহার পর অত্যন্ত উদার ভাবে
জটিল বস্ত্রগ্রন্থ উন্মোচন করিয়া তাহার হস্তে
দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন, “লেও বক্‌সিস্।”

কুলী চীৎকার করিয়া উঠিল “ওপার হইতে
এপারে মোট আনিবার সাধারণ মজুরিই এক
আনা; তাহার উপর সে ছই জনের মোট
—একাকী বহন করিয়া আনিয়াছে। তাহার
এই মজুরি।”

উভয়ে ঘোরতর তর্ক বর্তক লাগিয়া
গেল। বহুতর্কের পরে শেঠজি হতাশ
হইয়া বলিলেন যে এ সকল বড়ই “জুলুমের”
কথা। একটা মোট বহবার মজুরি এক
আনা! একপ অবস্থায় ভ্রমলোকের পক্ষে
অগ্রকাজ না করিয়া মজুরি করাই ত ভাল!
জটিলতর গ্রন্থি বহুক্ষেপে উন্মোচন করিয়া শেঠ-
জিকাতর ভাবে আর একটি পয়সা বাহির করিয়া
বলিলেন “লেও ভাই মিন্‌সে তুম্‌ থুসী হোও।”

কুলি আর তর্ক করা বৃথা বুঝিয়া অমুচ্চস্বরে
শেঠজির সপক্ষে নানা অযথা বিষয়ের
আলোচনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

কুলিকে বিদায় দিয়া শেঠজি চরণ হইতে পাছকাষুগল উন্মোচন করিয়া উত্তরীর সাহায্যে সবদে তাহাদের সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। পাছকাষুগল একে বিলাতি, তাহাতে নুতন।

যথোচিত সংস্কারান্তে দ্বারের সম্মুখে সে ছুটিকে রক্ষা করিয়া শেঠজি সগর্বে একবার সহযাত্রীগণের প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়া লইলেন। একজন যাত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন “ইংরেজ লোগ্ বড়া বড়িয়া জুতি বানাতা হয়। লেকিন দামভি বহুত লেতা হয়। ইস্ জুতিকে দাম সাঢ়ে সাত রোপেয়া লিয়া।” মুগ্ধ সহ-যাত্রী বলিল “ওঃ সাঢ়ে সা—ত রোপেয়া !”

শেঠজি একটু গর্কের হাসি হাসিয়া আপনার পরিপুষ্ট গুফরাজিকে যত্নপূর্বক সুবিস্তৃত করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। ষ্টেশনের খালানীর গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময়ে কোট-প্যাণ্টপরিহিত এক বেহারবাসী দ্রুতবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্ভত হইলেন।

শেঠজি “হাঁ হাঁ” করিয়া উঠিয়া বলিলেন “ইয়ে গাড়ী মে জাগা নেহি হয়। দোস্‌রি গাড়ীমে যাও।” উত্তেজিত বেহারবাসী বলিল “চোপ্‌রও শালা, তুম্‌হারা বাপ্‌কি গাড়ী হয় ?”

শেঠজি তাঁহার বিশাল উদর কম্পিত করিয়া বলিলেন “খবরদার মুহ্ সামাল্যকে বাত বোলো।” এঞ্জিনের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বেহারবাসী সবেগে দ্বার খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; শেঠজি ধাক্কা মারিয়া তাহাকে বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। কলে বেহারীর

পায়ে লাগিয়া শেঠজির সম্বন্ধরক্ষিত একপাটি জুতা লাইনের মধ্যে পড়িয়া গেল। শেঠজি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “গার্ড সাহেব! গার্ড সাহেব! হুজুর, ষ্টেশনমাষ্টার, পুলিশ পুলিশ—হামারা জুতি গিরা দিগা—!”

গার্ডসাহেব নিকটেই দাঁড়াইয়া ড্রাইভারকে হরিৎ পতাকা দেখাইতেছিলেন। শেঠজির মর্শ্বেভেদী চীৎকার শুনিয়া সম্মুখে আসিয়া রক্ষ-স্বরে বলিলেন “কেয়া হয়? কাহে হালা করতা?” চীৎকার করিয়া শেঠজি বেহার-বাসীর হাত ধরিয়া বলিলেন “হুজুর, ইয়ে বদ-মাসনে হামারা সাঢ়ে সাত রোপেয়াকা জুতি গিরা দিগা!” বিহারী বলিল “Sir, the fellow push me. I about to be thrown on the line! the rascal!”

গার্ড শেঠজিকে বলিলেন “কাহে ধাক্কা মারা শূয়ারকে বাচ্চা?” শেঠজি করজোড়ে বলিতে চেষ্টা করিলেন “হুজুর!”—সাহেব বলিল “চোপ্‌রও।” বলিয়াই বাঁশী বাজাইয়া দিল। শেঠজি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন।

শেঠজির মোটবাহী কুলিটি সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। শেঠজি করুণ অশ্রুনের স্বরে বলিলেন “এ ভাই, জারা জুতিকে তো উঠাও। নগদ চার পয়সা বখসিস্ দেজে।” কুলি বিরক্তির স্বরে বলিল “ওঃ বড়া দেনে-বালা! গাড়ী খুল রহা হয়, চার পয়সেকা ওয়াস্তে আদমি জান দেগা।”

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শেঠজি মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন “গাড়ী যানেকো বাদ জুতি উঠাকে রাখিও। হাম্‌ ঘুরকে আঁকে চার আনা বখসিস্ দেজে।” পার্শ্বের গাড়ীতে এক বাঙ্গালী যুবক বসিয়া ছিল। সে হাসিয়া বলিল

“শেঠজি, একপাটি জুতো নিয়ে আর কি করবে ? ও পাটিটাও ফেলে দাও। যে পাবে সে পায়ে দিয়ে তোমায় আশীর্বাদ করবে !” শেঠজি অবোধা ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া “বাকের” উপর হতাশভাবে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

শেঠজি শুইয়া পড়িলে বেহারী ভদ্রলোকটা মাথার টুপি খুলিয়া বাকের উপর রাখিলেন। “নেক্টাই”-শোভিত সাহেবী পোষাকের উপর তাঁহার দোহুলামান স্থূল শিখা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ভারতীয় ধর্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। টুপি রাখিয়া আরামে বাকের উপর উপবেশন করিয়া বাবুসাহেব কহিলেন, “সাত রোপেয়াকে জুতি দেখ লাভ। লছমি চৌধুরী সাতলাখ রোপেয়া পুছতা নেহি তো সাত রোপেয়া। এই কিউল ব্রিজমে হামারা দেড় লাখ রোপেয়া একরাত্বে ডুব গিয়া। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহা ‘আপ্‌কো বহৎ রোপেয়া লোকসান হো গেরা। হাম্‌ Agentকে লিখ্‌কে আপ্‌কো কুছ, রোপেয়া Advance দেলা দেঙ্গে।’ হাম কহা, ‘হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া মত্‌ কিজিয়ে সাহেব। দো চার লাখ রোপেয়া কোন্‌ পুছতা হয় ?’ উসরোজ সে সাহেব হামারা নাম রাখা ‘King contractor!’ সম্বন্ধে, হাবড়া সে দিল্লী তক যেতনা লাইন হয় সব হামারা এলাকা হয়। বিশ পঁচিশ লাখ রোপেয়া হামারা হামেশা লাইন পর পড়া রহতা হয়। Agentসে লে করকে ষ্টেশনমাস্টার তক্‌ ভর লাইনমে এইসা গোই নেহি হয় যো লছমি চৌধুরীকে একঠো বাত উঠাবে। Company দশ বিশ হাজার লোকসান করেগা সো কবুল। তব্‌তি লছমি

চৌধুরীকো বাত নেহি উঠাবেগা।” মুখ শ্রোতুবল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল “ঃ কেয়া খাতির !” সুযোগ পাইয়া একজন সহযাত্রী বাবু ঘমণ্ডিলাল বলিলেন “হামারা নোকরনে তো একঠো বড়া ভারি গল্‌তি (ভুল) কিয়া। উস্কো লানে দিয়া “ইন্‌টর”কে “টিকস্‌” উয়ে বে ওকুফ্‌নে “থার্ড ক্লাসকে টিকস্‌” লান দিয়া। ইস্‌মে কুছ্‌ হরজ (ক্ষতি) তো নেহি ?”

শ্রীযুক্ত ঃক্ষী চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন “কোই পরোয়া নেহি। হামারা নাম লেকে আপ্‌ ফার্স্ট ক্লাস মে বাইয়ে তব্‌তি কোই কুছ্‌ নেহি কহে গা; ইন্‌টর কোন পুছতা হয়।” ভক্তিগদগদ ঘমণ্ডিলাল চৌধুরীজিকে দীর্ঘ সেলাম করিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ধারারায় আসিয়া পৌঁছিল, তিনজন মুসলমান আরোহী—“বদনা” “গড়গড়া” “পানদান” “ওগলদান” “খানা” প্রভৃতি লইয়া মহাসমারোহে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হাজি সাহেব জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন “তোবা, হামরা খানা কাঁহা !”

হায় হায়, কমবক্‌ত্‌ খানসামা হাজি সাহেবকে কি বিপদেই ফেলিয়াছে ! উৎকণ্ঠে গব্যস্থত ভিন্ন হাজিসাহেবের অত্র কোন স্নেহ-পদার্থ আদৌ সহ হয় না ! তাহার উপর অপরের রন্ধন হাজি সাহেবের মোটেই ঋচিকর হয় না। সেইজন্ত হাজিসাহেবের বিবি প্রত্যাহ সন্ধ্যায় সময় একটা মোরগ মারিয়া তাহাকে চালে বুলাইয়া রাখেন। পরদিন সেইটিকে ছাড়াইয়া কেবল একসের ঘৃতসহযোগে রন্ধন করেন। তাহাতে বিন্দুমাত্র জল পড়িবার যো নাই ; কেবল কিছু মেওয়া,

আফ্রান্, এলাচি, আর পেঁয়াজ। এই মোরগটা, একডজন “খাস্তা” পরেটা, কিছু উৎকৃষ্ট ফল, আধসের রাবড়ি আর আধসের উৎকৃষ্ট সিরনি (মিষ্টান্ন)—ইহাই হাজি সাহেবের রাত্রে নশ্তা (জলযোগ)। ইহার বাতিক্রম হইলেই সর্বনাশ। “কমবখ্ত” এই আসল জিনিষটাই দিতে ভুল করিয়াছে! এখন সার-রাত্রি উপবাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। লছ্মি চৌধুরী বলিলেন যে, কিউলে উৎকৃষ্ট ফলমূল যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেখানকার “রাবড়ি” এবং “মালাই”ও উত্তম। সেইখানে, কিছু ফলমূল আর রাবড়ি খরিদ করিয়া লইলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। “খয়ের” বলিয়া হাজি সাহেব মনকে প্রবোধ দিয়া তামাকু সাজিতে মনোনিবেশ করিলেন।

হাজি সাহেবের সহযাত্রী খাঁ সাহেব এতক্ষণ তাব্রকুট-ধুমাকর্ষণে ব্যাপ্ত ছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি উদাসীন ভাবে হাজি সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “চাকর বাকরদের উপর বিশ্বাস করিলেই বিপদ। এই দেখুন না কেন, খারাপ তামাক আমার সহ হয় না বলিয়া ৫০ টাকা খরচ করিয়া লক্ষ্মী হইতে একেবারে একমণ তামাক আনাইয়া রাখিয়াছি। তথাপি আসিবার সময় সে তামাক না দিয়া তাহাদের নিজেদের খাইবার “কডুয়া” তামাক একসের ইহার মধ্যে দিয়া দিয়াছে। এখন সমস্ত রাত্রিই “নেহাইৎ তক্লিফ্”। পথে ভাল তামাক পাইবার কোনই উপায় নাই।” হুঃখিতচিত্ত খাঁ সাহেব মুদিতচক্ষে তাব্রকুটধুমাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীএর মূল্যবান তামাকের অভাবে তাঁহার যে বিশেষ কষ্ট হইতেছে মুখ দেখিয়া এমন কোন লক্ষণ বুঝা গেল না।

পার্শ্বের গাড়ী হইতে সাক্ষ্য বাতাস কম্পিত করিয়া মাঝে মাঝে স্রব আসিতে লাগিল—

“পিছে চলত ভাই লছমন

আগে চলত রঘুবীর।”

গাড়ী কাজরা পৌঁছিয়া মাত্র ১০।১২ জন স্ত্রী-পুরুষ, লাঠি, বস্তা, ঝুড়ি, কোদাল প্রভৃতি লইয়া কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। চৌধুরী সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন; “ইয়ে গাড়ী নেহি। ইয়ে ডেঢ়া মাগুলকে গাড়ী হয়। আগে যাও।” কিন্তু তাহাদের অগ্রণী ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল “ও ডেঢ়া আর আঢ়াইয়া, আরে চলরে শুকরা।” বলিতে বলিতে হড়মুড় করিয়া সমস্ত দলবল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

খাঁ সাহেবেরা “ওঃ! ওঃ!! আরে ই কেয়া, ই কেয়া” বলিয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। চৌধুরী সাহেব গার্ড সাহেবের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। গার্ড আসিয়া বহুকষ্টে নিশানের দণ্ড প্রয়োগে তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল।

হাজি সাহেবের যুবা সঙ্গীটী এখনো কোন কথা কহেন নাই। এক্ষণে তিনি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁহার পরিচয় লইয়া জ্ঞানিলেন যে মৌলভি মহম্মদ মির্জা সাহেব একজন “আন্দীর” লোক। সেখপুরা অঞ্চলে যত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার আছেন, মৌলভি সাহেবের পরিবার তাঁহাদের মধ্যে বংশ-মর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইংরাজের সঙ্গে নবাব মিরকাশিমের যুদ্ধ বাধিলে, বলিতে গেলে একরকম তাঁহার “পরদাদার” (প্রপিতামহের) সাহায্যেই

ইংরাজের জয়লাভ হয়। মিরকাশিম তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার “পরদাদা” গবর্ণর সাহেবকে একবার “জবান” (কথা) দিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া কিছুতেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইতে স্বীকৃত হন নাই। কৃতজ্ঞ গবর্ণমেন্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মোলভি সাহেবের প্রপিতামহকে একখানি তিন হাজার টাকা মূল্যের তরবারি আর একলক্ষ টাকা আয়ের একটা “জাগীর” দান করেন।

তাঁহার পিতামহ এক ফকিরকে সেই জাগীর “ইনাম” দিয়া ফেলেন। তদবধি মোলভি-পরিবারের কিছু অর্থকষ্ট ঘটয়ছে।

চৌধুরী সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন “একলক্ষ টাকা আয়ের জাগীর একেবারে ফকিরকে দান করিয়া ফেলিলেন!”

ঈশৎ হাসিয়া মোলভি কহিলেন যে “বালা কালে তাঁহার পিতার একবার কঠিন পীড়া হয়। কলিকাতা, লক্ষৌ, দিল্লী, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানে যত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, সকলকে দেখাইয়াও কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না। অবশেষে এক ফকির দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ফকিরের চিকিৎসায় পিতা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হন। রোগ-মুক্তির পর ফকির তাঁহার পিতামহের নিকটে “ইনাম” চাহিতে গেলে, তিনি তাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের সমস্ত জমিদারী ফকিরকে লিখিয়া দেন! তাঁহার দুই চারিজন বন্ধু সে সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিল “একেবারে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি! ইনামটা বড় বেশী হইয়া গেল!” কিন্তু পিতামহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন “কুহু! নেহি। প্রাণের দাম লাখ টাকার

অনেক বেশী! আমি ফকিরকে কিছুই দিতে পারিলাম না!”

শুনিয়া পুলকিত চিত্তে খাঁ সাহেব ও হাজি সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন “ওঃ হোঃ হোঃ! উন্ হোনে বহত ঠিক তজ্জিজ্ (বিচার) কিয়া, জান্ কি কিস্মত (মূল্য) হাজার লাখ!!”

পিতামহের গৌরব-কাহিনী শ্রবণে উদ্বেলিত-হৃদয় মোলভি সাহেব সহাস্তমুখে দুই খিলি পান নিজ বদন-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, “মোচে” একটু “ইন্তর” (আতর) লাগাইয়া গড়গড়ায় ঝুলাইবার জন্য পূর্বসংকীর্ণ পুস্তকলিকার সাহায্যে মালা-রচনার প্রবৃত্ত হইলেন।

গাড়ী কিউলে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্লাটফর্ম প্রতিধ্বনিত করিয়া “রাবড়ি-মালাই,” “পুরী-মিঠাই,” “পান-বিড়ি-দিয়াশালাই,” “রোটি-কাবাব,” “হিন্দু-চা,” “কেলা-আম-কাঁকড়ি-নাশপাতি”—ইত্যাকার শব্দ নানা বিচিত্র সুরে সমুখিত হইতে লাগিল।

“নাশ্-তা” (জলযোগ) বঞ্চিত হাজি সাহেব “কেলাবালা” “কেলাবালা” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

কলাওয়াল নিকটে আসিলে হাজি সাহেব বলিলেন “কুছ মেওয়া হয়?” কলাওয়াল আপেল, নাশপাতি, আত্র, কদলী প্রভৃতি দেখাইল। কিন্তু তাহাদের মূল্যের কথা শুনিয়া হাজি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একান্ত হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা কাঁকড়ি কেয়া ভাউ?” কলাওয়াল বলিল “পরসা পরসা।” “তব্-তুম্-হারা সগদা বেচেন্কে মতলব নাহি হয়!”—

বলিয়া হাজি সাহেব অন্তর্দিকে মুখ ফিরাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে একটা অতিক্রম কঁকড়ি তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সেইটা উঠাইয়া হাজি সাহেব বলিলেন “আচ্ছা ইস্কো কেত্তা লেগে ?” ফলওয়ালী বিরক্ত হইয়া বলিল “এক আখেলা। আব্ লেনা হোয় তো লিজিয়ে ; এত্তা দেব মে হাম্ এক রোপেয়াকে সওদা বেচতে।” “খয়ের”—বলিয়া হাজি সাহেব আখেলা দিয়া কঁকড়ি গ্রহণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে ছুরিকা সাহায্যে তাহাকে ছাড়াইতে ছাড়াইতে সহযাত্রীগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন “আরে ভাই জারা নাশ্ তাই না করনা ? নাশ্ তাকে লিয়ে এহি কাফি (যথেষ্ট) হয়।” একজন হিন্দু ভদ্রলোক বলিলেন “হিঁয়া কা মালাই ভি বহুত আচ্ছা হয়।” চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাজিসাহেব কহিলেন “কুছ্ কামকা নেহি, বিল্ কুল আটা মিলায়া হয়। সাদিমে কাম পড়েনসে হিঁয়াকে রাব্ ডি মালাই হামেশে দু দশ মণ হামারা মকাম্ মে যা তাই হয়।” অগত্যা নিরুপায় হাজিসাহেব কঁকড়ি খাইয়াই এক বদনা ভলপান করিলেন। “মেওয়া” এবং “মোরগ মোসলম”—ভোজী হাজি সাহেবের ভীষণ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে প্লাটফর্মে এক মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল লক্ষপতি চৌধুরী সাহেবের সহিত টিকিট-কলেক্টরের মহা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। টিকিট কলেক্টর বলিতেছিল “তুমি without ticket travel করিতেছ ; যদি তুমি এখনি টিকিটের মূল্য ও penalty না দাও তাহা হইলে

আমি তোমাকে পুলিশে hand over করিয়া দিব।” চৌধুরী বলিতেছিলেন “I am a pass-holder. I forgot to bring my pass. Your Traffic Manager and Agent know me. I report against you.” টিকিট-কলেক্টর বলিল “Do what you like. I won't let you go.” চৌধুরী সাহেব হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফল হইল না। রেলওয়ে পুলিশের জমাদার আসিয়া তাঁহার ভার গ্রহণ করিল।

বাবু ঘমণ্ডিলাল তাঁহার মুরবির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কাণে পৈতা জড়াইয়া দ্রুতপদে লোটা হস্তে গাড়ীর পাইখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোলমালে শেঠজির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। চৌধুরীর দুরবস্থা দেখিয়া পাছকা-শোক-বিহ্বল শেঠজির মুখে কণি হস্তরেখা দেখা দিল। শেঠজি হাসিয়া বলিলেন “শালা চোড়ী। টিকিট খরিদ্ নে কো আওকাত (ক্ষমতা) নেহি, শালা বিশ লাখ্ কে গপ্ উড়া তা খা। হামারা সাড়ে সাত রোপেয়াকা জুতি নাশ্ কর দিয়া, শালা, বদমাস্ !”

কঁকড়ি-ভোজন-পরিভূষ হাজিসাহেব ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন “দো চার রোপেয়াকে ওয়াস্তে ইজ্জত বরবাদ করনা বহুত খারাব হয়।”

এক পরসার বরফ বদনার জলে ফেলিয়া দিয়া বাঁ সাহেব বলিলেন “সেরেফ্ এই ইজ্জত কে খেয়াল্ সে মেরা ওয়ালিদ (পিতা) হামেশা গাড়ী reserve করকে travel করতে থে।”

গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময়ে দুইজন “বাউন” গল্প করিতে করিতে দ্রুতবেগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েরই পরিধানে জীর্ণ মলিন বস্ত্র ও মিরজাই, কেবল মস্তকে একটা গুল টুপি।

উভয়ে কিছুক্ষণ উপবেশনের পর কোমর হইতে “খইনি” (দোস্তা) এবং চুণের ডিবা বাহির করিয়া “খইনি” প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। খইনি প্রস্তুত হইলে নিজ নিজ বদনে খইনি নিক্ষেপ করিয়া একজন অপরকে কহিল “রামসিং তোমার সে মোকদ্দমার কি হইল?” রামসিং কহিল “মোকদ্দমার আমারি জিত হইয়াছে। কোন সাক্ষী সাবুদ ছিল না। শেষে একটা জাল তমসুক বাহির করিয়া মোকদ্দমাটা “দ্রুত” করি। হাকিম তমসুক দেখিয়া আর কোন কথা শুনিল না।”

হরি সিং বলিল “তমসুক রেজিষ্টারি হইল কি করিয়া?”

রাম। আরে সেজ্ঞা ভাবনা কি? আমার চাকরটা গিয়া বলিল “আমি ভিখন সিং, আমিই তমসুক লিখিয়া দিয়াছি।”

হরি। সনাক্ত করিল কে?

রাম। তুমিও যেমন, সনাক্তের আবার ভাবনা? এক টাকা খরচ করিলে কত মোক্তার খুসী হইয়া সনাক্ত করিয়া দেয়! আজকাল আমাদের কুটুম্বেরা উকীল হইয়াছে, এখন উকীলেরও ভাবনা নাই!

কিন্তু তোমার খুনী মোকদ্দমাটা খুব বাঁচাইয়াছ যাহোক, হরি সিং!

হরি। কি করি তাই; কিছু খরচ হইয়া গেল। রাস্তায় “লাস” বদলাইয়া দিলাম। কনষ্টেবলকে ঘুণ দিয়া ওদের “মুর্দার” (মরার)

বদলে আমার চাচার লাস চালাইয়া দিলাম। সমস্ত মোকদ্দমা কঁাসিয়া গেল।

রাম। অ্যা! তোমার চাচা কি মারা গিয়াছেন?

হরি সিং কণ্ঠস্বর খুব নীচু করিয়া বলিল “আর ও কথা কেন বল? চাচা বুড়ো হইয়া ত একরকম “বেকার” হইয়াছিলেন, একটা কাজে লাগিয়া গেলেন।”

রাম। হাঁ সে কথা যথার্থ, আগে “জায়-দাদ” (সম্পত্তি), পরে “জান”। “জান” দিতে পারি, কিন্তু এক “ধূল” জমি ছাড়িতে পারি না।

গাড়ী সেখপুра আসিয়া পৌছিল। রামসিং ও হরি সিং গল্প করিতে করিতে নামিয়া গেল। তাহাদের পরিবর্তে “মেহ্দি”-রঞ্জিত শ্মশ্রু এবং স্থূল যষ্টি লইয়া আর একজন মুসলমান তাড়া-তাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া খাঁ সাহেব তাঁহার তাসুল-রঞ্জিত দস্তরাজি আমূল প্রকাশিত করিয়া কহিলেন “আঃ হা! হাকিম সাহেব! আইয়ে, আইয়ে,” হাকিম সাহেব আপনার জিনিস-পত্র গুছাইয়া খাঁ সাহেবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পর খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন “নবাব সাহেব—কি হাগত (অবস্থা) কেইনা?”

হাকিম সাহেব দ্বঃখের সহিত বলিলেন “কুচিকিংসায় তিনি শেষটা মারা গেলেন! আমি রোগীকে প্রায় আরাম করিয়াই আনিয়াছিলাম, কেবল একটু খাসের জোর আর “ছাতির ধড়ধড়ি” ছিল। গয়া হইতে বাঙ্গালী ডাক্তার আসিয়াই সর্বনাশ করিল! হাত ফুড়িয়া পিচকারি করিয়া কি দিল, আর দুই

ঘণ্টার মধ্যেই নবাবসাহেব “কজা” করিলেন ! আসল কথা, ইংরাজিতে “প্লেগের” কোন ঔষধই নাই। ইহার প্রকৃত ঔষধ হইতেছে মিছরির সরবৎ আর আফিং। পর্য্যায়ক্রমে মিছরির সরবৎ আর আফিংয়ের সরবৎ ২৪ ঘণ্টা দিতে পারিলে যেমনই রোগ হউক আরাম হইবেই। আমি এমনি করিয়া “হাজারো” রোগী আরাম করিয়াছি। খাঁ সাহেব সোচ্ছ্রাসে বলিলেন “আলবৎ। দাবাই তো ইউনানী। উহার কাছে অত্র চিকিৎসা কিছই নয়।”

এই বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে না হইতে গাড়ী ওয়ার্সেলিগঞ্জে আসিয়া পৌছিল। খাঁ সাহেব সপরিবারে বাটী যাইতে-ছিলেন। এইখানে তাঁহার নামিবার কথা। খাঁ সাহেব “পাক্কী” “পাক্কী” বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাক্কীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না। খাঁ সাহেব একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

“আবরু” রক্ষা করিয়া কিরূপে বিবিসাহেবাকে গাড়ী হইতে নামান যায়, ইহা বিষম সমস্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি দুইজন কুলিকে ডাকিয়া খাঁ সাহেব যবনিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট একখানির অধিক চাদর ছিল না। বিপন্ন খাঁ সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন “চাদর” “চাদর”! সকলেই আগ্রহাতিশয়ে বলিয়া উঠিলেন “হাঁ হাঁ, জরুর, জরুর!” কিন্তু কাহারও নিকট “তোয়ালিয়া” ভিন্ন আর কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না।

এই সময়ে ক্ষুণ্ণচিত্ত শেঠজি একখানি স্থল চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া স্বতের দর

মণকরা কত করিয়া চড়াইয়া দিলে সাড়েগাত টাকা জুতার মূল্য উঠিয়া যাইতে পারে, সুদিত চক্ষে সম্ভবতঃ এই কঠিন সমস্তার সমাধানে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। নিরুপায় খাঁ সাহেব তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া সবেগে শেঠজির গাত্রবস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া পত্নীর “আবরু” রক্ষার জন্ত ধাবমান হইলেন। চৈতন্তপ্রাপ্ত শেঠজি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ দিয়া প্লাটফর্মে পড়িলেন। খাঁ সাহেব ছুটিয়া গিয়া কুলির হস্তে চাদর দিয়া বলিলেন “জলদি করো। চাদর পাক্‌ড়ো।” কিন্তু কুলি চাদর ধরিবার পূর্বেই শেঠজি ব্যাঘ্রবিক্রমে খাঁ সাহেবের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন “শালা চোড়ী! চাদর লেকে ভাগত্যা?” শেঠজির বিশাল উদরের গুরুভারে খাঁ সাহেব মুহূর্ত্তে ধরাশায়ী হইলেন। বিপন্ন খাঁ সাহেব করুণ-স্বরে বলিলেন “আরে ছোড়ে ছোড়ে, গাড়ী খুলেগো।” শেঠজি গর্জিয়া উঠিলেন “কেয়া? ছোড়েগা শালা চোড়ী? তুমকে পলিশমে দেউঙ্গা।” খাঁ সাহেব শেঠজির বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই শেঠজির “জগদল” দেহ-ভার হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না।

হাজি সাহেব এবং হাকিম সাহেব উভয়েই গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন “ওঃ ওঃ কেয়া বদ্বৎ!” কিন্তু কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। দেধিতে দেধিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণে শেঠজির চৈতন্ত হইল। তিনি খাঁ সাহেবকে ছাড়িয়া চাদর লইয়া দ্রুতবেগে চলিষু গাড়ীর

পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিলামাত্র ষ্টেশন-মাষ্টার চীৎকার করিয়া উঠিলেন “হাঁ, হাঁ, খবরদার চল্‌তি গাড়ী মে মত্‌ চটো!” ষ্টেশনমাষ্টারের ইজিতে একজন কুলি শেঠজির কোমর ধরিয়া সজোরে ঝুলিয়া পড়িল। শেঠজি সশব্দে প্লাটফর্মের উপর পড়িয়া গেলেন। খাঁ সাহেব বিস্ময় পানস্ত্র ভাষায় আপনার হৃদয়, “কাহার” গণের নিবুদ্ধিতা, এবং শেঠজির “সয়তানি” সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে টেলিগ্রাম করিবার জন্ত ক্ষুণ্ণমনে “তার ঘরে” প্রবেশ করিলেন।

হাকিম সাহেব ও হাজি সাহেব নিজ নিজ আগনে পুনরাসীন হইয়া উভয়েই হৃৎকের সহিত বলিলেন যে গাড়ীতে ভদ্রমহিলার “আবরু” রক্ষা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। মোলভি মহম্মদ মির্জা সাহেব কহিলেন “ইহার একমাত্র উপায় আছে। আমার “ওয়ালিদ” (পিতা) বরাবর সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন এবং আমিও এ বিষয়ে সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হইলে আমরা একখানি করিয়া থোলা কয়লার গাড়ী (coal truck) আনাইয়া লই। তাহারই উপর বেহারারা “ঘেরা টোপ” দেওয়া পাকী সমেত স্ত্রীলোকদের উঠাইয়া দেয়। যেখানে নামাইবার প্রয়োজন

হয়, সেখানে পাকীসমেত নামাইয়া লয়। ইহাতে ২০০।১০০ খরচ হয় বটে, কিন্তু এরূপ না করিলে কিছুতেই ইজ্জত থাকে না।”

মির্জা সাহেবের অদ্ভুত আবিষ্কার-কাহিনী শ্রবণে মুগ্ধ হাকিম ও হাজি সাহেব কহিলেন “বাহবা! ইয়ে আপন্নে বহত্‌ হি উম্মদা তরিকা (কৌশল) নিকাল। সাবাস!”

মির্জা সাহেব বলিলেন আমাদের “খান্দানে” (পরিবারে) ইজ্জতের খেয়ালটা বরাবরই খুব বেশী। একবার আমার “চাচী” প্রসবকালে কিছুতেই প্রসব হইতে পারেন না। প্রতিবেশীরা সকলেই আসিয়া ধরিল একবার ডাক্তার সাহেবকে আনান হউক, নহিলে জীবন-সঙ্কট। কিন্তু আমার চাচা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন “জানুসে ভি ইজ্জত বড়া; জান যায় মো কবুল, কিন্তু আমি “বে-ইজ্জতি” হইতে দিব না! চাচী মারা গেলেন, তথাপি চাচা নিজের ইজ্জত নষ্ট হইতে দিলেন না।

দীর্ঘশ্বাস ৫জুলিসাহায্যে আলোড়িত করিয়া হাজি সাহেব বলিলেন “আলবৎ। ইজ্জতকে খেয়াল এইসাই হোনা চাহিয়ে।”

গাড়ী নওয়াদা পৌছিল। টেলিগ্রাম পাইয়া টিকিট কন্ট্রোল আসিয়া শেঠজির মোট এবং খাঁ সাহেবের রোদনরতা বিধি সাহেবাকে নামাইয়া লইল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

দুর্ভাগ্যের কাহিনী

—•—

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় স্তর

(১)

মণ্টফারমিল, ফ্রান্সের একটি গণ্ডগ্রাম।
সহর হইতে অনেকটা দূর, তবে ডাকগাড়ীর
পথে বলিয়া কতকটা সহর-ধোঁসা; একটিমাত্র
সরাসি; যাত্রীরা সেইখানেই আসিয়া উঠিত।
থেনেডিমার-পরিবার তাহার একমাত্র স্বত্বাধি-
কারী এবং একাধারে পাচক, ভৃত্য এবং পরি-
বেশক। অনর্থক ব্যয়বাহুল্য বলিয়া তাহার
পরিচারক বা পরিচারিকা রাখিত না;
সরাসিয়ের আয় হইতে কষ্টে-স্বষ্টে একরূপে
তাহাদের কাটত।

সে দিন প্রাতঃকালে, থেনেডিমারের স্ত্রী,
সদর দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া, রাত্তার
অপরপার্শ্বে ক্রীড়ারতা তাহার কণ্ঠাধ্বয়ের প্রতি
চাহিয়া চাহিয়া, আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া
গান ধরিয়াছিল। কত্না দুইইই শিশু, - একটির
বয়স আড়াই, অপরটির বয়স দেড় বৎসর
মাত্র; হুঁজনে একটা ভাঙ্গা গাড়ীর শিকলের
দোলনা করিয়া খুব দোল খাইতেছিল, আর
মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া
পড়িতেছিল। সে নিরুলল সরল মুখ হইটি
আনন্দে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল;
বাতাসে তাহাদের কুঞ্চিত কেশজুচ্ছ উড়িয়া

উড়িয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল;
পার্শ্বস্থ উদ্যান হইতে বেলিমল্লিকার গন্ধটুক
যেন তাহাদের গাত্রসৌরভ লইয়াই ভাসিয়া
আসিতেছিল। সতর্ক এবং স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে
তাহাদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া জননী
গাহিতেছিল—

এমন সময় পশ্চাদ্ধিক হইতে মধুর কণ্ঠে
কে বলিয়া উঠিল—“বেশ সুন্দর মেয়ে ছুটি ত'
আপনার!”

প্রশ্নকর্ত্রী এক যুবতী; তাহার কোলে
শিশু কত্না, দক্ষিণ হস্তে একটা ভারি ব্যাগ।

অপূর্ব স্ত্রী সে শিশুকত্তার! বিধাতা
যেন আপন ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়িয়া,
তুলিকা দিয়া তাহার অঁাখিপক্ষ এবং যুগ্ম ক্র
চিত্রিত করিয়াছিলেন। রাজকত্তার ত্রায় তাহার
আভরণ ও বেশভূষা। জননীর স্নেহশীতল
বক্ষে বালিকা ঘুমাইতেছিল। জননীর কিস্ত
বেশভূষার কোন পারিপাটা ছিল না; দীন-
দরিদ্রার ত্রায় তাহার আকৃতি, অঙ্গুলিগুলি
স্ফুটিক্ত,—তাহাকে যে খাটিয়া খাইতে হয়
তাহাতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। তথাপি
লুকাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার মুক্তাধবল দস্ত-
পাতি অশ্রুসজল চক্ষু, অবতরিত আভাঙ্ক-
লম্বিত ঘনকৃষ্ণ কৃষ্ণিত কেশদাম, এবং মুখের
সে বিষম মাধুরীতে, তাহার অল্পম সৌন্দর্য্য
ফুটিয়া উঠিতেছিল। জননী ক্রোড়স্থ শিশুর

প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন,— সে দৃষ্টি কেমন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ; স্তম্ভদাননিরতা জননী ধাত্রীকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিবেন ।

কে সে জননী ?—সে ফ্যান্টাইন ।

এইখানে আমরা একটা পূর্বকথা বলিব ।
কে এ ফ্যান্টাইন ?

ফ্যান্টাইন দরিদ্রা শ্রমজীবিকতা । যৌবনের প্রারম্ভে প্রতারকের কুহকে ভুলিয়া সে আজন্মের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসে ।— থেলোমিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াই সরলাকে ভুলাইয়া আনে । কিহ, একদিন, দু' দিন, সপ্তাহ, মাস, করিয়া ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর কাটিল, তবু থেলোমিয়ে তাহার সে প্রতিজ্ঞা পালন করিল না । নানা ছলে, নানা কৌশলে সে সে কথা চাপা দিতে লাগিল । অবশেষে একদিন সহসা সে যখন অন্তর্দান করিল, তখন বালিকা সত্যই অকূল পাথারে পড়িল । হায়, সে যে থেলোমিয়েকে তাহার সর্বস্বই দিয়াছিল,—পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া সে ত কিছুবই বিচার করে নাই,—বিবাহিতা স্ত্রীর মতই সে যে আপনাকে উৎসর্গিত করিয়াছিল । বালিকা চারিদিক্ শূন্য দেখিল,—সে তখন অস্তবত্নী !

তাহার নিজের অলঙ্কারাদি যাচা ছিল, একে একে বিক্রয় করিয়া সে কয়েক মাস চালাইল । তারপর, অনেক অনুসন্ধানে থেলোমিয়ের ঠিকানা জানিয়া, একদিন এক সাধারণ মুহুরীকে দিয়া তাহাকে একখানি পত্র লিখিল—নিজে সে লেখাপড়া জানিত না । থেলোমিয়ে তখন ‘মথুরার রাজা’ ; ‘ব্রজের কথা’ আর তখন তার মনে থাকিবে কেন ? তাই সে ফ্যান-

টাইনের পত্রের কোন উত্তর দিল না । ফ্যান-টাইন তার পর উপযুগপরি আরও দুইখানি পত্র লেখাইল,—তাহাতেও কোন ফল হইল না । তার নিজের প্রতি না থাকুক, তাঁর আপন সন্তান—নিষ্কলঙ্ক স্বর্গের ছবি তার প্রতিও তাঁর দয়া নাই ?—অভাগিনীর শূন্য দেউলের ক্ষীণ দীপশিখা কমশঃ নির্বাকগোমুখী হইতে লাগিল ।—স্বেচ্ছায় সে ইহজীবনের সব সুখ নষ্ট করিয়াছে, ক্ষণিক সুখের মন্থনে যে হলাহল উঠিয়াছে আজীবন সে বিষ তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে বালিকা তাহা বুঝিল । তাহার প্রকৃতি অল্পরূপ হইলে তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না ; যাহার সে অল্পপম রূপসম্পত্তি, তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব কি ? কিন্তু আমরা জানি তাহার প্রকৃতি অল্প ধাতুতে গঠিত ছিল ; সংসারানভিজ্ঞা বালিকা একবার মাত্র পদস্থলিতা হইলেও, রমণীসুলভ সঙ্কোচ এবং পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্টা হইবার সে প্রবৃত্তি তখনও তাহার হয় নাই ।

ভালবাসা জীবনের ভ্রান্তি ; হয় ইউক, কিন্তু ফ্যানটাইনের সারল্যের ছবিখানি সে ভ্রান্তির সলিলের উপর ভাসিতেছিল—এ কথা আমরা শতবার বলিব । যে দেবতার চরণে সে তাহার যৌবনের প্রথম আবেগ, জীবনের প্রথম প্রণয়, অন্তরের প্রথম অর্ঘ্য উৎসর্গিত করিয়াছিল,—প্রতারিতা হইয়াও, কার্য্যে বা চিন্তায় তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতে সে চাহে নাই ; তাঁহার প্রসাদী ফুল অল্প কোন দেবতার চরণে অর্পণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই । প্রথম যৌবনে সর্বপ্রথম যে মূর্ত্তিকে জ্বীলোকে একবার বরণ করিয়া লয়, যাহার

মধ্যে সৰ্ব্বপ্রথমে সে একবার আত্মবিসৰ্জন করে, সে দেবতার আসন তাহার হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিতই থাকে; উপেক্ষায়, বিচ্ছেদে, ঘটনাচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতে, সে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, প্রথম প্রেমের স্মৃতি, হৃৎথে মধুর আশায় উজ্জ্বল হইয়া, চিরদিন তাহার জীবনে এক অমুপম মাধুরী সঞ্জন করিয়া রাখে। ‘হৃৎথের বেশে আসিলে’ও চিরদিবসের সে রাজার জন্ত চিরদিন তাহার হৃদয় উন্মুখী হইয়া থাকে।—ফ্যানটাইন তখনও পর্য্যন্ত সেই একনিষ্ঠা সাধিকা ছিল। তাই সংসারের নিম্নাঙ্গিকভাষ্য এবং ঘটনাচক্রের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়াও তখনো সে তলাইয়া যায় নাই। কিন্তু অর্থহীনা নিঃসহায়া তাহার অবস্থা প্রতিদিনই শোচনীয়তর হইয়া উঠিতেছিল; তাহা বুঝিয়াই, ‘শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়’ ভাবিয়াই, প্রাণপণে আপনাকে প্রলোভনের হাত হইতে সে দূরে দূরে রাখিতে লাগিল। অবশেষে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করাই সে স্থির করিল। বহুদিন হইতে তাহার প্রবাসী হইলেও, সেখানে কেহ না কেহ তাহাকে চিনিয়া দয়া করিতে পারে, কাজকর্মেরও তাহার সুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহার কোলের শিশু? তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যে অসম্ভব; তার অস্তিত্বের কথা তাহাকে গোপন করিতে হইবে। ভাবী বিচ্ছেদের চিন্তায় চিত্ত অধীর হইয়া উঠিলেও, সে অর্ধৈর্ধ্য তাহাকে দমন করিতেই হইবে। কিন্তু কোথায় সে তাকে রাখিয়া যায়? সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ খেনেডিয়ারের কথা হুইটির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল; তাহাদের

সে শিশুসুলভ আনন্দোচ্ছাস, অকলঙ্ক সরল মুখচ্ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করিল। তার যেন দেবদূতের গ্রাস তাহাকে বলিতেছিল—“এই ই দর্গ, এইখানে আয়।” অভাগিনী মুগ্ধা হইল, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া খেনেডিয়া-পত্নীর কাছে যাওয়া তাই সে মৃদুস্বরে বলিল—“সুন্দর মেয়ে দু’টি ত আপনার!”

অতি হিংস্র পশুও অপরকে তাহার সন্তানদের আদর করিতে দেখিলে, শাস্ত হইয়া আসে; খেনেডিয়া-পত্নী ত দূরের কথা। তাই মুখ তুলিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, আগন্তুকাকে সে বসিতে বলিল। পরিচয়ে বলিল—“আমি খেনেডিয়া-পত্নী; এটা আমাদেরই সরাই।” তারপর গুণ্ গুণ্ করিয়া পুনরায় গাছিতে লাগিল;—

খেনেডিয়া—অন্ততঃ সে নিজে এইরূপ প্রচার করিত—বহুপূর্বে সৈন্তদলভুক্ত ছিল; এবং বিখ্যাত ওয়াটলু যুদ্ধের সময় সে না কি কোন এক আহত সেনাপতিকে বদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করে। সেই ঘটনার উপলক্ষ্য করিয়াই সে “ওয়াটলু সার্জেন্ট” বলিয়া তাহার সরাইখানার নামকরণ করিয়াছিল। তার পত্নীও সৈনিকের যোগ্য স্ত্রী; তাহার পাটল কেশ, তাত্রাভ গাভবর্ণ, এবং অসম কর্কশ দেহবৃষ্টি দেখিয়া সকলেই বলিত—“যোগ্য যোগ্যেন যুক্তং।” তবে স্ত্রীর জীবনে একটু বৈচিত্র্য ছিল,—বটতলার এবং বাঙে নাটক নভেল পড়িয়া কতকটা নায়িকাশূলভ নভেলী ভাব তাহার মধ্যে কঠোরে কোমলে মিশিয়া ছিল। তত্রাচ, সে বসিয়া ছিল তাই, নতুবা তাহার পূর্ণ অবয়ব এবং সম্পূর্ণ মুখখানা

দেখিলে ফ্যানটাইন হয় ত সম্ভ্রান্ত। এবং সন্দ্বিধা হইত ; কি করিত বলা যায় না, হয় ত কত্নাকে সেখানে রাখিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিত।—কিন্তু বিধির নির্বন্ধ অত্কল্প। এমনি সামান্য সূত্রের উপর কত সময় মানবের অদৃষ্ট চলিতে থাকে।

আগন্তুকা আপন জীবন-ব্রহ্মসু, সময়ো-পযোগী কতক পরিবর্তিত করিয়া, বর্ণনা করিল। বলিল - “তাহার স্বামী পারীতে দিনমজুরের কাজ করিতেন, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় অনাথা শিশুকত্নাকে লইয়া সে কাজের সন্ধানে অত্ৰত যাইতেছে, দরিদ্রা সে, তাই সে প্রায় সব পথটাই হাঁটিয়াই আসিয়াছে, মেয়েকেও কতক হাঁটিয়াছে,— তাই তার চাঁদের কণা ক্লান্ত হইয়া তার বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ইত্যাদি” বলিয়া কত্নাকে দৃঢ়তরালিঙ্গনবন্ধা করিয়া সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন করিল।

সে স্পর্শে শিশু জাগিয়া উঠিয়া, আয়ত স্নানীল নেত্রে জননীর প্রতি চাহিল।—কি দেখিল?—কিছুই নয় ; অথচ সবই যেন সে দেখিল। তারা যে দেব-দূত তা বুঝি শিশুরা বোঝে, আমরা যে দুর্বল মানব তাও বুঝি তারা জানে ; তাই আমাদের সন্দ্বিধা পুণ্যের পার্শ্বে তাদের উজ্জ্বল পবিত্রতার ছবি এমন সারল্যে কোমল, গান্তার্যো মধুর।

কত্নাকে ফ্যানটাইন ধরিয়া রাখিতে পারিল না ; ক্রোড় হইতে স্থলিতা হইয়া ক্রীড়ারতা বালিকা দুইটির প্রতি সে ছুটিল। থেনেডিয়ার-পত্নী তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্তে বলিল,— “বেশ হয়েছে। তিনটিতে খেলা কর।”

সে বয়সে ভাব হইতে বিলম্ব হয় না।

মুহূর্তের মধ্যে তিন জনে পূর্ণ উৎসাহে ‘গর্ত কাটাকাটি খেলা’ খেলিতে আরম্ভ করিল। নবাগতার উৎসাহই খুব বেশী ; শিশুর আনন্দোচ্ছ্বাসে জননীর অন্তর-ছবিখানি প্রতি-ফলিত হয়, এ কথা খুবই সত্য।

কিয়ৎক্ষণ পরে থেনেডিয়ার-পত্নী প্রশ্ন করিল—“তোমার মেয়ের নাম কি বাছা?”

“কসেট।”

“ক’ বছরের হল?”

“এই তিন চল্ছে।”

‘তা হ’লে ত আমার বড়টির বয়েসী।’

শিশু তিনটি তখন বিস্ময়চকিত ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তার বিশেষ কারণও ছিল। একটা বৃহৎ কীট মাটি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তা দেখিয়া তাহাদের কত ভয়, অথচ কি আনন্দ! তাহাদের ক্ষুদ্র ললাট তিনটি পরস্পর সংলগ্ন, তিনটি ক্ষুদ্র মস্তকের উপর একটি দিব্যালোকসম্পাত!

“ছেলেরা কেমন এক দণ্ডে ভাব করে নেয় দেখেছ? তিনটিই যেন এক মায়ের পেটের!”

ফ্যানটাইন বুঝি এতক্ষণে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। থেনেডিয়ার-স্ত্রীর হাত ছুটি ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল—“আমার মেয়েটিকে, আপনার কাছে রাখবেন?”

প্রবীণা বিস্ময়ে নবীনার প্রতি চাহিল। সে চাহনিতে ‘হাঁ’ কি ‘না’ কিছুই বুঝা গেল না। ফ্যানটাইন পুনরায় বলিল—“মেয়েকে নিয়ে ত আর আমি সেখানে যেতে পারি নে। সঙ্গে নেজুড় থাকলে কোথাও কাজ পাব না। তাই ভগবানই বুঝি দয়া করে আমাকে এ দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার মেয়ে

হুটিকে যখন দেখলাম, তখন মনে হল,—
এদের মা নিশ্চয়ই খুব ভাল, আর কসেটও
এদের সঙ্গে হেসে খেলে আপনার বোনের
মত বেশ সুখে থাকবে।—ক’ দিনই ত !
তার পর আবার আমি এসে নিয়ে যাবো।
কসেটকে আপনি রাখবেন ?”

“তাই ত, আচ্ছা ভেবে দেখি।”

“আমি মাসে মাসে তার খরচ বলে ছ’
ফ্রাঙ্ক করে দেবো।”

এমন সময় বাটীর অভ্যন্তর হইতে পুরুষ-
কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—

“সাত ফ্রাঙ্কের কম হবে না—আর, ছ’
মাসের টাকা আগাম চাই।”

প্রবীণা বলিল—“ছ’ মাসের হিসাবে তা
হলে ত ৪২ ফ্রাঙ্ক হয়।”

নবীনা।—“বেশ, তা দিচ্ছি।”

পুনরায় নেপথ্য হইতে থেনেডিয়্যার বলিল
—“আর, প্রথম প্রথম বার্তি খরচের জন্য তা
ছাড়া ১৫ ফ্রাঙ্ক বেশী চাই—”

প্রবীণা।—৪২ আর ১৫,—সবশুদ্ধ তা
হলে ৫৭ হয়।

নবীনা।—“তাও দেবো—আমার কাছে
এখন ৮০ ফ্রাঙ্ক আছে ; তা থেকে ৫৭ গেলেও
যা থাকবে তাতে এখন কিছুদিন আমার চলে
যাবে। না হয় হাঁটাপথেই যাবো, তাতে
খরচেরও কিছু সাশ্রয় হবে। তার পর, কাজ
কর্ম জুটলে, হাতে কিছু টাকা করে, ফিরে
এসে আমার সোণাকে নিয়ে যাবো।”

নেপথ্য হইতে—“মেয়ের জামা কাপড়
আছে ত ?” এইবার প্রবীণা মৃদুস্বরে নবীনাকে
জানাইল—“উনি আমার স্বামী।”

নবীনা।—আমি তা বুঝেছিলাম। জামা

কাপড় আছে বই কি, যথেষ্টই আছে ; ভাল
ভাল রেশমী পোষাক,—সব একডজন করে
আছে। আমার হাতের এ কার্পেটের ব্যাগটা
ওরই জিনিষপত্রে ভরা।

পুনরায় নেপথ্য হইতে—“সে গুল্লা সব
রেখে যাবে ত ?”

“নইলে কোথায় নিয়ে যাবো—এত
পোষাক থাকতে কি মেয়ে আমার জ্বাংটো হয়ে
থাকবে ?”

এতক্ষণে খেনাডিয়্যার বাহিরে আসিল।
বলিল “তা হলে আর আমাদের আপত্তি নেই।”
সেইভাবেই বন্দোবস্ত হইল। ফ্যানটাইন,
রাত্রিটা সেই সরাইখানাতে থাকিয়া, প্রাতঃ-
কালে, থেনেডিয়্যারদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া,
কত্নাকে সেখানে রাখিয়া রওনা হইল। খুব
শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া কত্নাকে আপনার কাছে
লইয়া যাইবে, তাহার মনে তখন সেই আশা।
তত্রাচ সহজভাবে কত্নার কাছে বিদায় লইলেও
এক একবার সে দারুণ নিরাশাভারে লুটাইয়া
পড়িতেছিল।

ফ্যানটাইন চলিয়া গেলে, থেনেডিয়্যার
তাহার স্ত্রীকে বলিল—“আঃ, বাঁচা গেল।
সেই ১১০ ফ্রাঙ্কের দেনাটা কাল শোধ দেবার
দিন, গোটা ৫০ ফ্রাঙ্ক কম পড়্ছিল—কি
করব্ তাই আকাশ পাতাল ভাব্ছিলাম ;
হয় ত কাল সকালে দোকানে ‘সিলই’ বা পড়ত !
ভাগ্যি ভূমি তোমার বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে এমন
ইছুর-কল পেতে ছিলে !”

“হাঁ,— তবে অজান্তিতে, এই যা !” বলিয়া
প্রবীণা মৃদু হাস্য করিল।

কলে ইন্দুর ধরা গাড়িয়াছিল।—সে ইন্দুর-
শিশু কসেট। শিকার ক্ষুদ্র হউক, তাহা

দেখিয়াই মাজ্জারী সানন্দে লাক্সলাফালন করিতেছিল।

কাহারো এই থেনেডিয়ার-পরিবার? বংশ হিসাবে ধরিতে গেলে, তাহাদিগকে মিশ্র-বংশজ বলিতে হয়। নিম্নতম বংশ হইতে ক্রমোন্নত সম্প্রদায়, এবং অবস্থাবিপর্যয়ে অধঃপতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী—উভয়ের মিশ্রণে যে শ্রেণী উৎপন্ন হয়, থেনেডিয়ারেরা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে, থেনেডিয়ারদের রীতিনীতি সেইরূপ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজাত ভদ্রতা বা শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের চিন্তের উদারতা কিছুই তাহার পায় নাই। জ্ঞানী-পুরুষ উভয়েই অতি সঙ্কীর্ণ মনা ছিল;—সামান্য কারণেই তাহার পিশাচসদৃশ হইয়া উঠিত,—তাহাদের অননুষ্ঠেয় কোন পাপ-কার্যই ছিল না। এমন মানব অনেক আছে যাহারা প্রতিদিনই ‘আপনা রচিত জালে আপনি জড়িত’ হইয়া, জীবনে ক্রমশঃ গাঢ়তর অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া থাকে;—পশ্চাদিকেই তাহাদের জীবনের গতি, পুরোভাগে নহে; তাহাদের জীবন চিররহস্তাচ্ছন্ন, সর্বদাট যেন কি এক আশঙ্কায় তাহারো সম্ভ্রান্ত; তাহাদের পাপপূর্ণ চরিত্রের ছায়া সর্বদাই তাহাদের মুখে ঘনীভূত হইয়া থাকে, সামান্য ছ’একটি কথায়, মুখ ভাবে, তাহাদের অতীতের গুপ্ত পাপকাহিনী এবং ভবিষ্যতের অন্ধকারময় ঘটনার ইঙ্গিত যেন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। থেনেডিয়ার ও তাহার জ্ঞানী সম্বন্ধে এ কথা খুবই পাটে।

পাপ যতই আপাতঃ বলবান হউক না কেন, সকল সময় তাহা হইতে সম্পদ আসে না; থেনেডিয়ারদের ব্যবসায়ই তাহার প্রমাণ—

কোনও রূপে তাহাদের চলিতেছিল মাত্র। দেনার দায়ে সরাইখানা প্রায়ই বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। ফ্যানটাইনের প্রদত্ত ৫৭ ফ্রাঙ্ক এ যাত্রা তাহাদিগকে উত্তমর্ণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু পরমাসে পুনরায় সেইরূপ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল; তখন থেনেডিয়ারের জ্ঞানী কসেটের মূল্যবান পরিচ্ছাদাদি পারায়ীতে লইয়া যাইয়া ৬০ ফ্রাঙ্কে বন্ধক দিয়া আসিল। সে অর্থও যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন হইতে তাহারো কসেটের সহিত অনুগ্রহজীবীর ভ্রায় ব্যবহার করিতে লাগিল। মূল্যবান পোষাকের যাহার অভাব ছিল না, থেনেডিয়ার-কন্তাদের পরিত্যক্ত—অর্থাৎ শত-চ্ছিন্ন, অব্যবহার্য—বস্ত্রাদিতে তাহার দেহতাপ রক্ষা হইতে লাগিল; তাহাদের উচ্ছিষ্ট অন্নবাক্সনে কোনোরূপে তাহার উদরপূর্তি ঘটিতে লাগিল। অথচ এদিকে ফ্যানটাইন প্রতিমাসেই পত্রোত্তরে জানিতে লাগিল—“কসেট ভাল আছে, বেশ মনের স্তুতিতেই আছে।”—নির্দিষ্ট ছয়মাস অতীত হইয়া গেলে, ফ্যানটাইন চুক্তিমত, তাহার মাসিক দেয় ৭ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিল। উত্তরে থেনেডিয়ার লিখিল—“৭ ফ্রাঙ্ক কি হবে? এখন থেকে ১২ ফ্রাঙ্ক করে চাই।” পরমাসে ফ্যানটাইন ১২ ফ্রাঙ্কই পাঠাইল;—মেয়ে ভাল আছে,—কাজেই সে কোন আপত্তি করিল না।

লোকচরিত্র চিরদিনই দুজ্জের। অনেক চরিত্রে ভালবাসা এবং হিংসা পাশাপাশি গ্রথিত থাকে। থেনেডিয়ারের জ্ঞানী আপন কন্তা ছ’টিকে যে পরিমাণ ভালবাসিত, কসেটের প্রতি তার

সেই পরিমাণ ঘৃণা ছিল। অবশ্য সেটা সঙ্কীর্ণ-মনের লক্ষণ; জননীর ভালবাসা এতটা সঙ্কীর্ণ হওয়া পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমরা কি করিব? আমরা যেমনটি দেখিয়াছি তেমনই লিখিতেছি;—তবে সংসারে এমন জননীও অনেক থাকে। কসেট শিশু কসেট-তাহার গৃহে তাহার কথা দুইটির সহিত আলো-বাতাসের ভাগ বন্টাইতে আসিতেছে—তাই সে ভাবিত, আর জলিয়া মরিত। আদর, যত্ন, হাতটান—তিনটাই তার পূর্ণমাত্রায় ছিল,—কসেটের অভাবে, এতটা স্নেহ থাকিলেও, হয় ত তিনটাই সম-ভাবে কষ্টাদের উপর বণিত হইত; কিন্তু কসেট আসিয়া অবধি কিল চাপড়ের ভারটা সবই আপনার উপর লইল, আদর যত্ন যা কিছু সবই তাহাদের জন্ত রাখিয়া দিল। তত্রাচ তাহার নিস্তার ছিল না।—অসহায়া, কে মলা, সংসারানভিজ্ঞা, বালিকা দণ্ডে দণ্ডে নির্যাতিত হইত, আর তাহারই পার্শ্বে অপর দুইটি বালিকা স্নেহের শীতল ছায়ায় বসিয়া থাকিত।—এমনই সংসার!

শুধু জননী বলিয়া নয়, কষ্টাদ্বয়ের—ইপোনাইন ও এজেলমারেরও—ব্যবহার বড় নিষ্ঠুর ছিল। তাহাদের কি দোষ? সে বয়সে বালিকারা ত জননীরই প্রীতিচ্ছায়ামাত্র; সে ছায়া আয়তনে ক্ষুদ্র—এই যা!

এই ভাবে বৎসর দুই কাটিল। প্রতি-বেশিনীরা সব কথা জানিত না; তাহারা ভাবিত, জননী বৃদ্ধি আর কসেটের কোন উদ্দেশ্য লয় না। তাই তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত—“যা হোক, থেনেডিয়ারদের খুব ভাল বলতে হবে কিন্তু বাছা। পরের

মেয়েকে ঘরের কড়ি দিয়ে কে পোষে বল ত?”

ক্রমে ক্রমে কসেটের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে থেনেডিয়ারের মনে সন্দেহ জন্মিল; তাই সে জো পাইয়া তখন হইতে মাসিক ১৫ ফ্রাঙ্কের দাবী করিয়া বসিল, লিখিল—“মেয়ে এখন বড় হচ্ছে, বেশী খাচ্ছে, এর কমে হবে না।” পরমাস হইতে ১৫ ফ্রাঙ্ক করিয়াই তাহার নিকট আসিতে লাগিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, কসেটের দুর্দশাও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। যতদিন সে নিতান্ত শিশু ছিল, ততদিন ইপোনাইনদের কৃত অপরাধের সমস্ত শাস্তি তাহাকে বহন করিতে হইত; পাঁচ বৎসরে পড়িতেই বাটার পরিচারিকাক্রমে সে গণ্যা হইল। পাঠক, কথাটা আশ্চর্য্য ভাবিবেন না; এমনই ঘটনা থাকে! বিখ্যাত দস্যু হুমলার্ডের বিচারে কর্তৃপক্ষের নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, উদরাম-সংস্থানের উপায়ান্তর না দেখিতে পাইয়া, পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালে দস্যুদলপতি হয়। অতএব কসেট যে সে অল্প বয়সে অবস্থাবিপর্ধ্যয়ে দাসীগিরি করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

চিঠিপত্রাদি লইয়া যাওয়া, ঘরদ্বার উঠান প্রভৃতি কাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, ছোট খাট মোট-ঘাট বহা;—এ সকলই এখন হইতে তাহাকে করিতে হইত। বিশেষতঃ কয়েক মাস হইতে ফ্যানটাইন টাকা পাঠাইতে পারে নাই, কাজেই থেনেডিয়ারেরা বরং জোর করিয়াই তাহাকে বেশী বেশী খাটাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ ফ্যানটাইন ফিরিয়া

আসিলে, কসেটকে দেখিয়া কখনই আপনার কন্ঠা বলিয়া চিনিতে পারিত না,—তিন বৎসর পূর্বের সেই নধরদেহা বালিকা এতই শীর্ণা হইয়া গিয়াছে ; অত্যাচার এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়া সে ক্ষুদ্র বালিকা এই বয়সেই এতই গম্ভীরপ্রকৃতি এবং এমনই লুপ্ত-শ্রী হইয়া পড়িয়াছে ! থাকিবার মধ্যে চক্ষু দুইটি তার আজিও তেমনি আগ্রত ছিল,—তাহাতে বুঝি তাহার দীনভাবটুকু আরও পরিষ্কৃত হইয়া থাকিত। খেনেডিয়ারেরা তা দেখিয়া বলিত—“পাজি ছুঁড়ি ! হাড়ে হাড়ে সয়তানি !”

দারুণ শীতের সময়েও, প্রত্যাষে উঠিয়া, শতছিন্ন গাত্রবস্ত্রে, কাঁপিতে কাঁপিতে, ছোট ছোট হাত দু’খানিতে প্রকাণ্ড সম্ভারজ্ঞানী লইয়া তাকে ঘরদ্বার কাঁট দিতে হইত। গ্রামের লোকেরা তাই তাহার নাম দিয়াছিল—“চাতক পাখী।” চাতক পাখীটির মতই দেখিতে সে ক্ষুদ্র ছিল, তাহারই মত প্রত্যাষে সকলের আগে উঠিতও বটে ; তবে উভয়ের মধ্যে একটু মাত্র প্রভেদ ছিল ;—এ চাতকে গান গাহিত না, বুঝি গান সে জানিত না !

ফ্যানটাইনের কি হইল, এখন তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

যথাসময়ে সে তাহার পিতৃগ্রাম ম—তে আসিয়া পৌঁছিল। বহুদিন পূর্বে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেলেও, আব্হায়া মত কতকটা তাহার মনে ছিল ; কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া সেটাকে স্বগ্রাম বলিয়া প্রথমতঃ সে চিনিতেই পারিল না,—এখন তাহার এতই পরিবর্তন ঘটয়াছে। যেখানে সামান্য কয়েক ঘর গৃহস্থ পরিবার লইয়াই গ্রামের সমগ্র জন-সংখ্যা ছিল এখন সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল-

কারখানা, অজস্র দোকান-পাট, কত নূতন নূতন অট্টালিকা,—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিসে সে গ্রামের এখন এমন অভাবনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইল তাই বলিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ম—গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, কয়েক ঘর শ্রমজীবী মাত্রই সেখানে বসতি করিত—পুরুষাভুক্রমে তাহারা কালো বনাত ও কালো কাঁচের চুড়ির ব্যবসায় করিত।—কিন্তু কাঁচা মাল (Raw materials) দুর্ন্যূনা হওয়ায়, বাধা হইয়া তৈয়ারী জিনিসের দাম তাহাদের চড়াইতে হইত—কাজেই দামী বলিয়া বাজারে তত কাটতি ছিল না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কিন্তু একজন বিদেশী লোক আসিয়া দ্রব্যাদির নির্মাণ-প্রণালীতে কথঞ্চিৎ পরিবর্তন সংসাধিত করে। পরিবর্তন যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই সে ব্যবসায় যুগান্তর উপস্থিত হইল। দ্রব্যাদির নির্মাণ ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এবং তজ্জন্ত মূল্য স্থলভ হওয়ায়, এখন হইতে সে সব জিনিসের বিক্রয় অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাইল। ফলে, ক্রেতা বিক্রেতা, এবং শ্রমজীবিসম্প্রদায় প্রত্যেকেই লাভবান হইতে লাগিল অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় করিলেও পূর্বাপেক্ষা তিনগুণ লাভ থাকিতে লাগিল ; এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির উন্নতি এবং শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিও সম্ভবপর হইল। দেখিতে দেখিতে নবাগত লোকটি আপনি সমৃদ্ধ হইয়া সে পল্লীকেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল :—কিন্তু সাধারণে এ পর্য্যন্ত তাহার বংশপরিসর বা পূর্ববৃত্তান্ত জানিত না।—লোকে বলিত কয়েক শত ফ্রাঙ্ক মাত্র লইয়া সামান্য শ্রমজীবীর ভ্রায় সে সে গ্রামে প্রবেশ করে ; তারপর পরিশ্রম এবং কার্য-

কুশলতার শুণে এবং সে নূতন আবিষ্কারের ফলে তাহার এ সমৃদ্ধি ; প্রথম যখন সে আসে তখন সাধারণ একজন শ্রমজীবীর ছায়াই তাহার আচার-ব্যবহার পরিচ্ছদ ছিল। লোকে আরও বলে যে, সে দিন তাহার আগমনের অব্যবহিত পরেই সন্ধ্যার সময় সে গ্রামে আগুন লাগে, এবং নবাগত লোকটি তাহা দেখিয়া আপন জীবন তুচ্ছ করিয়া জলন্ত গৃহ হইতে দুইটি শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনে,— সে শিশু দুইটি পুলিশের দারোগার। সেই আকস্মিক বিপদে কৃতজ্ঞ কর্তৃপক্ষ আর তাহার ছাড়পত্র দেখিতে চায় নাই। লোকটি সেই দিন হইতে ‘ফাদার ম্যাডেলিন’ নামে পরিচিত হইয়া সে গ্রামে বাস করিতে লাগিল। তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ।

লোকটি উদারপ্রকৃতির, সর্বদাই সে চিন্তামগ্ন থাকিত। সৌভাগ্যলক্ষী যেন স্বহস্তে তাহার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই দুই বৎসর বাইতে না বাইতে তাহার কার্যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিল,—প্রত্যহ সহস্র সহস্র জী-পুরুষ তাহার কারবারে খাটিতে লাগিল ; কার্যের সুবিধার জন্ত তখন ম্যাডেলিন জী এবং পুরুষ শ্রমজীবীদের জন্ত স্বতন্ত্র দুইটি কারখানা করিল,—প্রত্যেকটির জন্ত পৃথক্ তত্ত্বাবধায়ক এবং স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। তবে অসচ্চরিত্রা জীলোক বা বালিকার সেখানে স্থান ছিল না, ম্যাডেলিন এই একটি মাত্র বিষয়ে কঠোর ছিল। তাহার আগমনে সে মুমূর্ষু প্রদেশ কর্মের দীক্ষা লাভ করিয়া যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল ; চারিদিকে উৎসাহ-উদ্গাদনা পরিস্ফুট হইতে লাগিল ; শ্রম-বিমুখতা এবং দারিদ্র্য অন্তর্হিত হইল ;

অতি ছুগীরও অল্পের সংস্থান হইল ; দীন-দরিদ্রের আবাসও আনন্দরেখায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কার্যের জন্ত কেহ আসিলে ম্যাডেলিন কখনও তাহাকে ফিরাইত না, শুধু বলিত,—“জী হও, আর পুরুষ হও,—সংপথে থাক।”

ল্যাফিটের ব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই তাহার প্রায় ৬০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়াছিল ; অথচ সে কখনও অর্থগ্ৰন্থ ছিল না। হাসপাতাল, বালক এবং বালিকাদিগের জন্ত পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয়, আতুরাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি শত শত অহুষ্ঠানে তাহার উপার্জিত অর্থের সদ্যবহার হইতে লাগিল।

সর্বদেশে সর্বকালেই পরামুচিকীর্ষু থাকে ; ম—তেও ছিল। প্রথম প্রথম তাহারা বল-বলি করিত—“লোকটা টাকা চায়।” তার পর তাহার দানব্যয় দেখিয়া বলিল—“লোকটার মনে একটা উচ্চাশা আছে।” কথাটা অনেকের মনে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল ; কারণ, ম্যাডেলিনের ধর্মের দিকেও বেশ একটু টান ছিল,—সাধারণের সহানুভূতিও তজ্জন্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অবশেষে যখন একদিন তাৎকালিক “মনিটর” পত্রে প্রকাশিত হইল যে, তাঁহার সাধারণ সং-কার্যের জন্ত এবং পুলিশের অধ্যক্ষের অমুরোধে স্বয়ং সম্রাট ম্যাডেলিনকে ম—র নগরাধ্যক্ষের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহারা যুগপৎ বলিয়া উঠিল—“দেখেছ ত, ঠিকই বলেছিলাম। লোকটার মনে মনে বরাবরই এমনই একটা মতলব ছিল। যা কিছু ওর দান-ধ্যান, সবই এর জন্ত।”

ম্যাডেলিন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে পদ প্রত্যাখ্যান

করিল। সেই বৎসরের শেষে তাহার নুতন আবিষ্কারের ফলে, সম্রাট তাহাকে সি, এল্, এচ্ (Cross of the Legion of Honour) উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলেন। তখন তাহার পরস্পর বলাবলি করিল—“ওঃ বুঝেছি, ও এই রকম একটা বড় উপাধি চায়।”

ম্যাডেলিন সে সম্মানও প্রত্যাখ্যান করিল। তখন তাহার বিস্মিত হইয়া, ম্যাডেলিনের এরূপ ব্যবহারের কোন কারণ না বুঝিতে পারিয়া, শেষে বলিল—“লোকটা একটা Adventurer (হুজুকে)।” অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার-সমূহ হইতে ম্যাডেলিনের নামে অজস্র নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। সাধারণ শ্রমজীবীভাবে যেখানে তাহার কোন স্থান ছিল না, আজ অবস্থার উন্নতিতে সে সব দ্বার তাহার জন্ত সাদরে উন্মুক্ত হইল। তত্রাচ ম্যাডেলিন আপনাকে দূরে দূরেই রাখিতে লাগিল। তাহাতে অনেকে বিরক্ত হইল;—কেহ বলিল—“ও একটা কোথাকার গেয়ে ভূত, মূর্খ,—ভদ্রপরিবারে ও মিশবে কি করে।” কেহ বলিত “পশু ও, ভদ্রতার কি জানে?” ইত্যাদি ইত্যাদি। ম্যাডেলিন কিন্তু তাহাতে টলিল না—অবশেষে, একদিন কর্তৃপক্ষ না-ছোড়বান্দা হইয়া তাহাকে ধরিলেন, গ্রামস্থ সকলে পথে ঘাটে তাহাকে অনুন্নয় করিতে লাগিল; শেষে এক বৃদ্ধা ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে বলিল—“ভাল, নগরাধ্যক্ষ হলে দেশের ও দেশের উন্নতি হয়। ভাল কাজ করতে হবে বলেই কি তোমার যত ভয়?” অগত্যা ম্যাডেলিনকে স্বীকৃত হইতে হইল, এবং তাহার

অনতিকাল পরেই ম—র অধ্যক্ষরূপে তাহার নিয়োগপত্র আসিল।

নগরাধ্যক্ষ হইয়াও তাঁহার সেই সহজ অনাড়ম্বরতা বিনষ্ট হইল না। শ্রমজীবীর ছায়া তান্নাভ-বর্ণ, এবং দার্শনিকের ছায়া সর্বদা চিন্তামগ্ন তাঁহার মুখভাবে সর্বদাই একটা শান্ত শ্রী ফুটিয়া থাকিত। একটা চওড়া টুপি এবং গলা পর্যন্ত আঁটা কোর্তাই সাধারণতঃ তিনি পরিধান করিতেন। কথা তিনি কহিতেন কম; এবং লোকের তোষামোদ হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। পথে কাহারও সহিত দেখা হইলে, মৃদু হাসিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেন—কাহাকেও কথা কহিবার বড় একটা অবকাশ দিতেন না; স্মরণে পাইলেই নির্জনে প্রান্তরে যাইয়া একাকী পদচারণ করিতেন। প্রায়ই তিনি পাঠগৃহে থাকিতেন; পুস্তক তাঁহার বেশী ছিল না; যাহা ছিল সবগুলিই উচ্চ ভাবপূর্ণ, সুনির্বাচিত। যথার্থ বলিতে গেলে কিন্তু পুস্তকের মত নীরব অথচ যথার্থ বন্ধু আর নাই। সেই নীরব বন্ধুর নিত্যগহবাসে ম্যাডেলিনের কথাবার্তা, ভাষা, ভাব ক্রমশঃই সংশোধিত হইতেছিল। একটা কথা, নির্জনে বেড়াইবার সময় সর্বদাই তাঁহার কাছে কোন না কোন একটা বন্দুক থাকিত; প্রায়ই তাহার ব্যবহার হইত না, কিন্তু আবশ্যিক কালে তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ-সন্ধান ছিল। নিরীহ জীবকে কখনও তিনি শিকার করিতেন না। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিলেও, শরীরে তখনও তাঁহার অমাহুষিক শক্তি ছিল। পথে চলিতে চলিতে কতবার তিনি কতলোকের বহুপরিশ্রম-সাধ্য কার্য একাই করিয়া দিতেন। লোকেরা নির্বাক্ বিশ্বে তাঁহার প্রতি চাহিয়া, থাকিত।

কৃষকদিগকে কতদিন তিনি কৃষিসম্বন্ধে কত উপদেশ দিতেন,—কিরূপে ধানের গোলায়, মরাইয়ের নীচে, কেবল মাত্র লবণের জল দিলে ঘুণ ধরে না, কিরূপে ধানের খেতে, গোলাবাড়ীতে, orviotএর ফুল রাখিয়া দিলে চেলোপোকা নষ্ট হয় ; কিরূপে ধানের জমি ভাল থাকে, ইত্যাদি অনেক কথা তিনি তাহাদের বলিতেন। একবার কোন মজুরকে কতকগুলি nettle (কাঁটাগাছ) তুলিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়া তিনি বলেন “দেখ, ভগবানের জগতে সব জিনিসেরই মূল্য আছে। এর জমিও পাট করতে হয় না, চাষেরও পরিশ্রম নেই, অথচ সামান্য যত্নেই এ থেকে কত উপকার পাওয়া যায়, কতকাজে একে লাগান যেতে পারে ; আমরা সে যত্নটুকুও করি না বলেই, সময়ে এর ফলগুলো কুড়িয়ে নিই না বলেই, শেষে এ গুলো জমির ক্ষতি করে, কাজেই তখন তাকে উপড়ে ফেলে দূর করে দিই। মানুষও এই কাঁটাগাছের মতনই।” তারপর থামিয়া,—“ভাই সব, এটা ঠিক জেনো, সংসারে নিভাস্ত মন্দ লোক বলে, বা একবারে অপদার্থ উদ্ভিদ বলে কিছু নেই, আবার দোষেই সব মন্দ হয়, বা কিছু ফ্রট—সবই চাষার।” ম্যাডেলিন সব কাজই জানিতেন,—সামান্য খড়-কুটা দিয়া ছেলেদের এমন সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈয়ার করিয়া দিতেন যে, তাহারা তাঁহাকে পাইলে আর সহজে ছাড়িতে চাহিত না।

যখন কোন মৃতদেহ গির্জায় লইয়া যাওয়া হইত, ম্যাডেলিন, কাছে থাকিলে, অমনি তাহার অনুসরণ করিতেন। অপরের হৃৎকণ্ঠ মৃত্যু তাঁহাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিত ; শোকাক্ত পরিবারে তাহাদেরই

একটি হইয়া তিনি মিশিয়া যাইতেন। মৃতের উদ্দেশে পঠিত মন্ত্রের ধ্বনি অপর এক জগতের দ্বার যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিত। মৃত্যুর গাঢ় অন্ধকারে সে করুণ স্বর যেন ডুবিয়া যাইত, আর উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্তের গৃঢ়-রহস্তাচ্ছন্ন কোন দৈব-বাক্য যেন তিনি শুনিতে থাকিতেন। তাঁহার অধিকাংশ সংকাণ্ড দানাদি অতি গোপনেই নিষ্পন্ন হইত। কত দরিদ্র, কত সময় সম্ভার পর বাটী ফিরিয়া তার সদর দরজার পুরাতন তালা ভাঙা দেখিয়া “চোর” “চোর” করিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিত তাহার শয্যার উপর কতকগুলো টাকা কে রাখিয়া গিয়াছে। সে চোর কে, পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না।—লোকে তাঁহার টাকাকড়ি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিত ; তবে এটা সত্য যে লাফেট ব্যাঙ্কে তাঁহার প্রভূত পরিমাণ অর্থ জমা ছিল ; এবং ব্যাঙ্কওয়ালার সহিত এই সর্ভ ছিল যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সব টাকা তিনি এককালীন উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

ম্যাডেলিন ম—নগরের অধ্যক্ষ হওয়ার পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সহসা একদিন ডি—র প্রধান ধর্মযাজকের ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইল ; পরদিন ম্যাডেলিন শোক-চিহ্ন ধারণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল। কারণ ডি—র ধর্ম-যাজক তখনকার কালে একরূপ মহর্ষি-পদ-বাচ্য ছিলেন। লোকে ভাবিল, হয়ত

ম্যাডেলিন তাঁহার কোন আত্মীয়ই বা হইবেন ;
তজ্রাচ তাহার। উভয়ের মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ
নির্ণয়ের জন্ত কোতুহলী হইল। অবশেষে
একদিন এক সম্ভাষা বৃদ্ধা ম্যাডেলিনকে এ
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন—

“আপনি কি তাঁহার কোন আত্মীয় ?”

“আজ্ঞে না।”

“তবে তাঁর জন্ত আপনি শোকচিহ্ন
নিষেছেন কেন ?”

ম্যাডেলিন ধীরভাবে উত্তর করিলেন—
“ছেলে বয়সে তাঁর বাড়িতে আমি চাকর
ছিলাম, তাই।”

আরও একটা কথা। যখন কোন
‘হা-ঘরে’ বালক সে গ্রামে আসিত, ম্যাডেলিন
তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার নামধাম
জিজ্ঞাসা করিয়া অর্থ ভিক্ষা দিয়া তাহাকে
বিদায় দিতেন। তাহার। যাইয়া সঙ্গীদের
কাছে সে গল্প করিত ; ফলে হা-ঘরে
বালকদের প্রায়ই সে পথ দিয়া যাতায়াত
করিতে দেখা যাইত।

ক্রমে ক্রমে ম্যাডেলিনের নাম চতুর্দিকে
বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দশ পনের ক্রোশের
মধ্যে যত গ্রামবাসী ছিল সকলেরই তিনি উপ-
দেষ্টা স্বরূপ হইলেন ; মামলা-মোকদ্দমার
সালিশনিষ্পত্তি, পরস্পর বন্ধুত্ব সংস্থাপন প্রভৃতি
কার্যে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ
করিলেন। লোকের মুখে মুখে তাঁহার গুণ-
গাথা কীর্তিত হইতে লাগিল।

একজনমাত্র লোক তাঁহার উপর বরাবর
সন্নিহিত ছিল। সাধারণের স্তুতি, ম্যাডে-
লিনের অসংখ্য সংকার্যাদি কিছুতেই তাহার
মনোভাব পরিবর্তিত করিতে পারে নাই।
এক একজন লোকের মনে এমন এক একটা
পাশবিক সংস্কার থাকে—যাহা আপনাতেই
আপনি সম্পূর্ণ, যাহা আপনা আপনিই স্নেহের
আকর্ষণের বা ঘৃণার বিকর্ষণের সৃষ্টি করে,
যাহা কখনও ইতস্ততঃ করে না, কখনও
চঞ্চল হয় না ; কখনও আপনাকে ভ্রান্ত
বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না ; জ্ঞান,
বুদ্ধি, বিচার, বিতর্ক যাহাকে কখনও টলাইতে
পারে না ; স্থির গম্ভীর অদম্য অনম্যভাবে
আপনার সম্পূর্ণতার মাঝে যাহা স্তব্ধভাবে
বসিয়া থাকে। এলোকটারও প্রকৃতি সেইরূপ।
প্রায়ই, যখন ম্যাডেলিনের ধীর স্নেহ-মধুর
সাধারণের মঙ্গলাশীষপূত মৃতিখানি পথে দেখা
যাইত, তখন সে অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাদিকে
ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির দৃষ্টিতে, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে
তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত ; আর নিম্নাধ-
রোষ্ঠ দিয়া উদ্ধাধরোষ্ঠকে নাসিকার সহিত
সংযুক্ত করিয়া, ধীরে ধীরে মন্তক সঞ্চালন
করিত ; ভাবটা—“কে এ ? কোথায় না
দেখিছি যেন ? যাই হোক তোমার ভেঁকে
আমি ভুলছি, ঠাকুর !”

সে জাভাট। পুলিশের দারোগা।
ম—তে যখন সে আসে, তখন ম্যাডেলিনের
ব্যবসায় জমিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

রেখা-চিত্র

বাঙ্গালীর স্বাধীন বৃত্তির পরিচয় দানের সুযোগ বড়ই অল্প ঘটে। একরূপ স্থলে, দেশের শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন ভাবের উপযোগী স্পষ্ট-বাদিতার সাহস দেখিলে আমাদের অশ্রদ্ধার সীমা থাকে না, তাই আজ দেশের চারিটি প্রথিতনামা মহাশয় ব্যক্তির অন্তর্গত চারিটি ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই,ই, মহোদয় বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ রাজকাৰ্য্যে যখন নিযুক্ত হন, তখন স্ত্রীর অসুখি ইডেন বঙ্গের সর্বপ্রধান রাজপুরুষ। রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে ভূদেব বাবু বেলভিডিয়ায় ছোটগাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, প্রসঙ্গক্রমে ইডেন সাহেব সম্মান ও সমাদরের ভাবব্যঞ্জক স্বরে ভূদেব বাবুকে বলিয়াছিলেন, “দেখুন আমাদের রাজ্য-পালন-পদ্ধতি কত উদার! আমরা আপনাকে যোগ্য ব্যক্তি বলিয়াই জাতি ও বর্ণ বিচার না করিয়া, একেবারে একটা ডিপার্টমেন্টের সর্বোচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি।” ভূদেব বাবু চিরদিনই স্পষ্টবক্তা, এ স্থানেও উচিত বলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। বলিলেন,—“এই রাজ্যপালনপদ্ধতি অত্যন্ত অনুদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আমাকে যেকোন ভাবে শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কখনই ঐরূপ হইত না। আপনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, ভিতরে ভিতরে

প্রভেদ বজায় রাখার জন্য আপনারা দৃঢ়ব্রত, তবে এদেশে অবশ্য আপনাদের এই নীতি শোভা পাইতেছে, আর এতেই দেশের লোক সন্তুষ্ট।” ছোটগাট বলিলেন, “আপনার ঐরূপ বলিবার কারণ কি?” ভূদেব বাবু বলিলেন, “দেখুন, ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পদে আমাকে কয়েক মাসের জন্য নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু ঐ নিয়োগটা একজন ইংরাজের হইলে, গেজেটে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, আমার বেলা সে ভাষা ব্যবহার করিতে আপনাদের আপত্তি জন্মিল। Officiating Director এই দুটি শব্দ ব্যবহার তাগ করিয়া ‘Placed in charge of the Directorate’ ব্যবহার করা আবশ্যক হইল; একজন ইংরাজের নিয়োগে কি ঐরূপ কিস্তুতিক্রমাকার হইত?” ইডেন সাহেব সত্যই উদারপ্রকৃতির রাজকর্মচারী ছিলেন, তাই ভূদেব বাবুর কথায় প্রতিবাদ না করিয়া তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিলেন। ভূদেব বাবু পুনরপি বলিলেন “দেখুন, মোগল-রাজত্বে আমরা ত্রায় ব্যক্তি মোগল-কোর্টের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিতে বোধ হয় অক্ষম হইত না।” ঐরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ইডেন সাহেবের আনন্দানুভূতি সে দিন বিষাদে পরিণত করিয়া ভূদেব বাবু গৃহে ফিরিয়াছিলেন।*

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় যখন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ, সে সময়ে পুণাল্লোকা মহারাজী স্বর্ণময়ী নির্দেশ

* অধুনা লোকান্তরিত অধিকাচরণ বহু মহাশয় ভূদেব-প্রসঙ্গে আমাকে ঐ ঘটনাটি বলিয়াছিলেন। ইনি ডাইরেক্টরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন।

মত উল্ল কলেজের কার্যপরিচালন জন্ত এক কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সম্পাদক ছিলেন—রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, আর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সেই কমিটির সভাপতি। সুতরাং যখন যিনি ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতেন, তিনিই কলেজ-কমিটির সভাপতির কার্য করিতেন।

একদা প্রেসিডেন্সীবিভাগের শিক্ষাবিভাগীয় ইন্সপেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক মাসের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহার তদানীন্তন সহকারী চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় অস্থায়িতাবে ঐ কার্যে ব্রতী থাকা কালে একবার মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয় সকল পরিদর্শনে বাহির হইয়া বহরমপুরে উপস্থিত হন। তথায় জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলার বিদ্যালয়-সমূহের অবস্থা বিষয়ে নানা কথা-বার্তার মাঝখানে জেলার কর্ত্তা সহসা কলেজ পরিদর্শনের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। “কলেজ পরিদর্শন ত করা হয় না।” সাহেব বলিলেন “এবার হবে। আগামী কল্যা আপনি কলেজে যাইবেন, আমি কলেজের কমিটিকে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া এখনই পত্র লিখিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া সভাপতি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কমিটির সম্পাদক রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরকে এক পত্র লিখিয়া পরদিনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং এ কথাও লিখিয়া দিলেন যে, তিনি স্কুল ইন্সপেক্টর মহাশয়কে পরদিন কলেজ-পরিদর্শনে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন।

যে দিন এই ব্যাপার ঘটে, সেই দিন সন্ধ্যার সময় কাশিমবাজার রাজবাটিতে বিশেষ কোন

অনুষ্ঠাননিবন্ধন বহু পদস্থ লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। রায় বাহাদুর সম্পাদক, কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্র বাবুকে পত্রের দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় জানাইয়া পর দিনের পরিদর্শন ব্যবস্থা করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু রায় বাহাদুরের পত্র পাঠিবার পূর্বেই চন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাই রাজবাটিতে নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে একখানি পদত্যাগপত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবা মাত্র ব্রজেন্দ্র বাবু নিজের পদত্যাগপত্রখানি হাতে দিয়া বলিলেন “আগে কল্যাকার ব্যবস্থা করুন। আমি কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ভিন্ন অথ কোন নিম্নপদবির কর্মচারী দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে সাহায্য করিতে পারিব না। সে কাজ আমার দ্বারা হইবে না।” শ্রীনাথ বাবু পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন “এখন উপায় ? এ ব্যাপার এতদূর গড়াইবে, আমি তাহা আদৌ বুঝিতে পারি নাই। তাহা হইলে আপনাকে সংবাদ দিবার পূর্বে উপায় অবলম্বন করিতাম, এখন উপায় কি ?”

ব্রজেন্দ্র বাবু বলিলেন, “এ ক্ষেত্রে আমার দ্বারা কোন সাহায্য হইবে না।” এই সময়ে বৈকুণ্ঠ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র শ্রীনাথ বাবু বৈকুণ্ঠ বাবুকে গিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া দ্বারায় উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ইতিপূর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে একজন বিষয়-জ্ঞানবিহীন নিরীহ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াই

মনে করিতেন, কিন্তু সেই দিন ঐ পদত্যাগ পত্রখানি পাঠ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা উচ্চগ্রামে উঠিয়া গেল। বৈকুণ্ঠ বাবু বলিলেন যে, অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ কেবল পণ্ডিত নহেন, তাঁহার পদ-মর্যাদাজ্ঞান পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও স্বপদের সম্মান রক্ষায় বেশ পটু; উক্ত পদত্যাগপত্রে উচ্চাঙ্গের কন্ঠপটুতার পরিচয় পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং ত্বরায় ইহার প্রতীকার সাধনে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনাথ বাবু ও বৈকুণ্ঠ বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া তখনই সভাপতি ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় উপস্থিত হইয়া সাহেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিবামাত্র, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর—সাক্ষাসমীরণ-সেবিত স্নিগ্ধ ইংরাজ-মুন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব—সহসা বৈশাখের প্রদীপ্ত মার্ভণ্ডে পরিণত হইয়া বলিলেন, “How can it be? I can't cancel my order. The Inspector must inspect the college to-morrow. I have asked him to do so as President of the College Committee. It is impossible for me now to ask him not to go there”. বৈকুণ্ঠ বাবু ও শ্রীনাথ বাবু সাহেবকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে “এটা নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, আর এই ছকুম তামিল করিতে হইলে, আমাদেরিগকে বর্তমান অধ্যক্ষকে হারাইতে হয়। এ কার্য্যে আমরাই বা কেমন করিয়া সম্মত হইব?” সাহেব বলিলেন, “I don't know that. It is my order, and the order must stand”. এই বলিয়া সাহেব ক্রোধ ও অভিমানভরে নীবে বসিয়া রহিলেন।

তখন বৈকুণ্ঠ বাবু সাহেবকে বলিলেন, কলেজের একটা কমিটি আছে, এরূপ গুরুতর বিষয়ে কলেজ-কমিটির অভিপ্রায় জানিয়া কার্য্য করা উচিত। তাই আমার অনুরোধ এই যে আজ রাত্রিতেই সম্পাদক সকল সভ্যকে সংবাদ দিবেন। আগামী কলা প্রাতঃকালে ছয়টার সময় আপনার এখানেই আমরা মিলিত হইয়া এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করিব, আপনি সে বিষয়ে অনুমতি দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।” সাহেব বলিলেন “All right Babu.”

পরদিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় সভ্যরা সাহেবের বাঙ্গালায় মিলিত হইলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, বিষয়টা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে এবিষয়ে কমিটি কিছু না করিয়া শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান রাজপুরুষের উপর ভার দেওয়া হউক, কমিটি ডাইরেক্টর বাহাদুরের নির্দেশ মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিলেন। অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবামাত্র ম্যাজিস্ট্রেট পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া তাঁহার বক্তব্যসহ বিষয়টা শিক্ষা-বিভাগের কর্তার নিকট প্রেরণের অনুরোধ করিয়া বলিলেন “আমরা আপনাদের প্রদর্শিত বিধিসম্মত পন্থায়ই অনুসরণ করিলাম। এতে ক্ষুণ্ণ হইলে চলিবে কেন? শেষ মীমাংসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, তাহা না করিলে, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার অবমাননা করা হয়, আপনার ত সেরূপ করা উদ্দেশ্য নহে।” ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুনরায় বলিলেন “All right Babu.”

অধ্যক্ষের পদত্যাগপত্রসহ কমিটির মন্তব্য, সভাপতির মন্তব্য স্বাক্ষরে তদানীন্তন ডাই-রেক্টর শ্রীর আলফ্রেড্ কন্সট্রাক্ট বাহাদুরের দরবারে প্রেরিত হইল। জেলার কর্তা চন্দ্র-মোহন বাবুকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, “আপনি কলেজ পরিদর্শন জন্ত এই জেলায় কয়েক দিনের জন্ত অপেক্ষা করুন। সঙ্গে সঙ্গে অত্রাণ্ড বিদ্যালয়ের পরিদর্শনকার্য চলিতে থাকুক।” সম্ভ্রাহ অতীত হয় দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাহার তাগিদ দিলেন। নবম কি দশম দিবসে শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আসিল। সে আদেশ বড়ই চমৎকার।

ডাইরেক্টর বাহাদুর লিখিলেন “শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরই কেবল প্রথম শ্রেণীর কলেজ-পরিদর্শনের অধিকারী, তন্নিস্ত কোন কর্মচারী নিয়মানুসারে ঐরূপ পরিদর্শনের অধিকারী নহেন। এক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভ্রমবশতঃ ইন্সপেক্টরকে কলেজ পরিদর্শনে অনুরোধ করায় কলেজের অধ্যক্ষ যদি শীলতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে সভাপতির অনুরোধ রক্ষা করিতেন, বা এখনও করেন, ভালই; কিন্তু তাঁহার আপত্তি থাকিলে, নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ইন্সপেক্টর দ্বারা কলেজ পরিদর্শনে তাঁহাকে বাধ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। আর এক কথা এই যে, শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ শীল যত দিন কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষতা করিবেন, সে সময়ে কলেজ-কমিটি কলেজের শিক্ষাবিষয়ক আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।”

এই আদেশ আসিবামাত্র ম্যাজিস্ট্রেট

বাহাদুর সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার স্থলে জেলার জজ বাহাদুরকে সভাপতি-পদ বরণ করা হইল। বোধ হয় সেট বাবস্থা এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। অস্থায়ী ইন্সপেক্টর চন্দ্রমোহন বাবুর আর কলেজ পরিদর্শন করা হইল না।

মহামাণ্ড হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দুই জন ইংরাজ জজের সঙ্গে মিলিত বিচার-আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঢাকার ষড়যন্ত্রবিষয়ক মোকদ্দমার আপিল শুনিতে ও বিচার করিতে আরম্ভ করেন। আপিলের সময়ে রাজপক্ষ-সমর্থনের ভার ছিল কাউন্সেল গার্গ সাহেবের উপর। গার্গ সাহেব আপিলের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান কালে প্রাথমিক বক্তৃতায় কয়েকটা অবাস্তর কথার উত্থাপন করিবামাত্র শ্রীর আশুতোষ বলিয়াছিলেন “মিষ্টার গার্গ, আপনি যাহার নামে গুরুতর অভিযোগ আরোপ করিতেছেন, তিনি কি এই আসামী দলভুক্ত?” উত্তরে গার্গ সাহেব বলিলেন “No, my lord.” শ্রীর আশুতোষ তৎক্ষণাৎ বলিলেন “তবে তাঁহার নাম করিবার আপনার কি অধিকার আছে?” পুনরায় গার্গ সাহেব বলিলেন “আর, সি, দত্তের ভারতীয় ইতিহাস পাঠে এদেশের ছাত্র-বৃন্দের মস্তিষ্ক বিগুড়াইয়া যাইতেছে।” স্যার আশুতোষ প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসা করিলেন মিষ্টার গার্গ কোন ইতিহাস? যেখানি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, সেই ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতে সাবধান হওয়া উচিত।” গার্গ সাহেব পুনরায় বলিলেন “শিবাজি দস্যদলের নায়ক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।” শ্রীর আশুতোষ

উত্তরে বলিয়াছিলেন—“Was the Marhatta leader a greater robber than your Alexander the Great?” এইরূপ শিষ্ট বিশেষণে ভারতীয় জাতি সকলের মৰ্য্যাদাশালী লোকদিগকে ভারত-প্রবাসী বিদেশীগণ কালাকালবিচারশূন্য হইয়া আক্রমণ করিয়া থাকেন। নিরীহ ভারতসন্তান এ সব তিরস্কার নীরবে সহ করে।

ভাগ্যগুণে বিচারাসনে স্থার আশুতোষের ছায় আত্মমৰ্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন, উদারহৃদয়, তেজস্বী বিচারপতি উপবিষ্ট ছিলেন, তাই সমগ্র জাতির মৰ্য্যাদা রক্ষার জন্ত গার্হ সাহেবের বাক্যাগমনার উপযুক্ত প্রতিবাদ হইয়াছিল এবং সাহেবও নীরব হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্থার আসলি ইডেন যখন বঙ্গের ছোটলাট নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে আলিপুরের রাজ-ভবনে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের সকলেই এক এক করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বেলভিডিয়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, যান নাই কেবল বিভাসাগর মহাশয়। প্রসঙ্গক্রমে ছোটলাট স্থার এসলি ইডেন রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের নিকট হুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—“আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই আমার সংবাদ লইলেন, পণ্ডিত কেবল আমার কোন খোঁজ লইলেন না।” স্বর্গীয় পাল মহাশয় এই বহু সম্মানজনক আক্ষেপোক্তিতে আনন্দিত হইয়া আলিপুর হইতে প্রত্যাগমন কালে কাঁসাড়িপাড়ার মোড় হইতে গৃহে না গিয়া সেই দরবারের পোষাকেই বাহুরবাগানে বিভাসাগরসদনে উপস্থিত হইলেন। বিভাসাগর মহাশয় পাল মহাশয়কে বলিলেন, “এ রাজবেশে আমার এখানে কেন?” রায়

বাহাদুর বলিলেন “আমি বেলভিডিয়ায় গিয়াছিলাম। ইডেন সাহেব আপনার কথা বলায় আপনাকে কথাটা বলিতে আসিয়াছি। তিনি হুঃখ করিয়া বলিলেন ‘আমি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসায় আমার পুরাতন বন্ধুদের সকলেই সংবাদ লইলেন, কেবল পণ্ডিত কোন সংবাদ লইলেন না।’ আপনি কি একবার সাক্ষাৎ করিবেন না?” বিভাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া “না রাম না গঙ্গা” একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমশঃ অগ্রাগ্র কথা পাড়িয়া রায় বাহাদুরের আদর আপ্যায়ন করিয়া বিদায় দিতেছেন, এমন সময়ে উৎকণ্ঠায়িত রায় বাহাদুর পুনরায় বলিলেন “আপনি কথাটা গায় মাথলেন না, ব্যাপার কি?” “ব্যাপার কি শুনিতে চাও তবে একটু বসো” বলিয়া বিভাসাগর মহাশয় অতি শাস্ত ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন “তোমাদের দরকার আছে, তোমরা যাইতেছ, আমার কোন দরকার নাই, আমি কেন যাইব? ছোটলাটের কোন প্রয়োজন হইলে তিনি আমাকে সংবাদ দিতে পারেন। আমি অকারণ কেন দৌড়াদৌড়ি করিব?” রায় বাহাদুর বলিলেন “তিনি পুরাতন আত্মীয়তার অভিমান করিয়াই ঐ কয়টি কথা বলিয়াছেন।” উত্তরে বিভাসাগর মহাশয় বলিলেন “তিনি কি ঐ কথাগুলি আমাকে বলিবার জন্ত তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন?” রায় বাহাদুর বলিলেন “আজ্ঞে না, তা তিনি বলেন নাই।” এইবার বিভাসাগর একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “তুমি কি মনে কর ইডেন সাহেবের পাঁচিলে আমার একচালা? যেমন তোমার মুখে শুনা, অমনি আলিপুরে দৌড়িব?”

তোমার তিনি অনুরোধ করেন নাই, আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার নাম করিয়া ইডেন সাহেবকে বল পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন।” রায় বাহাদুর বলিলেন “আজ্ঞে আমার দ্বারা ও কাজ হইবে না, আমি আপনাকে এ কথা বলিতে আসিয়া অত্যাচার করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে কোন কথাই বলিব না।”

এই ঘটনার কিছুকাল পরে কার্যাবিশেষে উত্তর-পশ্চিমের ছোটলাট ও বঙ্গের ছোটলাট একদা বঙ্গারে দেখা সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে বঙ্গের ছোটলাট ইডেন সাহেব মোগলসরাই স্টেশনের দীর্ঘ প্লাটফর্মে পাইচারি করিতেছেন, এমন সময়ে বিজ্ঞানাগর মহাশয় কানী হইতে আসিয়া মোগলসরাই স্টেশনে কলিকাতার গাড়ীতে চড়িয়া বসিতেছেন, ইডেন সাহেব তাহা দেখিয়াছেন। দেখিয়া ধীরে ধীরে পণ্ডিতের গাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র ইডেন সাহেব সুন্দর বাঙ্গালায় বলিলেন “আপনি আমাকে চিনিতে পারেন?” বিজ্ঞানাগর মহাশয় ক্ষণকাল মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন “না, চিনিতে পারিতেছি না।” সাহেব বলিলেন “আমি ইডেন।”

বিজ্ঞানাগর মহাশয় একটু লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন “কেমন করিয়া চিনিব? দেখাসাক্ষাৎ কতকালের কথা হইল, তখন তুমি লিকলিকে ছোকরা ছিলে, এখন তুমি যেমন বাঙ্গালার লেকটেনেন্ট গবর্নর, তেমনি তোমার চেহারাখানোও জাঁদরেল গোছের হয়েছে, সে চেহারা ই নাই, আমি কেমন করে চিন্‌বো?” ইহার পরই বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিলেন “তুমি কৃষ্ণদাস পালকে আমার বিষয়ে কিছু বলেছিলে?” সাহেব বলিলেন “হঁ। বলিয়াছিলাম।” “আমি যে উত্তর বলিয়াছিলাম তিনি বোধ হয় তোমাকে সে কথা বলেন নাই। আমি সর্বাগ্রে সেটা তোমাকে বলি,” বলিয়া তিনি আত্মপূর্বিক সমস্ত কথাগুলি ইডেন সাহেবকে বলিলেন। সাহেব “পাঁচিলে এক চালার” কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন “বেশ উত্তর হয়েছে, এখন বেলভিডিয়ায় পায়ের ধূলা পড়িবে কবে?” বিজ্ঞানাগর মহাশয় বলিলেন “তোমার যে দিন ইচ্ছা সংবাদ দিলেই হইব।” এরূপ ভাবের মর্যাদাবোধই এদেশের লোকসমাজে ফুটিয়া উঠিতে বিলম্ব আছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাও বাহাদুর সদ্দার সংসারচন্দ্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাহারা কর্মী, জীবনী-লেখক তাঁহাদিগের জীবনের ঘটনা-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কীর্তি বর্ণনা করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু যে সাধনার বলে বাহারা এই সকল

কর্ম কৃতকার্য হইয়াছিলেন,—তাহা দেখান এক প্রকার সাধ্যাতিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিপুণ ব্যবচ্ছেদকের ছুরিকা দ্বারা মস্তব্যাদেহের শিরা, পেশী প্রভৃতির বর্ণাধ

সংস্থান প্রকাশ করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যদেহে জীবনী-শক্তির স্থান কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সমালোচক কবিতার সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু সহস্র বিশ্লেষণেও কবিতার প্রাণ কোথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না—তেমনি মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা কেবল তাহার প্রধান প্রধান উপাদান নির্দেশ করিতে পারি—কিন্তু যে জীবনব্যাপী নিগূঢ় সাধনায় এই চরিত্র আপনাকে সম্পূর্ণ সফল করিয়াছিল,—তাঁহা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সংসার-চন্দ্র সামান্য শিক্ষকতা হইতে ক্রমে ক্রমে জয়পুরের মত একটা বিশাল রাজ্যের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,—আমরা ঘটনাবলি গ্রথিত করিয়া তাহা দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু কেমন করিয়া যে তাঁহার প্রতিভা চারিদিক হইতে রস গ্রহণ করিয়া, ক্ষুদ্র বীজ যেমন বৃহৎ বন-স্পতিতে পরিণত হয়, তেমনি আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া বিকশিত হইয়াছিল—জানি না কি প্রকার বিশ্লেষণে তাহা প্রকাশ করিব। সংসারচন্দ্রের জীবনী লিখিতে যে সহস্র ক্রটি রহিয়া গিয়াছে—সে সকল ক্রটির ইহাই একমাত্র ওজুহাত।

এত দূর যাহারা ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিয়াছেন—সংসারচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ধারণা জন্মিয়াছে, আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। তথাপি আমরা তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্য এই পরিচ্ছদের অবতারণা করিয়াছি।

রাজনীতি ব্যাপারটি এমন যে, ধর্ম্ম-নীতির সহিত ইহার অহি-নকুল-সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহারা ধর্ম্মভীরু তাঁহারা যদি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার সামঞ্জস্য করা যে কতদূর কঠিন তাঁহা তাঁহারাই বুঝেন। সংসারচন্দ্র সম্বন্ধে কি রাজা, কি প্রজা, কি ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী সকলেরই মুখে এই একটা কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যাইত—“Oh! he is a God fearing man!”—এই ধর্ম্ম-ভীরুতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান। তিনি অল্প বয়স হইতেই নানা দুঃখ-কষ্টের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া “সাবধানে জালায়ে অন্তর-প্রদীপখানি” সংসারের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রতা বিধাতা তাঁহাকে এই বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যে বিবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতেছিলেন, তিনি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই দুর্গম পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নানা প্রলোভন, নানা চক্রান্ত, “প্রতিদিনের কুশাস্তুর” প্রতিপদে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরস্থিত দেবতার আদেশ-বাণী কখন অগ্রাহ করেন নাই—তিনি সেই “ভয়ানাং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাম্” এর আদেশ প্রতিকার্য্যে অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন—জগদীশ্বর শুধু প্রেমময় নহেন—তিনি ভীষণ ভীষণানাম্। ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান; ধর্ম্মভীরুতা এবং জগদীশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরতাই

তাহার চরিত্রকে অসামান্যতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব দৈন্ত, সকল প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া অসাধারণ চরিত্রবলে বলীয়ান করিয়াছিল। তাহার চরিত্রের যাহা কিছু মহত্ব, এই ধর্ম্মভীরুতাই তাহার মূল প্রসবণ।

সংসারচক্রের ধর্ম্ম-জীবনের মূল—তাঁহার স্বর্গীয় পিতার আদর্শ এবং উপদেশ। বাল্যকালে তিনি প্রতিদিন প্রাতে পিতার সহিত মন্দিরে গিয়া প্রণামাদি করিয়া আসিতেন এবং গৃহে নিজে পিতার অনুকরণে পূজাদি করিতেন। বালকের নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশেষ অনুরাগী হইলেন। তখন বঙ্গদেশে এই নবধর্ম্মের যুগ—রাজা রামমোহন রায় যাহার ব্যাখ্যা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাহার সাধক এবং কেশবচন্দ্র সেন যাহার প্রচারক—সেই নবধর্ম্মের স্রোত বঙ্গদেশ হইতে স্রুদূর আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহার ফলে তখনকার অনেক শিক্ষিত যুবকই আশ্রয় নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেন, সংসারচক্রও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ লইয়া নিয়মিতরূপে এখানে আসিয়া উপাসনাদি করিতেন। তারপর যখন স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া গেলেন, তখন সংসারচক্র প্রভৃতি যুবকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে উৎসাহে যোগ দিলেন। এ সকল কথা আমরা পূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। জয়পুর ব্রাহ্ম-সমাজ লোপ পাওয়ার পর সংসারচক্র নিজে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত উপাসনাদি করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে সংসারচক্রের জীবনে

এক মহৎ পরিবর্তন ঘটিল। তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্রের শিক্ষাদাতা এক জন বৈদান্তিক পাঞ্জাবী সাধুর সহিত সংসার-চক্রের ধর্ম্মালোচনা হইল—বহুক্ষণব্যাপী আলোচনার ফলে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মে বিশেষ আস্থা বান হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হিন্দুগৃহীর আদর্শ গ্রহণ করিয়া আপন জীবনে সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং জীবনের প্রতিকার্যে তিনি হিন্দুর সেই আদর্শ অনুসারে চলিতেন।

এই ধর্ম্মানুরাগ তাঁহাকে ঈশ্বরের উপর যে একান্ত নির্ভরতা, যে সাহস, বিপদে যে অটল ধৈর্য্য, এবং প্রলোভনে আত্মরক্ষার যে অসীম ক্ষমতা দান করিয়াছিল—তাঁহার গৃহীর পক্ষে বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিতান্ত সুলভ নহে।

তাঁহার সাহস সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গীদিগের মুখে আজও নানা প্রকার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ মাধোসিংহ অত্যন্ত শিকার প্রিয়। তিনি পূর্বে প্রায়ই রাজ্যে ব্যাঘ্র শিকার করিতে যাইতেন। গভীর বনের ভিতর বৃক্ষের উপর শিকারীদিগের জন্ত কয়েকটি ‘মাচান’ বাঁধা হইত। সংসারচক্র শিকার করিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গে না লইলে মহারাজের চলিত না। মাঝে মাঝে শিকার সম্বন্ধে অন্ত্র শিকারীদের মহারাজের আদেশ দিবার প্রয়োজন হইত। সংসারচক্রের উপরই সে সকল আদেশ বহন করিবার ভায় পড়িত। তাঁহার সঙ্গীরা বলেন সেই ঘোর অন্ধকারে, গভীর বনের ভিতর যখন প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্র আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা, সে সময় সংসারচক্র সামান্য এক গাছি ছড়ি মাত্র হস্তে করিয়া

এক মাচান হইতে নামিয়া অল্প মাচানে যাইতেন, নির্ভীক সংসারচন্দ্রকে তাহার কখন একটুও বিচলিত বা ত্রস্ত হইতে দেখে নাই। মহারাজ তাঁহাকে বন্দুক হাতে করিয়া যাইবার জন্ত বলিলে তিনি একটু হাসিয়া বলিতেন “কি দরকার?”

বাল্যকাল হইতে সংসারচন্দ্র নানা দুঃখ-কষ্ট, নানা শোকের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শোকে দুঃখে কেহ কখন তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের একটা ঘটনা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া ইন্দুমতী তাঁহার একান্ত স্নেহের পাত্রে ছিলেন। ইন্দুমতীর স্বামী মেদিনীপুর জেলায় কাঁথিতে ওকালতি করেন। কয় দিন হইতে ইন্দুমতীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। ইঠাৎ একদিন প্রাতে ইন্দুমতীর পরলোক-গমনের সংবাদ আসিল, সংসারচন্দ্র তখন মহারাজের নিকট। এই নিদারুণ সংবাদ যে সংসারচন্দ্রকে মর্মান্তিক আঘাত করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু বাহিরে তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তিনি ধীর ভাবে আফিসের নিয়মিত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। বাড়ী যাওয়া মাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যাকুল হইয়া ইন্দুমতীর সংবাদ লইতে আসিলেন, সংসারচন্দ্র কোন কথা না কহিয়া নিজে স্নান আহার করিয়া বাড়ীর সকলকে স্নানাহার করাইলেন, তারপর সকলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া ধীর ভাবে এই মর্মান্তিক সংবাদ দিলেন এবং নানা প্রকার উপদেশ দিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া আর আর

সকলে শাস্ত হইল—তিনি আপন বলে শোকসম্প্রাপ্ত পরিবারকে বলোয়ান করিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রের কত প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়াছিল—নানা কারণে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নহে। একটা উদাহরণ দেই—মহারাজ মাধোসিংহের গদি প্রাপ্তির পর ১৮৮১ সালে তাঁহার সহিত গুজরাট প্রদেশের ঞ্চাংখাড়া রাজকুমারীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব বাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় সে জন্ত ব্যারিষ্টার মিঃ কৃষ্ণরাও পাণ্ডুরাং ঞ্চাংখাড়া রাজ-দরবার হইতে জয়পুর আগমন করেন। মিঃ কৃষ্ণরাও জয়পুরে আসিয়া তদানীন্তন রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, প্রধান প্রধান সর্দার এবং রাজবাটীর কর্ম্মচারীদিগকে নানা কৌশলে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। সংসারচন্দ্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং মহারাজের উপর তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট—এই সকল কারণে মিঃ কৃষ্ণরাও তাঁহাকেও স্বপক্ষে আনিবার বিধি-মত চেষ্টা করেন এবং বাহাতে এই শুভ-বিবাহ ঘটে তাহা করিতে পারিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিবেন এমন প্রস্তাবও করেন। পুরস্কারের পরিমাণ দরিদ্র সংসারচন্দ্রকে প্রলোভিত করিতে পারিল না—তিনি সহাস্ত বদনে এই বিপুল অর্থ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—“যে পরিশ্রমে এবং মহারাজের অল্পগ্রহে তিনি যাহা উপার্জন করেন—তাঁহার সামান্য অভাবের পক্ষে তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। এরূপ পুরস্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি এই

শুভ-বিবাহ বাহাতে ষটে সে বিষয়ে বিশেষ চক্ষুকে দেখিয়া মিঃ কৃষ্ণরায় এই ঘটনার চেষ্টা করিবেন। বিবাহ হইয়া গেল। উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—“তুমি জান না, এই ঘটনার বহুদিন পরে বোধায় কোন তুমি কত বড় লোকের পুত্র; তোমার পিতা বহুগৃহে সংসারচক্রে জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ-মাহুষ নহেন, তিনি দেবতা।” (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাধ্বজ ।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র ।
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি ।
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য্য,
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য্য ।

নেব সকল বিশ্ব
দাও সে পবল প্রাণ,
করব আমার নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান ।
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিণ হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র ।
জাগব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান,
ছাড়ব স্বপ্নের দাস্ত
দাও দাও কল্যাণ ।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

পূর্বরাগ *

শৃঙ্গার আর মাধুর্য্য মূলে একই বস্তু বলিয়াই, শরীরের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ। আর মাধুর্য্যের কোনও অবস্থাতেই এই শারীর সম্বন্ধের একান্ত বিলোপ হয় না। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সম্বন্ধের উপরেই মাধুর্য্যরস ফুটিয়া উঠে। এই সম্বন্ধের প্রথম সূচনাকেই পূর্বরাগ বলে। এই পূর্বরাগ যে ভাবে নায়ক-নায়িকার স্নায়ুগুণকে অধিকার করিয়া, তাঁহাদের অঙ্গ-পত্যঙ্গের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাকেই পূর্বরাগের রূপ বলা যাইতে পারে।

রসশাস্ত্রে সচরাচর কেবল নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধেই পূর্বরাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আব পরস্পরের প্রতি প্রথম অনুরাগের সঞ্চার অবশি, প্রথম মিলন বা সম্মেলন পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের যে সকল অবস্থা ঘটে, এক্ষেত্রে তাহাকেই পূর্বরাগ বলে। কিন্তু রসশাস্ত্রে এই পূর্বরাগ-শব্দ বিশেষভাবে মাধুর্য্যের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইলেও, বাৎসল্য বা সখ্যোতেও যে ইহাও অরূপ একটা অবস্থা নাই, তাহা নহে। সম্ভবতঃ ভূমি হইবার বহুকাল পূর্ব হইতেই, আপনার গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রতি সম্ভবসম্ভাবিতার অন্তরে একটা অপূর্ব আসক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাই বাৎসল্যের পূর্বরাগ। আর বাল্য-বন্ধুত্বের আশ্বাদ-লাভ যার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সেই সখ্যের পূর্বরাগ-বস্তুটা যে কি, ইহাও জানে। মাধুর্য্যের

মতন, বাল্য-বন্ধুত্বের ভিতরেও একটা রূপ-লালসা ও আসক্ত-মিশ্র লুকাইয়া থাকে। পাঠশালায় শতাবধি বালক এক সঙ্গে পড়ে। ইহাদের মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা বালকের মুখ দেখিয়া আর একটা বালকের প্রাণে একটা অভিনব তত্ত্বরাগের সঞ্চার হইল। ঐ মুখখানি ধ্যান করিতে তার আনন্দ হয়। এই বালকের সঙ্গে-লাভের জন্ত তার অন্তরে একটা পিপাসা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তখনও উভয়ের মধ্যে তেমন পরিচয় হয় নাই। পূর্ব পরিচয় থাকিলেও তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। তখনও ইহারা পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি জড়াজড়ি করিতে আরম্ভ করে নাই; অথচ তাহা করিবার জন্ত প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই যে অবস্থা ইহাই সখ্যের পূর্বরাগ। এ অবস্থায় লালসা ও ভয়, সাহস ও লজ্জা, আস্থা ও সন্দেহ, এই সকল পরস্পর-বিরোধী ভাব প্রাণটাকে তোলপাড় করিতে থাকে। এই লোভ ও ভীতি, আশ্বাস ও সন্দেহ মিলিয়া তার শরীর-মনে একটা চাক্ষুণ্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এই উদ্বেগ তার মুখে, এই চাক্ষুণ্য তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়া, সখ্যরতির পূর্বরাগের বিশিষ্ট রূপটিকে গড়িয়া তোলে। আর এই সখ্যরতি এখন খুব বলবতী হইয়া উঠে, তখন তাহাতেও মাধুর্য্যের পূর্বরাগের মতন, স্বেদকম্পপুলকাদি সান্বিতিক্রিয়াবের সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রণয়ী

* রসের রূপ শ্লোক ৫ বঙ্গাবলী বঙ্গদর্শনে ১৩১৯ সালের পৌষ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে —
(১) বাৎসল্য—পৌষ ; (২) দাস্ত ও (৩) সখ্য—মাঘ ; (৪) (৫) (৬) মাধুর্য্য—১৩২০—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।

জনের রূপ দেখিয়া, আর কখনও বা না দেখিয়াও, তাঁর রূপগুণের কথামাত্র শুনিয়াই, সখ্যের এবং মাধুর্যের পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। কিন্তু বাৎসল্যের পূর্বরাগের একরূপ কোনও প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা থাকে না, থাকা অসম্ভব। তবে সন্তান ধারণ করিয়াই, সন্তান-সন্তাবিতার শরীরের, বিশেষতঃ তাঁর স্নায়ু-মণ্ডলের, এমন সকল পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে, যাহাতে অজ্ঞাত সন্তানের প্রতিও গর্ভ-ধারিণীর অন্তরে একটা স্বাভাবিকী আসক্তি জন্মিতে থাকে। গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তিও বাড়িয়া চলে, এবং সন্তানসন্তাবিতা জননীর প্রাণে গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি একটা প্রবল মমতা জাগিয়া উঠে। এই মমতা হইতেই এই সন্তানের মুখ দেখিবার জন্ত লালসার উদয় হয়। এই লালসায় তখন আসন্ন-প্রসবা জননীর সমুদায় শরীরকে যেন এক অভূতপূর্ব রসে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। আর, যেখানে আশা সেইখানেই আশঙ্কা, যেখানে লোভ সেইখানেই ভয়, যেখানে ঔৎসুক্য সেইখানেই উদ্বেগ ও ভাবনা জাগিয়া উঠে। অজ্ঞাত সন্তান সম্বন্ধে শত আশা, শত আশঙ্কা, শত স্মৃতি-কল্পনা, শত দুঃখভীতি, এ সকলে মাতার মনকে অধিকার করিয়া, তাঁহাকে অধীর করিয়া তোলে। সন্তান বালক হইবে, না বালিকা হইবে; সুন্দর, সুস্থ, সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ হইবে, না কুৎসিত, রুগ্ন, অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইবে; সে দীর্ঘায়ু হইবে, না স্বল্পায়ু হইবে, এই সকল চিন্তায় মাতার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপে কখনও কখনও সন্তানসন্তাবিতাকে গর্ভস্থ শিশুর ধ্যানে

তন্ময় করিয়া ফেলে। এই তন্ময়ত্বহেতু গর্ভবতী রমণীগণ কখনও বা অমনস্ক, কখনও বা সমনস্ক; কখনও বা চঞ্চল, কখনও বা ধীর; কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা অবসন্ন ও বিষন্ন হইয়া পড়েন। আর এই ধ্যান খুব গভীর হইলে, অজ্ঞাত সন্তানের ভাবনায় জননীর সঙ্গে হৃদয়ৈক্যপুলকবিবর্ণাদি সাস্বিকী ভাবেরও প্রকাশ হইতে পারে। সন্তানের জন্মের পূর্বে, জননীর অন্তরে বাৎসল্যের এই সকল প্রকাশই, এই রসের পূর্বরাগ। অতএব কেবল মাধুর্য বা শৃঙ্গার-রসেরই একটা পূর্বরাগের অবস্থা আছে, সখ্যের বা বাৎসল্যের কোনও পূর্বরাগ নাই, এমন বলা যায় না। তবে মাধুর্য সকল রসের সেরা ও সর্বাপেক্ষা জটিল বলিয়া, প্রত্যেক অবস্থাতেই এই রসের মধ্যে যে অভূত শক্তি, আনন্দ এবং বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে, সেখা বা বাৎসল্যে যে তাহা হয় না, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

রসতত্ত্ববিদেরা শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টভেদে রসের পর্যায় নিরূপণ করিতে যাইয়া, প্রথমে সখ্য, তারপর বাৎসল্য, এবং সর্বশেষেই মাধুর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা সত্য। ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা হইতে এ সকল রসকে পৃথক করিয়া, সকল রসের একটা সমী-করণ ও নিজস্ব-পর্যায়-নিরূপণ করিতে হইলে, যেটা অপেক্ষাকৃত সরল, তাহাকেই সকলের নিম্নে, আর যেটা সর্বাপেক্ষা জটিল, তাহাকেই সকলের মাধ্যম বসাইতে হয়; ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এবং—

“পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে বৈসে”—
এই সূত্র ধরিয়াই আমাদের রসতত্ত্ববিদ পণ্ডিত-ভক্তেরাও বাৎসল্যকে মাধুর্যের পূর্বে

এবং সখ্যের পরে বসাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিজ নিজ জীবনের বিবর্তনধারাতে এই সকল রস, এই ক্রমের অনুসরণ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। আমরা সকলের প্রথমে, যত সামান্য পরিমাণে হউক—না কেন, দাস্যরসেরই আশ্বাদন করিয়া থাকি। কারণ, আমাদের প্রথম আসক্তি পিতামাতার উপরে, কিছা পিতৃমাতৃস্থানীয় পরিচারক ও পরিচারিকার উপরেই জন্মিয়া থাকে এবং এই আসক্তির মধ্যে দাস্যরসের প্রাণ যে দুইটা বস্তু—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও আনুগত্য—সেই দুইটাই স্বাভাবিক বিদ্যমান থাকে। আশ্রয়-আশ্রিত ভাবটা, অতি অলঙ্কিতে হইলেও, শৈশবের পিতৃমাতৃভক্তির মধ্যে সর্বদাই লুকাইয়া থাকে। তার পরে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে, নবযৌবনের প্রথম মলয়নিঃস্বনে যখন শরীর-মনের কুঞ্জে কুঞ্জে নূতন প্রাণতা ও নূতন উল্লাস স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং যখন আমরা, বাসন্তী বনস্থলীর জায়, নিজেদেরে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিবার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠি ; তখন ইচ্ছা হয়—

ঘর করি বাহির, বাহির করি ঘর,

পর করি আপন, আপন করি পর।

আর এই যে পরকে আপন করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহা হইতেই সখ্যরতির জন্ম হয়। বাসন্তী বনস্থলী যেমন আপনি আপনার অভিনব উল্লাস ও কস্মচেষ্টার ভাব নিজে বুঝে না, কেন যে তার গুফ তরু মুঞ্জরিয়া উঠে, নীরব আকাশ বিহগের কলকণ্ঠে ও ভ্রমরগুঞ্জে সঙ্গীত-মুখরিত হইয়া উঠে, কেন যে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটে, চারিদিকে সৌরভ ছুটে, এ সকল কিছুই জানে না ; আমরাও

অনেক সময় প্রকৃতি দেবীর এই অপূর্ণ বসন্তোৎসবের বরণকিরণগঞ্জে সঙ্গীত-চ্ছন্দেই কেবল মুগ্ধ হইয়া থাকি, কিন্তু তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম যে কি, ইহার অনুসন্ধান করি না। সেইরূপ প্রথম-যৌবন-সন্ধারে আমাদের শরীর-মনে যে অভিনব ভাবের উদয় হয়, তাহার আনন্দ এবং উল্লাসটুকুই কেবল আমরা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তাহার দ্বিতরে যে নিগূঢ় কলাকৌশলটা লুকাইয়া আছে, তাহা ধরিতে চাহিও না, পারিও না। কলতঃ প্রকৃত মর্ম্ম কিন্তু হু' এরই এক। ঐ বাহিরের নৈসর্গিকী বাসন্তী লীলার যে অর্থ, জীবের শরীর-মনের এই যৌবনলীলারও সেই অর্থ। ছই-ই এককে বহু করিবার, সঙ্গীর্ণকে বিস্তীর্ণ করিবার জন্ত প্রকৃতির অঙ্কিত কলাকৌশল মাত্র। ভূঙ্গের পায়ে জড়াইয়া, প্রজাপতির পালকে চড়াইয়া, উদ্ভিদেয়া আপনার প্রাণ-কেশরগুলিকে বনময় ছড়াইবার জন্তই, রূপের হাট খুলিয়া, মধুগন্ধ বিলাইয়া, বাসন্তীলীলাতে নিযুক্ত হয়। আর আমরাও সখ্য ও মাধুর্য্য-রতিকে জাগাইয়া, তার সাহায্যে আপনাদিগকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাতেই, সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে, নবযৌবনের রূপরসের পসরা খুলিয়া বসি।

যৌবনের স্মৃচনাতেই সখ্যরতির সন্ধার হয়। তার পরে, যৌবনের প্রস্ফুট পূর্ণতায়, যাহা মাধুর্য্যরসের ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করিবে,—সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যারও এই সখ্যরতিতেই “হাতে খড়ি” আরম্ভ হয়। এই জন্ত মাধুর্য্যের অনেকগুলি ভাববিভব এবং কলাকৌশল সখেতেও ফুটিয়া উঠে। রূপ-লালসা এবং

আসঙ্গলিপ্সা মাধুর্যের প্রাণ। এই রূপ-লালসা এবং আসঙ্গলিপ্সা সখ্যেরও প্রধান প্রেরণা এবং উপজীব্য। দেহাশ্রয় ও রূপজ-মোহ ব্যতীত সখ্যরতির সঞ্চার হয়, এ কল্পনা অসত্য। যৌবনান্তে বা যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি হইলেও বহুলোকের সঙ্গে আমরা অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হই বটে, এবং প্রচলিত ভাষায় অনেক সময় এই সকল আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সখ্য নামও দিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহা সখ্যরতি নহে। সেবা, কল্যাণ-কামনা, চিন্তা ও ভাবের বিনিময়, সংসারের কর্মে ও অবসরের আমোদ-প্রমোদে পরস্পরের সাহায্য—এ সকলই এই আত্মীয়তার সম্বন্ধের মধ্যে বিद्यমান থাকে, কিন্তু তথাপি ইহা প্রকৃত সখ্য নহে। আর, এই সম্বন্ধের মধ্যে রূপের ভোগ ও একান্ত আসঙ্গলিপ্সা থাকে না বলিয়াই ইহাকে সখ্য বলা সঙ্গত নহে। প্রকৃত সখ্য কৈশোর-ধর্ম। দেহের তারুণ্য ও লাভণ্য ইহার প্রধান উদ্দীপনা। বিগত-কৈশোরের প্রণয়ের সম্বন্ধেতে প্রণয়ী জনের দেহের প্রতি কোনও প্রকারের লোভ থাকে না। তাঁর হাতখানি ধরিয়া, সে স্পর্শসুখে নীরবে ডুবিয়া যাইবার কোনও সাধ, তাঁর অনাবৃত দেহের স্পৃহা আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার কোনও লালসা—হয় না। তাঁর অবিরল সান্নিধ্য লাভ না করিলে, কাছে থাকা বার্থ হইয়া গেল, এমনটা মনে হয় না। অথচ এইগুলি সখ্যরতির নিত্যধর্ম। এই ঘনিষ্ঠ দেহ-সম্বন্ধ-নিবন্ধনই সখ্যরতির মধ্যে আমরা মাধুর্য্যের পূর্বস্বাদ লাভ করিয়া থাকি। এই জন্তই সখ্যরতিরও ঠিক

মাধুর্য্যের পূর্বরাগের মতন একটা পূর্বরাগের অবস্থা আছে।

আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাহিত্যে সখ্য-বাৎসল্যাদি রসের যেমন অদ্ভুত ও সুস্ব-শিল্পেবণ হইয়াছে, জগতের আর কোনও সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত সেরূপ হইয়াছে বলিয়া জানি না ও শুনি নাই। আর আমাদের বৈষ্ণব-পদকর্তীগণ এ সকল রসের রূপ যেমন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, অথ কোনও কবি-সমাজ সেরূপ ফুটাইতে পারেন নাই। পূর্বরাগ, মিলন, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রভৃতির বর্ণনা যেমন বৈষ্ণব কবিতায় আছে, তেমন আর কোন্‌ও কবিতায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণও সখ্যের পূর্বরাগের কোনও চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। গোষ্ঠলীলায় সখ্যের সম্ভোগের এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইলে শীতামাদির বিরহের বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ রসের মধ্যেও যে পূর্বরাগ এবং মানাদির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার কোনও চিত্র অঙ্কনঃ এ পর্য্যন্ত আমার চক্ষে পড়ে নাই। অথচ এই রসের যে একটা পূর্বরাগের অবস্থা আছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। আর এই পূর্বরাগের সঙ্গে মাধুর্য্যের পূর্বরাগের সাদৃশ্য অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

দর্শন বা শ্রবণ এই দুই সূত্র অবলম্বনে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। রূপ-দর্শন বা শ্রবণ, এই দুই কারণেই,—যাঁর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, কিম্বা শ্রবণের কথা শুনিয়া যাঁর প্রতি প্রাণে একটা আসক্তির সঞ্চার হইল—তাঁর সঙ্গলাভের জন্য লোভ জন্মে। এই লোভেরই নাম পূর্বরাগ। শ্রীকৃষ্ণের নাম-শ্রী

শ্রবণে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার পূর্বরাগের
সঞ্চার হইয়াছে—

সই ! কেবা গুনাইল গ্রাম নাম ।

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো !

আকুল করিল মোর প্রাণ ।

না জানি কতেক মধু, গ্রাম নামে আছে গো !

বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।

জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো !

কেমনে পাইব সই, তারে ?

অত্মদিকে বিতাপতির শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ
মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎদর্শন হইতেই
সঞ্চার হয়—

নাহি উঠল তীরে, রাই কমলমুখী

সমুখে হেরল বর কান ।

গুরুজন সঙ্গে, লাজে ধনৌ নতমুখী

কৈহঁনে হেরয় বধান ।

সখিহে, অপকূপ চাতুরী গোৱী !

সব জন তেজিয়া, আগুসরি ফুকরই

আড় বদন তাঁহি ফেরি ।

তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল,

কহত হার টুটি গেল ।

সব জন এক এক চুনি সঞ্চর

গ্রাম দরশ ধনৌ কেল ।

নয়ন চকোর, কান্ধমুখ শশিবর

করল অমিয়া রসপান ।

হুহু দোহাঁ দরশনে, রসহঁ পসারল

বিতাপতি ভাল জান ॥

প্রথমে তাঁর নামগুণ গুনিয়া চণ্ডীদাসের
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণানুরাগিনী হইয়াছেন, তারপর
চিত্রপটে কৃষ্ণ-প্রতিকৃতি দেখিয়া, সে অনুরাগ
বাড়িয়া যায় ; এবং সর্বশেষে সাক্ষাদর্শন
লাভ করিয়া, সে রূপসায়রে কুলীগমন ধরম-

করম সকল বিসর্জন দিবার জন্ত ব্যাকুল
হইয়া উঠেন । ফগতঃ দর্শন ও শ্রবণ দুই
পূর্বরাগের সমান বাহন । তবে উভয়ের মধ্যে
বিস্তর প্রভেদও আছে । বিতাপতির শ্রীরাধিকা
ঐ প্রথম দর্শন-লাভের পরেই সখীকে
কহিতেছেন :—

কি কহব রে সখি কানুক রূপ

কো পতিয়ায়ব স্বপন-স্বরূপ ।

কিন্তু চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণরূপে

যেমন পাগল করিয়া তুলিয়াছে, বিতাপতির
শ্রীরাধিকাকে তেমন করিতে পারে নাই ।
ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে,
সাক্ষাৎদর্শনের পূর্বে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার
মতন, বিতাপতির শ্রীরাধিকা সে রূপকে
এমন করিয়া আপনার ধ্যানের বিষয় করেন
নাই । চণ্ডীদাসের শ্রীমতী প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের
নামগুণ গুনিয়া মুগ্ধ হন । এই নাম-গুণই
তাঁর অনুরাগের প্রথম আশ্রয় ও উপজীব্য
হয় । কিন্তু নাম গুনিয়া তিনি কেবল নাম
লইয়াই পড়িয়া রহেন নাই—কেহই পড়িয়া
রহে না । তিনি সেই নামকে আপনার
জপমালা করিলেও, আপনার অন্তরে যে
সহজ শ্রেষ্ঠতম রূপের আদর্শ ঘুমাইয়া ছিল,
তাহাকে জাগাইয়া, সেই নামের উপরে
আপনার নবীন অনুরাগের তুলিকা লইয়া
সে নবীন রূপকে আঁকিয়া নামের সঙ্গে
তারও ধ্যান আরম্ভ করিলেন । মানুষের
প্রাণ, জগতের সকল রূপের সার ছানিয়া,
আপনার মনের মাঝে তার নিজের সৌন্দর্যের
আদর্শকে ফুটাইয়া তোলে ও জাগাইয়া রাখে ।
তার চক্ষে এ রূপের তুলনা জগতে মিলে না ।
আর আপনার অন্তরের এই অতুলনীয় রূপ

দিয়াই চণ্ডীদাসের শ্রীমতী শ্রামনামের উপরে শ্রামরূপের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপর চিত্রপট-দর্শন। পটের ধর্মই এই যে, তাহা কোনও বস্তুর সমগ্রকে কিছুতেই প্রকাশ করে না ও করিতে পারে না। যে রূপ পটে ফুটিয়া উঠে, তার পশ্চাতে তার শতগুণ, সহস্রগুণ রূপ অক্ষুট থাকিয়া, কেবল যেন চারিদিকে উকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। প্রথমে যেমন নাম শুনিয়া সেই নামের উপরে শ্রীমতী আপনার অন্তরের সৌন্দর্য্যের ছবিটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ চিত্রপট দেখিয়াও সেই পটের অক্ষুট রূপের উপরে আপনার অন্তরের রূপের চিরন্তন আদর্শের রসান মাথাইয়া দিলেন। ইহার পরে যখন তাঁর সাক্ষাৎদর্শনলাভ হইল, তখন সে প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের ধ্যানের রূপটি মিলিয়া মিশিয়া, ভিতরবাহির, চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ উভয়কে এক করিয়া দিল। বিজ্ঞাপতির শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া

কি কহব রে সখি কান্থক রূপ !

কো পতিয়ায়ব স্বপনস্বরূপ !

ইহার চাইতে কোনও বড় কথা আর কহিতে পারিলেন না। তার পরে যাহা কিছু রূপবর্ণনা করিলেন, সকলই যেন ভাসা-ভাসা, কেবল কবিত্বের চাতুরী, উপমার ছলাকলা মাত্র। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা পূর্বে হইতেই পতীর ধানযোগে ও মানস-সম্ভোগের দ্বারা সে স্বপ্নকেই প্রত্যক্ষ ও সত্য করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। স্মৃত্যং সাক্ষাৎদর্শনে তাঁর স্বপ্ন-বেশ হইল না ; বরং তজ্জা টুটিয়া গিয়া সজাগ দৃষ্টিতে সে সত্যরূপ দেখিয়া, তিনি সজ্ঞানে

তাহার পদে আপনার তনু-মন-প্রাণ সকলি সমর্পণ করিলেন। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার দৃষ্টি পরিষ্কার, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আর ছায়ার মতন দেখেন নাই !

শ্রামের বদনের ছটার কিবা ছবি।

কোটি মদন জহু জিনিয়া শ্রামের তনু
উদইছে যেন শশী রবি।

সই কিবা সে শ্রামের রূপ
নয়ান জুড়ায় চেঞা।

হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধেঞা।

অনুব্র—

জলদ বরণ কান্থ দলিত অঞ্জন জহু
উদয় হয়েছে সুধাময়।

নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উত্তরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়।

* * * * *

ছইটা মোহন নয়নের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।

পশিয়া মরমে, যুচায়া ধরমে
পরায় সহিত টানে।

দর্শন ও শ্রবণ—রূপদর্শন এবং নামগুণ-শ্রবণ—ইহা হইতেই পূর্বরাগের জন্ম হয়। সখ্যের পূর্বরাগ প্রায় সর্বদাই রূপদর্শনে জাগ্রত হয়। মাধুর্য্যের পূর্বরাগ দর্শন ও শ্রবণ—আম্র আমাদের দেশে বিশেষতঃ প্রিয়জনের নামগুণ শুনিয়াই জাগিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই পূর্বরাগেরও একটা পূর্বাবস্থা আছে। যৌবন ফুটিতেছে অথচ বাল্যও একেবারে চলিয়া যায় নাই, এই বয়ঃসন্ধি-কালেই সখ্যের পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। এই সময়ে বাল্য-বন্ধু ও বাল্যসহচরীগণই আমাদের

জন্মের প্রধান আলম্বন ও উপজীব্য হইয়া কেন। তখনও মাধুর্য্যের ভূমি প্রস্তুত হয় নাই। প্রজননশাস্ত্রি কন্দর্পঃ—প্রজনন-হেতুই কাম বা কন্দর্প ভগবানের বিভূতিমধ্যে পরিগণিত হয়। আর এই প্রজনন-চেষ্টা হইতেই শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য-রসের উৎপত্তি হয়। স্তত্রাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের শরীর-মনের অবস্থা প্রজনন-ক্রিয়ার উপযোগী হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে মাধুর্য্যের ভূমিও প্রস্তুত হয় না। অতএব স্মৃটনোন্মুখ যৌবন যেমন সখ্যরতির আশ্রয়, সেইরূপ প্রস্ফুট যৌবনই কেবল মাধুর্য্যের আশ্রয় হইয়া থাকে। যৌবন ফুটিবার পূর্বে সখ্য-রতিই জন্মিতে পারে, কিন্তু মাধুর্য্য জন্মিতে পারে না। সেইরূপ আবার যৌবন একেবারে নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আর প্রকৃত মাধুর্য্য ফুটিবার অবসর পায় না। যে সকল সমাজে অতীত-যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, সেখানে আমাদের রস-শাস্ত্রে বাহ্যকে পূর্বরাগ বলিয়াছেন, তার সত্য স্বরূপটা ভাল করিয়া ফুটিতে পারে না। একদিকে একটা বলবতী লালসা, অন্যদিকে একটা অজ্ঞাত, অনিদিষ্ট আশঙ্কা,—এই দুই ভাব মিলিয়া যে গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে, তাহাই পূর্বরাগের প্রাণ। জীবনের অভিজ্ঞতারুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কা সঞ্চক্ষে আমাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা স্বল্পবিস্তর স্থিরবুদ্ধি জন্মিতে আরম্ভ করে। আর পূর্বে পূর্বে যে সকল অবস্থার যেরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, এবারেও তাহার অনুরূপ অবস্থার সেইরূপ পরিণতিই ঘটবে, এই যে ধারণা, ইহা হইতেই অনাগিত বিষয়ে আমাদের

উদ্বিগ্ন কমিয়া আইসে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের সংসারের ভাবনা ও কণ্ঠচেষ্টা যতই প্রবল হউক না কেন, প্রথম বয়সের অসহ উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠা যে ক্রমে কমিয়া আইসে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। এবং এই জন্মই পরিণত যৌবনে বা যৌবনান্তে আমাদের জীবনে মাধুর্য্যের পূর্বরাগ ফুটিয়া উঠিবার উপযোগী ভূমি ও অবসর প্রাপ্ত হয় না।

প্রথম যৌবনের সূচনায় আমরা একটা অনন্ত অজ্ঞাত রাজ্যের সীমাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াই। আমাদের শরীরের মধ্যে তখন একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে—এই অভিনব উল্লাস ও বিবর্তন-শ্রোতে আমাদেরকে কোথায় লইয়া যাইবে, ইহা আমরা তখনও জানি না। জানি কেবল একটা নূতন শক্তির জাগরণ, একটা নূতন আনন্দের সঞ্চার, একটা নূতন রূপের বিকাশ, একটা নূতন ভোগের পিয়াসা। এই যৌবন যখন আপনার নিঃশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, এই বিকাশ যখন বন্ধ হইয়া যায়,—ইন্দ্রিয়ের লালসা মাত্র তখন থাকে, কিন্তু পূর্বকার সে রস বা রোম্যান্স-টুকু আর থাকে না। ফলতঃ অজ্ঞাতের আশ্রয় ব্যতীত কোথাও সত্য রস বা রোম্যান্স (Romance) ফুটিতে পায় না। অজ্ঞাতই রসের বা রোম্যান্সের নিত্যভূমি। যে দম্পতি পরস্পরকে একান্তভাবে জানিয়া ফেলিয়াছেন, বাহাদুরের পরস্পরের চক্ষে পরস্পরের রূপের, গুণের, চিন্তার, ভাবের, আচার-আচরণের মধ্যে অজানা কোনও কিছু থাকে না,—যাঁরা পরস্পরের সঞ্চক্ষে সত্যভাবে সর্কিয়া ইহা অনুভব করেন না যে—“জানি

জানি মনে জানি, কিন্তু আমি জানিনে”
 চিনি চিনি মনে চিনি, কিন্তু আমি চিনিনে”—
 তাঁদের দাম্পত্য সন্ধের রস বা রোম্যান্স (Romance) আর থাকে না। যতদিন
 ঐ অজানা জগৎ! পরস্পরের রূপের, গুণের,
 আচার-আচরণের মধ্যে একে অন্বেষণ চক্ষে
 নিয়ত জাগিয়া থাকে, ততদিনই প্রকৃত
 পক্ষে তাঁহাদের দাম্পত্য-প্রেমে মাধুর্য্য-রস
 বিত্তমান থাকে। সব জানা হইয়া গেলে,
 কামের সঙ্কলন-নিবৃত্তি না হইলেও, প্রেমের
 সন্ধান আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন
 নিতান্ত সাধুলোকে মধ্যও, প্রেমের ডোর
 ছিঁড়িয়া গিয়া, কেবল সংসারের কঠোর
 কর্তব্য বন্ধন মাত্র অবশিষ্ট রহে। কেবলমাত্র
 কামপ্রসূতির চরিতার্থতার জন্ত, কিম্বা শুদ্ধ
 প্রজননক্রিয়া সম্পাদনার্থে যৌবন এবাংগ
 আবশ্যক নহে। কিন্তু মাধুর্য্যের জন্ত তাহা
 নিতান্তই প্রয়োজন। এই জন্তই চণ্ডীদাস
 কিশোরী-কিশোরীর যুগল-মূর্তিকে মাধুর্য্যের
 আধার ও আশ্রয় বলিয়াছেন।

কিশোরী কিশোরী দুইটি জন।

শৃঙ্গার রসের মূর্তি হন।

কিন্তু এখানে কিশোরী-কিশোরী বলিতে
 অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা বুঝিলে চলবে
 না। প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে একাদশ
 হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্তই কৈশোরকাল
 বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবপদ-
 কর্তাগণের, বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের,
 পরিভাষায় ইহাকে কৈশোর না বলিয়া বয়ঃ-
 সন্ধি বলাই সমধিক সঙ্গত। আর বয়ঃসন্ধি-
 কালে সখ্যরতিরই সঞ্চার ও বিকাশ সম্ভব,
 মাধুর্য্যরসের স্ফুর্তি অসম্ভব। ফলতঃ চণ্ডী-

দাসের পদাবলীতেও শ্রীমতীর যে রূপবর্ণনা
 আছে, তাহা হইতে তাঁহাকে কোনও মতেই
 অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।
 ইহা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বা চতুর্দশবর্ষীয়া
 বালিকার ছবি নহে, কিন্তু প্রস্ফুট-যৌবনা
 রমণীরই ছবি।

তাড়ত বরণী, হরিণ নয়নী

দেখিহু আঞ্জিনা মাঝে।

কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,

গড়িল কোন বা রাজে ॥

সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।

চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,

বড়ই রসের কূপ ॥

সোণার কটোরি, কুচয়ুগ গিরি

কনক মন্দির লাগে।

তাহার উপরে চূড়াটি বসাল

সে আর অধিক ভাগে ॥

অন্তঃ—

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।

গোরোচনা গোয়ী, নবীন কিশোরী

নাহিতে দেখিহু ঘাটে ॥

গুনহ পরাণ, সুবল সাজাতি

কো ধনী মাজিছে গা।

যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,

পায়ের উপরে পা ॥

অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন

আলাঞা দিয়াছে বেণী।

উচ কুচ মূলে, হেমহার দোলে,

সুমেধ শিখর জানি ॥

আবার অন্তঃ আছে—

খির বিজুরী বদন গোয়ী

পেখহু ঘাটের কূলে।

কানড়া হাঁদে, কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার মালা ॥

সই মরম কহিছ তোরে ।

আড় নয়নে জেবং হাসিয়া
আকুল করিল মোরে ॥

ফুলের গেড়িয়া, লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ ।

উচ কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস ॥

অন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর রূপ বর্ণনা করিয়া
বলিতেছেন :—

শ্রীফল যুগল, জিনি কুচ যুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে ।

তাহার উপরে, মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে ॥

শ্রীকৃষ্ণমুখে শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনার সকলের
শেষ পদটী এই—

কনক বরণ কিবে দরপণ
নিছনি দিবে যে তার ।

কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত
সিন্দূর অরুণ আর ।

সই, কিবা সে মধুর হাসি ।

হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল গশি ॥

গলার উপর, মণিময় হার
গগন মণ্ডল হেক ।

কুচযুগ গিরি, কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু ॥

শুরু উরুতে, লম্বিত কেশ—
ইত্যাদি ।

নায়কের পূর্বরাগের বর্ণনায়, চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধিকার যে রূপের বর্ণনা

এখানে করিয়াছেন, প্রচলিত অর্থে তাহা
কৈশোর রূপ হইতেই পারে না । একাদশ,
দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ
পর্যন্তও অঙ্গ-গঠনের এতটা বিকাশ প্রায়
হয় না । শুকনিতম্ব, পীনপয়োধর প্রভৃতি
প্রস্ফুটযৌবনেরই লক্ষণ, বিকাশোন্মুখ
যৌবনে ইহা পাওয়া যায় না । অতএব
চণ্ডীদাসের কৈশোর কাল কিছুতেই একা-
দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত নির্দেশ
করা যায় না । কদাচিৎ কোনও স্থলে
চতুর্দশ বা পঞ্চদশবয়সী বালিকার মধ্যে
এতটা অসাধারণ অঙ্গবিকাশ দেখা গেলেও,
সচরাচর আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ষোড়শ
হইতে অষ্টাদশ এবং শীতপ্রধান যুরোপে
অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্যন্তই চণ্ডীদাস
কৈশোর-নামে যে প্রস্ফুট যৌবনের বর্ণনা
করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কাল বলিয়া
নির্ণয় করিতে হয় । চণ্ডীদাসের কিশোরী
অম্লভিঙ্গযৌবনা বা সন্তোভিন্নযৌবনা নহেন,
কিন্তু প্রস্ফুট বা বিকাশিতযৌবনা । তাঁহার
কিশোরাঙ সেইরূপ বালক নহেন, কিন্তু
যুবক । শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপের
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার সম্পূর্ণ
প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায় । সাক্ষাৎদর্শনের
পরে শ্রীমতী সখী সন্মোদনে বলিতেছেন—

সই এমন স্তম্ভর বর কান ।

হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি
ভেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥

এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে ।

যুবতী ধরম, ধৈর্য্য ভূজঙ্গম
দমন করিবার তরে ॥

অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত
দেখিহু দর্পণাকার।

তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপা তার ॥

নাভির উপরে, লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।

ভুকর বলনী, কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা ॥

আর একবার শ্রীমতী রুক্ষরূপ বর্ণনা করিয়া
বলিতেছেন—

অতি সে শোভিত, বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণাকার।

তাহার উপরে মাল, শোভি আছে ভাল
উপজে মদন বিকার ॥

নাভির উপরে জহু, তমাল জিনিয়া তহু
দলিত অঙ্গন জিনি আভা।

বড় কারিকর, কুন্দিয়াছে ভাল
বাম কদলী শোভা ॥

অন্তর—

বিধকল জিনি কে বা, ওঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করি-গুণ্ড।

কম্বু জিনিয়া কে বা, কঠ বনাইল রে,
বিস্তারি পাশাণে কে বা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগরে বৃকের শোভা।

নাম কুন্তমে কে বা, স্রবমা করেচে রে,
এমতি তন্তর দেখি আভা ॥

আচলি উপরে কে বা, কদলি রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগ।

অকুলি উপরে কে বা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥

যেমন শ্রীমতীর গুরুনিতম পীনপয়োধর
প্রভৃতি, প্রচলিত অভিধানে বাহাকে কৈশোর

বলে, তাহার লক্ষণ নহে; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের
বিস্তারিত বক্ষ, নাভি, লোমলতাবলী, কদলি-
সম উরুযুগ, এই সকলও কৈশোরের ছবি
নহে। চণ্ডীদাসের শ্রীমতীর রূপবর্ণনা ও
শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা উভয়ই তাঁর নায়ক-
নায়িকার কোমল কৈশোরের নহে, কিন্তু
প্রস্তুট ঘোবনেরই প্রতিকৃতি অঙ্কিত
করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেমন,
বিদ্যাপতির পদাবলীতেও সেইরূপই, প্রথম
দর্শনের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পরস্পরের
ষে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের
কৈশোরাবস্থার নহে, কিন্তু প্রস্তুটঘোবনেরই
পরিষ্কার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম
দর্শনের পরে বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ ও
শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

উরাই অঞ্চল, কাপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেক।

শরস পরাভবে, শারদ ঘন জহু
বেকত করল স্রমেক ॥

অতঃ বলিতেছেন—

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমতি-হার।

কামকম্বু ভরি, কনয়া শতুপরি
চারত সুরধুনী-ধার।

আবার—

অপরূপ-রূপ রমণী মণি।

বাইতে পেছনু গজরাজ-গমন ধনী ॥

সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তহু অতি কোমলিনী

কুচ-ছিরি-কল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে কনি ॥

পীনপয়োধর, গুরুনিতম, সন্ন্যাস,—এ

সকলের কোনটাই কৈশোর-লক্ষণ নহে। বিশেষতঃ বিজ্ঞাপিত পূর্বরাগ বর্ণনার পূর্বেই বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করিয়া, পূর্ণ ও প্রস্ফুট যৌবনের পূর্বে যে মাধুর্যের সঞ্চার অসম্ভব ইহা স্পষ্টতঃই বাগ্মী গিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণবপদকর্তৃগণের কিশোরা-কিশোরীকে আধুনিক বাঙ্গালা অভিধানের অর্থে অপাপ্ত-বয়স্কা বা অস্ফুটযৌবনা মনে করা কোনও মতেই সম্ভব নহে। তাঁহাদের রূপাক্ষয়ের লীলা-বর্ণনার সঙ্গে এই অর্থের কোনও পকারের সঙ্গতি হয় না।

কণ্ঠঃ পচলিত বাঙ্গালা অভিধানে যাহাকে কৈশোর বলে, বিজ্ঞাপিত তাহা এই বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। এই কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিকালে স্খাতিরই জন্ম হয়, মাধুর্য জন্মে না। এই কৈশোরে মানুষ জানা ও অজানার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের গোথুলা লগ্নে আসিয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞাতের ছটা আসিয়া তখন যাবতীয় জ্ঞাতকে টঙ্কাসিত করতে আরম্ভ করে। উন্মেষোন্মুখ যৌবনের প্রথম মলয়-নিবাসে তখন একটা অভিনব রূপ-লালসা ও আদর্শগীষ্মা শরীর-মনকে চঞ্চল করিতে আরম্ভ করে। তখনও কিন্তু জননে-জিহ্বের ক্ষুধা হয় নাই। প্রজনন-প্রয়োজনে প্রস্ফুট যৌবনে জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে পূর্ণতাপ্রাপ্তি অত্যাবশ্যক, সে পূর্ণতা তখনও ফুটিয়া উঠে নাই; তার অঙ্গুর মাত্র সবে জাত হইতেছে। ভিতরে ভিতরে তখন সবে এই নবযৌবনের সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু এই সাড়ার মর্ম্ম সম্যক উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই বয়ঃকালকেই আমাদের দেশের রসতত্ত্ব-বিদেরা বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। তখন মাধু

র্য পুরুষ না স্ত্রী; না রমণ, না রমণী। এই বয়ঃসন্ধিকালই সখ্যারতির উপযোগী যুগ। এই বয়ঃসন্ধিকালেই ইংরেজিতে যাহাকে school-boy কিংবা school-girl love বা friendship বাগ্মী থাকে, তার জন্ম হয়। তখনও মাধুর্যের আশ্রয় যে শৃঙ্গাররতি তার প্রেরণা জাগে নাই, অথচ উহার প্রথমতম আভাসের মতন, এই অপূর্ণ, অজ্ঞাত রসের একটা ঈষৎ-আভা শিরায় শিরায় ধারে ধীরে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদেরে চিনি নাই ও বুঝি না; কেবল প্রতিদিন নূতন নূতন রূপরসের বিকাশ অনুভব করিয়া কেমন একটা অজানাভাবে বিভোর হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের দেখিতে এই উন্মেষোন্মুখ যৌবনের নিত্য নবরূপের ক্ষুধা দেখিয়া নিজেরাই বিস্মিত হইয়া, চাকত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া, ব্যর্থতার তাহারহ ধ্যান করিতে থাকে। এই ধ্যান হইতে এই শরীরের প্রতি একটা আভিনব মমতা, এই দেহের ক্ষুধা ও কাঙ্ক্ষ-সাধনের জন্ম একটা অভিনব প্রণয়ন-প্রণয় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময়ে দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমরা নিজেরা নিজেদের রূপেরই সন্তোষ করিতে থাকি। এই রূপে তখনও অপর কাহারও অধিকার হয় নাই। ইহাই বয়ঃসন্ধির অবস্থা। এই অবস্থাতেই আমাদের শরীর-মনেতে ক্রমে ক্রমে মাধুর্যের ভূমি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে।

বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বয়ঃসন্ধির কোনও বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। অথচ রসের সকল রূপকে ভাল করিয়া কুটাইতে হইলে, যেমন নারিকার সেইরূপ

নারকেরও বয়ঃসন্ধির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা
আবশ্যক হয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই এই
বয়ঃসন্ধির সঙ্গে পরবর্তী প্রস্ফুটবোবনে
মাধুর্যের পূর্বরাগের যে সকল রূপ ফুটিয়া
উঠে, তার অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে।
শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধির কোনও ছবি বৈষ্ণব-
পদাবলীতে না থাকিলেও, বিদ্যাপতি ঠাকুর
শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধির অতি অপূর্ব প্রতিকৃতি
অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের
আর কোনও সত্যিত্যে ইহার অনুরূপ কোনও
কিছু পাওয়া যায় বলিয়া এখনও জানি নাই।
আর পূর্বরাগের সত্য রূপটী যে কি, ইহা
ভাল করিয়া ধরিতে হইলে, প্রথমে এই
বয়ঃসন্ধিকালে নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে সকল
ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার আলোচনা করা
আবশ্যক। কারণ এই সকল ভাবই প্রস্ফুট-
বোবনের তাড়িতসঞ্চারের দ্বারা রূপান্তরিত ও
অর্থান্তরিত হইয়া, পূর্বরাগের স্বরূপকে
ফুটিয়া তোলে। শৈশব ও বোবনের
মিলন-কালকেই এই বয়ঃসন্ধি বলা হয়।

শৈশব বোবন হুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ হুঁ লোচন নেল ॥
বচনক চাতুরি, লহ লহ হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ ॥
নিরঞ্জে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত, হাসত, পয়োধর হেরি ॥
পহিল বদনগন পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উষারয়ে অঙ্গ ॥

অন্তঃ—

কণে কণে নয়ন কোণ অঙ্গুরই।
কণে কণে বসনধূলি তম্ব ভরই ॥

কণে কণে দশন ছটীছটী হাস।
কণে কণে অধর আগে কর বাস ॥
চমকি চলয়ে কণে, কণে চলু বন্দ।
মন্মথ পাঠ পাহল অনুবন্দ ॥
হৃদয়জ মুকুল ছেরি ধোর ধোর।
কণে আঁচর দেই, কণে হোয় ভোর ॥

আবার—

শৈশব বোবন দরশন ভেল।
হুঁ দল বলে ধনি দক্ষ পড়ি গেল ॥
কবছঁ বাক্সয়ে কচ কবছঁ বিধারি।
কবছঁ বাঁপয়ে অঙ্গ কবছঁ উষারি ॥
ধির নয়ন মথির কছু ভেল।
উরজ-উদয় থল নাগিল দেল ॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥

তার পরে যখন বোবন আর একটু ফুটিয়া
উঠিল, তখন এ সকল ভাবেরও একটু
পরিবর্তন ঘটিল।

আওল বোবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল ॥
করু হুঁ লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল, উপজল লাজ ॥
অব অনুধন দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ ॥
কটিক গৌরব পাওণ নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ॥

তার পরে, বোবন যখন আরো প্রস্ফুট হইল
তখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈল গেল পীন।
বাড়ল নিতম্ব মাঝ ভেল কৌণ ॥
অনাহি মদন বাড়ায়ল দাঁট।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ ॥

কেমন করিয়া ধীরে ধীরে শৈশব সরিয়া যায় ও বোবন আসিয়া তার স্থান অধিকার করে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীরাধিকার এই বয়ঃসন্ধির চিত্রেতে তাহা অতিশয় বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর

“জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান”

এই পদেতে বিদ্যাপতি ঠাকুর এই বয়ঃসন্ধির সঙ্গে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গারের সম্বন্ধ কি ও কতটুকু ইহা অদ্ভুত কলাকুশলতা সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শৈশবে আমাদের দেহমনে মদনের কোনও সাড়া পড়ে না। শৃঙ্গার বা মাধুর্য্য কাকে বলে তখন আমরা তার কোনও কিছুই জানি না। কিন্তু এই বয়ঃসন্ধিকালে, আসন্ন যৌবনের পূর্ব্বেভাগে শরীর-মনের যখন একটা নূতন বিকাশ আরম্ভ হয়, তখনই প্রথমে মনসিজ জাগিতে আরম্ভ করে—কিন্তু চক্ষু খোলে না। ভিতরে ভিতরে তার আগরণ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বহিঃশ্চতঃ প্রকাশ হয় নাই। ফলতঃ কোনও বিশিষ্ট মানুষী রূপের প্রেরণা বাতীত মনসিজ কখনও এই বহিঃশ্চতঃ লাভ করে না। এইরূপ চাক্ষুষই হউক বা কেবল কল্পিতই হউক,— ইহার প্রেরণা মনসিজের নমনোম্মীলনের জন্ত অত্যাৱশ্যক। আর কল্পিতরূপও প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত ফুটে না। কারণ স্থানবিশেষে, কালবিশেষে, আধারবিশেষে যে রূপ প্রত্যক্ষ হয়, অন্তস্থানে, অন্তকালে, অপর আধারে, যেখানে তাহা প্রত্যক্ষ নাই, সেখানে তার আরোপ বা অধ্যাস করিয়াই আমরা সর্ববিধ কল্পিত রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এইরূপে বিশেষ রূপের প্রত্যক্ষ বা কল্পনা ব্যতীত মনসিজের মুদিত-নয়ান খোলে না। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার আগ্রত কিন্তু নিম্নলিখিতেন্ত্র মনসিজ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদর্শনে

চক্ষু বেলিয়াছে। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার মনসিজের এই নিম্নলিখিত নেত্র প্রথমে শ্রীমতীর অন্তরের ধ্যানমূর্ত্তি ভাবিয়া, ও পরে চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া এবং সর্বশেষে তাঁহার সাক্ষাদর্শনলাভে উত্তরোত্তর পরিষ্কার হইয়া থুলিয়া যায়। কিন্তু উভয়-ক্ষেত্রেই বয়ঃসন্ধিকালে ইহা আগ্রত অঞ্চল নিম্নলিখিতেন্ত্র হইয়া ছিল।

বিদ্যাপতি ঠাকুর পূর্ব্বেভাগের বর্ণনায় প্ররম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধির এই অল্পমাত্রা চিত্র অঙ্কিত করিয়া, মাধুর্য্যের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, শরীরের ও মায়ামণ্ডলের কোন্ অবস্থাকে কিরূপে কোন্ দিক দিয়া অলম্বন করিয়া এই উন্নত উজ্জ্বল রসশ্রী তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে, ইহার বিবর্তন-ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্বও অতি পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এইখানেই আমরা পূর্ব্বেভাগের মনস্তত্ত্বের বা psychology'র সন্ধান প্রাপ্ত হই। আর এইখানেই আমরা অতি পরিষ্কাররূপে এটি দেখি যে, প্রস্তুত যৌবনে ভিন্ন মাধুর্য্যের সত্য আশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। শ্রীরাধিকার যখন—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।

বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥

অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীর্ঘ।

শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥

আর এইরূপে শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্বভেদে যখন যৌবন সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল এবং শৈশব সদলবলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল,— অর্থাৎ যৌবনের পূর্ণ ও অনন্তপ্রতিষন্দী প্রভাব যখন তাঁর দেহ-মনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল,—তার পরেই যমুনা-স্নানে বাইয়া কান্দ-দরশনে পূর্ব্বেভাগের সঞ্চার হইল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়

বুড়া বয়সে কলম ধরিতে বাওয়াই এক প্রকার বিড়ম্বনা। লিখিতে বসিলে সব কথা সকল সময়ে ঠিক মনে আসে না—আর যদিই বা আসে, ভাল করিয়া শুছাইয়া লেখা চঃসাধা হইয়া উঠে। কিন্তু তা' বলিয়া জগদীশ বাবুর জীবনবৃত্তান্ত বাদ দেওয়া চলে না। সুতরাং যেখানে যেখানে ক্রটি ঘটিয়াছে, পাঠকগণ অল্পগ্রহপূর্ব্বক মার্জনা করিবেন।

জগদীশ বাবু যখন নোয়াখালিতে, তখন সেই বিভাগে ডরাণ্ট বলিয়া একজন সিম্ভিল-সার্জন ছিলেন, পানাদিকোর জন্ত সাহেবেরা কেহই তাঁহাকে সূচক্ষে দেখিতেন না, এনি জগদীশ বাবুর শরণাপন্ন হন, জগদীশ বাবুও ইঁহাকে সহায়তা করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর জগদীশ বাবুর নিকটে আসিয়া কি চাহেন, জগদীশ বাবু তাহা দিতে স্বীকৃত হন নাই, তাহাতে রাগান্বিত হইয়া হস্তান্তর একটা 'ছপ্টি'র দ্বারা জগদীশ বাবুকে আঘাত করিষে যান, ছপ্টির অগ্রভাগ জগদীশ বাবুর মুখে লাগে, তিনি ইঁহার মস্ততার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, অল্প কোনও প্রতিবিধান না করিয়া, আর্দালিদের কেবল উঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হুকুম দেন, আর্দালিরা বাহিরে লইয়া গিয়া কিছু শাস্তি দেয়, সাহেব প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

লেক্টেন্যান্ট গবর্নর গ্রে সাহেব এ কথা জানিতে পারিয়া, একেবারে ডরাণ্টকে ডিসমিস করেন, নোয়াখালি হইতে আসে, তাহার এমন সংস্থান ছিল না, সুতরাং জগদীশ বাবুর

নিকট সহায়তা প্রার্থনা করে, জগদীশ বাবু তাহার পূর্ব্ব ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাই। দেন, এ রকম উদারতা আজকাল বিরল।

একবার জগদীশ বাবু ময়নাগড়ের রাজা ও তাঁহার দল-বল লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাত্রা-হিগেন, শিমালদহ ষ্টেশনে পুলিশ-বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনেরাল কর্ণেল জিউ. ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনেরাল কর্ণেল গর্ডন, পারদমানাল আমিষ্টাণ্ট মেজার হাইল্যান্ডসন এবং অপরাপর সাহেব পুলিশ-কমিষ্টারাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা জগদীশ বাবুকে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি অম্মান বদনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটগুলি দেখাইয়া উত্তর করিলেন “আমার বন্ধুদের লইয়া কাঁচড়াপাড়ায় যাত্রা-হি এবং তৃতীয় শ্রেণীর এহ টিকিটগুলি ক্রয় করিয়াছি।” কয়জন এ অবস্থায় পাড়লে সংকথা বলিতে সাহসী হইতেন?

যখন জগদীশ বাবু নোয়াখালিতে, তখন হুইনকিল্ড্ বলিয়া একজন ইংরাজ সিম্ভিলিয়ান কলেক্টর ছিলেন, নিমকসংক্রান্ত কোন বিষয় তাঁহার জানিবার আবশ্যক ছিল, সুতরাং রেভেনিউ বোর্ডে সেই তথ্য জানিবার জন্ত লেখেন, আলান্‌জোমনি তখন বোর্ডে নিমক বিভাগের-কর্ত্তা ছিলেন, তিনি উত্তর পাঠাইলেন ‘নিমকের সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার আবশ্যক হইলে বোর্ডকে লিখিতে হইবে না, ওখানে তোমার যে

পুলিশের কর্তা আছেন, তিনি নিম্নকসম্বন্ধীয় বিষয়ে এত দক্ষ ও বিজ্ঞ যে, তিনি যাহা বলিবেন সেই মতে যেন কার্য্য করা হয়, বোর্ডকে লিখিবার আবশ্যক নাই, বোর্ড ও গবর্ণমেন্ট নিম্নক সম্বন্ধে জগদীশ বাবুর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন।”

হুইনফিল্ড সাহেবের জগদীশ বাবুর উপর এত প্রশংসাত্মক বাক্যিত হইল যে, তাঁহার দ্বারা জগদীশ বাবুর সঙ্গে এক বোটে কলিকাতায় চাঁকৎসার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। আজকাল এমত সৌহার্দ্য বাঙ্গালী-ইংরাজের ভিতর দুলভ।

বালেশ্বরে থাকিবার সময় ইনি উড়িয়া-দিগের উচ্চ শিক্ষা দিবার এবং সরকারী কার্য্যে দক্ষি করিবার সুব্যবস্থা করেন; বাঙ্গালারা তখন উড়িয়াদের সূচক্ষে দেখিতেন না, এমন কি উড়িয়া ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা ছিল না, জগদীশ বাবু উড়িয়াদের নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে বাঙ্গালীরা মনে মনে বিরক্ত হইলেন, যদিও প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে কেহ সাহসী হন নাই। এই সম্বন্ধে বাবু ককির-মোহন সেনাপতি, বাবু গোবিন্দ দাস এবং মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর অনেক কথা বলিতে পারেন। জগদীশ বাবুর উত্তেজনায় ডিভিসনাল কমিশনার রেভেনস সাহেব স্থানীয় সাহেবদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, উড়িয়াদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্ত গবর্ণমেন্টকে অগ্ররোধ করেন এবং তাঁহার পরেই রেভেনস সাহেব প্রতীতি হয়। জগদীশ বাবুর পরামর্শ মত চাঁদবালা বন্দর খোলা হয়, উড়িয়ার পথে তখন চোর-

ডাকাতের বড় ভয় ছিল, বাঙ্গালীদিগের কাপড়-চোপড় কাড়িয়া কুড়িয়া লইয়া শুধু বদমায়েসেরা যে ক্ষান্ত হইত তাহা নহে, সময়ে সময়ে খুন জখম অবধি করিয়া কেবলিত। অধিকন্তু পথে পীড়া হইলে একেবারে চাঁকৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, জগদীশ বাবু এণ্ডাল্ট রোডে এমন সুব্যবস্থা করিলেন যে, প্রত্যেক এক ক্রোশ অন্তর একজন কনষ্টবল ও চারিজন পাইক এবং প্রত্যেক তিন ক্রোশ অন্তর একজন হেড্ কনষ্টবল, চারিজন কনষ্টবল এবং আটজন পাইক, তাহাদের এলাকার ভিতর চৌকি পাহারা করিত, ইহাদের উপর একজন ইন্স্পেক্টর ও দুইজন সর্ভেইন্স্পেক্টর ণালি জেদগস্ত করিত, স্বয়ং জগদীশ বাবু নিজে যুগ্ম ঝাপ করিয়া আজ এখানে কাল ওখানে দেখিয়া বেড়াইতেন, সুতরাং চুরি ডাকাতী তাঁহার এলাকার ভিতর একেবারে বন্ধ হইয়া পিয়াছিল। এই সব পুলিশ-কর্মচারিগণের নিকট জ্বর, কলেরা, রক্ত আশায়ের ঔষধ থাকিত এবং পানীয় জলের ইন্দারা অথবা পুষ্করিণী তাহারা একেবারে ময়লা করিতে দিত না। এই প্রকার সুচারু বন্দোবস্তে বাঙ্গালীদিগের বড়ই উপকার হইয়াছিল। ক্রমে কটক এবং পুরী পুলিশ সাহেবেরা ঠিক ঐ রকম আপন আপন এলাকায় করিয়াছিলেন। এই সময় দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, স্যার রিচার্ড টেম্পল জগদীশ বাবুকে মনোনীত করিয়া দুর্ভিক্ষকার্য্যে ব্রতী করিলেন। তিনি প্রথমতঃ দুইলক্ষ মণ চাউল সংগ্রহ করিবার ভার পান, মালদহ এবং নিকটবর্তী স্থানে চাউল সংগ্রহ করিয়া, উহা দিনাজপুরে গোলাজাত করা হয়, দিনাজ-

পুরে চারিমাশ ধরিয়া তিনি পুলিশ ও হাউজিং
উভয় বিভাগেরই কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার
পর রামগঞ্জ গিয়া একেবারে হাউজিং কমিশনার
ব্রতী হইলেন। এই রামগঞ্জ মাঠের উপর
একটা ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু হাউজিং কমিশনার
আধা সহরে পরিণত হইল। ‘ফেমিন’ কর্ম-
চারীর সুবৃহৎ বাঙ্গালা সম্মুখে সুবৃহৎ তাম্র-
খাটান, এই তাম্রটি অফিসারদিগের জগৎ
এবেসিনিয়ান এক্সপিডিসনে গিয়াছিল, বড়

বড় প্রকাণ্ড চালের গোলা, কর্মচারীদিগের
থাকিবার বাসা, খাণ্ড-সামগ্রী বিক্রয়ের জগৎ
দোকান-ঘর প্রভৃতি নানাবিধ আটখানা চালা
বাঙ্গালা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর পড়তিতে রামগঞ্জ
একটা জনাকীর্ণ স্থান হইয়া পড়িল। গ্রামটির
নাচে টাঙ্গন বলিয়া একটি নদী হিমালয় হইতে
পড়িতেছে, তাহার বক্ষে পারাপারের সুবিধার
জগৎ একটি বাঁশের পুন নিৰ্মিত হইল।
(ক্রমশঃ)

জিজ্ঞাসা ।

—:~:—

হে ঐব, হে অন্তর্যামী, হৃদি-অন্তঃপুর
তব রূপ-রস-স্পর্শে সদা ভরপুর—
এ কথা কে কবে নাথ, করে অস্বীকার ?
তবে কেন প্রাণারাম, হেন ব্যভিচার,—
তব সহ পরিচয় করিবার তরে,—
অক্ষয় করুণা-স্নেহ লভিতে অন্তরে,—
পুরোহিত—প্রতিনিধি—পঞ্চ-প্রদর্শক,
অনিল-সলিল-সম হবে আবশ্রুক ?
যে সম্বন্ধে বাঁধিয়াছ হৃদয় আমার—
তা’র মাঝে কোথা স্থান অস্ত্রে দাঁড়াবার ?
আমার প্রাণের কথা—সে শুণ্ড কাহিনী—
মিলন-মঞ্চল তব, দিবসযামিনী,
অপরে বলিবে মোরে,—তা’ কি হয় কত ?
চির-প্রিয়তম মম, হে নিখিল প্রভু !

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ ।

‘বকতাবা ও সাহিত্য,’ ‘রাবারী কথা,’ ‘বেহুলা,’ ‘হুমরা’ ‘নতী’ প্রভৃতি গ্রন্থে

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, সম্পাদিত

ও

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ প্রকাশিত

ধর্ম্মকাহিনীর অপর অমর ভাণ্ডার—কাব্যের আদর্শ-সজ্জানিষ্ঠার প্রজ্ঞাবণ

কাশীদাসী মহাভারত

ভারতের বালকবৃদ্ধবনিতার একমাত্র অবশ্যপাঠ্য পুস্তক ।

সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত

সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত ।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা ।

কাশীরাম দাস প্রণীত মহাভারত দেশী এণ্টিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে । ইহা বাজারের খেলো সংস্করণ নহে । যেমন কাগজ, তেমন ছাপা, তেমন বাঁধাই । বাহিরের আকার অতি মনোহর—কাপড়ের উপর রূপায় ছাপা অর্জুনের রথ শ্রীকৃষ্ণ-সারথি সহ কক্ কক্ করিতেছে । অভ্যন্তরের সজ্জা আরও মনোমুগ্ধকর । তিন খানি ত্রিবার্ণে মুদ্রিত ও ছাব্বিশ খানি একবার্ণে মুদ্রিত হাকটোন চিত্রে সুশোভিত ! ছবিগুলি সমস্তই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ কর্তৃক অঙ্কিত । প্রত্যেক চিত্রের পরিকল্পনাই, অভিনব সুন্দর । প্রায় তের শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্,

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

KEATINGS INSECT POWDER. কালাজ্বর এবং ছারপোকা।

কাপ্টেন প্যাটন (Patton of Indian Medical Service) সাহেব ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের এক প্রদক্ষ ডাক্তার—বহু পরীক্ষার পর কালাজ্বরবীজাণু ছারপোকাকার পাকস্থলীতে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় দেখিয়াছেন। তাঁর ছারপোকা এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর দংশনে আপনার পরিবারবর্গ এবং বিশেষতঃ স্নানশীল শিশুগুলির স্বাস্থ্য ও সুখ নষ্ট করে। প্রায় শত বর্ষ ধরিয়া কিটিং সাহেবের বৈজ্ঞানিক “কাটনাশক পাউডার” সমগ্র জগতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ভারতের প্রতি সংসারে প্রচলিত হওয়া উচিত। ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ, বিষাক্ত নহে; কোন ছর্গক নাই। কেবল ১০ মিনিট পূর্বে বিছানার চাদরের নিম্নে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া দিলে ছারপোকা মশা মাছি পরিপূর্ণ বিছানা সুখ-শস্যায় পরিণত হয়। মূল্য প্রতি কোটা মাঝারী ১০০, বড় কোটা ১১০০, ছোট কোটা ১০ মাত্র। এই সামান্য ব্যয়ের জন্য দারুণ কষ্টভোগ করা উচিত নহে। লগুনে প্রস্তুত। সমস্ত বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

শ্রমজীবিসমবায় লিমিটেড

৯০২এ হারিসন রোড, কলিকাতা।

একমাত্র খাঁড়ী স্বদেশী দ্রব্যের
সাম্মিলন স্থান।

যিনি প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিবেন,
তিনি নিশ্চিন্ত মনে এই স্থানে আসিলে পরিধেয় ধূতি, চাদর, মিলের
ধূতি সাটী তৈয়ারী জামা জ্যাকেট যাহা চাহিবেন, সাবান
এসেন্স, পুতুল এবং পাথরের এ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য
ও দর্জির কার্য যাহা চাহিবেন তাহাই
পাইবেন। ৫৯ একটা অংশ ক্রয়
করিলে টাকায় ১০ কমিশন
পাইবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

• ম্যানেজিং এজেন্ট।

৩৪ নং বেঙ্গলবাজার স্ট্রীট, মেট্রিকাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ইন্ডিয়া

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন ।

[নবপৰ্য্যায়]

মাসিক পত্র ।

চতুর্থ বর্ষ ।

১৩১১ ।



লেখকগণের নাম ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীবর বেনাস্বামীণ,
শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত
চন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,
মহাপ্রভা শ্রীযুক্ত জগদ্বিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ
বিদ্যাবৃষণ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ
গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশ-
চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ,
শ্রীযুক্ত ব্রজবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন
বাগচৌ, গোপালকৃষ্ণ, ও সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি ।

সহঃ সম্পাদক

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত ।